তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তদশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

— পঁচিশ টাকা

উপদেষ্টা পরিষদ:

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর সুকুমার সেন

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক:

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীজয়ন্ত বাকচি কর্তৃক পি. এম. বাকচি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য প্রধান লেখকদের সঙ্গে তারাশঙ্করের কিছু প্রভেদ বা বিশিষ্টতা আছে—সে তাঁর বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য। কাহিনী-নির্বাচনে, কাহিনী-বয়নে, চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁর মতো এত বহু বিচিত্রের স্বাদ কেউ দিতে পারেন নি। অনেক বিখ্যাত লেখকেরও কয়েকটা বই উপর্যুপরি পড়লে ক্লান্তি আসে, কারণ দেখা যায় একই পাত্র পাত্রী বিভিন্ন নাম নিয়ে বিভিন্ন বইতে উপস্থিত হচ্ছেন। কেউ কেউ নায়ক নায়িকা নির্বাচন করেন কোন কোন বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীর মুখ চেয়ে, সেক্ষেত্রে উক্ত তারকাদের মুদ্রাদোষগুলি পর্যন্ত অধিকাংশ নায়ক নায়িকার চরিত্র-চিত্রে আরোপিত হয়।

তারাশঙ্কর সম্বন্ধে একমাত্র অভিযোগ তাঁর কাহিনীর স্থান-নির্বাচনে বিস্তৃতির, অভাবনীয়ত্বের অভাব। বীরভূম ছাড়া নাকি তিনি কোন পৃষ্ঠপট ভাবতে পারেন নি। এক্ষেত্রে আমার সবিনয় নিবেদন, বর্তমান লেখকের প্রথম বয়সে দীর্ঘকাল ধরেই মধ্যে মধ্যে বীরভূম ভ্রমণের সুযোগ ঘটেছিল। এখানের গ্রামে গ্রামে আমি ঘুরেছি—তাতে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হল এই: বীরভূম একাই বহু জেলার সমতুল্য। সেখানের ভূমি-প্রকৃতি সেখানের মানুষ—কী জমিদার শ্রেণী কি দরিদ্রতম ব্যক্তি—সবই যেন অন্য জেলার অধিবাসী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে স্বতন্ত্র, বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। এখানে জমিদার আছেন, চাষী আছে, মজুর আছে; ব্রাহ্মণ কায়স্থ আছে, বাউরী বাগদী, নমঃশূদ্র, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষ আছে; মুসলমান তো আছেই। সন্ন্যাসী আছেন, ফকীর আছেন, বাউল কর্তাভজারা আছেন। তান্ত্রিক বৈষ্ণব দুই সাধনার জন্যই এ জেলা বিখ্যাত। আবার রাজপুত সাঁওতাল বিহারী প্রভৃতি অন্য প্রান্তের অন্য ভাষাভাষীরও অভাব নেই। একে 'এপিটোম অফ দ্য ওয়ার্লড্' বললেও যেন খুব বেশী অত্যুক্তি হয় না।

এমন রত্নভাণ্ডার হাতের কাছে থাকতে তিনি অপর স্থানে গিয়ে হাত পাতবেন কেন? বীরভূম শুধু তারাশঙ্করের জন্মভূমিই নয়—অতি প্রিয়, অতি পরিচিত এই স্থান তাঁর। এখানের মাটি পর্যন্ত তাঁর কাছে বন্ধুর মতো আপন। একে দেখেছেন তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে-শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিস্ময়ের সঙ্গে—মনে রাখবার মতো করে। কৈশোর ও যৌবনে এ জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন—সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, মিশেছেন অন্তরঙ্গ ভাবে। আত্মীয়ের মতো করে। সেই বিচিত্র বিপুল অভিজ্ঞতা বলতে গিয়েই কত বই লেখা হয়েছে—ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম, কালিন্দী, নাগিনী কন্যার কাহিনী, আরোগ্য নিকেতন—হাঁসুলীবাঁকের উপকথা—এবং কোনটাতেই বৈচিত্র্যের, চমকের, অনাস্বাদিত রসের অভাব ঘটে নি। অভিজ্ঞতা, চিন্তাশক্তি ও কল্পনার সম্পদ যাদের আছে, তাদের এদেশ ওদেশ কলকারখানা খনি প্রভৃতি ঘুরে রচনার বৈচিত্র্যের স্বাদ আহরণ করতে হয় না। টমাস হার্ডি যে তাঁর গল্প উপন্যাসে অর্ধকল্পিত ওয়েসেক্সের বাইরে যান নি, জেন অস্টেন্ তাঁর পিতৃগৃহের পঞ্চাশ মাইল বৃত্তের বাইরে কখনও পা দেন নি—তবু তাঁদের রচনায় বৈচিত্র্যের

অভাব ঘটেছিল বলে শুনি নি, অমরত্বের পথেও তা বাধা হয় নি।

তবু যেন এই দুর্নাম (?) থেকে মুক্তি পেতেই তারাশঙ্কর মন্বন্তরে কলকাতায় পৌছেছেন। আরও কয়েকটি বই লিখেছেন কলকাতাকে তাঁর কাহিনীর ঘটনা-কেন্দ্র করে। সপ্তপদীতে বাঁকুড়া, কীর্তিহাটের কড়চায় মেদিনীপুর ঘুরেছেন। না হলেও খুব ক্ষতি হত হত না। কীর্তিহাটের কড়চার কীর্তিহাট অনায়াসেই বীরভূমে হতে পারত।

তারাশঙ্কর প্রথম বয়সে নির্মলশিবের প্রেরণায় ও উৎসাহে নাটক নিয়ে খুব মেতেছিলেন। তাঁর শক্তিতে নাটকীয়তা ছিলই, সেটা এই মাজাঘষায় আরও তীক্ষ্ণ আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। তাঁর সব রচনাতেই নাটকীয়তার প্রভাব আছে। সেই জন্মেই ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার দিকে একটা ঝোঁক ছিলই। আর মনটা ইতিহাসের রসে জারিত বলে যখনই ইতিহাসের কথা বলতে বসেছেন—সন তারিখ স্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে অতি সতর্কতা ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর একটু অনুরাগও ছিল। ফলে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে কোথায় ইতিহাস শেষ হয়ে কল্পনা শুরু হয়েছে—অনেক সময় বোঝা যায় না, কল্পনাকেই ইতিহাস বলে মনে হয়।

এ আমরা ছায়াপথে দেখেছি, গন্নাবেগমে দেখেছি—আরও অনেক উপন্যাসে দেখেছি—ঐতিহাসিক আধা-ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা তারাশঙ্করের কম নয়—এখানেও তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি ইতিহাসের সমস্ত প্রান্ত ভ্রমণ করেছে; পাণিপথ যুদ্ধ থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহ পর্যন্ত কিছুই বাদ যায় নি। বৈষ্ণবসাধনার ইতিহাসও ইতিহাস, যাত্রাদলের ইতিহাসও কম নয়। সেটা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছেন। এখানেও তাঁর বিশেষ কোন চরিত্র পূর্বসৃষ্ট চরিত্রের অনুবর্তন করে নি। তিনশূন্যে, অগ্রদানীতে, রাইকমলে, আরোগ্য নিকেতনে, নাগিনীকন্যাতে, যোগভ্রষ্টে, পঞ্চপুত্তলীতে যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, অর্ধমানব মূর্খ গোঁয়ার প্রচণ্ড শক্তিধর পশুমানুষের চরিত্রাঙ্কনে যে দক্ষতা, সে শক্তি সে দক্ষতা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁকে ত্যাগ করে নি।

জঙ্গলগড় উপন্যাসখানি আয়তনে ছোট, তাঁর সমধিক বিখ্যাত উপন্যাসগুলির সঙ্গে ঠিক হয়ত তুলনীয়ও নয়, অন্তত পাঠক মহলে ঠিক সে রকম সমাদর পায় নি, তবু তার মধ্যেও তাঁর ইতিহাস-সচেতনতা, কাহিনী-বয়নের বিস্ময়কর ও নাটকীয় দক্ষতা এবং বিচিত্র চরিত্রসৃষ্টির পারঙ্গমতা তাঁকে ত্যাগ করে নি। সংলাপেও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের মতো ব্যবহৃত বাক্যে রহস্যঘনতা, অর্থের গভীরতা ও মননশীলতা বিদ্যমান। ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর সর্বাধিক প্রিয় নাট্যকার ছিলেন, তিনি সগর্বে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতিটি নাটকের প্রথম সংলাপ মুখস্থ বলেছেন আমাদের কাছে—সে প্রভাব তাঁর গল্প-উপন্যাসের সংলাপে প্রত্যক্ষ। তবে তাতে কোন ক্ষতি হয় নি বরং তারাশঙ্করের জন্মভূমিজাত অভিজ্ঞতা ও মেজাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে গেছে। অসুবিধা নাটকে হয়, একজনের কথার রহস্যময় অর্থ তলিয়ে বুঝতে অবসর পাওয়া যায় না, তার পূর্বেই অপরের কথা এসে পড়ে—সে অসুবিধা গল্প-উপন্যাসে নেই।

জঙ্গলগড়ও আরম্ভ হয়েছে নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে—অবশ্য তখনও পর্যন্ত যা নির্ভুল বলে জানা গেছে—তারপর একসময় নাটক শুরু হয়ে গেছে, কাহিনীর তারাশঙ্করীয় জাদু। এখানে পৃষ্ঠপট আমাদের অপরিচিত, সেদিক দিয়ে বিচিত্র তো বটেই, তবে এই রূপকথার মতো পরিবেশ আমাদের কল্পনা করতে অসুবিধা হয় না। পরিবেশও না, কাহিনীগুলোও না—অথবা সত্যিই তারা যেন আর এক লোকের আর এক যুগের মানুষ। কথার খেলাপ হয়েছে বলে ছত্রিশগড়িয়া ছত্রিশ জাত উনি লিখেছেন) সর্দার ইচ্ছে করে বাঘের পেটে গেল, এ হয়ত অসম্ভব কিন্তু এখানে অবিশ্বাস্য বোধ হয় না। এদিক দিয়ে এই ছোট্ট এবং স্বল্পপরিচিত উপন্যাসটিতে তারাশঙ্করের ক্ষমতা অনায়াসে অসাধারণত্ব লাভ করেছে। দলুই, মাধব সিং, রুক্মিণী, অর্জুন সিং—তার চেয়েও বড় কথা রুক্মিণীর প্রতি বিরূপ মাধবসিংয়ের মহিষীরা—এবং সব চেয়ে আশ্চর্য সব চেয়ে মিষ্টি সব চেয়ে পাঠকদের মনোমোহিনী—ঝুমঝুমি।

এরা সকলেই যেন এক বিস্মৃত ইতিহাসের, যেন বহু দূরের কিংবদন্তীর পৌরাণিক ভারতীয় ঐতিহ্যের মানুষ—তবু এরা বড় প্রিয়। শুধু তাই নয় লেখক তাঁর মায়াময়-কলমে আমাদের বিশ্বাস করিয়েছেন—এরা সত্য, এরা রক্তমাংসের মানুষ, ঐ অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এদের দর্শন মিলত। এদের সুখ দুঃখ আমাদের বুকের মধ্যে অনুভূত হয়, এদের বিপদে আমরা কণ্টকিত হই; একরকমের উত্তেজনা বোধ করি—যে উত্তেজনা শুধু খুব পরিচিত, নিকট আত্মীয়দের সম্বন্ধেই বোধ করে মানুষ।

মহানগরীতে দ্রুত-লিখনের ভাগিদের লেখার চিহ্ন আছে। লেখক একবার বালিগঞ্জের পাঞ্জিয়া অঞ্চলে একটি আধাবস্তিতে ঘর ভাড়া ক'রে একা বাস করেছিলেন—সাহিত্যসাধনার (সাহিত্য তপস্যা বলাই উচিত) জন্য। সেই পৃষ্ঠপটেই এ উপন্যাসের শুরু—এর মধ্যে আমরা মন্বন্তরের পূর্বাভাস পাই, সেই বাড়ি সেই চরিত্র। তাদের নিয়েই লেখকনায়ক এক গল্প লিখতে শুরু করছেন, সেটাই এ উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ।

মহানগরীতেও কলকাতাকে পৃষ্ঠভূমি করা হয়েছে। এর মধ্যে লেখকের নিজের জীবনের কথা অনেকখানি। তাঁর সাহিত্য জীবন শুরুর কথা, পত্র পত্রিকা, পুস্তক প্রকাশকের সঙ্গে পরিচিত হবার কথা। বালিগঞ্জের বস্তিতে আরম্ভ, বৌবাজারের চীনা-মুসলমান-ফিরিঙ্গি অধ্যুষিত অঞ্চলের একটি মেস বাড়িতে শেষ। এ মেস-বাড়িতে স্বয়ং তারাশঙ্করকে অধিষ্ঠিত দেখার সুযোগ আমাদের ঘটেছে।

নিজের জীবনে বিস্ময়কর ঘটনা লিখতে বসলে লেখকদের যে সব তথ্য মূল্যবান বোধ হয় পাঠকদের তা নাও হতে পারে। তবে বইয়ের এই ব্যক্তিগত জীবন-চিত্রের মধ্যেও অনেকখানি অপরিচিতের স্বাদ পাওয়া যায়। বিশেষ, আমাদের বয়সী বা অগ্রজ যে সব লেখক আজও জীবিত আছেন—তাঁদের কাছে এই সম্পাদক, ঐ পত্রিকার আপিস, ঐসব লেখকরা বিশেষ পরিচিত। ভূপেনের অবিন্যস্ত চুল নাড়া ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহ আবেগকরুণ কণ্ঠে মধ্যে মধ্যেই আবৃত্তি করে ওঠা আজও আমাদের চোখে ও কানে লেগে আছে। তাঁর সাকীর গান

তো শুনেছিই, আজও শুনছি।

কিন্তু, হয়ত এই সব বিশেষ লোকগুলিকে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়েই এ গ্রন্থে কিছু শৈথিল্য দোষ ঘটেছে। তারাশঙ্করের গল্প বোনার সে আশ্চর্য জাদু এ উপন্যাসে অনুপস্থিত। পড়ার সময় মনে হয় নিজের কথা লিখতে লিখতে যখন হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছেন যে উপন্যাসের কাহিনী বহু দূরে চলে যাচ্ছে, তখন হঠাৎই আবার গল্পের সূত্র টেনে এনেছেন, ফলে আত্মকথা ও উপন্যাসের টানা-পোড়েন বুনুনিটা তেমন জমাট হ'তে পারে নি।

এ গ্রন্থে বৈচিত্র্য বলতে ঐ সাহিত্যিকদের জগৎটুকুই যা—বাকী গল্পে বা চরিত্রে তেমন কোন অভাবনীয়ের স্বাদ আমরা পাই না। চিত্র কয়লা-ও'লা আর শিল্পী পিনাকীই যা একটু। ভাঙ্গাবাড়ির অভিজাত মালিক তো 'মন্বন্তরে'র মানুষ, সে বইটা আমরা আগে পড়েছি বলে পূর্ব-পরিচিত। লা-ণ্যও আরও কয়েকবার এসেছে—লেখকের অন্য রচনায়, হয়ত হুবহু একরকম নয়, আদলটা এক। এ উপন্যাসে বিশিষ্ট চরিত্র বুড়ী মাগী, বাঙ্গালীর মেয়ে কেটির জন্য মাতৃস্নেহের ব্যাকুলতা নিয়ে যে বসে আছে ঐ বাইজী-পাড়ার বাড়িতে।

'মহাশ্বেতা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর পুরোপুরি কলকাতার দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। যুদ্ধোত্তর কলকাতার বদলে-যাওয়া জীবন, তার ভালমন্দ—ভালর থেকে মন্দই বেশী—বাড়তি টাকার নেশায় উন্মত্ত মানুষ, এদের চোর'টাকার কারবার, কালো টাকা, নতুন ধরনের ব্যবসা, যৌবন-মত্ততা কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় নি। এই পঙ্ককুণ্ডে ফুটে উঠেছে অপরূপ এক নারীচরিত্র—অগ্নিশিখার মতো মেয়ে নীরজা বা নীরা।

অগ্নিশিখা শব্দটি সাধারণ বহু-প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করি নি। অন্যায়ের প্রতিবাদে উগ্র, তেজস্বিনী তরুণী চিত্র অনেকেই এঁকেছেন বাংলা সাহিত্যে, এখনও আঁকছেন। ব্যবহারে ওটার জেল্লা কমে গেছে, ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে। তারাশঙ্করের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অন্যত্র। এ মেয়ে অনায়াসে পরের অন্যায়ের দায় বা কলঙ্ক নিজের মাথায় তুলে নেয়। তার জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করে, আবার অপরের প্রতি অন্যায়ে অবিচারে নিজের সৌভাগ্যের পূর্ণপাত্র হেলায় ফেলে দিয়ে চলে যায়।

শিল্পী বিনো সেনকে অপমান করে, যে অন্য একটি মেয়ের প্রতি অবিচার করেছে, তাকে প্রতারণা করছে সন্দেহ করে—আবার নিজের ভুল বুঝে বিলেত থেকে ফিরে সোজা চলে যায় সেই মুমূর্ষু সংক্রামক-ব্যাধিগ্রস্ত বিনো সেনের কাছেই. নিজের জীবন তার পায়ে উৎসর্গ করে সে অপমানের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

নীরা ছাড়াও কটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র আছে বইতে. জ্যাঠামশাই সাধারণ, এঁদের আমরা অনেককেই চিনি, অজিত সুজিতও তাই, তবে রণজিৎ আর জ্যাঠাইমা, এবং হেনা এণাক্ষী—এদের মধ্যে তারাশঙ্করের ছাপ সুস্পষ্ট।

'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে' তারাশঙ্করের অন্য সৃষ্টির তুলনায়, তাঁর প্রখর লেখনীর দিক দিয়ে বিচার করলে আদৌ সফল হয়ে ওঠে নি। এখানে যে ক্ষেত্র, পরিবেশ ও যেসব পাত্রপাত্রীর মধ্যে উনি বিচরণ করেছেন, অনেক সময় মনে হয় সে ক্ষেত্রে প্রবেশ ওঁর অনধি-

কার চর্চা, এদের কথা উনি অপরের মুখে শুনেছেন, এদের সম্বন্ধে ওঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কম। কালো মেয়ে শ্যামলী বা কাজল এবং শিল্পী নায়কের প্রেম এই গল্পের প্রধান উপাদান কিন্তু সে খুব অসামান্য হয়ে উঠতে পারে নি। বরং নায়কের কথাবার্তা ও আচরণে কিছু তারাশঙ্করীয় ছাপ আছে। তারাশঙ্কর তাঁর সব উপন্যাসেই—সাময়িক-পত্রের তাগিদে তাড়াহুড়ো করে লিখতে হত বলে—গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় আদ্যোপান্ত মেজে-ঘষে দিতেন—মনে হয় এই বইটির বেলায় সে অবসর পান নি।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মহাশ্বেতা

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রীতি ও স্নেহভাজনেষু

এক

"ক্ষমা কর। আমাকে তুমি ক্ষমা কর!" হাত থেকে বিনোবাবুর তুলিটা পড়ে গেল। ত্রস্ত কাতর কণ্ঠে অত্যন্ত দ্রুত কথা ক'টি বলে শেষ করলেন তিনি। যেমনভাবে অসম্বৃতবসনা তরুণী কারুর সাড়া পেয়ে কাপড়খানা সারাঅঙ্গে জড়িয়ে ধরে; ঘরের মধ্যে দপ করে আগুন জ্বলে উঠলে লোক যেমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে কিছু দিয়ে সে-আগুন চাপা দেয়, তেমনিভাবে। তেমনি লজ্জার সঙ্গে, তেমনি ভয়ার্ত কাতরতার সঙ্গে। কিন্তু নীরা আগুনের মত মেয়ে—জীবনে সে জ্বলেই আসছে—এ নিয়ে তার অনেক অহংকার এবং সে সচেতন-ভাবেই উদ্ধত হয়ে থাকে সদাসর্বদা। বিনো সেনের এ-লজ্জাকে সে চাবুক মেরে বলে উঠল—

—ক্ষমা? আপনার এ নির্লজ্জতা কি ক্ষমা করা যায়? ক্ষমার যোগ্য? আপনি না প্রবীণ? আজই না আপনার পঁয়তাল্লিশতম জন্মদিন পালন করেছি আমরা? আপনি না সর্বত্যাগী দেশসেবক? আশ্রম করে বসে আছেন? আপনি না খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী? আজই আমি আপনাকে বরেণ্য ব্যক্তি বলে দশের সম্মুখে স্তুতি করেছি। কি ভেবেছিলেন আপনি? আপনার প্রেম-নিবেদন-করা পত্রখানি পেয়ে আমি বিগলিত হয়ে যাব? আমি আপনার প্রেমে পড়েই আছি? যেহেতু না—আপনার আমি আশ্রিত! আপনার আশ্রমে চাকরি দিয়ে আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন—সুতরাং গল্প-উপন্যাসের যুক্তি অনুযায়ী কৃতজ্ঞতা-হেতু প্রেমে পড়তে আমি বাধ্য!

—আমাকে তুমি ক্ষমা কর! বিনো সেন আবার কাতর মিনতি করে উঠলেন।

—না। ক্ষমা করব না। আপনি নির্লজ্জের চেয়েও আরো বেশী কিছু যার নাম আমি জানি না।

—নীরা!

—না-না। নীরা নয়। আমি নীরজা দেবী। নীরা বলে ডাকবেন না আপনি।

—বেশ! এতক্ষণে একটু বিষণ্ণ অপ্রতিভ হাসি হেসে বিনোবাবু বললেন, কিন্তু একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না, নীরজা? তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, তুমি আমার কাছে ছাত্রীর মত পড়েছ, তোমাকে আপনি বলতে বাধছে! এবং এমন অপরাধ কি করেছি আমি?

এবার জ্বলে উঠল নীরা।—কেন? কেন? কেন এ পত্র লিখেছেন আপনি?

এবার নিজেকে সংযত করে ধীর কণ্ঠে মাটির দিকে চেয়েই বিনো সেন বললেন, পত্রেই লেখা আছে। একটু থেমে আবার বললেন, তুমি অবিবাহিতা কুমারী—আমি অবিবাহিত; তোমাকে আমি চার বছর ধরে গড়ে তুলেছি। তোমাকে আমি বিবাহ করতে চাই! ঘর চাই সংসার চাই! নীরা, অকস্মাৎ আমার বাঁধ ভেঙে গেল। তুমি চলে যাবে—আমি সইতে পারলাম না।

কথায় বাধা দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল নীরা, আপনি চরিত্রহীন।

—নীরা!

মর্মান্তিক যন্ত্রণায় এবার বিনো সেন যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলেন।

নীরা কিন্তু গ্রাহ্য করলে না; সেও যেন ক্ষোভে এবং ক্ষোভের অতিরিক্ত একটা কোন আবেগে জ্ঞানশূন্য হয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। সে রূঢ়তম কণ্ঠে বললে, নন চরিত্রহীন? তারপর স্থিরদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাঁর দিকে চেয়ে থেকে বললে—

—তবে প্রতিমা দেবী কে?

আবার একটু চুপ করে থেকে বললে—ওঁকে আপনি ভালবাসেন বলেই কি এখানে আনেন নি? ওঁর মান অভিমান কারুর অজানা ভাবেন এখানে? আমার প্রতি আপনার এই গোপন আকর্ষণ আমি বুঝি নি কিন্তু উনি বুঝেছেন। উনি আপনাকে জানেন যে! লোকে অনুমান করে, আমিও করছিলাম, আপনার এ প্রেম পবিত্র প্রেম। বিবাহই যদি করবেন, তবে ওঁকে অবহেলা করে আমার কাছে নিবেদন কেন? আমি জানি ওঁর বুকের মধ্যে কি ক্ষোভ! ওঁকে চিঠিতে কি লিখেছিলেন? আমি দেখেছি চিঠি। ওঃ, চরিত্রের সে কি বড়াই! কি নাটুকেপনা!

এবার ব্যঙ্গের সুরে চিঠির কথাগুলি বলে গেল—'আমাদের সম্পর্ক বিবাহের নয়, প্রতিমা আত্মসম্বরণ করতে হবে, আমার জীবন তো জান! বিবাহ তো আমি করব না!' ভদ্রমহিলার চোখের জলে বুক ভাসছিল, উপুড় হয়ে পড়েছিলেন, আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম, চিঠিখানা উনি দেখান নি, আমি দেখে ফেলেছিলাম।

এবার মাথা হেঁট করে বিনোবাবু মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভেজানো দরজাটির আধখানা খুলে মাটির মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল বিষণ্ণ প্রতিমা। দুটি চোখ বেয়ে তার গড়িয়ে নেমে আসছিল অবিশ্রান্ত ধারা। মুহূর্তের জন্য তাকে তিনি দেখেছেন।

* * *

বাইরে অন্ধকার রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা; বাংলা দেশের একটি মফস্বল শহরের উপকণ্ঠে নির্জন গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে একটি অনাথ আশ্রম। নিতান্ত সন্ধ্যাতেই এখানে রাত্রির নিদ্রালু স্তব্ধতা নেমে আসে। ছেলেরা কিছু ঘুমোয়, কিছু ঢুলতে থাকে, দু'চারজন পড়ে। শব্দ হয় রান্না ও খাবার জায়গায়; চাকরেরা, পালাপড়া ছেলেদের নিয়ে অ্যালুমিনিয়মের গ্লাস সাজিয়ে যায়, কেউ তাতে জল ভরে দেয়, কেউ পিঁড়ি পাতে—তারই শব্দ হয়। এরই মধ্যে কখনও ওই নীরার কণ্ঠস্বর শোনা যায়, লাইন সোজা কর।

অথবা—

—না-না। তাড়াতাড়ি করো না, তাড়াতাড়ি নয়। দেখছ না জল পড়ছে, ভিজছে বসবার জায়গা! তারপরই হয়তো—

—রমেন, তোমার শরীর বা মন কি আজ খারাপ আছে নাকি?

ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর শোনা যায় না, কিন্তু নীরার কথায় বোঝা যায় যে, ছেলেটি বলেছে, না তো!

নীরার উত্তর শোনা যায়, তবে মুখে বিরক্তি কেন? কাজ এমন দুমদাম করে করছো

কেন ?

এরই মধ্যে প্রায়ই ছেলেদের বোর্ডিং থেকে উচ্চ চিৎকার আসে, দিদিমণি গো, দুটোতে খুন হবে এবার!

নীরা সঙ্গে সঙ্গে টর্চটা হাতে, সেটা তার হাতেই থাকে, বলতে বলতে যায়, বাপ রে বাপ রে! আর তো পারি না রে বাবা!

নতুন ইলেকট্রিক স্কীমে এখানে ইলেকট্রিক এসেছে অল্পদিন, কিন্তু তা এখন ঘরেই রয়েছে, আশ্রমটার বিস্তৃত পঞ্চাশ বিঘা জমির মধ্যে বাইরে কেবল একটা আলো, তাতে আলো-আঁধারিরই সৃষ্টি ক'রে বিভ্রান্তি ঘটায়। টর্চটা না হলে চলে না। গিয়ে দেখতে পায়, দুটো ছেলেতে নিঃশব্দে বা সশব্দে সরবে মল্লযুদ্ধ বা মুষ্টিযুদ্ধ লাগিয়েছে। নীরা গিয়েই দুটোকে আলাদা করে দেয়, ছাড়! ছাড়!

কিন্তু সে সহজ নয়, দুটোই দুটোকে ডেঁয়ো পিঁপড়ের কামড় দিয়ে ধরার মত ধরে থাকে। তবু নীরার কথায় ছাড়তে হয়। নীরার প্রভাব ওদের উপর অসাধারণ। ছাড়বার পরই বিস্ফোরণ হয়, কেন ও আমাকে—: সে ফোঁপাতে থাকে। দুজনেই অনাথ ছেলে—তাদের অভিমান ক্ষোভ বিচিত্র। ব্যাপ্তিতে বিশ্বজোড়া, উচ্চতায় বোধ করি আকাশ-প্রমাণ। সে কথা নীরা অন্তর দিয়ে জানে। সে উপলব্ধি তার আছে। নিজের জীবনটাই যে তার এই জীবন। পাঁচ বছরে বাপ মরেছে, আট বছরে মা! বাপের লাইফ ইনসিওরের তিন হাজার টাকা এবং জমি বিক্রী করা হাজার চারেক এই সাত হাজারের মূলধনে, জ্যাঠা-জেঠীর সংসারে এক কোণে ঠাঁই পেয়েছিল। সেও তো এই জীবন। ক্ষোভ বিদ্রোহ যে এই বঞ্চিত বেদনার্ত জীবনে বিশ্বব্যাপী, আকাশ-প্রমাণ! বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে মানুষ আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। তার তেজস্ক্রিয়তায় বায়ুমণ্ডল জীবদেহের পক্ষে বিষাক্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু মানুষের চিত্তলোকের আকাশে আকাশে বঞ্চনার ক্ষোভের বিস্ফোরণ প্রতিনিয়ত চলেছে—তার তেজস্ক্রিয়তায় সব বিষ হয়ে গেল বোধ হয়। হ্যাঁ, সব বিষ! নীরার চিত্তলোকের বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়তায় বিনো সেন যদি নাগাসাকি হিরোসিমার মত ঝলসেই যায় তো কি করবে নীরা! যুদ্ধ ঘোষণার সময় জাপান কথাটা ভাবে নি। বিস্ফোরকে আগুন তো সে-ই দিয়েছিল প্রথম। অহিংসার সাধক—দেবতা বুদ্ধের উপাসক জাপান!

বিস্ফোরকে অগ্নিসংযোগ হলে মুহূর্তে আসে মৃত্যুযোগ। কত দেবতার মন্দির, রাজার প্রাসাদ ফেটে চৌচির হয়ে যায়, দেবতা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, রাজার দেহ মাংস-পিণ্ডে পরিণত হয়। সে রেহাই দেয় না কাউকে। নিজের উপর ফাটলে নিজেও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মাংসখণ্ডের টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। হলেই বা বিনোদা, বিনোদ সেন সর্বত্যাগী বলে পরিচিত, দেশমান্য, রাষ্ট্রের দরবারে সম্মানিত জন। বিস্ফোরকে তিনি আগুন দিয়েছেন, তার আঘাতে তাঁকে টুকরো টুকরো হতে হবে না ?

খাবার জায়গায় ছেলেদের যাবার ঠিক আগেই ব্যাপারটা ঘটেছে। আশ্রমের একপ্রান্তে বিনোদ সেনের নিজের ঘর। দুখানি ঘর, বারান্দা, একটি স্টুডিও, খানিকটা বাগান। ঠিক মাঝখানে স্কুল, তার পাশে বোর্ডিং, তার পাশে খাবার ঘর, এক লাইনে পাশাপাশি এগুলি।

তারই ঠিক পিছনে,—বিনোদ সেনের বাড়ি যেদিকে, তার বিপরীত দিকে শিক্ষয়িত্রীদের কোয়ার্টার। চল্লিশটি অনাথ ছেলে নিয়ে আশ্রম ; সঙ্গে ইস্কুল, আগে ছিল প্রাইমারী—এখন হয়েছে বেসিক, তার সঙ্গে সেকেণ্ডারি স্ট্যাণ্ডার্ডের তিনটি ক্লাস। তার জন্ম আছেন দুজন বৃদ্ধ শিক্ষক ; তাঁরা থাকেন বিনোদ সেনের বাড়ির লাইনে। এ লাইনে বিনোদ সেনের নিজের বাড়ির পিছনেই আর একটি কোয়ার্টারে থাকেন বিনোদ সেনের বিধবা বোন আর তাঁর ছেলেরা। তারই একদিকে থাকে এই প্রতিমা। এখানে আশ্রম পত্তন হয়েছে ১৯৪৮এ ; আটটি ছেলে দিয়ে শুরু হয়েছিল। পঞ্চাশ সালে সরকারী সাহায্য পেয়ে যেবার আশ্রমের রূপ বদলে গেল, সেইবার নাকি বিনোদ সেন নিয়ে আসেন এই প্রতিমাকে। ইনি বিনোদ সেনের কোন বন্ধুর বিধবা পত্নী, শুধু তাই নয়, বান্ধবীও, প্রিয় বান্ধবী বলেই সবাই জানে। এর বেশি অতীত কথা, অতীত ইতিহাস কেউ কিছুই জানে না। তবুও কারও বুঝতে কষ্ট হয় না যে এদের দুজনের মধ্যে একটা কিছু আছে। অন্য শিক্ষয়িত্রীরা মুখ ফুটে বলাবলি করে, মুখ টিপে হাসে ; নীরা বিষন্ন হেসে চুপ ক'রে থেকেছে। সে যখন এখানে আসে তখনই শুনেছে ছেলেদের কাছে প্রতিমা 'মা-মণি'। ওর যেন একটা অর্থ আছে।

নীরার এমন উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে সবাই এসে বাইরে দাঁড়িয়ে গেছে। আসে নি শুধু সেনের বোন, সে পঙ্গু। তার ছেলেরা কলেজে পড়ে। কলকাতায় থাকে। একটি চোদ্দ-পনের বছরের মেয়ে, সে এই শহরের ইস্কুলে পড়ে, সেও বোধ হয় লজ্জায় আসে নি। পাশের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বা অনুভব করা যাচ্ছে, অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। চাপা গলায় কেউ যেন বলছেন—যাও, যাও ; সব আপন আপন ঘরে চলে যাও। যাও। এখানে নয়। যাও। বিহারী, এই বিহারী—যাও না—খাবার ঘণ্টা দাও গে না। যাও—যাও।

কথাটা শুনে নীরা এবং বিনো সেন দুজনেই একবার বাইরের দিকে তাকালেন। স্কুল-কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটা মাত্র ইলেকট্রিক আলো—তাও সেই খাবার-ঘরের ওখানে ;—কুহেলির আবছায়ার মধ্যে অনেক কালো কালো মূর্তি। সব ভেঙে এসেছে।

নীরার সে গ্রাহ্য করবার কথা নয়। সে অন্যায় করে নি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। সে প্রতিবাদ উচ্চকণ্ঠেই সে করবে। বিনো সেন কিন্তু আশ্চর্য। লজ্জা নেই। নীরার কাছে মাথা হেঁট ক'রে ছিল যে বিনো সেন—সেই বিনো সেন এই—সকলের সামনে মুখ তুলেই বললেন—আমি তোমাদের যেতে অনুরোধ করছি। এ ব্যাপারটা আমার আর মিস মুখার্জীর মধ্যে। এবং উনি যা বলছেন তাই আমি মেনে নিচ্ছি। যান। আপনারা দয়া করে যান!—

ভিড় সরতে লাগল। শুধু তার মধ্যে থেকে বা চলে যাওয়ার জন্ম উদ্যত ভিড় ঠেলে এখানে কে একজন যেন ছুটে এল। এল, কিন্তু সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল দরজার একখানা কপাট ধরে।

সে প্রতিমা। মুখ তার ছাইয়ের মত বিবর্ণ পাংশু। দেহ তার দুর্বল রুগ্ন। সে কোনমতে

দরজাটা ধরে দাঁড়াল! তাকিয়ে রইল বিনো সেনের দিকে। সে কি দৃষ্টি! কি বেদনা! কি ক্ষোভ! কি ক্ষুধা!

এবার বিনো সেন মাথা হেঁট করলেন। সব সপ্রতিভতা তাঁর স্তব্ধ হয়ে গেল।

নীরা এগিয়ে গিয়ে হতভাগিনী মেয়েটার হাত ধরে টেনে এনে বিনো সেনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল, বললে—বলুন, আপনি তো গুণী-জ্ঞানী, বড় মানুষ, বলুন, কোন মনুষ্যত্বের নিয়মে বা অধিকারে, এঁকে ভালবেসে এখানে নিয়ে এসেও এঁকে বিয়ে করবেন না? আপনি নিজে সেদিন বিধবা বিবাহ সমর্থন করে একঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিয়েছেন। যারা বিবাহ সত্ত্বেও আবার বিবাহ করে, মেয়েদের ভালবেসে প্রতারণা করে, তাদের জন্মে বলেছেন, তাদের মাথায় বজ্রাঘাত হোক। এর পরও আমাকে ভালবাসেন, আমাকে বিবাহ করতে চান বলে পত্র লিখলেন কি ক'রে আপনি?

প্রতিমা এবার কেঁদে যেন ভেঙে পড়ে গেল। দুই হাতে সেনের পা জড়িয়ে ধরে সে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠে বললে, আমাকে আগে বললে না কেন? আমি যে বিষ খেতাম।

বিনো সেন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েই রইলেন।

—কি, কথা বলেন না কেন?

বিনো সেন বললেন, আমার মাথায় বজ্রাঘাতই হোক নীরজা! আমার বোধ হয় তাই প্রাপ্য।

প্রতিমা আবার কেঁদে উঠল, না-না-না।

নীরা বললে, ছি-ছি-ছি, আপনাকে ছি!

বলেই সে দ্রুতপদে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে আবার ফিরে গেল, দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললে, আজ রাত্রেই আমি এখান থেকে চলে যাব।

প্রতিমা তখন কাঁদছে।

বলেই সে চলে গেল।

যেতে যেতে শুনতে পেলে বিনো সেনের কণ্ঠস্বর, তিনি দূরে-দূরে টুকরো জটলায় জমাট লোকগুলিকে বলছেন, যেন একটু কঠিন কণ্ঠেই বলছেন—দয়া ক'রে আপনারা যান এবার। নাটক তো ফুরিয়ে গেছে! যান। যাও।

আছে যে অনেকেই। শিক্ষকেরাও আছেন। ছেলেরাও কিছু রয়েছে। বিনো সেন মহাপুরুষ, রাগ হবে বইকি।

কিন্তু, নাটক? সে নাটক করে এল?

নির্লজ্জ কোথাকার।

মানুষ সাধু—মানুষ সর্বত্যাগী। ছদ্মবেশী ভণ্ডের দল! দেহধারী মানুষ, দেহজ কামনার আগুন তার রোমকূপে-রোমকূপে; ছাই মেখে সেই মুখ বন্ধ করে মানুষ সন্ন্যাসী সাজে। এদেশের মোহন্তদের ইতিবৃত্তের কথা সে জানে। ইয়োরোপের সন্ন্যাসীদের ব্যভিচারের ইতিহাস সে পড়েছে। ইতিহাসের দেশে বিদ্রোহ হয়, বিপ্লব হয়, ইতিবৃত্তের দেশে হয় না।

তাই একদিন যারা বিপ্লবী ছিল, তারা আজ অধিকার পেয়ে ভণ্ড ব্যভিচারীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এদেশের লজ্জাবতী লতার মত কোমলা মেয়েরা স্পর্শ মাত্রেই নুইয়ে প'ড়ে বলে, আমার এলায়িত দেহের ভঙ্গিতে আমার উত্তর নাও, মুখে বলতে কি পারি? এবং স্বল্পস্মিত হাস্যে তাকিয়ে মুখ নত করে। কিন্তু বিনো সেন, তুমি জেনো সে তাদের দলের নয়!

সে কঠিনা সে নিষ্ঠুরা—সে পৃথিবীকে চেনে, মানুষের অন্তর সে আয়নার মত দেখতে পায়; এতদিন অসহায় ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। আজ সে শক্তি পেয়েছে, সে আঘাত করবে না?

বেশ করেছে সে নাটক করেছে।

নাটক! নাটক কি সহজ না সুলভ? যাকে-তাকে নিয়ে নাটক হয়?

ঘরের ভিতর বসে স্থির দৃপ্তদৃষ্টিতে দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো মনে মনে যেন আউড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাধা পড়ল। বাইরে থেকে কড়া নড়ল। তিক্ত উষ্মার সঙ্গে অল্প ঘাড় বেঁকিয়ে সে-দিকে তাকিয়ে সে বলল, কে?

—আমি দিদিমণি। ডাকছে ঠাকুর নটবর।

—কি চাই?

—ছেলেরা যে খেতে আসবে, ঘণ্টা দিচ্ছে।

—দাও গে। আমি যাব না।

—আজ যে মাছ মাংস মিষ্টি হয়েছে, লুচি আছে। ওরা যে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি করবে।

আজ বিনো সেনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ছেলেদের জন্যে ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। করেছিল যারা তাদের মধ্যে সে-ই প্রধান। নিজের সে আচরণের জন্য অনুতাপ হচ্ছে তার, রূঢ়কণ্ঠে সে বললে, করুক। আমি যাব না। আর আমি এখানকার কেউ নই। অন্য কাউকে ডাক গিয়ে, নমিতাদি কি কমলাদি, যাকে হোক।

—আজ্ঞে?

—যা বলেছি শুনেছ। ওঁরা না আসেন খোদ সেনবাবুকে বল গিয়ে। যাও! যাও! যাও!

সে উঠে গিয়ে দরজা একবার খুলে বললে, যাও বলছি! বলেই সে আবার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকিনি বন্ধ করে দিলে। এখানকার সংস্রবে সে আর একদণ্ড থাকতে চায় না। আজ রাত্রেই সে চলে যেতে চায়। হ্যাঁ। আজ রাত্রেই।

হ্যাঁ, আজ রাত্রেই।

হোক রাত্রিকাল। হোক দু পাশে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। হোক সামনে দামোদর। দামোদরের উপরে ডি-ভি-সি'র ব্যারাজে ব্রিজ আছে। ওপারে নতুন ডি-ভি-সি কলোনী। নতুন যুগের দেশ। শুধু সমস্যা, সঙ্গে আজ জিনিস অনেক। আরও একদিন এমনি করে রাত্রে জীবনের যাত্রা শুরু করেছিল। একবস্ত্রে বিয়ের কনে, সাজ খুলে, কপালের চন্দন, চোখের কাজল মুছে বেরিয়ে এসেছিল। বিবাহের রাত্রে এর চেয়ে অনেক কঠিনতর জটিলতর

ঘটনার সংঘটন! নাগপাশ! নাটক! নির্লজ্জ সেন বললেন, নাটক শেষ হয়ে গেছে! নাটক! সে নাটক করেছে! হ্যাঁ, করেছে। নাটক করে কে? যে নাটক অভিনেতা-অভিনেত্রীরা করে, সে তো নকল নাটক। আসল নাটক করে তারাই, যাদের চরিত্র নিয়ে নাটক হয়। যারা বিদ্রোহী, যারা সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, যারা নিজের জীবনে আগুন লাগিয়ে সংসার-সমাজে আগুন ধরিয়ে তপ্ত শিকে ছেঁকা দেওয়ার যন্ত্রণার শোধ নেয়। তার জীবন নাটক যে, সত্যই নাটক! মনে পড়ছে সব ঘটনা। আশ্চর্যভাবে নাটকীয়। নাটকের আকারে সাজালেই হল।

দুই

সাজাও। সাজিয়ে নাও নীরার জীবনের ঘটনা। দেখ নাটক হয় কিনা!

সংসার রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট তৈরী কর। ১৯৩০-৩১ সালের কলকাতার উপকণ্ঠ; এই দমদমের কাছে ছোট একটি গ্রাম। তখনও এরোড্রোম হয় নি। অন্তত নীরা তার খবর জানে না। অর্ধেক পাড়াগাঁ, অর্ধেক শহর। অনেক নারকেল গাছের মাথা উঠে আছে আকাশের পট-ভূমিতে। তার সঙ্গে সুপুরি গাছ। আর আমের বাগান। যেগুলো ভেঙে ভেঙে এখন কলোনী হচ্ছে। আধকাঁচা আধপাকা রাস্তা। অপ্রশস্ত। দুধারে কাঁচা ড্রেন। পাঁকে ভর্তি। কৃমিপোকা মাছি আর মশায় নরক। এরই মধ্যে একটি চৌরাস্তায় কিছু দোকান-দানি। ইলেকট্রিক তখন দমদম পর্যন্ত এসেছে। তাদের গ্রামে আসে নি। ঘর এক পাকা আর এক ছিটেবেড়ার গোলপাতার। পাকাবাড়ির অধিকাংশই একতলা, কয়েকখানা মাত্র দোতলা। কাঠের চেয়ারে বালিশের কুশন, তক্তাপোষে ফরাস। তার উপর সরু আকারের হোমমেড টেবিলক্লথ। জানালায় রঙীন পুরনো কাপড়ের পর্দা। দরজায় রোঁয়া-ওঠা পাপোষ, অনেক কালের পুরনো। সন্ধ্যেবেলা শেয়াল ডাকত। মধ্যে-মাঝে দু'চারটে সাপ মারা পড়ত। দিনের বেলা, দশটা হতে-না-হতে সারা গ্রাম হত পুরুষশূন্য। সব কলকাতা ছোটে। হাতে খাবারের কৌটো, পানের ডিবে। মুখে বিড়ি। ফেরে সন্ধ্যে ছটা থেকে আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে। দমদম স্টেশনে নেমে মাঠ ভেঙে হনহনিয়ে ফেরা—যেন বিবরে ঢোকা। বৈচিত্র্যহীন, স্তিমিত। তবে কালের পটভূমিতে স্তিমিত নয়। কালের আকাশে তখন ঝড় উঠেছে। এক দণ্ডধারী কৌপীনবন্ত খর্বকায় শীর্ণ ব্যক্তির পদক্ষেপে-পদক্ষেপে দেশের হৃদয় সমুদ্রের মত উথলে উথলে উঠছে। এ তো দেখাতে পারবে না রঙ্গমঞ্চে! প্রতীক হিসেবে কিছু ভাঙা ডালপালা পাতা ফুল ছড়িয়ে রেখো। একটা গাছের ডালে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা বেঁধে দিয়ো। কারণ সেটা ১৯৩০ সাল। এক মাস আগে ২৬শে জানুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প পাঠ করে বিদ্রোহের ধ্বজা উঠেছে। ওই তেরঙ্গা ভারতের জাতীয় পতাকা।

তার মধ্যে রাত্রে একটি নবজাতকের কান্না দিয়ে শুরু করো নেপথ্য সঙ্গীতের মধ্যে।

এক এক সময় মনে হয় বিদ্রোহের ওই ঝড় বেজেছিল বুঝি নবজাতা কন্যাটির রক্তস্রোতের ধ্বনির সঙ্গে। ওই কালই বোধ হয় তার এই প্রকৃতির জন্যে দায়ী।

* * *

না।

তা নয়। কাল স্থান মানুষের প্রকৃতিকে কিছু দেয় না। না। নইলে ওই সালে ওই সময়ে অনেক মানুষই তো জন্মেছে। তারা তো নীরার মত নয়। তার শৈশবে দেখা কত ছেলে কত মেয়ে—! এই তো তার জাঠতুতো বোন হেনা—তার জন্ম একই বাড়ীতে, তার জন্মদিন থেকে অনেকগুণে বেশী ঝড়ো রাত্রে। যে রাত্রে চট্টগ্রামে আর্মারি রেইড হয়—সেই উত্তপ্ততম রাত্রে। কিন্তু কই? সে তো নীরার মত নয়।

সংসারে একটা সাধারণ মেয়েও সে নয়। একটা পচা, হ্যাঁ, পচা মেয়ে হেনা। নীরার উপরে তার নিজের জীবনের পঙ্ক-কলঙ্ক—। না, তার জন্য সে তাকে দোষ দেবে না। তার সে পঙ্ক-কলঙ্ক নীরা নিজেই নিজের সর্বশরীর দিয়ে মুছে নিয়ে মেখেছিল।

পুষি বেড়ালের মত একটি মেয়ে হেনা। একতাল কাদায় গড়া তলতলে নরম জান্তব সুখের থসথসে প্রতীক তাকিয়া বা ওই ধরনের কিছুর মত একটা মেয়ে। তার থেকে মাসখানেক মাস দেড়েকের ছোট। ম্যাট্রিক ফেল; বিয়ে ক'রে দিব্যি শ্বশুরবাড়ী গিয়েছে। মেলা পান খায়, দোক্তা খায়। ভোরবেলা থেকে বেশবিন্যাস করে। শ্বশুর মার্চেণ্ট অফিসের বড়বাবু—ছেলেও সেখানে চাকরি করে; হয়তো এরই মধ্যে ছোটবাবু থেকে সেজবাবু কি ফুলবাবুত্বে প্রমোশন পেয়েছে। অনেক টাকা। যুদ্ধের বাজারে ঘুষের টাকা। ব্ল্যাক-ম্যার্কেটের টাকা। পাঁচ-সাতটা ঝি চাকর ঠাকুর। তাদের উপর তম্বি করে। গুনগুন ক'রে সিনেমার গান গায়। অনেক সিনেমা দেখে। আর স্বামীর কাপড় শুঁকে দেখে, খুঁজে দেখে কোন লম্বা চুল কোথাও লেপটে লেগে আছে কিনা। স্বামী চরিত্রহীন। তাতে তার কৌতুকই আছে, ক্ষোভ নেই। সেই কৌতুকবশেই ওই সন্ধান সে করে। নইলে স্বামীর পকেটভরা টাকাতেই সে খুশী।

জন্মকালের প্রভাব যদি জাতকের জীবনে থাকে বা পড়ে তবে চট্টগ্রাম আর্মারী রেইডের রাত্রে যার জন্ম সে নিশ্চয় ওই পাষণ্ড স্বামীকে ত্যাগ করে কবে আদালতে গিয়ে দাঁড়াত—বলত—আমি মুক্তি চাই। অথবা গডিয়ান নট কাটার মত নিজের হাতে সে বন্ধন ছিঁড়ে বা কেটে এসে দাঁড়াত পথের উপর। ফেটে যেত।—

না।

মনের আবেগে কোথা থেকে কোথায় এসেছে। তার জীবননাট্যের আরম্ভেই এসে পড়েছে হেনার কথায়।

হেনার আসল নাম হানাহানি। সে ওই চট্টগ্রাম আর্মারি রেডের রাত্রে জন্মের জন্যে। হানাহানি থেকে হেনা।

জন্মের সময় কিছু নয়।

বাপ-মায়ের প্রকৃতি সন্তানের পক্ষে সত্য এটা সে বিজ্ঞানে পড়েছে। কিন্তু তার বাপ-

মায়ের প্রকৃতিতে কি ছিল তেমন কিছু ?

শোনে নি তেমন কিছু। বরং উল্টোই শুনেছে। বাপ-মা সম্পর্কে তার নিজের স্মৃতি তো খুব ক্ষীণ। বাপ মারা গেছেন পাঁচ বছর বয়সে, মা মারা গেছেন আট বছরে। দুটি দশটি ছবি ছাড়া কিছু মনে পড়ে না তার। তাদের কথা শুনেছে সে জেঠাইমা—ওই হেনার মা'র কাছে।

তার আগে এলোমেলো ভাবনায় মনে পড়া কথাগুলো সরিয়ে দিয়ে সাজিয়ে নাও।—দমদমের পাশে ওই গ্রামটিতে একতলা একখানি বাড়ি। মাঝখানে উঠোন রেখে চারদিকে ছখানা ঘর। ঘরের কোলে উঠানের সামনে সামনে বরাবর টানা বারান্দা। চৌকো থাম ছিল বারোটা। খিলেন দিয়ে ছাদ ধরা ছিল না। ছিল কাঠের কড়ি। তাতে ছিল সে আমলের কাঠের ঝিলমিলি। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, ইট বের-করা রাস্তার সামনে পুবমুখো বাড়িটা। দুপাশে দুখানা ঘর—মাঝখানে চার ফুট চওড়া ফুট দশেক লম্বা রাস্তা। ঘর পার হয়ে উঠোন। উত্তরে একখানা ঘর। দক্ষিণেও একখানা। পশ্চিমে খুপরি খুপরি দুটো রান্নাঘর—দুটো বাথরুম একটা ছাদে ওঠার সিঁড়ি।

দরকার হয় কাগজে ছকে নাও। তারপর পট আঁকো। ইচ্ছে হলে বক্স সিন করতে পার। না হয় মনে মনে তৈরী করে নাও। স্পষ্ট দেখতে পাবে বাস্তব সংসার-রঙ্গমঞ্চের আসল বাড়িটি। ধরণী মুখুজ্জের দুই ছেলে। হারাণ মুখুজ্জে আর পরাণ মুখুজ্জে। চাকুরিজীবী। কিছু ধানী জমি একটা বাগান, এই ছিল সম্পত্তি। নিরীহ শান্ত চাকুরিজীবী দুটি ভাই দুই বউ। বড় বউয়ের অর্থাৎ জেঠাইমার দুটি ছেলের পর একটি মেয়ে হয়েছে হেনা। আর তার মায়ের কোলে সে। দুই ভাই পৃথক হয়েছে কিন্তু উঠানে পাঁচিল পড়ে নি।

১৯৩০ সালে দেশব্যাপী বিদ্রোহের মধ্যে চাকুরি নিয়ে ভয়ে দুই ভাই মহা বিব্রত।

তার মনে নেই। মাস কয়েকের শিশু সে তখন। শুনেছে জেঠাইমার কাছে। বিচিত্র জেঠাইমা! এ সংসারে দুই আর দুইয়ে জেঠাইমার জীবনে চার কোথাও হয় নি। কোথাও হয়েছে তিন কোথাও পাঁচ কোথাও আট। সে তখন মা-বাবা হারিয়ে জেঠাইমাদের সংসারে থাকে, পোষ্য নয় কিন্তু তাঁরা ছাড়াও কেউ নেই অথচ সে সে-সংসারে একঘরে।

পচা আবদেরে মেয়ে ওই হেনার জন্যেই একঘরে। বয়স তখন বারো। হেনা কান্না ধরত, কোন কারণে কাঁদতে শুরু করলে থামত না। তখন জেঠাইমা অর্ধেক তিরস্কার অর্ধেক সমাদর মিশিয়ে বলতেন, কেমন রাত্রে কেমন লগ্নে জন্ম দেখতে হবে তো! ঠিক নাম দেওয়া হয়েছিল। হানাহানি! তাই থেকে বাপ করলেন হেনা। হেনা বললেই কি হেনা হয়, না হেনার খুসবই ওঠে! দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে শিবের প্রেতেরা এসেছিল বিষফুল কানে গুঁজে, তার গন্ধে হতচেতন। সেই গন্ধ উঠেছে। মাগো!

এই থেকেই শুরু হ'ত। ওই কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন গৌরব এবং সমাদর আছে তা বার বার শুনে শুনে মুখস্থ পড়ার মত এমন সহজবোধ্য হয়েছিল যে হেনার খুশী হ'তে বিলম্ব হ'ত না। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই জেঠাইমা আরম্ভ করতেন সেকালের গল্প। হেনাই ধরিয়ে দিত। বলত, সে বুঝি ভয়ঙ্কর মারামারি হানাহানির ব্যাপার হয়েছিল মা? বল না?

মা বলতেন, ওরে মা! তোর জন্মের কদিন পর খবর পাওয়া গেল। নইলে চট্টগ্রাম তো স্বদেশীর দল কেড়ে নিয়েছিল! সে ভীষণ কাণ্ড! রক্ত হিম। এখানে মারপিট। দেশসুদ্ধ হৈ-চৈ। ছেলের দল চীৎকার করে। পিকেটিং করে। নুন তৈরী করে। দলে দলে জেলে যায়। বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম! কানপাতা যায় না। এখানে গুলি ওখানে লাঠি সেখানে বোমা। আজ বেতাল কাল হরতাল। তোর বাপ আপিং খায় অনেক কাল থেকে—আপিং পাওয়া যায় না। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে উঠে তেড়ে সায়েবকে খুন করলে। নিজেরা বিষ খেলে। গুলি খেলে। সাহেবরা ভয়ে ঝুড়ি মাথায় দিয়ে টেবিলেরই তলায় ঢোকে। মেয়েরা রাস্তায় বেরিয়ে ঝাণ্ডা ঘোরায়, জেলে যায়। পুলিসে মাথা ফাটায়। আমরা দুই জা মিলে চুপচাপ ঘরে বসে থাকি। সন্ধ্যে হলে বুক-ঢিপঢিপ বাড়ে, মানুষ দুটি কখন ফিরবে! আমি ডাকি, ও ছোট বউ, রাত যে বেশ হল! ও বলে, তাই তো ভাবছি দিদি! তোর বাপের রেলের হেড আপিসে কাজ, নীরার বাপের রাইটার্স বিল্ডিংএ। তা হলে কি হবে, গায়ে তো লেখা থাকে না; ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেলে তখন কে কাকে চেনে! পুলিস লাঠি চালিয়ে দিলেই তো হল। সে বড় দুর্ভাবনার সময় গেছে।

বলতে বলতে হেসে উঠতেন; ওই হাসির সঙ্গেই দেশের কথায় মিশে যেত ঘরের কথা। হেসে নিয়ে বলতেন, দুঃখের মধ্যে হাসি মা; তোর বাপের মাছের লোভ তো দেখেছিস! তোর খুড়োরও কম ছিল না। সেদিন শুনেছেন শেয়ালদায় খুব গোলমাল, লাঠিচার্জ হয়েছে, ট্রাম বন্ধ। তো দুই ভাই ঠিক করেছে—দুজনে আপিস থেকে ওই সময়টায় বেরিয়ে একসঙ্গেই হয়ে রোজ আসতেন—; ঠিক করেছে, শ্যামবাজারে এসে, ছোট লাইনে কিছুদুর এসে, হেঁটে আসবেন। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে শুনেছেন, বাগবাজারের ঘাটে ইলিশ একেবারে অঢেল, খুব সস্তা, টাকায় এই বড় ইলিশটা দেড়সের, দুসের। দুই ভাই আর লোভ সামলাতে পারে নি, গেছে, মাছও কিনেছে। এ একটা ও একটা ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরছে, আর ওদিক থেকে হল্লা। লোক ছুটছে, পালাও পুলিস! এদিক থেকে চিৎপুর ধরে, ওদিক থেকে বাগবাজার ধরে বাস—দুই ভাই মাছ হাতে নিয়ে দৌড়। একেবারে খালের দিকে। হাতে মাছ, বগলে ছাতা, অন্য হাতে খাবারের কৌটো, আরও কি-কি, বোধ হয় দুজনে দুটো ফুড কিনেছিল। দুজনেই একটু থলথলে মানুষ; শেষে ছাতা ফেলে, ফুড ফেলে, কৌটো ফেলে দৌড়। দুই ভাই হেঁটে বাড়ি ফিরল ট্রাঙ্ক রোড ধরে, রাত্রি তখন দশটা। আমরা তো দুজনে মরে ভূত হয়ে গেছি। এদিকে তোরা দুটোতে খিদেয় চ্যাচাচ্ছিস। আর ধড়াধ্বড় পিটছি। মর মর! তোদের ফুড কিনতে গিয়েই মানুষ দুটো গেল! শেষে ঝগড়া বেধে গেল। আমি একটু বেশী মেরেছিলুম তোকে। ককিয়ে গেছিস;

ছোট বউ বললে, তুমি কি ক্ষেপলে দিদি ? এমনি করে মারে ? আমি বললুম, বেশ করেছি। নিজের মেয়ে মেরেছি, তোমার কি ?' সে বললে, খুব করে মার। মেরে ফেল। পুলিস ধরবে আমায় সাক্ষী দিতে হবে, তাই বলছি। আমিও অমনি জ্বলে গেলুম তেলে-বেগুনে, বললুম, দিস না দিস! দেবে তো ফাঁসি, আর করবে কি ? সে বললে সেটা যদি এতই তুচ্ছ হয়, তবে ওকে না মেরে নিজেই এখুনি গলায় দড়ি দাও না! আমি বললুম, কি বললি ? ব্যস, লেগে গেল তুমুল ঝগড়া। ঠিক এই সময়ে দুই ভাই এলেন, গায়ের জামায় কাদা, কাপড় ছিঁড়েছে তোর বাপের, জুতোয় বেধে পড়ে গেছেন; হাঁটু ছড়েছে। তোর খুড়োর জুতো গেছে ছিঁড়ে, সে দুটো হাতে নিয়ে ঘর ফিরলেন। কিন্তু মাছ ছাড়েন নি। দুজনের হাতে দুই মাছ।

জেঠাইমা যত হাসতেন হেনা তত হাসত। সেও হাসত। কিন্তু হেনার মত নয়। এমন করে হেসে গড়িয়ে পড়তে সে পারতও না, অধিকারও ছিল না;—এমন গড়িরে পড়ে হাসলে, নিশ্চয়ই জেঠাইমা হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলতেন, ও কি হাসি, নীরা ? ওই হেনাও তো হাসছে। তোমার যে বেহায়ার মত হাসি! অবশ্য সবটাই ওই নয়, নিশ্চয় তার প্রকৃতিতে কিছু ছিল, কিছু আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন প্রকৃতিকে আপনার ছাঁচের মধ্যে পুরে তৈরী করতে চায়, ঠিক তেমনি ভাবেই প্রকৃতিও তার শক্তি অনুযায়ী ঠেলে উত্তাপে গলিয়ে ছাঁচকে বদলে অন্য রকম করে দেয়।

থাক সে কথা।

এ থেকেই কল্পনা করে নাও,—সে নিজে বেশ চোখে দেখার মতই স্পষ্ট দেখতে পায়—শান্ত পরিবার দুটিতে একটি তৃপ্তির সুখ ছিল। বিদ্রোহ বিপ্লব এ সব কিছু ছিল না। সেই উনিশশো তিরিশ সালেও ছিল না। বাবা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ফিনান্সের কেরানী ছিলেন; সেখানে হিসেব কষতেন সারাদিন—ফাইল সারতেন, উপরিওয়ালার সই করাতেন, ডিবে থেকে মধ্যে মধ্যে পান বের করে খেতেন, তার সঙ্গে বিড়ি ধরিয়ে আরাম করতেন; দেশের স্বাধীনতা কামনা আদৌ ছিল কি না সে বলতে পারে না, কারণ জেঠাইমা বলেন, দুই ভাইই যেদিন কষ্ট পেয়ে বাড়ি ফিরতেন, সেদিন ঘরে বসে নেতাদের কটু কথা বলতেন। স্বাধীনতা-কামনা থাকলেও নিতান্ত সভয়ে মনের চোরকুঠরীর এক অন্ধকার কোণে নিষ্ঠুর পাওনাদারের ভয়ে, দেনদারের মত ভীরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে লুকিয়ে থাকত।

যেদিন কষ্ট পেতেন না, সেদিন সকৌতুকে দুই পক্ষেরই ভীরু কর্মের গল্প করে উপভোগ করতেন:—বুঝেছ না, পুলিস তাড়া মেরেচে, আর সব চোঁ-চা দৌড়। সে কি দৌড়! একজনের কাছা খুলে গেছে তো তাই নিয়েই দৌড়ুচ্ছে। বাপ রে বাপ রে! আবার বলতেন, সায়েববেটার ঘরে ঢুকেছি, একটু বেশী শব্দ হয়েছে দরজায়, বাস, বেটা চমকে দাঁড়িয়ে উঠে বলতে শুরু করেছে, হু আর ইউ! আর্দালী, আর্দালী! সে কাঁপছে প্রায়। আমি বললাম, এক্সকিউজ মি সার! ক্যারিয়িং শো মেনি ফাইলস, আই হ্যাড টু পুস দি ডোর উইথ মাই হেড। তার পর হয়তো বলতেন, ওদের আর হয়ে এসেছে। খট শব্দ শুনে যারা চমকে উঠে, প্রাণপক্ষী খাঁচার গায়ে ঝটপটিয়ে মাথা ঠোকে, তাদের পালা খতম।

হয়তো এর পর তাকে নিয়ে আদর করতেন—নীরা হীরা জিরা ধীরা মীরা টিরা—। এমনি অর্থহীন শব্দের সমাবেশ। কিন্তু তার মধ্যে ছিল পরমাশ্চর্য মধু। হয়তো বলতেন—যা অর্থহীন নয়—নীরা হীরা মণি মানিক! নীরাকে আমি ইস্কুলে পড়াব, গান শেখাব—মা বলতেন, নাচও শিখিয়ো বাপু। আজকাল আবার ভাল করে নাচ জানার রেওয়াজ হয়েছে।

বাপ বলতেন, নিশ্চয় শেখাব। কুড়ি বছরের আগে তো বিয়ে হচ্ছে না। ইনসিওরটা কুড়ি বছরে ম্যাচিওর করবে।

মা বলতেন, তিন হাজারে ভাল ঘরে বিয়ে হবে ভাবছ?

—না হলে করব কি! আরও তো ছেলেমেয়ে হবে। তাদেরও তো দায় আছে।

—তবে তোমার মাইনে বাড়বে।

—তা বাড়বে। প্রমোশন হবে। জান এবার সায়েব সার্ভিস বুকে খুব ভাল নোট দিয়েছে।

—তোমরা দুই ভাই নাকি জমি বেচছ?

—হ্যাঁ, ভাল দর পাচ্ছি। নার্সারিওয়ালারা নেবে।

—টাকাটা যেন খরচ করে দিয়ো না।

—বাড়িটা মেরামত করাব। আর বাকীটা ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনব।

—একটা কথা বলব!

—বল না, এত সঙ্কোচ কেন?

—নীরাকে একটা প্যারাম্বুলেটর কিনে দেবে?

—তা না হয় দিলাম। ঠেলবে কে?

—একটা ঝি রাখব। হেনার জন্যে একটা কিনেছেন বঠ্‌ঠাকুর, ও যা করে চড়বার জন্যে!

—দাদার মাইনে কত জান? আমার ডবল! আমার পঁচাশী টাকা, দাদার একশো ষাট টাকা।

—তা হোক। সে বাচ্চারা বোঝে না।

—বাচ্চার মা-রাও বোঝে না!

—বেশ বাপু দেবে না, দিয়ো না। এত কথা কেন? বাচ্চার মা নিজের জন্যে কোন দিন কিছু বলে? ওই তো দিদির গলার হার ভেঙে হার হল, আমি বলেছি তোমাকে আমারটাও হোক! দুই ভাই-এর বিয়েতে তো টাকা একই নিয়েছ। বাবাকে বাজারদর দেখানো হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল—ছেলে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢুকেছে। বড় ছেলে রেলের চাকরে, পেনসন নেই। এর পেনসন আছে।

—বাপ রে বাপ! বাচ্চার মা কথা বলে না ব'লে কম কথা বললে না!

—যাক্‌ আর বলব না। তবে কাল ওর দুটো জামা না-হলেই হবে না। ঝিটার সঙ্গে আমি কথা বলেছি, সে আর এক টাকা বেশী দিলে বিকেলবেলা বেড়িয়ে আনবে; সে আমি

ওই রদ্দি জামা পরিয়ে পাঠাব না।

পরের দিনই তার বাপ শুধু ভাল ফ্রকই আনেন নি, একটা সস্তা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ঠেলাগাড়িও এনেছিলেন। একটা ব্ল্যাক জাপানও এনেছিলেন। নিজেই রঙ দিয়ে পুরনো গাড়িটার উপর নতুনের খোলস চড়াতে চেয়েছিলেন।

এর পর নাকি তার মায়ের দুটি ছেলে হয়ে মারা গিয়েছিল। তাতে মা তার পিঠের দোষ বলে তার উপর বিরূপ হয়েছিল। কিন্তু বাবা আরও গাঢ়তরভাবে ভালবেসেছিলেন।

ছেলেবয়সে তার দুঃখ খুব ছিল না। সুতরাং বিদ্রোহের কারণ ঘটে নি। সে ছিল বোধ হয় প্রকৃতিতে। জাগিয়ে দিল তাকে সংঘাত।

* * *

এ পর্যন্ত তো নাটকের পূর্বকথা। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসরণ করলে এটুকুও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে সূত্রধার এই পূর্বকথা বর্ণনা করে এইখানে—'অলমতিবিস্তরেণ' বলে প্রস্থান করতে পারে অথবা অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের প্রস্তাবনার শেষ কথায় কৌশলে হরিণ এবং রাজা দুষ্মন্তের মত উল্লেখ করতে পারে—

সংঘাতের চরম সংঘাত এবং অনিবার্য সংঘাত কি ? সে ওই—।

তারপরই আরম্ভ হোক নাটক। সূত্রধার প্রস্থান করুক। সূক্ষ্ম যবনিকাটি তুলে দাও। একটি খাটিয়ার উপর শবদেহ সাজানো থাকে। একখানা চাদর ঢাকা থাক। ইচ্ছে হলে কয়েকটা ফুল ছড়িয়ে দিয়ো। তার কিছু দূরে বিস্ফারিত আয়ত-নেত্রা একটি পাঁচ বছরের কালো মেয়েকে দাঁড় করাও।

অনিবার্য নিষ্ঠুরতম সংঘাতে তার ঘুমন্ত বিদ্রোহ জাগছে। নিষ্ঠুরতম আঘাত দিয়ে মৃত্যু কেড়ে নিল তার বাপকেই।

বাবা মারা গেলেন। ঠিক মনে নেই। শুধু দুটুকরো ছবি মনে আছে। সন-তারিখ-স্থানহীন একটি সূর্যাস্তের মত। লাল সূর্য কেঁপে-কেঁপে ঘোরে সেই ছবিটুকুর মত। মনে আছে শবযাত্রার দুটুকরো ছবি। এক টুকরো—একটা খাটিয়া তার উপর একটি মানুষ শোয়ানো। বাবার ফটো আছে। কিন্তু সে মানুষটির মুখ ওই ফটোর মুখের মত কিনা বলতে পারবে না নীরা। কারণ খাটিয়ায় যে শুয়েছিল তার মুখ মনে নেই। একখানা সাদা কাপড় ঢাকা। তার উপর কতকগুলো ফুল ছড়ানো ছিল। আর একটা, কতকগুলি লোক এসে তার উপর দড়ির বাঁধন দিয়ে কাঁধে তুলছে। ভয়ে রাগে কষ্টে নীরা চীৎকার করে উঠেছিল—না—!

সে মনে থাকা এমন যে কদাচিৎ কালেকস্মিনে তা প্রত্যক্ষভাবে মনে পড়ে। বাবার কথা উঠলে ছবি দুটুকরো মনে পড়ে বটে, কিন্তু মনে পড়ার সঙ্গে সেদিনের অনুভব-করা বেদনা বা ক্ষোভ বা কষ্ট মনকে স্পর্শ করে না। কিন্তু কোন শবযাত্রার সঙ্গে কান্নায় আকুল কোন শিশুকে দেখলে ওই ছবি দু'টুকরোর সঙ্গে সেদিনের সেই কাঁটাটা খচ করে কোন অন্তরের অন্তরে বেজে ওঠে। মনে হয় সৃষ্টিতে কি অনাচার অবিচার! কোন পিতৃহীন ম্লানমুখ শিশুকে দেখেও মনে হয়; তার স্বাভাবিক চেতনা অবচেতনে শৈশবে সঞ্চিত ওই

আশ্চর্য ক্ষতবিন্দুর বেদনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে।

থাক।

শব-বাঁধা খাটিয়াটার দিকে তাকিয়ে নীরা চীৎকার করে উঠল—না!

পরের মুহূর্তেই 'বল হরি হরি বোল' দিয়ে খাটিয়া উঠল।

প্রথম সংলাপ হবে—একজন প্রতিবেশী বলছে জ্যাঠামশাইকে—রেখে-টেকে কিছু গেছে পরাণ? না সব খরচ করেই গেছে? জ্যাঠামশায় বলবেন, ঠিক জানিনে; জমি বেচা টাকার কত কি রেখেছে, তবে ইনসিওরেন্স পলিসি তো একটা আছে। এই তো কিছুদিন আগে প্রিমিয়াম দিয়ে এল।

—কত টাকার?

এ কথাগুলি নীরার কাল্পনিক। কিন্তু পরবর্তী যে নাটকীয় ঘটনায় তার জীবনে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল—যা তার মনে আছে, তাই মনে রেখেই কথাগুলি নীরা বসিয়ে দিচ্ছে।

তার জীবন-নাটকের রচয়িতা যখন রচনায় বসেছিলেন এবং বসেন. তখন তিনি একটি নিষ্ঠুর এবং কৌতুকপ্রবণ মন নিয়ে বসেন।

বাপের মৃত্যুতে তার সুখ বাড়িয়ে দিলেন তিনি। মায়ের হাতে টাকা এল। জমি বিক্রি করা যে টাকাটা অবশিষ্ট ছিল শুধু সেটাই নয় লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকাও পেলেন তিনি। সবসুদ্ধ বোধ হয় হাজার ছয়েক। ১৯৩৫ সালে এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেবে দেখ, সে বাজারে এ টাকাটা নেহাত কম ছিল না। কলকাতা কর্পোরেশনের এলাকার ভিতরে পাঁচ হাজার টাকায় তখন আড়াই কাঠা জমির উপর দোতলা বাড়ি হয়েছে।

বাপের মৃত্যুতে সুখ যিনি বাড়ালেন তিনি নিষ্ঠুর কৌতুকপ্রিয় নাট্যকার।

ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট করে দিতে তিনি জেঠাইমাকে দিয়ে মাকে বলালেন—ছোট ওঠ, মেয়েটাকে বুকে করে নে।

মা নাট্যকারের ইঙ্গিতে ঘাড় নেড়েছিলেন—না-না।

জেঠাইমা বলেছিলেন—না নয়। নে তুই ওকে। বড় হতচ্ছেদ্দা করেছিস এত দিন। ওর পর তোর দুটো ছেলে হয়ে যাওয়ার পর থেকে তুই ওকেই দায়ী করে বলতিস 'রাক্ষসী'। ঠাকুরপো ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলত, আঃ, কি বল, বাচ্চা মেয়ে! ওকে বলছ রাক্ষসী? কিন্তু তোমার আমার ভাগ্যকে দায়ী করছ না কেন? আজ সে নেই, তোরও তো এই গুঁড়ো সম্বল। নে বুকে করে নে!

মা দু'হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

সংসার রঙ্গমঞ্চের নাটক। খেলার নাটমঞ্চের নাটক নয়। এ নাটকের একটা দৃশ্যের অভিনয় চলে মাসের পর মাস ধরে, হয়তো বছরের পর বছর ধরে।

নীরার জীবন-নাটকের এ দৃশ্য চলেছে তিন বছর ধরে। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে আরম্ভ—মায়ের মৃত্যুতে এ দৃশ্যের শেষ। তার সুপ্ত প্রকৃতির উপর মৃত্যুর আঘাতের পর আঘাত। যার ফলে সে সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধ করতে উঠে দাঁড়াল।

দুঃখের প্রারম্ভেই বাপের মৃত্যুতে আশ্চর্য নাটকীয় ভাবে ঘটল বিপরীত ফল। তার সমাদর বাড়ল।

মা সমাদর মুখেই করলেন না। সাজাতে লাগলেন। টাকা পেয়েছিলেন হাজার ছয়েক —তার উপর বাকী জমিটুকু যা ছিল তিনি বিক্রি করলেন।

বললেন—কে দেখবে? যদি কেউ জোর ক'রে দখলই ক'রে নেয়, কে মামলা করবে? ফসলের ভাগ তাই বা কে দেখে নিতে আছে?

জ্যাঠামশাই বলেছিলেন—আমাকে অবিশ্বাস করছ?

মা বলেছিলেন—আপনি গুরুজন, আমার বড় ছোট মন। আপনার ক্ষতি হবে না, সন্দেহ করে আমার পাপ হবে। তার থেকে ও না-থাকাই ভাল।

—বেশ। আমাদের পৈতৃক জমি, আমিই নেব।

—নেবেন। তবে পাড়ায় একবার দামটা যাচাই ক'রে দেখি।

—যাচাই ক'রে দেখবে! ভাল, কে তোমার ও জমি নেয় আমি দেখি!

মা দমেন নি, কুণ্ডুবাবুর কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামীর হিতৈষী।

কুণ্ডুবাবুই জমিটা নিয়েছিলেন—বাজারদর থেকে বেশী দর দিয়ে। তাতেও হাজার কয়েক টাকা পেয়েছিলেন। ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনেছিলেন।

তারপর নীরাকে সাজিয়ে ডবল বেণী বেঁধে দিয়ে গাড়ি ভাড়া করে গেলেন দমদম ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলে। মিশনারীদের স্কুল। মাইনে বেশী। তার উপর ঘোড়ায় টানা গাড়ি আছে, গাড়ি এসে নিয়ে যায় আবার পৌঁছে দেয়। টিফিনের বাক্স কিনে দিলেন।

যেদিন প্রথম গাড়ি এসে দাঁড়াল সেদিন হেনা ছুটে এল—মা মিশনারী স্কুলের গাড়ি এসেছে!

জেঠাইমা বলেছিলেন—তা কি নাচব নাকি!

ঠিক এই সময়েই নতুন জামা জুতো প'রে মাথায় রিবন বেঁধে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নীরা ওদের ঘর থেকে বের হয়েছিল।

জেঠাইমা গালে হাত দিয়ে সবিস্ময়ে বলেছিলেন—ও মা! তুই যাবি? গাড়ি তোর জন্যে? নীরা হাসতে হাসতে ছুটেছিল গাড়ির দিকে, উত্তরই দেয় নি। মা উত্তর দিয়েছিলেন—ওকে ওই মিশন ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছি। পড়ুক।

হেনা সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করেছিল।—আমি যাব। আমি যাব। আমি ও ইস্কুলে যাব না।

জেঠাইমা এসে ঘাকতক বসিয়ে দিয়েছিলেন মেয়ের পিঠে। চুপ চুপ। চুপ বলছি।

—না—না—না। চিৎকার কিছুতে থামে নি হেনার।

হঠাৎ জেঠাইমা মাকে বলেছিলেন, হেনার ওপর টেক্কা দিতেই মেয়ে ওখানে ভর্তি করেছ, না?

অবাক হয়ে মা বলেছিলেন—তোমরা হেনাকে নতুন প্যারাম্বুলেটর কিনে দিলে তো আমি ঐ কথা বলি নি দিদি!

হেনা পাগলের মত হাত পা ছুঁড়ছিল আর চেঁচাচ্ছিল। এবার জেঠাইমা আবার এসে তাকে প্রহার করে বলেছিলেন—তোর তো আর বাপ মরে নি যে তুই মেমসাহেব বনবি! আর মরলেই বা কি? ভাই যে তোর এক গণ্ডা। তোর আগে দুটো পরে দুটো!

* * *

আশ্চর্য! বাপকে মনে নেই, মায়ের মুখও ঝাপসা হয়ে গেছে, কিন্তু এই কথাগুলো তার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। সে গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে শুনেছিল দেখেছিল। আজও কথাটা তার মনে রয়েছে। তাই জীবনে অনাথ আশ্রমে এসে ছেলেদের কখনও কটু কথা বলে নি। বলে না সে কাউকেই। মধ্যে মধ্যে এখানে তার সহকর্মিণীরা কতদিন কঠোর হতে বলেছে, বলেছে শাসন কর একটু, আমরা শাসন করি আর তুমি ওদের এমন নাই দাও যে সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়।

সে তাতে হেসেছে। বলেছে, দিদি, খাদ্যের মধ্যে সেরা মিষ্টি নুন, আর দুনিয়ার সেরা মিষ্টি মধু নয় মিষ্টি কথা। কটু কথা বলতে নেই, ও আমি পারি নে। বেশ তো শাসন তোমরা করো, ওটার ভার তোমাদের।

আজ সে কি করে এমন নির্মমভাবে কথাগুলো বলেছে বলতে পারে না। না, পারে। মানুষের শুধু প্রাণই সব নয়, তার মান আছে। প্রাণের চেয়ে মান বড়। দুনিয়ার যে-সব ক্ষমতামত্ত প্রতিষ্ঠাবানেরা মানুষের অসম্মান করে, তাদের ক্ষমা সে করতে পারে না। না, পারে না। ক্ষমা করতে না-পারার জন্যেই সে আজ এই নীরা হয়েছে। নইলে—

থাক, আবার ঘুরে সেই আজকের কথায় এসেছে।

নাটকের দৃশ্যে পরম্পরা ভঙ্গ হচ্ছে। স্মৃতির প্রম্‌টার স্মারক বলছে, ভুল বলছে। ও সব পরের পার্ট। বল, শোন, শুনে বল—।

এ ঘটনা একদিন ঘটেই ক্ষান্ত হয় নি। প্রায়ই ঘটত। জেঠাইমা জ্যাঠামশাইকে বলেছিলেন—হেনাকে ওই স্কুলে দেবার জন্য। জ্যাঠামশাই তা দেন নি। কিন্তু হেনা জেদ ছাড়ে নি। সে প্রায়ই কাঁদত। নিজের ইস্কুল যাবে না বলে গোঁ ধরত, জেঠাইমা পিটতেন। জেঠাইমা ওই কথাটাই বলতেন—আগে তোর বাপ মরুক—!

মা চুপ করেই থাকতেন। বোধ হয় মনে মনে হাসতেন। কিন্তু এক এক দিন ধৈর্য হারাতেন।

সেদিন জেঠাইমার কথা শুনে মা বলতেন, কি বলছ দিদি? ছি!

জেঠাইমা জ্বলে উঠে বলতেন, ছি কিসের? ছি! সত্যি বলছি। আর বলছি আমার মেয়েকে।

মা বলতেন, না, বলা হচ্ছে আমার মেয়েকে।

—না-না-না। বলি নি। তুমি বললেই হল? গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চাও! জেঠী তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠতেন।

মা দৃঢ়স্বরে বলতেন, ভাল, বঠ্‌ঠাকুর আসুন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি বলেন শুনি!

না-হয় প্রতিবেশীদের বলব। তাতে প্রতিকার না হয়, সব বেচেছি, বাড়ি বেচেও উঠে যাব।

মা জানতেন ওটি ব্রহ্মাস্ত্র। কারণ প্রতিবেশী কুণ্ডুরা তখন ও অঞ্চলে রাহুর গ্রাস এবং শক্তি নিয়ে উঠেছেন। যত হাঁ—তত হজমশক্তি। জ্যাঠামশাই ওখানে টুক্‌টাক করে রেলের আপিসের পয়সায় একটি উপরাহু কিংবা বাঘের পিছনে ফেউ থেকে অধিক—নেকড়ে হয়ে উঠেছেন। মায়ের কাছে অবশিষ্ট ধানী জমি জ্যাঠামশায়ের মুখ থেকে তিনিই কেড়ে নিয়েছেন। মায়ের তাতে বলবার কিছু নেই। তিনিও ইচ্ছে করেই দিয়েছিলেন এবং কুণ্ডুবাবু ন্যায্য দাম দিয়েছিলেন। পরাণবাবুর সঙ্গে একটু সদ্ভাবও ছিল। বাড়িটির উপরও তাঁর খুব নজর। ওটি পেলে তাঁর বাড়ির কম্পাউণ্ড প্রায় চৌকোশ হয়—অর্থাৎ বাদ থাকে শুধু জ্যাঠামশায়ের বাড়ি। কুণ্ডুবাবু মাকে বলেও রেখেছেন—বউমা, এটা বিশ্বাস করো তুমি, ইচ্ছে ক'রে বাড়ি না বেচলে আমি চাইব না; কিন্তু কোন কারণে যদি বিক্রি কর মা, তবে আমাকে দিয়ো। সুতরাং বাড়ি বেচে চলে যাব বললেই চমকে উঠতেন ওঁরা। ভয় পেতেন।

চুপ করে যেতেন জেঠাইমা। জ্যাঠামশায় এসে বলতেন, তুমি বাড়ি বেচবে কেন বউমা! আমরাই বরং যাব। তুমি বেচলে আমাদের দেবে না, আমি কিন্তু তোমাদেরই দিতে চাই। নিয়ে নাও।

মা তাতে ভয় পেতেন না। কারণ তিনি জানতেন যে জ্যাঠামশাই কখনও বেচতে পারবেন না। ছলনা যখন নকল নাটুকে হয়, তখন তাতে কেউ ভয় পায় না। এমন কি বিপরীত পক্ষ যে ভয় পাওয়ার অভিনয় করে সেও না। দর্শকও না। জ্যাঠামশায়ের ছলনা একেবারে থিয়েটারী ছলনা হত। মা বলতেন, সে আপনার ইচ্ছে। ইচ্ছে হলে আপনি বেচে দিয়ে সুখের জন্য তো কলকাতায় যেতে পারেন। আমার তা নয়। আমার মেয়েকে আমি ভাল করে মানুষ করব, পড়াব, যাতে ভাল পাত্রে পড়ে বা বিয়ে না হলে মাস্টারী-টাস্টারী করেও খেতে পারে। আর বুদ্ধি ওর ভাল। ক্লাসে ফার্স্ট হচ্ছে। ওকে এমন করে বলা আমার সহ্য হবে না। আমার তো মায়ের প্রাণ।

জেঠাইমা আর থাকতে পারতেন না—ফোঁস করে উঠতেন এবার, আর আমার রাক্ষসীর প্রাণ, না!

জ্যাঠামশায় এবার ধমক দিতেন, কি হচ্ছে কি? কি বলছ এসব?

মা বলতেন, ওই শুনুন না।

জ্যাঠামশায় বলতেন, তুমি বড়। তোমাকে সহ্য করতে হবে।

নীরা কৌতুক অনুভব করত। ছবিগুলো ফটোগ্রাফ নয়, পাকা রঙে তুলিতে আঁকা ছবির মত আঁকা হয়ে গেছে। হয়তো বা ফটোগ্রাফের সঙ্গে আঁকা ছবির যেটা তফাত, কালোর জায়গাটা ঘন কালো, আলোর জায়গাটা আর্টপেপারের মসৃণ অমলধবল শুভ্রতায় শুভ্র। কিন্তু বিষয়টা সত্য।

নীরা এর পর সোচ্চারে গভীর মনোযোগ সহকারে ইংরেজী পড়ত। ও ইস্কুলে প্রথম থেকেই ইংরেজী উচ্চারণ পর্যন্ত মেমসাহেবদের অনুকরণে আশ্চর্য রকমে সম্ভ্রান্ত।

Tell the man to come to me.

ও উচ্চারণ করত, "টেল দ্য ম্যান টু কম টু মি।" মানে—ও মনুষ্যটিকে বল আমার কাছে আসিতে। উসকো বোলো মেরি পাশ আনেকো লিয়ে।

মা ওই কথাটা মিথ্যে বলেন নি; নীরার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল এবং ওই ইস্কুলে পড়ানোর গুণে পড়তেও ভাল লেগেছিল। তার সঙ্গে শিখেছিল আর একটা জিনিস। সেটা সাজ-পোশাক, পরিচ্ছন্নতা। বছর দুই যেতে-না-যেতে মায়ের মৃত্যুর ঠিক আগেটায় আর সে মায়ের সাজিয়ে দেওয়া নিত না। নিজেই সাজত। বলত, না, তুমি বড় লাউড করে দাও।

আশ্চর্য হয়ে মা বলতেন, কি! কি করে দি?

—লাউড। লাউড মানে উচ্চ। মানে চড়া সাজ করে দাও। লাউড কথাটা নীরা তখন শিখে ফেলেছিল।

মা গৌরবে হেসে সারা হতেন, ওরে বাপ রে!

মা বেঁচে থাকতেই সে ওই ইস্কুলের তিন বছরের কোর্স শেষ করে সেকালের ইউ-পি পরীক্ষায় মাসে তিন টাকা বৃত্তি পেয়েছিল। হেনা সেবার ফেল করেছিল।

এরপর মেমসাহেব নিজে এসে মাকে বলেছিলেন, আপনার কন্যাকে কোন ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়া ডিবেন। উহার বিড্যা হইবে। বলেন টো আমি কোন মিশনের স্কুলে বলিয়া ডেখি। টাহারা ফ্রি করিয়া ডিবে। আমি বলিব। হ্যাঁ, আমি বলিব।

মা আর ততটা সাহস করেন নি। তিনি ওখানকার গার্লস্ হাই স্কুলেই ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তারা সমাদরের সঙ্গে ফ্রিশিপ দিয়ে তাকে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইস্কুলে এবং পাড়ায় নাম রটেছিল 'ব্রিলিয়ান্ট গার্ল'। কেউ কেউ বলতেন—পরাণ মুখুজ্জের মেয়েটি যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হত!

মা তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলতেন, এই আমার ছেলে। ছেলের চেয়েও বড়। ঠিক একদিন এমনি করে আদর করতে গিয়েই তিনি বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন, এ কি হল! বুকে যে—। তারপরই আঁ-আঁ শব্দ করে গড়িয়ে পড়লেন।

নীরা মা-মা বলে ডাকতে ডাকতে চিৎকার করে ডাকলে, মাগো! কি হল? মা—মা—মা!

তার চিৎকারেই জেঠীমা ওপাশ থেকে বলেছিলেন, আরে এমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন? মা কি মরেছে?

—জানি না। কি হল দেখ, জেঠীমাগো!

জেঠীমা এসে দেখে 'সর সর' বলে পাশে বসে মুখে কয়েকবার জলের ঝাপটা দিয়ে, নেড়ে-চেড়ে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—খেলে মা, মাকেও খেলে! ভাই খেয়ে খিদে মিটল না, বাপ খেয়ে মিটল না, শেষে মা—তাকেও খেলে!

নীরা বড় বড় চোখ দুটো বিস্ফারিত করে জেঠীমার দিকে তাকিয়েছিল। সে খেয়েছে মাকে? সে?

দৃশ্যটা শেষ হল। নাটক নয়? মায়ের অনাদরে দুঃখের আরম্ভ, বাপের মৃত্যুতে আকস্মিক পরিবর্তনে আশ্চর্য সমাদর, তার পরই হঠাৎ হার্টফেল করে মায়ের মৃত্যু এবং অন্তে জেঠীমার নিষ্ঠুর কঠিন নির্মম তিরস্কার—'মাকেও খেলে মা!'

যদি কেউ তার জীবন নিয়ে নাটক লেখে এবং বেশী নাটকীয় করতে ইচ্ছে করে তবে সে যেন যোগ করে দেয়—নীরা তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠেছিল—না-না-না। আমি খাই নি, আমি খাই নি। তারপর আছড়ে পড়েছিল মায়ের বুকের উপর—মা-মা-মা।

বাস্তব হল, তার মনে আছে, সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জেঠাইমার কথাগুলি তার বুকে পিঠে মুখে চাবুকের মত আছড়ে কেটে বসছিল যেন। সে চীৎকার করে প্রতিবাদ করত কিন্তু মায়ের এমন কেন হ'ল সে বুঝতে পারে নি। সে আঘাত করেছে—লাগিয়ে দিয়েছে!

ভয়ঙ্কর আঘাত দিয়ে মৃত্যু আবার তার সামনে এসে দাঁড়াল। এবার সে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কাঁদল না। কান্না এল না।

তিন

আবার নূতন দৃশ্য আরম্ভ হল। দ্বিতীয় দৃশ্য।

নূতনকালে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে আলোকসম্পাত একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলোর যাদুতে অসম্ভব সম্ভবপর হয়। দিন রাত সকাল দুপুর দেখানো অত্যন্ত সহজ।

প্রথম দৃশ্যটায় আলোকসম্পাত প্রত্যূষের পরিবেশ। আলো সবে ফুটেছে। উষাকাল। দু'চারটে কাকের ডাক উঠেছে শুধু। কারণ নীরার জীবনের সে কালটা প্রত্যূষই বটে। তার সঙ্গে কুয়াশা।

মায়ের চিতার আগুনের আলোর দীপ্তিতে শেষটা আলোকিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কলরব করে পাখীরা ডাকল। পূর্ব দিগন্ত লাল হয়ে উঠল, সূর্য উঠছে। তারই মধ্যে সে চিতায় শোয়ানো মায়ের পুড়ে যাওয়া দেখলে।

মৃত্যুকে সে এমন করে দেখে নি। বয়সই বা কত যে দেখবে! আট বছর। জীবনে তখন স্মৃতি সক্ষম হয় নি, শক্ত হয় নি; জীবনের জলময় সৃষ্টি থেকে তখনও স্মৃতির পৃথিবী তরল পলিমাটির মত সদ্য জাগছিল। বাপের মৃত্যুর স্মৃতির মধ্যে বাপ নেই, ভারী মানুষটা সে তরল পলির চোরাবালির মধ্যে কোথায় ডুবে গেছে। খুঁড়লে হয়তো একটা নরকঙ্কাল বা তার ছাপওয়ালা মাটি বেরুতে পারে; থাকবার মধ্যে আছে চওড়া হাল্কা খাটিয়াটার দাগ। কিন্তু আট বছর বয়সে তার চোখের উপর, তার প্রায় কোলের উপর মায়ের এই মৃত্যু তার শক্ত-হয়ে-আসা স্মৃতির পৃথিবীতে প্রথম নিষ্ঠুর আঘাত। সে যেন হত-চেতন হয়ে গেল। তাকেই মুখাগ্নি করতে হয়েছিল। শ্রাদ্ধও করেছিল। সে সব আঘাতে সে কোন প্রতিঘাত দিতে পারে নি! শুধু দুর্বোধ্য বা অবোধ একটা অনিশ্চিতের ভয়ে শুধু কেঁদেই ছিল ক'দিন

ধরে। শুধু একটা কথা মনে আছে। সেটা এই দৃশ্য পরিবর্তনের বিরতি-সময়টুকুর মধ্যে অথবা এই এক দৃশ্যে একটি অঙ্ক শেষ যদি কর তবে প্রথম অঙ্ক ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যের অবসরে সেই কথাগুলিকে গ্রানরুমে দ্বিতীয় অঙ্কের নাট্যপরিচালকের কঠিন নির্দেশ বলতে পার। শ্মশান থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়েছিল। জেঠীমা বলেছিলেন, আজ আর খেতে নেই কিছু। বিছানায় শুতে নেই। ওই কম্বলে শুয়ে পড়।

পরদিন সকালেই বলেছিলেন, ওগো মেমসায়েব, সকালে উঠেই তো চুল আঁচড়াও, মুখে হয়তো পাউডারও দাও, সে-সব যেন কোরো না, করতে নেই।

সে নিশ্চয়ই সে-সব করত না! শোকের একটা স্বাভাবিক বৈরাগ্য আছে, সুখের কথা সজ্জার কথা মনে থাকে না। কিন্তু জেঠীমা যেন পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নির্দেশ দিলেন, তোমার মেক-আপ সব পাল্টাল। সর্বদা মনে রাখবে, তুমি দুঃখিনী।

যবনিকা উঠল—শ্রাদ্ধবাসরে! না, তারও পরে।

বারো-চৌদ্দ দিনের পরই রপ্ত হয়ে গেছে তখন মেক-আপ। মুখে তখন একটা ছাপ পড়ে গেছে ক্লিষ্ট মালিন্যের, না ছোপ ধরে গেছে। এইটে তার এ অঙ্কের মেক-আপ। উঠুক যবনিকা। তোল।

মনে রেখো মা মারা গেছে। শ্রাদ্ধও হয়ে গেছে। শ্রাদ্ধের দশ দিন কম্বলে শুয়েছে, একা শুয়েছে, পৃথিবীতে সুস্বাদু খাদ্যের জন্য মন লালায়িত হয় নি; লোভ হয় নি—কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে। কিন্তু হবিষ্যি সে খেতে পারত না। শ্রাদ্ধ করেছে। কিছু বোঝে নি। কেমন একটা আচ্ছন্ন বিভ্রান্ত ভাবের মধ্যে কেটেছে এ পর্যন্ত।

শ্রাদ্ধের পরও তেমনিভাবে উদাস বিভ্রান্ত হয়ে বসে থাকবে। সেদিন রবিবার। ওদিকে জাঠতুতো ভাইবোনেরা মানে হেনারা লুডো খেলছে, একজন হি হি করে হাসছে। এরই মধ্যে ডাক আসবে, জাঠতুতো বড় ভাই এসে বলবে, বাবা নীরাকে ডাকছে।

জেঠাইমা বলবেন, কি বলছে রে ওরা ওই কুণ্ডুবাবু আর হেডমাস্টার? কথাটা কি?

জাঠতুতো দাদা অজিত বলবে—কে জানে বাবা! যাচ্ছি খেলতে হুকুম হয়ে গেল—অজিত, ডাক তো নীরাকে! যত সব—! ন্যুইসেন্স। বলেই সে ওই ঘরের দিকে 'ডেকে দিয়েছি' বলে চীৎকার করে ছুটে বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে।

মনে থাকে যেন। তোল যবনিকা এবার।

না। দাঁড়াও। বাধা পড়েছে।

* * *

১৯৫৬ সালে দুর্গাপুরের দামোদর ব্যারেজের ওপারে বাঁকুড়ায় বিনো সেনের আশ্রমে যুবতী নীরার বন্ধ ঘরের দরজায় আঘাত পড়ছে। কে ডাকছে!

১৯৩৮ সালে মায়ের মৃত্যুর পর অতীতের দিকে তাকিয়ে সে দেখছিল তার জীবন-নাট্যের অভিনয় তার মানস রঙ্গমঞ্চে। আসল সংসার-রঙ্গমঞ্চে সে ১৯৫৬ সালে তৃতীয় অঙ্কের অভিনয় শেষ করে এল এইমাত্র। তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে বিনো সেনকে নিষ্ঠুর আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত করে দিয়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিশ্রামের ঘরে বসে অতীত অঙ্কগুলির

কথা ভাবছে। তার মানস-রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি চলছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রতিচ্ছবি ফুটবে এমন সময় বাধা পড়েছে। কে কড়া নাড়ছে!

কে আবার? নিশ্চয় বিনো সেন। অনুতপ্ত বিনো সেন। প্রখ্যাত বিখ্যাত বিনো সেন নতশির হয়ে কি বলতে এসেছেন? দরজার গোড়ায় সে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়াল। কি চান তিনি? কি ভাবেন তিনি?

বাইরে থেকে এবার ডাক শোনা গেল—নীরা! নীরা!

নীরা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল।—কেন? কেন? কেন?

বিনো সেন ডাকলেও সে এত ক্ষিপ্ত হত না। ডাকছে অণিমাদি। স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া সেই সুখী মহিলাটি।—কেন তিনি আসবেন বিনো সেনের হয়ে কথা বলতে!

—নীরা! অ নীরা! নীরা!

এবার সত্যসত্যই নীরা চীৎকার করে উঠল, কেন? কেন? কেন? কি চাই আপনার?

—তোমার খাবার এনেছি ভাই। খাবারটা নাও। আমি বসি তুমি খাও।

খাবার! কি আশ্চর্য! কি অত্যাচার!

এই মিষ্টমুখী অণিমাদি—কি বলবে একে?

—নীরা!

এবার নীরা বললে—মাফ করবেন আমাকে, এখানকার খাবার আমার মুখে রুচবে না। রুচতে পারে না। উচিত নয়।

—ভাল। খাও না-খাও তুমি দরজাটা খোল দিকি। খোল নীরা। না খুললে আমি যাব না।

—থাকুন সারারাত্রি দাঁড়িয়ে।

—শুধু দাঁড়িয়ে থাকব না, কড়া নাড়ব। ক্রমাগত কড়া নাড়ব। নীরা!

—না, নাড়বেন না। ডাকবেন না। চীৎকার করলে নীরা।

কিন্তু অণিমাদি নাছোড়বান্দা। বললেন, ডাকব। নাড়ব কড়া। আমি তোমাকে প্রেমপত্র লিখি নি। আমাকে কি বলবে তুমি?

কি আপদ! দরজা খুলে সে পথ আগলে দাঁড়াল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েই দাঁড়াল। ইচ্ছে হল তার হাতের থালাটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব। কিন্তু অণিমাদি একটু রূঢ় দৃষ্টিতেই তার দিকে তাকিয়ে গোড়াতেই বললেন—থালা ছোঁড়াছুঁড়ি করো না নীরা, ভাল হবে না। আমি কারুর দূত বা দূতী হয়ে আসি নি।

অণিমাদির বয়স হয়েছে। দু'চারগাছা চুলও সাদা হয়েছে। তা তিনি সযত্নে ঢাকা দিয়ে রাখেন। বেশ একটু মোটাসোটা। এই কথা বলে তিনি প্রায় তাকে ঠেলেই ঢুকলেন ঘরে। বললেন, ও মা! আমি ভাবছি তুমি জিনিসপত্তর গোছাচ্ছ। এ যে সব যেমনকার তেমনি। বসে বসে কাঁদছিলে নাকি?

—কাঁদতে আমি জানিনে অণিমাদি। জীবনে আট বছর বয়সে কান্না শেষ করেছি মরা

মায়ের বুকের উপর পড়ে। তারপর আর কাঁদি নি।

হাসলে নীরা।

খাবারের থালাটা রেখে অণিমাদি বললেন, তাই তুমি এমন নিষ্ঠুরভাবে সমস্ত লোকের সামনে এত বড় মানুষটাকে এমন করে বলতে পারলে! আমরা হলে পারতাম না।

—তার যোগ্যতা নেই আপনার।

—তা হবে। তবে আজ যা করলে তুমি—। একটু হাসলেন অণিমাদি।

—কি? অনুতাপ করতে হবে এর জন্যে? নীরাও ব্যঙ্গভরে হাসল।

—অনুতাপ-টনুতাপ বুঝি নে ভাই। তুমি বি-এ পাস করেছ, তাও আবার ডিস্টিংশনে। আমরা সে হিসাবে মুখ্যু মানুষ। তবে বয়স বেশী, প্রায় দ্বিগুণ। আমি বিনো সেনের চেয়ে বয়সে বড়। দেখেছি অনেক। পুড়েছিও। আমি বুঝি কি জান? বুঝি, যে জীবনে কাঁদে নি, তাকে কাঁদতে হবেই।

—না। কঠিনভাবে ঘাড় নাড়লে নীরা।

—আচ্ছা। আমি চললাম। ইচ্ছে হয় খেয়ো, না হয় খেয়ো না। দিয়ে গেলাম।

চলে গেল অণিমাদি।

নীরা তখনও ঘাড় নাড়ছিল—না।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটায় তার প্রতিবিম্ব ঘাড় নাড়ছে, না। মৃদুস্বরে সে বললে, সব কথা সব মানুষকে খাটে না অণিমাদি। আমি কাঁদি নি সেই দিন থেকে, কাঁদব না।

—ভাল। বলে চলে গেলেন অণিমাদি।

ঘরে দরজা দিয়ে আবার বসল নীরা। বড় ক্লান্ত সে। বড় ক্লান্ত। বাইরে আশ্রমটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। নীরার দেহ ভেঙে পড়ছে। কিন্তু মনে ক্ষোভ ক্রোধ এখনও পাক খাচ্ছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার তার মানস-রঙ্গমঞ্চের অভিনয় শুরু হয়ে গেল।

যবনিকা কে যেন তুলে দিচ্ছে।

* * *

তোলো, জীবননাট্যের প্রথম বিরতির পর দৃশ্যপট তোলো। দেখ চরিত্র-বিচার করে সে কাঁদবে কিনা। দৃশ্যপট বদল হয়েছে তখন। তাদের এবং জ্যাঠামশায়ের বাড়ির উঠোনের মাঝখানে যে পাঁচিলটা ছিল সেটা ভাঙা হয়েছে। যেটা তাদের শোবার ঘর ছিল, রাস্তার দিকে, সেটা তখন বসবার ঘর হয়েছে। ছোটখাটো অনেক বদল। নীরাকে শুতে হয় হেনার সঙ্গে।

ডাক এল, সেই ঘরে জ্যাঠামশায় ডাকছেন। স্কুলের হেডমাস্টার এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন কুণ্ডুবাবু।

ডাকটা জানিয়ে দিয়ে জাঠতুতো দাদা গলিতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

নীরা একলা বসেছিল—তাদের বাড়ী অর্থাৎ যে অংশটা তার বাবার—সেই উত্তর দিকটায়

তাদের শোবার ঘরের সামনে পুরনো তক্তাপোষটার উপর, যেটা একটু নড়াচড়াতেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে। সে যেন এখন নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারে নি—তবে অত্যন্ত যন্ত্রণা, অসহনীয়। সব ফাঁকা—কেউ নেই; একা যেন একটা গাছতলায় বসে আছে। এবং তার যেন কোন অধিকার নেই। কছু করতে নেই, কিছু ছুঁতে নেই, সব মানা, সব বারণ। খেতেও নেই। জেঠাইমা মধ্যে মধ্যে বলেন—এত খেয়ে এখনও খাওয়া! এখনও ক্ষিদে!

এই জেঠাইমা তার বাবা মরবার পর তার মাকে বলেছিল—ওসব ওকে বলিস নে।

এখন! এখন যদি সে বলে ক্ষিদে নেই, তাতেও তিনি বলেন—থাকবে কি ক'রে? দুটো আস্ত মানুষ—বাপ-মা! বাপ!

ডাক দিলেও সে নড়ে নি। তার কি যেতে আছে? জ্যাঠামশাই ডাকছেন—তবুও কি—? সে জেঠাইমার দিকেই তাকিয়েছিল। ইতিমধ্যে আবার ডাক এসেছিল। জ্যাঠামশাইয়ের গলা—নীরা! আরে নীরাকে পাঠিয়ে দিতে বললাম যে!

গলার আওয়াজটা গম্ভীর, শক্ত।—শুনছ! নীরা এবার উঠেছিল আপনা থেকেই। ওই গম্ভীর শক্ত আওয়াজই যেন তাকে টেনে তুলেছিল। চোখ ছিল জেঠাইমার দিকে। তিনি কাজই করছেন, কাজই করছেন। হঠাৎ চোখে চোখ মিলতেই তিনি বললেন—যাও, ডাকছে যে!

সে পা বাড়াল। জেঠাইমা বললেন—ময়লা ওই ন্যাকড়া জামাটা পাল্টে যাও। একটা ফরসা ফ্রক পরে যাও। আমাদের ছিদ্দির খুঁজতে এসেছে নিশ্চয় কুণ্ডু। বলবে, ঘুঁটে-কুড়ুনী করে তুলেছি এরই মধ্যে।

বলেই গলা তুলে স্বামীকে জানিয়ে দিলেন—যাচ্ছে। বাথরুমে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে গলা নামিয়ে বললেন—ফ্রকটা বদলে নাও। যাও।

ফ্রক পালটে, নীরা নিজের অভ্যাস অনুযায়ী চুলে চিরুনি দিয়ে মুখে পাউডার বুলোবার জন্যে কৌটোটা খুললে। ওটা তার ওই মিশন স্কুলের শিক্ষা। সামনেই আয়নায় তার কালো মুখখানা আরও কালো মনে হচ্ছে, বড় গরীব বড় নোংরা দেখাচ্ছে। ধবধবে ফ্রকের সঙ্গে কেমন বেমানান লাগছে। ঠিক এই সময় পিছন থেকে কে ঢুকল। আয়নায় দেখলে নীরা—ঘরে ঢুকেছে হেনা। আবার ডাকতে এসেছে। সে পাউডারের পাফটা মুখে বুলুতে লাগল যত তাড়াতাড়ি পারে, কিন্তু হেনা বলে উঠেছিল—ওমা! তুই পাউডার মাখছিস? তোর না মা মরেছে?

হাতখানা আর নড়ে নি। কিন্তু ঠিক সে বুঝতে পারে নি। তবে মুহূর্তে এবার তার অন্তরে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তারপর বলেছিল—কেন, এখন তো আবার মাছ খাচ্ছি, বিছানায় শুচ্ছি! জেঠীমা বললেন, পরিষ্কার হয়ে যেতে।

বলেই সে তার মনের পঙ্গুতা কাটিয়ে মুখে পাফটা বুলিয়ে নিয়েছিল।

জেঠীমা বারান্দাতেই ছিলেন; সব শুনেও ছিলেন; বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই তিনি বলেছিলেন, একটু গন্ধ মাখলিনে? একটু সেণ্ট? তোর তো আছে।

একটা তীক্ষ্ণমুখ মোটা সূঁচ যেন তার বুকে বিঁধে গিয়েছিল। অন্য মেয়ে হলে সে নিশ্চয় কাঁদত বা সভয়ে মুখের পাউডার মুছে ফেলত। কিন্তু সে কোনটাই করে নি। ভুরু কুঁচকে,

বাল্যের মসৃণ ললাটে সূক্ষ্ম তিক্ত রুক্ষ রেখা জাগিয়ে তুলেছিল।

অণিমাদি, ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে দুঃখকে যারা জয় করে তারা কাঁদে না। ওই লড়াইয়ে কাঁদতে মানা গো। কাঁদলেই হারলে। তোমার চোখের জলেই তোমার পায়ের মাটি পিছল করে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়বে। নীরা কখনও কাঁদবে না। জীবননাট্যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্কে। প্রথম অঙ্ক তো তুমি জান না, জানলে ও কথা বলতে না। থাক।—

প্রম্পটার বলছে—অণিমাদি তৃতীয় অঙ্কে।

এখন কেন অণিমাদির কথা বলছ?

—ভুল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় চলছে মানস-রঙ্গমঞ্চে।

নতুন ড্রয়িংরুম, হ্যাঁ, জ্যাঠামশায় তাদের শোবার ঘরখানাকে ড্রয়িংরুমই বলতে শুরু করেছেন তখন। ঘরে ঢুকতেই জ্যাঠামশায় বললেন, কাল থেকে তুমি ইস্কুলে যাবে, বুঝেছ! হেডমাস্টার মশায় নিজে এসেছেন।

নীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ডাগর চোখ দুটিতে তার বিভ্রান্তি এবং বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

হেডমাস্টার বললেন, দাঁড়িয়ে কেন? বস!

সে বসল। জ্যাঠামশায় বললেন—কি রে, তোকে আমরা ইস্কুলে যেতে বারণ করেছি?

তা তো মনে পড়ল না নীরার। সে ঘাড় নাড়লে, না।

কুণ্ডুবাবু বললেন, তবে ইস্কুলে যাচ্ছ না কেন? ইস্কুলে গেলে তো ভাল থাকবে। পাঁচজনের মধ্যে থাকবে।

চুপ করে বসে রইল নীরা। ভুরু দুটো আবার কুঁচকে উঠল। হেনা ইস্কুলে যায়, দশটায় জেঠীমা তাগিদ দেন, হেনা, দশটা বাজে যে। কই তাঁকে তো বলেন না! তার মা মরেছে, তাকে যেতে আছে?

হেডমাস্টার বললেন, ইস্কুলে যাবে কাল থেকে। আমরা আশা করি, ভালভাবে পাস করবে। স্কলারশিপ পাবে। ইচ্ছে হলে আই-এ, বি-এ, এম-এ পড়বে। পাস করবে। কত মেয়ে করছে। চাকরি করছে। বুঝলে না!

নীরা বললে, আমাকে ইস্কুলে যেতে আছে? আমার মা মরেছে!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়। অশৌচ চলে গেছে, আবার কি? কাল থেকেই যাবে তুমি, এই তো হেনা যায়। ওর ইস্কুল তো আমাদেরই প্রাইমারী সেকশন। একসঙ্গে যাবে।

নীরা বলে ফেললে, জেঠাইমা বকবেন না?

জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন, না-না। কেন বকবেন?

—উনি তো বকেন। সব তাতেই বকেন।

জ্যাঠামশাইয়ের মুখোশ এবার খুলছিল, বললেন, না, সব তাতেই বকেন না। অন্যায় করলেই বকেন এবং বকবেন। তোমার মা তোমার মাথা খেয়ে গেছে আদর দিয়ে। যাক,

ইস্কুলে যাবে তুমি, তাতে তিনি কখনই বকবেন না।

—ছি-ছি-ছি, হারাণবাবু! ছি! বলে উঠলেন কুণ্ডুবাবু।—এই শিশু মেয়ে, পনের দিন আগে মাতৃবিয়োগ হয়েছে—

জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন, বোধ করি জলমগ্ন ব্যক্তির মত তিনি রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠেছিলেন, কুণ্ডুমশাই! শুধু ওই একটি কথা।

কুণ্ডুমশাই তাতে ভীত হবার ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি সহাস্যে বলেছিলেন—বলুন!

উত্তর খুঁজে পান নি জ্যাঠামশাই। তিনি নীরাকেই ধমক দিয়ে বলে উঠেছিলেন—যাও, তুমি ভিতরে যাও। তুমি ইস্কুলে যাও না, ওঁরা আমাকে দোষ দেন। কাল থেকে ইস্কুলে যাবে, বুঝলে? সে চলে যাচ্ছিল, আবারও বললেন জ্যাঠামশাই—বুঝলে?

সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

বলেই বেরিয়ে এল। বারান্দায় বেরিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। সামনে উঠানে বারান্দায় চার-পাঁচ জোড়া চোখ তার দিকে হিংস্র আক্রোশে ধ্বকধ্বক করছে। যেন একদল নেকড়ে। তার আর পা উঠল না। কাছে গেলেই যেন ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। পিছনে বাইরের ঘরে জ্যাঠামশাইয়ের একেবারে ফেটেপড়ার মত গলার আওয়াজ শোনা গেল।

—কুণ্ডুমশাই, আমি প্রটেস্ট করছি, আপনি ধনী বলে আমার ঘরে নাক গলাতে আসবেন না। সে আমি কখনও সহ্য করব না। নেভার।

—একশোবার করব। শুনুন হারাণবাবু, পরাণের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ বন্ধুত্ব ছিল—

—ছিল, খাদ্য আর খাদকের!

—সে জানা আছে। ভাইয়ের সম্পত্তির ওপর লোভের কথা পরাণ জানত। সে যখন আমাকে জমি বিক্রী করে, তখন সে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিল। আমার সে দলিল আছে।

—কুণ্ডুমশাই!

—শুনুন হারাণবাবু, পরাণের মেয়েকে ফাঁকি দেবার মতলব আপনার এ চাকলার লোক এর মধ্যেই বুঝে নিয়েছে। কিন্তু শুনুন, ফাঁকি দিতে চাইলে তা পারবেন না। আমি পরাণের টাকাকড়ির সব হিসেব জানি, রাখছি। আমি দরখাস্ত করব এস-ডি-ও এবং পুলিসসাহেবের কাছে। জজসাহেবের কাছেও জানাব, আপনি একটি নাবালিকার অভিভাবকত্বের সুযোগ পেয়ে তাকে ঠকাচ্ছেন।

—করবেন। করবেন বলব না—করুন বলছি।

কথাগুলি বেশ উচ্চকণ্ঠেই হচ্ছিল। বাড়ীর ভিতরেও স্পষ্ট হয়ে প্রতি কথাটি ভেসে এসে পৌঁছুচ্ছিল। সেই কণ্ঠধ্বনির আতঙ্কেই বোধ করি জেঠাইমা, হেনা এবং তার তিন ভাই চীৎকার করে আক্রমণ করতে পারছিল না, নইলে তাদের চোখে-মুখে-হাতে-দাঁতে হিংস্র নেকড়ের হিংসা ফুটে উঠেছে। আর নীরা তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা থাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের আড়াল দিয়ে বন্য মানুষ যেমনভাবে এমন ক্ষেত্রে নেকড়েদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয় ঠিক তেমনিভাবে। ভয় তার দৃষ্টিতে নেই। সাহস আছে।

প্রতিরোধের সঙ্কল্প আছে, ক্রোধও একটা আছে। মরতে হ'লে না মেরে সে মরবে না। মৃত্যু এলেও তাক থাবা সে মারবে হারবার আগে।

জেগেছে তার বিদ্রোহ তখন। সেই, সেই বোধ হয় প্রথম দিন।

এ দৃশ্যের শেষ এখানে হলেই অনেকের মতে ভাল হত। কিন্তু মানুষ-নাট্যকারের নাটকে তাই হত। কিন্তু এ নাট্যকার মানুষ নয়। ভগবান বলতে আপত্তি আছে নীরার, ভগবান সে মানে না। তবু মানুষ নয় এমন একজন নাট্যকারকে সে মানে বা অনুভব করে। আজকাল যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, যে যন্ত্রে মানুষের যে অঙ্ক কষতে এক মাস লাগে তা কয়েক মিনিটে কষে দেয়। এই নাটক হয় তেমনি কোন অদৃশ্য-শক্তি যন্ত্রের রচনা। যারই হোক— তার নাটকে এ দৃশ্য এখানে শেষ হয় নি। পরের দিন সকাল দশটা পর্যন্ত চলেছিল।

কুণ্ডুমশাই চলে যেতেই জ্যাঠামশায় ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন—এইভাবে আমার মুখে চুনকালি না মাখালেই কি চলত না!

জেঠাইমা বলেছিলেন—মাখালাম আমরা? না তোমার এই ভাইঝি!

তিনি দুমদুম করে এগিয়ে এসেছিলেন তার দিকে। সে কিন্তু নড়ে নি। তিনি আঙুলটা মুখের কাছে দেখিয়ে থেমে গিয়েছিলেন।

জ্যাঠামশাই চাপা গলায় বলেছিলেন—কুণ্ডু এখনও রাস্তায়। তারপর বলেছিলেন—ওকেও শাস্তি দেব না ভেবেছ? দেব কিন্তু তার সময় আছে।

নীরা কিন্তু ঠিক তেমনিভাবেই দাঁড়িয়েছিল। না, একটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। সেও যেন এই পশুগুলির আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পশুই হয়ে গিয়েছিল। এতগুলি বিপক্ষের বিরুদ্ধে সে একা, বনের ঝোপে আশ্রয় নেওয়া বেড়ালের মত নখ যেন ঈষৎ বের করে দাঁড়িয়েছিল। চোখের পলক পড়ছিল না তার।

এইভাবেই শেষ হয়েছিল সেদিনের পালা। ঝোপের চারিপাশে ব্যর্থ গর্জন করেই শান্ত হয়েছিল তারা। নিশ্চিন্ত হয়েছিল এই ভেবে যে আগলানো আছে যাবে কোথায়! রাত্রে সে শুয়েছিল একা তাদের ঘরে। কারণ তাকে শুতে কেউ ডাকে নি। বাড়ীর ঝিটা বারান্দায় শুয়েছিল যেমন শোয়। বিছানায় শুয়ে নীরা জেগেই ছিল, ঘুম আসে নি। আজ যেন তার অবস্থাটা সে প্রথম প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করলে। মাতৃবিয়োগের সকাতর অসহায়তাটুকুকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে তখন হিংস্র হয়ে উঠেছে। সেই যে উঠল বিদ্রোহের হিংস্রতায় উগ্র হয়ে, তা আর তার গেল না। রাত্রে জেগে ছিল, ঘুম আসে নি; মায়ের মৃত্যুর আগে থেকেই সে এটুকু বুঝেছিল যে, ওরা সম্পর্কে নামে আপন হলেও ওরা আপন নয়, ওরা পর। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে আজকের ওই ঘটনার আগে পর্যন্ত তার ওই ধারণাটাই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে এসেছিল। এই ঘটনার পর বাড়ী ঢুকেই ওদের চোখেমুখে কঠিন আক্রোশ এবং হিংসা দেখে সে বুঝেছে এরা শুধু পর নয়, এরা তার শত্রু। পরের কাছে হয় সঙ্কোচ। শত্রুর কাছে হয় পায়ে লুটিয়ে পড়তে হয়, নয় দাঁত নয় যে কোন অস্ত্রই তার থাকে তাই উদ্যত করে দাঁড়াতে হয়। নীরা তাই দাঁড়িয়েছিল তার প্রকৃতির নির্দেশে, পায়ে লুটিয়ে পড়ে নি। সে দাঁড়িয়েছে প্রস্তুত হয়ে। এবং নিজের যুদ্ধকৌশল আপনিই তার ভিতর

থেকে আবিষ্কৃত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে। নীরব অথচ উদ্ধত সহিষ্ণুতা তার প্রধান ধর্ম। জেঠীমা ভেবেছিলেন একা ঘরে শুতে নীরা ভয় পাবে। কিন্তু তাও সে পায় নি। এমন কি একলা থাকার সুযোগেও সে কাঁদে নি। সে রাত্রিটি নীরার জীবনে অক্ষয় স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত।

পরদিন সকালে ইস্কুল যাবার সময় সে বইখাতা সমস্ত ঠিক করে স্নান করবার আগে এসে দাঁড়িয়েছিল জেঠীমার সামনে। জেঠীমার বাড়িতে সেই নতুন ঠাকুর এসেছে। মায়ের শ্রাদ্ধে এসেছিল, আর তাকে বিদায় করা হয় নি।

দাঁড়াবার মধ্যেই যেন কিছু বলা হয়েছিল। জেঠীমা তবু তাকে কোন কথা বলেন নি। বলেছিলেন ঠাকুরকে—ক্লাসের ফার্স্ট মেয়েকে ঘণ্টাখানেক আগে ইস্কুলে যেতে হয় ঠাকুর। যা হয়েছে দিয়ে দাও।

এবার সে বলেছিল, আমি কি পরে ইস্কুল যাব? আমার সাদা ফ্রকটা সেদিন হেনা পরে ওদের স্কুলের ফাংশনে গিয়েছিল। সেই থেকেই সেটা ও পরছে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল জেঠীমা। তার মুখের উদ্ধত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তিনি ডেকে-ছিলেন, হেনা!

ও ঘরে হেনা তখন চুল আঁচড়াচ্ছে। বলেছিল, কি?

—নীরার ফ্রক নিয়েছ, দিয়ে দাও।

—না, তুমি সেদিন বের করে দিয়ে বলো নি, এটা তুই পরিস! তা হ'লে আমি দেব কেন?

—তর্ক করো না, দাও।

—না, দেব না। আমাকে এমনি একটা সুন্দর ফ্রক না দিলে আমি দেব না। কক্ষনো না। না। এটাই আমি নেব। ওকেই তুমি কিনে দিয়ো।

—দাও।

—না।

—না! জেঠীমা গিয়ে ওকে দুমদাম শব্দে মেরেছিলেন এবং ফ্রকটা কেড়ে এনে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, ওই নাও।

নীরবেই সে কুড়িয়ে নিয়েছিল। এবং সেইটে পরেই ইস্কুল গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে পাট করে সযত্নে তুলে রেখেছিল। পরদিন সকালে দেখেছিল সেটা ফালি ফালি করে ছেঁড়া। খানিকক্ষণ সেটাকে হাতে ধরে তাকিয়ে দেখে বাড়ির বাইরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছিল। কিছু বলে নি।

এইটেই প্রথম দৃশ্যের শেষ।

দ্বিতীয় অঙ্ক সুদীর্ঘ। দশ বৎসর। প্রথম দৃশ্য চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা। তার পরেরটি —দীর্ঘ অঙ্কটির অর্ধেক সময় জুড়ে একটি পাঁচ বৎসরের দৃশ্য। হেনারা ভাইবোনে পাঁচজন, জ্যাঠামশাই জেঠাইমা এবং সে—আটজনের সংসারে সে একা এবং ওরা সাতজন একদিকে।

সে ঝোপের মধ্যে বন্দী বেড়ালের মত স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি, উদ্যত নখ, কিন্তু আক্রমণ প্রতীক্ষায় নীরব, স্থির। শুধু একটা পরিবর্তন উভয় পক্ষই অনুভব করেছে, সেটা হল এই যে, ঘরের কোণের বন্দী যে জীবটিকে বিড়াল মনে হয়েছিল, সেটা বড় হয়েছে এবং সকলেই কিছুটা পিছু হটেছে; কারণ নেকড়েরা যেটাকে বিড়ালের বাচ্ছা ভেবেছিল—সেটা তো বিড়ালী নয়—এ যে একটা কিশোরী চিতাবাঘিনী। তবে শীর্ণ, দীর্ঘ, কুৎসিত।

পটভূমিকে কোনরকমে প্রতীকের মাধ্যমে দেখিয়ে দিতে পারা যায়। একখানা ক্যালেণ্ডারের সাহায্যে চমৎকার হয়। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—একটা ঝোপের মধ্যে একটি সন্ত্রস্ত সতর্ক-দৃষ্টি বিড়ালের ছবি দিয়ে ১৯৩৮ সালের মাস-পঞ্জি লাগিয়ে টাঙানো থাকবে এবং এই দ্বিতীয় দৃশ্যে ১৯৪৬ সালের ক্যালেণ্ডারে একটি কিশোরী চিতাবাঘিনীর ঘুম ভেঙে আড়ামোড়া ছাড়ার ভঙ্গির ছবি দিয়ো, চমৎকার হবে।

না, উপরের দিকে তাকিয়ে আছে এমনি ছবি দিয়ো। বনের মাথায় ঝড়ের টান। ঝড় চলছে। ১৯৪২ সাল থেকে দেশে তখন যুদ্ধের ঝড় এসেছে। ঘরের আলোয় ঠুঙি পরিয়ে দিয়ো। ব্ল্যাক আউট। ১৯৪২ সালের ২০শে ডিসেম্বর এয়ার রেড শুরু হয়েছে। '৪২ সালের সাইক্লোনে বাড়ির পাশের একটা বড় গাছ ভেঙেছিল—ঠিক মাঝখানে সেটা কন্ধকাটার মত দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যাঠামশায়ের বাড়ির দিকটায় ভারা বেঁধে রেখো; জ্যাঠামশায় যুদ্ধের বাজারে জমি নিয়ে এবং আরও সব কি কি নিয়ে যেন গোপনে ব্যবসা করছেন। ফাঁপতে ধরেছেন। দমদমে এরোড্রাম হয়েছে। বাড়ছে।

দিনে রাত্রে প্লেনের গোঙানিতে আকাশ কাতরাচ্ছে। গুজব নানান রকম। ইংরেজ, অ্যামেরিকান, কাফ্রি, নিগ্রো, চীনে সেপাইয়ে ভরে গেছে কলকাতা। তারা নাকি নানান অত্যাচার করছে। নোট উড়িয়ে দেয় শীতের হাওয়ায় ঝরাপাতার মত। কাঙালীতে ভরে গেছে এদিকটা। দখ্নে কাঙালী। '৪২ এর আশ্বিনে সাইক্লোন গেছে, তাদের সব উড়ে গেছে। শুরু হয়েছে দুর্ভিক্ষ।

এই দৃশ্যের পটভূমিতে জ্যাঠামশায়ের ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বলতর বেশভূষা, কিন্তু তার বেশভূষা সেই এক। মলিন না হলেও উজ্জ্বল নয়; মূল্যের তারতম্যও বোঝা যায়।

নেকড়ের পালের রাজত্বের মধ্যে সতর্ক যুদ্ধে আত্মরক্ষা করে বেড়ে ওঠা কিশোর বয়সের চিতাবাঘিনীর সঙ্গে তুলনা কষ্ট-কল্পনা নয়—সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। মনে হয়েছিল, সেটা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি কিশোর চিতাবাঘিনীতে।

সত্যই তাই। শুধু প্রকৃতিতে নয়, আকারেও সে এমন লম্বা ঢেঙা হয়ে উঠেছিল যে জ্যাঠামশায়ের বেঁটেখাটোর সংসারটিতে যে-কেউ এলেই একদৃষ্টিতে বুঝতে পারত, এ তাদের কেউ নয়।

গৌরাঙ্গী সে নয়, শ্যামাঙ্গী। কিন্তু বাল্যবয়সে সে ঢেঙা হবার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন হারিয়ে গেল। শুধু রইল ওই বড় বড় চোখ আর একপিঠ চুল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে দেখে নিজের উপরেই তার রাগ হত। কিন্তু কাঁদত না সে।

হেনা তখন আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠেছে। ছোটখাটো মেয়েটি, নধর গড়ন, মুখে কোমল লাবণ্যই শুধু নয়, সে ততদিনে নারীসুলভ কটাক্ষও আয়ত্ত করেছে। নাটক নভেল অনেক পড়েছে। পড়ায় সে কাঁচা বরাবর, সেটা তখন এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে, ওদিকে পাকার সম্ভাবনা একেবারেই নষ্ট হয়েছে। নীরা পড়ছে তখন ক্লাস নাইনে, হেনা ফেল করে তখনও পড়ে আছে ক্লাস সিক্সে। আট বছরে যে অঙ্ক শুরু হয়েছে, তারপর পাঁচ বছর শেষ হতে চলেছে, এই পাঁচ বছরে হেনা দুবার ফেল হয়েছে। গোড়া থেকেই হেনা ওর থেকে এক ক্লাস নিচে পড়ত। কিন্তু তাতে হেনাও খুব দুঃখিত নয়, তার মা-বাপও নয়। হেনার নারীত্ব এবং নারীসুলভ লাবণ্য বিকশিত হতে দেখেই তাঁরা খুশী ছিলেন। নিত্য চোদ্দ বছরে পা-দেওয়া মেয়ের চুল বেঁধে দেবার সময় মা তার মুখ মুছিয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন—টাকা খরচ করব, কত বেটা বড়লোকের ছেলে এসে সেধে নিয়ে যাবে! টাকাও তো আসছে লক্ষ্মীর কৃপায়!

একটা হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই। সেটা বাজিয়ে সে গলা সাধত। সা-রে-গা-মা। সারেগা, রেগামা, গামাপা। তারপর ক্রমে দু'চারখানা আধুনিক সিনেমার গানও সে শিখেছিল। ভাইদের সঙ্গে ছাদে থিয়েটার করত। নায়িকা সাজত।

সে চুপ করে বসে থাকত।

ভাইরা লোকের প্রয়োজনে তাকে ডাকত, কিন্তু সে যেত না।—না। কি সাজবে সে? ঝি? না!

পাড়ার অন্য দুটি মেয়ে এবং কটি ছেলে আসত। অজিতদা বড় হয়েছে। ম্যাট্রিক একবার ফেল করেছে। কিন্তু কালচারে তার খুব অনুরাগ। ফ্যামিলি থিয়েটার করবে। জেঠাইমা তেমনি কঠোর তেমনি নির্মম তার উপর। এই সুযোগে তার দিকে তাকিয়ে বলতেন—ওমা, কি হবে মা! এ মেয়েকে পছন্দ করবে কে?

হেনা বলত, ও কি শুধু পুরুষদের সঙ্গে লেখাপড়ায় পাল্লা দেয়? ও যে টিফিনের ছুটিতে ইস্কুলে স্কিপিং করে। লং জাম্প দেয়, পুরুষদের সঙ্গে বক্সিং করবে। হবে না এমনি চেহারা! শেষ পর্যন্ত না বেটাছেলে হয়ে যায়। আজকাল খবরের কগজে বের হয়।

হি-হি করে হাসত।

সে চুপ করে থাকত।

জেদ করে সে সাজসজ্জা প্রসাধন ছেড়ে দিয়ে নিজেকে আরও শ্রীহীনা করে তুলতে চেষ্টা করলে। একদিন সে আর থাকতে পারলে না, জেঠীমাকে বললে, ভাববেন না। আমাকে কেউ পছন্দ করবে বলে ভগবান বোধ হয় সৃষ্টি করে নি। কিন্তু ভয় নেই, আমি কারুর গলগ্রহ হতেও জন্মাই নি। তা আমি হব না।

জেঠীমা বলেছিলেন, কি বললি? ক্লাসে ফার্স্ট হোস বলে এত অহংকার তোর?

সে বলেছিল, যার কেউ নেই তার অহং না থাকলে সে বাঁচে কি করে বলুন! অহং যার সর্বস্ব, তার অহংকার ছাড়া কি আছে সংসারে!

—তার মানে?

—তার মানে, অহং মানে আমি। আমার আমি ছাড়া আর তো কেউ নেই, কিছু নেই। তাই অহংকার করেই বেঁচে আছি। নইলে হয় বিষ খেতে হয়, নয় গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে হয়।

আশ্চর্য! মানুষের যে কখন কি হয়, আর কিসে কি হয় তা কেউ বলতে পারে না। ঐ কথাটি কিভাবে যে জেঠীমার মনে গিয়ে বাজল, আর তার কণ্ঠস্বরও সেদিন কি মুহূর্তের জন্য তার অজ্ঞাতসারে কোমল করুণ হয়ে উঠেছিল? হয়তো উঠেছিল। নইলে সেদিন এমনটা হল কেন? তার সমস্ত জীবননাট্যে আর একটা কি দুটো ছাড়া অমন সুন্দর নাটকীয় বিস্ময় আর আসে নি। গোটা জেঠাইমা মানুষটাই যেন আগাগোড়া পালটে আর এক মানুষ হয়ে সামনে দাঁড়াল। সে কি তার কথার সুরের ছোঁয়ায়? হ্যাঁ, তার ওই কথার সুরের ছোঁয়ায়!

তখন জেঠীমা কিছু বলেন নি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার ঘরে এসে জেঠীমা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাড়িতে হেনারা ছিল না। তারা ভাই-বোনেরা মিলে গিয়েছিল পাড়ার অ্যামেচার থিয়েটার দেখতে। সে যায় নি। যেত না কখনও। পড়ছিল সে।

জেঠীমা ডেকেছিলেন, নীরা!

সে মুখ তুলে তাকিয়েছিল, সুর শুনে বিস্মিত হয়েছিল।

জেঠীমা বলেছিলেন, তোর মনে হয় নীরা আমরা কেউ তোকে একটু ভালবাসিনে, না!

নীরা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তাঁর মুখের দিকে। কথা বলে নি।

জেঠীমা বলেছিলেন, না, যতটা ভাবিস তা নয়। তোর নিজেরও দোষ আছে। ভেবে দেখিস। তুইও আমাদের আপনার ভাবতে পারিস নি। তবে হ্যাঁ, দাগ দুটা আমাদের আগে। তুই সেই একদিন বুড়োবাবুর কাছে আমার এমন কুৎসা করলি যে—।

বলেই তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আবার বললেন, তা ছাড়া আমার ছেলেমেয়েতে পাঁচটা, তারা গুণে তোর চেয়ে এমন ছোট রে যে তাদের জন্যে—

কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। যেখানে সত্য কথা বলে নিজেকে খাটো করতে হয়, তার চেয়ে নিষ্ঠুরতর সত্য আর নেই। সে সত্যকে ভয় ওই বিনো সেনও করেন। জোড়হাত করে বলতে হয়, আমাকে ক্ষমা কর—আমাকে ক্ষমা কর!

আঃ, আবার ক্রম ভঙ্গ হচ্ছে। ভুল হচ্ছে। জীবন-রঙ্গমঞ্চে বিনো সেনের সঙ্গে তৃতীয় অঙ্কের অভিনয় শেষ করে সে তার ঘরে বসে পিছনের অভিনয় দেখছে তার মনের রঙ্গমঞ্চে।

* * *

ওই অসমাপ্ত কথা আর তিনি সমাপ্ত করতে পারেন নি। করেন নি। কেঁদে ফেলেছিলেন। নীরা সবিস্ময়েই তাকিয়েছিল তাঁর মুখের দিকে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। জেঠাইমার চোখের কোল থেকে দুটো ধারা গড়িয়ে এল। মনে আছে ডান চোখ থেকে আগে, তারপর বাঁ চোখ থেকে।

নীরা কাঁদে নি। কান্না তার পায় না। সে অভিভূত হয়ে বসেই ছিল। চুপ করে বসেছিল।

জেঠাইমা তাঁর চোখ মুছে একটু ধরা-ধরা গলায় বলেছিলেন—পড়। তুই ভাল ক'রে পড়। রূপ না থাকে গুণ আছে তোর, তার দাম যে আরও বেশী। পড় তুই।

নীরা আবার উৎসাহভরে বলে উঠেছিল—দেখবেন আমি স্কলারশিপ নেবই।

জেঠাইমা বলেছিলেন—যেন ভাবতে ভাবতে বলেছিলেন—একালে বড় বড় পণ্ডিত-বিদ্বানেরা বিদ্বান পরিবার চায়। তারা রূপের চেয়ে বিদ্যের আদর করে। তেমনি কেউ যেচে এসে নিয়ে যাবে তোকে। আমি বলছি।

বলেই তিনি চলে গিয়েছিলেন।

জেঠাইমা মেয়েদের বিবাহ না-হওয়া জীবনের কথা ভাবতে পারতেন না। শুনলে যেন দিশেহারা হয়ে যেতেন।

প্রসন্ন হাসি মুখে মেখে নীরা চুপ করে বসেছিল। এমন একটি প্রসন্ন দিন এর পূর্বে তো তার জীবনে আসে নি!

পরের দিন স্কুল যাবার আগে জেঠাইমা ডেকেছিলেন—নীরা শোন!

—কি জেঠাইমা?

—বস তো। একরাশ চুল, না করিস যত্ন, না সামনেটা একটু ফেরাস। বস।

নীরা খুশী মনে বসে নি, কারণ রূপের অভাবের জন্য প্রসাধনে তার তিক্ততা ছিল। তবুও সে কথা অমান্য করে নি। তিনি চুল আঁচড়ে বেণী বেঁধে সামনেটা সুশ্রী করে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে নীরাকে দেখে বলেছিলেন—কে বলে শ্রী নেই! তাই তো রে, মুখখানা একটু ভরলে যে বড় সুন্দর হবে।

হেনা বলেছিল, ওমা! আমি যাব কোথায়?

অর্থাৎ জেঠীমার আকস্মিক পরিবর্তন দেখে।

কিছুটা দিন সুখেই গিয়েছিল। গোটা ক্লাস নাইনের বছরটাই। জেঠীমা সত্যই স্নেহ করেছিলেন। কিন্তু নীরার জীবন যে নাটক। ব্যঙ্গ করলে কি হবে। হঠাৎ নাটকীয় পরিবর্তন ঘটল, যেন কেউ ঘাড় ধরে ঘটিয়ে দিলে। এবং তার মুখ দিয়ে বললে, তাকে দিয়েই ঘটালে।

সে ওই হেনার জন্য। হেনার জন্যে স্বেচ্ছায় জেঠাইমার মর্মান্তিক ঘৃণার বিষদৃষ্টিতে পড়ল নীরা।

জেঠাইমার স্নেহের স্পর্শে ঔদ্ধত্য তার বেড়েছিল। জীবনের ভঙ্গিটা পাল্টেছিল। আগে হাসত না। এখন হেসে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত। হেনাদের সঙ্গে মেলামেশাও করত। ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত লেখাপড়ার কথায়। সহপাঠিনীদের এমন কি দিদিমণিদেরও ব্যঙ্গ করত।

জেঠাইমা বলতেন, না, এমন করে অহঙ্কার করে না।

নীরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলত, আচ্ছা আর করব না।

কিন্তু আবার করত। দিদিমণিদের ব্যঙ্গ করে বলত—বি-টি পাস হলে কি হবে, উনি জানেন না কিছু। বড়লোকের মেয়েদের উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিল। এরই মধ্যে ঘটল

নাটক। পার্থ অভিনয়ে এরই মধ্যে হেনার পরিবর্তন হয়েছিল প্রচণ্ড—সে নীরা কেন, জেঠাইমাও জানতেন না। হেনা তার চেয়ে বয়সে কয়েকদিনের ছোট হলেও—বয়সে চৌদ্দ বছরে পা দিলেও মনে মনে এবং দেহের গঠনেও তখন কৈশোর অতিক্রম করেছে। নাটক নভেল পড়ে মন তার স্বপ্নরঙীন হয়ে উঠেছে, দেহেও তার জোয়ার আসছে।

ঠিক মাস ছয়েকের মধ্যে ঘটে গেল। সে এক আশ্চর্য দ্রুতসঙ্গত ছন্দ এসে গিয়েছিল গোটা বাড়িটাতে। জ্যাঠামশাই রিটায়ার করলেন। এক্‌স্‌টেনসন্‌ পেতেন কিন্তু নিলেন না। বেনামীতে জমি কিনে রেখেছিলেন দমদম এরোড্রোমের পাশে, যুদ্ধের প্রয়োজনে এরোড্রোম বড় হচ্ছে, জমির দাম হু-হু করে বাড়ছে, সেই চড়া দামে জমি থেকে পেলেন প্রচুর টাকা। এবং ব্যবসাদার হয়ে বসলেন এক মাসের মধ্যে। কলকাতায় আপিস খুললেন। সদ্য-মেরামত-করা বাড়িখানায় তাঁদের অংশে আবার ভারা বাঁধা হল। ভেঙেচুরে ফ্যাশন বদল হবে। দোতলায় ঘর উঠবে। একদিন জ্যাঠামশাই স্যুট পরে বাড়ি এলেন। অজিতদাও স্যুট পরে কলেজ ছেড়ে আপিসে ঢুকল ছোটসাহেব হয়ে। সুজিত মেজ, সেও স্যুট পরে ইস্কুল যেতে লাগল। হেনার জন্যে শাড়ী এল। সেও দু'তিনখানা পেয়েছিল। কিন্তু হেনার নিত্য নূতন শাড়ী পরা বাতিক হয়ে উঠল। জেঠাইমা বলতেন—পরে পরে পুরনো করিসনে। বিয়ের সময় লাগবে। বিয়ের সম্বন্ধও দেখা হচ্ছিল। বাড়িটায় লক্ষ্মীর চঞ্চল অঞ্চলের বাতাসে এমনই একটা এলোমেলো হাওয়া বইল যে হেনার পরিবর্তন কারুর অস্বাভাবিক মনে হয় নি। সপ্তাহে দুদিন সিনেমায় যেত। ভাইয়ের সঙ্গে পাড়ার সঙ্গিনীদের সঙ্গে গান গাইত। সাজত। ইস্কুলে তার উচ্ছলতা বেশি ক'রে চোখে পড়ত। কিন্তু নীরা পড়ার নেশায় এবং জীবনের সেই শৈশবের একাকীত্বের একটি স্বাভাবিক গতিতে আপন পথেই চলেছিল। পড়া! পড়া! পড়া! তাছাড়া রূপহীনা সে—তার একটা লজ্জা ছিল। সে পারত না। হেনাও তাকে চাইত না। ক্রোধ ঘেন্না বা হিংসে তাদের মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই, সেই ফ্রকের ব্যাপার থেকেই। কিন্তু সেটা ইদানীং বেড়ে উঠেছিল—হেনার পৈতৃক সমৃদ্ধিতে আর নীরার প্রতি জেঠাইমার আকস্মিক মতিগতির পরিবর্তনে।

বোধ হয় একজনের চোখ এড়ায় নি। সে জেঠাইমার। তিনি মধ্যে মধ্যে হেনাকে শাসন করতেন—বকতেন।

—তোকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি হেনা—

—কেন কিসের সাবধান? হেনা উত্তর দিত।

জ্যাঠামশাই বাড়ি থাকলে বলতেন—কেন ওকে মিছিমিছি বকো বল তো?

—বকি ওর ভালর জন্যে।

ভাইরা বলত—মাম্‌স—সে কাল আর নেই। এভাবে তুমি চেঁচামেচি করো না। কি হয়েছে? ছি!

হেনা কাঁদতে বসত। কেঁদে জিতত।

জেঠাইমা সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন। শেষ পর্যন্ত হার মানতেন। নীরা দেখত। আবার কিছুক্ষণ পর পড়ায় মন দিত। জেঠাইমা কিন্তু ভুল দেখেন নি।

হঠাৎ হেনার সে রূপ নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পেল। পেল পেল—নীরার কাছেই। সে আশ্চর্য ভাবে প্রকাশ পেল।

হেনা তার নিচে পড়ে। তার ছুটি হয় নীরার অনেক আগে। হেনার নিজের একটি দল আছে। তাদের সঙ্গেই যায় আসে। দূরত্বও বেশী নয়, মিনিট দশ-বারোর পথ। নীরার ক্লাস নাইন। সে ভাল ছাত্রী। স্কলারশিপ পাবার খুব আশা। তাই স্কুল থেকে হেডমাস্টার ব্যবস্থা করেছেন ছুটির পর আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট কোচিং ক্লাসের। একা নীরা নয়—আর দুটি মেয়েও আছে। হেনা বাড়ি ফেরার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর সে বাড়ি আসে। একাই আসে। এই পাড়ারই মেয়ে এবং ভাল মেয়ে বলে সকলেই তাকে স্নেহ করে। সে পিতৃমাতৃহীনা সেও একটা কারণ। এবং সে কুশ্রী। সব থেকে বড় কারণ সে নিজে সাহস রাখে। দুঃসাহস। পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা তাকে বলে—এম-পি। অর্থাৎ মেয়ে-পুরুষ। কিন্তু মুখে বলে—মিলিটারী পুলিস।

সেদিন কোচিং ক্লাস সেরে বেরিয়ে এসে সে অবাক হয়ে গেল। হেনা একা চুপ ক'রে বসে আছে। মুখখানা শুকনো। তাকে দেখেই বললে—বাবাঃ—বসে আছি কখন থেকে!

নীরার বিস্ময়ের অবধি ছিল না।—বাড়ি যাস নি? বসে কেন?

অদ্ভুত রকমের হেসে সে বলেছিল, তোর জন্যে। তোর সঙ্গেই যাব।

—জেঠীমা বলেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

মনে মনে জেঠাইমার উপর তার ভালবাসা আবেগের উত্তাপে গাঢ়তর হতে চাইল। সে বললে—চল।

স্কুল থেকে বেরিয়েই গ্রামের বাজারের পথ। পাঁচটা বাজছে, লোকজন এসময়ে একটু বেশি। এখন এলাকাটা দমদম মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে এসেছে। ইলেকট্রিক লাইট হয়েছে। ওরা দুজনে গল্প করতে করতেই চলছিল। একাই কথা বলছিল নীরা। হেনাকে বলছিল ক্লাসের একটা গল্প। ইতিহাসের টিচার আজ পড়াতে পড়াতে রবীন্দ্রনাথের কোটেশন দিতে গিয়ে ভুল কোটেশন দিয়েছেন, সে তা ধরে দিয়েছে। অবশ্য আপনার ভুল হচ্ছে বলে ধরে দেয় নি। সে বলছিল—জানিস, কোট করলে, 'শক হুন দল মোগল পাঠান এক দেহে হল লীন।' আমি প্রথমটা কিছু বললাম না। বুঝলাম মোগল পাঠান বই আছে, খেলা আছে, সেইটেই ভদ্রমহিলার মনে আছে। ওঁর শেষ হলে বললাম, দিদিমণি কবিতাটার মিলটা কেন খারাপ করলেন? রবীন্দ্রনাথ আর হিস্ট্রীও উল্টোপাল্টা হয়েছে। শক হুন দল পাঠান মোগল হলে কেমন মিল হত আর হিস্ট্রীও ঠিক থাকত। আগে পাঠান তারপর তো মোগল এসেছে। দিদিমণি কিন্তু খুব ভাল মেয়ে। আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, ওটা তাই হবে। কবির ভুল নয় ওটা, ওটা আমারই ভুল—বুঝলি—। বলতে বলতে থেমে গেল সে, নীরা প্রশ্ন করলে—কি?

হেনা হঠাৎ যেন তার গায়ে এসে সেঁটে লেগেছে। হেনা উত্তর না দিয়ে বললে—মরণ!

বলেই সে তাকে রাস্তার দিকে ঠেলে দিয়ে এপাশে এল।

আরও বিস্মিত হল সে। হেনা খুব ভয় পেয়ে গেছে। কি হল? এবার নীরার চোখে পড়ল—একটি সাইকেলে চড়া ছেলে। ছেলেটি পাশ দিয়েই পার হয়ে গেছে এখুনি। এই মুহূর্তে সেই সাইকেলে চড়া ছেলেটিই গাড়িটা ঘুরিয়ে মন্থরগতিতে ইচ্ছে করে সাইকেলটাকে এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে চালিয়ে হেনার দিকে চেয়ে একটা বিশ্রী হাসি হেসে এগিয়ে আসছে। নীরা ভুরু কুঁচকে বললে, ও কে? তোর দিকে তাকিয়ে হাসছে কেন?

হেনা বললে, ওই ওরই জন্যে। ও আমায় জ্বালিয়ে খেলে। ইস্কুলের মেয়েদের সঙ্গে যাই, ও আমাকে যা-তা বলে। পিছু নেয়। সে তার লম্বা কাঠের মত হাতখানা চেপে ধরলে। নীরা অনুভব করলে কাঁপছে সে।

তবু প্রশ্ন করলে—কিন্তু ও কে? তুই চিনিস?

—ও মনা ঘোষ। থিয়েটার করে।

মনা ঘোষের নাম সে শুনেছে বটে।

মনা ঘোষ তখন কাছে এসে গেছে। প্যাডেলে একটু একটু ধাক্কা মেরে অতি মন্থর গতিতে এসে হেসে বললে, কি, আজ এত দেরি যে?

নীরা বললে, কি চান আপনি?

—তোমাকে নয় মণি। ওই ওকে!

মুহূর্তে এক কাণ্ড করে বসল নীরা—সাইকেল-আরোহীর দিকে এক পা এগিয়ে গিয়েই এক চড় কষিয়ে দিলে। মনা ঘোষ সাইকেল ছেড়ে গালে হাত দিতে গিয়ে সাইকেলসুদ্ধ পড়ে গেল। নীরা চিৎকার করে উঠল, লম্পট কোথাকার!

১৯৪৩ সালের কলকাতার শহরতলী। লোক জমে গেল। কিন্তু তার আগেই মনা ঘোষ উঠে সাইকেলটা নিয়ে চলে গেল—আচ্ছা, আমিও চিঠি নিয়ে ফাঁস করে দেব।

হেনা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছিল। এ রাস্তায় ওরা দুজনেই, বিশেষ করে নীরা, বিশেষ পরিচিত। তার ঢেঙাপনা ও শ্রীহীনতার জন্যও বটে এবং ওর ভাল মেয়ে বলে সুখ্যাতির জন্যও বটে। সে বললে, পথ ছাড়ুন, আমরা বাড়ি যাই। একটা কুকুরকে মেরেছি, তার জন্যে হৈ চৈ করছেন কেন? পথও সে করে নিয়েছিল। হেনার হাত ধরে সে হনহন করেই চলতে শুরু করেছিল। এবং ভিড় এড়াবার জন্য সদর রাস্তা ছেড়ে কুণ্ডুবাড়ির পিছন দিকের খানিকটা পড়ো জমির উপর পায়ে-চলা-পথ ধরেছিল। কিন্তু হঠাৎ হেনা হাত টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নীরা বলেছিল—কি হল? হেনা হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলেছিল, আমি কি করব নীরা, মা যে আমাকে কেটে ফেলবে!

—কেন?

—ওরে সবই তো জানাজানি হবে রে এরপর। ঢাকা তো থাকবে না। আমি যে ওর সঙ্গে মজা করবার জন্যে ইয়ার্কি করেছি, হেসেছি, ঠাট্টা করেছি।

শুম্ভিত হয়ে গেল নীরা। হেনা কেঁদে উঠল, ওরে আমার যে বিয়ে হবে না এরপর। আমার যে বিয়ের কথা হচ্ছে। আমায় তুই বাঁচা নীরা। কোন উপায় কর। আঃ, তুই

ওকে মারলি কেন ?

জায়গাটা বাড়ির কাছেই এবং একটু নির্জন। হেনা হাউহাউ করে কেঁদে বসে পড়ল। নীরা বললে, তুই বলবি তুই কিছু জানিসনে। নীরা জানে।

—ও চিঠি লিখেছিল, আমি যে তার উত্তর দিয়েছি। মনা ঘোষকে জানিসনে। আমি কি করলাম, আমি কি করব!

—কিছু করবিনে, বাড়ি চল। আমি সব দোষ ঘাড় পেতে নেব। ভাবে নি মুহূর্তের জন্য এবং এও মনে হয় নি যে তার উপর কেউ কোন মন্দ ধারণা করতে পারে। তার মনে হয়েছিল সে বলবে হেনা কিছুই জানে না। সে একলা আসত, ছেলেটা তার পিছন নিত, মন্দ কথা বলত। তাই সে আজ হেনাকে বলেছিল, তুই একটু থাকিস তো ভাই। একসঙ্গে যাব। ইচ্ছে ছিল হেনাকে সাক্ষী রেখেই সে তাকে শিক্ষা দেবে।

—আমি যে চিঠি লিখেছি!

—চিঠি ও দেখাতে আসবে না। এত সাহস হবে না।

—হবে। ও মনা ঘোষ। তুই জানিসনে!

এক মুহূর্ত কি কয়েক মুহূর্ত সে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়েছিল। প্রেম—পুরুষের প্রতি কিশোরী হৃদয়ের অনুরাগ ও আকর্ষণ, ফুল ফোটার মত দেহমনের যে অনিবার্য চঞ্চলতা এ সম্পর্কে কোন অনুভূতি উপলব্ধি তার ছিল না। না ছিল না। ফুল না-ধরা কাঁটা গাছের মত তার জীবন। আয়নায় সে নিজেকে দেখেছে আর তার মনে হয়েছে সে কি কুশ্রী! বাড়িতে শুনেছে—বাইরে শুনেছে। পথে চলতে চলতে মনে হয়েছে—লোক তাকে দেখে ভাবছে কি কুশ্রী মেয়েটা! চিত্ত তার কঠিন হয়েছে। কপালে কোঁচকানো রেখার সারি দেখা দিয়েছে। মনে মনে এঁকে সে চেষ্টা করে ঘৃণা করতে শিখেছে এবং পেরেছে। দুরন্ত ঘৃণা হয়েছিল হেনার উপর।

মনে পড়ছে—চকিতের জন্য মনটা হেনার এই চোখের-জলে-বুক-ভাসা অসহায় অবস্থা দেখে খুশীও হয়ে উঠেছিল। তারপরই সে মাথা নাড়া দিয়ে নিজেকে তিরস্কার করে অভয়-দাত্রীর মত তাকে অভয় দিয়ে বলেছিল—কোন ভয় নেই তোর। ওঠ। সব ভার আমার। তার মনে অপার সাহস—অফুরন্ত বল—সে এ সবের ঊর্ধ্বে। এত ঊর্ধ্বে যে কেউ কাদা ছুঁড়তে সাহস করবে না। এবং কল্পনা করেছিল—তার এই সাহস—মনাকে চড় মারার জন্য —জেঠাইমা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলবেন—তুই আমার মহিষমর্দিনী!

হেনা তবু ওঠে নি। বলেছিল—ওরে আমার চিঠি আছে ওর কাছে। মজা করবার জন্যে, দিব্যি ক'রে বলছি নীরা—মা কালীর দিব্যি। দক্ষিণেশ্বরের কালীর দিব্যি।—নীরা বলেছিল—বেশ, তাও বলব, আমি লিখেছি তোর নাম দিয়ে। তোর লেখা নকল করে। বলব, আমি ওকে একটু মজাই দেখাতে চেয়েছিলাম। পেছনে লাগে—তাই মারব বলে এই করেছি।

হেনা সকরুণ মুখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল—দিব্যি কর!

—করছি। ভগবানের দিব্যি।

—না। দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর দিব্যি কর।—দক্ষিণেশ্বরের মা কাল হেনার কাছে সাক্ষাৎ দেবতা। অলজ্জণীয়া। কিন্তু সে তখন ঈশ্বরে দেবতায় অবিশ্বাসিনী। সে হেসে বলেছিল—হ্যাঁ তাই করছি। এবং তাই করেছিল। বাড়িতে এসেও তাই বলেছিল। কারণ বাড়িতে ততক্ষণে খবর পৌঁছে গেছে। জেঠীমা দোরগোড়ায় থমথমে মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

* * *

জেঠাইমা শুনে তার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। যেন বিশ্বাস কিছুতেই হচ্ছিল না। হঠাৎ এগিয়ে এসে নিজের পা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, পা ছুঁয়ে দিব্যি কর!

সে তাই করেছিল। নীরার কিশোর মনে যেন একটা আত্মত্যাগের নেশা লেগেছিল। আবার আশ্চর্য নাটক ঘটে গেল। জেঠীমা বুকে জড়িয়ে ধরলেন না, পাগলের মত ওকে চুলের মুঠো ধরে মারতে শুরু করেছিলেন। সে তার কল্পনার এই সম্পূর্ণ বিপরীত সংঘটনেও বিচলিত হয় নি; স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাঁদে নি। জেঠীমা আশ্চর্য মানুষ! তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, নীরা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে মিথ্যা বলতে পারে। এবং তাঁর বিশ্বাসমত এই কৌতুকের ছলে যে পাপ করেছে নীরা—তাও অমার্জনীয়। অবশ্য তার সঙ্গে তাঁর চিরকালের বিদ্বেষ যা এতকাল ঝাঁপিবন্দী সাপের মত বন্দী ছিল—সেটাও ছাড়া পেয়েছিল।

জ্যাঠামশায়ও বিশ্বাস করেছিলেন কিনা সে বলতে পারে না। তাতে নীরার সন্দেহ আছে। কারণ তিনি অবিলম্বে হেনার বিয়ে দেবার ব্যবস্থায় লাগলেন।

সে উঠে-পড়ে-লেগে বিয়ে দেওয়া। টাকা তাঁর তখন অনেক। তবুও তিনি বেশি টাকা খরচ করবেন। হেনা বিয়ের সম্ভাবনায় খুব উজ্জল হয়ে উঠেছিলো। আর সে তার কলঙ্কের পসরা মাথায় করে হল বন্দিনী। সব হারাতে হয়েছিল। জেঠীমাকে হারিয়েছিল, পড়ার সুযোগ হারিয়েছিল—

ইস্কুলেও আর তার ঠাঁই হয় নি। মনা ঘোষ চড়ের শোধ নিতে তার কথাটাই সত্য বলে ঘোষণা করেছিল।

বাড়িতে বন্দিনীর মত জীবন হল। জেঠীমা সত্যই তাকে বন্দিনী করেছিলেন। শুধু বন্দিনী নয়। অস্পৃশ্য—অপবিত্র বলে বাড়ির একপাশে নির্বাসিত হয়েছিল সে। থাকত তাদের ভাগের রান্নাঘরটায়। চুপচাপ বসে সে ভাবত আর বই ওল্টাতো। ওইটে সে কোন দুঃখ-হতাশায় ছাড়তে পারে নি। অনুশোচনা করে নি। কিন্তু ভাবত, এ হল কি! এতটা তো সে ভাবে নি। এরই মধ্যে একদিন হল জ্বর। তারপর চেতনা হারাল। তারই মধ্যে যখন খানিকটা চেতনা হয়েছে—তখনই দেখেছে পাশে বসে হেনা।

আশ্চর্য! এতেই সেই রোগের অসুস্থতার মধ্যেও সে এক অদ্ভুত সান্ত্বনা-সুখ পেয়েছিল। না, হেনা তো অকৃতজ্ঞ নয়। এই তো তার অনেক পাওয়া।

বত্রিশ দিন পর সে পথ্য পেয়েছিল। তখন তার কঙ্কালসার কুৎসিত কালো চেহারা।

কালো রঙ আরও কালো হয়েছে।' এর উপর দিন বিশেকের মধ্যে মাথার চুলগুলি প্রায় সব উঠে গেল। তার পরেই হল পনের দিনের মধ্যে হেনার বিয়ে। সে মহাসমারোহের বিয়ে।

সে বের হয় নি। কিন্তু তার উপর জেঠীমা তার ঘরের দরজায় তালা দিয়েছিলেন। কি জানি তাকে নিয়ে কেউ যদি কোন কথা তোলে। ইঙ্গিত করে। তা ছাড়া জেঠীমা, বিচিত্র জেঠীমা—তাঁর কাছে নারীজীবনের এইটেই সব থেকে বড় এবং হয়তো একমাত্র অপরাধ! সে অচ্ছুত।

কোলাহল কলরব রসুনচৌকির বাতাবরণের মধ্যে সে ঘরে বই খুলে বসে থাকত। তার প্রাইজের বইগুলি পড়ত। নটা ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে—খান তিরিশেক বই। বাংলা, ইংরিজী। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানের নানারকম বই। রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা, বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', ইংরিজী পৃথিবীর ইতিহাস—এই পড়ত বেশি। মধ্যে মধ্যে পড়ত ইংরিজী এলিস ইন দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড। খুব যখন ভার হত মন—তখন পড়ত প্রেমেন মিত্তিরের ছেলেদের গল্প আর শিবরামের ছেলেদের গল্প—ওগুলো পেয়েছিল নিচের ক্লাসে।

ওই বিয়ের সময় থেকেই পড়া আরম্ভ করেছিল। পৃথিবীর ইতিহাস দিয়ে শুরু। এইখানে নীরার জীবননাট্যে দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষ।

শেষ হয়েছিল এইভাবে।

হেনা শ্বশুরবাড়ি যাবে। রসুনচৌকি বাজছে। সানাইয়ের সুর উঠেছে। কলকল করছে বাড়িটা।

হঠাৎ হেনা এসে ঘরে ঢুকল।

—নীরা!

—হেনা?

হেনা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বলেছিল—তোর কি হবে নীরা!

নীরা কি বলবে ভেবে পায় নি। তবে কাঁদেও নি। হেসেও কিছু বলতে পারে নি।

জেঠীমা হেনা-হেনা বলে ডাকতে ডাকতে ঘরের সামনে এসে প্রশ্ন করেছিলেন—কে খুললে ঘরের তালা?

বলে উত্তরের অপেক্ষা করেন নি—ঘরে ঢুকে হেনার হাত ধরে টেনে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন—শুভক্ষণ পার হয়ে যাচ্ছে, চল।

বেরিয়েই ঘরে তালা দিয়েছিলেন।

নীরা এবার একটু হেসেছিল—তারপর বই খুলে বসেছিল—পৃথিবীর ইতিহাস। শেষ হল দ্বিতীয় দৃশ্য।—

চার

তৃতীয় দৃশ্যের পটভূমি গাঢ় অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। পাঁচ বৎসরব্যাপী দ্বিতীয় দৃশ্যের পর তৃতীয় দৃশ্য।

এবার গোটা বাড়িটা নয়। রঙ্গমঞ্চের এক কোণে নীরার বন্দী-জীবনের ঘরখানা। বাড়ির এক কোণের ঘর। বাকী বাড়িটায় এখন উৎসবের সজ্জা খোলা হচ্ছে। সেদিকটা এখন অন্ধকারই থাক। আলো ফেল নীরার ঘরে।

হেনার বিয়ের পর।

হেনা চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। ফিরে এল স্বামীর সঙ্গে হাসিমুখে। নীরা ঘরে বসে কথা-বার্তার হাসির ধ্বনি শুনতে পায়। সে প্রায়-অন্ধকার ঘরে বসে বই পড়ে আর উঠানের দিকে যে জানালাটা সেই দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখে। বাইরের দিকে জানালা নেই বলেই এঘরে তাকে রেখেছেন জেঠাইমা। বাইরে থেকে যদি মনা ঘোষ পত্র ছুঁড়ে দেয়, সে উত্তর দেয়, কথা বলে! আকাশের দিকে তাকিয়ে ছেলেবেলার ছড়া মনে পড়ে নীরার, এক তারা নাড়াখাড়া—।

বাইরে আনন্দকলরব ওঠে। জামাই এসেছে। জ্যাঠামশাইয়ের গলার সাড়া পাওয়া যায়। জামাইয়ের সামনে ভারিক্কি বড়লোকী চালে কথা বলেন। অজিতদা, সুজিত, অন্য ভাইরা দল বেঁধে উল্লাস করে উপরের ঘরে উঠে যায়। উপরের ঘর কখানা এই বিয়ের আগেই শেষ হয়েছে। নীরা শুনেছে মোজেইকের মেঝে হয়েছে। বিয়ের সময় মেঝে শুকিয়ে নেবার জন্যে নাকি চারটে খুব বড় স্ট্যাণ্ডিং ইলেকট্রিক পাখা কেনা হয়েছিল—পাখা চারটে সপ্তাহখানেক চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরেছিল। উপরের ঘরেই হেনা, তার বর এবং জেঠীমার ছেলেরা থাকে। রেডিয়ো বাজে। হারমোনিয়ম বাজিয়ে হেনা গান করে।

হেনা এসে অষ্টমঙ্গলা সেরে আবার চলে গেল। একদিন মাত্র উঁকি মেরে বলেছিল—কেমন আছিস নীরা!

নীরা বলেছিল—ভাল। তুই?

—সে বলিস নে। দিনরাত্রি ছাড়বে না। খেয়ে ফেললে আমাকে। বলে হেসে উঠল।

নীরা একটু হাসল। বললে—যা—এখুনি হয়তো খুঁজবে। নয় জেঠাইমা দেখতে পাবে।

—পরে আসব, হ্যাঁ! বলেই সে চলে গেল। পালিয়ে বাঁচল। নীরারও ভাল লাগছিল না।

যদি বল ঈর্ষা—তবে বলো। নীরা কিছু বলবে না। কিন্তু এইটুকু বলবে—সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, স্নেহ-প্রেমের অস্তিত্ব আলোছায়ার মত একটার সঙ্গে অন্যটার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক হলেও, ওর উপরেও এই বাস্তব মাটির জগতের মতই একটা অতি সত্য জগৎ আছে। Thy need is greater than mine বলে মরুপ্রান্তরে যে নিজের মুখের জল অন্য তৃষ্ণার্তকে

দিতে পারে—তার মৃত্যু ওই মরুভূমিতে জলাভাবেই ঘটে—দেহের কষ্টও হয়, নিশ্চয় হয়, কিন্তু মনের কষ্ট কি অনুশোচনা হয় না—এটা নীরার কাছ থেকে শুনে রাখ।

জেঠীমা কঠিন নিষ্ঠুর। তাঁর কাছে এ অপরাধের ক্ষমা ছিল না। অসুখের সময় বলতেন, ও মরে যাক। ও মরে যাক।

সে-কথা অসুখের ঘোরের মধ্যেও তার দু'চারবার কানে গেছে। মনে আছে তার। রোগ সারলে বলতেন—জীবনে যার দুর্ভোগের জন্যে জন্ম, মরণও তার হয় না! যম নিতে আসে—ওই দুর্ভোগ তার পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে, না, আমার শিকার তুমি পাবে না। দুর্ভোগের সহায় যে নিজে ভগবান। যমকে ফিরে যেতে হয়। সৌভাগ্য যাদের, সুখ যাদের, তাদের বেলা ভগবানের অন্য বিচার। আয়ু থাকতেও তারা মরে। সে মরণ তাদের মোক্ষ যে!

কখনও কখনও বলতেন, তুই যদি আমার পেটের মেয়ে হতিস, ওই হেনা যদি এই কাজ করত, তবে বিষ দিয়ে আমি মেরে দিতাম।

আবার বলতেন, ভাবতাম আমি হেনার জন্যে। ওর জন্যে তো ভাবনা হয় নি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতেন, এ ওই ক্রীশ্চান ইস্কুলের শিক্ষার ফল!

নীরা বেশ একটি নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে শুনেই যায়। হাসে। হাসিটি বিষণ্ণ বটে, বিক্ষুব্ধ নয়। কারণ একটা আশ্চর্য অনাবিল আত্মপ্রসাদ ছিল। তা ছোট ভেবো না। ভাবলে ভাবতে পার। তা হলে তুমি জেঠাইমা থেকেও সংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাসে বদ্ধ এবং অন্ধ। কারণ জেঠাইমার সংস্কারেও তবু একটা আদর্শ আছে। তোমার সংস্কার সেক্ষেত্রে বাস্তবতার দোহাই দিয়ে 'চোরের—সবাই চোর ধারণার মত' নীচ এবং কুটীল।

ও-বিশ্বাসে পৃথিবীতে ক্ষুধা আর খাদ্য—কাম আর নারীপুরুষের দেহ ছাড়া আর কি আছে, বলো? শুধু ভাব-ভাবনার ক্ষেত্রেই নয়। বস্তুজগতেও তো তা হলে খাদ্য আর দেহ ছাড়া কি প্রয়োজন? জন্তুর আলো লাগে, না ঘর লাগে, না শিল্প লাগে, না সাহিত্য লাগে?

* * *

* * *

যাক।

ধীরে ধীরে এবার রঙ্গমঞ্চটার আলো ফুটে উঠছে।

বিয়ের উৎসবের সাজ খোলা হয়ে গেছে, তবুও জ্যাঠামশায়ের ভোল পাল্টানো বাড়িখানা রঙে গড়নে মনোহারী দেখাচ্ছে। জানালা দিয়ে দেখা যায় নতুন তৈরী সিঁড়িটা। সম্পূর্ণ হালফ্যাশনের। বিশেষ করে সিঁড়ির পাশের ঘের বা রেলিংটা। চমৎকার লাগে। ওখানে স্বীকার করতে হয়—জ্যাঠামশায় পয়সার সঙ্গে সত্যিই বড়লোকী রুচিও পেয়েছেন। ওই সিঁড়ি দিয়ে দুড়বুড় করে জাঠতুতো ভাইরা নামে ওঠে। সকলের পরনেই চমৎকার কাপড়চোপড় মানে পোশাক। ধুতি-পাঞ্জাবি নয়, স্যুটের রেওয়াজ বেশী হয়েছে। অজিত, সুজিত তো পরেই, তার ছোট রণজিৎও পরছে। কারণ সেও এবার ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে। তার ছোট অভিজিত এখনও হাফপ্যান্ট পরছে। তবে তাও বেশ দামী। সুজিত তার থেকে বয়সে বড়,

কিন্তু ফেল ক'রে ক'রে ক্লাস টেনেই ঠেকে রয়েছে। তাতে তার দুঃখ নেই। পড়াও সে ছাড়তে চায় না। কারণ সে খেলা নিয়েই মেতে আছে। নিত্য অপরাহ্নে খেলার পোশাক পরে ছোটে। দমদমে নয়—কলকাতার মাঠে। ফেরে রাত্রি সাড়ে আটটা নটায়। জ্যাঠামশায় আপিসে তাকে ঢোকাতে চান, সে ঢুকছে না, তাতে নাকি খেলায় অসুবিধে হবে।

অজিতদা ফেরে আরও রাত্রে। সে আপিসের ছোটবাবু। মধ্যে মধ্যে জড়িত স্বরে উচ্চকণ্ঠে কথা বলে।—I don't care. বলতে হয় বাবাকে বল—that old husband of yours, ask him, সে-ই আমাকে পাঠিয়েছিল—হোটেলে সাহেবদের এণ্টারটেন করতে। তাকে জিজ্ঞেস কর!

নীরা বুঝতে পারে—অজিতদা নিজের মাকে বলছে। তিনি কিছু বলেছেন। হয়তো জড়িত কণ্ঠস্বরের কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন।

জ্যাঠামশায়ের কথাও শুনেছে।—দেখ ব্যবসা করতে হয়। মুদীর দোকান নয়। ধান-চালের আড়ত নয়। বিলিতী ব্যবসা। পার্টি বাগাতে হোটেলে খাওয়াতে হয়। হ্যাঁ হয়, টাকা এমনি আসে না। মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাক।

নীরা শুনেই যায়।

জেঠীমায়ের আদর্শ সে জানে, এর পর আর তিনি কথা বলবেন না। বলেনও না। তবে মধ্যে মধ্যে এক-আধদিন বলেন, দেখ নিজে ওই বলে খেতে শুরু করেছো এখন নিত্যি। না হলে চলছে না—

জ্যাঠামশাই বলেন—নইলে বুড়ো বয়সে এনার্জি পাব কোথায়? শরীরটা তো বাঁচাতে হবে। এবং ওটা ওষুদ। ডাক্তারের প্রেসক্রুপশন-মতই খাই। তুমি নিজে মেপে ঢেলে দাও। ইচ্ছেমত তো খাইনে। আমার এখন অনেক কাজ, বাঁচতে হবে, বুঝেছ!

হঠাৎ নাটকে নাটকের মতই নাটকীয়ভাবে গতি দ্রুত এবং ধ্বনি উচ্চ হয়ে উঠল। রাত্রে সেদিন জ্যাঠামশাই স্খলিত স্বরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ঘরে ঢুকলেন।

—ফরটিফাইভ থাউজ্যাণ্ড্! পঁয়তাল্লিশ হাজার! নেট প্রফিট!

তোল একশো এক টাকা পুজো!

নীরা সেদিন একটু চকিত হয়ে উঠল। জ্যাঠামশাই!?

আজ শব্দ শুনতে পেল—ঠাস্ ঠাস্ ঠাস্! সঙ্গে সঙ্গে জেঠীমার কণ্ঠস্বর—এই—এই—এই! কপাল! হায় রে কপাল!

চীৎকার করে উঠল জ্যাঠামশাই—শাট আপ! বুড়োমাগী কপাল চাপড়ায় না। এই নে—এই নে! গুনে নে পঞ্চাশ হাজার টাকার করকরে নোট! নে নে!

—ও কি হচ্ছে কি? নোটের বাণ্ডিলগুলো—।

—নে নে নে!

—আঃ!

—কেয়া আঃ! কিসের আঃ! মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাক। মিলিটারী সাহেব, তারা মদ খাওয়ালে খুশী হয় না, তাদের সঙ্গে খেলে তবে হয়। ভাবে ঘেন্না করছে।

দমদমের ওপাশের জলো জমি কিনেছিলুম আড়াইশো টাকা বিঘে, ওরা দর ঠিক করেছিল দু হাজার টাকা বিঘে, পার্টি দিয়ে ওদের সঙ্গে ক'গেলাস খেয়ে আড়াই হাজার বিঘে করেছি। কুড়ি বিঘে জমি, টোয়েন্টি ইনটু টোয়েন্টি ফাইভ হাণ্ড্রেড—ফিফ্‌টি থাউজ্যাণ্ড! নেট প্রফিট ফরটিফাইভ থাউজ্যাণ্ড! এখনও পনের বিঘে আছে। ঝাড়ব। মওকা পেলেই ঝাড়ব!

জেঠীমা চুপ করে গেছেন। নীরা জেঠীমার আদর্শ জানে। কতবার শুনেছে। তিনি হেনাকে শিক্ষা দিতেন। বিশেষ করে বিয়ের আগে, তার অর্থাৎ হেনার কলঙ্ক নীরার স্বেচ্ছায় মাথায় নেওয়ার পর হেনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তার চুলের গোছা মুঠোয় ধরে বলে যেতেন —বেটাছেলের কাছে হিসেব নিয়ো না। কাজ ওদের—ধর্ম মেয়ের। ভগবানে ভক্তি আর মেয়েধর্ম—এই দুয়ের ওপর সংসারের ভাল-মন্দ; পৃথিবী ওতেই শীতল—বাসুকি ওতেই স্থির। পুরুষে টাকা আনে—জিজ্ঞেস করো না—কোথা থেকে আনলে? রাজলক্ষ্মী রাজ্য নিয়ে হানাহানি করুক, কুরুক্ষেত্র হোক, কৌরব যাক পাণ্ডব রাজা হোক, সংসারে গেরস্ত লক্ষ্মী মেয়ের হাতে মেয়ের ধর্মে স্থির। তাতেই সৃষ্টি থাকে, পৃথিবী বেঁচে থাকে।

শেষে কোটেশন তুলতেন রামায়ণ থেকে, রামায়ণ পড়ে দেখ। ব্রাহ্মণের ছেলে রত্নাকর দস্যুবৃত্তি করত। একদিন নারদ আর ব্রহ্মা এলেন, তাকে বাল্মীকি ঋষি করতে হবে। রত্নাকরকে বললেন—ভাল, তুমি যে এই দস্যুবৃত্তি নরহত্যা করছ, এর পাপের কথা ভেবেছ? রত্নাকর বললেন—ঠাকুর, এ পাপের ফল আমরা গোটা সংসার মিলে ভোগ করব। একসঙ্গে থাকব যেখানেই থাকি। ভাবনা কি? ব্রহ্মা বললেন—উঁহু, তুমি জিজ্ঞাসা করে এস তোমার সংসারকে। রত্নাকর নারদ আর ব্রহ্মাকে গাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যে এই দস্যুবৃত্তি নরহত্যা করে টাকা আনি, সোনা আনি, নানা জিনিস আনি, এর যে পাপ, তার অংশ তোমরা নেবে তো? স্ত্রী-বাপ-মা-বোন-ছেলে সবাই বললে, না। তুমি কোথা থেকে কি করে উপার্জন কর তা আমাদের দেখার কথা নয়। সে দায় তোমার। স্ত্রী বললেন, আমি তোমার সেবা করি, সুখী করি তোমাকে, তোমার সন্তান গর্ভে ধরি—সেই দায় শুধু আমার। বাপ-মা বলেন—বাল্যকালে তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছি, আমাদের দায় চুকে গেছে। ছেলে বললে—তুমি বুড়ো হলে তোমাকে খাওয়াবার দায় আমার। তোমার দায় তোমার, তার জন্যে কোন প্রশ্নও নেই, তার পাপ-পুণ্য কিছুর ভাগই আমরা নেব না। বুঝলে মা, এই হল ধর্মের শিক্ষা। ভুলো না। তোমার বাপ আজকাল মদ খেয়ে বেসামাল হয় কখনও কখনও, কিছু বলি নে। শুধু সংসারের মধ্যে মেয়েদে ভার আমার। আমি তাই নিয়ে আছি। তোর দাদাও মদ খায়। বলি নে কিছু। হয়তো আরও দোষ ঘটেছে। বিয়ে করতে বলি, করতে চায় না। বুঝি।

সেই জেঠীমার জ্যাঠামশায়ের ওই কথার পর চুপ না ক'রে উপায় কি? উঠানের দিকের ওই একমাত্র খোলা জানালাটাও সে সেদিন বন্ধ করে দিয়েছিল।

পরের দিন স্নান করবার সময় বাইরে এসে দেখেছিল—পুজোর উদ্যোগ হয়েছে—সে অনেক।

জ্যাঠামশায় গরদের কাপড় পরেছেন। জেঠীমাও। আজ রবিবার। পুজো নিয়ে যাচ্ছেন

দক্ষিণেশ্বরে। তিনি উঠানের মাঝ-বরাবর আঙুল দেখিয়ে বলছেন—সোজা পাঁচিল টেনে দেব। বেশ উঁচু করেই দেব। থাকবে ওদিকটা যেমন ওর আছে। আমাদের এদিকটা হবে পিছন—পিছন দিকটা হবে সামনে। ওই দিকটায় ফেন্সিং করে এদিকটা জুড়ে নেব পেছনে।

তাকে দেখেও তিনি থেমে যান নি। বরং বলেছিলেন—কি কাজ আমার ভাইঝির বাড়ির অংশ নিয়ে! ন্যায্য মূল্য দিয়ে কিনলেও লোকে দুর্নাম করবে। ঘোষেরা দাম বেশী চাচ্ছে। তাই দেব।

নীরা বুঝতে পেরেছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মুনাফা তাঁকে দক্ষিণ পাশের ঘোষেদের বাড়ি কিনতে উৎসাহিত করেছে। কিনবেন বা কিনছেন।

বাথরুমে স্নান করতে করতেই সে শুনতে পেলে মোটর থামবার শব্দ। জ্যাঠামশাই এক-খানা পুরনো মোটরও কিনেছেন। শুনেছে—বাইরের দরজায় পিতলের নেমপ্লেট বসানো আছে। এইচ সি মুকুরজী। কণ্ট্রাক্টর এ্যাণ্ড মারচেণ্ট। আর একটা কাঠের প্লেটে আছে এইচ সি মুকুরজী, ইন্ আর আউট, তার নিচে এ কে মুকুরজী, ইন আর আউট। নিচে খানিকটা জায়গা খালি আছে সেখানে, সুজিতের নাম উঠবে—এস কে মুকুরজী। গাড়িখানা এসে থামল। এবার ওঁরা যাবেন। না, ও কে? কার গলা?

—এ্যাঁ, আমি কিন্তু একখানা গয়না নেব, হ্যাঁ!

হেনা। হেনার গলা। হেনা এসেছে। সেও যাবে পুজো দিতে। এখানা তা হলে হেনার বরের গাড়ী।

স্নান সেরে বেরিয়ে নীরা আপনার ঘরে গিয়ে ঢুকল। হেনাই বটে। সঙ্গে তার বর। চোখোচোখি হল বারেকের জন্যে। কিন্তু তার চোখে নীরাকে সে যেন দেখতেই পেলে না। নীরা হাসলে একটু। ঘৃণার হাসি। একবার মনে হল সে বের হবে নাকি এই নাটকীয় মুহূর্তে! বলবে আমি স্বেচ্ছায় বিনাদোষে বন্দিনী হয়েছিলাম, আজ মুক্তি নিলাম। কলঙ্ক আমার নয়, কলঙ্ক ওই পচা মেয়েটার!

সেই মুহূর্তেই শাঁখ বেজে উঠল বাড়িতে। শাঁখ? পুজো দিতে যাচ্ছে শাঁখ বাজিয়ে? কই, সাধারণতঃ তো যায় না। তবে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তো কম নয়!

রঞ্জিৎ অভিজিৎ সমস্বরে বলে উঠল—সন্দেশ, সন্দেশ!

সুজিত বললে—নো সন্দেশ। চাঙোয়ায় ডিনার।

বেলা তিনটে নাগাদ ফিরল ওরা। তারপরই হেনা এসে ঘরে ঢুকল—নীরা! উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকিয়েছিল নীরা তার দিকে। রাগে তো তার সর্বাঙ্গ রি-রি করছিল।

হেনা সে গ্রাহ্যই করল না। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলেছিল—ওরে নীরা আমার, আমার ছেলে হবে রে!

নীরা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। হেনার ছেলে হবে, খুশী হয়েছিল কিনা ঠিক বলতে পারবে না। তবে তার বিক্ষুব্ধ মনটা কেমন শান্ত হয়ে পড়েছিল।

* * *

হেনাকে সে ক্ষমা করেছিল সেদিন—অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। কার্যকারণ এবং যুক্তি-যুক্ততার দুনিয়ায় যাকে স্বাভাবিক বলে—সেভাবে স্বাভাবিক নয় বা না হতে পারে, বা হতেও পারে সে নীরা জানে না, তার নিজের মনের স্বভাবের দিক থেকে বলছে—স্বাভাবিকভাবে হেনাকে ক্ষমা করেছিল। বা ক্ষমা এসে গিয়েছিল। হেনা বিনো সেন নয়—সে অজ্ঞান পাপী। বিনো সেন জ্ঞানপাপী। তিনি অজগরের মত নিঃশ্বাস দিয়ে টেনে টেনে তাকে কাছে এনে পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরে গ্রাস করতে চেয়েছিলেন। বিনো সেন তাকে ব্যঙ্গ করে বলে—নাটক করে গেলে! হাঁ, নীরার জীবন নাটক এবং সে নাটকে তুমি বিনো সেন যে ক'জন ভিলেন এসেছে তাদের নায়ক!

থাক—ক্রম ভঙ্গ হচ্ছে।

হেনা আনন্দে গলছিল সেদিন। এবং তার জীবনের সেই বিগলিত ধারায় তাকেই সে স্নান করাতে চেয়েছিল। বোধ করি কৃতজ্ঞতাবশেই করেছিল। আরও একটা কারণ ছিল, হেনার চরিত্রের মধ্যে যে একটা কদর্য ভীরু স্বৈরিণীপনা ছিল—তার কথা মুখে বলে উল্লসিত হবার মত লোক আর কেউ ছিল না। জেঠীমার কাছে বলতে বোধ করি সাহস করত না।

সেদিন সে আর শ্বশুরবাড়ি ফেরে নি। বর ফিরে গিয়েছিল। বিকেলবেলা অজিতদা আর সে বেরিয়ে গিয়েছিল, সিনামা দেখে অজিতদা ফিরবে—বর বাড়ি চলে যাবে—দু দিন পর এসে নিয়ে যাবে হেনাকে।

হেনা বরকে বিদায় দিয়ে ফিরে এসে ধপ ক'তে বসে বলেছিল—আয়—এ ঘরে নয়। উপরে আয়—এ ঘরে মানুষ থাকে!

—না, তুই যা বরং। আমি একটু পড়ি।

—পড়বি!

হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, বলেছিল—এ দুঃখ তোর আমার জন্যে।

—হোক, আমার দুঃখ কাটবে একদিন—তোর হলে কাটত না। তুই সইতে পারতিস নে। তুই বরকে নিয়ে সুখী হয়েছিস—ভালবাসে—

—ছাই রে ছাই! মিছে কথা। সব মুখে।

—কি বলছিস যা-তা!

—ঠিক বলছি। তোরা হলে ধরতে পারতিস নে—আমি বাবা হেনা, আমার কাছে চালাকি!

খুক্ খুক্ করে হাসতে শুরু করলে সে।

—হাসছিস কেন?

—কেন? সে যা কাণ্ড! লোকটা ভারী চালাক। জানিস, সিগারেট ছাড়া কোন নেশা করে না। কিন্তু ভারী খারাপ চরিত্র। সন্ধ্যাবেলা কোন দিন বাড়ি ফেরে না। ব্যাপার কি? জিজ্ঞাসা করি তো বলে—ভুরু কুঁচকে বলে—কিসের ব্যাপার কি! বলি—নরম হতে হয় ভাই—হয়ে বলি—ছুটি তো অনেকক্ষণ হয়েছে। থাক কোথায় এতক্ষণ? বলে—কোথায়

থাকব! থাকি চুলোয়—যেখানে ইচ্ছে। আমি ভাই চুপ করে যাই। অথচ গায়ে যেন কেমন-কেমন গন্ধ। ব্যাটাছেলের গায়ে মেয়েদের গায়ের মত গন্ধ। সিগারেটের গন্ধের সঙ্গে মিশিয়ে আর এক রকম। চুপ করে গেলে বলে—সারাদিন আপিসে থাকি—বেরিয়ে ময়দানে একটু বেড়াই। তারপর উপরি পাওনাগুলো আদায় করতে হয়, এনগেজমেণ্ট থাকে। মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাক। বেশ তাই তাই। কিন্তু পুরুষকে জানি তো! ওরে মনা ঘোষ সবাই! রকমফের। ভদ্র-অভদ্র। তারপর বুঝলি, একদিন—।

বসে খিলখিল করে হাসতে লাগল হেনা।—"সে বুঝলি—." হি-হি-হি-হি।। —হি-হি-হি-। গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলেছে—গেঞ্জি খুলবে—ধবধবে সাদা সিল্কের গেঞ্জিতে চুলের তেলের দাগ—আর এই একগাছা লম্বা চুল! খপ করে হাত চেপে ধরেছি। এ কি। বলে—কি? কি? এই যে লম্বা চুল আর গেঞ্জিতে দাগ! তখন বুঝলি, ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল ভ্যাবাগঙ্গারাম। আমি তখন খুব জোর পেয়েছি। খুব ইস্ক্রুপ টাইট করছি। তখন একেবারে মুখোশ খুলে দাঁত বের করে বলে—বেশ করেছি; রোজগার করি—করেছি! তোমার বাপের পয়সায় করি নি। আমি চ্যাঁচাতে লাগলুম। তখন বলে চুপ-চুপ। বাপকে খুব ভয় তো! হুঁ-হুঁ, শুধু বাপ নয়—আপিসের বড়বাবু। আর খুব কৃপণ। মাইনের টাকা তো হাতে দেয় না। তার উপর বাইরের রোজগারেরও হিসেব নেবে। বলবে, ওই ঠিকেদারের বিলের দরুন কত নিয়েছিস, ওই পার্টির কণ্ট্রাক্টের দরুন? হলে হবে কি, বাজার যে যুদ্ধের। দু হাতে রোজগার। ঘুষের টাকার হিসেব আছে, না ধরা যায়! এক এক দিন চার-পাঁচশো টাকার নোট পকেটে থাকে। তবে একশো দেড়শো, এই নিত্য। ওদিকে আপিসে মেয়ে কেরানী, সন্ধ্যার পর তো ধর্মতলায় মেয়েদের মাইফেল। করব কি? ওই করি আর কি! এবার বলেছি, যা করবে করগে যাও বাবু, ছোট নজর করো না আর বাঁধা পড়ো না। তা পড়বে না। সেদিকে হুঁশিয়ার আছে। আর নজরও ছোট নয়, সে গায়ের গন্ধে বুঝতে পারি। গায়ে একটা গন্ধ পাই। সেদিন বললাম, কি ব্যাপার কি বল তো? বলে—কি? বল না, কোথায় গিছলে? দিব্যি করে বলছি কিছু বলব না। গন্ধটা কেমন অচেনা লাগছে মনে হচ্ছে! বললে, কি, শুনি? বললাম, মেট্রোতে গিয়ে মেমসাহেবের পাশে বসলে এই রকম গন্ধ পাই। হেসে সারা। বলে, বাপ-রে! তুমি বাবা শার্লক হোমস। ঠিক ধরেছ। পার্ক স্ট্রীট এরিয়ার গন্ধ। বললাম, কত টাকা লাগল? ঈশ্বরের দিব্যি, আমার নট-এ ফার্দিং! একটা পাঞ্জাবী ঠিকাদার, সে নিয়ে গিয়েছিল।

এখানেও থামে নি হেনা। মনের খুশীতে বলেই চলেছিল—এখন একটা কম্প্রোমাইজ ক'রে নিয়েছি—যেখানেই যাও, নিচু জায়গায় যাবে না। আর দশটার বেশী রাত করতে পাবে না। তিন দিন আটটায় ফিরে আমাকে নিয়ে নাইট শোতে সিনেমায় যেতে হবে। আর মাসে একশো টাকা আমাকে লুকিয়ে দিতে হবে, আমি আপনার বলে রাখব। এই যে আজ গেল—এখানে ফিরবে না, বাড়ি যাবে বললে—বাড়ি যাবে না, সব মিছে কথা। আজ সমস্ত রাত্রি বাইরে কাটবে। অজিতদাও তো ওর সঙ্গী এখন!

জেঠীমা এর মধ্যে বার কয়েকই ডেকেছিলেন হেনাকে। প্রতিবারই হেনা বলেছিল—

যাচ্ছি। কিন্তু যায় নি।

এবার জেঠীমা এসে ঘরে ঢুকেছিলেন। বলেছিলেন—দেখ, আজ শুভ সংবাদের দিন। আমি কিছু তাই বলি নি। ওর দীর্ঘনিশ্বাস পড়লে পাছে কিছু ক্ষতি হয়। কিন্তু আর সহ্য হচ্ছে না আমার। এস—রাত্রি নটা বাজে। ওঠো।

হেনা বলেছিল—নীরা কিন্তু আমার সঙ্গে চলুক। কাছে শোবে।

রূঢ়কণ্ঠে জেঠীমা বলেছিলেন—না।

—কেন?

—কেন, তা তো জান! আমার ঘর অপবিত্র হবে। তুই জানিস, অজিত এখন মদ খায়, মনে হয় অন্য দোষও ঘটেছে। কিন্তু বিয়ে দিই নি ওই পাপ ঘরে আছে বলে। আগে ওর গতি করি, তারপর নিশ্চিন্দি।

হেনা কেমন হয়ে গিয়েছিল। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—ওর কি ক্ষমা নেই মা?

—না।

—ওকে তুমি ক্ষমা কর মা।

—না।

চুপ করে গিয়েছিল হেনা। পরের দিন সে চলে গেল। দুপুরবেলা যাবার সময় বলে গেল নীরাকে—নীরা!

নীরা বলেছিল, তুই যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ। আবার আসব মাস দুই পর।

—কোন্ মাসে ছেলে হবে তোর?

—এই তিন মাস। দু মাস পর এখানে চলে আসব।

বলে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কিছু বলতে চেয়েও পারে নি। হঠাৎ বলেছিল, আসি তা হলে। বলেই যেন হঠাৎ চলে গিয়েছিল।

নীরার মনে হল, আবার দু মাস নিরম্বু সঙ্গীহীন জীবন। হেনার সঙ্গে—অনেকদিন পর তার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটল। পায়রার মত বকবক করে আপন মনে আপনার কথাই বলে গেল। শুনতে বেশ লাগল। হেনাকে মনে হল তার স্নেহাস্পদা। সেই হেনাকে সুখী করেছে। বিনো সেন তুমি হেনা নও। হেনা ভণ্ড নয়।

হেনা চলে গেল। গাড়ির শব্দ পেলে নীরা। মোটরের হর্ন।

হেনার যাবার সময়ে বিদায় নেওয়ার মুখচ্ছবি ভেসে উঠল। বড় যেন মলিন লাগল হেনাকে। কাল সন্ধ্যার হেনা আর আজকের এই দুপুরের হেনায় যেন অনেক তফাৎ ঘটে গেছে। মনে লেগেছে হয়তো। কাল জেঠীমার সঙ্গে কথা বলবার সময়েই অকস্মাৎ নিভে-যাওয়া আলোর মত যেন কালো হয়ে গিয়েছিল।

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হেসেছিল। বেচারা! তবে শ্বশুরবাড়ি যেতে যেতেই ও আবার জলে উঠবে। সে নীরা জানে। বইটা সে খুললে। নাঃ, থাক

পৃথিবীর ইতিহাস। এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড পড়বে সে। পরীর রাজ্য যাদুর রাজ্য স্বপ্নের রাজ্য—।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। ফিরে তাকালে নীরা। জেঠীমা ঢুকেছেন। সে মুখ নামিয়ে বইয়ের দিকে ফেরালে। জেঠীমাকে দেখলেই ক'দিন থেকে তার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে—তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

—নীরা!

কণ্ঠস্বরে ভ্রূ কুঞ্চিত করে নীরা আবার ফিরে তাকালে। মনে হচ্ছে এবার সে আর সামলাতে পারবে না। পারছে না, যেন আগুন লেগেছে। জ্বলে উঠল বলে দাউ দাউ করে।

জেঠীমার কণ্ঠস্বরে কি ক্রোধ! নীরার চোখেও তার প্রতিচ্ছটা বাজছে। তবু সে কথা বললে না। শুধু তাকালে।

জেঠীমা একখানা পত্র বাড়িয়ে দিলেন—হেনা দিয়ে গেল। এ সত্যি?

নীরা পড়লে। হেনা সব অকপটে স্বীকার করে পত্র লিখেছে। মুখে বলতে পারে নি, পত্রে স্বীকার করে লিখেছে, আর ওর কষ্ট দেখতে পারলাম না, লিখলাম—তুমি ওকে এমন করে কষ্ট দিয়ো না।

পত্র পড়েও চুপ করে রইল নীরা। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। হেনা এটা পেরেছে শেষ পর্যন্ত!

—নীরা! বল?

—কি বলব?

—এ সত্যি?

—হেনা নিজে যখন স্বীকার করেছে—তখন আর আমার না বলে লাভ কি বলুন। হেসেছিল একটু।

স্থির বিচিত্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়েছিলেন জেঠীমা। তারপর কঠিন ঘৃণার সঙ্গে বলেছিলেন, তোর পাপ হেনার চেয়ে বড়। সে মতিভ্রষ্ট হয়ে ভুল করে করেছিল, আর তুই মতিস্থির করে করেছিস। কলঙ্কের কাজ করে ভয় পেয়ে মিথ্যা বলে সে-কলঙ্ক ঢাকতে যাওয়ার চেয়ে পাপ না করে যারা পাপের কলঙ্ক মাথায় নেয়—তারা তো সব পারে! হেনার উপর যত ঘেন্না হল আমার, তার চেয়ে বেশী ঘেন্না হল তোর উপর।

অদ্ভুত নিষ্ঠুর সে-ঘৃণার অভিব্যক্তি তাঁর। অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে নীরা। তিনি আবার বলেছিলেন, তার মানে পাপে কলঙ্কে তোর ঘেন্না নেই, লজ্জা নেই। তা হলে তো তুই সব পারিস!

বলে তিনি চলে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল নীরা। আপনা-আপনি যেন অকস্মাৎ বন্ধন-মুক্ত জীবের মত উঠে দাঁড়িয়েছিল। বন্ধন কেটে গেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, দরজাটা দেবেন না।

এসে দরজাটা চেপে ধরেছিল। জেঠীমা দরজাটা বন্ধই করেছিলেন অভ্যাসমত। এই

এক বৎসর তার ঘরের দরজা বন্ধ করেই রাখতেন। রাত্রে তার ঘরে ঝিটা শুতো, বাইরে থেকে তালা দিতেন। তিনি ভয় করতেন নীরাকে মনে মনে, সে নীরা জানত। একদিন, কবে ঠিক মনে নেই, জেঠীমা বলেওছিলেন কাকে যেন, হয় অজিত বা সুজিতকে—ও সব পারে। ভয়ঙ্কর সাহস ওর। পালিয়ে যেতে পারে। ছুটে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবে। তাই তালা দি।

জেঠাইমা খুব জোর করেন নি। ছেড়েই দিয়েছিলেন। নীরা বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে, জেঠাইমার মুখের দিকে—সেই পুরানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল—শুনুন, সব যখন জেনেছেন, তখন আজ থেকে আমি বাইরে বেরুলাম। কাল থেকে আমি আবার ইস্কুলে যাব।

জেঠাইমা বললেন, না। তা তোমাকে যেতে দিতে পারব না।

—কেন?

—একথা প্রকাশ হবে, হেনার শ্বশুরবাড়ি যাবে। তা ছাড়া, তোমাকে বিশ্বাস কি?

—না, আমি সে-কথা প্রকাশ কখনও করব না।

—সে বিশ্বাস করলাম। তা আমি বলি নি। তোমার নিজের কথা বলছি—কলঙ্কেও যার লজ্জা নেই, ঘেন্না নেই, তাকে বিশ্বাস আমি করিনে। মনা মরে নি, বেঁচে আছে। শুনছি সে এখন গরিব গেরস্তবাড়ির মেয়েদের নিয়ে যুদ্ধের বাজারে দালালী করছে। এ বাড়ির বাইরে তোমাকে যেতে দিতে পারব না আমি। আর ইস্কুলেই বা বলবে কি, হেনার কথা প্রকাশ না করলে!

—বেশ। ইস্কুলে আমি যাব না, কিন্তু এবারই আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব প্রাইভেটে।

—যে লেখাপড়া শিখে মিথ্যে পাপের বোঝা মাথায় করে নিজের আত্মনারায়ণের এত বড় অপমান করলে—তা শিখে হবে কি?

—পেটের ভাত হবে। আপনাদের হাত থেকে মুক্তি পাব।

একটু চুপ করে থেকে জেঠীমা বলেছিলেন, তাই দেবে। তোমার জ্যাঠাকে বলব।

সেদিন আর একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল। সেই বাইরের মানুষের সঙ্গে ঘাতে-সংঘাতে নয়—নিজেকে দেখে নিজের মনের মধ্যে সেটা জেগেছিল—সে যুদ্ধ যেন নিজের সঙ্গে।

এক বৎসর, হ্যাঁ, গণনা করা এক বৎসর সাতাশ দিন পর পরিপূর্ণ উন্মুক্ত আলোয় দাঁড়িয়ে সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছিল একখানা বড় আয়নার মধ্যে। হেনা চলে গিয়েছিল দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পরই। জেঠীমা ঠিক আধঘণ্টা পরই এসে তার ঘরে ঢুকেছিলেন হেনার চিঠিখানা নিয়ে। মিনিট দশেকের মধ্যেই কথা শেষ হয়েছিল। জেঠীমা তাকে ক্ষমা না করে, ক্ষমা কেন তাঁর আশীর্বাদ করা উচিত ছিল তাকে, তা না ক'রে তিনি তাকে বেশী ঘৃণা করেছেন বলে বেরিয়ে আসবার সময় দরজা বন্ধ করতে গিয়েছিলেন, সে দরজা চেপে ধরে বন্ধ করতে দেয় নি। সে নিজেই যেমন একদিন স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল, একটি কথাও বলে নি, তেমনি ভাবেই সে নিজেই মুক্তি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। বাড়িটা তখন প্রায় স্তব্ধ। প্রায় দুটো বাজে। জ্যাঠামশায় অজিতদা আপিসে। সুজিত আর তাদের অন্য

ছোট ভাই দুজনও ইস্কুলে। বাড়িতে একা জেঠীমা। ঠাকুরটা রান্নাবান্না সেরে বাইরে একবার বেড়াতে গেছে। কলকাতার ঠাকুরেরা দুপুরে ঘুমোয় না। জুতো জামা পরে বেড়াতে বের হয়। চাকরটা ঘুমুচ্ছে। ঝিটা এখনও রান্নাশালে, সব ধোয়ামোছার কাজ করছে।

পাড়াতেও বিশেষ সাড়াশব্দ নেই। এই সময়টা স্তব্ধই থাকে। সদ্য অপরাহ্নমুখী পশ্চিমে অল্প ঢলে পড়া সূর্যের রোদ তখনও তাদের উঠোনটায় পরিপূর্ণভাবেই পড়েছিল। সেই সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে মুক্তির আস্বাদই অনুভব করছিল তার উত্তাপের মধ্যে আর দেখছিল জ্যাঠামশায়ের বাড়ির ঐশ্বর্য সম্পদের নূতন সমাবেশের দিকে তাকিয়ে। বাড়িটার ভাঙাগড়া অনেক হয়েছে। দেখেছেও, কিন্তু খুব ভাল করে দেখে নি। একটা কঠিন আত্মনির্যাতনের প্রবৃত্তি তাকে যেন পেয়ে বসেছিল। সেটা তার জীবনের বিদ্রোহের আর একটা চেহারা। তখন এটা যেন তার নিজেকে খুব তৃপ্তি দিত। একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করত। হয়তো অভিমান ছিল। যাই সত্য হোক, সে এসব দেখেও দেখে নি। দেখতে চায় নি। আজ মুক্তি নিয়ে বেরিয়ে সে উঠানে দাঁড়িয়ে দেখছিল সেই সব।

মুখে একটু হাসিও ফুটে উঠেছিল। নাঃ, জ্যাঠামশায়ের তারিফ করতে হয়। জেঠাইমা ওই জীবনদর্শনের অনেক মূল্য পেয়েছেন। সুতরাং ভুল বললে কি করে চলবে? বাঃ! জ্যাঠামশায় আজকাল মধ্যে মধ্যে স্যুট পরেন, আপিসের বড়বাবুদের মত ঢলঢলে পেণ্টুলান আর গলাবন্ধ কোট নয়, দস্তুরমত স্যুট। তবে অর্ডারী নয়, রেডিমেড। বাড়িটার চেহারাও ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়েছে। রেডিমেড স্যুট পরা হারাণচন্দ্র মুখুজ্জের এইচ সি মুকুরজী স্বরূপের মত। নতুন ফার্নিচার হয়েছে। অবশ্য সেখানে ওই অসামঞ্জস্য নেই, সব নতুন এবং অত্যন্ত মডার্ন।

বাইরে অর্থাৎ উঠানের সামনে বারান্দাটা চমৎকার হয়েছে। সেই বারান্দায় অভিজাত রুচি অনুযায়ী হ্যাট-র‍্যাক সমেত একটি সুন্দর খাড়া করা আলনা; তার নীচে জুতো রাখবার বাক্স, আর প্রায় গোটা মানুষের মাপের একটা স্ট্যাণ্ডিং মিরার। সেই আয়নার মধ্যে ফুটে উঠেছে—রৌদ্রালোকে আলোকিত নীরার প্রতিবিম্ব।

শিউরে উঠল সে। ভয়ে চোখ বুজল।

আয়নাটার মধ্যে—ও—ও—কে? সে? নীরা?—সে?—না—না। কিন্তু সত্য-সত্য।

পাথরচাপা বিবর্ণ ঘাসের মত বিবর্ণ যক্ষ্মারোগীর মত, ফ্যাকাশে তেমনি শীর্ণ কঙ্কালসার একটি মেয়ে, মুখের হনুর হাড় দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে, তার উপর পিছনে ফোলা ফাঁপা একরাশ বিশৃঙ্খল চুল তাকে আরও কদর্য করে তুলেছে, না—কদর্য নয়, বীভৎস। শুধু রয়েছে সেই চোখ দুটো, বড় বড় ঝকঝকে চোখ। সেই দুটি চোখ দেখে সে চিনতে পারলে—এ সে নিজে!

আয়নায় প্রতিবিম্বটাও তার দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

জীবনে ত্যাগ-স্বীকারের এই পরিণতি! পুণ্যফল!

না, জেঠীমার কথাই সত্য। নিজের আত্মার যে অপমান সে করেছে, এ তারই ফল।

এ তার প্রাপ্য।

অকস্মাৎ সে উঠে চলে গেল সিঁড়ি বেয়ে ছাদের উপর। সূর্যের পরিপূর্ণ আলো—মুখে বাতাস—স্বাধীন মন তার চাই। তাকে বাঁচতে হবে। সূর্যালোকিত পৃথিবীর দিকে তাকালে। ওঃ, এই এক বছরে জায়গাটা কত বদলে গেছে! মাথার উপর প্লেন উড়ছে। ১৯৪৪ সাল। কোলাহল কলরব বেড়েছে। কলকাতা লোকে লোকে পিঁপড়ের রাজ্য হয়ে উঠেছে।

সারাটা দিন সে ছাদের উপর ঘুরল। সন্ধ্যেবেলা সে নতুন করে জীবন শুরু করলো। সর্বাগ্রে জেঠীমার কাছে গিয়ে স্থিরকণ্ঠে বললে—জেঠীমা, আমার নিজের ঘরের চাবীটা চাই। ওই ঘরে আমি আর থাকব না।

জেঠীমা তার মুখের দিকে শুধু একবার তাকালেন, কিছু বললেন না। তাতে যত অবজ্ঞা তত ঘৃণা। তিনি সেই এসে ঘরে ঢুকে বসেছেন আর বের হন নি। ভাবছেন বসে বসে।

সেদিন তার মনে হল, এই মেয়েটির মত নিষ্ঠুর সে আর জীবনে কাউকে দেখে নি। এই নিষ্ঠুর ঘৃণা আর তাঁর কোনদিন যায় নি। শুধু কি তার উপর! এরপর থেকে হেনাকেও তিনি ঘৃণা করতেন। যেন তাঁর জীবন-সংস্কারের এক ফলহীন পুষ্পহীন শুধু শাখা পল্লব-পত্র-সার পুণ্য-বিষে বিষাক্ত একটা গাছ যার তলায় রৌদ্র আসে না, ঘন হিম অন্ধকার, আর অহরহ পত্রপল্লব থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে বিচিত্র পুণ্যের বিষবাষ্প। শুধু যেন কয়েকটা দিনের জন্য, যে কারণে মানুষের ব্যাধি হয়, তেমনি একটা কারণে স্নেহের পোকা লেগে একটা ডাল শুকিয়ে ভেঙে গিয়েছিল, তারই মধ্য দিয়ে এসে পড়েছিল খানিকটা সূর্যালোকের দীপ্তি এবং উত্তাপ। আবার সেখানে ডাল গজিয়ে ফাঁকটা সম্পূর্ণরূপে ঢেকে গেছে।

জেঠীমা নীরবে চাবীটা তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। নীরা অসঙ্কোচে চাবীটা কুড়িয়ে নিয়ে তার মায়ের ঘর খুলে ভিতরে ঢুকে দাঁড়াল। ঘরখানাকে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। রঙের টিন—সিমেন্টের বস্তা। লোহা। পুরনো আসবাব। ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। আরসোলা উড়ছে। কিছু খরখর করছে। বোধ হয় ইঁদুর।

সে আন্দাজে গিয়ে পিছনের দিকের পাশাপাশি জানালা দুটো খুলে দিতেই আলোর ঝলক এসে পড়ল।

তারপর সে নিজেই রঙের টিন কয়েকটি বের করে উঠানে নামিয়ে দিলে। চাকরটা সেই মুহূর্তেই ঘুম ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল। সে তাকে বললে—এগুলো বার করে নাও এ ঘর থেকে। বলেই গলা তুলে বললে—জেঠীমা, এগুলো বের করে নিয়ে আমার ঘর পরিষ্কার করে দিতে বলুন।

এইখানেই দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষ।

পাঁচ

এইবার দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য।

এ দৃশ্যে ভাগ্য অদৃষ্ট যদি মানো, তবে ভাগ্য অদৃষ্ট, যদি বিচিত্র কার্যকারণ বল, তবে তাই। তারই বিচিত্র সমাবেশ—এবং তারই মধ্যে পড়ে নীরা করলে নিষ্ঠুর সংগ্রাম। যত আঘাত এল তত আঘাত করলে সে। মার সে পড়ে পড়ে খায় নি আর। আঘাত করলে সে। হার-জিত ঠিক হয় নি। তবে সে হারে নি, আঘাতে আহত হয়ে শুয়েও পড়ে নি। সিন্দুর-চিহ্নহীন মাথার সিঁথিটাকে সে মনে করে অপরাজয়ের চিহ্ন।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ '৪৫ সালের ডিসেম্বরে আরম্ভ—'৪৯ সালের শেষ পর্যন্ত প্রসারিত। চার বৎসরের বেশী। তবে মার সে একা খায় নি। জেঠাইমাও খেয়েছেন। থাক, নাটকের নিয়ম পরের পর সাজানো। শুধু নাটকেরই বা কেন, ভগ্নক্রম, এলোমেলো যা কিছু তাই বিশৃঙ্খল—অনিয়ম।

যবনিকা তোল। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস; নীরা পড়ছে মুখ গুঁজে, সামনে তার পরীক্ষা। অপরাহ্ন বেলা।

দৃশ্যপট—তার মায়ের সেই ঘরখানি। সেই দিনই সন্ধ্যে পর্যন্ত সব বের করিয়ে দিয়ে সেই রাত্রি থেকে বাস করছে।

ঘরখানাকে যথাসাধ্য পরিচ্ছন্ন এবং নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়ে সেই দিন থেকেই আরম্ভ করেছে ছেদপড়া জীবনের নূতন অধ্যায়, নূতন জীবন। সন্ধ্যায় জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে এসে বলেছিল, আমার কয়েকখানা বই লাগবে।

ভুরু কুঁচকে হারানবাবু প্রথমে কিছুক্ষণ কিছুই বুঝতেই পারেন নি। সকালবেলা যাবার সময়ও দেখে গেছেন স্বেচ্ছায় বন্দিনী মৌন মূক নারীর এক রূপ—যার তুলনা পায়ের তলার মাটি। সেই মাটি কোন্ প্রচণ্ড শক্তিতে উদ্ধত শিখর-শীর্ষ তুলে একটি পাহাড়ের মত দাঁড়াল?

সংশয়পূর্ণ কণ্ঠে তিনি প্রশ্নও করলেন—নীরা? নীরা বলেছিল—হ্যাঁ, আমি। আমি আর এভাবে থাকব না ঠিক করেছি। আবার আমি পড়াশুনো করব। বই চাই আমার।

—বই! কি বই? কিসের জন্ম?

—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব আমি।

—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে! যেন এর চেয়ে আশ্চর্য বা অসঙ্গত কিছু হতে পারে না। হয়তো এইবার কিছু বলতেন কঠিন কথা। কিন্তু তার আগেই জেঠীমা ঘরে ঢুকলেন।

জেঠীমা ঘরে ঢুকে হেনার চিঠিখানা তাঁর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, পড়। হেনা লিখেছে। আজকের ডাকে এসেছে। তুমি এ ঘর থেকে এখন যাও নীরা।

নীরা চলে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর জ্যাঠামশায় ডেকে বলেছিলেন, ক'খানা বই লাগবে? কত দাম? মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেলেন, বোধ করি সঙ্কোচ কাটিয়ে নিলেন এরই মধ্যে, তারপর গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—তবে—একটি কথা আমি বলে রাখি। তোমার জানা ভাল। তোমার মা যা রেখে গিয়েছিলেন তার আর খুব বেশী অবশিষ্ট নেই। তুমি বরং সুজিতের বই নিতে পার। অজিতেরও বই আছে—নিতে পার।

নীরা বলেছিল—না, আমার নিজের চাই। নইলে দরকারমত পাব না।

মনের মধ্যে আরও কঠিন কথা এসেছিল, টাকাটার হিসেবের কথা। কিন্তু সে তা বলতে পারে নি। একবার কুসুমশাইয়ের কথাও মনে হয়েছিল। কিন্তু তাও ভাল লাগে নি। বোধ হয় এতদিন নীরব সহিষ্ণুতার অভ্যাসে খানিকটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল সে। নীরবে দাঁড়িয়ে নখ খুঁটেছিল নীরা। শুধু দাঁতের উপর দাঁতের পাটী দুটো শক্ত হয়ে বসেছিল।

জ্যাঠামশায় বলেছিলেন, যে কটা টাকা আছে, আর তোমার অংশের বাড়ির একটা দাম ধরলে বিয়েটা অংশু গৃহস্থঘরে কোন রকমে হতে পারে।

জেঠীমা বলেছিলেন, পরীক্ষাটা দিতে চায়, তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

এবার নীরা বলেছিল, বিয়ে আমি করতে চাই নে। আমাকে বিয়েই বা করবে কে? পরীক্ষাটা দিয়ে পাস আমি করবই, কোন চাকরি আমি খুঁজে নিয়ে চলে যাব। আমাকে বরং টাকাটাই দিয়ে দেবেন। বলে সে চলে গিয়েছিল। পুরনো বই নিয়েই পড়তে বসেছিল। জাঠতুতো ভাইরা এসে বিস্মিত হয়েছিল। ছোট দুটো। অজিতদা গ্রাহ্যই করে নি। সুজিত এসে শুধু বলেছিল—তুই যেরিয়েছিস, আমি খুশী নীরি!

—কেন?

—কারণ আমি সব জানি। মনাকে একদিন মার দিয়েছিলাম আমি। বুকে চেপে বসেছিলাম। সে সব বলেছে আমায়। কি করব, হেনার জন্যে আমাকেও চেপে যেতে হয়েছে। কারণ দাদারকে তো জানিস!

—তিনিও জেনেছেন।

—জেনেছেন? তুই—

—না। হেনা নিজে চিঠি লিখেছে।

—আচ্ছা। পড়। আমার বইগুলো দেব তা হ'লে। তবে একটা কথা বলছি নীরি—দাদার মার খাবেন এবার।

—মানে?

—দেখবি। এখন বলছি না। বলে সে চলে গিয়েছিল। সুজিত পড়া ছেড়েছে তাহলে!

এ দৃশ্যে হঠাৎ নাটক এল, ওই জেঠীমার উপর আঘাতের মধ্যে দিয়ে। সেদিন তখন অপরাহ্ণ বেলা—সে পড়ছে; ঝি-চাকরে কাজ শুরু করেছে; জেঠীমা এক ঘটকীর সঙ্গে বড়-ছেলের বিয়ের কথা বলছেন। এবার বড়ছেলের বিয়ের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়েছেন; ব্যস্ত

কথাটা পর্যাপ্ত নয়, উঠেপড়ে লেগেছেন। বাজারের ফাউয়ের মত তার বিয়ের কথাটাও আছে।

সে অবশ্য একদিন বলে দিয়েছে, আমার বিয়ের কথা কইবেন না, জেঠীমা।

জেঠীমা বলেছেন, আচ্ছা। কিন্তু তবুও বলছেন। সে নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ করবার তার এই মুহূর্তে সময় নেই বলেই সে আর কিছু করে নি।'

হঠাৎ সুজিত বাইরে থেকে বিচিত্র উল্লাসে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকল—মা! মা! কই, মা!

উল্লাসের বৈচিত্র্যের মধ্যে কৌতুক যেন উছলে পড়ছিল।

জেঠীমা বিরক্তভাবেই বললেন, কি? এই তো রয়েছি। বাইরে থেকে এমন করে চেঁচাচ্ছ কেন?

সে উঠোনে ঢুকেই বললে, তোমার বড়ছেলের বিয়ে হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা উপরে তুলে উল্টে দিল।

—বিয়ে হয়ে গেল? মানে! তোর বাবা বুঝি সেই পাটের দালাল হঠাৎ-বড়লোককে কথা দিয়ে দিলে? আচ্ছা আমিও দেখব সে বিয়ে কি করে হয়!

সুজিত হেসেই খুন।

—হাসছিস কেন?

—হাসছি কেন? বললাম, বিয়ে হয়ে গেল, না তুমি বলছ—তোর বাবা বুঝি পাকা করলে বিয়ে? না—না। সব পর্ব খতম। বিয়ে শেষ!

—তুই কি নেশা করেছিস? বিয়ে হল কখন?

—আজ। দিনের বেলা। রেজেস্ট্রি করে বিয়ে। আমি তার একজন সাক্ষী। পাটের দালালের মেয়ে নয়। সিনেমা স্টার—এণাক্ষী বোস। ওরফে এনা বোস। ওরা আজ হোটেলে উঠেছে। সেইখানেই রাত্রে খাওয়াদাওয়া এবং বাসর।

নীরার পড়া সহজে বন্ধ হত না, সংসারের নানান আকস্মিকতার মধ্যেও পড়ে যেত। ঝনঝন করে কিছু পড়লে না, দুমদাম শব্দে বড়ভাই অজিত চাকর বা ঠাকুরকে মারলে না, ড্রইংরুমে বসে হঠাৎ সমবেত অট্টহাস্য হাসলে না, জ্যাঠামশায় পার্টি থেকে ফিরে চিৎকার করলেও না। আজ কিন্তু তার পড়া বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল, হয়তো এমন একটা কিছু ঘটবে—যা সে কল্পনা করতে পারে না, কল্পনাতীত, মর্মান্তিক। কিছু কৌতুকে কিছু আশঙ্কায় তার পড়া বন্ধ হয়েছিল।

জেটিমা—জেঠীমা এবার কি করবেন? ভীষণ একটা কিছু! ভয়ঙ্কর একটা কিছু! হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবেন! সে পড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আশ্চর্য, জেঠীমা তার কিছুই করেন নি। চিৎকার করেন নি, মাথা ঠোকেন নি, অজ্ঞান হন নি, কিছুই করেন নি, শুধু নিঃশব্দে উঠে ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন।

রাত্রি আটটা পর্যন্ত বাড়িটা স্তব্ধ নিঃঝুম। যেন একটা পক্ষাঘাত হয়ে গেছে বাড়িটার।

ছোট ছেলে পর্যন্ত বাড়ি ফেরে নি। সুজিত তাদের ইস্কুল থেকেই নিয়ে গেছে নতুন বউদি দেখাতে। শুধু ঝি চাকর ঠাকুর ফিসফাস করছে। এমন সময় মদ খেয়ে প্রমত্ত হয়ে ফিরলেন জ্যাঠামশাই। তিনি খবর পেয়েছেন। আপিসে টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছে অজিত নিজে। অবশ্য বিয়ের পর। এইচ সি মুকুরজী মনের দুঃখে প্রচুর মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছেন। বাড়ি ঢুকলেন চ্যাচাতে চ্যাচাতে।

—ত্যাজ্যপুত্র করব আমি। বাড়ি ঢুকতে দেব না। সে বহুবিধ শপথ এবং আস্ফালন।

জেঠীমা স্তব্ধ নীরব।

হঠাৎ মোটর এসে দাঁড়াল বাইরে। নীরা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। অজিতদা বউ নিয়ে এল।

জ্যাঠামশাই স্খলিত বসন হয়ে বেরিয়ে এলেন।—গেট আউট! গেট আউট আই সে! বেরিয়ে যাও।

কিন্তু অজিত নয়, সুজিত ফিরে এল ভাইদের নিয়ে দাদার বিয়ের বৌভাতের ডিনার খেয়ে।

জ্যাঠামশায় তখনও বলছেন—ত্যাজ্যপুত্র করব। ত্যাজ্যপুত্র! মুখদর্শন করব না। বলতে বলতেই আবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সুজিত খুকখুক করে হেসে উঠল। অপরিসীম কৌতুক বোধ করছে সে বাপের ক্রোধে।

ভাল লাগে নি নীরার এটা। অন্যের জন্য না হোক জেঠীমার জন্যে একটা বেদনা সে অনুভব করছিল। আশ্চর্য সহ্যশক্তি, আর তেমনি কি প্রশান্ত!

সে সুজিতকে বলেছিল, তুমি হাসছ কেন সুজিত?

সুজিত ডিনার খেয়ে এসেছে চোখ তার ঈষৎ রাঙা এবং ঘোরালো, কথাবার্তায় তার অপরিসীম কৌতুকবোধ; সে বলেছিল—ত্যাজ্যপুত্র করবে বাবা—তাই হাসছি! অজিত মুখার্জী এক্সপার্ট ছেলে—সে আটঘাট বেঁধে কাজ করে। আফিসে বাবার সই করা ব্ল্যাঙ্ক চেকে—সেল্ফ নাম দিয়ে তিরিশ হাজার টাকা ক্যাশ করে পকেটে পুরে রেজিস্ট্রারের কাছে গেছে। টাকাটা সে এবার বোসকেও দেয় নি। তারপর তার নামে যা শেয়ার কেনা আছে, সে-সব তার পোর্ট ফোলিওতে। টু ডে—দি জেন্টলম্যান—রাগের মাথায় জাম্পিং এ্যাণ্ড বাম্পিং, কাল আপিসে গিয়ে শিভারিং এ্যাণ্ড স্ট্যাগারিং। হাসছি সেই জন্যেই।

জেঠীমা নীরবে মুখ গুঁজে সেই পড়েই ছিলেন। খান নি কিছু, একবিন্দু জলও মুখে দেন নি। জ্যাঠামশায়ের ক্রুদ্ধ শপথ এবং চিৎকার সত্ত্বেও না। শেষ পর্যন্ত তিনি—যা খুশী তাই করগে, আই ডোণ্ট কেয়ার, স্ত্রী পুত্র কারুর জন্যেই আমার কোন মাথা-ব্যথা নেই—বলে বেশ খানিকটা মদ্যপান করে গাল দিয়েছিলেন জেঠীমাকে।

অনেকটা রাত্রে সে থাকতে পারে নি, গিয়ে ডেকেছিল, জেঠীমা, ঠাকুরটা খাবার নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

তিনি পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। সে আশ্চর্য রকমের একটা আঘাত অনুভব করেছিল।

চলেই আসছিল, হঠাৎ জেঠীমা ডেকেছিলেন, শোন!

ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সে।

—তুমি আমার ঘরে ঢুকলে কেন? এ ঘরে আমার ঠাকুর আছে।

দপ করে জ্বলে উঠেছিল নীরা। নিষ্ঠুর উত্তর দিতে গিয়ে কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছিল। জেঠীমা বলেছিলেন, তুমি—তোমার জন্যেই আমি ছেলের বিয়ে দিই নি। না-হলে এই কাণ্ড আজ ঘটত না!

নীরা আর থাকতে পারে নি, বলেছিল—তবু ঘটত জেঠীমা। এ আপনার ঘটতই। আমি থাকলেও ঘটত, না থাকলেও ঘটত। আমার জন্যে জ্যাঠামশায় এমন করে মদ খাচ্ছেন না। খাচ্ছেন ব্ল্যাক মার্কেটের টাকার জন্যে। অজিতদার এ কাণ্ড আমার জন্যে ঘটে নি, ঘটেছে ওই টাকার জন্যে। কিম্বা হয়তো টাকার জন্যে নয়। আপনি ভাগ্য-ভাগ্য করেন—আপনার ভাগ্যের জন্যে! নইলে হেনা? সে এমন হয়েছিল কেন বলুন? সেই দিনই এর চেয়েও জঘন্য কিছু ঘটত, আমি বাঁচিয়ে নিয়েছিলাম। যাকগে, আমার জন্যে ভাববেন না। আমি চলে যাব এবার আপনার বাড়ি থেকে। পরীক্ষাটা হয়ে যাক, ফল বের হোক—আমার কি আছে বুঝিয়ে দেবেন, আমি চলে যাব। না-হয় কালই দিন না উঠোনে পাঁচিল গেঁথে আর টাকাগুলো ফেলে! আমার সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে!

* * *

মাস কয়েক অজাযুদ্ধ বা ঋষিশ্রাদ্ধ যাই বল—বহু তর্জন-গর্জন রোদন-অনুতাপের ব্যাপারটা মিটল। তার পরীক্ষাও শেষ হল সেদিন। বাড়িতে বউ এল সেদিন। এনা বোস—এখন এনা মুখার্জী এল। অজিতকে না ফিরিয়ে—এইচ সি মুখার্জী অর্থাৎ জ্যাঠামশায়ের গত্যন্তর ছিল না। ব্যবসা অচল হয়ে গিয়েছিল। অনেক জমি তার নামে; মোটা টাকার শেয়ারের অধিকারী সে। সুতরাং একটা মিটমাট হতেই হল। টাকা-শেয়ার-জমি অংশমত নিয়ে বাকীটা অজিত বাপকে ফিরিয়ে দিলে; বাপ বাড়ির অংশ তাকে লিখে দিলেন। তেতলায় ইতিমধ্যেই দুখানা ঘর উঠল। সেখানে হল তাদের সুখনীড়। এনা মুখার্জী শপথ করে বলল, সে আর সিনেমায় নামবে না। বাস, মিটে গেল।

কিন্তু জেঠীমা স্বতন্ত্র হবেন। তাঁর সংগ্রাম আপোসহীন। সব আলাদা হবে—রান্নাবান্না সব। এরই মধ্যে তার পরীক্ষাটা হয়ে গেল। ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের সব খবর রাখবার সময় তার ছিল না কিন্তু খবরগুলো কানে ঢুকিয়ে দিত রণজিত। সেও পরীক্ষা দিচ্ছে। ভাগ্যক্রমে কাছাকাছি জায়গায় সিট পড়েছিল। একসঙ্গে যাবার সময় সে গল্প করত। পরীক্ষা সম্পর্কে খুব উদ্বেগ তার ছিল না। তবে এই পরীক্ষা দিতে গিয়ে রণজিতের সঙ্গে যেন একটা প্রীতির সূত্র গড়ে উঠেছিল। পরীক্ষা-শেষে সে তার জন্যে অপেক্ষা করত। সঙ্গে নিয়ে আসত। সেদিন তার পরীক্ষার শেষ দিন। রণজিতের পরীক্ষা আগের দিন শেষ হয়েছে। তবু রণজিত তার সঙ্গে গিয়েছিল। আসবার সময় ছিল না। কারণ সেই দিন বউ আসবে। অজিতদা এবং এণাক্ষী বউ। ফিরেছিল সে পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে।

বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। মন তার ভাল ছিল না। তার চেষ্টা উদ্যম সব বোধ হয় ব্যর্থ

হয়েছে। পরীক্ষা তার ভাল হয় নি। অঙ্ক ভুল হয়ে গেছে। একটা সে কষতে পারে নি —তিনটের উত্তর ভুল হয়েছে। সেই যে তার মাথার মধ্যে ব্যর্থতার ক্ষোভ জন্মাল, তার ফলে সারারাতটা সে ঘুমোয় নি। পরের দিন সংস্কৃতের পেপারে সে যা করেছে তা একটা ছোট ছেলেতেও করে না। একটা কোশ্চেনেরই ডবল উত্তর লিখেছে। 'অর' লেখাটা তার এই বিভ্রান্তিতেই চোখ এড়িয়ে গেছে। তারপর তার স্নায়ু-ধৈর্য এমনই ভেঙে গেল যে, শেষের দিকে কত ভুল হয়েছে সে তা জানে না। মনে পড়ছে মধ্যে মধ্যে বানান নিয়ে ধাঁধা লেগেছে। ইতিহাসের পেপারে খ্রীষ্টাব্দ ভুল হয়েছে। রচনায় বোধ হয় শব্দ পড়ে গেছে; অ্যাডিশনাল পেপারে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছু হয় নি, হাত কেঁপেছে, সে ঘেমেছে, কাঁদতে তার এই দিনটিতে ইচ্ছে হয়েছিল, বুক থেকে ঠেলে উঠেছিল কান্না, লজ্জায় কাঁদতে পারে নি। কোনক্রমে আত্মসম্বরণ করে ফিরেছে; মনে পড়ল ক্লাস নাইনে উঠে অধিকাংশ মেয়ে যখন অঙ্ক ছেড়ে দিয়ে ডোমেস্টিক সায়েন্স নিয়েছিল—তখন অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো পাওয়া আদৌ অসম্ভব নয় বলে সে অঙ্কই নিয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে বসে সব পড়াই বোঝা সম্ভবপর হয়েছে, অঙ্ক বোঝা সম্ভবপর হয় নি। তবুও এগুলো ভুল হবে এ আশঙ্কা সে করে নি। রণজিৎ এবং ক'টি পাড়ার মেয়ে তারা খুব খুশী, পরীক্ষা দিয়ে থার্ড ডিভিসন কেউ কাড়তে পারবে না। সুখী ওরা। কিন্তু তার যে শুধু ফার্স্ট ডিভিসনেও ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

বাড়িতে যখন এল, তখন সে শ্রান্ত ক্লান্ত, হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়েছে। ইচ্ছে ছিল বাড়ি এসেই শুয়ে পড়বে। কিন্তু বাড়িতে তার অবকাশ ছিল না।

বাড়িতে তখন সমারোহের কোলাহল উঠছে। সিনেমা স্টার বউদিকে নিয়ে। দেবরেরা কলকল্লোল তুলেছে। চারিদিকে আছাড় খেয়ে পড়ছে তার ঢেউ। বিয়াল্লিশ সালের সাই-ক্লোনের মধ্যেও সে বিঘ্ন বোধ করে নি। কিন্তু এর মধ্যে বিশ্রাম, ঘুম অসম্ভব। তেতলায় নতুন কার্নিচার উঠছে। স্যুটকেস ট্রাঙ্ক উঠছে। বাড়ির দোরে দুখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একখানা অজিতদার। স্ট্যাণ্ডার্ড টুয়েল্ভ। পুরনো হলেও নতুনের মত ঝকঝকে, তার পেছনে হেনার স্বামীর গাড়ি। আসন্নপ্রসবা হেনাও এসেছে। তার আসবার কথাটা সে শুনে গিয়েছিল। হেনা সেই গিয়ে আর আসে নি। জেঠীমা তাকে আনেন নি। আজ এসেছে অজিত। বউয়ের আজ আসবার কথা, সে পরীক্ষা দিতে যাবার সময় শুনে গিয়েছিল, কিন্তু এমন সমারোহ উচ্ছ্বাস সে কল্পনা করতে পারে নি, জেঠীমা বিগুমানে। জেঠীমার ঘর-খানি বন্ধ। স্তব্ধ হয়ে তিনি ঘরে বসে আছেন। চাকর ঝি ঠাকুর সব ব্যস্ত। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তার ঘরের সামনের বারান্দায়। ক্ষিদে পেয়েছে কিন্তু দেবে কে? এক কাপ চা পাওয়ারও কোন আশা নেই।

নিচের তলাটা খাঁ খাঁ করছে। কলরব উঠছে দোতলার উপরে তেতলায়।

এরই মধ্যে ওর নামটা ধ্বনিত হয়ে উঠল প্রায় কোরাসে। ঊর্ধ্বলোক ওই ছাদ থেকেই —মীরা! মীরা! মীরাদি! মীরু! মিরুনি! চিরুনি!

প্রথম ডাকটা অজিতদার। শেষেরটা হেমার।

তাকালো সে ছাদের দিকে। আলসের উপর ভর দিয়ে সারি সারি মুখ। তার মধ্যে

একখানি আশ্চর্য ঝকমকে মুখ সোনা-রূপার গহনার মধ্যে মীনা করা আভরণের মত নানা বর্ণে ঝলমল করছে।

—উপরে আয়, নীরা। চা তৈরি। বউদির সঙ্গে আলাপ করে যা।

এণাক্ষী মৃদু মৃদু হাসছে। বিজয়িনী গরবিনীর প্রসাদ-ঝরা হাসি। প্রকাশ্যে সে আকারে আয়তনে মৃদু অর্থাৎ ঈষৎ হাল্কা কিন্তু ওজনে সে সোনার চেয়েও গুরুভার আর আলোর প্রতিচ্ছটায় ঝিকিমিকির মধ্যে চোখ-ধাঁধানো কৌতুক; সর্বোপরি তুমি ধন্য হয়েছ, এইটে নাটকের স্বগতোক্তির মত অভিব্যক্ত:

তবু সে গেল।

তেতলার সিঁড়ির মুখে জেঠীমার ঘর। এ ঘরটা তিনি পাল্টাবেন। নইলে বউকে দেখতে হবে ওঠানামার সময়। সেটা পার হয়ে সে উঠে গেল। অজিতদা বললে, ইনিই শ্রীমতী নীরা, যার সম্পর্কে অনেক গল্প করেছি। আর এই তোর বউদি, ফেমাস এণাক্ষী।

অকস্মাৎ এণাক্ষী সকলকে সচকিত করে দিয়ে বলে উঠল, আরে, একেই তুমি বলতে কালো কুশ্রী! কি চমৎকার ফিগার! আর রূপ তো এই সবে ফুটছে, উঁকি মারছে।

কথাটা অন্যে বললে হেসে উঠত। কিন্তু এ এণাক্ষী বোস। এ ওর মুখ চাইলে। শুধু হেসে উঠল হেনার পরের ভাইটি। বললে, কি ইন্টেলিজেন্ট স্যাটিয়ার বউদি! ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল! হেনার এ ভাই সাহিত্যিক হচ্ছে।

কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল নীরার। সে নীরা। সে বলে উঠল, ঠাট্টা করছেন? তা অবশ্য—

বাধা দিয়ে এণাক্ষী বললে, না। তোমার দাদার দিব্যি করে বলতে পারি, না। দেখ, তোমার দাদার চেয়ে আমি বয়সে কিছু বড়। ফিল্মে কাজ করেছি, রূপ আমি চিনি, গায়ের রঙে রূপ নয়, রূপ সব কিছু নিয়ে। গায়ের রঙ তো ফেরানো যায়। মুখে সফ্‌ট্‌নেসের শ্রী তো আনা যায়। আমি নিজে করেছি। কিন্তু তোমার গড়নে-পেটনে রূপ ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। জাগে নি। জাগছে। কিছু মনে করো না, তুমি এতদিন ফোট নি গো সুন্দরী, এইবার ফুটছ, কিছুদিনেই বুঝতে পারবে। একটা মনা ঘোষ নয়—ঝাঁকবন্দী মনা ঘোষ ভন ভন করবে চারদিকে। তখন চড় মারতে হলে দশভুজা হতে হবে। অদ্ভুত ফিগার তোমার। টল, গ্রেসফুল। অদ্ভুত! সে তাকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছিল।

লজ্জায় বিস্ময়ে নীরা কেমন হয়ে গেল। এণাক্ষী তাকে মনে মনে প্রশ্ন করবার অবকাশ দিল না, এ কি সত্যি? কিন্তু চোখের দৃষ্টি? সেও কি অভিনয়? কিন্তু ভাববার অবকাশ সে পেলো না, এণাক্ষী তার হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে গেল, এস তো, দেখাই! ঘরে নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে তাকে বসিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার মাথার সেই সুপ্রচুর চুলগুলি নিয়ে কি করতে শুরু করলে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেন জাদু শুরু হল। শিউরে উঠল নীরা। এ কি! এ কি হচ্ছে! ও কে? ও কে? সে একটা আশ্চর্য চিত্ত-উদ্বেলতা! ভুলে গেল সে তার পরীক্ষার কথা। বিস্ময়, এক অনির্বচনীয় গোপন আনন্দ,

ভয়—সব একসঙ্গে। পরমুহূর্তেই সে উঠে দাঁড়াল। না—না!

—বস, বস।

—না, ছাড়ুন।

—বস না।

—না। তার কণ্ঠে সেই রূঢ়তা ফিরে পেয়েছে তখন।

ছেড়ে দিল এণাক্ষী তাকে। হাসতে লাগল। বললে, এত ভয়?

—গরিবের অনাথার ভয়ই তো আত্মরক্ষার আশ্রয়।

—গরিব অনাথ অবস্থা তোমার ঘুচতে কতক্ষণ? টাকা অনেক পাবে, আর নাথ—! হাসতে হাসতে বললে, নাথ চাইলে অনেক জুটবে। না চাও, অনাথের নাথ একটা ভক্তিমান দারোয়ান রেখো, কিংবা একটা অ্যালসেশিয়ান পুষো। বলো, নামিয়ে দি ফিল্মে! এমন ফিগার, এমন উচ্চারণ তোমার। ক্যামেরা মাইকের টেস্ট তুমি উৎরবে এ আমি সিনা পরখেই বলতে পারি। নামবে? আমি ছেলেবয়েস থেকে ফিল্মের দরজায় ঘুরেছি, কাজও অনেক করেছি।

তার সেই বিচিত্র লিপ্সক দৃষ্টিতে নীরা এণাক্ষীর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এনা সকৌতুকে বললে, কি?

নীরা বললে, না।

—না নয়, ভেবে দেখো।

—না। ও আমি পারব না। আমাকে লোভ দেখাবেন না।

—অভিনয় তুমি খুব পারবে। অদ্ভুত পারবে। দু দিনে ভয় ভেঙে যাবে।

—অভিনয় আমার ভাল লাগে না। এবং চাই না করতে। মাফ করবেন আমাকে।

বলেই সে ফিরল এবং বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছুটে সে পালাল না, ধীর পদক্ষেপেই নেমে এল। হেনা তার পথ আটকেছিল—দেখি দেখি! তাই তো, চুলটা ফেরানোতে—।

—পথ ছাড়। বলে তাকেও সরিয়ে নেমে এসেছিল।

নিজে ঘরে এসে ঘর বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে তার মায়ের পুরানো আয়নায় নিজের ছবির দিকে চেয়ে বসে রইল। সত্যিই তো, তার এই কুশ্রীতা তো সহজাত নয়—শ্রীর পরিচর্যার অভাব!

না। তাও নয়। তার পুরাতন জীবনের দেহের মধ্যে থেকে আর একজন অথবা নূতনের আবির্ভাব হচ্ছে। রাত্রিক্রমে শুরু করবার সময় নিজেকে ভাল ক'রে দেখে সে তাকে আবিষ্কার করলে। কে এক অজ্ঞাত রূপসী তার ভিতর থেকে স্মিতহাস্যে উঁকি মারছে।

* * *

এই অজ্ঞাত রূপসীকে সে দর্পণে আবিষ্কার করলে পূর্ণ গৌরবে—তার বিবাহবাসরে, বিবাহসজ্জায়। আরও চার বৎসর ১৯৪৯ সাল—অগ্রহায়ণ মাস। এর মধ্যে সে অর্থাৎ ওই অজ্ঞাত রূপসী তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে, এ-কথা গোপন বা অজ্ঞাত ছিল না। তার নিজের কাছেও ছিল না, আর সকলের কাছেও না। তাকে সে অসম্মান করে নি, তবে

তাকে আসন পেতে বসিয়ে ধূপ দীপ গন্ধে পুষ্পে অর্চনাও করে নি। ইতিমধ্যে তার সব কল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। শুধু তার দুর্ভাগ্য নয়, গোটা দেশের দুর্ভাগ্য, দুর্যোগের রূপ নিয়ে সব আচ্ছন্ন করে দিয়ে তারা জীবন-দুর্যোগকে আরও ঘনীভূত আরও অলঙ্ঘনীয় করে দিলে।

১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সে ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করে নি, করেছিল থার্ড ডিভিসনে। সব আশা ধূলিসাৎ হয়েছিল বললেই বলা হল না, লজ্জাতেও সে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে টিটকিরির সীমা ছিল না। পাশের বাড়ির সেই মেয়েরাও থার্ড ডিভিসনে পাস করেছে। তাদের কলরব শোনা যাচ্ছে। ঘরের মধ্য থেকে নির্বাক জেঠীমার কথাও শোনা গিয়েছিল, অতি দর্পে হত লঙ্কা অভিমানে দুর্যোধন! এত অহঙ্কার কি সয়! থাক সে-সব কথা। এণাক্ষী নিজে নেমে এসে বলেছিল, নামবে ছবিতে? দেখ?

ঘাড় নেড়ে সে বলেছিল, না।

তারপর সটান গিয়েছিল জ্যাঠামশায়ের ঘরে। জ্যাঠামশাইকে বলেছিল, আমার বাড়ির অংশের দাম, আর যদি কিছু আমার মায়ের রেখে-যাওয়া টাকার দরুণ পাওনা থাকে তো আমাকে দিন। আমাকে তো পথ খুঁজতে হবে।

—পথ! মেয়েদের জন্য পথ নয়, মেয়েদের জন্যে ঘর।

—ঘর ভেঙে যাদের ভগবান পথে দাঁড় করান, আমি তো তাদের একজন।

—কোন্ পথে হাঁটবে? আমাদের বংশের সম্মান, সেটা তো আমাদের দেখতে হবে।

কোন বাক্য সে করে নি। সে বলেছিল, আমার ইচ্ছে আমি কোন ইস্কুলে চাকরি করি। সেখান থেকে আই-এ দেব। তারপর পারি তো—

—হুঁ, ভাল। তাতে অবশ্যই আপত্তি করব না। কিন্তু ভেবে দেখতে বলব। পরাশের পিণ্ডটা লোপ হবে। তা আগে চাকরি পাও। দেব যা পাবে তুমি। কেন দেব না!

কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত— অথবা আকস্মিক একটা আঁধির মত নেমে এল এক ভীষণ দুর্যোগ। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। ১৬ই আগস্ট শুরু হল কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা। তার কিছুদিন আগেই গেছে আজাদ হিন্দ দিবস। কলকাতা তখন বারুদ-স্তূপ। এ দুর্যোগের ভীষণতায় প্রচণ্ডতায় তার মত মেয়েও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মনা ঘোষকে সে দেখেছে, কিন্তু মানুষের এই উলঙ্গ উন্মত্ত চেহারা সে দেখে নি এই দীর্ঘ দেড় বছরের বন্দী জীবনেও। কোন দিন ভাবতে পারে নি; তার অভিজ্ঞতায় সে জানে—মানুষ এমনি নির্জনে, বন্দীজীবনে যত কুৎসিতভাবে মানুষ সম্বন্ধে জীবন সম্বন্ধে ভাবতে পারে—তেমন আর কখনও পারে না। এই বন্দীজীবনে এমন ভীষণ মানুষকে সে ভাবে নি। ১৬।১৭।১৮ই আগস্টের সে কি রাত্রি! মনে আছে ওই অঞ্চলটা তখন ওদিকে বসিরহাট বারাসত এবং এদিকে কলকাতার মধ্যে পড়ে নিদারুণ আতঙ্কের মধ্যে কাটিয়েছিল। ছাদে ইঁটপাটকেল জড়ো করে ওরা চার ভাই সেদিন এমনি একটা চেহারার আভাস দেখিয়েছিল বটে। সুজিত মেজ ভাইয়ের সে চেহারা সব থেকে স্পষ্ট। অজিতদার তখন দুটো বন্দুক, একটা রিভলবার,

একটা রাইফেল, একটা কার্টিজ ছাড়া ব্রিচ্ লোডিং ডবল ব্যারেল। সারারাত সে বন্দুক ছুঁড়ে বিপ্লাটা আয়ত্তে এনে ফেলেছিল। অজিত শুধু মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসেছিল একখানা চেয়ারে। জেঠীমা তাঁর ঠাকুরের সামনে জপ করেছিলেন। জ্যাঠামশায় হয়ে গিয়েছিলেন একতাল মাংস-স্তূপ। আর চেহারা দেখেছিল এনার। কোমরে কাপড় জড়িয়ে রিভলবারটা হাতে নিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাববশে খানিকটা আড়ম্বর দেখিয়েছিল, কার্টিজ-বেল্টটা গলায় পরে নিয়েছিল, কিন্তু সত্যই তার সাহসের অভাব ছিল না। সে স্তম্ভিত হয়ে ছাদের আলসেতে কনুই রেখে, শূন্যদৃষ্টিতে রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে থাকত। আর একজনকে সেদিন কেউ বুঝতে পারে নি। সে রণজিত। সারারাত্রি সে দা হাতে যেন নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সারারাত কথা বলে নি। পরের দিন থেকে সে আর এক রণজিত হয়ে গেল।

মাস তিন গেল। পুজার পর সে জ্যাঠামশাইকে বলেছিল, যা হয় করে দিন জ্যাঠামশায়, আমার পথ তো আমাকে করতে হবে!

—এই দুঃসময়ে?

—দুঃসময় যদি না কাটে!

—না কাটে, আমাদের ভাগ্যে যা হবে তোমার ভাগ্যেও তাই হবে। আমি তো এ সময়ে তুমি যেতে চাইলেও যেতে দেব না মা।

এই একবার, এই একটি কথা জ্যাঠামশায়ের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির একটি ফাঁকে একটি নীলাভ তারার মত জেগে আছে তার স্মৃতিতে। নইলে তার জীবনে এত বড় দুষ্ট গ্রহ আর কেউ হয় নি।

জেঠীমা কথাটা শুনে বলেছিলেন, ওর তো লাঞ্ছনার ভয়ও নেই, পাপের ভয়ও নেই। আর মারা? ও পাথর। দিয়ে দাও টাকা—ও যাক, মরুক!

আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল নীরা। তারও অবশ্য কল্পনা করতে গিয়ে মনে হত—শিউরে উঠত মনে হলে; মনে হত সে পথে বেরিয়ে হঠাৎ পড়ল ওই দাঙ্গাবাজ—নারী-হরণকারীদের মধ্যে—তারা ছুটে এল হা-হা ক'রে! এ কথার কদর্য ব্যাখ্যা একটা হয়। তখন জানত না। আরও পরে জেনেছে। কিন্তু তাদের একটা কথা জানিয়ে দেবে সে। একখানা ছোরা সেও যোগাড় করেছিল। ওই কল্পনায় শিউরে উঠেও সে আত্মসম্বরণ করে কল্পনা করত, ওই ছুরিটা সে উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। কখনও কল্পনা করে, নিজের বুকে বসিয়েছে।

কুৎসিত। অতি কুৎসিত—জীবনের এই ব্যাখ্যা। দেহধারণ করে দেহকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তার প্রভাব মনের উপর পড়ে। কিন্তু মানুষের দেহের বাহন নয়। দেহই তার বাহন। নিষ্ঠুর চাবুক মেরে মন তাকে মনের পথে চালায়। এই দাঙ্গাতেই তেমন অনেক মানুষ আপন পরিচয় রেখে গেল। আশ্চর্যভাবে এই বাড়ীতে ওই জ্যাঠামশায়ের ছেলেদের মধ্যে থেকে হঠাৎ এই পরিচয় দিয়ে সামনে দাঁড়াল রণজিত। হেনার ছোট ভাই।

এবার উঠেছে ক্লাস টেনে। তার আর নেনার চেয়ে দু বছরের ছোট। আঠারো বছর বয়স। সুজিতের মত খেলা-পাগল। পাড়ায় মারপিটে সিদ্ধহস্ত বলে খ্যাত।

ওই রণজিতই তাকে ছোরাখানা দিয়েছিল—১৭ই রাত্রে।—দিদি তুই রাখ। তুই রাখবার যোগ্যও বটিস, আর দরকারও তোর হতে পারে। এ বাড়ীতে বিপদ ঘটলে সে বিপদের মুখে তোরই পড়বার ভয় আগে। রাখ এটা।

বেশ সুন্দর ধারালো একখানা ছোরা। নীরাও নিয়েছিল।

থাক—রণজিতের কথা। থাক—পণ্ডিত মনস্তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা।

নাটক—তার জীবন নাটকের কথায় ফিরে এস।

জেঠীমার কথার উত্তরে সে আরও কঠিন হয়ে উঠে বলেছিল—আপনার বংশের সম্মান যদি সহজভাবে সম্ভ্রমের সঙ্গে আমার নিজের জোরে বাঁচে—তবেই সেটা বাঁচা। নইলে আমাকে কুলুপ দিয়ে ঘরে পুরে সম্মান বাঁচানোর কি দাম? গেলে আমারই ইজ্জৎ যাবে। আমারই নরক হবে। আপনাদের লজ্জা হয়তো হবে, কিন্তু বললেই পারবেন—আমাদের মেয়ে তো নয়। ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী। ভাইঝি, বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, আমার সঙ্গে সম্পর্ক কি?

জ্যাঠামশায় সেদিন সত্য আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছিলেন—ওর কথা তুমি ধরো না মা। ও এক ব্যাধিগ্রস্ত জীব।

জেঠীমা বলেছিলেন ওঘর থেকে—যে যা পার বল আমাকে। ব্যাধিগ্রস্ত আমি নই। ওই মেয়ে কালাপাহাড়টাই ব্যাধিগ্রস্ত। নইলে আজ এই মন্বন্তর মাথায় করে কেউ পথে বের হতে পারে?

জ্যাঠামশাই আবার বলেছিলেন—আমার কথা শোন মা। শুনতে হয়। এ কথা সে শুনেছিল। মেনেছিল।

ঘরে এসে চুপ করে বসেছিল। ভাবছিল কি করলে? ঠিক না ভুল? এণাক্ষীও এসে তাকে বারণ করেছিল। অজিত সুজিত—এরাও। ঝড়ের নদীতে বিপন্ন নৌকার সহযাত্রীর মতই তাদের সে মমতা, আঁকড়ে ধরেছিল। সে যেন ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে যাবার দুঃসাহস জেদ ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে, আর তারা ব্যাকুল সহযাত্রীর মত ধরে বলেছে—না না নীরা, এ কাজ করিস নে। ঠিক হবে না। হঠাৎ নাটক ঘটল। রাত্রি তখন দশটা। হঠাৎ রণজিত তাকে ডাকলে—নীরাদি শোন্! দোর খোল্! নীরাদি!

রণজিত রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কোথায় যায় কোথায় থাকে। প্রশ্ন করলেও উত্তর দেয় না। তার কথায় দৃষ্টিতে ভয় পায় বাড়ির সকলে। দাঙ্গার সব বিচিত্র খবর সে-ই আনে। তার কণ্ঠস্বরে আদেশ ছিল।

নীরা দরজা খুলে দিয়েছিল।

রণজিত এসে বলেছিল—বাড়ি থেকে চলে যাবি মতলব করেছিস? প্রশ্ন করে উত্তরের অপেক্ষা করে নি। বলেছিল—খবরদার! আমি তোকে পথের ওপরেই বোমা মেরে টুকরো টুকরো করে দেব। খবরদার! চোখ দুটো তার জলছিল।

অবাক হয়ে গিয়েছিল নীরা। ছেলেটা—!

—তোর ঘরের ওই কোণে একটা থলে রেখেছি বিকেলবেলা, তুই বাথরুমে ছিলি বলা হয়নি। ওটা যেন নাড়িস নে। ওতে বোমা আছে।

—বোমা!

—হ্যাঁ। নাড়বি নে।

—বোমা কেন?

—লড়াইয়ের জন্যে। তোর বিয়েতে ফোটাবার জন্যে নয়।

—রণজিত!

—বলিস নে কাউকে। আর শোন, তোর পড়বার বইয়ের আমি ব্যবস্থা করব কাল। আমি সেই কলেজে ভর্তি হয়েছি, পড়ি নে। ওগুলোর যা লাগবে তোর, নে—আর বাকী বই ওদের ঘাড়ে ধরে কিনিয়ে দেব। দেবে না, চালাকি! বাড়ীতেই পড়। কিন্তু বাড়ী ছাড়বার নাম এখন করবি নে। পাঁচটা পুরুষ মরে মরুক—লড়াইয়ে মরে। কিন্তু একটা মেয়ের কিছু হলে জাত চলে যাবে। খবরদার!

রণজিত চলে গিয়েছিল, আর দাঁড়ায় নি। নীরার আর ঘুম আসে নি। রণজিত সম্পর্কে কোন কথা ভাবে নি। মনেও ওঠে নি, বার বার উঠে গিয়ে শুধু বোমার থলেটার অদূরে সেটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বল তো, নাটক নয়?

রণজিত কথা রেখেছিল। তার নিজের বইগুলো সব এনে তাকে দিয়ে বলেছিল, এই নে। আর বাকী কি লাগবে বল—আজই বড়দাকে গিয়ে বলছি। কিনে দিতে হবে। কি নিবি তুই?

—হিস্ট্রি, সিভিক্স, সংস্কৃত।

শুনেই সে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরই দোতলা থেকে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে, আলবৎ দিতে হবে! ওর বাপের টাকা থেকে দেবে তুমি—তোমার বাপের নয়।

অজিতদা চীৎকার করে উঠল—রণজিত!

উত্তরে রণজিত বললে, লাল চোখ দেখিয়ো না। রণজিত ওতে ভয় করে না। হুড়হুড় করে নেমে গেল সে।

ভুরু দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল নীরার। এবার বোধ হয় এণাক্ষী এবং অজিতের সঙ্গে লাগবে তার।

কিন্তু তা লাগে নি। কিছুক্ষণ পর এণাক্ষী এসে দাঁড়িয়েছিল, হেসে বলেছিল—পড়বার ভূত কিছুতেই নামছে না ঘাড় থেকে! বললাম এত ক'রে, মনে ধরল না! হায় হায় হায়! কোনও মাস্টার-টাস্টারকে মনে মনে ভালবাস বুঝি?

তার কথায় একটি মিষ্টি সুর ছিল, যার জন্যে তার কপালে রূঢ়তার রেখার সারিগুলো জাগে নি, যা ছিল নীরার বৈশিষ্ট্য। বরং একটি ক্ষীণ হাস্যরেখাতেই ওই তার পুরু ঠোঁট দুটি ঈষৎ

বিচলিত হয়ে উঠেছিল। হেসে বলেছিল—প্রেম ছাড়া জীবন বুঝি ভাবতে পারেন না বউদি ?

বেশ ভঙ্গি ক'রেই ঘাড় তুলিয়ে এণাক্ষী বলেছিল—না !

—তা হলে আমাকে দেখুন। প্রেম আমার নেই। এবং অভিনয় ক'রেও, ভালবাসি এ কথা বলতে আমার লজ্জা হয় ঘেন্না হয়।

—তা'হলে যখন প্রেমে পড়বে তখন ঘাড়মুড় ভেঙে পড়বে।

সে ভঙ্গিও এমন সরল এবং সহজ যে নীরা এবার অনেকটা হেসে ফেললে। এণাক্ষী মুহূর্তে চিবুক ধ'রে তুলে বললে—দেখ তো, কি সুন্দর হাসি! কি সুন্দর দেখাচ্ছে! মাইরি বলছি—দেখ আয়নায়।

আয়নার দিকে সেও তাকিয়ে দেখেছিল। এবং লজ্জা পেয়েছিল। এণাক্ষীর কথা তো সত্য!

এণাক্ষী বলেছিল—আর ছ মাস নয় বছরখানেক, দেখবে মৌমাছির ঝাঁক উড়বে।

এবার সে বিরক্ত হতে চেষ্টা করেছিল। হ্যাঁ, চেষ্টা করে বিরক্ত হ'তে হয়েছিল, বলেছিল—এসব কথা বউদি আমার বেশ ভাল লাগে না। আপনি এসব আমাকে বলবেন না। মানুষের মন তো এক নয়, রুচিও নয়! ছেলেবেলা থেকে আমি ভেবে এসেছি একরকম। আমি পড়ব—অনেক পড়ব—।

কথার মাঝখানেই উপর থেকে অজিতদা'র ডাক এসেছিল—এনা! এনা। কি মুশকিল—আপিস বেরুব—আর—।

—যাই যাই !

চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বললে—বই তোমার আসবে। আমি বলছি। যখন যা দরকার হবে আমাকে ব'লো, রণজিতকে বলো না। ওটা একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে।

চলে গিয়েছিল এণাক্ষী।

সে বসে ছিল আয়নার দিকে তাকিয়ে।

এণাক্ষী খুব মিথ্যে বলে নি। আয়নায় তার প্রতিবিম্বকে ভুরু নাচিয়ে হেসে প্রশ্ন করেছিল, তাই তো, লোকে তোমাকে মিথ্যে কুৎসিত বলে—তুমি তো মন্দ নও দেখতে গো !

একসময়ে আয়নার খুব কাছে গিয়ে বলেছিল—You are a darling! Very sweet!

কয়েক দিনের মধ্যেই বইগুলি সে সত্যই পেয়েছিল। রণজিতের বই এবং এইগুলি নিয়ে সে আই-এর জন্য পড়তে শুরু করেছিল। জীবনের আশাকে সে সফল করবেই। অনেক পড়বে। ভাল ক'রে পাস করবে। স্কলারশিপ নিয়ে। তারপর প্রফেসারি করবে। সে জানে—এ তার ছেলেবয়সের মনে তার মায়ের বুনে দেওয়া বীজের চারার আকাশ অভিযান।

ফল তার তেতো কি মিষ্ট জানে না।. কিন্তু সে ফল ফলবেই। তারপর—।

পড়তে পড়তে আয়নার দিকে চেয়ে পড়া বন্ধ করত। হাসত মুচকে মুচকে। নীরবে ইসারায় তার সঙ্গে কথা বলত।

দেখতে পেত—ওই চারা গাছটির পাশেই তার মধ্যে ওই নব অপরূপার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটি লতা বের হয়েছে। সতেজ একটি লতা। তার বীজ বোধ করি এনে বুনে দিয়েছে ওই এণাক্ষী। লতাটা গাছকে জড়িয়ে নিয়েছে। ফুলও বোধ করি ধরেছে. চোখে দেখা যায় না কিন্তু অতি মৃদু গন্ধ পাচ্ছে।

তার সন্ধানে সে বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে নিজের অনাবৃত ঊর্ধাঙ্গের দিকে চেয়ে দেখত। কৈশোরে এতদিন যা কুঁড়ির মত ছিল তা স্থলপদ্মের মত ফুটছে। আশ্চর্য! জীবনে যেন অকস্মাৎ মহাসমারোহের আয়োজন করছে তার দেহ জুড়ে। দেহ পুষ্ট হয়ে ভরছে। যেমন তিন বছর আগে হেনার হয়েছিল। মুখের যেন চেহারা পাল্টাচ্ছে। তার বর্ণ পাল্টাচ্ছে। আশ্চর্য! মগের পর মগ জল ঢালত মাথায়। অঙ্গ বেয়ে পড়ত, সে দেখত। হাসত। চুলের রাশি মুখে বুকে পিঠে সেঁটে লেগে যেত। সাবান মাখার নেশা ছিল। এবার সে ঘর বন্ধ করে চুল আঁচড়ে নানা ভঙ্গিতে সাজিয়ে নিজেকে তুলনা করে দেখত। তারপর দু হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিয়ে বাইরে বেরুতো। রূপ তার নিজের জন্য। সে যেন বাইরে কাউকে দেখা না দেয়।

* * *

মাস ছয়েক পর। ১৯৪৭ সালের জুন মাস তখন। সব চিন্তা সব কল্পনা সব ভাব ভাবনা ওলোট-পালোট হয়ে গেল যেমন গিয়েছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট। স্বাধীন হচ্ছে দেশ। স্বাধীনতা। স্বাধীনতা! দেশ ভাগ করে কেটে স্বাধীনতা আসছে। ইংরেজ, দুর্ধর্ষ ইংরেজ, অপরাজেয় ইংরেজ যারা দু-দুবার জার্মানীর কাছে হারতে হারতেও না হেরে জিতল তারা চলে যাচ্ছে।

নীরা সেদিন বাথরুমে—নিজের অঙ্গের দিকে চায় নি—উল্লাসে ছোট্ট বালিকাটির মত নাচছিল আর গান গেয়েছিল আপন মনে "জয় হে! জয় হে! জয় হে! জয় জয় জয় জয় হে।" ভারতভাগ্য বিধাতা শব্দটিও মনে পড়ে নি।

সারা দিন আয়নার দিকে চায় নি। উপরে এণাক্ষীর ঘরে গিয়েও নেচেছিল। এণাক্ষীও নেচেছিল। সে যেন আবোল-তাবোল। ছেলেবেলায় শোনা শেখা একটা ছড়াও আবৃত্তি করেছিল। "এ হল কিরে হল কি—সিগারেট খাচ্ছে ভটচাজ্জি। হল কি।"

তার উচ্ছ্বাসটা গেল—কিন্তু সে উচ্ছ্বাস ভাসিয়ে এমন একটা উঁচু মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল যে—ওসব কথা আর গুঞ্জরিত হয়ে উঠল না। মনে জাগল—গোটা জাতের বিরাট আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রেখে—জীবন-প্রত্যাশা।

মনে আছে সেদিন শ্যাডো মিনিস্ট্রি তৈরী হল। পনেরই জুলাই। এক মাস পর পনেরই আগস্ট দেশ স্বাধীন হবে। সেদিন সে আয়নার দিকে তাকিয়েই তার ছবিকে বলবে—বাস্। এইবার তুমি স্বাধীন হও। কি বল? পারবে না? তার ছবির চোয়াল দুটো শক্ত

হয়ে উঠেছিল। ছবি বলেছিল, কি সে বলেছিল তার হিসেব সে আজও করে না। মনে হয়েছিল সেদিন, আজও হচ্ছে যে সে নয় তার ছবিই বলেছিল—নিশ্চয় পারব। কেন পারব না?—তা হ'লে—; সে বলেছিল—ওই পনেরই আগস্ট চল, স্বাধীন দেশে, স্বাধীন মেয়ে হয়ে বেরিয়ে পড়ি! নিশ্চয়! পাকা কথা!

বলেছিল সে রণজিৎকে। সে বলেছিল—তুই বল বাবাকে দাদাকে। আমি নিশ্চয় সাপোর্ট করব!

জ্যাঠামশায়কে সে নিজে গিয়ে বলেছিল।

জ্যাঠামশায় ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলেছিলেন—বেশ! বলবার তা কিছুই নেই আমার। সাবালিকাও তুমি হও। তা হলে বাড়িটার দাম ঠিক করে একটা দলিল লেখাই—আর হিসেব করি—কত মজুত আছে তোমার খরচের পাই পয়সার হিসেব আমার আছে।

সে খুশী হয়েই ফিরে এসেছিল। রণজিৎকে বলতে গিয়ে খুঁজে পায় নি। পাওয়ার কথাও নয়। সে পাগলা ঘোড়ার মত ছোটে আজকাল, ছুটো তিনটেয় ফেরে। শোনা যায়—সে দাঙ্গার আজকাল নেতা হয়ে উঠেছে। এবং প্রচণ্ডরূপ উগ্র। বাড়ির সকলেও কথা বলতে ভয় করে। রণজিৎকে না-পেয়ে সে কথাটা বলেছিল—এণাক্ষীকে। এণাক্ষী বলেছিল—তা বাড়ি ছেড়ে যাবে কেন?

একটু ভেবে সে বলেছিল—নতুন পথে—এ বাড়িতে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করি। ভাল লাগে না। মনে ওদের সঙ্গে—।

এণাক্ষী বলেছিল, বুঝলাম। তা বেশ। কি বলতে পারি আর? যাত্রা শুভ হোক তোমার!

যাত্রার আয়োজনই সে সম্পূর্ণ করছিল। কি আর আয়োজন! একটা ট্রাঙ্ক। তাতে যা ধরে। সেই ট্রাঙ্কটাই একবার আজ সাজিয়ে, বন্ধ ক'রে কাল খুলে আর ছুটো জিনিস পুরে—ছুটো জিনিস বের করে দেওয়া। এই আর কি!

হঠাৎ ঘটল নাটক!

সেদিন ভোরবেলা বাড়িতে গোলমাল! চমকে উঠে বসল।—কি? ছোরাখানা নিয়ে সে জানলায় দাঁড়াল।

জ্যাঠাইমা চীৎকার করে উঠলেন—রঞ্জিত রে!—ওরে রঞ্জিত! সে ছুটে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। কাছে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই জ্যাঠামশাই একটা আর্তনাদ করে ধড়াস করে আছাড় খেয়ে পড়লেন। সংজ্ঞা ছুটে গেল জ্যাঠামশাইকে ধরতে তুলতে। সামনেটার আড়াল সরে গেছে। সেখানে রক্তমাখা কাপড় জামা ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ, রণজিত পড়ে আছে। মুখখানা অক্ষত।

বোমায় রণজিত মারা গেছে।

* * *

রণজিত মেতেছিল দাঙ্গার মহামারণে। কাল রাত্রে কোথায় বোমা মারতে গিয়ে বোমা মেরে পালাবার সময় পা পিছলে পড়ে সঙ্গের অন্য বোমাটা ফেটে ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে গেছে।

জ্যাঠামশাই অজ্ঞান হয়ে গেছেন। ডাক্তার এসে দেখে বললেন—সেরিব্রেল থ্রম্বসিস। পঙ্গু হয়ে বাঁচলেও বাঁচতে পারেন। বিচিত্র জেঠীমা, তিনি এসে বসলেন—স্বামীর পাশে। আশ্চর্য বসা। বেলা দুপুর হল, উঠলেন না। তারপর এসে দাঁড়াল এণাক্ষী, বললে, আমি বসছি আপনি—একবার—। জেঠীমা বললেন—না। তুমি ওপরে যাও।

তারপর নীরার দিকে চেয়ে বলেছিলেন, তুই একটু বসবি? আমি স্নান পুজোটা সেরে আসি!

সে বসেছিল।

পনেরই আগস্ট তারিখেও নীরা সারাটা দিন বসেছিল জ্যাঠামশাইয়ের শিয়রে। জেঠীমার সেদিন জ্বর। প্রবল জ্বর। কে বসবে? সে-ই বসে রইল।

ওদিকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গেল।

ছয়

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য এখানেই শেষ করো। এ অঙ্কের শেষ হোক চতুর্থ দৃশ্যে। না হলে কাল তো নিরবধি। তার তো ছেদ নেই। জীবনে ঘটনার চলারও ছেদ নেই। ছেদগুলি গ'ড়ে নিতে হয়। এ অঙ্ক আর একটা দৃশ্যে টেনে দাও। কারণ এমন নাটকীয় ঘটনায় তার যাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দেড় বৎসরের মধ্যে একটা বছর ওই জ্যাঠামশাইয়ের শিয়রে বসে থাকা। অথবা অসহায় ভাবে জেঠাইমাকে তাঁর শিয়রে বসে থাকতে দেখা।

এরই মধ্যে কেটে গেল সাতচল্লিশ সাল। অজিত ব্যবসার মালিক হয়ে ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। নতুন বিভাগ খুলেছে। শক্তিগড়ের কাছাকাছি রাইস মিল কিনেছে। শুধু তাই নয়, রেফিউজিদের সেবা করে, দান করে নামও কিনেছে। আগামী ইলেকশনে সে দাঁড়াবে। টিকিট চাই তার। মধ্যে মধ্যে দিল্লী যায়, সঙ্গে এণাক্ষী। নতুন ব্যবসায়ে বড় ব্যবসাদার শরিক জুটেছে। প্রবীণ হুঁশিয়ার মানুষ। দ্রুত ধাবমান রথ থেকে নেমে অজিতের বৃদ্ধ অসহায় পরাণবাবুর শয্যার পাশে দাঁড়াবার অবকাশ কে থায়। অন্য ছেলেরা সুশিক্ষিত অভিজ্ঞিত তাদেরও সময় নেই। এর মধ্যে ওই জেঠীমাকে এই রোগীর পাশে একা রেখে আসতে সে পারে নি। কিন্তু তার যে দিন চলে যায়! দরখাস্ত কয়েকটা করেছিল, কিন্তু কোনটাতেই সাড়া মেলে নি। একে শুধু ম্যাট্রিক, তার উপর সর্বত্র সরকারী নির্দেশে রেফিউজি অগ্রাধিকার জীবনের মুক্তিপথকে সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর করে দিয়েছিল। এই মধ্যে সে হঠাৎ মনস্থির করলে সে আই-এ পরীক্ষা দেবে। পাস সে করবে। যে ডিভিসনে হোক। বইগুলি পড়েই ছিল; আবার সেই বই নিয়ে বসল এবং একদিন অজিতকে গিয়ে বললে, সে পরীক্ষা দেবে। ফিয়ের টাকা চাই। কিছু বই চাই। অজিত বললে, পরীক্ষা? পড়লে কোথায়?

—পড়েছি।

অনেক দিন পর এণাক্ষীর সঙ্গে দেখা। তেতলা ইন্দ্রলোক। সে মর্তভূমের বাসিন্দা দেখা বরাবর কদাচিৎই বটে কিন্তু জ্যাঠামশায়ের এই অসুখের পর থেকে রকমসকম যেন অন্য ধরনের হয়ে গেছে। আজকালও—দেখা হয় না এমন নয়, কিন্তু সে দেখায় শুধুই তাকানো, দেখা ঠিক হয় না। বোধ করি সেদিন যে জেঠীমা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে নীরাকে জ্যাঠা-মশায়ের শিয়রে বসতে দিয়েছিলেন এবং এখনও সেই বসে থাকে, তারই প্রতিক্রিয়ায় এণাক্ষী এমন হয়েছে। আজ হঠাৎ এণাক্ষী হেসে আক্ষেপ প্রকাশ করে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—তোমার কপালে শনির দৃষ্টি। না হলে তোমার অন্ন খায় কে? পরীক্ষা দেবে, দিয়ে হবে কি?

অজিত বলেছিল, থাক না ও-কথা।

—থাক। তবে তুমি নামচ ওই বিজনেসে, খুব ভাল হিরোইন হত।

সে কঠিনভাবে বলেছিল, সকল অন্ন সকলের জন্য নয় বউদি। কারও জন্যে গোবিন্দভোগ, কারুর জন্যে খুদ। আমার খুদের ভাগ্য। আমাকে আপনি আর এই কথাটা বলবেন না।

এণাক্ষী রাগ করে নি। হেসে বলেছিল, চমৎকার কথা বল তুমি। আচ্ছা আর বলব না। ওগো টাকাটা দিয়ে দাও বাপু।

ওই পরীক্ষা দেওয়া তার ভুল হল। অথবা ভুল নয়, ওইটেই তার মুক্তির পথ করে দিয়েছে।

সে ফেল হয়ে গেল। পড়তে সে ঠিক পায় নি। জ্যাঠামশাই মরতে মরতে মরছিলেন না। নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও প্রাণ বেরুচ্ছিল না। ডান হাত ডান অঙ্গ অবশ। কথা বলতে পারেন না। গোঙান, প্রলাপের রোগীর মত চিৎকার করেন। আর বাঁ হাতে ডান হাতের চেয়েও জোরে এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জেঠীমাকে মারেন, তাঁর চুল ধরে টানেন। ছুটে গিয়ে ছাড়াতে হত তাঁকে। মলমূত্র বিছানায়; গায়ে লাগে; মুক্ত করেন জেঠীমা; সে অবশ্য দু চারদিন করেছিল। তার অগোচর ছাড়া তিনি তাকে নড়তে দেন নি। শেষে বলেছিলেন, ও তুমি করতে যেয়ো না, ও আমি কাউকে করতে দেব না। আমি পুজোয় বসি, বাথরুমে যাই, থাকবেন কিছুক্ষণ ওই অবস্থায়। ওঁর অদৃষ্টে ওই রয়েছে। আমি বারণ করলাম।

হেনা আসত মধ্যে মধ্যে, নাকে কাপড় দিয়ে ঘরে ঢুকত। কিছুক্ষণ থাকত, তারপর ছেলের অজুহাত তুলে চলে যেত। একদিন তাকে বলেছিল, তুই ওখানে মরিস কেন? দাদারা তো নার্স রাখলেই পারে। মরণ তোর। পরের জন্যেই গেলি! সে হাসত।

পরীক্ষার ফল বেরুল, সে ফেল হয়েছে।

এরই দিন দশেক পর প্রায় এক বছর ভুগে জ্যাঠামশায় মারা গেলেন। জেঠীমা আবার ঘরে ঢুকলেন। সে তাঁর কাছে গিয়েছিল। জেঠীমা বলেছিলেন এবার আমার বিধবার জীবন নীরা। সেবা আমি কারুরই চাইনে। তুমি আমার কিছু ছুঁয়ো না। এরপরই চলে গেলেন কাশী।

সেই দিনই সেও চলে যেত। কিন্তু অজিত-দা ছিল না বাড়ি। গিয়েছিল বম্বে। তার টাকায় ছবি হচ্ছে। তার কি সব করবার জন্যে বম্বে গেছে এণাক্ষীকে নিয়ে।

ফিরে এলে সে বলতেই বললে, আমার ছবিটা রিলিজ হোক। টাকা আটকে গেছে। তার আগে তো পারছিনে। জোর করলেও উপায় নেই, পারব না। জ্যাঠামশায়ের আমল থেকেই দলিলপত্র হয়ে আছে। তারপর এ বছরের হিসেব সে নিজেই রেখেছে।

ছবি রিলিজ হল কিন্তু দু সপ্তাহেই ছবি শেষ। মাথায় হাত দিয়ে বসল অজিতদা। একদিন পর এণাক্ষীকে নিয়ে গাড়িতে কোথায় চলে গেল। সুজিত বাড়িতে বসে রইল, আপিস গেল না।

দিন কয়েক পর একখানা বড় গাড়ি এসে দাঁড়াল। সুজিত চাকরকে বললে, বল গিয়ে বাবুরা সব বাইরে গেছেন। কিন্তু চাকরকে ঠেলে তিনি বাড়ি ঢুকলেন। অবশ্য তার আগেই সুজিত খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

অজিতবাবু! অজিতবাবু! সুজিত। কে রয়েছে বাড়িতে?

এবার বাধ্য হয়ে বেরিয়ে এল নীরা। এঁরা তো কেউ বাড়ি নেই!

এক বৃদ্ধ; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিশ্চয়। তিনি বললেন, কোথায় গেছেন?

নীরা বললে, তার আগে আমার কথার জবাব দিন। আপনি এভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন কেন? আপনি কোন একজন সম্ভ্রান্ত লোক।

বৃদ্ধ নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, চাকর বললে, বাবুরা কেউ বাড়ি নেই। অজিত স্ত্রী ছাড়া কোথাও যায় না, ওর মা কাশীতে।

বাধা দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে আরোপ করে। নীরা হেসেই বললে, আরও কেউ থাকতে পারেন; দেখতেই পাচ্ছেন আমি রয়েছি।

বৃদ্ধ বললেন, আমার ভুল হয়েছে স্বীকার করছি। অজিতের কারবারে আমি অংশীদার। আমার প্রয়োজন জরুরী। আমার মনে হচ্ছে, এরা ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে দেখা করছে না। তাই ঠিক হিসেবটা হয় নি। তোমার কথা মনে হয় নি আমার! তুমি তো অজিতের খুড়তুতো বোন। কিন্তু—। কথাটা কিন্তুতেই চাপা রেখে বলেন, চমৎকার মেয়ে তো তুমি!

চুপ করে ছিল নীরা।

বৃদ্ধ বলেছিলেন, আচ্ছা আসি মা। আমি বৃদ্ধ, কোন অপরাধ নিয়ো না আমার।

পরদিন আপিসের একজন কর্মচারী এসে সুজিতের সঙ্গে দেখা করলে। সুজিত বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে। ফিরে এল হাসিমুখে পরদিন যথাসময়ে আপিস গেল। পরদিন সেই বৃদ্ধ এলেন। এবার সুজিত সমাদর করে তাঁকে ড্রইংরুমে বসাল। তারপর তাকে ডাকলে, উনি একবার ডাকছেন। কি হয়েছে সেদিন! হাসতে লাগল। আসতেই হবে, নইলে উনি আসবেন। বলছেন, আমার ঠিক ক্ষমা চাওয়া হয় নি। এসেছেন ওই জন্যে। ভারী ভাল লেগেছিল নীরার সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের এই বিনয়। আভিজাত্যের প্রতি মোহ তার নেই বরং একটু বিরূপতাই আছে কিন্তু সেদিন সম্ভ্রম অনুভব না করে পারে নি। এবং লজ্জাও পেয়েছিল। কি মুশকিল দেখ তো, না বুঝে কোন্ মানুষকে কি বলে ফেলেছে সে। কুণ্ঠিত ভাবেই সে ড্রইংরুমে গিয়েছিল। ভাবতে ভাবতেই গিয়েছিল কি কোন্ কোন্ কথাগুলি

সত্যাই রূঢ় হয়েছিল। ঘরে ঢুকেই কিন্তু আরও অপ্রস্তুত হয়ে গেল। একটি যুবকও বসে আছে। সম্ভ্রান্ত ও রূপবান ছেলে।

বৃদ্ধ বলেছিলেন, এটি আমার ছেলে মা। ভাল ছেলে, এম-এ পড়ে, আবার দুষ্টু ছেলে। ওকে নিয়ে এই পথে যাচ্ছিলাম, তা মনে হল সেদিনের ত্রুটি স্বীকার যেন ঠিক হয় নি। তাই নেমে পড়লাম। সেরে নিতে চাই সেটা।

নীরা দুজনকেই নমস্কার করেছিল, তারপর বলেছিল, না। ত্রুটি আমারও হয়েছিল। আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। আপনার মত প্রবীণ সম্মানী লোককে আমার—।

কথার মাঝখানেই হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন বৃদ্ধ, বলেছিলেন, অসামান্য মা। শুধু ব্যবহারে নয়। রূপেও। তাই তো ভুল হয়ে গেল আমার। কারণ অজিত বলত আমার খুড়তুতো বোন একটু কালো, বেশী ঢ্যাঙা। আমি চিনতে পারলাম না, তুমি তো কালো নও। তুমি শ্যামা। আর ঢ্যাঙাও নও—তুমি মহিমাময়ী, তাই মাথায় একটু সাধারণ থেকে উঁচু। যা মিষ্টি করে আমাকে সচেতন করেছিলে। জান, এই আমার এম-এ পড়া ছেলে আমার সামনে কথাটি বলতে পারে না।

ছেলেটি সত্যাই স্তব্ধ মৌন হয়ে বসেছিল।

তারপর ঘটনাগুলো ঘটল অত্যন্ত দ্রুত। যেন বাঁকের মোড় ফিরে সমতলে পড়ে ছুটল ঘটনার বন্যা। অজিত এণাক্ষী ফিরে এল। পুজোর পর তখন। এসেই তাকে ডেকে বললে, নীরা, একটা কথা আছে। আমাদের তো মনে হয় আশ্চর্য সুসংবাদ। সোমেশবাবু তোকে পুত্রবধূ করতে চান। তিনি তোকে দেখে গেছেন। ছেলেও দেখেছে, তুইও দেখেছিস, তোর ভাগ্য ভাল রে—আশ্চর্য ভাল।

এণাক্ষী বলেছিল, বহু লক্ষের মালিক।

তার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তবু সে বলেছিল, ভেবে বলব। সারাটা রাত্রি—সে তার নিদ্রাহীন রাত্রি। ঘরে আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বার বার প্রশ্ন করেছিল, তুমি এত রূপসী? তুমি এত ভাগ্যবতী? আকস্মিকতায় তার অতীতের সব দুঃখ, ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে এক রহস্যময়ী যাদুকরীর সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বর্ষার কালো মেঘের মত কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়ে শরৎ-প্রভাত জেগে উঠেছিল। সেখানে যাদুকরী প্রকৃতি—আর এখানে সে যাদুকরী ভাগ্য যাকে সে এতদিন শুধু জেঠীমার সঙ্গে তুলনা করে এসেছে। যাকে সে মানতে চায় নি। সেদিন তার প্রতি শ্রদ্ধা হয়েছিল তার। জীবনে মোহ বোধ করি ওই একবার।

বৃদ্ধ কিন্তু সত্যাই সম্ভ্রান্ত, সত্যাই অভিজাত। রূপবান যুবকটির স্তব্ধ মৌনতার মধ্যেও একটি সংযত সম্ভ্রম দেখেছিল।

সকালবেলা অজিতই এসে ডেকেছিল—নীরা! নীরা!

নীরা তখনও ঘুমোচ্ছিল। সারারাত্রি সে ঘুমোয় নি; ভেবে নিজের ভাগ্যকে লক্ষ্মীর মত

বন্দনা করে—এই শেষরাত্রে তার পায়ে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছিল। সে ঘুম ভেঙেছিল অজিতদার ডাকে। সে জেগে উঠে বলেছিল, হ্যাঁ, বলো আমার মত আছে। তবে আমার বাবার যে টাকা কটি আছে তাই সব। তার বেশী দাবী করলে চলবে না এবং তা না নিলেও হবে না। তোমরাও কিছু দিতে পারবে না।

* * *

তাই হয়েছিল। সোমেশবাবু নিজে এসে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন, গলায় জড়োয়া নেকলেস পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি রাজ্য চালাতে পারো মা। সঙ্গে সঙ্গে দিনস্থিরও হয়েছিল অগ্রহায়ণে। জেঠীমা এসেছিলেন কাশী থেকে। সে নিজেই তাকে লিখেছিল, এবং অজিতকে বলেছিল তাঁকে আনতে হবে তিনি না হলে হবে না। তিনিই আমাকে সম্প্রদান করবেন। জেঠীমাও এসেছিলেন।

এল বিয়ের দিন।

সেদিন তাকে সাজিয়েছিল এণাক্ষী। নিজের মেয়ের রূপসীকে পূর্ণ যৌবনে রাণীর মত মহিমায় প্রকাশিত দেখে নিজেই সে নিজের প্রেমে পড়েছিল। দীর্ঘাঙ্গী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল, মধ্য-ফাল্গুনের শ্যামলতার মত উজ্জ্বল-শ্যামা, তার উপর ঘন কালো একরাশি চুলের পৃষ্ঠপটে সে যেন কোন কাব্যের নায়িকা নায়কের জন্য প্রতীক্ষমাণা। কন্যাকুমারী। জেঠীমা সম্প্রদান করবেন। আত্মভোলার মত বসে ছিল নীরা। সারাদিন উপবাস করে আছে। দেহ মন যেন দীর্ঘকালের রোগমুক্তির পর লঘু স্নিগ্ধ শান্ত মনে হচ্ছে খুব ভাল লাগছে। সে দুমের দু হাতের অঞ্জলিতে ধরে না এমনি বড় একটি পুষ্প-স্বপ্নের মধ্যে মধ্যে এণাক্ষী এসে প্রশ্ন করছিল—ছেঁড়া কখানা বই, ছেলেদের বই, ও কি হবে?

একটু হেসে নীরা বলেছিল—ও কখানা আমার ছেলেবেলার লাইব্রেরী।

—আচ্ছা! এণাক্ষীও হেসে চলে গিয়েছিল।

আবার আসছিল আর এক কথা জিজ্ঞাসা করতে। কারণ স্থির হয়েছে কাল ফুলশয্যা সেরেই ওরা রাত্রে ট্রেনে উঠবে, যাবে ভারত ভ্রমণে। ট্রেনেই হবে ফুলশয্যা। পরের বাড়িতে প্রীতিভোজন কালই সারা হয়ে যাবে। এণাক্ষী তাই সব জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছে।

নীরা অত্যন্ত ক্লান্তভাবে শান্ত। তার আর কিছু মনে করবার শক্তি নেই। ভাগ্যের ঐশ্বর্যময় ইন্দ্রপুরীর যবনিকা উঠছে তা দেখে বিস্মিত হবার মত শক্তি নেই তার।

প্রথম সন্ধ্যাতেই লগ্ন।

পাত্র এসেছে। সানাই বাজছে। চারিদিকে ব্যস্ততার কোলাহল। ফুলের মালার, ফুলের সজ্জার, পুষ্পসারের সৌরভে চারিদিক ভরে গেছে। এদিক দিয়ে অজিতদা আয়োজনের ত্রুটি রাখে নি। সে একক্ষেত্রে নীরার কথা শোনে নি। সে বাড়িটি কে খুব ভাল ক'রে সাজিয়েছে। খাওয়াদাওয়ারও আয়োজন করেছে সরকারী গেস্ট কন্ট্রোল অর্ডারকে সুকৌশলে ফাঁকি দিয়ে। রোশনচৌকি বাজছে। মেয়েরা সব বাইরের প্যাণ্ডেলের দিকে গিয়ে বসেছে। বর দেখছে। নীরা বসে শূন্যমনে যেন ডুবে যাচ্ছিল সুখস্বপ্নের মত একটি অনুভূতির মধ্যে!

অকস্মাৎ কি একটা চীৎকার উঠল।

কি? কি? কে? কে? এই! এই! নিকালো নিকালো। এই! সব ছাপিয়ে একটি নারীকণ্ঠের আর্ত কান্না বেজে উঠল—না—না—আমি যাব না। না—।

উনি আমার স্বামী। আমার—আমার—।

চমকে উঠল নীরা। ঘুমন্ত, সুখ-স্বপ্নে ভোর মানুষের গায়ে অস্ফুটস্বরে জলন্ত আঙরা পড়লে যেমনভাবে চমকে ওঠে।

পাশের ঘরে কার হাত থেকে যেন একরাশ বাসন পড়ে গেল ঝনঝন শব্দে। বোধ করি সে-ই বললে—ওমা, মেয়েটার যে সন্তান হবে গো। ও যে বলছে—বর ওর স্বামী। ওকে বিয়ে করেছে। ওমা কোথায় যাব গো। সানাই থেমে গেছে।

কে চীৎকার করে উঠল ভারী গলায়, পুলিসে খবর দাও অজিত। এরা ব্ল্যাকমেলার। কোথায় টেলিফোন? চল নিজেই বলছি আমি। ডেপুটি কমিশনার আমার বন্ধু। চল। তোমরা এদের বসিয়ে রাখ ধরে রাখ!

নীরা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আসরটা আশ্চর্য রকমে প্রশ্নের গুরুত্বে নির্বাক হয়ে গেছে!

মেয়েটিই শুধু থামে নি। সে বলছে, ওগো তুমি বল! তার সঙ্গে কান্নার স্পষ্ট প্রকাশ।

ওঃ, সে কি নির্মম বাস্তবের নিষ্ঠুর প্রকাশ। মহাকাব্যের বর্ণনার মত আলো নেভে নি, পুষ্পসজ্জা বিধ্বস্ত হয় নি; সৌরভের হানি ঘটে নি; তবে হাঁ, সানাই থেমে গিয়েছিল। ও যে মানুষের বাজনা। মেয়েরা ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল রেলিংয়ে ভর দিয়ে। কি হল? তাদের সঙ্গে সেও। থর থর করে কাঁপছিল সর্বাঙ্গ। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ভয়ে উদ্বেগে যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। মিনিটে যদি হৃদস্পন্দনের সংখ্যা সীমায় বাঁধা থাকে তবে সে তখন এক মিনিটে বহু মিনিট অতিক্রম করছিল। হয়তো সমস্ত পরমায়ুর স্পন্দনসংখ্যা শেষ করে লুকিয়ে পড়তে চেয়েছিল। অথবা এই ঘটনার সময়টা সংক্ষিপ্ত করে দিতে চেয়েছিল।

একটি সুন্দরী মেয়ে। মা হবে অল্পদিনে। দু চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। সে কাঁদছে আর বলছে—ওগো তুমি বল। বর পাথর, নতশির। যার মধ্যে তার স্বীকৃতি সুস্পষ্ট। সঙ্গে এক বৃদ্ধ, আর কয়েকজন অল্পবয়সী ছেলে।

বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত সোমেশবাবুর আজ এই মুহূর্তে এ কি মূর্তি? হাতের রুপোবাঁধানো ছড়িটা ঠুকছেন আর বলছেন তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি জোচ্চোর। ঠগ তোমরা। বেরিয়ে যাও! আমি এক্ষুনি ডি-সিকে টেলিফোন করতে চাই। অজিত! কিন্তু নড়ছেন না। যেন দণ্ডমুণ্ডের কোন শাসনকর্তা—যিনি মুহূর্তে দণ্ড হিসাবে মুণ্ডটা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন। তাঁর অন্যের সাহায্য নিতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।

অজিতদা তার সুরে সুর মিলিয়ে বলছে, ব্ল্যাকমেলারস!

মেয়েটির সঙ্গের বৃদ্ধ হাত জোড় করে বলছে, না—না—ঈশ্বরের শপথ করে বলছি এ সত্য। আপনার ছেলে আমার মৃতপুত্রের সহপাঠী ছিল। আমি গরিব, আমি সাধারণ, কিন্তু সে লেখাপড়ায় অসাধারণ ছিল। সেই সূত্রে আপনার ছেলে আমার বাড়ি আসত। আমার ওই মেয়ে

হতভাগিনী, বিবেচনা করে নি, বিচার করে নি সম্ভব অসম্ভব, হাত বাড়িয়েছিল আপনার পুত্রের দিকে। আমার ছেলের মৃত্যুর পর স্নেহের মধ্য দিয়ে ঘটেছে এটা। দোষ আপনার ছেলেকে আমি দেব না। জেনে, অভিসম্পাত দিয়েছি মেয়েকে। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। সর্বনাশ তখন ঘটে গেছে। দয়া করুন—

—প্রমাণ কি? আপনাকে আমি পুলিসে দেব।

—এই দেখুন ওদের বিবাহের পরদিনের ছবি, জিজ্ঞাসা করুন আপনার ছেলেকে।

—কিসের বিবাহ? কই সার্টিফিকেট কই?

—রেজেস্ট্রি করে বিবাহ হয় নি। কথা ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠে নি। হিন্দুমতে ভগবান সাক্ষী রেখে।

—ভগবান সাক্ষী? আমরা ব্রাহ্মণ, আপনি কায়স্থ, হিন্দুমতে ভগবান এ বিবাহ স্বীকার করেন? করেন না। চলে না। আপনি চলে যান।

ধীরে ধীরে এসে ঘরে ঢুকে নীরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ কি হল? কি করবে সে? পৃথিবী শূন্য হয়ে গেছে তার কাছে। বুকের মধ্যে একটা ঝড় বইছে শুধু। হাহাকার ক্রোধ মিলে প্রচণ্ড একটা কিছু। কানে এল পাশের ঘরে এণাক্ষী বলছে, ওরা খবর পেলে কি করে? ছি-ছি ছি!

অজিতদা বললে, কি করে জানব? আমি কি করে বলব। আমি বার বার সোমেশ-বাবুকে এ সব উৎসব-টুৎসব করতে বারণ করেছিলাম। উনি যে নিজেকে বড় পয়গম্বর মনে করেন। হ্যাঃ—ওরা আবার কিছু করতে পারে।

এণাক্ষী বলেছিল, তারপর? বিয়ে যদি ভেঙে যায়? টাকা তো সোমেশবাবু ছাড়বেন না! আমি কি করব বলার মানেটা ভেবেছ। টাকাটা ছাড়ছিলেন তিনি এই জন্যেই—।

সকল আবরণ ছিঁড়ে গেল। অনেকক্ষণ অর্থাৎ সেই মুহূর্ত থেকেই ছিঁড়তে শুরু করেছে। তার অন্তরের সুখ-কল্পনার মোহ চেপে ধরেছিল, ছিঁড়তে দেবে না, কিন্তু সমস্ত ঘটনাগুলি এমনই নিষ্ঠুরভাবে সত্যের শক্তিতে প্রচণ্ড বেগে টেনে ছিঁড়েখুঁড়ে ছড়িয়ে দিয়ে নগ্ন করে দিলে, শেষটান দিলে এণাক্ষীর কথা। নগ্ন সত্য তার সামনে এসে ব্যঙ্গ হেসে দাঁড়াল। না, সত্য ব্যঙ্গ হাসি হাসে না; সে ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, বল, এবার কি করবে? স্থির কর তোমার পথ।

সে-ই তার পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দিয়েছিল, ওই পথ।

এ বাড়ির সদর দরজা পার হয়ে বিশাল পৃথিবীর দিকে দিকে পথ চলে গেছে। যে পথে বার বার চলতে চেয়েছো কিন্তু চেয়েও পারোনি। আজ বের হও। এই রাত্রেই, এই মুহূর্তে।

বিলম্ব সে করে নি। মালা ছিঁড়ে ফেলেছিল, গহনা খুলে ফেলেছিল, শাঁখা ভেঙে ফেলেছিল, কনে-চন্দন মুখের কাজল, মুখের প্রসাধন মুছে বেনারসী শাড়ী ব্লাউস বদলে সাধারণ শাড়ি ব্লাউস পরে বেরিয়ে পড়বার মুখে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

ঘরখানা মৃত রণজিতের ঘর। তার জন্য এখন থেকে সাজানো থাকবার কথা। রণজিতের ড্রয়ার খুলে সে বের করে নিয়েছিল তার একখানা ছোট নেপালী ভোজালী।

রণজিত যেখানা তাকে দিয়েছিল সেখানা সে স্বপ্নের মোহে খাপে ভরে বাক্সে রেখেছে, কাছে নেই। এটা তার চেয়ে ছোট, মারাত্মক। আর তুলে নিয়েছিল সাজানো দান-সামগ্রীর মধ্যে রাখা একটি ছোট ভেলভেটের থলি। তাতে ছিল নগদ, একশো এক টাকার ধাতুর টাকা।

বিবাহ-সভার সবার সামনে এসে সে দাঁড়িয়েছিল। অকুণ্ঠিতা অসমসাহসে সে তখন অগ্নিশিখার মত জ্বলছে; প্রদীপ্ত অনবনমিতা সে তখন। সোমেশবাবুকে বলেছিল, আপনার পুত্র আর পুত্রবধূকে নিয়ে ফিরে যান দয়া করে। আমি বিবাহ করব না।

চমকে উঠেছিল সমস্ত সভাটা।

অজিত ছুটে এসেছিল।—নীরা!

সে ভোজালিটা বের করে বলেছিল, এসো না আমার কাছে। তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।

হতভাগিনী সেই মেয়েটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। নীরা তাকে বলেছিল, জোর করে তোমার স্বামীকে এখান থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাও. সে তোমার দায়। আমি চলে যাচ্ছি।

—নীরা! অজিত আর একবার চিৎকার করেছিল।

বাকী সব স্তব্ধ স্তম্ভিত। সে তারই মধ্যে চিন্তাহীন মনে শঙ্কাহীন চিত্তে দর্পিত পদক্ষেপে বেরিয়ে গিয়েছিল সদর দরজা দিয়েই। সেখানে ডেকরেটারদের সাজানো ফটকের মাথায় রোসনচৌকির লোকগুলি বসেছিল অবাক হয়ে।

—নীরা! আবার চিৎকার করেছিল অজিত।

—না। থাক, মনা ঘোষের উচ্ছিষ্ট কন্যায় আমার প্রয়োজন নেই। সোমেশবাবুর গম্ভীর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিল সে।

একবার ইচ্ছে হয়েছিল সে ফিরে জবাব দিয়ে আসে, কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছিল সে।

ছোরাটায় হাত রেখে রাত্রির পৃথিবীর পথে এগিয়েছিল নির্ভয়ে; কনেসজ্জার এলো খোঁপাটা কখন এলিয়ে গেছে। কাজললতাটা তবুও কি ভাবে জড়িয়ে আটকে ছিল চুলে। পিঠে মধ্যে মধ্যে বিঁধছিল বলেই পেয়াল হল—কি এটা। কাজললতা? ব্যঙ্গে আপনিই তার ঠোঁট দুটো ভঙ্গি করে উঠেছিল। সেটাকে টেনে নিয়ে ফেলে দিয়েছিল পথে।

তার মুক্তি।

শেষ করো দ্বিতীয় অঙ্ক। যবনিকা পড়ুক!

বলো তো। বিনো সেন ব্যঙ্গ করে, তাকেই যেন ব্যঙ্গ করে বললে—যান এইবার। নাটক তো হয়ে গেছে। অর্থাৎ সেই নাটকটা করছিল, তার প্রস্থানের পরই নাটক শেষ হয়েছে—! তোমরাই বিচার করে বলো জীবন তার নাটক কিনা? সে সত্যই নাটকের নায়িকার মত বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে কিনা—তোমরাই বলো। বিপর্যয় এদেশে সবার জীবনেই আছে আসে যদি বলো তবে বলব আসে কিন্তু তারা লড়াই করে

না, সভয়ে আত্মসমর্পণ করে বলেই তারা নায়িকা হয় না।

তবে তার মত নায়িকা বাংলা দেশে একালে অনেক আছে গো। হেনা নয়—নীরারাই এ যুগে বেশী। যারা কলেজে পড়ছে, চাকরি করে বাপ-মাকে পুষছে তারা হেনাদের মত মনাদের সঙ্গে প্রেম করে না। হেনার বর অমল এই পাষণ্ড মনা এরা মনে করে এরা হেনাদের দল। হেনারাও মাঠে বেড়ায়, হোটেলে যায়। তাদের নিয়ে এরা খেলা করে। ভাবে সবাই হেনা। কাছে গিয়ে চড় খায় নীরাদের।

বিনো সেনের মত লোকও তাই ভাবে। ভণ্ড। সে ভাবছে বিনো সেনকে সে চড় মারবে না কেন? না—তা পারে নি!

সাত

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পিটছে।

আশ্রমের নিয়মমাফিক—শোবার ঘণ্টা পড়ছে। মেয়েদের ঘরের আলো নিভবে এবার, পনের মিনিট বাকী। সওয়া নটা সাড়ে নটায় আশ্রম অন্ধকার হয়। মন সম্পর্কে আগের কালে লোকে বলত—তুরঙ্গ অর্থাৎ ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগামী। মন বায়ুর চেয়েও দ্রুতগামী। বায়ু কেন, এ কালে জেট প্লেন হয়েছে—তার চেয়েও দ্রুতগামী। বায়ু ঝড়ের গতিতে যখন ছোটে—তখন ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে ছুটলেই পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সৃষ্টি ধ্বংস করে দেয়। জেট প্লেন ঘণ্টায় ছোটে ছ'শো মাইল,—আটশো মাইলও ছোটে। রকেট চলে আরও অনেক অনেক দ্রুততর গতিতে। চন্দ্রলোকে—শূন্যলোকে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরাম নেই। দ্রুতগামী এরোপ্লেনে মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যায়; যেতে পথে ক্লান্তি আসে, ঘুমোয়। ভাবে কতক্ষণে শেষ হবে এই বিরক্তিকর ছোটা। কিন্তু পৌঁছবার পর ঘরে বসে এই পথের কথা—তার ছবি—মনের পটে আগাগোড়া ভেসে যেতে কতক্ষণ লাগে? কয়েক মিনিট। মনের পটে স্মৃতির আলোয় প্রতিফলিত ছায়াছবি—মনের রঙ্গমঞ্চে স্মৃতির নাটকের অভিনয়—উনিশ বছরের জীবন রঙ্গমঞ্চের অভিনয়—মনোমঞ্চে একঘণ্টা বা কম সময়ে শেষ হয়ে গেল।

আশ্রমের এই শোবার ঘণ্টার সঙ্কেতে নীরা সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠল। বিনো সেনের সঙ্গে জীবন-মঞ্চের আসল নাটকে অনিবার্য সংঘাতপূর্ণ দৃশ্যটি শেষ করে ঘরে এসে বসে—উত্তেজনার মধ্যে আগাগোড়া জীবন-কথা স্মরণ করতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল নিজের মনো-রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে। সেখানে এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার জীবন-নাটকের যেন দুটি অঙ্কের অভিনয় হয়ে গেল। জীবন তার স্রষ্টার নির্দেশে নাটক কি না সেই সত্যকেই তার স্মৃতি যেন দেখিয়ে দিলে। মানুষের জীবন নিয়েই নাটক বিনো সেন। তাই নিয়েই উপন্যাস—গল্প—তাই নিয়েই শিল্প সাহিত্য সব। জীবনে নাটক আছে—শিল্প আছে—তাই ওগুলো সৃষ্টি করতে পেরেছে মানুষ। তুমি নাটক দেখেছ ভুল দেখ নি। তবে ওতে ব্যঙ্গের

কিছু নেই।

একটা পিতৃমাতৃহীনা দুঃখিনী মেয়ে—এই আত্মকেন্দ্রিক সংসারে শুধু আমার আমার আমার রোল তুলে কোটি কোটি আমির ঠেলাঠেলির মধ্যে বহু আঘাত সহ্য করে—আপন শক্তিমত তার ছোট হাতের দাঁতের নখের ধাক্কা কামড় আঁচড় দিয়ে—নিজের আমিকে বাঁচিয়ে এসেছে—তার 'আমি' সত্তার স্বত্বে 'আমার' ধ্বনিকে কারুর গলার জোরে চাপা পড়তে দেয় নি—সে তো কম বিচিত্র কম রোমাঞ্চকর নয়। বিনো সেনও তাকে আঘাত করলে? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে মীরা। বিনো সেনকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেছিল। এই চিঠিখানা পাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তা একটা মিনারের গৌরবে দাঁড়িয়েছিল। ছি-ছি-ছি, বিনো সেন নিজেই তাকে এক মুহূর্তে ভূমিসাৎ করে দিলে। সেই কারণেই ক্ষোভটাও হয়েছে প্রচণ্ড। তাকে সে ঘৃণাও করেছে এক মুহূর্তে।

না। থাক। আজ রাত্রেই তাকে যেতে হবে। যাবেই সে। শপথ করেছে সে। এখানকার অন্ন সে গ্রহণ করবে না। এখানে রাত্রির জন্যও বিশ্রাম করবে না চলে তাকে যেতেই হবে। যেমন সে ওই বিয়ের রাত্রে চলে এসেছিল। কিন্তু আর নয়, সে উঠল, জিনিসপত্র গোছোতে শুরু করলে। জিনিসপত্র আছে অনেক। থমকে দাঁড়িয়ে চারিদিকের জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলে।

'আমার' বলে সে এখানে এসে প্রথম কিছু না কিছু বস্তু সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল। পিছনের জীবনের কিছুই নেই। সবই ফেলে চলে এসেছে বিবাহ-বাসর ত্যাগ করবার সময়ে। পরণে যে সাজসজ্জা ছিল—তার সবই ছিল নতুন। বেনারসী বদলেও নতুন কাপড়ই পরতে হয়। বিয়ের কনের সজ্জা তো! সেই কাপড়জামাগুলি সে সযত্নে রেখেছে বটে—কিন্তু সে তার অতীতের সঞ্চয় নয়। জীবনের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্মৃতি। রণজিতের ছুরিখানা আছে সেখানাও তাই। থাকবার মধ্যে আছে মায়ের হাতের একটা আংটি। সেটা তার আঙুলে ছিল, বিয়ের দিনও সে সেটাকে খোলে নি।

তারপর এখানে এসে—এই বিনো সেনের আশ্রম-বিদ্যালয়ে এসে সে 'আমার' বলে যে বাসা ঘর পেয়েছিল তার মধ্যে সঞ্চয় শুরু করেছিল। প্রথম কিনেছিল ওই সস্তা ব্রাকেটটা। কিছু আসবাব আশ্রম থেকে দেওয়া হয়েছিল, এখানকার শাল কাঠের তৈরী নেয়ারের খাট, একটা টেবিল, দুখানা চেয়ার। তারপর সে অনেক করিয়েছে বরাত দিয়ে—নিজের পছন্দমত। এই ক'বছরে ঘরখানা ভরে গেছে। এগুলো ফেলে দিয়ে যাবে। শুধু বাক্স ব্যাগ নিয়ে তিনটে আর একটা বিছানা। একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সে বইগুলো। বাস। সে গোছাতে শুরু করে দিলে। কয়েক মিনিট গুছিয়েই সব রেখে ঘর খুলে বেরিয়ে এল। হাতে টর্চটা নিয়েই বেরিয়েছিল—সেটা জেলে এগিয়ে চলল।

এল বিনো সেনের ঘরের দিকেই। বিনো সেন বারান্দায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রতিমা নেই, সেনের বৃদ্ধ অধ্যাপক এখানকার রেক্টর, তিনি নেই, অণিমাদি নেই, কেউ নেই।

মীরা একটু দূর থেকেই তাঁকে দেখে একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ঘৃণা,

ক্রোধ, চক্ষুলজ্জা মিলিয়ে যে এক বিচিত্র জটিল সঙ্কোচের বাধা অতিক্রম ক'রে সে তাকে অতিক্রম করেই চলে গেল। যেন লক্ষ্যই করলে না তাকে। কিন্তু বিনো সেন আশ্চর্য মানুষ; লজ্জাহীন মর্যাদাহীন না কি সে অনুমান করতে পারলে না নীরা; তিনি নিজেই তাকে ডেকে বললেন, আপনি কি মাষ্টারমশাইয়ের ওখানে যাচ্ছেন? গাড়ীর জন্যে?

নীরা থমকে দাঁড়াল কিন্তু তার দিকে ফিরল না। বললে, হ্যাঁ। আমি রাত্রেই চলে যাব।

—হ্যাঁ অণিমাদি আমাকে বলে গেছেন। বলছিলেন আমাকে রাত্রে যেতে যেন বারণ করি। কিন্তু না, এক্ষেত্রে আপনি অন্তরে অস্বস্তি বোধ করবেন। আমি কুড়োরামকে সাম্‌পানি খানা তৈরী করতে বলেছি। সে তৈরী করছে। আর আপনার মাইনে ইত্যাদি গুলোরও হিসেব করতে বলে দিয়েছি রতনবাবুকে। তিনিও যাবেন আপনার কাছে অল্পক্ষণের মধ্যেই।

কয়েকটা মুহূর্ত নীরা যে নীরা সেও উত্তর দিতে না পেরে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেন একটি কথা খুঁজে পেয়ে বেঁচে গেল। হঠাৎ ধন্যবাদ কথাটা যুগিয়ে দিয়ে তার মনের মধ্যে থেকে তার অন্তরতম সত্তা বলে উঠল--ধন্যবাদটা দাও। বেঁচে গেল সে।

ধন্যবাদ। বলেই সে ঘুরল এবং হন হন করে এসে আপনার বারান্দায় উঠল। মনে হল সে এইটুকুতেই হাঁপিয়ে উঠেছে। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে যেন সামলে নিলে। সন্ধ্যায় দুরন্ত ক্রোধে ক্ষোভে সে বিনো সেনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করে এমন হাঁপিয়ে ওঠে নি। বিনো সেনের ওই আপনি সম্বোধনটা যেন তাকে একটা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। কেন তা বলতে পারবে না। তবে হেনেছে। না পারবে নাই বা কেন? লোকটিকে শ্রদ্ধা করেছে প্রথম দিন থেকেই! এই বহুরূপী মুখোসপরা মানুষটি কি মনোহরভাবেই মনোহর পটভূমিতে আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে তার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন! মনে পড়ে গেল!

*　　　*　　　*

মনের রঙ্গমঞ্চের যবনিকা আবার উঠে গেল। মনের রঙ্গমঞ্চে স্মৃতির প্রযোজনায় একবার নাটক শুরু হ'লে আর যেখানে ইচ্ছে সেখানেই তো ছেদ টানা যায় না। বিশেষ ক'রে যদি মর্মে আঘাত লেগে থাকে। মর্মান্তিক আঘাতে ক্ষুব্ধ স্মৃতি সেদিন ওই নাটকের মধ্য থেকে হিসেব-নিকেশ ক'রে দেখে।

যবনিকা উঠছে।

তৃতীয় অঙ্ক, যে অঙ্ক আজ শেষ হল সেই অঙ্কের প্রথম। বিয়ের আসর থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল আশ্চর্য সাহসে ভর ক'রে। আশ্চর্য আর কী? সোমেশবাবু, অজিতদা, মীনাক্ষীদের প্রতারণায় প্রবঞ্চনায় ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল সে। শৈশব থেকে সে মার খেয়ে কখনও চুপ করে থাকে নি। সেও মেরেছে। না-হলে হয়তো ছাদ থেকে ঝাঁপ খেতো, কাপড়ে আগুন লাগতো, নয়তো কাঁদতো, অজ্ঞান হয়ে যেতো তারপর আত্মসমর্পণ করতো। কিন্তু চিতাবাঘিনী তখন কৈশোর অতিক্রম করেছে, নিজের শক্তিকে জেনেছে—তার উপর হিংস্র স্বভাব যেমনটি তাকে করিয়েছে তেমনটি করেছে। সে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ির সামনে

বাঁধা প্যাণ্ডেলটা পার হয়ে।

রাস্তায় তখন ভিড় জমেছে। সে থমকে দাঁড়িয়ে বারেকের জন্য ভেবে নিয়েছিল। কি করবে? কোথায় যাবে? কুসুমশায় এ বাড়ি ছেড়ে বালিগঞ্জে বাড়ি করে উঠে গেছেন। না-হলে আজ হয়তো প্যাণ্ডেলেই তার সঙ্গে দেখা হ'ত। তিনি সাহায্য করতেন। তবে? যাবে কোথায়? কিন্তু দাঁড়িয়ে ভাববারও সময় নেই। পিছনে শিকারীর দলের সামনে চিতাবাঘিনীর মতই গর্জন করে বেরিয়ে এসেছে। যে কোন মুহূর্তে আবার আক্রমণ আসতে পারে। জেঠীমার চীৎকার শোনা যাচ্ছে।—নীরা—নীরা! লগ্নভ্রষ্ট হবে। নীরা।

নীরা সামনের জনতার দিকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে বললে—যেতে দিন আমাকে। পথ ছাড়ুন।

হাতের ছোরাখানা নিয়ে আস্ফালন সে করে নি—কিন্তু সেখানা হাতেই আছে। বের করাই আছে।

পথ তারা ছেড়েই দিয়েছিল। বেশ সম্ভ্রম করেই ছেড়ে দিয়েছিল।

একজন জিজ্ঞাসা করেছিল—কিন্তু কোথায় যাবেন?

মুহূর্তে মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—থানায়। পুলিসের কাছে যাব।

ভুল করে নি সে। ভুল হয় নি তার। মুহূর্তে নিজেই বুঝেছিল—ওইখানেই সে সব থেকে নিরাপদ হতে পারবে। হাঁ পুলিসের কাছে যাবে।

একটু এগিয়ে এসেই চার রাস্তার মোড়। বড় রাস্তায় বাস চলে। বাসের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল।

*　　　　*　　　　*

জিনিস গোছাতে গোছাতেই মনে হচ্ছিল এই। পুরনো কাপড়-চোপড়, ছোট ছোট কত টুকিটাকি—ছুড়েছুড়ে ফেলে দিচ্ছিল। সঞ্চয় তার জন্য নয়। সকল তুচ্ছ সঞ্চয়কে ফেলেই তাকে যেতে হবে এই তার নিয়তি।

এটা সেই সেই দিনের কাপড়খানা। এই কাপড় ব্লাউজ পরেই সে ঘর থেকে বেরিয়েছিল।

চৌরাস্তার বহুজনের দৃষ্টি তার দিকে পড়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। হওয়ারই কথা। বেনারসী শাড়ী ব্লাউস বদলেও নূতন কাপড় জামায় সেদিনের বিশেষ রূপটি সম্পূর্ণ বদলায় নি; মুখের চন্দন-তিলক চোখের কাজল অনেক জোরে ঘষে মুছলেও সে শোভার প্রকাশ মেঘাচ্ছন্ন শুক্লা পূর্ণিমার মতই আভাসে বোঝা যাচ্ছিল। চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সে লোকজনের দৃষ্টি দেখে। রাত্রি তখন বেশী হয় নি। সাড়ে সাতটা। পথে লোকজন অনেক। কিন্তু পৃথিবী বৈচিত্র্যময়ী।

আলোর মধ্যে ছায়ায় বিচিত্রিত। অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারায়, বনে-লাগা আগুনে, জোনাকী পোকায়, মানুষের জ্বালা আলোয় ঝলমল। আলো অন্ধকারের মত ভালোমন্দ সব জায়গায় আছে। মানুষের ভিতরে আছে—বাইরের জগতে আছে। সেদিনও দুটি ছেলে সেই মুহূর্তে পাশে এসে বলেছিল—কোন ভয় নেই দিদি। আমরা আছি। আমরা

রণজিতের বন্ধু।

একজন বলেছিল—আপনি আমাকে চেনেন। একদিন বোমা এনেছিলাম রণজিতের সঙ্গে গিয়ে।

তবু সন্দেহের চোখে সে দেখেছিল। তবে সাহস ছিল তার, আত্মহত্যা যে করে তার যে সাহস থাকে তাই তার ছিল। ছোরাখানাও ছিল। তখন সেখানা কোমরে গুঁজেছে।

আর একটি ছেলে বলেছিল—বিশ্বাস করুন। আপনি বোন। আমরা ভাই। মৃদুস্বরেই বলেছিল সে।

আমরা আপনাদের বাড়ির ওখান থেকেই বরাবর সঙ্গে সঙ্গেই আসছি। আমরা গোলমাল শুনেই গিয়েছিলাম। বিয়ে ভাঙব বলেই গিয়েছিলাম। আপনি নিজেই ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে আপনাকে। আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমরা সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দি। মনা ঘোষ এমনটা হবে ভাবে নি। অজিতবাবু তাকে টাকা দিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছিল। না হলে এতক্ষণ বেগ পেতেন আপনি। চলুন, দাঁড়াবেন না। থানায় চলুন। এই দিকে।

সে বলেছিল, না। কলকাতার কোন থানায় আমাকে পৌঁছে দিন।

এখানকার থানায় অজিতদার আলাপ আছে। এসে হয়তো—

সেই মুহূর্তেই একখানা বাস এসে পড়েছিল। তারাই তাকে নিয়ে উঠে পড়েছিল পরমাত্মীয়ের মত।

সে তাদের বিপদাপন্নের অসহায় অবস্থায় বিশ্বাস করার মত বিশ্বাস করে নি; বানের জলে ভেসে যাওয়া মানুষের তৃণগুচ্ছ বা খড়ের আঁটি আঁকড়ে ধরার মত ধরে নি তাদের। মনের বিশ্বাসে সে স্থির জেনে তাদের সাহায্য নিয়েছিল.

তারা তাই পৌঁছে দিয়েছিল উত্তর কলিকাতার এক থানায়। বিনা ভূমিকায় ইনস্পেক্টরকে সে বলেছিল, আমি বিয়ের আসর থেকে উঠে এসেছি, আমার বাপ নেই, মা নেই, ভাই বোন কেউ নেই, আছে জাঠতুতো ভাইয়েরা, ষড়যন্ত্র করে এক বড়লোকের পাষণ্ড ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। স্বার্থ, ওই বড়লোকের কাছে তাদের দেনা আছে। তা থেকে রেহাই পাবে। এসব কথা বিয়ের আসরে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। পাত্রের গোপনে বিয়ে করা বউ এসে হাজির হয়েছেন, আমি বেরিয়ে চলে এসেছি ছোরা দেখিয়ে। আমার বয়স উনিশ পূর্ণ হয়ে কুড়ি চলছে। এবার আই-এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আমি আশ্রয়ের জন্য এসেছি। আমাকে—

ইনস্পেক্টর বাধা দিয়ে চট করে প্রশ্নও করেছিলেন—তা বিয়ে তো কাউকে করতে হবে, বল কাকে বিয়ে করতে চাও? মানে কে তোমাকে বিয়ে করে এ বিপদে রক্ষা করতে পারে বল? থানা না হয় এক দিনের আশ্রয়। নাম কর তাকে খবর দি।

সে বলেছিল—না। কাউকে না। তেমন কাউকে আমি জানিনে চিনিনে। কেউ বিয়ে করতে চাইলেও আমি বিয়ে করব না।

—করবে না?

—না। সে যে পাষণ্ড বদমাস নয় তা কি করে জানব?

—হুঁ। কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে ইনস্পেক্টর বলেছিলেন—বিয়ের জন্যে তো সারাদিন খাও নি কিছু। উপবাস করে আছ। কিছু খাও, কেমন? চল আমার কোয়ার্টারে—আমার মা আছেন, স্ত্রী আছেন, ছেলেরা আছে, সেখানে চল। কিছু খাবে আর সব বলবে।

আপত্তি করে নি নীরা। সেখানে বসে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে সব শুনেছিলেন ইনস্পেক্টর। শুনে বলেছিলেন, তাই তো মা, তুমি তো কঠিন মেয়ে। চল—একবার থানায় চল, একটা কেস লিখে নি। সোমেশ চাটুজ্জেকে আমি জানি। অজিত মুখুজ্জে এণ্ড কোং এদেরও জানি। তোমাকে বাঁচাতে আমার মাথাটা বাঁচিয়ে রাখি।

ডাইরী লিখতে লিখতে হঠাৎ বলেছিলেন, তা তুমি গয়নাগুলো খুলে দিয়ে এলে কেন? সেগুলো কি দোষ করলে? সে সব তো তোমার বাপের টাকায়।

—না ইচ্ছে হল না। সমস্ত দেহমনই কেমন যেন ঘিন ঘিন করছিল।

—ঘিন ঘিন করছিল? বাঃ! চল এখন বাড়িতে আমার মায়ের কাছে শোবে। কেমন?

পরের দিন তিনি দমদম এলাকার থানায় ফোন করে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন। হেসে বলেছিলেন, সোমেশবাবুর ছেলের বিয়ে আটকায় নি মা, এ কন্যাদায়ের দেশে সমারোহের সঙ্গেই হয়ে গেছে। এবং ছেলেটি তার পূর্ব বিয়ের কথা বেমালুম দিব্যি করে অস্বীকার করেছে, বলেছে, সে বিয়ে করে নি। পাত্রী ওই তোমাদের পাড়াতেই জুটে গেছে। অজিতবাবুই দেখেশুনে জুটিয়েছেন। তারা আর তোমাকে খোঁজেনও না, দাবীও করেন না। মামলা নেই, চুকে গেছে। সুতরাং এখন তুমি মুক্ত। কোথায় যাবে বল?

মনে পড়েছিল তার কুণ্ডুবাবুর কথা। কুণ্ডুবাবুর নামও ইন্স্পেক্টরের অপরিচিত ছিল না। বলেছিলেন—তাঁকেও তো জানি মা। সেখানে যাবে?

—তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। আমার ভালো দেখতেন। ইনস্পেক্টর হেসে বলেছিলেন—তা দেখতেন। তখন তার গরজ ছিল বাড়িতে তোমার অংশটার জন্যে। আর—বাবার বন্ধু বলছ—তা তোমার জ্যেঠামশায় তো তোমার বাপের সহোদর ছিলেন।

কথাটা ঠিক বুঝতে পারে নি নীরা। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তাঁর মুখের দিকে।

ইনস্পেক্টর বলেছিলেন—কুণ্ডুবাবু যুদ্ধের বাজারে বহু লক্ষ টাকা কামিয়ে এখন কলকাতার বনেদীবাবুদের চাল ধরেছেন। লোকটি কোনদিনই ভাল ছিল না। তখন যা গোপনে করত এখন প্রকাশ্যে করছে। তখন ছিল জোনাকী পোকা এখন হয়েছে চাঁদ। কলঙ্ক তার শোভা। আমার এলাকাতেই তার একখানা বাড়ী আছে। সেই বাড়িতেই আজকাল রাত্রে এসে থাকে। নানাজনের কাছে নানান রিপোর্ট পাচ্ছি। এখনও ঠিক কিছু বলতে পারি না। তাছাড়া তার এক ছেলে বিলেত ঘুরে এসেছে এই কিছুদিন হল। এর মধ্যে বার তিনেক ধরা পড়েছে মাতাল অবস্থায় চৌরঙ্গীর হোটেলে ফিরিঙ্গী মেয়ের সঙ্গে। তুমি এমন ভাল মেয়ে—ভুল করে আবার গিয়ে বিপদে পড়বে?

নীরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীর সব মানুষই তবে এই রকম? তবে সে যাবে কোথায়? মনে আছে সব যেন কালো হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল। বিশ্রী কালো কুৎসিত কদর্য বীভৎস!

ইনস্পেক্টর বলেছিলেন, ভেবে দেখ মা। মনটা শান্ত কর। আমি আপিসে যাচ্ছি এখন, পরে বলো! এখানে তুমি থাকতে কিন্তু ভেবো না। ঘর মনে ক'রে থাক। অন্তত কয়েক ঘণ্টা যতক্ষণ ভাবতে লাগে। কেমন?

নীরার চোখে সত্যই অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল পৃথিবী। সেই অন্ধকারের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল—তাই তো, মুক্তি তো নিশ্চিন্ততা নয়। কোথায় যাবে সে? কলকাতার পথ উত্তরে-দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে সহস্র শাখায় ছড়িয়েছে। দক্ষিণে টালিগঞ্জ, মাঝপথে ভেঙে ডালহৌসি স্কোয়ার, আপিস—হাজার হাজার মেয়েরা ছোটে। আরও উত্তরে এসে বিডন স্ট্রীট থেকে চিৎপুর ধরে শতবর্ষব্যাপী নারীজীবনের নরক। পূর্বদিকে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে ইউনিভার্সিটি। কিন্তু ইনস্পেক্টরের কাছে কুণ্ডুবাবুর কথা শুনে মনে হচ্ছে পথে পথে সতর্ক-দৃষ্টি, শ্বাপদের মত মানুষ। মনা ঘোষ, মনা ঘোষ, মনা ঘোষ, অজিতদা দিব্যেন্দু এরাই নানান চেহারায় নানান নামে ছেয়ে ফেলেছে কলকাতা। যাওয়া মোটে সহজ নয়। তবে একটা লক্ষ্য তার স্থির আছে;—যাবে সে ইউনিভার্সিটির দিকেই। জীবনে সে লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় নি একবার ছাড়া, অর্থাৎ ওই বিয়েতে মত দেওয়ার বারটা ছাড়া। আর হবে না। কিন্তু আশ্রয়?

আজ মা-বাপকে মনে পড়ছে। কিন্তু সে কাঁদে নি। অসীম সহের সঙ্গে ভাঙা আকাশ মাথায় নিয়ে সে সেই নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে ভেবেছিল, আশ্রয়?

হঠাৎ মনে হয়েছিল অনাথ আশ্রমের কথা। রেস্কু্য হোম। উদ্ধার আশ্রম। সেখানে, সেখানে আশ্রয় পেতে পারে না সে? সরকারী আশ্রমের কথাও শুনেছে। তাই যাবে সে!

ইনস্পেক্টরকেও সে তাই বলেছিল—আমাকে আপনি কোন ভাল অনাথ আশ্রম বা রেস্কু্য হোম দেখে পাঠিয়ে দিন। যেখানে আমি পড়াশুনা করবার সুবিধে পেতে পারি। আমি পড়ব।

—অনাথ আশ্রম, রেস্কু্য হোম—ঠিক তোমার মত মেয়ের জায়গা নয় মা। তারা একটু অন্য ধাতের মেয়ে। অন্য জাত বললেই ঠিক বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাকে বলে ফয়েন গার্লস। অত্যাচারিত অন্যভাবে।

—আমাদের নিজেদের না থাকে ক্রশ্চানদের আছে শুনেছি। নেই?

—তা আছে। ওদের যত গালই দিই ওদের এসব আছে। এদেশের রাজ্য ছেড়েছে কিন্তু ওগুলি বজায় রেখেছে। কিন্তু সেখানেও ওদের ধর্মের দাবী আছে। Call of Christ আছে।

—আমি ক্রশ্চান হব।

—ক্রশ্চান হবে?

—হ্যাঁ। প্রাণ মান দুই যদি বাঁচে তবে কেন হব না!

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ইনস্পেক্টর। তারপর হঠাৎ বললেন—হুঁ! একটা কথা

তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। সেটা তো জানা দরকার।

দৃষ্টি একটু যেন কঠিন হয়ে উঠেছিল ইনস্পেক্টরের।

নীরার ভ্রূতে বোধ করি তার প্রতিচ্ছায়াও পড়েছিল, সে শান্ত ধীর কণ্ঠে এতক্ষণের সমস্ত জলীয় অংশ মুহূর্তে নিংড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল—বলুন।

ইনস্পেক্টর এবার হেসেই বলেছিলেন—তুমি একালে এমন একটা বেশ কড়াধাতের মেয়ে। তোমার তো একটা ঝাণ্ডা থাকা উচিত।

—কিসের ঝাণ্ডা?

—Politics গো। তোমার ঝাণ্ডাটা কি বল তো? লাল না তেরঙ্গা?

একটু বক্র অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠেছিল তার মুখে। বলেছিল—আমার ঝাণ্ডা আমার নিজের। কাস্তেও না হাতুড়ীও না চরকাও না। ওখানে আমার নিজের হাসি মুখ। আমি রাজনীতি করি নি। সময়ও পাই নি। ভালও লাগে না।

এবার ইনস্পেক্টর উৎসাহিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—গুড। তুমি ঝাঁ করে বলে দিলে কুশ্চান হয়ে যাবে তাই জিজ্ঞাসা করলাম। ওটাই একালের রাজনীতির বড় লক্ষণ তো। তা বেশ। আমি মনে মনে তোমার জন্যে একটা আশ্রম ঠিক করেছি। সেখানে ছেলে মানে বাচ্চাদের পড়াবে। ঘরের মেয়ের মত থাকবে। কলেজে আমি দেখব ফ্রি করে দিতে পারি কিনা। তবে তোমার মান সম্মান সব নিরাপদ। আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। কেমন যাবে?

একটু ভেবে সে বলেছিল—যাব।

—গুড। এস আমার সঙ্গে। দেখি তোমার অদৃষ্ট আর আমার পুণ্য। এস।

গাড়িতে চড়িয়ে শহরের উত্তর প্রান্তে নিয়ে এলেন একটা বাড়িতে। মাঝারি একখানি বাড়ি। ডাকলেন, দাদা আছেন? দাদা?

—কে? বেরিয়ে এলেন কৃষ্ণকায় শীর্ণ বৃদ্ধ।—ইনস্পেক্টরকে সমাদর করে আহ্বান জানিয়ে বললেন—আরে ঘোষাল ভাই, কি ব্যাপার? ওয়ারেণ্ট আছে নাকি? এদের কার নামে বল তো? না খোদ সর্দারের নামে?

পিছনে একটি দল বাচ্চা-বাহিনী। তের-চৌদ্দ হতে বছর চারেকের পর্যন্ত।

—এদের আজ সব কটাকে নিয়ে যাব।

বড়গুলি হাসতে লাগল। ছোট চারটির বড়টি ছুটে পালাবার সময় চিৎকার করলে—লড়াই লড়াই। অস্ত্র অস্ত্র!

ঘোষাল এবার বললে, দাদা, এই খুকীটিকে নিয়ে এসেছি। শুনুন বিবরণ। এ মেয়ে কঠিন মেয়ে, আপনার ঘরে তো অনেক বাচ্চা খুদে ডাকাতের দল। ছোটগুলিকে পড়াবে আর থাকবে। আপনার আশ্রয়ে দিয়ে আমি নিজের কাছে জবাবদিহি করতে পারি, এমন মেয়েটাকে সত্যি ভাল জায়গায় দিতে পারলাম। শুনুন বিবরণ।

বিবরণ শুনে তিনি বলেছিলেন—বহুত আচ্ছা। বাহবা কন্যা! ধন্যা ধন্যা! তোমার পায়ের ধুলোয় পবিত্র হল ঘর। থাক তুমি এখানে। ওই ছোট দৈত্য তিনটেকে পড়াও, পড়াতে দেখেশুনে আর কয়েকটা যোগাড় হয়ে যাবে। নিজে পড়। এই আমার বাড়ির

সামনে দিয়ে রোজ একটি ছোটখাটো আকারের বেণী ঝুলিয়ে ঘড়ির কাঁটার মত যায় আসে। সে ওই ছেলে পড়ায় পাড়ায়। তোমারও হয়ে যাবে।

ঘোষাল বললেন, ইনি কে জান? বিখ্যাত আর্টিস্ট শিবনাথ বাঁড়ুজ্জে।

—না না না। ঘোষাল কিছু জানে না। আমি তো আসল পরিচয় দিইনে। তোমাকে দিই। আমি ভাই সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা। এই যে দল দেখছ এরাই সব নয়, আরও আছে, পাশে বড় মেয়ে থাকেন, তাঁর আছে চার, তিন কন্যা এক পুত্র। এক পুত্র থাকেন রানীগঞ্জে, তাঁর তিন। কনিষ্ঠার এক। ওদের বন্ধু—তারা বলে পিতামহ। সামনে গুর্খা ক্যাম্প, তাদের ছেলেগুলো ঘোরেফেরে। তারা শুনে শুনে জেনেছে এর নাম পিতামহ। আমার সামনের এই ড্রেন, এতে যখন বর্ষার জল চলে, তখন তারা এসে শুয়ে পড়ে সাঁতার কাটে, আর চেঁচায়, আও পিতামহ (দাদু), পানিমে সাঁতার খেলো। এর মধ্যে দেবতা আছে, দৈত্য আছে, যক্ষ আছে রক্ষ আছে, কিন্নর গন্ধর্ব রাক্ষস নরবানর সব আছে। আমি পিতামহ ব্রহ্মা। বাড়িটির মধ্যে অহরহ চলছে পুরাণের পালা। সমুদ্রমন্থন। দুটো বাদাম, চারটে ছোলা, একটা পেরেক বা নাটবল্টু নিয়ে চলেছে মহা সংগ্রাম। তা তুমি এলে, তুমি নীরা, সাক্ষাৎ মোহিনী হয়ে এদের বিবাদ ভঞ্জন করবে, থাকবে। ঠিক হয়েছে।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে, যাত্রা থিয়েটারের বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললেন বৃদ্ধ শিল্পী। চিত্ত তার ভরে গেল।

ঘোষাল বললেন, আমি নিশ্চিন্ত। শুধু তুমি আশ্রয় পেলে না, একজন অমর শিল্পীর—

বাধা দিয়ে বৃদ্ধ আবার বক্তৃতা শুরু করে দিলেন—মূঢ়, তুমি মূঢ়। এই ডাকাতের দল আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি! কেউ ভাল কেউ মন্দ, কেউ দেবতা কেউ পাষণ্ড। কেউবা কালো কেউ ধলো—ঝাঁটোসাঁটো এলোমেলো সিঁটকে রোগা মোটাসোটা হাবাগোবা চালাক চতুর বুঝলে না—এদের জন্য কেউ বললেন ধন্য ধন্য, এমন পিতামহ না-হলে এমন নাতি! কেউ বলেন এমন কুচক্রী, মন্দ ঠাকুরদা না হলে এমন নাতি! এক অঙ্গে চন্দন এক অঙ্গে পঙ্ক মেখে, আমিও বলব ধন্যোইহং, আমি অমর পিতামহ। এখন ভাই তুমি ধন্য কন্যা, ধন্যা ধন্যা—সাক্ষাৎ মোহিনী তুমি—তুমি এসেছ, দেখ তোমার মোহে যদি দৈত্যেরা দেবতা হয়। আমার দুই অঙ্গে চন্দনের ব্যবস্থা হয়। নীরা তাঁকে আপনা থেকে একটি প্রণাম করেছিল। ব্যবস্থা থাকলে এইখানে আলোর বৈচিত্র্যে ছেদ টেনে বুঝিয়ে দিয়ো খানিকটা নাটকীয় ঘটনা সংস্থানের পর একটি নাটকীয়তা-হীন, সংঘাতহীন একটানা জীবন চলছে শান্ত সুখকল্লোল ধ্বনি তুলে।

পূর্ণ দেড় বছর এখানে তার কেটেছিল। জীবননাট্যে অনেক দুর্যোগময় পরিবেশ এবং অনেক যন্ত্রণাময় যুদ্ধের নাট্যপ্রবাহের পর এটি একটি সুন্দর প্রভাত। মেঘ নাই, মাটি ভিজে নরম, কিন্তু পিচ্ছিল নয়, পাখিরা কলরব করে আকাশে ডানা মেলেছে; তারই মধ্যে একটি

বাউল একতারা হাতে গান গাইছে—

"কাঁদিস কেন ও পোড়া মন
'রাধে' বলে নাচ্ না কেন ?
এমন মানব জনম আর পাবিনে—
সাধে সুখে বাঁচ্ না কেন ?
ওরে কেঁদে কেঁদে মরিস কেন ?
সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে
মায়া ফাঁদে পড়িস কেন—"

এ ওই বৃদ্ধ শিল্পী শিবনাথ—দাদু পিতামহ! প্রাণে তিনি সুর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। গানটি তিনি সত্যিই গাইতেন। গলা ছিল না তবু গাইতেন, অবশ্য বাউল সেজে নয়। তাঁর পোশাক ছিল বিচিত্র, লোকে দেখে মুচকে হাসত। শিল্পী শিবনাথের এই পোশাক, এই চেহারা। খালি-গা, গলায় রাঁধুনীবামুনের মত মালার ঢঙে পৈতে, থান-কাপড় ডবল করে লুঙ্গির মত পরা, খালি পা, শীর্ণকায় কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধের হাতে মাটি পায়ে ধুলো! ওই এক ধরনের বাউল গুন গুন করে গাইতেন। গানটা ওঁরই রচিত। বৃহৎ সংসার, তিন ভাইপো, পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্র পৌত্রী চাকর ঠাকুর ঝি নিয়ে ছিল তেইশ, তাঁকে নিয়ে হয়েছিল চব্বিশ। এছাড়া বাড়ীতে একজন দুজন আছেনই। কেউ তাঁর সাক্ষাৎ মা-কালী, কেউ শনিঠাকুর, কেউ দুর্গা, কেউ লক্ষ্মী, অবশ্য ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে। বাড়ির গৃহিণী ওদের দেখলেই চেনেন, সকালে আটটা থেকে ভাত খাওয়া শুরু, রাত্রি একটায় শেষ। পিতামহ মিথ্যে বলেন নি বাড়িতে উপরে নিচে ঘরে দালানে খাটের তলায়, ছাদে ওই নাতিগুলোর মধ্যে অহরহ দেবাসুর সংগ্রাম চলছেই চলছেই। বাড়ির ভিতরেই দর-দালানে সামনের প্যাসেজেই চলছে ফুটবলের ভলিবলের ক্রিকেটের সংগ্রাম। আবার যখন ওদের বন্ধুরাও জোটে তখন সেটা পাশের মাঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাশেই বড় মেয়ের ছেলেও এসে জোটে। তাঁর তিন মেয়ে আসে। বড় মেয়েটি এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠা। আশ্চর্য গুণবতী প্রতিভাশালিনী মেয়ে। দাদুই নাম রেখেছিলেন শকুন্তলা—এখন বলেন সরস্বতী। আর দুজন মণি-রুণি। মণি মানবী, বাস্তববাদিনী, রুণিকে বলেন অপ্সরী কারণ সে প্রায় অনবরতই নাচে। আর একজন আছে ছোট ছেলের বড় মেয়ে মঞ্জু, সে মধ্যে মধ্যে বাপের কর্মস্থল থেকে মায়ের সঙ্গে আসে,—সেও তাই—নাচে। আর একটি সর্বকনিষ্ঠা কন্যার প্রথম কন্যা, বছর দেড়েক বয়েস, তার নাম লাল-মোহিনী। দাদু ছড়া বেঁধেছে—

"লালমোহিনী রাধে
লালমোহিনী মান করছে বংশীবদন সাধে।"

বড় নাতিকে বলেন দেবরাজ, বড় দৌহিত্রকে বলেন জেন্টেলম্যান। মেজ পৌত্র 'মহারুদ্র', তৃতীয় নাতিটি বড় ভাল। শান্ত মানুষ। মধুর মানুষ। তার পরেরটির অনেক নাম—বুদ্ধিমান, জ্ঞানবৃদ্ধ—কথাটা মিথ্যে নয়, পুরাণের গল্প শুনে কণ্ঠস্থ করেছে, কখনও হয় রাম

কখনও হয় অর্জুন, কখনও বৃদ্ধও সাজে; এবং দুষ্টবুদ্ধির অন্ত নেই। দোতলা থেকে পড়ে কপাল কাটে, পথে পড়ে থুতনি কাটে। তার ছোটটি শ্যাম, এটি ওরই চাপে পৃথিবীর মত উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপার মত একটু ম্লান হয়ে গেছে। বড় লোভী, কিছু না পেলে ভাঁড়ারের চাল নিয়ে ভিজিয়ে খায়। গোটা রেশনের চালে জল ঢেলে দেয়। তার পরেরটা দিনরাত্রি ছুতোয়নাতায় চেঁচায়; হাতে পেরেক স্ক্রু ড্রাইভার ছুরি, কাটারি নিদেন, একটা কিছু চাই-ই। বছর চারেক বয়েস এর মধ্যে মায়ের ড্রেসিং-টেবিলটা পেরেক ঠুকে ভেঙেছে। ডাক্তার আসছেই আসছেই। এর জ্বর, ওর পা কেটেছে, ওর টনসিল। আর দাদুর অসুখ লেগেই আছে। মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হয়, উনি মৃত্যুভয়ে ভীত। তবে শরীর অসুস্থ তাতে সন্দেহ নেই। বড় ভাইপো চাকরি করে, কিন্তু কানাবিভোর। মেজ ভাইপো ডাক্তার ভাল ছাত্র, কলেজ ইউনিয়নে সেক্রেটারি, আপন মেজাজে আছে, তার পরেরটি ঘাড় গুঁজে পড়ে, একটু গোঁয়ার, কিন্তু বেশ লোক। বড় জামাইটি আশ্চর্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ছোট জামাই ডাক্তার। বড় ছেলে ভাল চাকরি করেন। সুখের সংসার। সব সুখ ওই মানুষটাকে কেন্দ্র করে। তবু কলহ বাধে। বড় ছেলের সঙ্গে বাধে, সে তাগাদা দেয় নূতন কিছু আঁকুন। বলে, আপনি জানেন না, কত বড় শিল্পী আপনি। উনি চটেন। মধ্যে মধ্যে ক্ষেপে যান। মধ্যে মধ্যে মা এবং স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেন। কারণ তিনি সংসার চালান এখন। সেটা অপছন্দ করেন। দাদুর স্ত্রীর সঙ্গে বাধে মধ্যে মধ্যে, সে ভীষণ বাধা। তিনি পূজা নিয়েই থাকেন। তবে তাঁর ধারণা দাদু তাঁকে ঠিক তার উপযুক্ত মনোরমা মনে করেন না। দাদুর অধিকাংশ নারীমূর্তির মুখে তাঁর আদল। তারা ছবির ভাববস্তুতে মহিমান্বিত। তবু স্ত্রী বলেন, কি পারাপ করেই আঁকলে তুমি আমাকে। লাগে বিরোধ। দুদিক বিরোধ। বড় 'খুকুনু' ঝগড়া সে করে না, তবে মধ্যে মধ্যে না খেয়ে শুয়ে থাকে। বিচিত্র মানুষ, কখনও মনে হয় এ বাড়িতে এসে সে ধন্য হয়েছে, কখনও ভাবে এ বাড়িতে পড়ে তার যোগ্য দাম মিটল না। বড় মেয়ে পাশে থাকে। বড় জামাই তাকে আশ্চর্য গড়েছে। মুখ সরল মন। সকল গৃহকর্ম নিজ হাতে করে হাসিমুখে, ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই। রোজ সন্ধ্যায় বাপ মাকে দেখতে আসে। ছোট জামাই ডাক্তার, কৃতী ছেলে, এখন সপোত্র চাকরিতে, বেশ সংসার। ছোট মেয়ে বাপের সর্বাপ্রেয় সন্তান। চমৎকার মেয়ে, কিন্তু তাকেও লোকা, সর্বদাই ভয়ে অস্থির এখন কী হবে। ছোট ছেলে বাইরে থাকে, খুব কৃতী উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বাপ্পা বাদো দুর্বাসা। ছোট বউটি মাটির মানুষ, বড় ভাল। তাদের বড় মেয়েটি খুকুপলা— দুটি ছেলে তার একটি ওই বুদ্ধিমানের চালা, অন্যটি বাচ্চা, একটা ঘোড়া ঠেলে বেড়ানোই তার একমাত্র নেশা। কলরব, কোলাহল, কলহ, হাসি-কান্নার সে এক অহরহ মুখরতার মধ্যে মূল একটি সুর কান পাতলেই ধরা যায়, সে সুর আনন্দের, সে সুর সুখের। সে ওই মানুষটিকে কেন্দ্র করে। এই দেড় বৎসরে সেও ওই সুরে জীবনের তার বাঁধতে চেয়েছিল। অনেক সময় বেঁধে খুশী হয়ে ভেবেছে, বাস, এইবার সে সুখী হতে পারবে। কিন্তু আশ্চর্য আবার কিছুক্ষণ বা কয়েকদিন পরেই দেখেছে, ঠিক সুরে সুর মিলছে না। এবং আরও আশ্চর্য হয়েছিল, বিচিত্র বেদনাহত অবস্থায় ওই বৃদ্ধকে দেখে। যেন কত বেদনা, কত উদাসীনতা। মধ্যে মধ্যে চোখে জলও পড়তে

দেখেছে। কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হয়নি! তবে মনে হয়েছে, ঠিক তারই মত দাদুর মনের মূল সুরটি এদের সঙ্গে পৃথক। স্টুডিয়োয় ঢুকলেই এই বেসুরো মানুষটা আত্মপ্রকাশ করত। উদাস দৃষ্টি বেদনায় আচ্ছন্ন, চোখে জল পড়ে। ও ঘরে সে ঢুকত না। সাহস হত না তার। ভাবত, অনধিকার চর্চা। সে নিজের অধিকারের গণ্ডি লঙ্ঘন কেন করবে? উনি স্টুডিয়োতে ঢুকলে বাড়িটার প্রত্যেকেই প্রহরারত নন্দিকেশ্বরের মত তর্জনী উদ্যত করে শাসন করে—চুপ। ছবি আঁকতে বসেছেন। চুপ। ও ঘরে যাবে না ছেলেরা। নিজেরাও যায় না। উনি বেরিয়ে এলে চুপি চুপি গিয়ে দেখে আসে, কি ছবি আঁকা শুরু করেছেন। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে আসে, দেখতে পায় ক্যানভাসটা শাদাই আছে। অবশ্য তাগিদে বরাতে কিছু আঁকেন, ওরা হৈ হৈ করে, উনি বিষণ্ণ হাসেন।

এরই মধ্যে সে আই-এ পাস করলে ফার্স্ট ডিভিসনে। সমস্ত কিছুর মধ্যেও আর কিছু না হোক সে পড়াশুনোর সুবিধেটা পেয়েছিল। তা পেয়েছিল। অসুবিধে ছিল, তবু আনন্দের মধ্যেই সহ্য হয়ে গেছে। এঁদের বাড়ি খাওয়া থাকা ছাড়া আর কিছু পেত না, তবে পুজোয় কাপড় জামা দিয়েছিলেন আর পরীক্ষার ফিজটা দিয়েছিলেন। মাত্র এক বাড়িতে একটি ছেলেকে পড়িয়ে দশ টাকা পেত, তা থেকেই চলেছে কলেজের মাইনে। সম্বল একশো এক টাকার সবটাই খরচ হয়ে দাঁড়ালো তিরিশ টাকা।

পরীক্ষার খবরে সে খুশী হল। ফার্স্ট ডিভিসন, অখুশী হবার নয়। সে সর্বাগ্রে ছুটে গেল দাদুকে প্রণাম করতে। আজ অধিকার অনধিকার বিবেচনা করলে না, গিয়ে ঢুকল স্টুডিয়োতে উনি চুপ করে বসেছিলেন। সামনে ইজেলে ফ্রেমে আঁটা কাপড়, তুলিটা নামানো, উনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। একটু চঞ্চল পদেই সে ঢুকেছিল, তবুও তাঁর তন্ময়তা ভঙ্গ হয়নি। অকারণে একটু কেশে সে বলেছিল, দাদু!

—কে? ও। কি খবর? কিছু সৌভাগ্য নিশ্চয়, তুমি তো কখনও এঘরে ঢোক না!

—আমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছি দাদু!

—বাঃ। বহুত আচ্ছা।

নীরা এবার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলেছিল, কিন্তু এইবার যে বড় ভাবনা হল দাদু। এরপর?

—পড়। পড়ে যাও।

—পড়া ঠিক এই রকম করে হয় না দাদু! তা ছাড়া—থাক দাদু।

—কেন ভাবছ আমি ভাবব ইঙ্গিতে তুমি আমার উপর চেপে বসতে চাও? না, তা ভাবব না। তোমাকে চিনি।

চুপ করে একটু বসে থেকে সে প্রসঙ্গটা পরিবর্তনের জন্যই বললে, কই, আঁকেন নি তো কিছু? একটা দাগও পড়ে নি।

—নাঃ।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব দাদু?

—কর। বল।

—বাড়িতে প্রায়ই শুনি। আর-আপনি তাগিদ ছাড়া বরাত ছাড়া ছবি আঁকেন না। মানে নিজের কল্পনায়। কেন?

মুখের দিকে চেয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নীরা সাহস করে বলল, দাদু!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, যা আঁকতে চাই তা যে কল্পনা করতে পারছিনে। নীরা, সংসারে রূপ অপরূপ। অনেক এঁকেছি। দেখেছি, এঁকেছি। অরণ্য এঁকেছি, পাহাড় এঁকেছি, সমুদ্র এঁকেছি, আকাশে সূর্য চন্দ্র, সূর্যাস্ত সূর্যোদয়, প্রতিপদ পূর্ণিমার চাঁদ এঁকেছি, লতা গাছ ফুল মানুষ, মা প্রিয়া পূজারিণী বিধবা, শিশু যুবক বৃদ্ধ, অনাথ বিদ্রোহী প্রেমিক, মৃত্যু ভাবনারত, মৃত, সদ্যপ্রসূত, দেখলাম আর আঁকলাম। ঝড় এঁকেছি, আলো এঁকেছি, অন্ধকার এঁকেছি। বুদ্ধ এঁকেছি, ক্রাইস্ট এঁকেছি, গান্ধী এঁকেছি, রবীন্দ্রনাথ এঁকেছি, সুভাষচন্দ্র এঁকেছি। অনেক নাম, অনেক যশ, তার সঙ্গে অর্থও অনেক পেয়েছি। কিন্তু নিজে কি আঁকলাম? অথবা এ সবের পিছনে যিনি বা যা একটা কিছু তাকে কই আঁকলাম? পাচ্ছি না যে তাঁকে। যা বা যিনির মধ্যে এ সব আছে, সেই বিশ্বরূপ! কিসের শিল্পী আমি নীরা, তাঁকে আমি কল্পনা করতে পারিনে, তাঁকে আঁকতে পারিনে। মিছে—আমার সব মিছে হয়েছে। তাই তুলি ফেলে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শুধু ভাবি, আর কাঁদি আমি নীরা।

বলে আকাশের দিকেই চাইলেন আবার। নীরা সন্তর্পিত পদক্ষেপে বেরিয়ে এল। তিনি অবশ্য ফিরেও তাকালেন না।

এই দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। মধুর তবু প্রচ্ছন্ন বেদনা আছে। তা থাক। বেদনায়, মাধুর্যে, পৃথিবীর দিনরাত্রির মত সহজ আনন্দ প্রসন্ন।

আরম্ভ হল যেন রাত্রির পর দিন।

দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রভাত যেন দ্বিপ্রহরের পথে অগ্রসর হচ্ছে। ডাক পড়ছে চারদিক থেকে, ঘণ্টা পড়ছে ইস্কুলে। আপিসে আপিসে লোক ছুটছে; দরজা খুলছে। সে চিন্তায় পড়েছিল। এখানে থেকে কি করবে সে? এখানে এদের কাজ কিছু নেই। ছেলেরা ঠিক তার কাছে পড়ে না। নামমাত্র বসে। তারপর উঠে যায় ওদের কাকু শিবনাথবাবুর বড় ভাইপোর কাছে।

হঠাৎ সেদিন সে চমকে উঠল। দাদু উল্লাসে চীৎকার করছেন, বিনো-দা! আরে বাপরে। বিনো-দা দি গ্রেট। জয় ভগবান, সর্বশক্তিমান, জয় জয় জয়পতি। অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা! হে বিনো-দা!

হা-হা হাসিতে গোটা বাড়িটা ভরিয়ে দিয়ে কে হেসে উঠল। এবং সে এক বিরাট কণ্ঠস্বরে বিব্রতভাবে বললেন, আরে-আরে ওকি হচ্ছে, ওকি হচ্ছে। দাদু! ইউ আর লাভলি, ইউ আর গড-লি! আই অ্যাম ম্যাডলি ইন লাভ উইথ ইউ।

—চুমু খাবে! বিনো-দা, তোমায় চুমো খাবো। বিশ্বাস কর, মুখে গন্ধ নেই, পুরনো দাঁত একটাও নেই, কোন অধর্ম নেই। তুমি আজ দু বছর আসো নি। কিন্তু টুপিটা কেন? ওটা তো আগে পরতে না।

আবার হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, টাকের জন্যে দাদু। টাকের জন্য। দেখুন না।

—হে ভগবান! এ যে প্রায় মনুমেণ্টের পাদদেশ করে ফেলেছ। অনবরত মিটিং বুঝি? কিন্তু দেশ তো উদ্ধার হয়ে গেছে। না 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'দের দলে জুটে মিটিং বাড়িয়ে ফেলেছ? কিন্তু তারা তো আণ্ডারগ্রাউণ্ড হে। দরজা বন্ধ করব না কি!

—রামোচন্দর। ও সব বাদ দিয়েছি। বিশ্বাস করুন। কিন্তু টাক পড়ার কারণটা বুঝলাম না। বংশে তো নেই, আমার হয়ে গেল। তা থাকগে এখন আপনার ঝাণ্টুর দলকে ডাকুন, কিঞ্চিৎ বিলাতী মিষ্টান্ন আছে, অর্থাৎ টফি লজেন্স। আলাপ করা যাক, ঝালিয়ে নেওয়া যাক্।

—এ যে অনেক গো বিনো-দা! এত?

—সেখানে যে আমার ছেলেরা আছে। সে তো কম নয়। আপনি তো জানতেন সাত আটটি। এখন যে পঁচিশটি! একেবারে পাকাপোক্ত পঞ্চাশ বিঘে জমির উপর পাকাবাড়ি, ইস্কুল, বোর্ডিং। বুঝলেন না। সরকার টাকা দিচ্ছে। আমাদের এডুকেশন সেক্রেটারি গিয়েছিলেন, দেখে এসে চীফ মিনিস্টার এডুকেশন মিনিস্টারকে বলেছেন, বিশ-বাইশটা ছেলে, তা বিনো সেন খুব ভাল ম্যানেজ করছে; অ্যাকাউন্টের গলদ হবে না, ওঁকে টাকা দেওয়া উচিত। তা টাকা দিয়েছেন।

বিস্ময়ের আর বাকী রইল না নীরার। কে এই মহাপুরুষ? এতগুলি ছেলে। পঁচিশটি! ঠিক যেন ধরতে পারছে না ব্যাপারটা। দাদুর কোন বন্ধু সন্দেহ নেই, শুধু বন্ধু নয় দাদা-স্থানীয় বন্ধু। এবং বিশ-বাইশটি ছেলে নিজের ছেলে না—বাড়ির ছেলে দাদুর বাড়ির মত; ছেলেদের ছেলে নাতির দল। না নে দাদুর দাদার গৌরব বজায় থাকে কি করে? ভদ্রলোক নিজে আট নয় সন্তানের বাপ তার আট নয় সন্তানের গড়ে দুবছরে ষোলটি আঠারোটি, তার সঙ্গে আগের সাতটি যোগ করলে অবশ্যই পঁচিশটি হতে পারে। আরও বেশী হয় নি এই আশ্চর্য। ওদিকে বাড়িতে সাড়া পড়ে গেছে, দাদুর বড় মেজ দুই নাতি উঁকি মেরে দেখে সোর-গোল তুলেছে, বিনো-দা, দিদি, দিদি, বিনো-দা এসেছেন, মা, পিসিমা, বিনো-দা!

দেখতে দেখতে ঘরটা ভরে গেল। বাচ্চাগুলো এবার সাহস করে ঢুকেছে। সেই কণ্ঠস্বর শুনলে নীরা।—এস বন্ধুগণ গ্রহণ কর! অর্থাৎ সেই আগন্তুকের কণ্ঠস্বর; কণ্ঠস্বরটি ভারী সুন্দর, প্রসন্ন এবং ভরাট—তিনি বলছিলেন—টফি এবং লজেন্স। এস এস। এস এস, বীণা এস, বউমা এস।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন বোদ দিদি।—অ্যাঁ বিনো-দা, পথ ভুলে নাকি? বাপ! আমি ভাবলাম দেশান্তরে গিয়ে, মানে বিলেত-টিলেত গিয়ে, আজকাল তো স্বাধীনতার পর খুব

সুবিধে, গিয়েছেন সেখানে, কারুর প্রেমে পড়েছেন এতকাল পরে।

হেসে সারা বিনো-দা।—বলেছেন ভাল তো। কিন্তু ওটা ঠিক মনে হয় নি দিদি, নইলে চেষ্টা করা যেত। কিন্তু পোড়া বরাতে আমার সেই জঙ্গলে পড়ে আছি, আশ্রম-ইস্কুল নানান ঝঞ্ঝাট! নিন দুটো লজেন্স খান।

—রসিক খুব। আমি লজেন্স খাব? আপনি খান।

—আমি সারা রাস্তা খাচ্ছি। খাই। দেখুন দাদুকেও দিয়েছি।

—তা খান উনি, আমি খাব না।

—তবে এই নিন। ঠাকুরকে দেবেন তাদের গুড়। চমৎকার জিনিস।

—নীরা, নীরা। এবার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন দাদু। আরে নীরা নেই?

বড় নাতি ছুটে এসে তাকে ধরে টানলে, দাদু ডাকছে জলদি। বিনো-দা এসেছে। এস, এস।

দেখে সব গোলমাল হয়েছিল। এতক্ষণ কথা শুনে যা কল্পনা করেছে, তার কিছুর সঙ্গে মেলে না। শুধু তাই নয়। সে প্রায় অভিভূত হয়ে গেল! ছ'ফুটের উপর লম্বা, সবল স্বাস্থ্যবান। যৌবনের সীমান্তে উপনীত প্রশান্ত সৌন্দর্য, এ যে ইতিহাসের কালের কোন মানুষ। টিকলো নাক, খাড়ার মত, চোখ দুটি ছোট, কিন্তু কি দৃষ্টি তাতে! তবে যত প্রসন্নতা তত কৌতুক সেখানে অহরহ। দীপ্তির কম্পিত জলের মত আলোর ঝিলিমিলি তুলে রয়েছে; হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলে তাতে জাগে সেই আশ্চর্য দৃষ্টি, একটি স্বপ্নের প্রতিচ্ছটা চোখের তারায় ঝলসে ওঠে। তাকে দেখেও সেই দৃষ্টি তাঁর চোখে ফুটে উঠল। বললেন, বাঃ!

দাদু বললেন, হাঁ, শুধু বাঃ নয়, বাঃ একেবারে শাস্ত্রী মেয়ে নীরা। ওর যা ইতিহাস সে শুনলে—

—শুনব পরে। কিন্তু এমন বিস্ময় ভরা মুখ, এর ছবি আঁকেননি?

—ছবি? নাঃ। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন দাদু।

—নাঃ! ওই দীর্ঘনিশ্বাস আমার ভাল লাগল না দাদা। রূপ ফেলে অরূপ। এমন রূপ! ওই মধ্যেই তো তাকে পাবেন। অরূপ যদি থাকেন তো ওই রূপের মধ্যেই আছেন। বাঃ যেমন স্বাস্থ্য তেমনি রূপ তেমনি নাম। নীরা। কাজলদীঘির মত হিল্লোল চঞ্চলা নয়, অথচ গভীরা প্রসন্না সুধীরা। উজ্জ্বল হীরের মত নাম আর নীরা।

দাদু তার পিঠে প্রচণ্ড একটা চপেটাঘাত করে বললেন—ব্রাভো—বিনো-দা। চমৎকার বলেছ। কিন্তু দুঃখ কি জান, কিছুই করলে না তুমি। জীবনটাই অবসর-মত ভালবাসা বেসে কাটিয়ে দিলে। না লিখলে কবিতা, না গাইলে গান, ছবি এঁকে যাবে বলে তুলি ধরলে—কিন্তু—

ভদ্রলোক—বিনো সেন বললেন—প্রতিবাদ করছি।

—কিসের?

—এই কথার। ছবি এঁকেই খাই আমি। কিন্তু জীবনে আমার প্রয়োজন কম। বেশী

আঁকবার দরকার হয় না। কিন্তু ওকথা থাক। শ্রীমতী নীরা দাঁড়িয়ে আছে। ওর পাওনা দিয়ে দিই। নাও। ধর। টফি লজেন্স ধর। ধর।

নীরা এই আশ্চর্য মিষ্ট প্রগল্ভতার মধ্যে যেন অভিভূত এবং একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিল—হাত সে পাততে পারছিল না।

বিনো সেন বলেছিলেন—আমার কাছে লজ্জা করতে নেই, দেখছ, আমি বিনো-দা। ইউনিভারস্যাল।

বলে হাতখানা ধরে তার হাতে কয়েকটা টফি দিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন অসঙ্কোচে ঝণ্টু দেয় বাচ্চুর হাতে কিছু গুঁজে বা কিছু কেড়ে নেয় তেমনি সহজ ছন্দে অসঙ্কোচে।

দিদি বললেন, এইখানে খাবেন, ইলিশ মাছ আনাই।

—আনান।

—এখনও নিম-সেদ্ধ খান না-কি ? ভিটামিন ?

আবার হাসি। সেই দরভরা হাসি। তারপর বললেন, না। তা আর খাইনে। তবে খাদ্যটা সত্যিই ভাল ছিল।

—আর ভাল ছিল!

—ভাল ছিল না ? রঙটা দেখছেন তো ? এ ওই নিম খেয়ে।

দিদি বললেন—আমার আর রঙ পরিষ্কারের দরকার নেই, ওই আপনার কৃষ্ণবর্ণ দাদুকে বলুন। তারপর হঠাৎ বললে, নীরা তুমিও খেয়ে দেখতে পার। তোমার রঙ কালো নয়, কিন্তু একটু মাঠো। দেখছ তো বিনো-দা'র রঙ। নিম খেয়ে হয়েছে।

বিনো-দা বললেন—না না না। স্বর্ণ-লতায় আর শ্যাম-লতায় তফাৎ আছে দিদি। ওই শ্যামলিমাতেই ও অপরূপা। জিজ্ঞেস করুন দাদুকে। কি দাদু ?

দাদু বললেন—কি বলব বল, 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণীপ্রেক্ষণা' ও তো পড়েনি। আর আমাদের মত শিল্পীর চোখ তো নয় ওর। ওদের হল সর্বদোষ হরে গোরা। নইলে বিনো-দা তুমিই বল, আমার ভুবন-আলো-করা কালোরূপ থাকতে তোমার গৌরবর্ণে মুগ্ধ হয়!

বউ মেয়ে পালাল। সঙ্গে সঙ্গে তাকেও ফিরতে হল। ওরা পালাল বলেই ফিরতে হল, নইলে যে লজ্জায় ওরা পালাল সে লজ্জা বা সঙ্কোচ সে ঠিক অনুভব করে নি। ওর মধ্যে একটি আশ্চর্য আনন্দরসের স্বাদ সে পাচ্ছিল। দিদি হয়তো ঝগড়া করতেন, কিন্তু শেষটার জন্তে হাসতে বাধ্য হলেন, বললেন, বলব কি বলুন। বউ বেটীর সামনে, ছি! এখন চা খাবার পাঠাচ্ছি। বীণার ঘর থেকে হারমোনিয়ম আনতে পাঠাচ্ছি। গান শোনান।

—যা আজ্ঞা করবেন। কিছু লবঙ্গ পাঠাবেন তা হলে।

আবার একবার চমকে উঠল নীরা। এ কি কণ্ঠস্বর! গান রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি প্রাণ ঢেলে গাওয়া। বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনি ওঠে। জানালার লোহার গরাদেতে হাত দিলে টের পাওয়া যায় কম্পন উঠছে। গাইছিলেন—

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি ?
হায়, বুঝি তার খবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি—
হায়, বুঝি তার নাগাল মেলে না।

কোলাহলমুখর, চঞ্চল সংসারটার জীবন-স্রোত, স্রোত কল্লোল, সব স্তব্ধ স্থির হয়ে গেছে। যমুনা হয়তো এমনই ভাবে উজান বইত। কিন্তু ভগবান যাকে দেন, তাকে কি এমনি করে দু হাত ভরে দিয়েও ক্ষান্ত হন না, পরিপূর্ণ করে উপচে মাটিতে ফেলে দেন ? এ লোক তো গান গাওয়ার মত গায় না!

দিদি বললেন, তা বটে। সুধা আপনার প্রাণে আছে। খবর কেউ পেলে না।

আবার সেই হাসি।

দিদি বললেন, একখানা ভক্তি রসের হোক। রবীন্দ্রনাথেরই।

—উঁহু। এগুলো এই প্রেমের গান, নতুন শিখেছি এখন। সেগুলো পুরনো মনে হচ্ছে।

—তবে স্বদেশী।

—মহাত্মাজীকে যেদিন হত্যা করেছে, সেই দিন থেকে শব্দটাই ভুলে গেছি। খাইদাই, ওই অনাথ-আশ্রমটা করেছি, তাই করি, ছবি আঁকি, ও সব দামোদরে ভাসিয়ে দিয়েছি। এখন গান শুনুন—বলেই ধরে দিলেন—

কান্না হাসির দোল দোলানো
পৌষ ফাগুনের পালা—
তারই মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা।
এই কি তোমার খুশি,
আমায় তাই পরালে মালা।
সুরের গন্ধ ঢালা।

গানের পর গান, বেলা দেড়টা পর্যন্ত। তারপর স্নান খাওয়া। খাবার পরও রইলেন তিনি। ছেলেদের সঙ্গে দেখা না করে যাবেন কি করে। দিদি হুকুম করলেন—উঁহু রাত্রিটাও এখানে। খাওয়া ভাল হয় নি ওবেলা। বিনো সেনের তাই সই। দুই অসমবয়সী বন্ধু—পরমানন্দে মগ্ন হয়ে রইলেন। শুধু উচ্চ প্রসন্ন হাস্যে বাড়িখানা মধ্যে মধ্যে যেন উল্লাসে চকিত হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ এরই মধ্যে দাদু ডাকলেন—নীরা। নীরার যেতে ইচ্ছে করছিল ওঁদের কাছে—যেতে পারছিল না। সে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দাদু বলেছিলেন—নীরা, বিনো-দা তোমার কাহিনী শুনে তোমার ভক্ত হয়ে পড়েছেন। বলছেন, তুমি যদি ওঁর অনাথ-আশ্রমে যাও, কাজ কর, তবে উনি তোমায় কাজ দেবেন; বি-এ পড়ারও খুব সুবিধে হবে বলছেন। অবশ্য প্রাইভেটে।

বিনো-দা বললেন, আমার এক মাস্টারমশাই আছেন। বুঝেছ। পণ্ডিত লোক। মাস্টারি কলেজেই করতেন। রিটায়ার করে দুর্মতি, দেশে গিয়েছিলেন, ময়মনসিংহে সেই

ভৈরবের ধারে। দেশভাগের সময় আসতে গিয়ে নিজে এসেছেন, দুটো নাতি এসেছে, আর বিধবা বোন, বাকী সব খতম। সর্বস্বান্ত। আমি তাঁকে এখানে নিয়ে গেছি। যা পারি সেবা করি। উনি এটা ওটা করেন। তুমি পড়লে সানন্দে পড়াবেন। মাইনে দেব চল্লিশ টাকা, আর খেতে পাবে দু বেলা বোর্ডিং-কিচেনে। আরও দুটি মেয়ে-মাস্টার আছেন, একটি মহিলা আছেন ছোট্ট বাচ্চাদের দেখেন, এঁরা সবাই কিচেনের খাবার পান, তার ওপর নিজেরা যে যা পারে করে নেয়। এই আর কি! তোমার মত একটা মেয়ে বাংলাদেশে জন্মায় শুনেই তো আমার নাচতে ইচ্ছে করে। বই-কাগজে এ দেশের মেয়েরা দুর্দশায় কেবল অধঃপাতে যাচ্ছে, মিথ্যে বলছে, নিজেদের বেচছে, চোখে কাঁদছে আর কাজল পরছে, ঠোঁটে রঙ মাখছে, এই তো শুনি। এমন হয়েছে যে মেয়ে দেখলেই সন্দেহ হয়, কে রে বাপু, কি এর কাহিনী। তোমার কথা শুনে ভারী ভাল লেগেছে। আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। ভক্ত হয়ে পড়েছি। তোমার মত মেয়ের উপকার আমি করছি, এ অহংকার আমার নেই; বরং মনে ভরসা হচ্ছে, আশ্রমটা গড়ে তুলতে পারব।

সেও এর মধ্যে বিনো দার কাহিনী শুনেছিল। রাত্রে শুনেছিল দিদির কাছে।

বিনো-দা—বিনয় সেন আর্ট স্কুলে পড়তে পড়তে দেশের কাজের চেষ্টার অপরাধে ধরা পড়ে জেলে ঢুকেছিল। হাতেখড়ি তার আগেই হয়েছিল। তখন তার বিশ বছর বয়স, ১৯৩১ সালে।

তিন বছর জেল—সশ্রম কারাদণ্ড। তারপর ডিটেনশন। তারপর বেরিয়ে এসে গণসংযোগ। ছবি আঁকা অবশ্য বন্ধ হয় নি। জেলে গ্রামে কাঠকয়লা। জেলের আগেও রঙও জুটেছিল। ডিটেনশনে সব যোগাড় হয়েছিল, হজেন থেকে নিজেই তুলি রঙ নিত। ডিটেনশনের আর একটা সুবিধে হয়েছিল, গ্রামটা ছিল, বোলপুরের কাছে। মধ্যে শিল্পী নন্দলালের কাছে মাঝে মাঝে যেতেন। ওখানকার অন্য শিল্পীদেরও সাহচর্য শিক্ষা তাও পেয়েছিলেন। বেরিয়ে এসে গণসংযোগ করতে করতে হঠাৎ কলকাতায় এসে আবার বছরখানেক আর্ট ইস্কুলে পড়ে বেরিয়ে এলেন খ্যাতিমান হয়ে; সেবারকার একটা বিশেষ পুরস্কার মেডেল পেলেন। তখন এক বছর খাঁটি শিল্পী হয়ে কলকাতায় কাটিয়েছিলেন। সেই সময়েই দাদুর সঙ্গে আলাপ। কিছুদিন শিষ্যত্বও করেছিলেন। সেই সময় বিনয় সেনের চেলারা এসে ডাকত 'বিনো-দা'। একদা দাদুও বললেন 'বিনো-দা'। সে নামটা কলকাতায় ছড়াল। বেশী বয়সীরাও বলতে লাগল, বিনো-দা। তারপর বিনো-দা হঠাৎ আবার উধাও। এবার একেবারে মহাত্মাজীর আশ্রমে। সেখানে বছরখানেক থেকে ফিরে এসে আবার গণসংযোগ। সেই সময়েই ওই অঞ্চলে গিয়েছিলেন। বছর আড়াই পরে—বিয়াল্লিশ সাল। ফের বিনো-দা জেলে। বেরুলেন পঁয়তাল্লিশ সালে। তখনই তাঁর আশ্রমের পত্তন। বিয়াল্লিশে এই অঞ্চলে লুকিয়েছিলেন ব্রাহ্মণের ঘরে। ফিরে যখন সেখানে গেলেন, তখন দুর্ভিক্ষে মড়কে গ্রাম শেষ। ছিল গুটি তিনেক ব্যাধিগ্রস্ত কঙ্কালসার মেয়ে, একটি পুরুষ আর গুটি চারেক ছেলে। কাজ শুরু করেছিলেন তাদের নিয়ে। সাতচল্লিশে দেশ স্বাধীন হল, সেবার তিনি পেলেন

একটি বড় শিল্পীর সম্মান। সেই বছরই তিনি গেলেন ফ্রান্সে। আশ্রমের ভার দিয়ে গেলেন এক অনুগামী কর্মীকে। ফিরে এলেন গান্ধীজীর তিরোভাবের পর। অর্থাৎ মাস কয়েক থেকেই। বললেন, কি হবে আর ছবি এঁকে। চাকরি তিনি দু-তিনটে পেয়েছিলেন। কিন্তু তার কোনটা নিলেন না, এসে বললেন এই অরণ্যভূমে, সেই গ্রামটিতে। গড়ে তুলতে লাগলেন। মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসতেন, তখন ঘন ঘনই আসতেন, দু বেলা খেয়ে গান শুনিয়ে তবে যেতেন। মধ্যে মধ্যে দিল্লিও যেতে হয়। একদা মহাত্মার স্নেহ পেয়েছিলেন, আজ যাঁরা রাষ্ট্রের কর্ণধার তাঁরা এই খেয়ালী প্রিয়দর্শন শিল্পী কর্মীকে চেনেন, তাঁর গানও শুনেছেন। তাঁকে ডাকতেন শিক্ষাদপ্তর ; সমাজকল্যাণ দপ্তর। তিনি যেতেন। পথে দাদুর বাড়ি ইলিশ মাছ না খেয়ে আর গান না শুনিয়ে যেতেন না। তারপর এই দু বছর একেবারে আসেননি। দু বছর পর এসেছেন, বাড়ি মেতে উঠেছে। উজ্জ্বল বাড়ী উজ্জ্বলতর হয়েছে। এই সর্বজনীন বিনো-দা ; শিল্পী দেশসেবক বিনয় সেন। তিনি বললেন, যাবে আমার সঙ্গে ? দেশ !

নীরা বললে—যাব।

এ তো তার ভাগ্য ! একজন খ্যাতিমান লেখক সেদিন তার অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দিয়েছেন—

পিছে তোর পড়ে থাক নগরীর দীপ
মানুষের ঘরে জ্বালা ভীরু-শিখা আলো—
ভয় কিরে ? চিরদিন আঁধার সমুদ্রে
যাত্রীদলে নক্ষত্রেরা দিগন্ত দেখালো।
এ তো ধ্রুবতারার আলো।
চল উত্তর মুখে। ওই তো শ্রেষ্ঠ পথ।

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য শেষ হয়েছে এইখানে। মহাকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে ধূমকেতু ছুটে বেড়ায়—উল্কা ছুটে চলে। কোন্ নীহারিকাপুঞ্জ থেকে ছিটকে বেরিয়ে লক্ষ্যহীন পথে নিরুদ্দেশে অগ্নিজ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে চলে পুড়ে ছাই হবার জন্য। সেও বেরিয়েছিল তাই। তার মা-বাপের কক্ষচ্যুত হয়ে ছুটে বেরিয়েছিল। জ্বলতে জ্বলতে, পুড়তে পুড়তে। হঠাৎ সে যেন তৃতীয় অঙ্কে এক প্রচণ্ড শক্তিশালী গ্রহের আকর্ষণে বাঁধা পড়ে গেল। ঘুরতে লাগল এক নির্দিষ্ট কক্ষপথে। ধীরে ধীরে এই প্রদক্ষিণায় সে রমণীয় দীপ্তিতে শান্ত স্নিগ্ধ হল ; সে জীবনে সুশ্যাম ধরিত্রীর মত হয়ে উঠতে লাগল। হয়ে উঠত। কিন্তু আবার ছিটকে বেরিয়ে পড়ছে। আবার সে প্রচণ্ড বেগে জ্বলে উঠেছে। ধূমকেতুর মত জ্বালাময়ী দীপ্তির আলোক বিচ্ছুরণ বিচ্ছুরিত হতে শুরু হয়েছে।

নয়

তৃতীয় দৃশ্য—পটভূমি এই আশ্রম। বিনো সেনের—সর্বত্যাগী, বিচিত্র সন্ন্যাসী-শিল্পী দেশসেবক বিনো সেনের সাধনপীঠ। মনোরঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় শুরু হবার পূর্বেই নীরা সচেতনভাবেই বললে—থাক এখন নয়। তাকে যেতে হবে। থাক অভিনয় থাক। গোছানোর কাজকর্ম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পড়ে প্রায় সবই আছে। থাক। ঘর তার জন্যে নয়, সঞ্চয় তার জন্যে নয়, আবার সে কক্ষপথ পরিত্যাগ করে মহাশূন্যলোকে সোজা চলবে সে জীবনের চরম সার্থকতায়। সে সার্থকতা তার কর্মজীবনে মহিমান্বিত প্রতিষ্ঠায়। এণাক্ষী তাকে ছবির রাজ্যের সিংহদ্বার খুলে দিতে চেয়েছিল—সে ধনে সম্পদে, বিলাসে বৈভবে, হাস্যে লাস্যে—গন্ধর্ব-রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী হতে পারত, অন্তত এণাক্ষী তাই বলেছিল—তাতে তার মন ওঠে নি। এদেশের বড় বড় লোক, কাগজ, সমাজসেবীরা আজ বাঙালীর মেয়েরা ছবিতে নামবার জন্যে জনগণমন-অধিনায়িকা হবার জন্য নাকি পাগল হয়ে উঠেছে বলে চিন্তান্বিত। হায় রে হায়! কতটুকু জানে এরা? এরা কি ওই ক'জন মেয়েদেরই বাঙালীর মেয়েদের মুখপাত্র মনে করে? দেখেছে এরা কত হাজার মেয়ে আজ অফিসে কাজ করছে? কত হাজার মেয়ে আজ শিক্ষাব্রতী? তাদের শান্ত সংযত দৃষ্টি দৃঢ় পদক্ষেপ কি চোখে পড়ে না এদের? দেখে নি কি তাদের রূপ? কত সত্যকারের রাণীর মত মেয়ে এই জীবনে তপস্বিনীর মতই কৃচ্ছ্রসাধন করে চলেছে যাদের তুলনায় হয়তো এই ছবির রাজ্যের রাণীরা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এই চিন্তাবিদেরা বিচিত্র। এরা একদিকে সতীত্বের কথায় ঠোঁট ওল্টায় আবার ছবিতে যারা নামে তাদের অবজ্ঞা করে, ঘৃণাও করে।

থাক্। গোছানো হয়ে গেছে। কাপড়-চোপড় যা' পরনে আছে তাই পরেই যাবে। তার জীবনে বিলাস নেই, আছে তপস্যা। তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার তপস্যা। এখনও অনেক পথ তার বাকী। অনেক পথ। পথের ধুলো তার গায়ে লাগবে। তার বেশভূষাকে মলিন করবে। থাক কাপড়-চোপড়। তার জীবননাট্যের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যেই তার জীবননাট্যকারের অঙ্গুলি নির্দেশে—অমোঘ ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে। তুমি চলো, তুমি চলো। তুমি ঘরের নও, পথের। এবারও ঠিক তৃতীয় অঙ্কের শেষে তার সেই তর্জনীটি তেমনি সোজা ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করছে—পথে-পথে-পথে। ঘর নয়।

বেরিয়ে এল নীরা ঘর থেকে। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কই, আশ্রমের সামপানি গাড়ি কই? বিনো সেন বললেন তাকে লজ্জা ঘৃণার উর্ধ্বে দণ্ডায়মান মহিমাময় ব্যক্তির মহিমান্বিত ভঙ্গিতে। কই? না—ওই আসছে। ওই যে আশ্রমের ওই কোণটায় সামপানি চালকের হেৎ-হেৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে। গরুর গলার ঘণ্টাও শোনা যাচ্ছে। তার অবশ্য ট্রেন ফেলের ভয় নেই। ট্রেন সকালে। শুধু এখান থেকে চলে তাকে যেতে হবে আজই রাত্রে। হ্যাঁ, আজই রাত্রে। লগ্ন এসে গেছে। বিস্তীর্ণ আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি মাত্র ইলেকট্রিক আলোর পোস্ট, তাতে আলো একটা জলছে—আড়াইশ বাতির বাল্ব কিন্তু তার আলোতে আলোকিত

হয়নি ঠিক।

ওই কোণটা দিয়েই গাড়িটা ঢুকেছিল। ঠিক আজকের মতই—আজ যেমন ঢুকছে। সামপানির ভিতর সেদিন একটা সিটে ছিল সে—অন্য সিটে বিনো সেন। ছেলের দল ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল মাঠে।

বিকেলবেলা, তখনও ইস্কুলের ছুটি হয় নি। কিন্তু বিনো সেনের সামপানি দূর থেকে দেখেই ছেলেরা ভিড় করে বেরিয়ে এসে বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সামপানিতে বসেই বিনো সেন হাত নাড়ছিলেন। এবং হাসছিলেন। সামপানিটা ওই কোণ দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই তারা ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়াল। বিনো দা—বিনো দা! বিনো সেন বিচিত্র, তিনি লজেন্সের বড় ঠোঙাটা হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে নেমেছিলেন ছোট ছেলের মত এবং গান ধরে দিয়েছিলেন সেই ভরাট গলায়—

এসেছে পাগলা বিনো আগুলে তোরা ধর দেখি কই!
লেবেনচুষের ঠোঙা হাতে ডাকল ডেকে ভাগলরে ওই।

বলেই তিনি ছুটতে শুরু করেছিলেন। ছেলেরা ওই গানের সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠল।

হৈ হৈ হৈ-রৈ রৈ রৈ

বিনো সেন লজেন্সের ঠোঙা ধরা হাতখানা উঁচু করে ধরে ছুটতে ছুটতে আবার ধরেছিলেন—

পাগলা জিতে একলা খাবে হারাবে যারা চোগলা পাবে
চোগলা মানে অয়েল পেপার কান্না শুনতে রাজী তো নই।

ছেলের দল সেই হৈ-হৈ-হৈ রৈ-রৈ-রৈ গাইতে গাইতে প্রাণপণে ছুটছিল। সে এক দৃশ্য। নীরার মুখ স্মিত হাস্যে ভরে উঠেছিল। সেইখানে দাঁড়িয়েই দেখছিল। চোখ তার ছুটছিল—ওদের পিছনে পিছনে। তারই মধ্যে চোখে পড়েছিল—আশ্রমের চেহারাটা। সুন্দর রাঙা মাটির দেশ। প্রায় তিন দিকে অল্প দূরে দূরে শালবন। ঘন সবুজের ঘর। তার মাঝখানে রাঙা মাটির উপর আশ্রম। চারিদিকে নতুন বাড়ির পত্তন হয়েছে। কাজ চলছে। রাজমিস্ত্রীরা কাজ করছিল তখনও, তারাও কাজ বন্ধ করে বিনো সেনের সঙ্গে ছেলেদের রেস দেখছিল এবং হাসছিল। বিনো-দা প্রচণ্ড বেগে ছুটছেন। ছেলেরা অনেক পিছনে পড়েছে। বাচ্চারা অনেক দূরে। তবুও তারা হা রে রে চীৎকার করে ছুটতে চেষ্টা করছে। জন কয়েক আছাড় খেয়ে পড়ছে। উঠে ধুলো ঝাড়ছে। বিনো সেন ছুটে পরিক্রমা শেষ করলেন পুরনো আমলের ইস্কুলের আপিস-ঘরের বারান্দায়। মাটির ঘর খড়ের চাল শাল কাঠের খুঁটি। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনটি মহিলা। তাঁরা এখানকার শিক্ষয়িত্রী তা সে বুঝেছিল। তাদের ভালভাবে তখনও সে দেখে নি, কারণ চোখ তার বিনো সেনের এবং ছেলেদের পিছনেই নিবদ্ধ ছিল; তারই মধ্যে দেখেছিল পারিপার্শ্বিক এবং নতুন বাড়িঘরের আয়োজন এবং যেখানে সে সামপানি থেকে নেমেছিল সেখানটা আপিস থেকে একটু দূরও ছিল। তা হাত চল্লিশেক হবে বৈাক। এবার বিনো সেনের সেখানে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে তারও দৃষ্টি

সেখানে পড়েছিল। একজন স্থূলাঙ্গী সে একেবারে উল্লাসে গদগদ হয়ে হাসছিলেন—এই ধরনের মোটা মেয়েরা যেমনভাবে হাসেন। আর একজন শীর্ণাঙ্গী মুখে রুমাল চেপে হাসছিলেন। চোখে চশমা। আর একটি মেয়ে সরুপাড় কাপড় পরা আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে। দূর থেকে সে হাসছিল কি হাসছিল না বুঝতে পারে নি নীরা। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এক বৃদ্ধ আরও জন তিনেক ভদ্রলোক। আরও জন কয়েক এদেশের মাটির মানুষ। চিনতে কষ্ট হয় নি। দেখবামাত্র তাদের চেনা যায়। নগ্নগাত্র খাটো-কাপড়-পরা মানুষ। আর ওরা অণিমাদি, কমলাদি আর এই প্রতিমা। বৃদ্ধটি বিনো সেনের মাস্টারমশাই। সেই অধ্যাপক। বাকী তিনজন সত্যবাবু, হর্ষবাবু, চারুবাবু এখানকার শিক্ষক বিনো সেনের সহকর্মী।

বিনো সেন ওখানে পৌঁছেই তাকে হাত নেড়ে ডেকেছিলেন—এখানে! এখানে! নীরা এখানে এস।

নীরা সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং থমকে গিয়েছিল। অথবা পৌঁছেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে কি দৃষ্টি! প্রশ্ন সকলের চোখেই ছিল, কিন্তু ওই সরুপাড়-কাপড়পরা সুন্দরী মেয়েটির প্রতিমার মত ডাগর চোখে সে কি শুষ্ক রুক্ষ কঠিন দৃষ্টি। না, হল না—, শুষ্ক রুক্ষ কঠিন থেকেও আরও বেশী কিছু। সে দৃষ্টি নিষ্ঠুর, হিংস্র। হ্যাঁ, হিংস্র। পলকহীন ওই দৃষ্টিতে প্রতিমা তার দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু সারা মুখে ভুরুতে কপালে কি চিবুকে কোথাও আর কোন একটি রেখার চিহ্ন ছিল না। যেন পাথরের মুখে ওই দৃষ্টি। বোধ হয় নীরার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল সবিস্ময় তিক্ত প্রশ্নে। হয়তো সে কিছু বলত। কিন্তু তার আগেই বিনো সেন বলেছিলেন—তাকেই বলেছিলেন—এঁরা জিজ্ঞেস করছিলেন তুমি কে ? পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি নীরা! বুঝেছ প্রতিমা, বুঝেছেন অণিমাদি, ইনি শ্রীমতী নীরা। হীরা নয় জিরাও নয়, পাঁচফুটের বেশি লম্বা, তেমনি গায়ে জোর, মনের জোর আরও বেশী। আজীবন লড়াই ক'রে জেতা মেয়ে, নাম তার নীরা। আই-এ পাস করেছেন। এখানে পড়াবেন; মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়বেন; এই গুণ্ডা দলের সঙ্গে লড়বেন, ওদের পিটে পিটে গড়বেন। উনি শ্রীমতী নীরা! আর নীরা, ইনি প্রতিমা—ছেলেদের মা-মণি মহিমময়ী মাতৃত্বের তপস্যায় রত। ইনি অণিমাদি, ছেলেরা গোপনে বলে—ঢিপসি দি। অর্থাৎ মোটা দি। বড্ড হাসেন। ইনি কমলাদি, ছেলেরা বলে কাঠিদি। আমি বলি—বিষণ্ণদি। একি প্রতিমা যাচ্ছ কোথায় ?

প্রতিমা অকস্মাৎ ঘুরে চলে যাচ্ছিল—ইস্কুলের ভিতরের দিকে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—শরীরটা আমার ভাল নেই।

—কি হল ?

—ঠিক বুঝতে পারছিনে।

—দেখি এখানে এস, জ্বর হয় নি তো ? এস হাতটা দেখি।

প্রতিমা সে আহ্বান লঙ্ঘন করতে পারে নি। এসে দাঁড়িয়ে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিনো সেন নাড়ী পরীক্ষা করে বলেছিলেন—একটু চঞ্চল হয়েছে নাড়ীটা। কিন্তু তোমার কাজটা করে যাও। তুমি ওদের মা-মণি। বেচারারা হেরে গিয়ে মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে

আছে। আমার কাছে লজেন্সের অয়েল পেপার ছাড়া পাওনা নেই। ভিক্ষে ওরা করবে না। এখন তুমি এটা কেড়ে নিয়ে বিতরণ করতে পার। তাতে ওদের অপমান হবে না। নাও। যাও। তোমরা তোমাদের মা-মণির কাছে নাও গিয়ে।

প্রতিমা নিঃশব্দে ঠোঙাটি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল ছেলেদের মধ্যে। একটা যন্ত্রমানুষের মত। প্রাণহীন পুতুলের মত। কেমন যেন বেদনাদায়ক মনে হয়েছিল নীরার।

হঠাৎ বিনো সেন উঠে এগিয়ে গিয়েছিলেন—দাঁড়াও দাঁড়াও। বলে ঠোঙায় হাত পুরে একমুঠো লজেন্স তুলে নিয়ে ফিরে এসে বলেছিলেন—অণিমাদি চুলবুল করছেন। আমি দেখছি। জিভ ওঁর জলে ভরে উঠেছে। আমি হলফ করে বলতে পারি—।

খিল খিল শব্দে হেসে স্থূলাঙ্গী অণিমাদি কমলাদির ঘাড়ে হাত রেখে যেন পড়ে যাওয়া থেকে আত্মরক্ষা করলেন। বিনো সেন বললেন—Please অণিমাদি, এমন ক'রে নয়, একটু সামলে। বেচারী কমলাদি কাঠির মত মানুষ, আপনার ভারে মট্ ক'রে ভেঙে যেতে পারেন। সমবেত সকলেই হেসে উঠল। বৃদ্ধ অধ্যাপক মাস্টারমশাই পর্যন্ত। বিনো সেন বললেন—নিন অণিমাদি, ধরুন। ধরুন এবার কমলাদি? এবার নীরা।

নীরার একবিন্দু সঙ্কোচ ছিল না।

দাদুর বাড়ি থেকে এই আশ্রম পর্যন্ত বিনো সেনের সঙ্গে একসঙ্গে আসার মধ্যে সে যেন আবিষ্কার করেছিল একজন মানুষকে—যে মানুষ সকল মানুষের হাসিখেলা সুখদুঃখের আসরের সমবয়সী সঙ্গীজন। সে হাসিমুখেই হাত পেতে নিয়েছিল এবং মুখে পুরেছিল।

এবার বিনো সেন বলেছিলেন—এবার মাস্টারমশাই।

প্রসন্ন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধও দ্বিধা করেন নি, হাসিমুখে হাত পেতে নিয়েছিলেন। তারপর অন্য শিক্ষকদের এবং গ্রামের কয়েকজনকে দিয়ে নিজে দুটো লজেন্স মুখে পুরে বলেছিলেন—এবার আমি।

বৃদ্ধ অধ্যাপক এবার বলেছিলেন—তুমি কিন্তু নিজের ভাগে একটা বেশী নিলে বিনো।

—হ্যাঁ স্যার, তা নিয়েছি। লজেন্স আমার ভারী ভাল লাগে। আমার বাক্সখানা তল্লাস করলে লজেন্সের প্যাকেট পাবেন। যখন মন খারাপ হয় তখনই একটা মুখে পুরে চুষতে শুরু করি। মন ভাল হয়ে যায়। বিশেষ করে টাকে হাত বুলিয়ে। তখন লজেন্স মুখে দিলে মনে হয় টাকটা বেদান্তের মায়া। আসলে আমি ছেলেমানুষ।

সকলের মুখই প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। মুহূর্তে যাদুকরের মত সব আবহাওয়া পাল্টে দিয়েছিলেন বিনো সেন। বলেছিলেন—বলতে ভুলে গেছি স্যার। দিল্লি থেকে ফেরার পথে বেনারসে নেমেছিলাম। গোপীনাথ কবিরাজমশায়ের সঙ্গে দেখাও করেছি। আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, এ প্রশ্ন কার? তোমার তো হতে পারে না। বললাম—কেন বলুন তো? বললেন, এ প্রশ্ন যারা করবে তাদের মুখের চেহারা আলাদা হয়। আর সে বয়সও নয় তোমার। বুঝুন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। কি বললেন?

—বললেন—একটু নির্জনে চলুন, বাচ্চারা হৈ হৈ করছে।

নীরাকে টেনে নিয়ে তখন অণিমাদি আলাপ জুড়ে দিয়েছেন।

—আশ্চর্য চেহারা ভাই তোমার। দেখলেই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে, আবার ভয়ও হয়। বলেই জড়িয়ে ধরে আলাপ শুরু।

—কিন্তু ভবিষ্যতে যদি মোটা হও, তবে আর দুঃখের সীমা থাকবে না। এই লম্বা তুমি, আমার ডবল মোটা হয়ে যাবে। বলেই হাসতে শুরু করে দিলেন।

কমলাদি বললেন, নামটিও তোমার বেশ ভাই। নীরা!

নীরা এবার বললে—প্রতিমাদি কি এখানে? আপনারা দিদিমণি উনি মা-মণি কেন?

হাসি শুরু করেছিল অণিমাদি কিন্তু কমলা একটু রূঢ় স্বরেই বললেন—অণিমাদি! ও কি। সে থেমে গেল।

কমলাদি বললেন—উনি ছোট বাচ্চাদের দেখেন। তাই মা-মণি।

তারপর আবার বললেন—দেখ, আমরা ঠিক জানিনে। তবে মনে হয় জীবনে সন্তান হারিয়েছিলেন। বিনো-দাকে তো দেখলে, উনি ওঁকে এখানে এনে অনেক ছেলের মা করে দিয়েছেন। অবশ্য প্রতিমাদি আমাদের আগে এসেছেন। বোধ হয় উনি বিনো-দার আত্মীয়া, তা না হয় তো আগের চেনা লোক। বিনো-দার একটু বেশী স্নেহও আছে, প্রতিমাদির দাবীও একটু বেশী। মানে আমরা যা পারি না। এই আর কি। প্রতিমাদির জীবনে দুঃখ আছে। বুঝেছ না। উনি ওইরকম।

নীরার দৃষ্টি এরই মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিল বৃদ্ধ শিক্ষক এবং শিষ্যের দিকে। গভীর আলোচনায় মগ্ন দুজনে। এ বিনো সেনকে সে এই কদিনের মধ্যে দেখে নি। এ এক নূতন মানুষ, গোপীনাথ কবিরাজের কথা এই কিছুদিন আগে আনন্দবাজারে পড়েছে। বিরাট মনীষী। একটি পাথরের বা ধাতুর তৈরী প্রাচীন ভারতের জ্ঞানস্তম্ভ। গুরু শিষ্য দুজনেই শুধু নির্বাক হয়ে মনশ্চক্ষু দিয়ে ওই স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে আছেন।

এই মুহূর্তেই ঘটেছিল একটা ঘটনা। আকস্মিক তীব্রকণ্ঠের চীৎকারে সকলেই চমকে উঠেছিল। নীরা বেশী। চমকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিল সে।

প্রতিমা দেবী চিৎকার করে উঠেছেন—ছাড়। ছাড়। ছাড়। মেরে ফেলব তোকে। ছাড়।

তাঁর হাত থেকে পড়ে গেছে লজেন্সের ঠোঙা। দুটো বড় ছেলেতে প্রচণ্ড মারামারি বাধিয়েছে। পরস্পরকে নিষ্ঠুর আক্রোশে আক্রমণ করে জড়িয়ে ধরেছে। একজন পড়েছে নিচে, অন্যজন তার বুকে বসেছে, আথালিপাথালি কিল চড় মারছে আর নিচের জন উপরের জনের মাথার চুলের গোছা ধরেছে এক হাতে অন্য হাতে খামচে ধরেছে গাল। প্রতিমা হাতের ঠোঙা ফেলে দিয়ে বাখারী নিয়ে তাদের নিষ্ঠুরভাবে পিটছে এবং তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করছে কঠিন ক্রোধে। কিন্তু তবু তারা ছাড়বে না কেউ কাউকে।

অণিমাদি বললে—গেল, গেল, একটা গেল। কি হবে?

বিনো সেন এবং অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা গোপীনাথের কথা বলতে বলতে দূরে চলে গেছেন। অণিমাই আবার বললে—আমি এ গতর নিয়ে ছুটতে পারব না, তুমি যাও

কমলা ভাই।

—আমি পারব ওই দৈত্যের সঙ্গে? তার উপর প্রতিমাদি রাগলে যা করেন জানো তো! ডাকো বিনো-দাকে ডাক।

নীরা বললে, আমি যাচ্ছি। সে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল। সঙ্কোচ করলে না। এবং দুই হাতে দুজনকে ধরে কঠিন কণ্ঠে বলল, ছাড়! ছাড়!

অপরিচিত একটি মুখ এবং সে মুখে যেন একটা কিছু ছিল যা তারা মা-মাসি বা দিদিমণিদের মধ্যে দেখে নি। যা অসাধারণ, প্রদীপ্ত এবং অধিকতর শক্তিতে প্রবল বলেও অলঙ্ঘনীয়। তার সেই সবল দেহ এবং প্রদীপ্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পরস্পরকে ছেড়ে দিল। নীরাও তাদের পৃথক ক'রে সরিয়ে দিয়ে তাদের ছেড়ে দিল। কিন্তু মুহূর্ত পরেই আবার হল বিস্ফোরণ—এবার একটি ছেলে মুক্ত হয়ে নীরার উপরেই লাফিয়ে পড়ল। নীরা এটা আশঙ্কা করে নি। 'তা' হলেও সামলে নিতে দেরি হল না তার; সঙ্গে সঙ্গে রাগও হল। সে মুহূর্তে ছেলেটার চুলের মুঠোয় ধরে তাকে শূন্যে খানিকটা তুলে মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে—তোমাকে আরও নিষ্ঠুর শাস্তি দিতাম আমি, কিন্তু আজ তোমাকে ক্ষমা করলাম।

প্রতিমা সেই বিস্মিত তিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। নীরা বললে—আপনাকে আঁচড় কামড় দেয় নি তো।

—না। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েই সে ফিরল। এবং টফি লজেন্সের ঠোঙাটার দিকে দেখিয়ে দিয়ে অণিমা দিদিকে লক্ষ্য ক'রে বলল— ওঁকে বলো এ আর আমি পারছি না। লোকও এসেছে, লোকেরও অভাব হবে না। আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে। বলেই সে চলে গেল মাঠ ভেঙে ওদিকের ঘরগুলির দিকে।

অণিমাদি এবার হাসলে না—বললে, মরণ তোমার! স্থূল শরীর নিয়েও অণিমাদি নীরার পিছনে পিছনেই বোধ হয় এসে দাঁড়িয়েছিল।

কমলাদি একটু হাসলে। নীরা বললে—কি ব্যাপার বলুন তো?

—ব্যাপার? মরণের ব্যাপার! আবার কি? তার ওপর তুমি এসেছ। আর রক্ষে আছে?

কমলাদি বললেন, থাকতে থাকতে সবই বুঝবে ভাই। থাক কিছুদিন।

অণিমাদি বললেন—বুঝবে আর ছাই, ওই শিবের মত লোকটাকে অতিষ্ঠ করে দিলে গা।

কমলাদি বললেন—দোষ মিছে দিচ্ছ ভাই। মন যে বড় অবুঝ!

অবুঝ মেয়েটিকে তখনও দেখা যাচ্ছিল, ওই ও প্রান্তে মাটির ঘরগুলির এলাকায় সবে ঢুকছে। মন্থর ক্লান্ত গতিতে।

নীরার আর সমবেদনার সীমা রইল না। সে বুঝেছে—ওই সুন্দরী মেয়েটি বিনো-দাকে ভালবেসেছে। বিনো-দাও তা জানেন। হয়তো বা ভালও বাসেন। তবে? তবে, কেন তাকে এ দুঃখ দিচ্ছেন? কিসের জন্য? এমন মানুষের এ কি আচরণ? একটু মনে লাগল তার।

কিন্তু উনি হঠাৎ এমন আচরণ করলেন কেন? হঠাৎ নিজের মনেই প্রশ্ন করলে—তাকে দেখে? সে হাসতে গেল কিন্তু পারলে না। ছি!

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সারাটাক্ষণ অণিমাদি কমলাদি'র সঙ্গে নানান কথার মধ্যে ওই কথাটাই বার বার যেন ফিরে ফিরে এসেছিল—অথবা উঠে পড়েছিল।

নীরা নিজের জেঠীমার কথা বলতে বলতে বলেছিল—মানুষটা আশ্চর্য। বিষ সে সাতসমুদ্রের মত। আবার জ্যাঠামশায়ের বেলা সে যেন নীল আকাশ; রাত্রের নীল আকাশ—যত শান্ত নীল তত নক্ষত্রের শোভায় ঝলমল। আমাকে ক'দিন স্নেহ করেছেন—সে অগাধ। আবার সারাজীবন যে ঘেন্না হিংসে করেছেন—তার জ্বালায় জীবনটা আজও জর্জর হয়ে আছে।

কমলাদি হঠাৎ বলেছিলেন—থাকে, এমন মানুষ অনেক আছে ভাই—

অণিমাদি বলেছিলেন—দেখ না প্রতিমাকে দেখ! কি কমলা? বল?

—হ্যাঁ। অনেকটা মিল আছে!

নীরা চুপ করেই ছিল। কি বলবে?

আবার কিছুক্ষণ পর নীরার কথায় ফিরে এসেছিল প্রসঙ্গটা: নীরা বলে যাচ্ছিল নিজের কথা। বলতে বলতে এসেছিল হেনার কথায়। বলেছিল—ওই মায়ের সে এক আশ্চর্য মেয়ে। বুঝেছেন—নিজে ওই কাণ্ড করেছিল বলেই নাকি বিয়ের পর স্বামীর উপর গোয়েন্দাগিরিই হল তার কাজ! কোথায় জামায় লম্বা চুল লেগে আছে, কোথায় কি গন্ধ উঠছে—

এ কথা সে আর শেষ করতে পারে নি। স্থূলাঙ্গী অণিমাদি বিপুল কৌতুকে হেসে বিপুল দেহভার নিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল মেঝের উপর।—কমলাকে ঠেলা দিয়ে বলেছিল—মাইরি ভাই কমলা—আমি ঈশ্বরের দিব্যি গেলে বলতে পারি উনিও তাই করেন।

নীরা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল—কে?

হাসি অণিমাদি'র একেবারে জলপ্রপাতের মত ভেঙে যেন আছড়ে পড়েছিল। কথা বলতে পারে নি। নীরা সবিস্ময়ে তাকিয়েছিল কমলার দিকে।

কমলা বলেছিল—ওই—উনি, প্রতিমাদি!

প্রতিমাদি?

ঠিক এই মুহূর্তেই ডাক দিয়েছিলেন বিনো সেন।

—নীরা আছ!

সকলে সচকিত হয়ে উঠে বসেছিল। নীরা বলেছিল—আছি। আসুন।

ঘরে ঢুকে বিনো সেন বলেছিলেন—ত্রিমূর্তিই এখানে। ভেরি গুড!

রাত্রে সকলের খোঁজ করা বিনো সেনের নির্ধারিত কর্মসূচী।

আজ তার ব্যতিক্রম ঘটল।

ছ বছর পর, আজ আর বিনো সেন আসবেন না—আসতে সাহস করবেন না, আর ডাক

দেবেন না—নীরা!

শেষ তার সঙ্গে সব সম্পর্ক। শেষ হয়ে গেছে সন্ধ্যাতে। এইবার সে চলে যাবে। চলে যাবে সামপানিতে চড়ে এই বনের ভিতর দিয়ে পথের উপর দিয়ে, দামোদর ব্যারাজ পার হয়ে সে চলে যাবে।

সামপানিটা আসছে। আলো দুটো চাকার ঝাঁকুনিতে কাঁপছে। এ দিক থেকে কারা আসছে যেন। কয়েকজন। অণিমাদি, কমলাদি, আর কে? মাস্টারমশাই হরিচরণবাবু! তার পিছনে চারুবাবু। আর কে? বিনো সেন?

আশ্চর্য লজ্জাহীন স্পর্ধিত মানুষ তো!

দশ

হ্যাঁ, বিনো সেনই।

হাতে একখানা মোটা খাম। বললেন—বিনা ভূমিকায় সহজ সাধারণ কণ্ঠে বললেন—এতে আপনার মাইনে আর আমাদের তরফ থেকে সকলকে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা দেওয়ার কথা হয়েছে তারই দরুণ টাকাটা রয়েছে। এটা ধরুন।

মুখের দিকে ক্ষণেকের জন্ম মুখ তুলে তাকালে নীরা—তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে—টেবিলের উপর রেখে দিন।

রেখেই দিলেন বিনো সেন; রেখে বললেন—ওটা কিন্তু দেখে নিতে হবে আপনাকে এবং রসিদ একটা লেখাই আছে—সেটায় সই ক'রে দিতে হবে।

একটু হেসে বললেন—না ক'রে তো উপায় নেই। হিসেব দিতে হয় সরকারকে, আপনি জানেন।

মনের তিক্ততা মাটির বুকের উত্তাপের মতই চাপা রাখতে হল। তার উদ্গার একটু আগেই হয়ে গেছে। উচ্ছ্বসিত উত্তাপ নিঃশেষিত হয়ে গেছে; দেহমন দুই-ই ক্লান্ত এখন—তারপর মনোরঙ্গমঞ্চে তার অতীত জীবনের স্মৃতি-নাট্যাভিনয়ের মধ্যে মন কেমন যেন মগ্ন হয়ে খানিকটা উদাস হয়ে পড়েছে। হয়তো বা বিনো সেনের প্রতি সেই সময়ের শ্রদ্ধা বিস্ময় অনুরক্তি সব মনে পড়ে তাকে খানিকটা নরম ক'রে দিয়েছে। হয়তো প্রচ্ছন্ন একটি প্রশ্ন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে নীরবে নিঃশব্দে। সে মুখর না হয়েও ইঙ্গিতে যেন বলছে এতটা কাল সব মিথ্যা হয়ে আজকের এইটুকুই কি পরম ও চরম সত্য হয়ে উঠল?

এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই আছে কিন্তু সব সময় দেওয়া যায় না। ভিক্ষুককে ভিক্ষুক বললে সত্য কথাই বলা হয় কিন্তু চক্ষুলজ্জাই বল আর করুণাই বল, যা হল আসলে দুর্বলতা—তার এতটুকু মনের কোণে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বলা যায় না। কাজেই এই ক্ষেত্রে মনের এই ক্লান্ত অবস্থায় বিদায়ের মুহূর্তে সকলের সঙ্গে যখন বিনো সেন এসে দাঁড়িয়েছে নির্লজ্জের মত তখন আর পারছে না তাকে বলতে—আপনার মত এত বড় লজ্জাহীন মানুষ আর আমি জীবনে

দেখি নি। ধনী সোমেশবাবুর দস্তুরে—'মনা ঘোষের উচ্ছিষ্ট কন্যা' ব'লে তাকে গাল দেওয়া সে বুঝতে পারে—কিন্তু আপনার এই ঘণ্টা দুয়েক আগের মাটির দিকে চেয়ে থাকা চোখ তুলে—মাথা তুলে অসঙ্কোচ হাসি হেসে সামনে দাঁড়ানো এবং কথা বলার প্রবৃত্তি ও মনকে সে বুঝতে পারে না। কেমন ক'রে পারলেন আপনি?

থাক সে থাক। তিক্ততা তার মনের মধ্যেই থাক। সে টেবিলের কাছে গিয়ে নোট ও হিসেবের কাগজের ভিতর থেকে রসিদখানা বের করে—অঙ্কটা দেখে তার উপর সই করে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—নিন।

রসিদখানা পকেটে পুরে বিনো সেন বললেন—স্কলারশিপের কাগজগুলো বিকেলেই দিয়েছি। ওটাকে যেন আমার অনুগ্রহ বলে উপেক্ষা করো না। এটা এদেশের একটি সুযোগ্য মেয়ে হিসেবে তোমার প্রাপ্য। সে ভুল তুমি যেন ক'র না।

একটু থেমে আবার বললেন—তুমি আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছ আমি তোমাকে তুমি বলছি ব'লে। তা বলছি। আমি বয়সে বড়। অনেক স্নেহ করেছি। আপনি বলতে পারছি নে। এবং তার জন্যে ক্ষমা করো বলতেও বাধছে। আচ্ছা আমি যাচ্ছি। কল্যাণ হোক তোমার।

বলেই বিনো সেন চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ সব মানুষ ক'টি স্তব্ধ হয়ে রইল। রইল নয়, কেউ বা কিছুতে যেন বাধ্য করলে স্তব্ধ হয়ে থাকতে। নীরাও স্তব্ধ হয়ে রইল বাধ্য হয়ে। বিনো সেনের নিজের অন্যায় এবং সেই অন্যায়ের প্রতিবাদে নীরা যে নিষ্ঠুর অপমান তাকে করেছে—সে সব কিছুকে এমন আশ্চর্য নিরাসক্তির সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এমন সহজভাবে এসে দাঁড়ানো এবং সহজ বিদায় দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে অবশ্যই বিস্ময়ের অনেক কিছু আছে। কিন্তু তারও চেয়ে বেশী কিছু আছে—যা অব্যক্ত অথচ অনুভবের মধ্যে সকলকেই স্পর্শ করেছে। বিনো সেনের ক্ষোভহীন এই প্রকাশ বড় সকরুণ; যেন, যেন—বেদনায় ভরা।

নীরার ভুরু দুটি মোটা এবং জোড়া। ওই ভুরু দুটির মিলনস্থলে একটি কুঞ্চনের কুণ্ডলী জেগে উঠেছে। শূন্যগর্ভ আগ্নেয়গিরি নিভে যাওয়া গহ্বর-মুখের মত।

এ নিস্তব্ধতা প্রথম ভঙ্গ করলেন—বৃদ্ধ অধ্যাপক হরিচরণবাবু। ডাকলেন—মা নীরা।

নীরা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চেষ্টা ক'রে হেসে যথাসাধ্য সহজভাবে বললে—আমি যেতাম আপনার কাছে।

একটু থেমে আবার বললে—অবশ্য ভয় ছিল—পাছে বারণ করেন। হরিচরণবাবু বললেন—না মা। এরপর তা বলব কেন? তা বলতেও আসি নি। অবশ্য তোমাকে বলা ঠিক হচ্ছে কিনা জানি না—বিনো আমাকে নিজে থেকে ডেকে বলেছে বাধা ওকে দেবেন না মাস্টার-মশাই। আমি তার বা তোমার কারও বিচারই করি নি, করছি নে। বুড়ো হলাম মা, দেখলাম অনেক। দেখেই যাই। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করতেই এসেছি। তবে মনটা খুঁত খুঁত করছে—এই রাত্রে যাবে মা?

নীরা শেষের কথায় এত কথায় উত্তর এক কথায় মিটিয়ে দেবার সুযোগ পেয়ে গেল। সে এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বললে—আর আমাকে বারণ করবেন না। মন

আমার ঝিমিয়ে গেছে।

বলেই সে ঘুরে দাঁড়াল অণিমাদি এবং কমলাদির দিকে। এত দিনের সহকর্মী—সুখদুঃখ হাসিকান্না—কত ছোটখাটো কলহ, কত নিবিড় অন্তরঙ্গতার মনের-কথা বিনিময়ের সঙ্গী প্রতিপক্ষ-সখী। তারা এখনও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্যে তারা দুঃখ পেয়েছে বা সে-ই তাদের আজ দুঃখ না দিক তিক্ত করেছে সে কথা নীরা ঠিক অনুমান করতে পারলে না। কিন্তু সে বোঝাপড়ার বা আলোচনার সময় নেই। সে এদের সঙ্গেও বিদায়-পর্বটা এক কথায় মিটিয়ে দিলে। বললে—চলছি ভাই অণিমাদি, কমলাদি!

হাসতেও একটু চেষ্টা করল।

—এসো ভাই। কি বলব? বললে অণিমাদি। সেও একটু হাসতে চেষ্টা করলে। কমলাদি শুধু হাসতে চেষ্টা করে ছেদ টেনে দিলে।

নীরাও আর বাড়ালে না। সে সামপানির গাড়োয়ানকে ডেকে বললে—জিনিসগুলি চাপিয়ে নাও বাঁকু। ধ'রে দেবার লোক চাই—না?

বাঁকুর নাম বাঁকারায়, সে বললে—লোক আসছে দিদিমণি। অরে—হৈ—রাখহরি। পা চালায়ে আস হে! তারপর নীরার দিকে ফিরে বলছে—তিনজনা যাব আজ্ঞা আমরা। হুকুম দিছেন বাবু।

গাড়িতে উঠবার আগে আর একবার সে সংক্ষেপে সম্ভাষণ সেরে নিলে। তাঁরা উত্তর দিলেন সংক্ষেপে। দুটি কথায় শেষ হওয়ার মত সংক্ষিপ্ত—

—আসি।

—এস!

তার সঙ্গে ওই চেষ্টা ক'রে হাসা একটু নিঃশব্দ হাসি।

শুধু হরিচরণবাবু বললেন—তুমি যেন স্কলারশিপটা নিয়ো মা। ওটা যেন উপেক্ষা ক'র না। তোমার জীবনের গতি যে মুখে- -আর যা যোগ্যতা তোমার তাতে দেশও অনেক কিছু পাবে, তুমিও সার্থক হবে।

—ভেবে দেখি!

বলেই গাড়িতে উঠল। গাড়িটা চলতে লাগল। ইটের খোয়ার উপর বাঁকুড়ার লাল কাঁকর ফেলা পথ। বাইরে দেখতে চমৎকার, রাঙামাটির পথ। কিন্তু সামপানি-গাড়িটার চাকার লোহার বেড় খোয়াগুলির উপর খড় খড় ঘট ঘট শব্দ করে শীতের কাঁপুনির মত ঝাঁকুনি খেয়ে থরথর করতে করতে চলেছে। মাথার চিন্তা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আশ্রমটা পিছনে পড়ছে। মন কেমন করছে। ক'বছরের মধুর জীবনের স্মৃতি। আনন্দ কোলাহলে মুখর, আশায় উৎসাহে প্রদীপ্ত জীবনময়তায় সুরভিত বর্ণাঢ্য ছটি বৎসর। ওঃ কত আশা, কত কল্পনা, কত খেলা, কত আনন্দ! আজকে সন্ধ্যের পূর্বেও তার কল্পনা ছিল স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাবে। শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে ও দেশের বিশেষ শিক্ষা নিয়ে এখানেই ফিরে আসবে। এই আশ্রমকে এক আদর্শ আশ্রমে রূপায়িত করবে। এর মধ্যে এসে অনাথ আত্মীয়হীন ছেলেরা পরমাত্মীয়ের স্নেহ পাবে, আপনজন পাবে, দুষ্ট শিষ্ট হবে, স্থুলবুদ্ধি সূক্ষ্মবুদ্ধি হবে।

সেই মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্—। তাই হবে। এখানেই আশ্রমের প্রান্তে খানিকটা জমি নিয়ে একটি ছোট বাড়ি তৈরী করবে। ছেদ পড়ে গেল চিন্তায়। বাড়ির পরই যে কল্পনাগুলি এসে দাঁড়ায়—ঘর সংসার—তারপর?—

না—এর পূর্বে কখনও বোধ হয় এমন গম্ভীর মুখে সে প্রশ্ন বা কল্পনা এসে দাঁড়ায় নি। স্বামী পুত্রের কথায় সে সলজ্জ বৈরাগ্যে এবং প্রসন্ন কৌতুকে এর পূর্বে বলেছে—যা—যা—যা। কি ছেলেমানুষী! স্বামী? পাগল! নীরার আবার স্বামী হয় না কি? কে সে? তিনি কিনি?

মনে পড়ছে আয়নায় প্রতিবিম্বে তার সে হাসিমুখ। এবং বাংলাদেশের সেই আদ্যিকালের সেই কথাটি বলে—নিজের প্রতিবিম্বকে ব্যঙ্গ করতে তার জিভে বাধে নি—মরণ! পোড়ারমুখীর সাধ কত?

আজ সেই প্রশ্ন সামনে আসতেই সে যেন বেদনায় বিষণ্ণতায় অভিভূত হয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই সে আত্মস্থ হয়ে বিষণ্ণতা বেদনা সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে—ছি! ছি! ছি! এ সব কি ভাবছে সে! জীবনের এই ক্ষুদ্র প্রলোভন এই মুহূর্তে এমন বড় হয়ে উঠল? ছি!

ওই তো সম্মুখে চলেছে পথ। রাঙামাটির পথ—বনভূমি পার হয়ে, দুর্গাপুরে দামোদর ব্যারাজ পার হয়ে পিচের রাস্তা ধরে কলকাতা হয়ে—দেশ-দেশান্তর—জলপথে—আকাশপথে—অন্তহীন পথ; এই আশ্রম-জীবন থেকে বড় বৃহত্তর জীবনে মানস-সরোবর-যাত্রীর মত একা একা—একা।

—সাবধানে যাবেক হে বাঁকু মশায়, হৈ শেষ জঙ্গলটোতে ক'দিন থেকা কটা ভালুক উপদ্রব করিছে হে! বল্লাম-টেল্লাম নিয়েছো তো হে গোবিন্দ মশায়?

সচকিত হয়ে উঠল নীরা। বিনো সেনের কণ্ঠস্বর। সে পিছনের দিকে তাকিয়ে ছিল। খেয়াল হয় নি। সামনেই বাঁ পাশে বিনো সেনের বাড়ি। বারান্দায় এখন আলো জ্বলছে না। অন্ধকারে বিনো সেন চুরুট মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

আর ও কে? পাশের বাড়িটার ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে, জানালার ধারে ও কে? চোখে নিষ্পলক শাণিত দৃষ্টি—। যত অতৃপ্ত তত নিষ্ঠুরতা তত আক্রোশ। প্রতিমা। প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি হতভাগিনী কিন্তু অকপট।

বিনো সেন সৌভাগ্যবান—কিন্তু কপট—প্রবঞ্চক।

নীরা বললে—একটু হাঁকিয়ে চল বাঁকু। স্টেশনে পৌঁছে একটু শুতে পারব।

—হ আজ্ঞা! বাঁকু বললে—খুব ডাকায়ে নিয়ে যাব। স্থাখেন ক্যানে—। গরুর পিঠে আঙুলের টিপ এবং পেটে পায়ের গুঁতো দিলে বাঁকু। চল হে বাবাধনেরা! হোঁ—হোঁ! হোঁ—হোঁ!

গাড়িটা দ্রুত গতিতে চলতে লাগল। আশ্রমের ফটক পার হয়ে খানিকটা এসে সদর রাস্তায় উঠল। রাস্তা দুটোর সংযোগস্থলে মাটির বাঁধানো গোল বেদীতে ঘেরা একটা বড় মহুয়া গাছ।

* * *

আশ্রমের লোকেদের সকলের সঙ্গেই এই গাছটার সম্পর্ক বড় মধুর এবং নিবিড়। কতকগুলি সরল তরুণ শাল ও পলাশ গাছের মধ্যে মহুয়াগাছটি প্রবীণ এবং শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে একটি ছাতার মত দাঁড়িয়ে আছে। এর তলায় বেদীটা বাঁধানো আছে অনেক দিন থেকে। প্রায় প্রতিটি দিনই আশ্রমের সবাই একবার এখানে এসে বসেছে। ছেলেরা এসে এখানে গাছে গাছে ঝুলে ঝাল্লু ঝাল্লু খেলে। এখানে ভোরবেলা আসেন হরিচরণবাবু আর বিনো সেন, বসে সূর্যোদয় দেখেন। সেও এসেছে কতদিন। ইদানীং তো নিত্যই এসেছে। কোন দিন সে বসে থাকত, বিনো সেন গান গাইতে গাইতে আসতেন—'ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময় তোমারই হউক জয়।" কোন দিন সে আশ্রম থেকে বেরিয়েই শুনতে পেত বিনো সেন এসে এখানে বসে গান গাইছেন—"তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়! তোমারই হউক জয়!" ইদানীং মাস তিনেক হরিচরণবাবুর হাঁপানি বেড়েছে বলে ভোরে ওঠেন না—আসেন না; তারা দুজনে ব'সে এখানে কত গল্প আলোচনা পরিকল্পনা রসিকতা করেছে কতদিন মন অকারণে বেদনাতুর হয়ে উঠলে পালিয়ে এসে এখানে চুপ করে বসে থেকেছে। বিকেলবেলা ছেলেদের খেলার পালা শেষ হলে অণিমাদি, কমলাদি, সে তিনজনে এসে বসেছে মুখআঁধারি সন্ধ্যায়। খিলখিল করে হেসেছে—রসিকতায় পরস্পরকে ব্যঙ্গ করে আঘাত করে। অণিমাদি কতদিন এই বেদীর ওপর শুয়ে পড়ে তাল-মান-হীন সুরে গান ধরেছেন—

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
আমার চাকুরি শ্যাম কারে দিয়ে যাব!
না পুড়ায়ো এই অঙ্গ—না ভাসায়ো জলে
মরিলে তুলিয়া রেখো এই মহুয়া'র ডালে।

কমলাদি যে কমলাদি, যাকে ছেলেরা বলে কাঠিদি তিনিও কৌতুক রসে উৎফুল্ল হয়ে উঠে সুরে গেয়ে আখর দিতেন, অবশ্য ছন্দ রাখতে পারতেন না। আখর দিতেন—

"পোড়াতে লাগিবে সখি সারা গোটা বন—
পোড়ায়ো না—এ পাহাড় পোড়ায়ো না।
—নদী সে কয়েক ক্রোশ—পারিবে না করিতে বহন।
পারিলেও এ পাহাড় ডুবিবে না জলে।
তার চেয়ে তুলে রেখো—মহুয়ারই ডালে।"

এ গান তাদের দীর্ঘদিনের কাব্যসাধনার ও সঙ্গীতসাধনার ফল। প্রায়ই এ গান তারা গাইত। হাসত। পুরোন হয় নি। আজও হয় নি। মাত্র কাল বিকেলেও এ গান গেয়েছে। আজ বিনো সেনের সম্বর্ধনার হাঙ্গামায় আসা হয়ে ওঠে নি। প্রতিমাও আসত এখানে। সে আসত একা। একা এসে বসে থাকত। প্রতিমা এখানে আসত তাদের ঠিক আগে; ইস্কুলের ছুটির পরই; তারা তিনজন এলেই সে উঠত। কখনও বসে থাকত না আর। ওই কটি কথা হত।

—উঠলেন!

একটু, প্রতিমার সেই বিচিত্র হাসি হেসে প্রতিমা বলত—

—হ্যাঁ। বল তোমরা। খেলাধুলা হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা।

চলে যেত প্রতিমা। অণিমা মোটা দেহখানি নিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করে বলত—বিরহিণী রে! তারপর বলত—মরণ!

গাছটার কাণ্ডের গায়ে কত ছেলেতে ছুরি দিয়ে কেটে নাম লিখেছে। শুধু ছেলেরা কেন ? অণিমাদি, কমলাদি, সে—তারাও লিখেছে। কত পথিকের নামও লেখা আছে। মধ্যে মধ্যে বেদীর উপর কতজন কত কথা লিখে যেত এবং যায়। এখানে এই ছায়াতলে দুপুরে রাখাল ছেলেরা বাঁশী বাজায়। মধ্যে মধ্যে জিপসীর দল এসে এই অল্প গাছপালার বনপ্রান্তে তাঁবু ফেলে দু'চারদিন থাকে।

এর পরেই কিছুটা দূর, বোধ করি সিকিমাইল গিয়েই, আরম্ভ হয়েছে ঘন শালবন। এরই মধ্য দিয়ে একালের পিচঢালা পথ। সামপানিখানা এবার বেশ মসৃণ গতিতে চলতে লাগল। এই মহুয়াতলায় সে এসেছিল এখানে পৌছুবার ঠিক পরের দিন। পরের দিন ছুটির পর অণিমাদি বলেছিল—এস বেড়িয়ে আসি। ভারি চমৎকার একটি জায়গা আছে।

সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন কাজের পর এখানে এসে তার ভারি ভাল লেগেছিল।

এগার

পরের দিন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল তার কর্মজীবন।

নিস্তব্ধ রাত্রি। দুপাশে বনভূমির মধ্য দিয়ে পিচঢালা সমতল মসৃণ পথে সামপানিখানা খানিকটা পথ বেশ দ্রুত চলার পর আবার মন্থর গতিতে চলতে লেগেছে। গরু খানিকটা দৌড়ে আবার তার স্বাভাবিক গমনে চলছে। সামপানির চাকাগুলি গরুর গাড়ির চাকার মত ভারী নয়, ঘোড়ার গাড়ির চাকার মতই হাল্কা এবং অনেক সহজে ঘোরে ; তবুও গরুর জন্য সেই সনাতন চাল। ঘুটঘুট করে চলেছেই চলেছেই, গরু দুটোর গলায় ঘণ্টা বাজছে। গরুর গাড়ির চাকার মত উচ্চ এবং সকরুণ বিলাপধ্বনির মত শব্দ না উঠলেও, চাকায় একটি মৃদু ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দও উঠছে। দু পাশের বনের ভিতর থেকে ঝিঁঝিঁর ডাক উঠেছে। ডেকেই চলেছে। একটানা। চালক বাঁকু রায় হঠাৎ সরব হয়ে উঠল—অঁই অঁই—আবার ঝিমায়ে গেলি যি রে! ই বেহুদ্দা বদমাসদিগে বললে কথা শুনে না হে! দিব পাচনের বাড়ি—! বলেই নাকে ঘড় ঘড় করে বিচিত্র শব্দ করলে। নীরা বুঝতে পারলে লেজে মোচড় দিচ্ছে বাঁকু। গাড়ির গতি দ্রুত হল।

সামপানির ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে বসে নীরা একটু হাসলে। একটা কথা মনে পড়ে

গেল। কথা নয়—ছড়া।

"পেটগুলো মোটা আমার ক্ষুরগুলি চেরা—
আমার কাজ নয়কো দৌড়া—
নইকো আমি ঘোড়া—
আমি টানতে পারি হাল—
ঘোরাই আখের শাল—
ঘরে বোঝাই করে দিই গুড় ধান চাল।
আমার পিঠে চড়া বারণ
বলি তাহার কারণ
বাবা বুড়ো শিবের আমি একমাত্র বাহন।
তাই তো আমার দাঁতের কষে—একটি পাটি দাঁত—
ফোকলা বুড়োর ফোকলা বাহন হবেই নির্ঘাৎ।
তাতেই বাজী মাত—
গবগবিয়ে গিলি—ঘাসের আঁটি টেঁমে ছেঁড়া।

মস্ত লম্বা ছড়া। গরু ঘোড়া গাধা মানুষ সাপ ব্যাঙফড়িং পাখি নিয়েই ছড়ার বিচিত্র পাঠ্য আশ্রমে। বড় বড় বোর্ডে মোটা মোটা এবং গোটা গোটা হরফে লেখা ছড়ার সঙ্গে সুন্দর ছবি। সারা দেওয়ালময় টাঙানো। শুধু গরু ঘোড়া গাধা কুকুর বেড়াল মানুষ কেন, উপরের ক্লাসের বড় ছেলেরা যারা ইতিহাস পড়তে শুরু করে—তাদের জন্ম রামায়ণ মহাভারত থেকে ভারতবর্ষের মোটামুটি ইতিহাস ছবিতে এঁকেছেন বিনো সেন। এদেশের সেই পুরনো পটের পদ্ধতিতে গোড়ানো পটে এঁকেছেন নিজে। এবং বেশ ছড়া বেঁধে গান করে সেগুলি দেখানো হয়, ছেলেদের চমৎকার লাগে।

সেদিন অর্থাৎ পৌঁছুবার পরদিন—যেদিন সে কাজ আরম্ভ করে—সেই দিনের কথা মনে পড়ছে। বিনো সেন নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরিচয় করিয়ে—।

গাড়িটা একটা কোন খানায় পড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। কিন্তু তাতেও কোন ব্যাঘাত হল না। মনে পড়ছে। জীবনের এই মনে পড়া একবার শুরু হলে সে সহজে থামে না। বিশেষ করে কোনও সংকট বা সংঘর্ষের মুহূর্তে বা লগ্নে যদি আরম্ভ হয়।

* * *

আবার মনোরঙ্গমঞ্চে স্মৃতি-প্রযোজকের প্রযোজনায় জীবন নাটক শুরু হয়ে গেছে।

পরের দিন থেকে শুরু হল কর্মজীবন।

বিনোদাই এসে তাকে ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি নীরাদি, বুঝলেন। ইনি তোমাদের অঙ্ক কষাবেন, ইতিহাস পড়াবেন। আর তোমাদের খেলার মাঠে তোমাদের তাড়াবেন চরাবেন খেলাবেন।

কাল তুই ষণ্ডাকে যা শায়েস্তা করেছেন শুনেছি আমি। দেখছ কতটা লম্বা—কেমন

হাত। তিনি হাতখানা টেনে তুলে দেখালেন। আবার তেমনি সুন্দর মিষ্টি চেহারা এবং মন। তোমাদের ঝগড়াঝাঁটির বিচারও উনি করবেন। তোমাদের মা-মণিকে তোমরা বড্ড বিরক্ত কর। উনি শান্তশিষ্ট মানুষ; এই সব দুর্দান্তপনা সইতে পারেন না। ওঁর প্রমোশন হল, উনি আপীল শুনবেন আর ওই ছোট বাচ্চাদের দেখবেন, মানে মোটামুটি সবই দেখবেন। আপিসে বসে থাকবেন, বুঝেছ?

প্রতিমাও বিনোদার সঙ্গে এসে ঢুকেছিলেন ক্লাসে। প্রসন্ন মুখেই এসেছিলেন। আগের দিনের অণিমাদির কথাগুলি মনে ক'রে একটু বিস্মিত হয়েছিল নীরা। কই রাগ তো করলে না প্রতিমা। হাসি মুখেই তাকে ক্লাসে বসিয়ে প্রতিমা বিনো সেনের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। নীরা বলেছিল—তোমাদের মতই আমার বাবা মা কেউ নেই। খুব ছেলেবয়সে তাঁরা স্বর্গে গেছেন। সেই হিসেবে আমি তোমাদের সত্যিই দিদি। নয়? ছেলেরা তোতাপাখির মতই বলেছিল—হ্যাঁ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আধঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে সত্যিই আপনার জন হয়ে গিয়েছিল। এবং ক্লাস শেষে মনে হল এইই তার জীবনের সব চেয়ে ভাল লাগার কাজ, সব চেয়ে ভাল কাজ। যোগী যোগ করুক, ভোগী ভোগ করুক, সে এই করবে। আজীবন। আজীবন। কাজ তার ভারী ভাল লাগল। সারাটা দিন আনন্দের মধ্যে দিয়ে যে কোন দিকে গেল সে বুঝতেই যেন পারলে না। সব সময় ক্লাস ঘরে নয়, মাঠে গাছতলায়। ওরই মধ্যে একজন চাষী-মাস্টার আছেন, তিনি ছেলেদের নিয়ে মাঠে খাটেন খাটান। তখন অনেক বাদাম হয়েছে, তোলা হচ্ছে। অণিমাদি দুপুরে ঢুকতে শুরু করেন, তখন গোলমাল করলে একেবারে রেগে খুন হন। দুহাতে পেটেন। কমলাদি বিকেলের দিকে মাড় হয়ে যান, দুর্বল মানুষ। নীরার ডিউটি আছে খেলার মাঠে, তাই এক ঘণ্টা আগে ছুটি। আপিস-ঘরে বইটইগুলি রাখতে এসে প্রতিমাদির সঙ্গে আলাপও হল। স্বল্পভাষী মেয়েটি। দেহে মনে খুব সবল নন বরং দুর্বল, তার উপর সারা-অন্তর-জোড়া দুঃখ। বললেন, তোমার কথা সব শুনলাম ওর কাছে। মানে তোমাদের বিনো-দার কাছে। ওঃ খুব শক্ত মেয়ে, বাহাদুর মেয়ে তুমি।

নীরা বললে, জলে ফেলে দিলে সবাই সাঁতার শিখে যায়। ভগবানই বলুন আর অদৃষ্টই বলুন আমাকে যে জলে ফেলে দিয়েছিল। কি করব, হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে কূল পেয়ে গেলাম।

প্রতিমার এক বিচিত্র বিষণ্ণ হাসি আছে। যে হাসি মানুষের ভাল লাগে না। আজ কিন্তু এই মুহূর্তে তার সেই হাসি নীরার ভাল লাগল। সেই বিষণ্ণ হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠল—প্রতিমা স্থির দৃষ্টিতে, বোধ করি নিজের জীবনের দিকে তাকিয়েই ঘাড় নেড়ে বললেন—না। জলে ফেলে দিলেই সাঁতার শেখে না, শিখতে পারে না। তোমার কথা শুনেছি। তুমি নদীতে পড়ে নদীর টানে ভেসেছ—শক্তি ছিল সাঁতারও শিখেছ। কিন্তু যারা সমুদ্রে পড়ে? যার তল নেই কূল নেই কিনারা নেই! বাপরে!

বলে কথায় এক মুহূর্তের ছেদ টেনে আবার বলেছিলেন—আসল হল ভাগ্য। আর শক্তিও বটে!

হেসে নীরা বলেছিল—ভাগ্য ঠিক মানিনে। তবে বিয়ের আসর থেকে বেরিয়ে পর পর পুলিস-অফিসার আর শিবনাথদাদু তারপর বিনো-দার দেখা পেয়ে আশ্রয় মনে হচ্ছে ভাগ্য থাক বা না-থাক সময় বলে একটা কিছু আছে। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার মত—, ও কি—ও কি ? ও কি করলেন ?

মধ্যপথে কথা অসমাপ্ত রেখে নীরা সবিস্ময়ে বলে উঠেছিল—ও কি—ও কি—ও কি করলেন আপনি।

প্রতিমা খাতার পাতা ছিঁড়ছে। যে-খাতাখানা নিয়ে সে কাজ করছিল তারই উপর হাত রেখে কথা বলছিল। হঠাৎ সেই খাতার পাতাটা মুঠোয় খামচে ধরে ছিঁড়ে ফেলছে। অথচ তার দৃষ্টি-তার দিকে।

নীরার কথায় প্রতিমা দৃষ্টি নামিয়ে নিজের কাজটা দেখে সেই দিকেই তাকিয়ে থেকেছিল —বোধ করি ভাবছিল—করেছে কি ?

নীরা খাতাটা নিয়ে কোন রকমে মেরামত করবার অভিপ্রায়ে হাত বাড়িয়েছিল—দিন—দেখি—গাম্ দিয়ে জুড়লেই হবে।

স্প্রিংকে টানলে যেমন স্প্রিং আপনি গুটিয়ে নিয়ে টানে—তেমনি ভাবেই প্রতিমার হাত খাতাখানা নিয়ে তার কোলের দিকে চলে গিয়েছিল। তার মন যেন ওদিকে ছিল না। হুঁস ছিল না যাকে বলে। খাতাখানা টেনে নিয়ে সে বলেছিল—শিবদাদুর বাড়িতে ওর সঙ্গে কবার দেখা হয়েছে তোমার ?

আজ এই কাণ্ডের পর গাড়িতে বসে চলবার সময় এ নিয়ে যত সূক্ষ্ম তত্ত্ব, লুকনো মানের কথা মনে হচ্ছে—সে-দিন তত মনে হয় নি। তবে একটু হয়েছিল। হাসি পেয়েছিল প্রতিমার এই আগ্রহ দেখে। আবার একটু বিরক্তও হয়েছিল—ছি এত নীচু। ওই মানুষকে এমন সন্দেহ! আজ বুঝেছে সন্দেহের কারণ কি!

থাক—

তার স্মৃতি বলছে—ব্যাখ্যা রাখ। অভিনয়ে ছন্দভঙ্গ হচ্ছে।

সেদিন সে আত্মসংবরণ ক'রে হেসেই বলেছিল—এই তো একবার। এবারই।

—সে কি ? কবারই তো উনি গেছেন কলকাতা! দিল্লীর পথে।

—তা জানি নে। আমি তো দেড় বছরের মধ্যে দেখি নি। শক্ত মেয়ে নীরা আত্মসংবরণ করে হেসেই এরপর বলেছিল—জানেন, মিথ্যে কথা আমি বলি নে। যে বলে তাকে খুব ঘেন্না করি। আর সত্যি বললেও যে বিশ্বাস না করে তাকে বলি দেখ—বিশ্বাস করে ঠকলেও তোমার জিত, আর অবিশ্বাস করে ঠকলে মাটির তলায় মুখ লুকিয়েও নিজের কাছে লজ্জা এড়ানো যায় না।

প্রতিমা কিন্তু ওসব কথার মানে-বোঝা তো দূরের কথা বোধ হয় শুনলেও না। কারণ তার চোখ মুখ যেন বলছিল সে ভাবছে। হঠাৎ একসময় যে ভাবছিল তা মনে পড়ল বোধ হয়; ঘাড় নেড়ে বললে—

—ও হ্যাঁ। উনি যে এ-কবার আসানসোলে উঠেছেন, আসানসোলে নেমেছেন। তারপর হঠাৎ উঠে এসে তার হাত ধরে বললেন, তোমার সঙ্গে কাল আমার কথা বলা হয় নি। ছেলে ছুটো এমন করলে! একটু হাসলেন, হেসে বললেন, কিছু মনে কর নি তো?

—না—না। সত্যিই আপনার যা নরম-স্বভাব আর ডেলিকেট শরীর তাতে ও সামলানো সম্ভবপর হত না। বোধ হয় ফেলে দিত আপনাকে। তবে বড় সুন্দর আপনি—ওদের তাতেই বশ মানা উচিত।

মুখ ফিরিয়ে তাকালেন খোলা দরজার দিকে—তারপর বললেন, রূপ! তিক্ত হাসি ফুটে উঠল মুখে। নাঃ। সেই দুর্বোধ্য—না!

খেলার মাঠে সে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। শুধু দাঁড়াল না, যে যখন পড়ল তাকে গিয়ে তুললে! ধুলো ঝেড়ে বললে, যাও যাও, ফের যাও।

বিনো সেন একটা চুরুট মুখে দূরে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। খেলার শেষে বললেন, ওয়াণ্ডার-ফুল। কনগ্রাচুলেশনস।

সন্ধ্যের আগে খেলা শেষ হলে অণিমাদি বলেছিলেন—এস এবার ভূত নাচানো হল, এবার চল আমরা পেত্নীরা নেচে আসি। একটু একেবারে নির্জনে হেসে খেলে নেচে কেঁদে আর কি!

নীরা বলেছিল—মানে!

—মানে এস বেড়িয়ে আসি আমাদের কুঞ্জবনে। চমৎকার জায়গা।

ওরা মানে অণিমা কমলা ও সে তিনজনে এসেছিল গাছতলায়। গাছতলায় এসে যেই ওরা হাজির হল—অমনি প্রতিমা উঠল।

অণিমাদি হেসে বললেন—হয়ে গেল বেড়ানো?

প্রতিমা বললেন—হ্যাঁ, বস তোমরা, অনেকক্ষণ এসেছি।

চলে গেল সে। অণিমা বললে—মরণ। তারপরই বললে—তবু তো আজ খেলার মাঠে শ্রীমতী নীরার মহিষমর্দিনী রূপ দেখে নি।

নীরা বললে—না-না। বাড়িয়ে বলেন সব আপনারা। আজ তো আমার বেশ লাগল। অনেক কথা হল। আমাকে বললেন—কিছু যেন মনে করো না!

অণিমাদি বললেন, কাল যে লেকচারিকারিং হয়েছে। দেড় ঘণ্টা।

—মানে বিনো-দা?

—হ্যাঁ গো। রোজ একটি করে লেকচার। অবশ্য এই এলেন বলে। সকলের ঘরে এসে খোঁজ করবেন, হাসবেন হাসাবেন। লোকটা সাক্ষাৎ শিব, বুঝেছ! তারপর ওর ঘরে গিয়ে কোনদিন আধঘণ্টা কোনদিন একঘণ্টা। অবশ্যি পড়ান—ধর্মশাস্ত্র গীতা জাতক। কিন্তু কে শোনে? ওই ছাই চাপা দিয়ে যান, ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উড়িয়ে দেয়। কিছুতেই, বুঝবে না বিনো সেনের মত মানুষ কাউকে ভালবাসেন না, বাসতে পারে না।

নীরা বললে, কেন বলুন তো? উনি কি এমন যে কাউকে ভালবাসেন না? দেবতা না অবতার না কি—যে কাউকে ভালবাসতে পারেন না?

এ আলোচনা অবশ্যই দীর্ঘ হয়েছিল। অনেক কথা যার সবটা আজ মনে নেই—অর্থাৎ নাটকে তার প্রয়োজনই নেই। জীবন নিয়ে যখন নাটক লেখা হয়—তখন ঝড়তিপড়তি যা কিছু ঝ'রে প'ড়ে যাওয়ার পর যেটুকু ভবিষ্যৎকালের বীজ আর বর্তমানকালের ফসল জমা থাকে তাই। যেটুকু যায় তার জন্য খামতি হয় না। বরং বাড়তি কথা বাদ পড়লে নাটক তাতেই জমে ওঠে।

সন্ধ্যে একটু গাঢ় হয়ে এলে তারা ফিরেছিল। নূতন উৎসাহে সে ফেরবার জন্যে একটু অধীর হয়েই ছিল। আজ সন্ধ্যে থেকেই সে হরিচরণবাবুর কাছে পড়া শুরু করবে।

ফিরে এসে তারা অণিমার ঘরেই ঢুকেছিল। অণিমাদি ছাড়ে নি। বলেছিল—এস না ভাই। প্রেম যখন করনি, করবে না—তখন তো পড়া রইলই সারাজীবন। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু করবার থাকবে না। তার জন্যে এত তাড়া কেন?

বেশ অণিমাদি—এই মোটাসোটা হাসকুটে মেয়েটি। জীবনে ওঁর সুখ বড় না দুঃখ বড় হিসেব করা কঠিন। কমলাদিও পাশের ঘরে থাকে; বাড়িটা একটাই। সেও ডেকেছিল।

নীরা যেতে যেতেই বলেছিল—প্রেম করলে তাহলে বলছেন পড়া হয় না?

অণিমাদি বলেছিল—উঁহু—। প্রেম থাকলে পড়া দিনের আকাশে তারার মত। বড় জোর হলুদ-মাখানো কুমড়োর ফালি মানে চাঁদের মত বলতে পার, আর পড়ায় ডুবলে প্রেম তো রাতের আকাশে সূয্যিঠাকুর। রাতের ভাস্কর। লেখাপড়া শিখলেই তো মাস্টারনী মেজাজ। বরের সঙ্গে হেডমাস্টার সেকেণ্ড মাস্টারের মত খিটিমিটি। শেষ পর্যন্ত রেজিগ্নেশন। ছাড়াছাড়ি। ও হয় না হে ও হয় না।

হেসে উঠে নীরা বলেছিল—সে না হয় হল—কিন্তু আমাকে হে বলছেন কেন? আমি কি পুরুষ হয়ে গেছি?

অণিমা বলেছিল—হলে তো বেঁচে যেতে, ফাঁড়া কেটে যেত। বুক ফাটলে বলতে পারতে—।

বাধা দিয়ে নীরা বলেছিল—তবে?

—হে, এদেশে বলে। এটা রাঢ় দেশ।

—মেয়েরা মেয়েদের হে বলে?

স্বল্পভাষিণী রুগ্না কমলা বসে এতক্ষণ নিজের মনেই মাথা টিপছিল—সে এবার বলেছিল—এদেশে বলে।

অণিমা বলেছিল—হঁ-হঁ। শিখবে। শিখতে হবে। রা, সান্, সব শিখবা। বিনো স্যান ঠিক তালিম লাগায়ে দিবেক হে। কিছু ভেবো নাই। আর আমি তুমাকে গায়েন শিখায়ে দিবো। বুঝলা!

কমলা বলেছিল—চমৎকার ঝুমুর শিখে নিয়েছেন অণিমাদি। যা নাচেন!

—সত্যি? গান না অণিমাদি!

অণিমাদিদিকে এসব কাজে দুবার বলতে হয় না। বললে—দে দরজাটা দে। জানালাটাও।

এবার দাও থেকে দে বলতে শুরু করলে অণিমাদি। তারপর কোমরে কাপড় জড়িয়ে তাকে টেনে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে নিজে মেঝেতে বসে পড়ল—এবং একখানা হাত বাড়িয়ে বললে—যখন বলব হাতে ধরে তুলতে—তখন তুলবি কিন্তু।

বলেই গান ধরে দিল—

পীরিতি হল শূল গো
সখি পীরিতি হল শূল
আমি বসিলে উঠিতে নারি
আমার হাতে ধরে তুল গো হাতে ধরে তুল।

হাত ধরে তুলে দিতেই অণিমাদি নীরার গলা জড়িয়ে ধরে আবার শুরু করেছিল—

সখি আমার এঁলায়ে দে চুল
আমি গুঁজিব না ফুল।
বিষে অঙ্গ জর জর—ডংশিছে ভীমরুল।

তারপর সে ধেই ধেই করে নাচ। নীরা আর আত্মসম্বরণ করতে পারে নি। খিল খিল করে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়েছিল। মোটা অণিমাদির নাচের সঙ্গে ছেলেবেলার দেখা ভালুক নাচের কোন তফাৎ ছিল না। অণিমাদি তা নিজেও জানত। কিন্তু সে নির্লজ্জ। সখিদের কাছে তার লজ্জাও ছিল না, রাগও না, আশ্চর্য মানুষ। অণিমাদি নেচেই চলেছিলেন। হঠাৎ বাইরে উচ্চগলায় ডাক পড়েছিল—অণিমাদিদি! সবনাশ। বিনো সেন। বিনো-দা। মুহূর্তে সব শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অণিমাদি কালীমায়ের মত জিভ কেটে তাড়াতাড়ি গাছ-কোমর-বাঁধা কাপড়ের পাক খুলে সামলে নিয়ে খোলা চুলে ঝুঁটি একটা বেঁধে নিয়েছিলেন।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে বিনো সেন ডেকেছিলেন—কি ব্যাপার? নাচ হচ্ছে বুঝি অণিমাদি'র?

অণিমাদি'ই এবার দরজা খুলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিলেন—না তো!

বিনো সেন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—আর না তো! এখনও হাঁপাচ্ছ তুমি!

তারপরই নীরাকে দেখে হেসে বলেছিলেন—ওরে বাপরে। এ যে একেবারে ত্রিমূর্তি! নীরা সমেত! অণিমাদি চতুর। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠেছিল—ত্রিমূর্তি নয়। তিন কন্তে। এক কন্তে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্তে খান, এক কন্তে রাগ করে বাপের বাড়ি যান। একজন খামতি ছিল—এবার পুরেছে।

—তা হলে শিবঠাকুর খুঁজি আমি। কিন্তু—

—কি কিন্তু?

—নীরা কন্তে যা কন্তে—তাতে ও সতীনও নেবে না—বুড়ো শিবও নেবে না। দেখেছেন তো খেলার মাঠে? ওঃ, চুলগুলো যা উড়ছিল, একরাশ কালো চুল। ওয়াণ্ডারফুল।

নীরা বললে, ওসব বললে আমি কিন্তু খেলার মাঠের ভার নিতে পারব না!

—আচ্ছা আচ্ছা বলব না। তবে খুব খুশী হয়েছি। তুমি আমার প্রবলেম মিটিয়েছ।

মেটাতে পারবে আন্দাজ আমি করেছিলাম। ছেলেরা তোমাকে পেয়ে খুশী হবে ভেবেছিলাম। তা হয়েছে। এখন চল, মাস্টারমশায়ের কাছে—পড়বে। বসে আছেন তিনি। তুমি আমার সমস্যা মেটালে—এখন তোমার সমস্যা মিটলে আমি আরও খুশী হব। চল।

অনিমাদি বললেন, প্রতিমাদির বাড়ি যাবেন না ?

—সেরে এসেছি।

সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ বসেছিলেন চুপ ক'রে। বিনো সেন তাকে বার বার বলে দিয়েছিলেন—দেখো স্মৃতির ঘরের দোরে ধাক্কা দিয়ো না। পুরনো কথা তুলো না! কেমন ?

নীরা অন্ধকারে পথ চলতে চলতেই নীরবে সায় দিয়ে ঘাড় নেড়েছিল।

নীরাকে পৌঁছে দিয়েই বিনো সেন চলে গেলেন। শুধু বলে গেলেন—এ মেয়ে আশ্চর্য মেয়ে কঠিন মেয়ে। একে যেমন শেখাবেন তেমনি শিখবে। আমি বলতে পারি মাস্টারমশাই আপনি খুশী হবেন পড়িয়ে।

অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই পড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভূমিকা না, পরিচয় না, শুধু বললেন—পড় মা। শুরু কর।

নীরা শুরু করে দিল। তারপর সে অন্য জগৎ—এই জগতের মধ্যেই যেন আর একটা জগতের দোর খুলে গেল। সেখানে গুরু আর ছাত্রী। ঘণ্টা আড়াই পর বৃদ্ধ বললেন—এইবার থাক মা!

নীরবে বই বন্ধ করলে নীরা। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন—পড়তে ভাল লাগল মা ?

নীরা বলে ফেললে—এভাবে তো কেউ কখনও পড়ায় নি! এমনভাবে পড়ানো যায় তাও আমি জানতাম না।

বৃদ্ধ বললেন—উপনিষদে আছে মা—গোড়াতেই গুরু শিষ্য দুইজনকেই প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনা করতে হয় আমাদের দুজনের আকৃতি যেন সমান হয়—আসন যেন সমান হয়—ছোট বড় নয়। সমান। শেষ কথা মা বিদ্বিষাবহৈ। আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করি। অনুরাগ থাকা চাই।

নীরা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে আবেগবশে বলে ফেলেছিল—বাপ-মায়ের কাছে আমার ঋণ হল জন্মের প্রাণের। আর কারও কাছে ঋণ আমার ছিল না। আজ নতুন খত লিখলাম! ঋণ পেলাম। শোধ—

—না—মা। শোধ-টোধ নয়। দিতে কিছু চেয়ো না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তারপর চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন—নেবার আর কিছু নেই মা। সব গেছে, নেব কার জন্যে ? নিয়ে করব কি ? সবই বাহুল্য মনে হয়। তবে যেটুকু আছে, যতক্ষণ পারি দিয়ে যাই। তুমি যখন সুবিধে হবে আসবে। পড়াতে পেলে সব ভুলে থাকি। তুমি আমায় বাঁচালে!

পড়া শেষ করে যখন ফিরল তখন প্রায় দশটা। বাইরে বিনো-দার গান শোনা যাচ্ছে, একটু এসেই দেখলে আপন বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি গান গাইছেন, 'কান্নাহাসির দোল

দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা'। ছোট একটি চিমনি জ্বলছে টেবিলের উপর। একখানা বইও নামানো। ওদিকে বারান্দার প্রান্তে ছবির ইজেল। এবং রঙ তুলি। তিনি উঠে এসে বারান্দার প্রান্তে দাঁড়িয়ে রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে গাইছেন। তিনি তার পায়ের শব্দে তাকালেন বোধ হয়। একটা মাটির খোলা তার পায়ের স্লিপারের চাপে মড়মড় শব্দে ভেঙে গেল। সেই শব্দে মুখ ফিরিয়ে বিনো সেন বললেন—কে? নীরা?

—হ্যাঁ।

—পড়া শেষ করে ফিরছ বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আলো নেই কেন? এখানে সাপ আছে।

—এইটুকু তো পথ।

—না। দাঁড়াও। একটু আগে একটা বড় সাপ বেরিয়েছিল মাঠে। টর্চটা নিয়ে পথে নামলেন। চলতে চলতে প্রশ্ন করলেন, কেমন পড়লে?

—খুব ভাল।

—হ্যাঁ, খুব ভাল পড়ান উনি। জান, সংসারে উজাড় করে দিতে চেয়েও সবাই তা পারে না। সেইটেই মানুষের বোধ হয় সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি। যারা পারে তারাই মহত্তম মানুষ। উনি তাই। ওঁদের ট্র্যাজেডি উল্টো, ওঁরা যত দিতে চান তত নেবার লোক মেলে না। হয়তো তোমার মধ্যে—তেমনি ছাত্রী পাবেন। পড় ওঁর কাছে ভাল করে।

তারপর হঠাৎ বললেন, দেখ প্রতিমাকে একটু সহ্য করে চলো। করুণা করো। ও বড় দুঃখী। ও—। মানে কথাটা তোমাকে বলাই উচিত, ও ঠিক তোমাকে পছন্দ করে নি। প্রশ্ন করো না। শুধু জেনে রাখ। কেমন? যাও।

ঘরে এসে বসে পড়ে খানিকটা স্তব্ধ হয়ে ছিল সে। ভুরু দুটি কুঁচকে উঠেছিল।—কেন? পছন্দ করেন নি? তিনি কি ভাবেন—সে বিনো-দাকে ভালবাসে? না। সে পড়িয়ে পড়তে এসেছে। জীবনে সে পথ করে নেবে।

নক্ষত্রের আলো ডাকে আঁধার সমুদ্র বক্ষে
নূতন দিগন্তে যারা তরণী ভাসালো।

বিনো সেন তার জীবনাকাশের দিগন্তে একটি নূতন নক্ষত্র। তার আলোতে আজ সে পথ দেখে চলেছে। প্রতিমাদি, কাল সে তাকে পিছনে রেখে চলে যাবে। বিনো সেন তোমার জীবনের ধ্রুবতারা, তার নয়। নারী-জীবনে একের ধ্রুবতারা অন্যের নয়!

বিনো সেন তখনও গাইছেন—এই কি তোমার খুশী—আমায় তাই পরালে মালা সুরের গন্ধ ঢালা।

বারো

আশ্রমের কর্মসূচী ধরাবাঁধা ছকে কাটা ঘরের মত। সেই ভোরে ওঠা—তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধোয়া। তারপর কাপড় ছেড়ে, মাথায় চিরুনিটা বুলিয়ে বেরিয়ে পড়া। ওদিকে ঘণ্টা পড়েছে। ঢনো ঢনো ঢনো ঢনো ঢনো ঢনো। ন্-ন্-ন্ ন্-ন্।

প্রতিমা ছোট ছেলেদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেরা আসছে প্রণাম করছে। উনি মাথায় হাত দিচ্ছেন।

আশীর্বাদও হচ্ছে আবার ছেলেদের কপালের উত্তাপও দেখা হচ্ছে। মাটির পুতুলের মত বসে যন্ত্রের মত করে যাচ্ছেন।

নীরা ওদের স্তোত্র পাঠ করিয়ে খাবারঘরে দাঁড়িয়ে জল খাওয়াতো। খাবারের ব্যবস্থা নিতান্ত রুগ্ন বা দুর্বলদের জন্য দুধ—দু-তিন জনের জন্য, তার সঙ্গে ডিম। বাকী সকলের ছোলা-ভিজে গুড় রুটি। মধ্যে মধ্যে সময়ের ফল। কাঁকুড়, ফুটি, শসার টুকরো, আমের সময় আম—তারপর জাম, আষাঢ়ে কাঁঠাল। তারপর খানিকটা হৈ-হৈ।

বিচিত্র খেলা হত। এটা খেলাতেন বিনো সেন নিজে।

সাপ আর ব্যাঙের খেলা। বাঘ আর হরিণের খেলা। জল আর পাহাড়ের খেলা। সব তাঁর নিজের আবিষ্কার।

ছেলেরা সব ব্যাঙ হত। বসে পড়ত মাঠময়। এবং গ্যাঙোর গ্যাঙ গ্যাঙোর গ্যাঙ চীৎকার করত। এক একদিন বিনো সেন সাপ হতেন। নইলে কোন বড় ছেলে।

গান ধরত সে এবং এঁকেবেঁকে ছুটত।

হিলি বিলি কিলি—

হাত নইকো পা নেইকো বুকে হেঁটে এঁকেবেঁকে চলি—

হঠাৎ দাঁড়িয়ে দুলত এবং ফোঁস ফোঁস করে নিয়ে গাইত—

মেরুদণ্ড নেইকো আমার নেইকো মাথার খুলি

তবুও লেজে ভর দিয়ে মাথা তুলে ফোঁসফুঁসিয়ে দুলি।

ব্যাঙেরা লাফাতে লাফাতে চলত। আর ডাকত।—

কে কার কড়ি ধারে? কে কার কড়ি ধারে?

সাপ এসে ঝাপটে ধরত একটা ব্যাঙকে। বাকী ব্যাঙেরা থপ্ থপ্ করে লাফিয়ে পালাত।

তারপর চলত লড়াই। রেফ্রী হুইসিল দিয়ে বলে দিত ব্যাঙ মরেছে। বা সাপ এবং ব্যাঙ দুইই মরেছে। মানে—সাপটার হাঁয়ের চেয়ে ব্যাঙটা বড়—তাই গিলতে না-পেরে সাপ ব্যাঙ দুই মরেছে। কারণ সাপ ধরে ছেড়ে দিতে পারে না। সাপ ব্যাঙ দুই মরলে বাকী ব্যাঙগুলো এসে মরা সাপের উপর লাথি মেরে আবার ডাকত গ্যাঙোর গ্যাঙ—কে কার কড়ি ধারে। না-হলে দূরে বসে ডাকত—কড়র। কড়র। কড়ি নে। কড়ি নে।

রেফ্রী হতেন বিনো সেন নিজে। যেদিন তিনি সাপ হতেন সেদিন রেফ্রী হতেন

প্রতিমাদি। এ সময়টায় নীরা অবকাশ পেত। সে পড়ত। নিজের পড়াটাই বেশী—কিছুক্ষণ ইস্কুলে ছেলেদের যা পড়াতে হবে দেখে নিত। ক্রমে ক্রমে সবই বেশ সয়ে এসেছিল—বা আসছিল। প্রতিমাও অনেকখানি সহ্য করতে পেরেছে অবশ্য মধ্যে মধ্যে তির্যকভঙ্গিতে তাকানো—সেটা যায় নি। কখনও কখনও বিনো সেনের সঙ্গে সে যখন কথা বলত—তখন অকস্মাৎ নজরে পড়ত আড়ালে একখানা কাপড়ের আঁচল অথবা কোন গাছের আড়ালে একটা মানুষ বা গাছের কাণ্ডের ছায়ার সঙ্গে একটি মানুষের ছায়া। নীরা কতদিন বলেছে মৃদুস্বরে—প্রতিমাদি!

বিনো সেন সঙ্গে সঙ্গে সহাস্য মুখে প্রসন্ন কণ্ঠে ডাকতেন—প্রতিমা নাকি? এস-এস। বস। কি কাণ্ড, দাঁড়িয়ে কেন?

প্রতিমা প্রথম প্রথম বাধ্য হয়ে বসত। বিনো সেন তাকে সামনে রেখে আলোচনা একটু দীর্ঘায়িতই করতেন ইচ্ছে ক'রে। কিছুক্ষণ পর প্রতিমা উসখুস করত, একসময় বলত—আমি যাই।

—আরে বস বস। তাড়া কিসের?

তাকে যেন কেউ হাত পা বেঁধে জলে ডুবিয়ে ধরছে এমনি অবস্থা হত প্রতিমার—সে হাঁপিয়ে উঠে বলত, না কাজ আছে আমার। আমি যাচ্ছিলাম আপনি ডাকলেন—।

—তা হলে আর আটকাই কি ক'রে? আমার কিন্তু একটু কাজ ছিল। যদি একটু চা ক'রে খাওয়াতে।

ক্রমে আড়াল দিয়ে শোনাটাও কমেছিল। কারণ নীরা এবং বিনো সেনের কথার মধ্যে হাস্যপরিহাসের অভাব থাকত না—কিন্তু তবুও তার মধ্যে প্রেমের গন্ধ প্রতিমা খুঁজে পেত না। কারণ পরিহাসের বিষয়ের মধ্যে প্রতিমার কথা কম থাকত না। বেশীই থাকত।

মনে পড়ছে একদিনের কথা।

বিনো সেন বোধ করি দিন কয় দাড়ি কামান নি। এবং ময়লা পাজামা পাঞ্জাবি পরেই কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। মধ্যে মধ্যে এমন করতেন বিনো সেন।

আজ এতদিন পর বিনো সেনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবার পর নীরা বুঝেছে ওটা তাঁর জীবনের বহু ছদ্মবেশের একটা ছদ্মবেশ। উদাসী বৈরাগীর সঙ্গে সাধুতার একটা অভিনয়।

আজ এই আশ্রমে ছ' বছর ধরে জীবনে ভাল আর মন্দ সৎ আর অসতের যে নিরন্তর সংগ্রাম—তার মধ্যে সতের প্রভাবই বড়—সে-ই একদিন অবশ্যম্ভাবীরূপে জিতবে এই ধারণাই তিলে তিলে গড়ে এসেছিল নীরা—ওই বিনো সেনকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে এসেছিল। আজ একদিনে সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সৎ নেই সততা নেই। মিথ্যের মুখোশ। শুধু অভিনয়।

বিনো সেন—তোমার জীবনটাই তো একটা নাটকের একটা অংশ—একটি মুখোশধারী চরিত্র। নিপুণ অভিনেতা তুমি।

* * *

থাক। নাটকে ফিরে এস নীরা। মনোমঞ্চের স্মারক বলছে নাটকে ফিরে এস। কদিন দাড়ি কামান নি বিনো সেন। ময়লা পাঞ্জাবি পাজামা পরে যেন এক উদাসী বৈরাগী।

অথবা আত্মভোলা শিল্পী। শিল্পধ্যানে বিভোর। এ মানুষকে তো শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। এককালে "আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান তার লাগি কাড়াকাড়ি" যারা করেছিল তাদের একজন—মহাত্মার মধ্যে পুনরুজ্জীবিত ভারত-তপস্যায় দীক্ষিত একজন, তার উপর শিল্পী। এই মানুষের উপর কার না শ্রদ্ধা হয়। কে অবিশ্বাস করে? তারও বিশ্বাস ছিল এই বৈরাগ্য এসেছে তাঁর নতুন শিল্পসৃষ্টির গভীর আকর্ষণের ফলে। একটা বড় ছবির কল্পনা মাথায় এসেছে, কিন্তু সেটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে না,—ঠিক যেটি মন চায় সেটি কল্পনায় স্পষ্ট হচ্ছে না, তিনি আহার নিদ্রা ভুলেছেন, সাজ পোশাক দেহমার্জনা তো তুচ্ছ কথা।

হরিভূষণবাবুর কাছে যাবার পথে নীরা দেখেছিল—বিনো সেন ওই চেহারা নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন আর চুরুট টানছেন।

সে প্রলোভন সম্বরণ করতে পারে নি, এসে তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিল। এবং একান্তভাবে কৌতূহলী কিশোরী মেয়ের মত আগ্রহভরে বলেছিল—নতুন ছবি আঁকবেন বুঝি?

মুহূর্তের জন্য শূন্য দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন বিনো সেন।

সেও অভিনয়। আজ আর তার সন্দেহ নেই।

তারপরই বিনো সেনের চোখ দুটি সচেতন কৌতুকে ঝলমল করে উঠেছিল। সে যেন এক দুষ্ট ছেলের চোখের ঝিকিমিকি। বলে উঠেছিলেন।—হুঁ। ঠিক ধরেছ।

—কি ছবি বলুন না।

—সেই তো ভেবে পাচ্ছিলাম না, এইমাত্র পেলাম। মানে তুমি জিজ্ঞাসা করলে আর পেয়ে গেলাম। তোমার ছবি।

—আমার ছবি? আমার ছবি হয়?

—হয়। আঁকব। কিন্তু সমস্যা হয়েছে। কোন্ রূপে আঁকব? কাপড়-বাঁধা পাষণ্ড-দলনী কিম্বা তপস্বিনী কিম্বা কি? সেই রূপটা যে আবিষ্কার করতে পারছি নে।

—আপনার সব তাতেই ঠাট্টা।

—কেন?

—ছবি হল রূপের প্রকাশ। সুন্দরের প্রকাশ—আমার মধ্যে রূপ কোথায়—সুন্দরকে পাচ্ছেন কি করে?

—আছে গো আছে। নন্দবাবুর মহাত্মাজীর ডাণ্ডী অভিযান ছবি দেখেছ?

—দেখেছি।

—তবে?

ঠিক এই সময়েই প্রতিমার আভাস পাওয়া গিয়েছিল বাড়ির কোণের মোটা শিরীষ গাছটার আড়াল থেকে সাদা শাড়ীর আঁচলের দোলায়। বিনো সেন বলেছিলেন—প্রতিমার মত রূপ বর্ণে-ছটায় সকলের নেই। কিন্তু তবু রূপ সবারই আছে। আমি যে আমি আমারও একটা রূপ আছে। ঘুমিয়ে যখন আমার নাক ডাকে—তখন সেটা ফুটে ওঠে। নাকে গর্জন হয়।

মুখ হাঁ হয়ে যায়, মধ্যে মধ্যে গাল দুটো ফোলে। সে ওরাংওরফুল!

প্রতিমার আভাস সম্পর্কে সচেতন হয়েও নীরা হেসে উঠেছিল। হেসে বলেছিল—কিন্তু সেটা নিরীক্ষণই বা করলেন কি করে? আবিষ্কারই বা করলেন কখন?

—এই কাল রাত্রে। স্বপ্নে। স্বপ্নে দেখলাম। বুঝেছ। অবিকল কুম্ভকর্ণ।

—রূপ যাদের থাকে তারাই নিজের রূপের এত কুৎসা করে।

—বিশ্বাস কর। কতবার কত অজানা জায়গায় অজানা পুকুরে ডোবায় নদীতে আমি ডুব দি। বলি তুমি যদি রূপসায়র হও—তবে আমার রঙ করে দাও প্রতিমার মত। চোখ ডাগর করে দাও—প্রতিমার মত। এবার অবশ্য তার সঙ্গে যোগ করব, টাক পড়া মাথায়—চুল করে দাও নীরার মত।

তারপরই চকিত হয়ে বলেছিলেন—আরে ওখানে কে? প্রতিমা। এস—এস। আরে তোমার রঙ তোমার চোখ তোমার গড়নের হিংসেয় যা গোপনে করি সেগুলো তুমি শুনে নিলে না কি?

এর পর প্রতিমাকে আসতে হয়েছিল। বসতে হয়েছিল। বলেছিল—যাচ্ছিলাম ওদিকে, হঠাৎ কানে এল—আমার কথা হচ্ছে। কি জানি অপ্রস্তুত হও তোমরা—তাই—

—ভাগ্যে নিন্দে করি নি তা হ'লে। তারপরই নীরাকে বলেছিলেন—এই দেখ না—প্রতিমাকে এক রাবণের চেড়ী বাদে যে রূপে আঁকতে চাইবে—তাইতেই মানাবে ওকে। মধ্যে মধ্যে মনে হয় নতুন করে যশোদা—ম্যাডোনা রূপে আঁকি ওকে; কিন্তু ওর এক বিষণ্ণ রূপ ছাড়া অন্যরূপে প্রকাশ নেই।

প্রতিমার সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ঘামতে শুরু করেছিল। নাকের ডগায় পেটি দুটিতে ঘামের আভাস স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল।

নিভে-যাওয়া চুরুটটা নতুন করে ধরিয়ে বিনো সেন আবার বলেছিলেন—এবার যেন একটা কাহিনীর পটে ওকে ধরা যায় বলে মনে হচ্ছে। ঘাড় নেড়ে যাচাই করে দেখার একটা স্বভাব আছে মানুষের; মনের কল্পনাকে মনে মনে সেটা ঠিক কি বেঠিক খতিয়ে দেখে—হয় 'হ্যাঁ' বা 'না' এর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে মানুষ। বিনো সেনও সেই ভাবে—'হ্যাঁ' এর ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে আবার বললেন—হ্যাঁ—। পেয়েছি এবার! হ্যাঁ। নীরার কৌতূহলের সীমা ছিল না। প্রতিমাকে কোন্ কল্পনার চালচিত্রের সামনে দাঁড় করাবেন! সে বলতে যাচ্ছিল—বলুন না শুনি! কিন্তু প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলতে পারে নি। প্রতিমার চোখ দুটি নিষ্পলক হয়ে বিস্ফারিত হয়েছে—তার মধ্যে ফুটে উঠেছে বিচিত্র অভিব্যক্তি,—ভয় না বিস্ময় তা বোঝা যায় না, হয়তো বা দুটোই। আনন্দও খানিকটা থাকবার কথা—তাও হয়তো ছিল;—বিনো সেন তার ছবি আঁকবেন—আনন্দ নিশ্চয় ছিল কিন্তু তা ছিল ভয় বিস্ময়ের সঙ্গে মিশে। ত্রিধারা সঙ্গমে লুপ্তবেণী সরস্বতীর মত।

বিনো সেন টেবিলের উপর থেকে একখানা বই হাতে করে নিলেন—ঝকমকে বাঁধানো বই। বললেন—বইখানা পড়ছিলাম। বড় ভাল বই। সংস্কৃত সাহিত্যের অপরূপ রোমান্স। কবি বাণভট্টের কাদম্বরী। নায়িকা কাদম্বরী, উপনায়িকা 'মহাশ্বেতা'। আশ্চর্য চরিত্র মহাশ্বেতার।

যাকে সে ভালবাসে—যে তাকে ভালবাসে, সে-ই পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার সেই ভালবাসার উত্তাপে দাহে। প্রেমের তপস্যা কোথাও সমুদ্র কোথাও আগুন। সে আশ্চর্য।—সে ভালবেসেছিল এক ব্রাহ্মণ কুমারকে—পুণ্ডরীক—। পুণ্ডরীকের মৃত্যু হল তার সঙ্গে মিলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। গন্ধর্বকন্যা মহাশ্বেতা। সে প্রিয়তমের মৃত্যুতে সাজল তপস্বিনী। তপস্যা ক'রে প্রিয়তম পুণ্ডরীককে বাঁচাবে। মৃত্যুলোক থেকে আবার আনবে জীবনলোকে। এল, আসতে হল পুণ্ডরীককে পুনর্জন্ম নিয়ে—। এবং সে যখন এল মহাশ্বেতার আশ্রমে—হঠাৎ তাকে দেখলে, পূর্বজন্মের আকর্ষণ জাগল, উথলে উঠল—সে আত্মহারা হয়ে দুই হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল মহাশ্বেতাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। মহাশ্বেতা শিলাসনে বসে তপস্যা করছিল; তার ধ্যান ভঙ্গ হল; এবং হতচকিত হয়ে গেল; একজন যুবা তাকে আলিঙ্গন করতে আসছে। চিনতে দেরি হল এক মুহূর্ত! সেই এক মুহূর্তেই তার চোখ থেকে বের হল তার ক্রোধের সঙ্গে তপস্যার তেজ, সেই তেজে, পুড়ে ছাই হয়ে গেল পুণ্ডরীক। বল তো, কি মর্মান্তিক! কি বেদনা মহাশ্বেতার! কি ভাগ্য! ওঃ!

মুগ্ধ হয়ে শুনছিল নীরা। গল্পটি অপরূপ। হঠাৎ চেয়ার ঠেলার শব্দে সে চকিত হয়ে মুখ ফেরালে। প্রতিমা; প্রতিমা চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মুখের দিকেও চাইবার অবকাশ সে পেলে না, প্রতিমা প্রায় ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে! সে বিস্মিত হয়েছিল।

বিনো সেন ডেকেছিলো তাকে—প্রতিমা! প্রতিমা!

প্রতিমা—না-না-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়েছিল কিন্তু থামে নি বা ঘুরেও দাঁড়ায় নি। নীরার বুঝতে বাকী থাকে নি যে সে কাঁদছে। এবং সে কান্না প্রতিমা কাউকে দেখাতে চায় না।

বিনো সেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—বড় দুর্ভাগিনী মেয়ে। ওকে দেখে ভাগ্য ছাড়া আর কোন কারণ খুঁজে পাইনে। ও আমার বন্ধুর বোন, ছেলেবেলা থেকে জানি, চিনি। ভারী মিষ্টি স্বভাব, অপরাধ বলতে যদি কিছু থাকে সে ওর অগাধ ভালবাসা আর ওর ভাগ্য। ওর দাদা ছিলেন আমাদের দাদা—মানে বিপ্লবী নেতা। ধরা পড়লেন বোমা মারতে গিয়ে—ফাঁসি হল। সংসারে রয়ে গেল বিধবা মা আর কুমারী মেয়ে। দেখাশুনার ভার ছিল আমার উপর। মানে দল থেকে হুকুম ছিল আমার উপর। হঠাৎ সেবার উত্তরবঙ্গের এক বন্ধু আমার সঙ্গে গেলেন আমাদের দেশে বরিশালে। পূর্ব বঙ্গ দেখবেন। নাম বলব না। শিল্পী। নতুন নাম হচ্ছে। আর তেমনি অগাধ আকর্ষণের শক্তি। বরিশালে এসে—ওই প্রতিমাকে দেখলেন। মুগ্ধ হলেন। প্রতিমাও মুগ্ধ হল। ভদ্রলোক যেচে বিবাহ করলেন! আর এক জায়গায় বিবাহের কথা ছিল—প্রতিমা বললে—সেখানে বিয়ে হলে ও বিষ খাবে। বিয়ের পর ওরা কলকাতায় এল, আমি মাস কয়েক পর অ্যারেস্টেড হলাম। ১৯৩০ সাল। তারপর আমার জীবন থেকে ওরা দুজনেই একরকম মুছে গিয়েছিল, হারিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ প্রায় কুড়ি বছর পর ওকে দেখলাম ও বিধবা। পথের ধারে ভিক্ষা—হ্যাঁ ভিক্ষা—। থেমে গেলেন বিনো সেন।

বোধ হয় অন্তরে আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। একটু পর বললেন—ওর দাদা আমার দীক্ষা-গুরু ছিলেন। আবার একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—আমার

বন্ধু যে ওকে বিয়ে করেছিল তাকে বিবাহ করতে আমি নিষেধ করেছিলাম। ও শোনে নি। মানে ব্যাধি ছিল তার। আমি জানতাম। কিন্তু আমার কি হাত?—ওর ভাগ্য সর্বনাশা ভাগ্য!

তারপর একেবারে চুপ ক'রে গেলেন।

নীরাও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। কি বলবে? বলবার কিছু ছিল না—সে ভাবছিল—। ভাবছিল মেয়েরাই বোধ হয় মেয়েদের নিন্দা সব থেকে বেশী রটনা করে। পুরুষরা নয়। নইলে অণিমাদি কমলাদি প্রতিমাকে নিয়ে এই সব জঘন্য রটনায় সরস রসনায় মুখর হয়ে উঠতেন না এই ভাবে।

ছি-ছি-ছি।

তেরো

ভুল হয়েছে তার। ভুল হয়েছিল বিনো সেনের কথায় বিশ্বাস করা আর অণিমাদিদের কথায় অবিশ্বাস করা।

বিনো সেন, আজ তুমি লোকেদের বললে—যান এইবার সব আপনার আপনার বাসায় যান, অভিনয় তো শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ অভিনয় করে এল নীরা। কিন্তু তুমি সুদীর্ঘদিন এই সাধু দেশসেবক শিল্পী গুণী জনের মুখোশ পরে দেশসুদ্ধ মানুষকে প্রতারণা করে এলে—সেটা কি? অভিনয় নয়? ওঃ, তুমি ধুরন্ধর অভিনেতা। কেমন ক'রে নরনারীর চিত্ত জয় করতে হয় অন্তত নারীচিত্তকে যে কিভাবে হরণ করতে হয় তার কৌশলী শিল্পী তুমি। সুনিপুণ, সুচতুর! নাটক নীরার জীবনে আছে—সে এসেছে স্বাভাবিকভাবে; বিনো সেন, তুমি সেই নাটকে সচেতনভাবে জেনে-শুনে ভাল লোকের সাজ সেজে এসে ঢুকেছ। নীরা স্বীকার করেছে; আজ এই অন্ধকার রাত্রে আশ্রম ছেড়ে নূতন অঙ্কে নূতন পটভূমিতে প্রবেশের মুখে স্বীকার করছে যে তুমি সচেতনভাবে যে অভিনয় করেছিলে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছিল, নীরা বিশ্বাস করেছিল তোমাকে।

সেদিন বিনো সেনের ওখান থেকে আসবার সময় কাদম্বরী বইখানি সে নিয়ে এসেছিল পড়বার জন্য। অপরূপ রোমান্টিক গল্প তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাসবদ্ধ বিশেষণ-বহুল রচনা ভাল লাগে নি। কয়েকদিন পর নীরা বইখানি ফিরিয়ে দিতে গিয়েছিল। বিনো সেন ক্লান্তভাবে শুয়েছিলেন সেদিন। মাথার কাছে গুচ্ছবাঁধা শালের মঞ্জরী। মৃদুগন্ধ উঠছিল। শাল বনে সদ্য তখন মঞ্জরী দেখা দিয়েছে। তখনও দুর্লভ। দুটো চারটে গাছে একেবারে সেই ডগায় দু-দশটা মঞ্জরী সবে উঁকি দিচ্ছে। বিনো সেনের বহু ভক্ত, সে শিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত, ব্রাহ্মণ কৃশ্চান থেকে সাঁওতাল পর্যন্ত।

ঘরে ঢুকেই সে বলে উঠেছিল—বাঃ।

একটু অন্যমনস্কভাবে বিনো সেন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে স্মিত হেসে বলেছিলেন—নীরা! এস-এস। কিন্তু বাঃ কি বল তো?

—শালের ফুল।

—তা হ'লে এ তুমি গ্রহণ কর।

—না-না-না। ভাল লাগলেই তা নিতে হবে বা পেতে হবে বুঝি?

—অন্তত দিতে তো হবেই। এটা চিরাচরিত রীতি। নাও তুমি। আমি খুশী হব।

—বেশ। সব আমি নেব না, তিনটে-চারটে শিষ নেব।

—তিনটে নয়, চারটে। তিনে নাকি শত্রু হয়।

একটু থেমে আবার বলেছিলেন—আমি বলি আরও কয়েকটা নাও। কারণ তোমার যা রাশিকৃত চুল—কালবৈশাখীর পুঞ্জিত কালো মেঘের মত, তাতে চারটে শালমঞ্জরী ঠিক বিজুরী চমক সৃষ্টি করতে পারবে না। বল তো আমি শিল্পী, কালো মেঘে বিদ্যুৎরেখার মত সাজিয়ে পরিয়ে দিতে পারি।

নীরা সপ্রতিভ চিরকাল কিন্তু প্রগল্‌ভা কোন দিন নয়। তার সপ্রতিভতার মধ্যে রূঢ়তা বা কাঠিন্যের অভিযোগই লোকে ক'রে থাকে। কিন্তু নীরা এখানে এসে স্নেহের মধ্যে প্রীতির মধ্যে পাল্টাচ্ছিল। এর মধ্যেই পাল্টেছিল তাই সে একটু প্রগল্‌ভ হয়েই বলেছিল—দিন না।

কাদম্বরীর পুণ্ডরীক এবং মহাশ্বেতার মধ্যে পারিজাত-মঞ্জরী আদান-প্রদানের ঘটনার কথাটা মনে পড়া সত্ত্বেও সে বলেছিল—দিন না। কিন্তু সে কি তার বিনো সেনকে ভালবাসার পরিচয়? না। না! না! তা হলে সত্য কথাটা শোন। বারেকের জন্য তার মনে এসেছিল—দুরন্ত একটি লজ্জার কম্পন, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে নিজেকে শাসন করে বলেছিল—ছি। ওঁর সে কথা মনে হচ্ছে না, তোমার হচ্ছে কেন? ছি! ভালবাসাকে সে লজ্জন করেছিল। সেটা তারই পরিচয়।

বিনো সেনকে শ্রদ্ধা করত। সংসারে শ্রদ্ধাও ভালবাসা, স্নেহও ভালবাসা—প্রেমও ভালবাসা। শেষেরটা সর্বগ্রাসী। কায়মনবাক্য সব দিয়ে একেবারে নিজেকে ঢেলে দিয়ে ভালবাসা।

হয়তো তাই সে বেসে বসত। বিনো সেন সুকৌশলী;—আজ বুঝতে পারছে সুন্দর কৌশল জানে বিনো সেন, সে দিন তা ভাবে নি—বুঝতে পারে নি,—ভেবেছিল স্বাভাবিক—সহজ, গুণীর আকর্ষণ, নদীকে সমুদ্রের আকর্ষণের মত স্বাভাবিক। সমুদ্র আদিম কালের প্রবীণতম পুরুষ; আজ দুর্গম মালভূমিতে হ্রদের বাঁধন কেটে যে কিশোর নদী বের হল—সেও ওই সনাতন পুরুষের দিকেই ছোটে।

কথাটা তাকে বলেছিল—মনে করিয়ে দিয়েছিল অণিমাদি! ওই এক মেয়ে। প্রৌঢ়া মেয়েটা বোধ করি জীবনে ভালবাসা পায় নি অথবা ভালও কাউকে বাসতে পারে নি। তাই দুনিয়াভোর মানুষ আর মানুষীকে পাশাপাশি বা দূরে থেকে, একটু স্মিতমুখে হাসাহাসি দূরের কথা, প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইতে দেখলেই ভাবে এরা দুজন দুজনকে ভালবাসে। মাথায়

শালের মঞ্জরী গুঁজে চলে আসবার জন্যে সে উঠেছে, বিনো সেন বলেছিলেন—এক গেলাস জল গড়িয়ে দিয়ে যাও, আর দেখ ওই রঙের বাক্সের নীচে একটা অ্যাসপিরিন আছে দাও।

সে এতক্ষণে লক্ষ্য করেছিল বিনো সেন যেন ক্লান্ত—মাথায় প্রশস্ত টাক, চুল পাশে—তাও বড় নয়, সেগুলি রুক্ষই থাকে—কিন্তু মুখের ও দৃষ্টির ক্লান্তি সেই সঙ্গে তার চোখে পড়া উচিত ছিল। হয়তো এতক্ষণ চেষ্টা করে বিনোদা হাসি-কথা দিয়ে চেপে রেখেছিলেন; এবার পারছেন না। তবুও তার চোখে পড়া উচিত ছিল। মুহূর্তে শঙ্কিত এবং একটু অনুতপ্ত হয়েই প্রশ্ন করেছিল—কেন? অ্যাসপিরিন খাবেন, মাথা ধরেছে?

—হ্যাঁ অনেকদিন পরে অনুভব করছি—মাথা আমারও আছে; কারণ মাথা ধরেছে। একটু জ্বর হয়েছে বোধ হয়।

—জ্বর হয়েছে? কেন?

—এই দেখ। এ প্রশ্নের উত্তর ডাক্তারও সহজে দিতে পারবেন না। ক্লিনিকাল রিপোর্ট ভিন্ন এর উত্তর সম্ভবপর নয়। দাও, অ্যাসপিরিন দাও।

এ্যাসপিরিন দিয়েই সে চলে আসে নি। মাথার শিয়রে পাখা নিয়ে বসে বলেছিল—আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন আমি বাতাস করি।

ছলনাময় বিনো সেন।

বিনো সেন কুণ্ঠিতভাবে বলেছিলেন—কিন্তু ওটা যে আমার নিয়মের বাইরে কল্যাণী নীরা। সেবা নিতে যে আমার নিষেধ আছে। গুরুর নিষেধ। যখন অক্ষম অজ্ঞান হব—তখন করো। এখন দুঃখকে আস্বাদন করতে দাও।

নীরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ে নয়—শ্রদ্ধায়। এ কি মানুষ! প্রতিবাদ করতে সাহস করে নি। কিন্তু দুঃখে হোক—শ্রদ্ধার সুখে হোক চোখে জল গড়িয়ে এসেছিল। রোধ করতে পারে নি। পাখাখানা হাতে নিয়েছিল—সেখানা রেখে চলেই আসছিল। বিনো সেন ডেকেছিলেন—নীরা।

নীরা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বুঝতে পারে নি জল এইবার ঝরবে। বিনো সেন বলে-ছিলেন—দুঃখ পেলে।

নীরা কথার উত্তর দেয় নি; তার চোখে জল উপচে পড়ে বলেছিল—তার প্রমাণ আমি।

—না। দুঃখ পেয়ো না। লক্ষ্মী! যাও।

চলে এসেছিল সে।

ওই ফেরার পথেই কিছুটা এসে দেখা হয়েছিল অণিমাদির সঙ্গে। অণিমাদি তার মাথায় শালের ফুল দেখে বলেছিল—এই মরেছে। হ্যাঁ লা সাঁওতালনী—কোন সাঁওতাল মাথায় তোর শালের ফুল গুঁজে দিলে লা? এ্যাঁ? এখনও বনের মাথায় তাকিয়ে শালের ফুল চোখে পড়ল না, আর তোর মাথায় কি করে এল লা?

নীরা রাগ করে নি। কারণ অণিমাদির ওই আদিরস-ঘেঁষা রসিকতা তার সহ্য হয়ে গিয়েছিল তাঁর প্রকৃতির মিষ্টতার জন্যে। একটু ম্লান হেসে বলেছিল—বিনোদা'কে কে দিয়ে

গেছে, উনি দিলেন।

গালে হাত দিয়ে অণিমাদি ভঙ্গি করে বলেছিল—তাহলে মরলি শেষ পর্যন্ত ?

এবার তার কপাল কুঁচকে উঠেছিল—বলেছিল—মানে ?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন অণিমাদি—মানে আবার কি ? মরলি মানে মরলি।

—না। ওসব বল না। কেন মিছিমিছি ভালকে মন্দ বলে মুখ খারাপ কর বল তো ? এমন একজন লোক—তার সম্বন্ধে বলতে নেই ওভাবে।

—এমন লোকই হোন আর তেমন লোকই হোন—বলি পুরুষ তো।

—কি হল তাতে ? পুরুষ হলেই মেয়েকে ভালবাসবে—বাসতে হবে—তার মানেটা কি ?

—মরণ! তবে আর সে পুরুষ কেন ? ওটা যে বিধান। তা তার কথা না হয় নাই বললাম। সে নয় তোকে ভালবাসে নি। কিন্তু তুই ? আমি তো তোর মরণের কথাই বলেছি।

এবার নীরা বলেছিল—তোমার মরণ। তুমি ওই ছাড়া আর কিছু দেখতে পাও না।

—বটে ? আমি ওই দেখি ? ভুল করে ?

—নয় তো কি ?

—নয় তো কি ? ভাল—তোর চোখের পাতাগুলো তো প্রজাপতির শুঁড়ের মত লম্বা, তাতে জল কেন লেগে লা ? চুলে ফুল পরে কেঁদে ফেলেছিস কেন ?

এতেও রাগ করে নি নীরা। ম্লান হেসে বলেছিল—তুমি জান ওঁর জ্বর হয়েছে ?

—জ্বর হয়েছে ? বিনো-দার ?

—হ্যাঁ। মাথা ধরেছে খুব। অ্যাসপিরিন খেলেন। শুয়ে আছেন।

মুহূর্তে পাল্টে গিয়েছিল অণিমাদি। চিন্তিত মুখে শঙ্কিত কণ্ঠে বলেছিল—ওঁর তো অসুখ হয় না। আমি তো কখনও দেখি নি।

সে কথার জবাব নীরা কেমন ক'রে দেবে,—উত্তরে সে তার শোনা—অসুস্থ বিনো সেনের —সেই বিচিত্র কথা ক'টি বলেছিল ;—আমি বললাম, অণিমাদি—আপনি অ্যাসপিরিন খেলেন এখন একটু চোখ বুজুন—আমি হাওয়া করি, ঘুম আসুক। তা বললেন—সেবা নিতে যে আমার নিষেধ আছে নীরা। গুরুর নিষেধ। যখন অক্ষম অজ্ঞান হব তখন করো ; এখন দুঃখকে আস্বাদন করতে দাও। সামলাতে পারলাম না অণিমাদি, চোখে জল এসে গেল।

এরপর আর কথা বলেন নি অণিমাদি। চলে গিয়েছিলেন বিনো সেনের ঘরের দিকে। নীরা একটু হেসেছিল। মনে মনে বলেছিল—আমার কথা বাদ দাও অণিমাদি। তবে তুমি, বয়স থাকলে, বিনো সেনের প্রেমে উন্মাদিনী হতে।

কথাটা আবার উঠেছিল বিকেলের দিকে। অণিমাদিই তুলেছিলেন। বলেছিলেন, গুরুর কথা-টথা মিথ্যে নীরা।

—মানে ? অর্থাৎ কথাটা ঠিক ধরতে পারে নি নীরা।

—বিনোদা'র। অণিমাদি বলেছিল—তোকে ওবেলা বলেছিলেন না ? সেবা নিতে গুরুর বারণ আছে !

—হ্যাঁ।

—মিথ্যে কথা। সব ওই প্রতিমার জন্যে।

—প্রতিমার জন্যে ?

—হ্যাঁ। জানিস, আজ তখন গিয়ে দেখলাম ঘুমুচ্ছেন—ফিরে এসেছিলাম। তিনটের সময় উঠে একবার গিয়েছিলাম—যাই একবার দেখে আসি, হয়তো এখন উঠেছেন বিনো-দা। আর এই পাথুরে দেশের বোশেখী তাত—নিশ্চয় ঘুমিয়ে নেই। বারান্দার কাছে গিয়েই শুনি—প্রতিমা বলছে—আমার সেবা নিতে হবে বলেই তুমি দোহাই দিচ্ছ। আমাদের বরিশালের বাড়িতে তুমি সেবা নাও নি ? বিয়ের পর কলকাতায় যখন এসেছিলে জেল থেকে, তখন সেবা নাও নি ? গুরু—? কে তোমার গুরু ? আমি তোমার কাছে এত অস্পৃশ্য ? কই অন্য কাউকে—। বিনো-দা বললেন—না প্রতিমা বিশ্বাস করো। সংসারে কারুর সেবাই আমি নেব না। জ্ঞান থাকতে না। গুরুর বারণ ? প্রতিমা বলে, মিথ্যে কথা। কবে তুমি দীক্ষা নিলে ? কে তোমার গুরু ? বিনো-দা বললেন—সবার গুরু বাইরে থাকেন না প্রতিমা, গুরুর বাস অন্তরে। প্রতিমা হন হন ক'রে বেরিয়ে চলে গেল। আমি তো লজ্জায় মরি—ভয়েও মরি। হয়তো চেঁচামেচি করবে, হিস্টিরিয়া হবে, এই মোটা দেহ নিয়ে মধু-মালতী লতাটার আড়ালে দাঁড়ালাম। প্রতিমা তখন সেই বলে না—বাণ-বিদ্ধা কুরঙ্গিনী—সেই মত একেবারে ফোঁপাতে ফোঁপাতে চলে গেল। এত মোটা আমি, আমাকেও দেখতে পেলে না।

নীরা চুপ করে শুনে গিয়েছিল। কথা বলে নি। মনে মনে হিসেব ক'রে বুঝতে চেষ্টা করেছিল।

—মরণ! বলে কথা শেষ করেছিল অণিমাদি। মরণ অবশ্যই প্রতিমার—সে কথা বুঝতে নীরার বাকী থাকে নি।

অণিমাদি আবার বলেছিল—প্রতিমা ভেতরে ভেতরে বোধ হয় পুড়ে যাচ্ছে। দেখেছিস কেমন শুকিয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছে!

হঠাৎ আশ্রমের সাতটার ঘণ্টায় সচকিত হয়ে উঠেছিল নীরা। পড়তে যেতে হবে তাকে হরিচরণবাবুর কাছে। তার বি-এ পরিক্ষার আর খুব দেরি নেই।

সেদিন হরিচরণবাবুই তাকে বলেছিলেন—তোমার কথা আজ বিনো জিজ্ঞাসা করছিল। অসুখ হয়েছে খবর পেলাম, গিয়েছিলাম দেখতে। তোমার প্রিপারেশনের কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমি বললাম—এদিকগুলো ঠিক আছে। ভালভাবে পাস করবে। তবে বাংলাটা কেমন হয়েছে বলতে পারব না। সেবার আমার এক ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র সব বিষয়ে খুব ভাল মার্ক পেলে কিন্তু বাংলায় একেবারে ফেল করে বসল। প্রথমটা ছেলেবেলায় পড়ত দার্জিলিংয়ে, বাপ-মা থাকত দিল্লিতে। সে এক দুঃখের কথা। রামায়ণ মহাভারত কিছুই পড়ে নি। কোশ্চেন ছিল পরশুরামকে নিয়ে। তা লিখে এসেছিল "পরশুরাম রামচন্দ্রের বড় ভাই—তাঁহাদের মাতা কুন্তীর কুমারী অবস্থায় পরশুরামের জন্ম—তাই তাহাকে পথে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পরশুরাম বড় হইয়া খুব বীর হন এবং মাকে কাটিয়া ফেলেন ; তখন রাম

তাহাকে গদার আঘাতে কোমর ভাঙিয়া দিয়া মারিয়া ফেলেন।"

এরপর হেসে বৃদ্ধ বলেছিলেন—তুমি যখন বাংলা নিয়ে এস না ?—তখন আমিও বিব্রত হই মা। আমরাও বাংলা ভাল শিখি নি। বঙ্কিম পর্যন্ত মোটামুটি বুঝি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এমন কাব্য রচনা করেছেন—যা বিশেষ চর্চা ভিন্ন বুঝতে পারি নে। তুমি বাংলা ভালই জান। একালের মেয়ে। তবু সাবধান হওয়া ভাল। বিনো আমাকে বললে—তা হলে ওকে বলবেন —আমার কাছে দরকারমত আসতে। ও ভাল হোক—তারপর তুমি দেখিয়ে-টেকিয়ে নিয়ো।

নীরা প্রশ্ন করেছিল—উনি এবেলা আছেন কেমন ?

—আছে ভালই। তবে জ্বরটা বেড়েছে একটু।

—কে রইল কাছে রাত্রে ?

—কে থাকবে ? ও তো অদ্ভুত। সেবা নেবে না। তবে থাকবেন কেউ। বোধ হয় রমেশবাবু থাকবেন। রমেশবাবু সেকেণ্ডারি সেকশনের একজন শিক্ষক।

আসবার পথে একবার দাঁড়িয়েছিল নীরা। কিন্তু কারুর কোন সাড়া পায় নি। বোধ হয় ঘুমিয়ে ছিলেন।

পরের দিন সকালে নিজেই গিয়েছিল নীরা—বিনো সেনকে দেখতে। জ্বর তখন ছেড়েছে। বিনো সেন স্নানের আয়োজন করছেন। নীরা বলেছিল—সে কি ? স্নান করবেন কি ?

হেসে বিনো সেন বলেছিল—ও আমার অভ্যাস।

—অভ্যাস ? অন্যায় বা খারাপ অভ্যাস।

—এই দেখ ! মাস্টারনী কি না। ঠিক শাসন শুরু করেছে। কিন্তু হরিচরণবাবু কাল রাত্রে আমাকে তোমার মাস্টার নিযুক্ত করে গেছেন। বলেছেন বাংলা পড়াতে। সুতরাং আমাকে আদেশ করা তোমার চলবে না নীরা দেবী।

বলেই বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

বিনো সেন বিচিত্রই বটে। স্নান করেও আর জ্বর আসে নি। সন্ধ্যাবেলা সে যখন বই নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিল—তখন সেই গানটিই গাইছেন—

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি ?
হায় তুমি তার খবর পেলে না।

চৌদ্দ

তৃতীয় অঙ্কের এই দৃশ্যটা ওইখানেই শেষ ক'রো। নাটকীয়তার যদি অভাব ঘটে তবে একবারে শেষে জুড়ে দিয়ো—ছোট্ট একটি ঘটনা।

বিনো সেনের কাছে নীরার বাংলা পড়ার প্রথম দিন।

পড়ার সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল বেলা এগারটায়। ঠিক হয়েছিল—পরীক্ষা পর্যন্ত নীরাকে

তার নির্ধারিত কাজ থেকে আংশিকভাবে ছুটি দেওয়া হবে। বেলা এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত ক্লাসে ছেলে পড়ানোর কাজ কমিয়ে দিয়ে বিনো সেন বলেছিলেন—সকালবেলা ডাকাত-গুলোকে মুখ ধোওয়ানো—খাওয়ানো—আর বিকেলবেলা ওদের খেলাধুলো—রাত্রে খাওয়ানো শোয়ানো—এ কাজ তুমি ভিন্ন হবে না। পড়ানোর কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। দশটায় ইস্কুল বসিয়ে এক ঘণ্টা দেখেশুনে চালু করে দিয়ে—এগারটা থেকে চারটে পর্যন্ত তোমার ছুটি।

তারই মধ্যে এগারটা থেকে একটা বিনো সেনের কাছে বাংলা পড়ার সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল। সেদিন অর্থাৎ ওই জ্বর ছাড়া মাত্র স্নান করার দিনের দুদিন পর নীরা সেই প্রথম পড়তে গিয়েছিল বিনো সেনের কাছে। সবে পড়া শুরু করেছে এমন সময়—ডাকপিওন এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল—একটা রেজেস্ট্রি আছে।

মস্ত একটা লম্বাচওড়া খাম, মোটা শক্ত কাগজের খাম। রসিদ সই ক'রে সেটা খুলে বিনো সেন বের করেছিলেন কয়েকখানা এক্সরে ফটো প্লেট। তার সঙ্গে মস্ত ডাক্তারী রিপোর্ট। বলেছিলেন—একটু অপেক্ষা কর, এটা দেখে নিই।

দেখে—তিনি ডেকেছিলেন চাকরকে—সমস্তটা হাতে দিয়ে বলেছিলেন প্রতিমাকে দিয়ে এস।

তারপর নীরাকে বলেছিলেন—পড়।

মনে প্রশ্ন নিয়েই পড়তে শুরু করেছিল নীরা।—প্রতিমার এক্সরে প্লেট? মাসখানেক আগে কয়েকদিনের জন্য প্রতিমাকে নিয়ে বিনো সেন কলকাতায় গিয়েছিলেন। সে কি এইজন্যে? কি হয়েছে প্রতিমার? দিন দিন রোগাও হচ্ছে সে!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রতিমা এসে দাঁড়িয়েছিল প্রসন্ন সহাস্যমুখে। এবং বলেছিল—আমি বলছি—আমি ভাল আছি। আমার কিছু হয় নি—। তবু জোর ক'রে তোমরা সকলে বলবে—ডাক্তার দেখাও, ডাক্তার দেখাও! দেখলে তো!

হেসে বিনো সেন বলেছিলেন—যাকে স্নেহ করে মানুষ, তার জন্যেই অযথা আশঙ্কা হয় প্রতিমা! আশঙ্কা কেটে গেল। এটা ভাল হল না?

মুখখানা লাল হয়ে উঠেছল প্রতিমার। উত্তর দিতে পারে নি সে। উত্তর হয়তো খুঁজে পায় নি; কণ্ঠস্বর হয়তো আবেগে রুদ্ধ হয়েছিল।

বিনো সেন আবার বলেছিলেন—তা হ'লে এই গরমের মাসটা ডাক্তারের কথামত তুমি শিলংয়ে থেকে এস। তিনি বিশ্রাম এবং চেঞ্জের কথা বলেছেন।

প্রতিমা বলেছেন—না।

—না কেন? ডাক্তার সেটা বিশেষ করে বলেছেন।

—বলুন। ওঁরা বলেন। আমি যাব না। আমি পরীক্ষা দেব।

—পরীক্ষা দেবে? কি ক'রে দেবে? আর পনের দিন পর ম্যাট্রিক পরীক্ষা শুরু। ফিজ দাখিল কর নি—পরীক্ষা দেবে? পরীক্ষা দেব বললেই তো দেওয়া হয় না প্রতিমা। এর আগে তুমি দুবার পরীক্ষা দিয়েছ—না-জানা নও। হঠাৎ আজ এসে বলছ পরীক্ষা দেব?

যাও। শিলং যাবে—তার ব্যবস্থা কর।

—না।

প্রতিমা 'না' বলেই ফিরল।

বিনো সেন ডাকলেন—শোন—! বিনো সেনের কণ্ঠস্বরে যেন একটা ধনুকের টানের মত টান ছিল। কিন্তু প্রতিমা তাতে বিচলিত হয় নি।

না। আমি শিলং যাব না।

বলেই সে বেরিয়ে গেল। বিনো সেন নীরাকে বললেন—পড়।

শেষ কর এইখানে দৃশ্যটা।

* * *

আরম্ভ কর তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য। যা আজ এই ঘণ্টা কয়েক পূর্বে শেষ হয়েছে।

অন্ধকার রাত্রে শামপানি গাড়িটার মধ্যে ঘড়ি দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ক'টা বাজছে। দুপাশে বন শেষ হয়ে এসেছে। পথে যে ভালুকটা বা ভালুক কয়টা ঘুরে বেড়ায় তারা যেন পথে এসে দাঁড়ায় নি। নিশ্চিন্তভাবেই তার মনশ্চক্ষের সামনে জীবন-নাটকের অভিনয় হয়ে চলেছে। আরম্ভ হচ্ছে এই শেষ দৃশ্য।

না। দাঁড়াও। নীরা ভাবছে—স্মরণ করতে চেষ্টা করছে সেদিন ওই প্রতিমা যখন চলে যায় এবং বিনো সেন যখন নির্বিকারভাবে নীরাকে 'পড়'—বলেন তখনকার মুখভাবটা স্মরণ করতে। একটি বা দুটি কোথাও বা দৃষ্টির চকিত আভাসেও কি বিনো সেনের প্রতিমার প্রতি তিক্ততা এবং নীরার প্রতি আসক্তি ফুটে উঠে নি?

না; মনে পড়ছে না। বিনো সেন নিপুণ অভিনেতা। বরং নীরা মুগ্ধ হয়েছিল তাঁর সংযম এবং কর্তব্যপরায়ণতা ও নিরাসক্তি দেখে।

অনবুঝ প্রতিমার উপর বিরূপ হয়েছিল সে। নীরা বুঝতে পারে নি যে, প্রতিমা বিনো সেনের নীরার প্রতি দৃষ্টিপাত লক্ষ্য করেছিল; শঙ্কিত হয়েছিল।

ডি-এল রায়ের সাজাহান নাটকের ঔরংজেবের চরিত্র মনে পড়ছে। ঔরংজেব সাধুতার মুখোশ প'রে—ফকীরের জপমালা হাতে নিয়ে—সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে দিল্লির পথে। ওদিক থেকে আসছে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা মোরাদ। সে নিজের জন্য সিংহাসন দখল করতে চায়। ঔরংজেব বললে—সে মক্কার দিকে পা বাড়িয়ে আছে। ফকিরিই তার জীবনের কাম্য। শুধু কাফের দারার হাত থেকে পবিত্র ইসলাম-সেবক মুঘল সিংহাসন উদ্ধারের জন্যই বাধ্য হয়ে ব্যথিত চিত্তে অগ্রসর হচ্ছে সৈন্য নিয়ে। তার কটিবন্ধের তরবারি খুলে সম্রাট মোরাদকে উপঢৌকন দেবে আর বাঁধবে না। বিনো সেন তাই। সেদিন নীরাকে সে ওই ঔরংজেবের মোরাদকে ভোলানোর মতই ভুলিয়েছিল।

আশ্চর্য—'সাজাহান' নাটক তাদের পাঠ্য ছিল। বিনো সেন চরিত্রটি চমৎকারভাবে বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন—Truth is stranger than fiction—নীরা। দেখ ও চরিত্রটি কাল্পনিক হলে যে কেউ বলত নাট্যকার অতিরঞ্জন করেছেন। হয়তো বা বলত—

চরিত্র অবাস্তব। কিন্তু এ চরিত্র ঐতিহাসিক। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর নজীর আছে। হয়তো নাটকের চরিত্রের চেয়েও বাস্তব ঔরংজেব—আরও জটিল আরও কুটিল ছিলেন। Stage-অভিনয়ে একজন অভিনেতা ঔরংজেব—একজন অভিনেতা মোরাদকে ভুলিয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে—বাস্তব ঔরংজেব—বাস্তব মোরাদকে ভুলিয়েছিলেন। মোরাদও রাজপুত্র—ডিপ্লোমেসি তার মধ্যেও ছিল। তারও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। কিন্তু কেউ ধরতে পারে নি।

দিনের পর দিন মুগ্ধ হয়ে শুনেছে বিনো সেনের সাহিত্য-ব্যাখ্যা। নিজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তার নিকট থেকে নিকটতর হয়েছে।

অজগর হরিণকে টানে। তার নিশ্বাসে হরিণের চেতনা অসাড় হয়ে আসে। এগিয়ে যায় মুখের কাছে। পরীক্ষা দিতে যাবার দিন মাথায় হাত দিয়ে সে কি গাঢ়স্বরে আশীর্বাদ!

—আমার মুখ রাখতে হবে। ভালভাবে পাস করা চাই। আমার হাতের 'তৈরী তুমি'। হাঁ!

পরীক্ষাতে প্রশ্নও এসেছিল সাজাহান নাটক নিয়ে। সর্বাপেক্ষা বিচিত্র চরিত্র কি? অধিকাংশই লিখেছিল—দিলদার। সে লিখেছিল—"দিলদার চরিত্র কল্পনার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হইলেও বাস্তবতার মূল্য বিচারে অনুত্তীর্ণ। অর্থাৎ কল্পনা ঠিক বাস্তব হইয়া উঠে নাই। এদিক দিয়া—ঔরংজীব চরিত্র বাস্তব পটভূমিতে কল্পনার চাতুর্যে একটি ক্রিয়াশীল গতিশীল কেন্দ্রীয় চরিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নাটকের প্রত্যেকটি নরনারী ঔরংজীবের আঘাতে চলিয়াছে, রূপ পরিবর্তন করিতেছে। তাহাকে বুঝিয়াও ধরিতে পারিতেছে না। এবং শেষ দিকে মানব চরিত্রের অবিনাশী সত্তা যখন অসহ্য অনুতাপে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে এবং কখনও যখন তাহার প্রতারক-সত্তা প্রাণপণে নিজেকে রক্ষা করিতে চাহিতেছে তখনই চরিত্রটি পূর্ণভাবে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।"

বিনো সেনও তাই। কেউ বুঝতে পারে নি কেউ ধরতে পারে নি। এমন কি শিবনাথ-দাদু পর্যন্ত না। তিনি মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখেছেন—তার মধ্যেও তিনি বিনো-দার কথাই পঞ্চমুখে গান করেছেন।

নীরা একবার লিখেও ছিল। আপনি যদি সত্য শিব হতেন অর্থাৎ কাঁধের উপর পাঁচটা মুখ থাকত তা হলে বিনো-দার কথা বোধ হয় বলে শেষ করতে পারতেন।

দাদু লিখেছিলেন—দিদি যা লিখেছ তার উত্তরে বলি—"শিব নামের জন্যে পাঁচটা মুখ যদি পাওয়া যায় তা'লে শিবের বদলে রাবণ নাম নিতে চাই। দশটা মুখ পাওয়া যাবে। তোমাদের সুবিধে দিদি, মুখের দরকার হয় না, দুখানি হাতে একগাছি মালাতেই তোমরা বিধাতার ঋণ শোধ করতে পার। দুঃখের কথা কি জান? বিনো সেন ওইখানে দেবতাদের চেয়েও চতুর। লোকটার ওইখানেই নিন্দে। লোকটার ফুলের মালায় লোভ নেই। বিনো-দার চিঠি পেয়েছি। লোকটা একমুখেই তোমার শতনাম করছে গো। চিঠিখানা দেখলে তুমি লজ্জা পাবে। লেখক ভাগ্যে বিনো-দা; নইলে ভাবতাম হয়েছে এইবার; নীরাদির ছেঁড়া

মালা আবার বিধাতা জোড়া দিয়ে হাতে তুলে দিলে। ভাই, ঠাট্টা করছিনে। বিনো-দা লিখেছে—দাদু এইবার আশা হয়েছে—আমার শিষ্যার মধ্যে আমি বাঁচব—আমার এই মরুভূমিতে লাগানো বাগানটি বাঁচবে। ভারী ভাল লাগছে দাদু—একটি মেয়েকে অন্তত মনের মত ক'রে গড়ে যেতে পারলাম—অথবা সে-ই আমার আকাঙ্ক্ষা বুঝে সেই মত বেড়ে এবং গড়ে উঠল। পরীক্ষার জন্যে খুব পড়ছে নীরা। পাস ভালভাবেই করবে। দেখবেন। দেখো, তার মুখ রেখো। আমার বাড়িতে বসন্ত হ'চ্ছে। কলকাতা জুড়েই। তুমি বর্ধমানে সেণ্টার করো।

* * *

পাস সে ভালভাবেই করেছিল।

খবর কলকাতা থেকে পাঠিয়েছিলেন দাদু—টেলিগ্রামে। আর তার কাছে সেটা নিয়ে এসেছিল বিনো সেন। নাটক! বিনো সেন আজ বললে—সে নাটক করলে। নাটক করার কৌশল তোমার থেকে কেউ ভাল জানে বিনো সেন?

ওঃ সে কি নাটকীয় আবির্ভাব!

স্কুলের ক্লাসে সে পড়াচ্ছিল। মাথায় একখানা চাদর পাগড়ীর মত বেঁধে ক্লাসের দরজায় দাঁড়িয়ে হেঁকেছিল—টেলিগিরাপ পিওন! নীরা মুখার্জী—টেলিগিরাপ!

গলার স্বরটাকেও চেপে চিনতে দেয় নি। নীরারও এক মুহূর্তের জন্ত ভুল হয়েছিল—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপনার বলে কেউ না থাকলেও—এক্‌বার বুকটা ধ্বক্ করে উঠেছিল। বলেও উঠেছিল—আমার? টেলিগ্রাম? পরমুহূর্তে বিনো সেন ঘরে ঢুকে হেঁট হয়ে একটা সেলাম ক'রে বলেছিল—বকশিশ্ দিদিমণি!

আর বুঝতে দেরী হয় নি। পাসের খবর এবং ভাল পাসের খবর! এবং বিনো সেনকে বক্‌শিশ দিতেও তার মুহূর্তের জন্যে ভাবতে বা বিব্রত হতে হয় নি। চট করে ঠিক মাথায় এসে গিয়েছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই নতজানু হয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—মিল গিয়া বকশিশ্! দিজিয়ে টেলগিরাপ!

বিনো সেন অভিনয়ের ভঙ্গিতেই বলেছিল—বহুৎ খুশ্! বহুৎ খুশ্ হো গয়া। তারপরই টেলিগ্রামখানা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন—নাও। শুধু পাস নয়, উইথ ডিস্টিংশন। আজ আমি ভোজ দেব। স্কুলের ছুটি তোমাদের, সব ছুটি আজ। নীরা-দিদিমণি খুব ভাল করে বি-এ পাশ করেছে। রাত্রে আজ লুচি মাংস মিষ্টি।

নীরা পড়েছিল—Thousands blessings. Passed with distinction. Dadu.

তারপর আর সে দাঁড়ায় নি—"মাস্টারমশায়কে প্রণাম করে আসি" বলেই ছুটে গিয়েছিল হরিচরণবাবুর বাড়ির দিকে। হরিচরণবাবু মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। বিশীর্ণ মুখে কৃষ্ণা চতুর্দশীর শেষরাত্রির আকাশের ক্ষীণ চন্দ্রলেখার মত শীর্ণ রেখায় একটুকরো হাসি ফুটে উঠেছিল। সে বুঝেছিল তাঁর বেদনার অন্তর্নিহিত অর্থটুকু। তিনি মধ্যে মধ্যে বলতেন, এই পৌত্র দুটির বড় ভাই অর্থাৎ বড় পৌত্রের কথা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছেলে ছিল। সে থাকলে সেও এবার বি-এ দিত।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়তে চাইছিল, সেটাকে চেপেই সে বেরিয়ে এসেছিল। তারও মনে পড়েছিল মাকে। বেরিয়ে এসে সে ফিরেই যাচ্ছিল ইস্কুলে। ওই ডাকাতদের সঙ্গে খানিকটা হৈ-চৈ করতে হবে। ওরা তাকে বড় ভালবাসে। ও সেই একদিনই সেই ছেলে ত্নটোকে মেরেছিল। তারপর আর মারে নি। সে তো জানে এই সব আপনজন-হারা ছেলেগুলির জীবনের কি ক্ষোভ কি অবিশ্বাস! মূল আছে তাই ফুল ফোটে। পরগাছা অর্কিডেও ফুল ফোটে, তাতে আর একটি গাছকে জীবনের সকল রস দিতে হয় পরিপুষ্ট করতে; বুকে ক্ষত করে রক্ত দিয়ে লালন করার মত।

তাই সে দিতে চায়। প্রত্যেক ক্ষোভের ক্ষেত্রে নিজের বাল্যকালের কথা স্মরণ করে, মিলিয়ে দেখে বিচার করে সে। আজ সে তার বাল্যকালের অন্যায়কেও দেখতে পায়। আজ সে ওদের সঙ্গে নাচবে খেলবে গান করবে।

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি ?
হায় বুঝি তার খবর পেলে না।

ছেলেদের নিয়ে সে গানটা রপ্ত করছে। শোনায় এবং বলে সমাজকে, সংস্কারকে। আজ সে নিজেকে বলবে। সবাইকে বলবে। জীবনে কিছু কিছু সঞ্চিত সুধা-নির্ঝরের যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। আপন মনেই সে আবৃত্তি করতে করতে চলেছিল আনন্দচঞ্চল পদক্ষেপে—

আমি ঢালিব করুণা-ধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—
প্রাণ হয়ে আছে ভোর॥

হঠাৎ সব ছন্দ তাল কেটে গিয়েছিল। কাকে যেন স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসছিল। সঙ্গে বিনো-দা। পিছনে স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল অণিমাদি আর কমলাদি।

কে আবার? বুঝতে বাকী থাকে নি। প্রতিমাদি। নইলে প্রতিমাদি কই? সে যেদিক থেকে যাচ্ছিল—সেইদিকেই আসছে। সেইদিকেই ছিল তাদের সকলের কোয়ার্টার।

পথে দেখাও হয়েছিল। প্রতিমাদিই বটেন। বিনো-দা একটু হেসে বলেছিলেন, প্রতিমা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তুমি যাও—আপিসে। কাগজপত্র দেখে সামলে রাখো। এরপর তো গোটা ইস্কুলের ভার পড়বে তোমার উপর। স্ট্রেচারের মধ্যে প্রতিমাদি প্রায় মরার মত নিথর হয়ে পড়ে ছিলেন।

অণিমাদি কমলাদির সঙ্গে দেখা হতেই তারা বলেছিল, মা। কি কাণ্ড!

—কি হ'ল বল তো?

—কি আবার? ঝগড়া করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল। তোকে নিয়ে ঝগড়া।

—মানে ?

—নেকী তুই।

কমলাদি বলেছিল, আপিসে এস। এখানে—ছেলেদের সামনে নয়।

আপিসে সে সব শুনেছিল। কমলাদি আর অণিমাদি ক্লাসেই ছিলেন, ছুটি পেয়ে ছেলেরা নাচছিল। হঠাৎ চীৎকার শুনে ছুটে আসে অণিমাদি কমলাদি দুজনেই, কিন্তু অফিস-রুমের দরজা বন্ধ ছিল। কথা তাতে আটকায় নি। তারা সব শুনেছিল স্তব্ধ হয়ে। প্রতিমা প্রায় আর্তনাদ করছিল,—কই আমার জন্যে তো কর নি। আমিও তো পড়তে পারতাম। পাস করতে পারতাম। দুবার ফেল করেছি বলে—তুমি—। বিনো-দা বলছিলেন, তার আগেও তুমি কলকাতায় একবার ম্যাট্রিক দিয়ে ফেল করেছিল। এখানে দুবার ফেলের পর আমি বুঝেছিলাম, তুমি পড় না। পড়তে চাও না। আমি নিজে তোমাকে পড়িয়েছি। নীরার চেয়ে কম যত্ন নিয়ে পড়াই নি। কিন্তু তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত। তুমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রতিমা—অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তুমি—তুমি কখনও আকাশের দিকে তাকাতে পারলে না। তোমার আমার সম্পর্ক—তাও—তুমি—

অণিমাদি বলেছিলেন—এই না ভাই, সে কি চীৎকার! চেঁচিয়ে উঠল—ওই—ওই—নীরা সব বিষিয়ে দিলে—তোমাকে নিশ্বাস দিয়ে টানছে—। বাস্, উনি গম্ভীর গলায় বললেন, প্রতিমা। তারপর ধড়াস্। পতন ও মূর্ছা।

গম্ভীর কমলাদিও হেসেছিলেন একটু। সে একটু স্তব্ধ থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, ওর জীবন আমি বিষ দিয়ে বিষিয়ে দিই নি—আমার গায়ে অকারণে বিষ ঢালতে এসে—সেই বিষ ঢাললে নিজের গায়ে! আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়—কেন—উনি—আমাকে এমন করে সব কিছুর মধ্যে টানেন—দায়ী করেন ? কেন ?

ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে ভঙ্গি করে অণিমাদি বলে উঠেছিলেন—উনি জানেন যে, বিনো-দা তোমার প্রেমে পড়েছেন!

—অণিমাদি! ধমকে উঠেছিল সে।

অণিমাদি বলেছিলেন,—তোর ধমকে আমি ভয় পাই নে। আমি পুরুষমানুষ হলে আমিই তোর প্রেমে পড়তাম। তোর পিছু পিছু ঘুরতাম।

—আমি ছেলেবয়সে একজনকে এক চড় মেরেছিলাম।

—সেটা একটা মস্ত হাঁদা। আমি এক গালে চড় খেলে আর এক গাল পেতে দিতাম। চড় মার, ঝাঁটা মার—দেহি পদপল্লবমুদারম। হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল অণিমাদি। সে ভঙ্গি দেখে সে আর না-হেসে পারে নি। হেসে ফেলেছিল।

সামপানির মধ্যে নীরা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। বিনো সেনের দৃষ্টি ও ব্যবহারের মধ্যে আজকের ঘটনার অঙ্কুর কি সেদিন আর সকলেই দেখেছিল, শুধু সে-ই দেখে নি ? কেন দেখে নি ? কেন ? সেও কি—? না-না। সে কখনও দুর্বলতা অনুভব করে নি, দুর্বল হয় নি, প্রতারিত হয়ে বিনো সেনকে সে শ্রদ্ধা করেছে কিন্তু ভাল সে বাসে নি। নীরার

ভালবাসা মরুভূমি বিদীর্ণ করে—উৎস-মুখে জলের ধারায় প্রকাশ। সে গোপন থাকত না—চাপা থাকত না। আর নীরা ভালবাসবে এমন পুরুষকে যে পুরুষ মনে মনেও আর একজনকে ভালবেসেছে? প্রতিমাকে বিনো সেন মনে মনেও ভালবাসেন! ছি! ছি!

থাক। মানসমঞ্চে নাটকের অভিনয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। প্রস্থানে বিলম্ব হচ্ছে। না। বিলম্ব হয় নি—ব্যাঘাত ঘটে নি। সেদিন অণিমাদির ওই কথায় হেসে ফেলে পরমুহূর্তেই বিষণ্ণ এবং অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ওই প্রতিমার কথা মনে করেই বিষণ্ণ এবং অন্যমনস্ক হয়েছিল। রাত্রে খাওয়াদাওয়া হবে—ছেলেরা উৎসব করবে, হুল্লোড় করবে। সেও নিশ্চয় অনিমাদি-কমলাদির সঙ্গে হাস্য-পরিহাসে মাতবে, বিনো সেনও মাতবেন, আর প্রতিমা?—ওই ভেবেই সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ চলে গিয়েছিল। গিয়েছিল বিনো-দার কাছে।—বন্ধ করুন খাওয়া দাওয়া! প্রতিমাদির অসুখ।

বিনো-দা বলেছিলেন, না। সেরে যাবে অসুখ সন্ধ্যের মধ্যে। তাঁর সে মুখ দেখে প্রতিবাদের সাহস হয় নি। সে মুখে একটা কাঠিন্য ছিল। দৃঢ়তা ছিল। সংকল্প ছিল। বাড়ি ফিরে এসে সে বসে ভেবেছিল, ঠিক আজকের মতই ভেবেছিল—কিছু কি সত্যই করেছে সে আপন অজ্ঞাতসারে? না। দিনের পর দিন, সেই একই ধারায় কাজগুলি করে গিয়েছে—যন্ত্রের মতন; সেই—সকালে উঠে ছেলেদের খবর নেওয়া কে কেমন আছে। তারপর ইস্কুল। বিকেলে খেলা দেখা। সন্ধ্যায় একবার ক'রে বিনো-দা সবার কাছে আসেন, তার কাছেও এসেছেন। খবর নিয়ে গেছেন। তারপর সে গিয়েছে হরিচরণবাবুর কাছে পড়তে। কোন কোন দিন অবশ্য বিনো-দা সঙ্গে গিয়েছেন। রাত্রে ফেরার সময় তিনি বারান্দায় কোনদিন গান করেন, কোনদিন ছবি আঁকেন হেজাক বাতি জেলে—ইলেকট্রিক আলোতে তাঁর কুলোয় না, বেশী পাওয়ারের বাল্ব ব্যবহার করলে ফিউজ হয়ে যায়। তাকে দেখলেই নেমে সঙ্গে তার বাড়ির দোর অবধি আসেন, এই পর্যন্ত। কই কখনও তো এমন কথা বলেন নি যার মধ্যে এতটুকু অনুরাগের চিহ্ন আছে। শুধু একটা কথা, তুমি ওয়াণ্ডার-ফুল। আশ্চর্য মেয়ে! মধ্যে মধ্যে ছেলেদের নিয়ে পিকনিক হয়েছে, তাতে হৈচৈ হয়েছে, হুল্লোড় সবাই করেছে, বিনো-দা সব থেকে বেশী। একদিন ছেলেদের সঙ্গে রেস দিয়েছিলেন, তাতে তিনি তাকেও টেনেছিলেন। হ্যাঁ, সে যোগ দিয়েছিল। অণিমাদি মোটা, কমলাদি রোগা, প্রতিমাদি মাটির পুতুল। তার শক্তি আছে উৎসাহ আছে—সে রেস দিয়েছিল। বিনো-দা জিতেছিলেন, সে সেকেণ্ড হয়েছিল, ছেলেরা দম রাখতে পারে নি। তার মধ্যে প্রেম কোথায়? মধ্যে বিনো-দা মিটিং করেছেন সমাজ-সংস্কার নিয়ে, মুগ্ধ হয়ে সে শুনেছে। নিশ্চয় চোখে মুখে ফুটে উঠেছে সে মুগ্ধতার ছায়া। তাই বা প্রেম হবে কেন?

ভাবতে ভাবতে সে এমনই ক্ষুব্ধ হয়েছিল—যে সে হঠাৎ উঠে কোন বিবেচনা না-করেই গিয়েছিল প্রতিমার কোয়ার্টারে। কেন—কেন তিনি এমন সন্দেহ করবেন?

প্রতিমা বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। দেখে তার আবার ক্ষোভ চলে গিয়ে মায়া হয়েছিল। কি বলবে ভেবে পায় নি, চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিল, ভাবছিল; হঠাৎ চোখে

পড়েছিল—টেবিলের উপর পড়ে-থাকা বিনো-দার একখানা ছোট চিঠি।

সে নিজেকে সম্বরণ করতে পারে নি। চিঠিখানা নিয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই মুখ তুলেছিল প্রতিমা। এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুখ গুঁজে পড়ে বলেছিল, তুমি যাও। তুমি যাও। আমাকে কি মরতেও দেবে না শান্তিতে? কাঁদতেও দেবে না?

সে বলেছিল, আমি আসতাম না প্রতিমাদি। কিন্তু আপনি যে আমাকে বিশ্রীভাবে জড়িয়ে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন। কেন আপনি এ রকম ভাবেন?

—ও তোমাকে ভালবাসে না?

—না। আমি অন্তত মনে করি না। স্নেহ করেন। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তার মধ্যে আপনি যা ভাবেন তার লেশমাত্র নেই।

—লেশমাত্র নেই! ব্যঙ্গভরে সে বলেছিল। চোখ বুজে ভেবে দেখো!

তারপরই প্রতিমা কেঁদে উঠেছিল হু-হু করে! নীরার আর সহ্য হয় নি—সেও চলে এসেছিল বিরক্ত এবং নিরুপায় হয়ে। একে সে কি বলবে? ঘৃণা হয়েছিল, করুণাও হয়েছিল। বাসায় এসে খেয়াল হয়েছিল চিঠিখানা তার মুঠোর মধ্যেই রয়ে গেছে। ভ্রূকুঞ্চিত করে সে ভাবতে বসেছিল, বিনো-দার প্রতি তার কি—? বিনো-দার কথা বিনো-দা জানেন। না, সেও জানে, ও মানুষ ভাল কাউকে বাসে না! জগৎ ওদের কাছে তুচ্ছ, ক্ষুদ্র। হায় প্রতিমাদি, তুমি যদি জানতে যে এ মানুষের কাছে নীরারও দাম নেই। অন্তত সেদিন তাই মনে হয়েছিল। সেদিন বিনো সেনকে সে বুঝতে পারে নি। সে স্বীকার করছে। বিনো সেনের প্রতারকের ভূমিকা নিখুঁত। আর নিজে সে? না। সে কোনদিন মনে ঠাঁই দেয় নি। কোনদিন না। মনে মনেই প্রতিমাকে উদ্দেশ করে বলেছিল—প্রতিমাদি—এই মুহূর্তে চোখ বুজলে হয়তো তোমার কথার সূত্র ধরে নীরার মনে বিনো সেনের মুখ ভেসে উঠবে, কিন্তু তা বলে তাই সত্য নয়। সে মনে ক... দেখেছে। ভাল করে খতিয়ে দেখেছে। হিসেব সে তোমাকে দিতে পারে।

হ্যাঁ। সে স্বীকার করবে যে সেদিন নিজের ঘরে সেই সময়টুকুর মধ্যে বার বার—বার বার বিনো সেনের মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তার কারণও সে জানে, তার কারণ প্রতিমাদির ওই কথা ক'টি। মনের একটা বিচিত্র অবাধ্য গতি আছে; যে মুহূর্তে একটা অন্যায় অপরাধের অপবাদ মানুষের ঘাড়ে কেউ চাপিয়ে দেয়—সেই মুহূর্ত থেকেই মনের মন্দ সেই অপবাদকেই সত্য ক'রে তুলতে চায় মিথ্যে কল্পনার মধ্যে।

বিনো সেন, বিনো সেন বিনো সেন। ঘুরে ফিরে বিনো সেনই তার মনের মধ্যে চারিদিকে দাঁড়িয়ে হেসেছিল।

সে দিন সে মাঝে মাঝে বিব্রত বোধও করেছিল। তা করেছিল। মাথাটা পর্যন্ত ধরে উঠেছিল।

ঠিক এই সময়েই ঢং-ঢনন শব্দে পড়েছিল—কিচেন ঘণ্টা।

মিনিট দুয়েক পরেই অণিমাদি এসেছিলেন দূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে—নীরি। নীরি।

আঃ, যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। তোর পাসের ভোজ, তুই কি করছিস? ঘরে ঢুকেছিল অণিমাদি—বলি ধ্যান করছিস কার?

—কারও নয়, চল। জীবনটা খতাচ্ছিলাম। মাথা ধরে গেছে।

খাবার আগে একটি ছোট আসর হয়েছিল। ডাইনিং-হলে ছেলেরা অণিমাদি কমলাদি হরিচরণবাবু এবং অন্য মাস্টারেরা এসে বসেছিলেন। তার আগেই তাঁরা এসে তারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল—এসব আবার কি?

হরিচরণবাবু বলেছিলেন—আমরা তোমাকে আশীর্বাদ করব মা। ছোটরা তোমাকে প্রণাম করবে।

সে তাঁরই পাশে বসে বলেছিল—না—না। সে আমার ভারী লজ্জা করবে। না। তা ছাড়া শরীরটা আমার আজ যেন ভাল নেই। মাথা ধরেছে।

হরিচরণবাবু তার আপত্তির কথাটা গ্রাহ্যই করেন নি; বলেছিলেন—এই তো অল্পক্ষণের মধ্যেই হয়ে যাবে। এই—কেউ যাও, বিনোকে ডাক—। বল আমরা বসে আছি!

অণিমাদি বলেছিল, একেবারে নিরীহের মত বলেছিল—বোধ হয় প্রতিমাদির আবার অসুখটা বেড়েছে।

নীরার অসুস্থ দেহমন যেন অকস্মাৎ একটা খোঁচা খেয়ে তিক্ততায় টান হয়ে উঠেছিল। সে বলেছিল—আমি তো বারণ করেছিলাম—এ সব করবেন না। একজনের অসুখ আর একজনের অভিনন্দন, তাকে নিয়ে উৎসব—এ হয় না হওয়া উচিত নয়!

ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই বিনো সেন এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এবং হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে বলেছিলেন—উদ্বোধন সঙ্গীত গাইছে বিনো সেন। গেয়েছিলেন—

তাই তোমার আনন্দ আমার পর।
তুমি তাই এসেছ নিচে—
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।

জাদুকর! ভুল করে ত্রিভুবনেশ্বর মনোহরণের জাদুদণ্ড দিয়েছিলেন—প্রতারক—ভণ্ডের হাতে। না; ভুল ক'রে নয়; নীরার জীবন-নাটকে নীরাকে অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখে ফেলে দিতে।

ওই গান আর বিনো সেনের কণ্ঠস্বর—মুহূর্তে আশ্চর্য একটি শান্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। অতি ক্লান্ত তিক্ত মনও প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। হরিচরণবাবু কেঁদেছিলেন।

শুধু অণিমাদি তার কানের কাছে এসে বলেছিলেন—এ ভাই তোকে বলছে।

তখনও বিনো সেন গাইছিলেন—

তাই তো তুমি রাজার রাজা
তবু—তোমার হৃদয় লাগি—
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি।

ভ্রূ কুঁচকে সে ফিরে তাকিয়েছিল অণিমাদির দিকে। অণিমাদি বলেছিলেন—ওটা রাজার রাজা নয়—রাণীর রাণী হবে। প্রতিবাদ করবার সময় সেটা ছিল না। তাই সে চুপ ক'রে গিয়েছিল। ভেবেছিল—এ সব শেষ হলে অণিমাদিকে কঠিন কথা বলবে বেছে-বেছে। কিন্তু প্রতিবাদ করতে হয় নি। প্রতিবাদ নিজেই জানিয়ে গিয়েছিলেন বিনো সেন। গান শেষ ক'রেই তিনি বলেছিলেন—মাস্টারমশাই আপনার সভা শেষ করুন। প্রতিমা বড় অসুস্থ, আমাকে যেতে হচ্ছে। নীরা—তুমি নিশ্চয় কিছু মনে করবে না।

নীরা বলেছিল—না।

বিনো সেন চলে যাবার পর সে বলেছিল—আমার শরীরটাও বড় খারাপ মাস্টারমশাই, আমি আর বসে থাকতে পারছি নে। অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। সত্যই হচ্ছিল।

ব্যাপারটা এমনি হয়েছিল যে কেউ কোন কথা বলতে পারে নি এর পর। হরিচরণবাবু শুধু অল্প কয়েকটি কথায় তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। তারপরই সে সামান্য কিছু মুখে দিয়েই উঠে পড়েছিল। মাথা তার খসে যাচ্ছিল—তার উপর চিত্তের তিক্ততারও সীমা ছিল না। বিনো সেনের চলে যাওয়ার অশোভন ব্যস্ততা—তার মনে একটা উত্তাপের সৃষ্টি করেছিল।

উত্তপ্ত মনে অসুস্থ দেহে সে ফিরে এসেছিল। মাথায় যন্ত্রণা।

ঘরে গুমোট গরম। আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। মনে তিক্ততা। বাইরের বারান্দায় ডেক-চেয়ার টেনে আকাশের মেঘের দিকে চেয়ে বসেছিল। ভাবতে চেষ্টা করেছিল, এর পর আর তার এখানে থাকা উচিত হবে না। বিনো-দাকে সে বলবে। না, মুখে বলতে সে পারবে না, চিঠি লিখে জানাবে। এখানে থেকে কোন অজুহাতে কলকাতা গিয়ে জানাবে। সব গোল-মাল হয়েছিল একটা বিদ্যুচ্চমকে। কোথা কোন দূরে মেঘ ডেকে উঠেছিল। গুরু গুরু রবে সঙ্গে সঙ্গে ঝিরঝির করে এসেছিল ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক। শরীরটা জুড়িয়ে গিয়েছিল। আঃ, চোখে বুজে এসেছিল।

কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ একটা চড়া বিদ্যুতের আলোয় ঘুম ভেঙে গেল! তারপরই কড় কড় শব্দে মেঘের ডাক। চমকে উঠেছিল সে। কাপড়চোপড় শরীর সব ভিজে-ভিজে হয়ে গেছে বৃষ্টির ছাটে। বৃষ্টি নেমেছে তখন। ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল। আঃ, বিনো সেনের মুখ। দেওয়ালে ফটোটা টাঙানো রয়েছে। টেবিলে বাতিটা জ্বলছে। কিন্তু উঠতে যে সে আর পারছে না। সে পাশ ফিরে শুয়েছিল।

পরের দিন সে যখন উঠল তখন শরীরটা ভার, মাথায় যন্ত্রণা, দেহে যন্ত্রণা। শরীর মন সব যেন ঝিমঝিম করছে। কি হল তার? ডাকলে—অণিমাদি।

পাশের ঘরেই থাকে অনিমাদি। সাড়া দিলেন—কি?

—এস না ভাই একবার। দেখ না আমার কি হল? বড্ড খারাপ করছে শরীর।

—এ যে বেশ জ্বর রে। কপালে হাত দিয়ে বলেছিলেন অণিমাদি। তারপর তার আর কিছু মনে নেই।

সেই জ্বর বত্রিশ দিন। সুস্থ যখন হল তখন চল্লিশ দিন। সেদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। একালের চিকিৎসা—উপবাসের চিকিৎসা নয়। কঙ্কালসার হয় নি, তবে রোগা হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকেছিল অণিমাদি।—কি দেখছিস? কত সুন্দর হয়েছিস?

—সুন্দর হয়েছি? তোমার কি সব তাতেই ঠাট্টা?

—উঁহু উঁহু। শিল্পীর কথা, খোদ বিনো-দা বলেছেন। মায় তোর ছবি তুলে নিয়ে গেছে। ফটো।

—মানে?

—বত্রিশ দিনে তোর জ্বর ছাড়ল। তুই অঘোরে ঘুমুচ্ছিস, কাত হয়ে শুয়ে আছিস, মুখটা একটু পিছনের দিকে হেলে গেছে। হাত দুখানা প্রায় জোড়হাতের মত; চুলের তো পাঁজা, সে খোলা, মাথার উপরদিকে ছড়িয়ে আছে। বিনো-দা কলকাতা গিয়েছিলেন ফিরে এসেই বরাবর এলেন তোকে দেখতে। আমি পাশে বসে, বললাম, সকালবেলা জ্বর ছেড়ে গেছে। উনি একদৃষ্টে তোকে দেখছিলেন, আমাকে বললেন, জানালাগুলো খুলে দিন তো। বললাম, রোদ্দুর আসবে। বললেন, সে তো পরে বন্ধ করলেই হবে। বলে নিজেই জানালা খুলে দিয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, এখানে আসুন। এইবার দেখুন। বললাম, কি দেখব?—নীরাকে কি সুন্দর লাগছে। ওয়াণ্ডারফুল! শুয়ে আছে দেখুন! ঠিক যেন সতী সদ্য দেহত্যাগ করেছেন। ওয়াণ্ডারফুল! বলেই গলায় ঝোলানো ক্যামেরা তুলে ক্লিক্ ক্লিক্ করে দিলেন। তারপরই আবার ওদিকে সেই কাণ্ড! দেখবি বোধ হয় সতীর দেহত্যাগ ছবি হবে।

মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা কিসের খোঁচা লেগেছিল। মুহূর্তে সারা চিত্তটা বিমুখ হয়ে উঠেছিল। কেন? কেন? সতীর দেহত্যাগের ছবির জন্য তার ছবি কেন? শক্তি থাকলে সে তখনই যেত। কিন্তু যেতে পারে নি। বিকেলবেলা বিনো-দা এলে বলেছিল, ওভাবে আমার ফটো নিয়ে ছবি আঁকবেন কেন?

বিনো-দা বলেছিলেন, সেটা দুর্লভ মুহূর্ত, ছবিটা নিয়ে রেখেছিলাম। আঁকলে তোমার অনুমতি না নিয়ে আঁকতাম না। ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু পারলাম না। মনে হল তোমাকে যেন মেরে ফেলছি। অন্তত মৃত্যুকামনা করছি।

বড় ভাল লেগেছিল কথাটা। সব উত্তাপ জুড়িয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে নীরা গাঢ়কণ্ঠে বলেছিল, আমি এবার চলে যেতে চাই বিনো-দা! আমি এখানে—

—হ্যাঁ। শান্তি পাচ্ছ না। সহ্য করে থাকতে পার না?

—না।

হাসলেন বিনো-দা। তারপর বললেন, জোরই বা কোথায় আমার? যাবে। তবে সে ব্যবস্থা আমিই করব অন্তত সেটুকু ভার আমাকে দিয়ো। একখানা দরখাস্ত লিখে টাইপ করিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সই করে দিয়ো। সরকারী স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে শিশুশিক্ষা

সম্পর্কে পড়াশুনো করে এস। তোমার আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চাই।

সে উঠে তাঁকে প্রণাম করেছিল। তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে পায়ের তলায় বসিয়ে তার চুলের রাশির খানিকটা মুঠোয় পুরে বলেছিলেন, শোন একটা কথা বলব।

—বলুন।

—বিচলিত হবে না যেন।

সেদিন সে এমনি নাটক আশঙ্কা করেছিল। ভুরু কুঁচকে প্রতীক্ষা করেছিল সে। সেদিন হলে মৃদু দৃঢ়স্বরে একটি কথায় শেষ করত।—না।

—দাদু নেই।

—অ্যাঁ!

—না। না। চঞ্চল হতে নেই। কাঁদতে নেই তাঁর জন্মে। তিনি বারণ করে গেছেন সকলকে।

উঠে গেলেন। যাবার সময় হেসে বলে গেলেন, আমার মৃত্যুতেও কেঁদো না। যেখানেই থাক। আমিও তাই বলে যাব সকলকে।

কি নিষ্ঠুর মানুষ! সে কাঁদে নি। আকাশপানে চেয়ে বসে ছিল। যাবার পথে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলেছিলেন—আর একটা খবর বোধ হয় জান না, প্রতিমা এখন এখানে নেই। তোমার অসুখের সময়—আবার তার শরীরটা বেশী খারাপ হওয়ায় তাকে চেঞ্জে পাঠিয়েছি। পুরী গেছে সে।

কিন্তু সেকথা তার মনে ঠাঁই পায় নি। সে ভাবছিল দাদু নেই! আর বিনো সেন কি আশ্চর্য মানুষ! নিষ্ঠুর। আসক্তিহীন।

* * *

দিন পনের পরেই প্রতিমা ফিরে এল। সে বিনো সেনকে রেখে থাকতে পারবে কেন? অণিমাদি অন্তত তাই বললেন। শেষে বললেন—মরণ! তারপর নীরাকে বললেন—তা তুই যা না চেঞ্জে। না, তুইও পারবি নে প্রতিমা এখানে থাকতে?

নীরা ম্লান হেসে বললে—আমি একেবারেই যাব অণিমাদি। দরখাস্তের উত্তরটা এলেই চলে যাব।

—বিলেত যাবি?

—হ্যাঁ।

তারপর এ ক'টা মাস সে সেই দরখাস্তের উত্তরের অপেক্ষা করেই রয়েছে এখানে। এর মধ্যে প্রতিমার মনের অসুখ দেহকে চেপে ধরছে। সে বড় ক্লান্ত বড় ক্লিষ্ট। বিনো-দা তাকে বিশ্রাম দিয়েছেন। বিশ্রাম করো। প্রতিমা ঘুরে বেড়ায় উদ্‌ভ্রান্তের মত। মায়া হয়।

হঠাৎ আজ—বিনো সেনের জন্মদিন। জন্মদিন প্রতিবারই প্রতিপালিত হয়। উদ্যোগ করেন অণিমাদি। এবার সে ভার নিয়েছিল। সে চলে যাবে, আসছে জন্মদিনে থাকবে না। তাই তার মনের মত করে সব করেছিল। নিজে মালা গেঁথেছিল; নিজে অভিনন্দন রচনা করেছিল। লিখেছিল, 'তোমার জীবনকেন্দ্রে আছে একটি অমৃতবিন্দু—সে বিন্দু আজ সিন্ধুর

মত করুণাতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত। তোমার জন্মমুহূর্তে জন্মভূমি তোমার ললাটে পরিয়ে দিয়েছিলেন বৈরাগ্যের তিলক, তুমি জন্ম-বৈরাগী। কোন বন্ধনে তুমি বাঁধা পড় না, অথচ সকলকে তুমি বাঁধো এক অচ্ছেদ্য গভীর বন্ধনে। মন তোমার রামধনুর সপ্তবর্ণের ভাণ্ডার; তোমার তুলিতে তুমি সৃষ্টি কর অপরূপের। রূপ তোমার পায়ে এসে নিজেকে অঞ্জলি দেয়।'

কথাটা সে প্রতিমাকে স্মরণ করেই লিখেছিল। কিন্তু বিনো সেন—। বিনো সেন ভাবলেন নীরা বুঝি নিজের কথাই লিখেছে।—অমনি বিদায়ের এই নাটকীয় মুহূর্তটি বেছে নিয়ে তাঁর লালসামদির উচ্ছিষ্ট জীবন নিয়ে এলেন তার কাছে—নাও নীরা গ্রহণ কর।

মনে পড়ছে—

বিনো সেন যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠে গেলেন সভার শেষে। বোধ করি ওখানেই একটা নাটক করবার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। চতুর বিনো সেন সেটাকে দমন করেছিলেন তখন। তারপর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বললেন, আমায় যেন কেউ না ডাকে। সারাটা দিনের পর সন্ধ্যায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন নীরার বারান্দায়। চমৎকার ক'রে ছ'কে নিয়ে এসেছিলেন নাটকের একটি দৃশ্য। মিলনান্ত নাটকের দৃশ্য। হায় বিনো সেন—তুমি নীরাকে চেন নি? সে কঠিন। সে উচ্ছিষ্টভোজী নয়। তার মূল্য অনেক। যাক। বিনো সেন বারান্দায় এসে ডেকেছিলেন—

—নীরা।

—আসুন। আপনি এমন করে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ভাবলাম শরীর খারাপ। আবার ভাবলাম, হয়তো অন্যায় কিছু লিখেছি। বলেছি।

বিনো সেন বিচিত্র দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে বলেছিলেন—না।

—তবে ?

—এটা ধর আগে। তোমাকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে, তোমার সেই স্কলারশিপের জন্য। একখানা খাম এগিয়ে দিলেন। সে কি বলবে ভেবে পেলে না। কিন্তু একটা বেদনা যেন সে অনুভব করলে। চলে যাবে সে এখান থেকে।

—তারপর—। চুপ করে গেলেন বিনো সেন।

—বলুন।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, এই চিঠিখানা—

—কার চিঠি ?

—পড়ে দেখো। ধর। বলেই তিনি উঠে পড়লেন।—প্রতিমা আজ একটু বেশী অসুস্থ, আমি যাই দেখে আসি।

চিঠি হাতে করেই নীরা তাঁর দিকে তাকালে—প্রতিমা। প্রতিমা। প্রতিমা! চাঁদে কি কলঙ্ক থাকেই!

"নীরা,

বহু দ্বন্দ্ব করে শেষে নিজেকে নিঃসংশয়ে যাচাই করে তোমাকে পত্রখানা লিখছি। আমাকে

অভিনন্দন জানিয়ে তুমি বললে, 'তোমার জন্মমুহূর্তে জন্মভূমি তোমার ললাটে পরিয়ে দিয়েছিল বৈরাগ্যের তিলক, তুমি জন্ম-বৈরাগী। কোন বন্ধনে তুমি বাঁধা পড় না অথচ সকলকে বাঁধো অচ্ছেদ্য গভীর বন্ধনে।' বুকটা আমার হাহাকারে ভরে উঠল। এ হাহাকার চিরদিন আছে নীরা। যারা অভ্যাসের বশে পাথর না হয়ে যায় তাদের সবারই এ হাহাকার থাকে। ইদানীং আমি যেন সেটা বেশী করেই অনুভব করছি। প্রতিক্ষণে বিশেষ করে যখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকি তখন আমি অনুভব করি আমার কেউ নেই। কেউ আমার নয়। আপনার, একান্ত আপনার কাউকে যে আমি চাই সে সত্য আমার অন্তরাত্মা তারস্বরে আমাকে বলছে। আমার আত্মা ব্যাকুল। তোমাকে আমি চেয়েছি। অনেকদিন থেকে চেয়েছি। কিন্তু— আজ যখন চিঠি এল, বিদেশে যাবে তুমি, সব সম্পর্ক কেটে যাবে, তখন আর যে আমার নিবেদন না-জানালে নয়। আমার আত্মা শতবাহু বিস্তার করে তোমাকে চায় তার বাহু-বেষ্টনের মধ্যে, হৃদয়ে চায়, মনে চায়। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

তোমাকে আমি বিবাহ করতে চাই। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস। প্রতিমা কোন বাধা নয়—। তার কথা তোমাকে—।"

আর নীরা পড়ে নি। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। বিনো সেন, বিনো সেন—প্রতিমার প্রতি অনুরক্ত বিনো সেন বলছে—প্রতিমা কোন বাধা নয়! আজ এই কয়েক বৎসর প্রতিমার বিনো সেন—বিনো সেন ক'রে পাগলিনী হওয়া—বিনো সেনের প্রতিমা-পূজা সে যে স্বচক্ষে দেখেছে! তারপরও লিখেছেন—প্রতিমা কোন বাধা নয়! হঠাৎ তার সামনে বিনো সেনের একটা কদর্য চেহারা বেরিয়ে পড়ল। তার চিত্তলোকে পুরানো তেজ যেন আগ্নেয়-গিরির মত ফেটে বের হল।

হাতে চিঠি দুমড়ে মুঠোয় ধরে হন হন করে—যেন জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।—লম্পট! ভ্রষ্ট! প্রতিমার জীবনটা নষ্ট করে আবার—। এসে উঠল বিনো সেনের বারান্দায়—।

দুই হাতে দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে সে দাঁড়াল বিনো সেনের সামনে।

* * *

পরমুহূর্তে শোনা গেল, বিনো সেন যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, আমি ক্ষমা চাচ্ছি, আমার অন্যায় হয়েছে। আমাকে ক্ষমা কর।

—না—না—না। চীৎকার করে উঠল নীরা—আপনি লম্পট, আপনি ভ্রষ্ট, আপনি মুখোশধারী।

রাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে সে চীৎকার ছড়াচ্ছিল। গোটা আশ্রমটা চকিত হয়ে উঠল। কি হল।

বিনো সেন আর্তনাদ করছেন, আমাকে ক্ষমা কর। আমি হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাচ্ছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

ক্ষমা! ওই প্রতিমা—এই চিঠি!

স্তব্ধ হয়ে গেলেন বিনো সেন। অপমানে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিয়ে সে বেরিয়ে এল ঘর

থেকে। তুমি ভণ্ড, তুমি লম্পট। নীরা যুদ্ধ করে অনেক জয় করে এসেছে। এখানেও সে হারবে না। সে জিতবে।

* * *

সে জিতেছে। সে হারে নি। আশ্রমের সকল লোক দেখেছে বিনো সেনের হেঁট মাথা, অপরাধীর মত স্তব্ধতা। ঈশ্বর সাক্ষী।

বিনো সেন সেই পরাজয়কে ঢাকবার জন্ত—সকলকে বললেন—নাটক তো শেষ হল—এবার সব যাও।

অর্থাৎ একটা রঙীন কাপড়ের পর্দা ফেলে দিয়ে—সবটা ঢেকে দিতে চাইলেন। কাল সকালে বলবেন—অভিনেত্রী নীরা চলে গেছে। সব ঝুট। অভিনেত্রী অভিনয় করে গেল।

—দিদিমণি—

ডাকছে সামপানি-চালক। ওঃ এ যে দুর্গাপুর ব্যারাজের একেবারে মুখে পড়েছে। মানসমঞ্চে জীবন-নাটকের অভিনয়ের মধ্যে একেবারে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

নাটক! বিনো সেন জীবন-নাটকই বটে। তবে জীবন-নাটকে সবাই তো নায়ক-নায়িকা নয়, তারা পার্শ্বচরিত্র, কাটা সৈনিক, দূত—তাদের ভূমিকায় একটু চেঁচামেচি হলেই তারা ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে পড়ে। তাদের তখন নাটুকে বললে গালাগালি হয়। উপহাস হয়। নীরা নায়িকা। তার ভূমিকায় সে আজ জ্বলতে পেরেছে—উচ্চকণ্ঠে সদর্পে তোমাকে অপরাধী ঘোষণা করতে পেরেছে বলেই সে বিজয়িনী। তোমার ভণ্ড স্বরূপ সে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়ে সে চলল—চলল নূতন অঙ্কে—নূতন পটভূমিতে।

—পুল পারাইতে পয়সা লাগবেক দিদিমণি।

একটা টাকা তার হাতে দিল নীরা।

ওপারে নূতন দুর্গাপুর। ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে সারি সারি।

নূতন ভারতবর্ষ। যুদ্ধোত্তর পৃথিবী। তার জীবনের নূতন পটভূমি।

হায় বিনো সেন।

তুমি যদি প্রতারক ভণ্ড না হতে! তোমাকে যে অনেক শ্রদ্ধা করেছিল নীরা। তোমার ওই প্রতিমা-প্রতিমা-প্রতিমা করা দেখেও শ্রদ্ধা করেছে। বরং গভীরতর শ্রদ্ধা করেছে ভালবাসা দেখে! তুমি মাটির ঠাকুর। পড়বা মাত্র ভেঙে গেলে!

না। আপসোস করো না নীরা। নূতন পৃথিবীতে ঢুকছ। নূতন জীবন। ভেবো না আর বিনো সেনের কথা!

মুছে দাও। ডাস্টার দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের খড়ি দিয়ে আঁকা ছবির মত মুছে দাও।

যাচ্ছে না। মন হিংস্র। আঘাত খেয়ে হিংস্র না হয়ে পারে না যে, বার বার আসছে ওই মুখ।

বেশ। বার বারই মুছবে সে।

গাড়িখানা কংক্রীটের ব্রিজ বেয়ে চলল ওপারের দিকে।

পনেরো

(শেষ অঙ্ক)

যবনিকা আবার উঠল।

জীবন যেখানে নাটক—সেখানে নাটকীয় গতিবেগ জীবনে সঞ্চারিত হয়—সেখানে তো ইচ্ছে করলেই মধ্যপথে নেপথ্যে প্রস্থান করা চলে না। ঈশ্বর থাকুক বা না-থাকুক—অদৃশ্য নাট্যকারের মত একটি বিচিত্র শক্তির সত্তা আছে। অথবা পৃথিবীর কার্যকারণের গতিবেগের মত মানুষের জীবনেও একটি স্বয়ংক্রিয়তা আছে—যা তার গতিবেগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটি নির্ধারিত গতিতে চলে—চলতে হয়—থামার উপায় নেই। মধ্যপথে যেখানে থামে সেখানে ঘটে একটা আকস্মিক কিছু! বিস্ফোরণের মত আকস্মিক প্রবল একটা সংঘটনে শেষ হয়। সেখানে প্রশ্ন করার কিছু থাকে না। তর্ক করা চলে না—কেন এমন হল! নীরার জীবনে কোন আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে নি, কোন দুর্ঘটনায় তার জীবন-নাট্যে ছেদ পড়ে নি। তাই দু-বছর পর আবার তাকে অকস্মাৎ দেখা গেল দমদম এরোড্রোমের দৃশ্যের পটভূমিতে। সে ইংল্যাণ্ড থেকে পূর্ব-দিগন্ত-যাত্রী একখানা প্লেন থেকে নামল।

ইংরিজী ১৯৫৮ সাল। অক্টোবর মাস।

ঠিক পুজোর পর। শরতের আকাশে তখনও সাদা হাল্কা বিচ্ছিন্ন মেঘপুঞ্জের যাওয়া-আসার পালা শেষ হয় নি। নীরা নামল—কাঁধে স্ট্র্যাপ-ঝোলানো ব্যাগ, গায়ে হাল্কা রংঙের পাতলা গরম কাপড়ের একটা ওভারকোট; কালো মেয়ের মুখে শীতপ্রধান দেশের বর্ণোজ্জ্বলতা কিন্তু ঠোঁটে লিপস্টিক নেই—রুজ পাউডার নেই। বরং মুখে চোখে যেন একটি শীর্ণতা। তবে দুটি ভ্রূর সংযোগস্থলে একটি তিক্ততার কুঞ্চন ফুটে রয়েছে, সেটি ছোট কুমকুমের টিপেও ঢাকা পড়ে নি। আয়ত চোখ দুটির দৃষ্টিতে একটি শাণিত দীপ্তি। একটি প্রচ্ছন্ন রুক্ষতার তীব্রতা সকল মানুষকেই যেন থমকে দাঁড়াতে বলে। কিন্তু তার উপরে যেন একটা ছায়া পড়েছে। বর্ষার দিগন্তে জলভারাবনত ঘন কালো মেঘ উঠলে—নির্মেঘ মধ্য আকাশের মধ্যাহ্নসূর্যের দীপ্তির উপরেও যেমন একটা ছায়া পড়ে তেমনি ছায়া। দু-বছর পর সে ইংলণ্ডে পড়া শেষ করে ফিরছে। লীডস ইউনিভারসিটিতে শিশু-শিক্ষায় বিশেষজ্ঞতা অর্জনের জন্য যে সরকারী স্কলারশিপের কাগজপত্র বিনো সেন দিতে এসে তাঁর সেই প্রণয়পত্র দিয়েছিলেন—সেই স্কলারশিপের পড়া শেষ ক'রে সে দু-বছর পর আজ ফিরে এল।

বেশ খানিকটা রোগাও হয়ে গেছে সে। এবং আরও খানিকটা গম্ভীর। মনস্তাত্ত্বিকেরা কেউ বলতে পারে, কার্যকারণে হয়তো। না সে গম্ভীর নয়—কিছুখানি বিষণ্নভাবে রূঢ়। যাক, ঠিক এই সময়টিতে অর্থাৎ প্লেন থেকে যখন নামল তখন তার মনের এই বিচিত্র প্রতিফলনটুকু আশ্চর্যরূপে স্পষ্ট, অত্যন্ত অকপটভাবে ব্যক্ত তার মুখে চোখে সর্ব অবয়বে; তার পদক্ষেপে পর্যন্ত।

কারণ ছিল—।

ইংল্যাণ্ড থেকে ার পথে —এই দীর্ঘ সময়টাতে—আবার একবার সে জীবনটা খতিয়ে

দেখতে চেষ্টা করেছে। প্লেনের মধ্যে নিঃসঙ্গ অবসরে—আবার একবার তার মানসমঞ্চে জীবন-নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে। তার তখন এই মুহূর্তটিতে সত্ত নাটকাভিনয় দেখে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে-আসা দর্শকের মত একটা আচ্ছন্ন ভাব।

তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত সেই পুরানো নাটক। নূতন অভিনয়ে কোন কাটছাঁট হয় নি, বাহুল্য মনে হয় নি—মিথ্যা বা অবাস্তব মনে হয় নি, ব্যাখ্যায়-রূপায়ণে পুরানো নূতন নাট্যবস্তু অভিনয় এক এবং অভিন্ন, সুতরাং নির্ভুল।

শুধু তৃতীয় অঙ্ক নূতন। অসমাপ্ত তৃতীয় অঙ্ক।

সেদিন দুর্গাপুরের ব্যারেজের সংলগ্ন ব্রিজের মুখে দ্বিতীয় অঙ্কের যে যবনিকা পড়েছিল—সেই যবনিকা এই পথের মধ্যে প্রথমবার উঠেছে।

না। প্রথমবার নয়। এই দু-বছরের মধ্যে বিদেশে থাকবার সময় উঠেছে, উঠতে চেয়েছে। কিন্তু কখনও শুরু হয়েই থেমে গেছে—না হয় উঠতে উঠতে ওঠে নি। কাজ এসেছে কখনও, কখনও তিক্ততায় অথবা বেদনায় মনে হয়েছে—থাক। কি হবে, যা হয়ে গেছে তার অভিনয় দেখে? থাক। ও থাক।

এবার আসবার পথে প্লেনে যবনিকা উঠেছিল—উঠেছিল শুধু অবসরের সুযোগে নয়—মনের তাগিদে। অকস্মাৎ এই বিদেশেও বিনো সেন—অক্ষম আক্রোশে তার সর্বাঙ্গে রঙের তুলি ছিটিয়ে তাকে উত্ত্যক্ত করেছেন। দূরান্তরে থেকেও সে শুনেছে বিনো সেন বলছেন—নাটক করে সেদিন তুমি যে অপবাদ আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে মাথাটা হেঁট করতে চেয়েছিলে—সে মাথা হেঁট হবার নয় গো শ্রীমতী নীরা। সেটা উঁচুই আছে। তোমার নাটুকেপনার আড়ালে লুকনো স্বরূপকে আমি এঁকে দিয়েছি।

এবার তার শেষ বোঝাপড়া করতে হবে তাকে। হ্যাঁ, করতে হবে। তার জীবনের নাটক শেষ হবে তার জীবনের শেষ মুহূর্তে কিন্তু এই তৃতীয় অঙ্কে তোমাকে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। নিষ্ঠুর ক্ষমাহীনা নীরা কাউকে ক্ষমা করে নি—তোমাকেও করবে না। তাই তার আগে—একবার অভিনয় দেখে খতিয়ে নিচ্ছিল। যা করেছে বিনো সেন—তাও কি তার অধিকার ছিল? যে রূপকে তার স্বরূপ বলে ব্যক্ত করেছে—সে কি সত্য?

রাত্রে প্লেন উঠেছে তখন পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ঊর্ধ্বে। তখন এয়ার-হোস্টেস্‌দের আপ্যায়ন হয়ে গেছে। প্লেনে বিপদের সময় কি ভাবে আত্মরক্ষার জন্ম লাইফভেস্ট পরে জানালা খুলে লাফ দিয়ে পড়তে হবে সে সব হয়ে গেছে। মনটা বারেকের জন্ম চঞ্চল হয়েছিল—তারপর একটু হাসিও পেয়েছিল। হোক না তাই। কেউ কাঁদতে নেই, তারও কাউকে মনে পড়বে না;—কিন্তু সেই মুহূর্তে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েছিল—মনে পড়েছিল বিনো সেনকে; বিনো সেনের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে। সেটা না করে মরতে মন সায় দেয় নি। হ্যাঁ, করতে হবে ওটা।

তারপর আলো কমে গেল। ক্ষীণ জ্যোতি ক'টি আলো যেন স্বপ্নালুতার আবছায়া সৃষ্টি করে জ্বলতে লাগল। যাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়ল। শোনা যাচ্ছে শুধু প্লেনের একটানা গর্জন। বাইরে অন্ধকার। উপরে আকাশে নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। ঝলমল করছে। চাঁদ নেই।

থাকলে সেও ছুটত সঙ্গে সঙ্গে। মহাশূন্যে মহা নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়ে একটানা গর্জন করে প্লেন ছুটছে। বিশাল ডানা দুটোর পিছনে লাল নীল সাদা আলো পর পর জ্বলছে নিভছে।

এরই মধ্যে উঠল যবনিকা।

সেই প্রথম অঙ্ক, সেই দ্বিতীয় অঙ্ক। এক অভিন্ন।

তারপর? তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা উঠবে কোথায়? দুর্গাপুরে? না। দুর্গাপুর স্টেশন থেকে কলকাতায় পৌঁছুনো—হোটেলে ওঠা, এগুলো অঙ্কান্তরের বিরতির মধ্যেই থাক।

কলকাতায় হোটেল ছাড়া কোথায় উঠবার জায়গা তার ছিল? দাদু নেই। কোথায় কার কাছে যেতে পারত? নিজের বাড়ি? জাঠতুত ভাইদের কাছে? না। সে-কদর্যতার মধ্যে যেতে তার মন চায় নি। যা মৃত, যাকে সমাধি দিয়ে চলে এসেছে অথবা চিতায় তুলে আগুন দিয়ে চলে এসেছে তা খুঁড়ে দেখতে অথবা ছাই ঘেঁটে দেখতে তার প্রবৃত্তি হয় নি। বরং কোন তীর্থে গিয়ে পিতৃপক্ষে তর্পণ করবে—যে চাস্মাকং কুলে জাতাঃ অপুত্রো গোত্রিনো মৃতঃ—অথবা যারা অপঘাতে মরেছে আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমার জ্ঞাতি—তারা আমার এই মাটিতে ফেলে দেওয়া জলে আর এই কাপড় নেঙড়ানো জলে তৃষ্ণা নিবারণ কর।

হোটেল ভাল। সে নীরা আজ সে নয়। আজ তার থেকে অনেক সক্ষম—অনেক সবল-আজ সে পৃথিবীর বুকে অবাধ বিচরণে বেড়াবে, তাকে জানবে, শিক্ষা নেবে, তার জন্য পা বাড়িয়েছে সে—তার হোটেলেই ভাল।

হাতে তার টাকা তার অবস্থার পক্ষে ভালই ছিল। ওখানকার তিন বছরের মাইনের টাকা—প্রভিডেন্ট ফাণ্ড নিয়ে প্রায় আড়াই হাজার টাকা। স্থির সে করেই এসেছিল—ভবিষ্যৎ। যে স্কলারশিপ সে পেয়েছে—তাই নিয়ে সে ইংল্যাণ্ড যাবে। শিক্ষাশেষে ফিরে আসবে ভারতবর্ষে। এই হবে তার জীবনের ব্রত। বিবাহ কল্পনা চুকে গেছে অনেকদিন। এই ক'বছরে যদিই তার মূল থেকে আবার কোন শাখা বের হবার উপক্রম করছিল—যা সে নিজে অনুভব করতে পারে নি—তাও নিষ্ঠুর দাওয়ের কোপে নির্মূল করে দিয়েছে বিনো সেন। বিনো সেনের সঙ্গে বিবাহ কামনার কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু বিনো সেন সব পুরুষের উপরেই ঘৃণা ধরিয়ে দিয়েছেন। বিবাহ নয়। ঘর নয়। নূতন যুগের নারী—নূতন তার কল্পনা, নূতন তার জীবন—নূতন তার পথ।

দু-একবার মনে হয়েছিল—বিনো সেনের উদ্যোগে পাওয়া স্কলারশিপ সে নেবে না। কিন্তু না। কেন নেবে না? এই স্বাধীন দেশের মেয়ে সে—তারও তো অধিকার আছে। সে তো পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে তবে যাবে। তবে পাবে।

এই সপ্তাহে গিয়েই তো দিল্লীতে তাকে ইণ্টারভিউ দিতে হবে। এদেশে জন্মের অধিকারে নিজের যোগ্যতার অধিকারে যা তার প্রাপ্য সে তা নেবে না কেন?

হোটেলে উঠেছিল।

দাদুদের বাড়ি একদিন গিয়েছিল।

সে স্মৃতি মর্মান্তিক। চাঁদহীন রাত্রির আকাশ নয়, সমস্ত তারা মুছে যাওয়া কালো একটা বেদনার সমুদ্রের মত শূন্যমণ্ডল।

পালিয়ে এসে বেঁচেছিল সে।

বড় মানুষদের সংসার করা উচিত নয়। একটা জাতির জীবনে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী নেতাজী যাওয়ার ধাক্কাও কোন রকমে সয়ে যায়। কিন্তু একটা সংসারের পক্ষে—এমন মানুষের তিরোধানে সেই দ্বারকার কাহিনী পুনরাবৃত্তি ঘটে। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গবিক্ষোভে দ্বারকাকে আপনার কুক্ষিগত করে নিয়েছিল। মানসম্মান শুধু নয়—এমন ক্ষেত্রে যেন আলোবাতাসেরও অভাব ঘটে। চোখের লবণাক্ত জল সমুদ্রে পরিণত হয়।

এইদিন তার আপসোস হয়েছিল কাঁদতে না-পারার জন্য। সমস্ত জীবন না-কেঁদে, কান্নাকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে বেঁধে—এমন স্বভাব হয়েছিল তার যে বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেও বাঁধ দেওয়া কান্নার সরোবরে কয়েক ফোঁটা জলও কোনমতে বেরিয়ে আসতে পারে নি। অথচ তার সে কি মাথা কোটা! নিজেকেই নিজের পাথর কি মরা মাটি মনে হয়েছিল।

মনে হয়েছিল কাঁদতে সে চায়, চাচ্ছে—কিন্তু পারছে না।

প্লেনে আসতে আসতে সেই মুহূর্তটিতে মনে হয়েছিল—কাঁদতে সে চায়, কাঁদতে পারলে সে যেন বাঁচে, কিন্তু কাঁদতে সে পারছে না!

*　　*　　*　　*

যবনিকা উঠছে—হাঁ, নাটকীয় ঘটনা বটে। এইখানেই যবনিকা যেন আপনি উঠে গেল।

স্মৃতি-প্রযোজক ভুল করে না।

যবনিকা উঠছে কলকাতার রিজ্যন্যাল পাসপোর্ট আপিসে। ব্রেবোর্ণ রোডে। পাস্-পোর্টের জন্য গিয়েছিল। দিল্লীতে পরীক্ষা ভালই হয়েছিল। অবশ্য বিভাগীয় সেক্রেটারি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনি বিনয় সেনের আশ্রমে কাজ করছিলেন! ওখান থেকে B, A, পাস করেছেন?

সে বলেছিল—হ্যাঁ।

—ছেলেদের পড়ানোর কাজ তা হ'লে আপনার ভাল লেগেছে?

—হ্যাঁ।

—শ্রী সেন আপনার সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন দেখছি। একটি সার্টিফিকেট তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন।

ভাল লাগে নি কথাগুলি তার। সে চুপ করেই ছিল।

স্কলারশিপের সংবাদ এসেছিল দিন পনেরোর মধ্যে। সরকারী তৎপরতায় সে একটু বিস্মিত হয়েছিল। অবশ্য দিল্লীর তৎপরতা সত্যই প্রশংসার। প্রদেশের মত নয়। যাক।

এ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পটভূমি পাসপোর্ট আপিসের রিজন্যাল অফিসারের ঘরের পাশের ঘরখানি। Visitors' Waiting Room; ঘরখানা ছোটই; অনেকগুলি চেয়ার, একখানা নিচু গোল টেবিল। অনেকগুলো পুরনো সাময়িকপত্র। চীনা, বার্মিজ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ইয়োরোপীয়ান ভদ্রলোক কয়েকজন—দুটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে—আর এদেশের টাই-বাঁধা

স্যুটপরা পুরুষ আর লিপস্টিক মাখা চুল বব্ করা, গগল্‌স্-পরা মেয়ে। তারা সিগারেটও খায়।

একপাশে একখানা চেয়ার টেনে সে বসে পড়েছিল। হঠাৎ চোখের গগল্‌স্ খুলে—মুখের সিগারেটটা নামিয়ে একজন এদেশী মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—নীরা ?

কণ্ঠে তার বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

নীরার মন ব্যস্ত হয়ে ছড়িয়েছিল তার নিজের জীবনে—ভবিষ্যতের ভাবনায়। তার সাহস অনেক—অভাব নেই—তবু দেশান্তরের ভবিষ্যৎ সে কল্পনা করতে চেষ্টা করছিল। মেয়েটির কথায় নীরার ছড়ানো মন সংহত হয়ে সচেতন হল—স্থান-কাল-পাত্রের অভিমুখে। মুহূর্তে সে চিনলে এবং সে সবিস্ময়ে বলে উঠল—এনা বউদি!

—হ্যাঁ। ওরে বাপরে! কত দিন পর বল তো ?

—পাঁচ বছর পার হয়ে গেছে!

—বাঃ, কি অপরূপ হয়েছ তুমি নীরা! আমি বলি নি তোমাকে ?

—তা বলেছিলে। কিন্তু রূপ নিয়ে আজও মাথা ঘামাই নি, আর আয়নাতে নিজেকে দেখতে সময় পাই নি!

—তা না পাও, কেউ বলে নি ?

ধ্বক ক'রে জ্বলে উঠেছিল নিভন্ত ক্ষোভ। কিন্তু নিজেই সেটাকে চাপা দিয়ে বলেছিল—ওসব ছাড়ান দাও। আমি স্কুলের মাস্টারী করতাম। সুতরাং ও সব আমাদের jurisdiction-এর বাইরে।

—মিছে কথা। সন্ন্যাসিনীর রূপ থাকলে তার কাছেও যদি কেউ গিয়ে বলে—এত রূপ তোমার—

বাধা দিয়ে সে বলেছিল—থাম বউদি।

—দাঁড়াও। একটা কথা বলে নিই। আমি আর তোমার বউদি নই। আমার সঙ্গে তাঁর divorce হয়ে গেছে।

—divorce ?

—হ্যাঁ, বনল না। তা ছাড়া অজিতের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। নানান কাণ্ড—সে এক মহাভারত। যাকগে। এখন তুমি এখানে, কি ব্যাপার ? পাসপোর্ট আপিসে ?

নীরা বলেছিল—ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের একটি স্কলারশিপ পেয়েছি—ইংল্যাণ্ড যাব দু-বছরের ট্রেনিং নিতে।

—বল কি ? চল চল একটু বাইরে চল ভাই। শুনি। তুমি ভাই দেখালে খুব! ওঃ!

বাইরে একটু ওরই মধ্যে নিরালায় নীরার কথা শুনে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—তোমাকে ওরা চেনে নি, আমি চিনেছিলাম। অবশ্য সবটা মানে এতটা নয়। ওঃ, তুমি অবাক করেছ আমাকে! একবার শুধু একবার, যখন সোমেশবাবু অজিতকে বলেছিলেন—তোমার বোনের সঙ্গে যদি আমার ছেলের বিয়ে দাও তবে আমি ফিল্মের লোকসানটা কোম্পানীর বলে চালিয়ে নেব—তখনই—

একটু থেমে বলেছিল—কারণ আমার কথাতেই অজিত ফিল্মে নেমেছিল, সেইজন্যে লোকসান দেনার হেতু মনে হ'ত নিজেকে—। তখন তাই বলেছিলাম—ওর ভেতরে ছিলাম—। ঠিক তোমাকে এতটা আঁচ করতে পারি নি! যাকগে ভাই—আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি—

নীরা জিজ্ঞাসা করেছিল কয়েকটা কথা ভাইদের সম্পর্কে।

জ্যাঠাইমা মরেছে।

অজিতদা প্রায় সর্বস্বান্ত, এখন দালালী করে, বাড়ি বিক্রি করছে—এর মধ্যে বাড়িও ছেড়েছে একরকম। বস্তীতে একটা মেয়েকে নিয়ে থাকে। বাকী ভাইগুলোও তাই।

হঠাৎ নীরার আবার মনে হয়েছিল একটু কাঁদতে পারলে যেন সে বেঁচে যেত। কাঁদতে পারে নি। স্তব্ধ হয়ে একটা জানালার ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল।

এনাক্ষীও কয়েক মুহূর্ত চুপ হয়ে ছিল। একটা মমতা বোধ হয় তারও ছিল। মানুষ তো। তারপর হঠাৎ বললে—দেখ দারিদ্র্য আর অজিতের বিশ্বাসঘাতকতা দুটো সইতে পারলাম না একসঙ্গে। একটা হলে হয়তো সইত। বিয়েটা ভালবেসেই করেছিলাম। আবার চুপ করলে। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলেছিল—একটা খবর দিই তোমাকে। বিদেশ যাবে। কাজে লাগবে। অজিতেরা বাড়ি বিক্রি করছে—বললাম না? তা—তোমার তো অংশ আছে বাড়িতে। সেইজন্যে কেউ নিতে চাচ্ছে না—তোমার সই ভিন্ন। ওরা তোমাকে খুঁজছে। তুমি না-হলে একটি জাল মেয়ে খাড়া ক'রে বিক্রি হয়ে যেত। তুমি যাবা মাত্র টাকাটা পেয়ে যাবে। কালই যেয়ো, বুঝেছ! মোচড় দিলে বেশী পাবে। হাসি পেয়েছিল নীরার। এনাক্ষী যা বললে তাতে মনে হল—তখন পুরো না চিনলেও আজ সে তাকে চিনেছে। বললে—যাব। কিন্তু তুমি divorce তো করেছ—বিয়ে করেছ আবার?

—রাম কহো। আবার! বাবাঃ। খুব সাধ মিটেছে।

—যার সঙ্গে কথা বলছিলে ওটি কে?

—বন্ধু! ফিল্ম প্রডিউসার-ডিরেক্টার একজন। ফিল্ম ফেস্টিভালে ইয়োরোপ যাচ্ছে—আমাকে নিয়ে যেতে চাইলে—বললে, যাবে? বললাম, যাব। I am always a sport. খেলতে এসেছি খেলে যাব, না বলব কেন?

বেয়ারা এসে তাকেই ডেকেছিল—অফিসার তাকেই ডাকছেন।

কাজ তার সহজেই হয়ে গিয়েছিল। কাগজপত্র পরিষ্কার, সরকারী বৃত্তি; অফিসার বলেছিলেন, দিন পনেরোর মধ্যে পেয়ে যাবেন। কোন গোলমাল নেই।

বেরিয়ে আসবার সময় এনাক্ষী হাত নেড়ে বলেছিল—গুড লাক! বিলেত পর্যন্ত যদি যাই নিশ্চয় দেখা করব। তুমি কিন্তু যেয়ো দমদমে। ভুলো না। টাকাটা পেয়ে যাবে।

দৃশ্যান্তর হল। সেই পুরনো দমদমের বাড়ি। নতুন কাল—নতুন হাওয়া—এই ক'বছরেই জনাকীর্ণ হয়ে গেছে। বাগান ভেঙে রেফেউজী কলোনী হয়েছে। ছিটেবেড়ার ঘর—টালির চাল। আবার সুদৃশ্য পাকাবাড়িও অনেক হয়েছে। রাস্তাগুলি আঁকাবাঁকাই

আছে—কিন্তু পিচ পড়েছে। তাদের বাড়ির কাছটায় তো একটা বাজার বসে গেছে। চেনা শক্ত। এরই মধ্যে জ্যাঠামশায়ের পুরনো বাড়িটার চারিপাশে নতুনের খোলস পরানো বাড়িটা শ্রীহীন বিবর্ণ ধূলিধূসর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরনো দেওয়ালে নতুন পলেস্তারাতে নোনা ধরেছে। ঝুর ঝুর করে বালি সিমেণ্ট খসছে। বাইরে থেকেই বুঝা যায় একটা দিক সেই একতলাই আছে। সেইটেই তার দিক। অজিতদা বাড়িতে ছিল না। বাড়িতে ছিল সুজিত। তারও চেহারা ওই বাড়িটার দেওয়ালগুলোর মত ছাতাপড়া নোনাধরা।

সুজিত বেরিয়ে এসে বিস্মিত হয়েছিল—নীরা!

—হ্যাঁ।

সুজিতের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের অবধি ছিল না, থাকবারই কথা—কিন্তু তার সঙ্গে ছিল একটা দীনতা। সেটা নীরাকে স্পর্শ করেছিল। বাড়ির ভিতর গিয়ে চারিদিকটা একবার ভাল ক'রে দেখেছিল—শুধু মমতার টানে। সুজিতের বউকে দেখেছিল। বেশ মেয়ে—গৃহস্থঘরের—দুখসইয়ে—ঘরকন্নার কাজে পটু অনুরাগিণী মেয়ে, এরা দুঃখের ভাত সুখের সঙ্গে সাজিয়ে নিতে পারে; তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারে। সে তাকে চা করে খাইয়েছিল—ফাটা ডাঁটভাঙা কাপে। নীরার মনে পড়েছিল অজিতের সেই মূল্যবান চায়ের সেট।

মনের ভিতরটায় সেই ব্যথাটা অনুভব করেছিল। যেটা সে দাদুর বাড়ি থেকে অনুভব করতে শুরু করেছে। সুজিত দুঃখের কথা বলতে বলতে কেঁদেছিল। বলেছিল—মধ্যে মধ্যে মনে হয় নীরা—হয়তো তোর দীর্ঘ নিশ্বাসেই আমাদের লক্ষ্মী ঝড়েপড়ের চালের মত উড়ে গেল।

বড্ড লেগেছিল তার মনে। কিন্তু কাঁদতে পারে নি। একটু চুপ করে থেকে সে উত্তর দিয়েছিল—বিশ্বাস কর ভাই সুজিত—তুই আমার বয়সে সম্পর্কে বড়, পর নোস—আপন জ্যাঠতুত দাদা—তোকে ছুঁয়ে বলছি—আমি কোনদিন তোদের অমঙ্গল কামনা করি নি। আর তাই এত জোরে সামনে ছুটেছি যে পেছনের দিকে তাকিয়ে আপসোস করবার বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার সময় পাই নি কোন দিন। এই কদিন আগে আমি যেখানে কাজ করতাম সেখান থেকে কাজ ছেড়ে চলে আসবার সময় গাড়িতে বসে নিজের জীবনটা আগাগোড়া ভেবে দেখেছিলাম। কিন্তু তুই বিশ্বাস কর—রাগ হয়েছে সে-সব কথা মনে করে; কিন্তু একবার, তোদের অমঙ্গল হোক এ ভাবি নি।

বউটি বলেছিল—আমি তাই ওকে বলি ঠাকুরঝি! যা গল্প শুনি—তাতে সে মেয়ে শাপশাপান্ত করবে না। দোষ পরের উপর চাপিয়ো না; নিজেদের দোষগুলো সংশোধন কর। মদটদগুলো ছাড়। দুর্দশা ওই জন্যে। বাড়ি বিক্রি করবে—কর—টাকাকড়ি দেনা শোধ দিয়ে যেটুকু পাও নিয়ে—খাটো খাও।

ভারী ভাল লেগেছিল সরল মেয়েটির সাদামাটা কথাগুলি। সাদামাটা হোক—আশ্চর্যরূপে সত্য। সঙ্গে সঙ্গে সে বলেছিল—ঠিক বলেছ বউদি। খুব সত্যি কথা।

এই সময়েই এসেছিল অজিতদা।

বস্তীতে রাত্রিযাপন শুধু নয়—এখন একরকম সেইখানেই বাস তার। মধ্যে মধ্যে আসে। প্রয়োজনে। বাড়িতে থাকবারও তার উপায় নেই। পাওনাদারেরা ছেঁকে ধরবে। এরা

মোটা পাওনাদার নয়, এরা সব খুচরো পাওনাদার।

অজিতকে দেখে মনে হয়েছিল—এনাক্ষীর কোন দোষ নেই। সে ডাইভোর্স করে ঠিক করেছে। নেশাখোর অশ্লীল—কুৎসিত একটা লোক। সে তাকে দেখেই বলেছিল—মাই গড! তুই যে একেবারে ভেনারেবল লেডী হয়ে উঠেছিস রে। ওঃ—তুই যদি তখন আমার ছবিটায় নামতিস রে! ওঃ! আমিও এনাক্ষীর কথা শুনলাম না। শালা—বেটা ডিরেকটারের পাল্লায় পড়ে একটা পুরনো বুড়ীকে ছুঁড়ি সাজিয়ে—

সে ধমক দিয়ে উঠেছিল—অজিতদা!

অজিত চমকে উঠেছিল। ওঠবারই কথা। কিন্তু তার রুচিতেই ছোট হয়ে যায় নি—সব কিছুতেই ছোট হয়ে গেছে সে।

সুজিত বলেছিল—নীরা গভর্নমেণ্টের স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যাণ্ড যাচ্ছে পড়তে—

হাঁ হয়ে গিয়েছিল অজিত।

সুজিত বলেই চলেছিল—ও এসেছে ওর অংশের বাড়ি বিক্রি করবে বলে। ও শুনেছে—ওর সইয়ের জন্যে আমরা বাড়ি বিক্রি করতে পারছি না। এখন ওসব ফিলিম—পুরনো কাসুন্দী ঘাঁটছ কেন? একদম ছোটলোক হয়ে গেছ তুমি। কথাবার্তা পর্যন্ত ভুলে গেছ।

অজিত আশ্চর্য রকম বিনীত এবং ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল এরপর। কোন রকমে বলেছিল—আমি জানতাম না। আমি জানতাম না।

এরপর রাগ চলে গিয়েছিল—দুঃখ হয়েছিল তার। আসবার সময় সে অনেক খুঁজে বিবর্ণ হলদে হয়ে যাওয়া—তার মা-বাবার ও তার ফটোখানা জঞ্জাল খুঁজে বের করে এনেছিল। এর জন্যে সারাটা দিন বিকেল পর্যন্ত সে ওখানে ছিল; সুজিতের বাড়িতেই খেয়েছিল সেদিন।

* * *

বাড়ির জন্যে সে আট হাজার টাকা পেয়েছিল; কয়েকদিনের মধ্যেই কাজটা শেষ করেছিল। বিলেত যাবার সময় সে দশ হাজার টাকার মালিক হয়েছিল। টাকা সে আরও বেশী পেত; দাম কমিয়ে তাকে প্রতারিত করার চেষ্টাটা সে বেশ বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সে আপত্তি করে নি। জেনেশুনেই করে নি। অজিতদারা যদি কিছু বেশী পায়—পাক।

শুধু একটু হেসেছিল।

টাকাটা হাতে নিয়ে আবার মনের মধ্যে সেই বেদনা বা কষ্ট অনুভব করেছিল।

মনে মনে বলেছিল—পিতৃপুরুষের বাস্তুদেবতা আমাকে ক্ষমা কর। আমার ভাগ্য-দেবতা আমার ভাগ্যে—ঘর সংসার সন্তান লেখেন নি। শৈশবে মা-বাবা তার বিয়ের কল্পনা করেছিলেন—তার বিয়ের জন্যে ইনসিওরও একটা করেছিলেন, কিন্তু বাবার মৃত্যুতেই তার শেষ। মা সেই তখনই বুঝেছিলেন এই রূপহীনা মেয়ের ভাগ্যে বর নেই, ঘর নেই। তিনি তার কানে-কানে সেটা বলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ভুল করেন নি। রূপ তার—সে একটা পেয়েছে। কিন্তু ঘর সংসার স্বামী তার প্রাপ্য নয়—সে জানে। সুতরাং তোমার দেউলে সকাল সন্ধ্যে গলায় আঁচল জড়িয়ে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখানো তো তার ভাগ্য নয়। তার শেষ ক্ষীণ কল্পনা মুছে দিয়েছে বিনো সেন। আজ সে পথে দাঁড়িয়েছে—সুদূর পথের যাত্রী। ঘর! যাদের ভাগ্যে তুমি

আছ, তোমার সুখ—যাদের জন্মান্তরের পাওনা—তুমি তাদের হলে। বাস্তুদেবতা—তাদের সেবায় তুমি তৃপ্ত হবে। তারা তোমাকে ঘিরে সোনার দেউল গড়ে তুলুক।

পরে ভেবে দেখেছে, হয়তো এটা নিছক হৃদয়াবেগ, হয়তো কেন নিশ্চয়। তবু এর একটা মূল্য আছে। এতে তার লজ্জিত হবার কারণ নেই। সেদিনও বড় কষ্ট হয়েছিল—কাঁদতে চেয়েছিল—কাঁদা উচিত ছিল—কিন্তু পারে নি—চোখে জল আসে নি।

আবার একবার এমনি হয়েছিল—যখন ইংল্যাণ্ডগামী প্লেনখানা মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে একটা বেড় দিয়ে কলকাতাকে পিছনে ফেলেছিল।

দেশের মধ্যে ঘর বলেই দেশ নিজের দেশ। মানুষ ঘরের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ মমতা অনুভব করে বলেই ঘরের জন্য এত মায়া। কিন্তু ঘর তার জন্য নয়—তার পথ—সম্মুখ—। তার স্থিতি নেই শুধু গতি। শুধু অস্থিরতা।

* * * *

ইংল্যাণ্ডে গিয়ে কয়েকদিন এই বিষণ্ণতা বেড়েছিল। ঘরে বসে বসে ভাবত। কেন? কেন এমন হল? চলার পথে দাঁড়িয়ে কেন ক্লান্তিবোধ? কিছুদিন পর এটা সে চেষ্টা ক'রে কাটিয়ে উঠেছিল। ডুবিয়ে দিয়েছিল নিজেকে শিক্ষার মধ্যে। ক্রমে সাফল্যের মধ্যে উৎসাহ এসেছিল। পারিপার্শ্বিক থেকে উল্লাসের উৎসাহের—জীবনে ছুটে চলার প্রচুর উপকরণ এখানে। প্রচুর। স্বচ্ছন্দগামিনী নদীস্রোতের মত চলেছে। বিচিত্র দেশ, মুক্ত, স্বাধীন। জীবন যে এত মুক্ত এবং হাস্যমুখর হতে পারে, তা সে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। এবং তাদের সঙ্গে একদিন নিজেও হাস্যমুখর হয়ে মিলে গিয়েছিল, মিশে গিয়েছিল। শিক্ষা এবং উল্লাসের মধ্যে জীবন চলছিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে নীরার জীবনে স্তব্ধতা নেমে আসত। এটা ঘটত দেশের স্মৃতি কোন কারণে জেগে উঠলে। বড় কষ্ট পেত। মনে হ'ত যে হাসি, যে গতিবেগ তার জীবনে ছিল, তাও যেন চিরদিনের জন্য স্তিমিত হয়ে গেছে। হৃদয় যেন ভারাক্রান্ত। এ ভার আর কখনও নামবে না। সে ভাবতে বসত। এই ভাবনার মধ্যে খতিয়ে দেখত, তার তো কোন আকর্ষণের বস্তু সেখানে সে ফেলে আসে নি—তবে কেন? জীবনে তো দেনা কারুর কাছে নেই। জ্যাঠামশায়দের সংসারে সকলের সঙ্গেই তার সম্পর্কে রূঢ়তার সবটুকু ধুয়ে মুছে দিয়ে এসেছে। আর কে? গোপন করবে না—এবং সে করবেই বা কেন—হঠাৎ একদা সে আবিষ্কার করেছিল—যে রূঢ় আচরণ সে বিনো-দার সঙ্গে করে এসেছে, তা ঠিক হয় নি। আরও সহজভাবে হতে পারত। চিঠি লিখে জবাব দিয়ে চলে আসতে পারত। একটি কথায় জবাব হ'ত, ছি, বিনো-দা! দেবতা যখন কাঙালীপনা করে তখন মানুষ কি করে বলুন তো?

না, ওটা বড় বেশী নরম হত। সে তো লিখলে পারত--। না, এ লেখা যেত না। আপনি প্রতিমাকে ভালবেসে আবার আজ আমাকে ভালবেসেছেন। আমি জীবনে কাউকে ভালবাসিনি। আমার এ অনুচ্ছিষ্ট হৃদয় কি যার হাত উচ্ছিষ্ট তার হাতে দেওয়া যায়? না। এ লিখতে সে পারত না। এতে যে লোকে ধরে নিত যে সে তাকে ভালবাসত। সে চিঠি লিখতে বসত বিনো সেনকে। কিন্তু লিখেও ছিঁড়ে ফেলে দিত। বিনো সেনের কাছে ক্ষমা

চাওয়া যায় না। সে নিজের অপমান করা। মধ্যে মধ্যে স্বপ্নে দেখত। বিনো সেন সকাতরে মিনতি করছেন—"ক্ষমা কর। আমি হাত জোড় ক'রে অপরাধ স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা কর।" কিন্তু সে আর কি করবে? যে আঘাত সে ক'রেছে—তা সে কি ক'রে ফিরিয়ে নেবে? এই একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে সে আবার পরিবর্তিত হয়ে গেল। উল্লাস মুখরতা রইল না—প্রচ্ছন্ন বেদনায় সে যেন বদলে, শান্ত স্তিমিত হয়ে গেল। বিনো সেন তার অপমান করেছেন—তার চরিত্রের কেউ প্রশংসা করবে না—কিন্তু লোকটি তার জন্য অনেক করেছে। অনেক। স্বদেশের দৃষ্টিভঙ্গি এদেশে এসে কিছুটা পাল্টেছে—সেই দৃষ্টিতে পিছন দিকে তাকিয়ে মনে হল—হ্যাঁ, আঘাত সে রূঢ়তম ভাবে করেছিল—ঠিক হয় নি। স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই, নইলে মন এমন হল কেন? তর্ক যুক্তি অস্বীকার ক'রেও মন যেটা মেনেছে অপরাধ বলে—তাকে অস্বীকার করার উপায় কোথা? ভেবেছিল দেশে ফিরে একবার গিয়ে বলে আসবে ভুলে যাবেন সেদিনের কথা।

* * * *

সব আবার বদলে গেল। আবার সে জ্বলে উঠল। আবার জীবনে এল নাটকীয় আঘাত। আঘাত দিলেন বিনো সেন। তাই সে সারাপথ ভাবতে ভাবতে আসছে—তার জীবন-নাটক থেকে এবার বিনো সেনকে প্রস্থান করতে বাধ্য করবে। শেষ যুদ্ধ হবে তার সঙ্গে। ঘটনাটা ঘটল সেদিন। পাস করার পর—সে গিয়েছিল ইণ্ডিয়া হাউসে—ইউরোপের বড় শহরগুলিতে যাবার অনুমতির এনডোর্সমেন্টের জন্য এবং ভিসার সাহায্যের জন্য। সেখানে একজন বিশিষ্ট কর্মচারী তাকে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠেছিল—স্ট্রেঞ্জ! আপনি? শুধু তিনিই নন—আরও ক'জনও সবিস্ময়ে তাকে দেখছিল। সে বিব্রত এবং বিরক্ত হয়ে বলেছিল—আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না।

অবশেষে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছিল। ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় শিল্পীদের কিছু ছবি সদ্য এসেছে। তার মধ্যে একখানি বড় ছবি এসেছে। মহাশ্বেতা! ছবিখানি যত ভাল—তত ভাল তার বিষয়টি। অপূর্ব রোমান্টিক! কবি বাণভট্টের কাদম্বরীর অন্তর্গত। সে জানে—সে জানে মহাশ্বেতার কথা।—প্রতিমাকে মহাশ্বেতা করে আঁকতে চেয়েছিলেন বিনো সেন। লক্ষ্মীর মানস পুত্র—নাম পুণ্ডরীক—ঋষিকুমার আর মহাশ্বেতা অপরূপ গন্ধর্ব রাজকন্যা। দুজনে দুজনকে দেখে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু মিলনের পূর্বেই বিরহ সইতে না পেরে পুণ্ডরীকের মৃত্যু হল। মহাশ্বেতাও আত্মহত্যা করতে গেল। কিন্তু দেবতা আদেশ করলেন—না! তপস্যা কর। পুণ্ডরীককে ফিরে পাবে। সে আসবে নবজীবনে তোমার কাছে। দেবতার আদেশে মহাশ্বেতা হলেন তপস্বিনী। কঠোর তপস্যা করলেন, পুণ্ডরীকও জন্মগ্রহণ করল বৈশম্পায়ন হয়ে। এক রাজার মন্ত্রীপুত্র হয়ে। রাজার পুত্র চন্দ্রাপীড়ের সখা, তার ভাবী মন্ত্রী। ক্রমে যুবক হলেন দুজনে। গেলেন একদা দিগ্বিজয়ে।

বৈশম্পায়ন গিয়েছিলেন সৈন্যবাহিনী নিয়ে গন্ধর্বলোকে। সেখানকার রাজকন্যা কাদম্বরীর সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের প্রণয়ই মূল ঘটনা—কিন্তু সে অন্য কথা। সেই অরণ্যে শিলার উপর ব্রহ্মাসনে বসে মহাশ্বেতা তপস্যা করছিলেন মৃত্যুপর থেকে দয়িতের প্রত্যাগমনের জন্যে। এলেন দয়িত।

বৈশম্পায়ন অকস্মাৎ তপস্বিনীকে দেখে যেন কোন্ অস্পষ্ট অথচ দুর্নিবার স্মৃতির আকর্ষণ অনুভব করলেন। অনুভব করলেন সর্বদেহ দিয়ে ওই দেহ স্পর্শের উন্মাদনা। তিনি অগ্রসর হলেন, তুমি আমার। তুমি আমার। তপস্বিনী মহাশ্বেতা আকস্মিকতার মধ্যে চিনতে পারলেন না ঠিক। শীর্ণ দেহ তপস্বিনী প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর আয়ত চোখে আগুন ঝলসে উঠল—ফিরে-আসা হারানো দয়িত সেই বহ্নিতে ভস্ম হয়ে গেল। এ সেই ছবি। কিন্তু ছবির মহাশ্বেতা আর নীরা যেন এক। আশ্চর্য সাদৃশ্য—দেখলেই চেনা যায়। মনে হয় যেন তাকে মহাশ্বেতার মডেল করে বসিয়ে শিল্পী এ ছবি এঁকেছে। দেখেছিল সে সে-ছবি। বিনো সেনের আঁকা। মহাশ্বেতা সে-ই। মনে পড়ল অসুখের পর পথ্যের দিন সে আয়নায় তার রোগক্লিষ্ট মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই সময় অণিমাদি এসে বলেছিল, বিনো সেন একদিন তার ঘুমন্ত অবস্থায় ফটো নিয়েছিল, বলেছিল, সতীর দেহত্যাগ ছবি আঁকবে। মুহূর্তে তার রাগ হয়ে গিয়েছিল। চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। ছবির মহাশ্বেতার মুখ সেই মুখ, দৃষ্টি সেই দৃষ্টি। অনিমাদির সঙ্গে কথা যখন বলছিল—তখন তার খাটের সামনেই ছিল তার শখ করে কেনা ড্রেসিং-টেবিলটার আয়না। অনিমাদির কাছে যে মুহূর্তে শুনেছিল—বিনো সেন তার ফটো তুলে নিয়ে গেছেন—সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল—কি বিশ্রী চেহারার ছবি নিয়েছেন বিনো সেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তাকিয়েছিল আয়নার দিকে। দেখেছিল তার রোগশীর্ণ মুখে আয়ত চোখ দুটো শাণিত খড়্গের মত ঝকমক করছে। কিন্তু বিশ্রী মনে হয় নি। একটি তেজস্বিনীর শীর্ণ মুখে চোখের দীপ্তি সত্যই ভাল লেগেছিল। এ ছবি সেই ছবি। ঠিক সেই ছবি! আর সামনে ভস্মীভূত বৈশম্পায়নের মুখে অবয়বে বিনো সেনের নিজের আদল। ক্রিমেটোরিয়ামে দাহ করা মূর্তির মত তবু তার মধ্যে মানুষটিকে চেনা যাবার মত করে এঁকেছে বিনো সেন। দেখতে দেখতে ইণ্ডিয়া হাউসের অনেকজনের কাছে খবর পৌঁছেছিল এবং অনেকজন উঁকি মেরে দেখেছিল তাকে। সে নিজে শুধু অস্বস্তি অনুভব করে নি, মনে হয়েছিল এরা সকলে মনে করছে এ অতি নিষ্ঠুরা অতি ভাগ্যহীনা। তারপর ও যতদিন গিয়েছিল এরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। একদিন কাগজওয়ালারা অতর্কিতে ফটোও নিয়েছিল—এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তার এতদিনের বেদনাতুর মন—বেদনাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার উগ্র রূঢ় হয়ে উঠেছিল। মনটা তার বিষিয়ে গিয়েছিল। মনে মনে বলেছিল—ছি—ছি—ছি! আপনি তো মরেন নি বিনো-দা। তবে? ছি-ছি।

* * *

সেই ক্ষোভেই সে এত চঞ্চল হয়েছিল যে ইয়োরোপ ঘুরবার কল্পনা সংকল্প একেবারে বাতিল ক'রে দিয়ে—ভারতবর্ষে আসবার ব্যবস্থা করে প্লেনে চেপে বসেছিল। তার জীবনের নাটক থেকে বিনো সেনকে চিরদিনের মত প্রস্থান করতে বাধ্য করবে।

কলকাতায় ফিরেই সে সর্বপ্রথম বিনো সেনের কাছে যাবে একবার। নাটক আর সে করবে না। তবে বিনো-দাকে জিজ্ঞাসা সে করবে, পুণ্ডরীক পরজন্মে বৈশম্পায়ন—তার কি প্রতিমার মত আর কোন প্রণয়িনী ছিল? এবং সে কি মহাশ্বেতার মত প্রণয়মুগ্ধ গন্ধর্ব

রাজকন্যা ? যাকে জীবনে পথের খোয়ায় কাঁটায় পা দুখানা ক্ষতবিক্ষত করে চলতে হয়েছে, যে জীবনের প্রেমের স্বপ্নকে রূঢ়ভাবে নিজের হাতে ভেঙে দিয়েছে, মুছে দিয়েছে, তাকে এমন ব্যঙ্গ এমন অপমান কেন করলেন ? এমন অপমান যে মনা ঘোষ করে নি, সোমেশবাবুর ছেলে করে নি ! ছি ! ছি ! ছি !

না, নাটকই করবে সে। তার জীবন-নাটক চরম নাটকীয়তার মধ্যে সমাপ্ত হওয়াই ভাল।

সে বিষ নিয়ে যাবে। বিনো সেনকে বলবে—এত ভালবাসেন তা আমি জানতাম না বিনো-দা। জেনে আজ আর আপনাকে পাওয়ার জন্য ব্যগ্রতার আমার সীমা নেই। কিন্তু ওই প্রতিমাকে সামনে রেখে আপনাকে আমি পেতে চাইনে। আপনাকে পেতে চাই নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। আসুন, দুজনে বিষ খাই। আসুন—নিন—খান—আমিও খাচ্ছি। নিন—।

সে জানে বিনো সেন বিবর্ণ হয়ে যাবে। ভয়ে পিছিয়ে যাবেন, বলবেন—না নীরা, না—

সে অট্টহাসি হাসবে।

ঠিক সেই সময়েই প্লেনের লাউডস্পীকারে ঘোষণা হয়েছিল—Attention please.

আমরা দমদমে পৌঁছে গেছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

সে ওই সংকল্পে উৎসাহিত হয়েই নিজের বেল্ট বেঁধেছিল। প্লেনটা নামছিল। সেই কলকাতা। ওই—ওই দিকে তাদের বাড়ি ছিল। ওই গঙ্গা—ওই ভেরতলা সেক্রেটারিয়েট। ওই ডোমটা—

খস করে চাকাটা রাণওয়ে স্পর্শ করল ছোট একটি ঝাঁকুনি দিয়ে।

* * *

কল্পনার উৎসাহ বোধ হয় স্থায়ী হয় না। তাই নামল সে সেই বিষণ্ণ ক্লান্ত অথচ রূঢ় চিত্ত নিয়ে। বিনো সেনের সঙ্গে বুঝাপড়া সংকল্পে সে স্থিরই আছে।

দেশের মাটিতে নেমে একটা আবেগ বুকের মধ্যে পুঞ্জিত মেঘের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। ছায়া নেমেছে অন্তরে। কিন্তু তার মেঘ বন্ধ্যা মেঘ। জল বর্ষণ করে না। দু ফোঁটা চোখের জল ঝরলে সে নিজেকে ধন্য মনে করত ; তার ক্লান্তি বিষণ্ণতাও বোধ হয় কেটে যেত। কিন্তু কান্না তার আসে না।

সে যাত্রীদের সঙ্গে কাস্টমস আপিসে এসে ঢুকল। এই এক পর্ব। কাস্টমস।

—নীরা।

কাস্টমসের কাজকর্ম সেরে সে লাউঞ্জে এসে ঢুকল। আন্তর্জাতিক জনতার ভিড়। সেই ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন তাকে ডাকলেন—নীরা।

পরিচিত কণ্ঠস্বর। নারী-কণ্ঠ। কিন্তু কে ? কোন্ দিক থেকে কে ডাকছে। চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সন্ধান করলে সে। হঠাৎ চোখে পড়ল এয়ার ইণ্ডিয়ার ওদিক থেকে এগিয়ে আসছে একটি স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া—অণিমাদি ! বিস্ময় একটু বোধ করলে সে। অণিমাদি

এখানে ? তাকে নিতে এসেছেন ? না—না—তা কেন হবে ! সে জানবে কি করে ? আসবেই বা কেন ? সেই রাত্রি থেকে তো কোন সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে !

অণিমাদি এসে কাছে দাঁড়িয়ে তাকে আপাদমস্তক দেখে বললেন—ফিরে এলে বুঝি ?

—হ্যাঁ ! এই কাস্টমস থেকে বের হলাম।

অণিমাদি আবার একবার তাকে ভাল করে দেখে ম্লান হেসে বললেন—তা বেশ। বড় সুন্দর হয়েছিস রে।

অণিমাদিরও যেন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কেমন যেন— !

হ্যাঁ, অণিমাদিও অনেক পাল্টেছেন। খুব একচোট হেসে আজ আর নীরার গলা জড়িয়ে ধরে গুরুভার দেহখানি নিয়ে তার উপর ঢলে পড়লেন না।

শান্তভাবে অণিমাদি বললেন—ভাল ছিলি ? উঁহু ! অনেক রোগা হয়ে গেছিস। বেশ খানিকটা পাল্টে গেছিস।

—মেমসাহেব হয়েছি ?

—না। কেমন যেন মরা-মরা মনে হচ্ছে। তা এখন উঠবি কোথায় ?

—দেখি। কোন হোটেলে বা বোর্ডিংয়ে। দাদু থাকলে সেখানে যেতে পারতাম। তা—। একটু চুপ করে থেকে বললে—তা তুমি এখানে কোথায় ? কেউ আসবে বুঝি ? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—বিনো সেন। মুহূর্তে সে ব্যস্ত হয়ে বললে—আমি যাই।

—দাঁড়া না একটু। কেউ আসবে না—আমি যাচ্ছি।

—প্লেনে ? কোথায় ?

—ডালহৌসি।

—ডালহৌসি ? সেখানে কি ? চাকরি ? এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়েছ ? বেশ করেছ। নীরা খুশী হয়ে উঠে—একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে ফেললে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অণিমাদি বললেন—না। সেখানে বিনো-দা থাকেন। আমিই তাঁকে দেখি। তাঁর তো কেউ দেখবার নেই।

সমস্ত পারিপার্শ্বিকটা এত বড় এরোড্রোমের সব কিছু যেন এলোমেলো হয়ে কেমন হয়ে গেল। পুতুলের মত নীরা বললে—ডালহৌসিতে বিনো সেন থাকেন ! তুমিই তাকে দেখ ? আর তো কেউ দেখবার নেই ! কি বলছ এসব ?

—সে অনেক কথা নীরা। বিনো দার টি-বি হয়েছে।

—টি-বি হয়েছে ?

নীরার পায়ের তলায় একটা যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল। সে স্থানকাল ভুলে গিয়ে চীৎকার করে উঠল—কি বলছ তুমি ? অণিমাদি ?

আশপাশের লোকজন তার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে তার দিকে তাকালে। অণিমার কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসছিল ; সে কথা কইতে পারলে না, আত্মসম্বরণের জন্য নীরব থেকেই সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ। বিনো সেনের টি-বি ! সেই সবল প্রাণবান বিনো সেন ? অসম্ভব ! কি ক'রে হয়। অপ্রত্যাশিত অসম্ভব সংবাদের আকস্মিক আঘাতেই বোধ হয়

তার দীর্ঘ-পথক্লান্ত দেহের স্নায়ুতে শিরায় কম্পনের মত একটা প্রবাহ বয়ে গেল। কেঁপে উঠল সে। পা কাঁপছে, হাত কাঁপছে—ঠোঁট কাঁপছে। বুকের ভিতরটায় ধড়ধড় করে আছাড় খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। আকাশ যেন কেমন হয়ে গেছে। গাছপালা মানুষ-জন সব অর্থ হারিয়ে ফেলেছে নীরার কাছে।

খানিকটা স্তব্ধ থেকে আত্মসম্বরণ ক'রে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে অণিমা বললে—সে-ই সর্বনাশী। মানুষটাকে ধ্বংস ক'রে দিয়ে গেল। প্রতিমা।

ইলেকট্রিক শক্ খেলে নীরা। বললে—তার অপরাধ?

—অপরাধ? সবটাই অপরাধ। তার ছিল—সে রোগ নিয়েই তাঁকে জড়িয়ে ধরল। বলে নি। তুই যে দিন চলে এলি—সকল লোকের সামনে তাঁর মাথায় ওই কলঙ্ক চাপিয়ে—তখন দিন তিনেক ভেবে তিনি প্রতিমাকে নিয়ে কলকাতা এলেন। সে অনেক কথা। প্রতিমা বিধবা ছিল না। স্বামী তার বেঁচে ছিল। সদ্য ডাইভোর্স আইন পাস হয়েছে তখন—ডাইভোর্স করিয়ে নিয়ে বিয়ে করলেন। মাস তিনেক পর রোগ প্রকাশ পেলে বাঁধভাঙা বন্যার মত। উনি স্যানাটোরিয়ামে দিতে চাইলেন। সে চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল—না-না-না, শেষ কটা দিন তোমাকে নিয়ে থাকতে দাও। উনিও তাই শুনলেন। দু-হাতে সেবা করলেন! সে মরল। ওঁর রোগ ধরল।

একটু চুপ ক'রে থেকে অণিমাদি বললে—লোকে কিন্তু বললে—এ বিনো-দা, তোর উপর অভিমানে—

—আমার উপর অভিমানের তাঁর অধিকার?

—ভালবাসার!

—সংসারে যারা দুজন চারজন মেয়েকে একসঙ্গে ভালবাসে অণিমাদি তাদের ভালবাসা ভালবাসা নয়—সেটা হল লাম্পট্য। তার আবার অভিমান কিসের? অভিমান! মহাশ্বেতা ছবি এঁকে যে অপমান তিনি আমার করেছেন—তার শোধ নিতে দেখা করব ভেবেছিলাম। তা থাক, রুগ্ন জনকে দয়াই করব। আমি সে ছবি ইণ্ডিয়া হাউসে দেখেছি। এত ছোট বিনো সেন!

নীরা! ওরে তোর জন্যে মানুষটা—মরণকে ডেকে নিলে; আর তুই—

নীরা বলেই গেল—থামল না—প্রতিমাকে বিয়ে করেছিলেন এর জন্যে তোমাদের বিনো-দাকে ধন্যবাদ দি। তার জন্যেই তাকে মার্জনা করতে রাজী আছি। প্রতিমাকে ভালবাসতেন—অনেক দিন থেকে—বিয়ে অনেক আগে করা উচিত ছিল—। শেষে করেছেন এবং বিবাহিতা স্ত্রীর সেবা করতে গিয়ে রোগ ধরিয়েছেন আতিশয্যে, তার মধ্যে আমাকে টানছ কেন? আমার জন্যে মরণকে ডেকে নিয়েছেন! তোমার নিজের একটু বোধ নেই অণিমাদি? এমন অন্ধ তুমি? ছি!

—তুই অন্ধ। নীরা তুই অন্ধ!

—বেশ তাই। তা—যাও তুমি—আমিও যাই। বড় ক্লান্ত আমি। কিছু মনে করো না।

—না। অণিমাদি তার হাতটা চেপে ধরলেন। আকর্ষণ করে বললেন—আয় আমার সঙ্গে একটু নিরালায়। যাবি—কিন্তু সবটা শুনে যা। যেতে হবে শুনে।

এ দৃঢ় কণ্ঠস্বর অণিমাদির কাছ থেকে কখনও শোনে নি। বিস্মিত হল নীরা। অণিমা বললে—তুই এমন একটা লোকের যা ক্ষতি করলি—বধ করলি—একরকম—

—অণিমাদি!

—হ্যাঁ, হাজার বার বলব। আমি যে সব জেনেছি। তুই জানিস নে, তুই তাকে ভালবাসতিস।

—না।

—হ্যাঁ। বাসতিস। হয়তো বাসিস। আমি জানি যে। তোর অসুখের সময় বিকারের মধ্যে চেঁচাতিস। আমি মাথার শিয়রে বসে শুনেছি। প্রতিমাকে তুমি ভালবেসো না বিনো-দা। বিনো-দা।

—অণিমাদি! বিহ্বল হয়ে গেল নীরা।

অণিমাই কথা বলতে বলতে তার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে নির্জন স্থানে এসে উপস্থিত হয়ে বললে—এইখানে দাঁড়া। না—ওই বাঁধানো বেঞ্চটায় বস। শুনে যা কি করেছিস।

প্লেনের ওঠানামার ঘর্ঘর মুখরতার মধ্যে বলে গেল অণিমা—

—আমি জানি। তোর অসুখের সময় আমি না তোর শিয়রে থাকতাম। বিনো-দা থাকতেন বাইরে। যেদিন প্রলাপ বকেছিলি—তার মধ্যে অনেক বকেছিল। বিনো-দা বলেছিলেন, এ কথা যেন কেউ না শোনে অণিমাদি। ওকে বোলো না। তুই নিজে যদি সত্যিই না জানিস—তবে জেনে যা। চুপ করেই রইল নীরা। মনে মনে প্রশ্ন করতেও ইচ্ছে হল না। এই ক্লান্ত বেদনার্ত মুহূর্তে কথাটা মেনেই নিলে। না-মেনে উপায় নেই। বুকের ভেতর বাঁধা-বাঁধা কান্নার হ্রদে অকস্মাৎ যেন তুফান জেগেছে, মনে হচ্ছে হ্রদের গভীরে কোন এক বিরাট শিলা-চাপা উৎস-মুখ থেকে শিলাখণ্ডটাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। এখন বাক্য স্তব্ধ, বাদ-প্রতিবাদ, যুক্তি-তর্ক সব মিথ্যা হয়ে গেছে। অমৃততপস্বার মৃত্যুতে প্রকাশিত এক অমোঘ সত্যের মত, মৃত্যুপণে অনশনব্রতীর নিষ্ঠুর ক্ষুধার মত তার অন্তরের এক সত্য যেন উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। সে এই পর্যন্ত বলতে পারে—ওই সত্যই মানুষের শেষ সত্য নয়; তাই অমৃতের তপস্যাও মানুষ ছাড়বে না, এবং ক্ষুধার সত্য নিষ্ঠুর পীড়নের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলেও মানুষ অনশন ভঙ্গ করে না—করবে না। সেও করবে না স্বীকার।

অণিমাদি যেন একটি বৈরাগ্যময় বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বিচিত্র বিষণ্ণ একটি হাসি তার মুখে ফুটে উঠল—আক্ষেপভরা কণ্ঠে বলল—প্রতিমা! আঃ ছি-ছি-ছি রে! নীরা, কি যে বলব রে ভেবেই পাইনে। বিনো সেনের ভালবাসার জন্যে কি মাথা খোঁড়া সে তো দেখেছিস—অথচ বিনো-দা কোন দিন তাকে ভালবাসেন নি। ডালহৌসিতে বসে বিনো-দা সেদিন বললেন—অণিমাদি—ওকে আমি কোন দিনই ভালবাসি নি। ওর এত রূপ—প্রথম যৌবন যখন আমার তখন ওর কৈশোর; তখনও কোন দিন এতটুকু ভাল লাগে নি।

ঈশ্বর সাক্ষী। ওর দাদা—আমাদের দাদা ছিলেন—ফাঁসি গেলেন। তাঁর কাছে কথা দিয়েছিলাম ওকে দেখব—ওর বিয়ে দিয়ে দেব। সেই শপথ আমার একমাত্র বন্ধন। যাঁর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল—উন্মাদের মত প্রতিমা যাকে ভালবেসে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল—তিনি আজও জীবিত, বাংলাদেশের বিখ্যাত লোক—শিল্পী গুণী। যে গুণীরা গুণের বদলে আঠার আনা সুখ চান—বত্রিশ আনা স্বেচ্ছাচারের স্বাধীনতা চান—সেই ধরণের গুণী। পৃথিবীর কোন আইন তাদের জন্যে নয়, একমাত্র ভাল-লাগাটাই আইন। বিনো-দা বললেন—আমি জানতাম। তবে প্রতিমা ওকে এমনিভাবে পাগলের মত ভালবাসবে তা অনুমান করতে পারি নি। কারণ যে দাদা ফাঁসি গেছেন তারই বোন তো! তার সংযম থাকবে না যাচাই থাকবে না ভাবতে পারি নি। আর যখন ওরা পালিয়ে এসে কলকাতায় বিয়ে করলে তখন আমি এ্যাবস্কণ্ডার। তারপর জেল। জেল থেকে বেরিয়ে ওদের বাড়ি গেলাম তখন ওরা খুব সুখী। খুশী হয়েছিলাম। আবার চলে গেলাম। বিয়াল্লিশ সালে ধরা পড়লাম। পঁয়তাল্লিশে বের হলাম। কলকাতায় গিয়ে বন্ধুর বাড়ি গেলাম। বন্ধু খ্যাতিমান ব্যক্তি, তখন আরও খ্যাতিমান হয়েছেন—রাজনৈতিক দলের হিরো। আমাকে দেখে ভুরু কোঁচকালেন! বললেন—কি খবর? জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছ? প্রতিমা কই, সে কেমন আছে। শুকনো গলায় বললেন—ভাল আছে। প্রতিমা এখানে নেই। প্রশ্ন করলাম কোথায়? চুপ করে থেকে একটু পরে বললেন—সে এখানে থাকে না বিনয়। জিজ্ঞাসা করলাম মানে? হেসে বললেন—দেখ তাকে বিয়ে করাটা আমার ভুল হয়েছিল। শুধু রূপময় খানিকটা মাংসস্তূপ নিয়ে যারা ঘর করে তাদের একজন আমি নই। মন—শিক্ষিত মন প্রয়োজন। সেই মনের খোঁজ যেদিন পেলাম—পেলাম অবশ্য কালচারাল ফাংশনে ঘুরতে ফিরতে এবং বুঝতে পারলাম—তাকে নইলে আমার সৃষ্টিশক্তি শেষ হয়ে যাবে। তবুও কিছুদিন চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এমন ঘটল—যে তাকে বিবাহ আমাকে করতেই হল। এবং বিবাহ করলাম। শর্ত হল—প্রতিমাকে পরিত্যাগ করব। সুতরাং—। অবশ্য আমি তাকে কিছু ক'রে খরচ দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু প্রতিমা নেয় নি। চলে গেছে। জানিনে ঠিক কোথায় থাকে। তবে আমার বদনাম করে বেড়ায়। হেসে বললেন, তা বেড়াক। আমার তাতে ক্ষতি হবে না। বিনো-দা বললেন—অবশ্য আমি খুব বিস্মিত হই নি এতে। কিন্তু বিস্ময়ের সীমা আমার রইল না যে দিন প্রতিমাকে দেখলাম সন্ধ্যায় এসপ্ল্যানেডে সেজেগুজে ফিরছে, চোখে অসুস্থ দৃষ্টি। আমাকে দেখে ছুটে পালাতে চেষ্টা করলে। কিন্তু পারে নি। আমি ওকে ধরে গাড়ি করে নিয়ে এলাম। গাড়িতে ও আমাকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করলে। ঘেন্নায় দেহ-মন রি রি করে উঠল। কিন্তু দাদার মুখ মনে পড়ল। আর দেখলাম ও সত্যিই অসুস্থ। জ্বর ভোগ করছে! তারপর অনেক বুঝিয়ে ওকে সানাটোরিয়ামে দু-বছরের উপর রেখে সুস্থ করে তুললাম। টি-বি ওর তখন থেকে। তার মধ্যে ভাল হয়েছিল। ও স্বামীর উপর আক্রোশ করে বিধবা সাজলে। বললাম তাই সাজ। কিন্তু গুণী লোক, তার নামটা প্রকাশ করো না। ওকে আশ্রমে এনে ছেলেদের ভার দিয়ে ওকে মা ক'রে দিতে চাইলাম। কিন্তু আমার কপালে এই আছে—

কপাল ছাড়া আর কি বলব? ও কিছুতেই মায়ের ঘরে পৌঁছুল না। কি যে হল ওর মনে ধারণা আমি ওকে ভালবাসি এবং আমাকে নইলে ওর জীবন ব্যর্থ বৃথা—আমায় পাবার জন্ম পাগল হয়ে উঠল। একদিন আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করলে। আফিং খেলে। উন্মাদের মত বলতে লাগল, না আমি বাঁচব না। কি বেঁচে লাভ? আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, একবার বল ভালবাসি। সেই দিন ওকে বাঁচাবার জন্তে মিথ্যে কথা বললাম। নইলে ডাক্তারদের চেষ্টা ও জোর করে ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। বললাম—বাসি। কিন্তু একটা কথা প্রতিমা। তার মধ্যে মিলনের আশা রেখো না। কারণ তুমি আমার বন্ধুর স্ত্রী। তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। এবং পাপ হবে। বিবাহ অসম্ভব। কারণ হিন্দু বিবাহে ডাইভোর্স হয় না। এবং সে যে লোক তাতে আমাদের দুজনকেই আদালতে লাঞ্ছনা করবে। ওকে আমি ভালবাসিনি, কোনদিন ভালবাসিনি।

নীরার চেতনা যেন হারিয়ে গেছে। সংজ্ঞা নামে আছে—কাজে নেই। পুতুলের মত বসে আছে। একখানা প্লেন এসে নামল।

অণিমাদি বললে, সেদিন—একটু হেসে এরপর বললেন—জানেন, এই ভালবাসা নামক দ্রব্যটির কি স্বাদ বা তার আকর্ষণ আমার জীবনে—প্রথম যৌবনে কঠিন অভ্যাস যোগের ফলে ঠিক ছিল না। বিশ্বাস করুন। হঠাৎ এই প্রৌঢ় বয়সে—পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স প্রৌঢ় বইকি। এই বয়সে—এল ওই মেয়ে। নীরা। এদিকে তখন মন ছাড়া পেয়েছে—স্বাধীনতা এসেছে—মনে চাপা-পড়া সাধ-আকাঙ্ক্ষাগুলো মাথা ঠেলে উঠেছে। ওই জীবনময়ী কলরব-করা মেয়েটিকে দেখতে দেখতে মনে হল—একে ভালবেসেছি। একদিন মনে হল—এই মেয়েটির জন্তে জন্মান্তরে তপস্যা করেছি—এ জন্মেও এতদিন ওর পথ চেয়েই বসে আছি। আমার বয়স বেশী হয়েছিল। কিন্তু আমি জীবনে তপস্যা করে নিজেকে শতজীব করতে পারতাম। তাই সেদিন, যখন ওর স্কলারশিপের চিঠি এল; আমিই ব্যবস্থা করেছিলাম; সেদিন মনে হল, এই তো নীরা আমার চিরজীবনের জন্ম হারিয়ে যাবে, তখন আর থাকতে পারি নি। আমার অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠেছিল সেদিন। অণিমাদি সেকালে ফাঁসির হুকুম হবে কল্পনাতেও মন এমন হাহাকার করে নি। ভুলের মাথায় পত্রখানা লিখে ফেললাম। নীরা আমাকে আঘাত দিয়ে চলে গেল। লোকের কাছে—প্রতিমা সম্পর্কে অপরাধের রায় দিয়ে গেল বিচারকের মত। ওদিকে ডাইভোর্স বিল পাস হল। ডাইভোর্স করিয়ে অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে রাক্ষসীকে বললাম—সে গ্রাস কর আমাকে। দিদি—ও আমাকেও বলে নি ওর ব্যাধির কথা। প্রথম দিনেই দেহ স্পর্শ করে বুঝলাম। কিন্তু তখন আর তো পথ ছিল না। আর এত সেবা কেন করতে গেলাম অনুযোগ কর তোমরা। এটা কি করে অবহেলা করব বল? তা-ছাড়া আবার কি—? কি হবে বেঁচে! নীরা যা বলে গেল—যেভাবে আমাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল তাতে বাঁচতে ইচ্ছে নেই আমার।

থামলেন অণিমাদি। নীরা শুব্ধ। সংজ্ঞা বুঝি তার হারিয়ে যাচ্ছে। অণিমাদি উত্তর না পেয়েও থামলে না—বললে—

ডালহৌসিতে জোর করে পাঠালেন মাস্টারমশাই। সঙ্গে কে যাবে? আমি বললাম—আমি যাব। উনি খুশী হলেন। বললেন—তা হলে দিন কটা আনন্দে কাটবে। অণিমাদি আমার আনন্দময়ী। আছেন সেখানে—। এসেছি দু'দিন হল। আছে চাকরটা। জোর করে পাঠালেন—দলিল করে আশ্রম সরকারকে দিলেন—সেই দলিল নিয়ে এসেছিলাম। তোর সঙ্গে দেখা হল। ভাল হল। বলব গিয়ে বিনো-দা—সেই পাথর মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাকে সব বলে এসেছি।

বলেই অণিমা উঠে দাঁড়াল। নীরাও উঠতে গেল। কিন্তু এ কি?—এ কি? কি হল?

পায়ের তলায় পৃথিবীটার এপাশ উঠছে—ওপাশ নামছে। না—চারিটা দিক পাক খেয়ে বনবন করে ঘুরছে। সব হিজিবিজি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

অণিমাদি বললেন—নীরা—নীরা! টলছিস। নীরা!

চেতনা হতেই সে ডাকল—অণিমাদি!

সে এক আর্তস্বরে ডেকে উঠল—অণিমাদি। অণিমাদি! কোথায়? অণিমাদি!

—উনি ওদিকে গেছেন—জিনিসপত্র ওজন করাচ্ছেন। কিন্তু আপনি উঠবেন না। বললেন একজন এয়ার ইণ্ডিয়ার কর্মী।

সে কথা শুনলে না। উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলে—অণিমাদি!

অণিমা এসে দাঁড়াল।—কিছু বলবি? মাপ চাইবি? বল।

কি বলবে? বলে দাও সে কি বলবে? এ তো মানসমঞ্চের অভিনয় নয়, স্মৃতির প্রম্‌টার নেই কে বলে দেবে? এ জীবনমঞ্চে দাঁড়িয়েছে সে। বলতে তাকেই হবে। বুকের ভিতর থেকে সিংহদ্বার খুলে হৃদয় মন প্রাণ সমস্বরে বলে দিলে—বল। তোমার সঙ্গে আমি যাব অণিমাদি!

চোখ থেকে জল গড়িয়ে আসছে। উচ্ছ্বসিত ধারায় উপচে পড়ছে। অণিমা বললে, তুই যাবি?

কাঁধে মুখ রেখে সে বললে—আজই এখুনি তোমার সঙ্গে।

—বস, আমি দেখি।

সে বসল। চোখ থেকে তার অনর্গল ধারায় জল ঝরছে। কিন্তু সে তাতে সঙ্কুচিত হল না, মুখ লুকুলে না, নত করলে না। শূন্য দৃষ্টিতে দূর ডালহৌসির দিকে চেয়ে রইল।

মায়ের মৃত্যুর পর আজ সে প্রথম কাঁদছে। হেরেছে সে। সে হারে তার লজ্জা নেই—পৃথিবীর সামনে সে কাঁদছে—কাঁদবে।

ডালহৌসিতে যখন তারা পৌঁছুল তখন অপরাহ্ণ-বেলা। তার জন্য প্রায় বারো ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। একটা মোড় ফিরেই অণিমাদি বলতে গেলেন—ওই বাংলো—। কিন্তু নীরাই বললে—ওই যে! দৃষ্টিতে দেহে মনে সে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। সে শুনতে পেয়েছে বিনো সেনের কণ্ঠস্বর। সে শক্তি সেই কিন্তু মিষ্টতা হারায় নি।

গান ভেসে আসছে।

"আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে,
চাও কি—
হায়, বুঝি তার খবর পেলে না।"

নীরা সে ব্যগ্রতা গোপন করলে না। বললে—রোখো। রিকশা রোখো। ঝাঁপ দিয়ে সে নেমে পড়ল। এবং ছুটতে চেষ্টা করলে। অণিমাদি বললে, ছুটিসনে নীরা। পাহাড়ে—।

নীরার সেকথা কানে গেল না। সে সুধার খবর পেয়েছে।

রিক্শাটা থামল। উনি ওদিকের বারান্দায় বসে গেয়ে চলেছেন—সামনে টাঙানো 'মহাশ্বেতা' ছবি—শেষ কলি গাইছেন—

"ডাক উঠেছে বারেবারে,
তুমি সাড়া দাও কি।
আজ ঝুলনদিনে দোলন লাগে,
তোমার পরাণ হেলে না॥
হায়, বুঝি তার খবর পেলে না।"

নীরা এসে পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

—কে ? —কে ?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে নীরা। বাঁধ ভেঙেছে গঙ্গোত্রীর !

—নীরা ? নীরা ? উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন বিনো সেন। উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

—আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। নীরা আর্তনাদ করে উঠল।

—ক্ষমা ? আমার ক্ষমার মূর্তিই যে তুমি। কিন্তু এত দেরি করে এলে ?

—না—দেরি করে আসি নি। দেরি আমার হয় নি! কিন্তু তুমি মহাশ্বেতার ও কি ছবি এঁকেছ ? আমি যে তোমাকে বাঁচাব। আমি এমনি করেই তপস্যা করব। কিন্তু বল তুমি বাঁচতে চাইবে। অণিমাদি বলছিল—। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।—আমার উপর অভিমানে—

প্রসন্ন কণ্ঠে বিনো সেন বললেন—বেশ, কাল থেকে তাহলে পুণ্ডরীকের পুনর্জীবন আঁকব।

হঠাৎ থেমে গেলেন বিনয় সেন। বললেন—কিন্তু—

—কি কিন্তু ? কিসের কিন্তু ? চোখের জলে ভিজে মুখ তুলে নীরা তার দিকে চাইল।

—এত শিক্ষা লাভ ক'রে দেশে ফিরে আমাকে নিয়ে পড়ে থাকবে ?—

—থাকব। তোমাকে ভাল ক'রে নিয়ে—ফিরে যাব। আমার ঘর, আমার সংসার, আমার—আমার—সেই তো আমার শেষ তপস্যা। নইলে যে আমার সব মিথ্যে।

বিনো সেনের হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সে কান্নায় অসীম তৃপ্তি আশ্চর্য সুখ। বিনো সেন সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন—এবার—এবার আঁকব—বরফঢালা পাহাড়ের উপর কম্পিত দেবদারু বনে—মহাশ্বেতার সামনে—বরফের হিমশীতল সমাধির বরফ গলে যাচ্ছে—তার ভিতর থেকে জেগে উঠেছে পুণ্ডরীকের ঈষৎ রক্তাভ মুখ। চোখ দুটির পাতা কাঁপছে—।

নীরা মনে মনে বলে উঠল, হে অদৃশ্য রঙ্গমঞ্চ পরিচালক—আর না। যবনিকা ফেল। শেষ কর। বল এই চিরন্তন।

একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়

গৌরবান্বিতেষু—

আপনি গুণী—প্রতিভাশালী গুণী শিল্পী। বাংলা ও ভারতবর্ষের জন্ম পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের অভিনন্দন বহন করে এনেছেন। দেশ আপনাকে অভিনন্দিত করেছে। জীবনের অপরাহ্ণে আমিও আপনাকে অভিনন্দন জানাই। ইতি—

২১ ৯।৬৩

সমস্তটাই চোখের উপর ঘটছিল ; আনন্দ চোখ মেলে দেখার জন্যই দেখছিল। সেই চোখ চাওয়া অবস্থাতেই চোখের উপরেই কি এসে পড়ল ঝপ করে। ঠিক নাক এবং ডান চোখের সংযোগস্থলে। বেশ বড় একটা কিছু। তাতে যেন কাঁটা আছে! এবং সবেগে এসে পড়ল। কয়েকটা কাঁটা যেন চোখে বিঁধে গেল আনন্দর। পিনকুশনের মত একটা জিনিস—পিনের ডগাগুলি যেন বেরিয়ে আছে। আনন্দ আকস্মিক আঘাতে শুধু চমকেই উঠল না, একটা ক্রুদ্ধ এবং কাতর চিৎকার ক'রে উঠল—ওঃ!

রবিবার দিন বিকেল বেলা, প্রায় পৌনে চারটে। চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, শীত গেছে, গরমের আমেজ উঠেছে, দুপুরে ঘুমুতে ভাল লাগছে কিন্তু রৌদ্রে জ্বালা বা তাপ এখনও ফোটেনি। তবুও গ্রীষ্ম-দুপুরে যে একটা থমথমে ভাব ওঠে সেটা দেখা দিয়েছে ; সেইটে কাটছে এখন। পাখীগুলো বাইরে কলকল করতে শুরু করেছে, দুপুরের ঝিমুনি কাটিয়ে উড়তে শুরু করেছে। ইলেকট্রিকের তারের উপর কয়েকটা কাক তারস্বরে কা কা ডাক ধরেছে। কয়েকটা শালিক কিচির মিচির করছে। আর চড়ুইয়ের দল ফুর ফুর করে উড়ছেই উড়ছেই।

কলকাতার বাইরে—আগে শহরতলী বলা চলত, কিন্তু এখন শহরের সামিলই। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নতুন স্কীমে নতুন শহরই গড়ে উঠেছে, মধ্যখানে একটা পার্ককে বেড় দিয়ে মসৃণ রাস্তার পাশে পাশে নতুন বাড়ি। বালিগঞ্জ রাসবিহারী অ্যাভিনুর মত সবগুলোই বড় বাড়ি নয়, ছোট বড় মাঝারি একতলা ছোট বাড়ি থেকে চারতলা বাড়ি, খান-দুই পাঁচতলা বাড়িও উঠেছে। এরই মধ্যে ছোট একখানা একতলা বাড়ির ভাড়াটে আনন্দ। বাড়িটা একতলা এবং ছোট হলেও ফ্যাশনে কায়দা-কানুনে খাটো নয়। সব থেকে বিশেষত্ব বাড়িটার জানালা। আটফুট-চারফুট একটা জানালা দক্ষিণের দেওয়ালে এবং তারপরই পঁচিশ ফুট রাস্তা, তার ওপারে পার্ক। পার্কের চারিদিকে দেবদারু গাছের সারি। দু-চারটে শিমুল জাতীয় গাছ। সব মিলিয়ে শহর এবং পল্লীর মুক্ত আকাশ ও মাটিতে গাছপালার মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে একটি মেশামেশি আছে। গাছপালার মধ্যে পাখী—সে শকুন থেকে চড়ুই পর্যন্ত। কীট-পতঙ্গও যথেষ্ট। মশার তো কথাই নেই, রাত্রিকালে মধ্যে মধ্যে ভোঁ করে গুব্‌রে পোকা ঘরে ঢুকে মাথা ঠুকে ঠক করে মেঝের যখন পড়ে তখন আনন্দকে চমকে উঠতে হয়। এ পর্যন্ত দুখানা ছবি তার একদম বরবাদ হয়ে গেছে। চমকানিতে হাতের তুলি লাফিয়ে এমন বেঁকা রঙের টান মেরে দিলে যে—তাকে আর কিছুতেই শোধরানো গেল না। শোনা যায় সাপও আছে। কোণে—অর্থাৎ ঘরের কোণে ব্যাঙ তো আছেই। আকাশে মেঘ হলেই কোণ থেকে কবুর্‌ শব্দ করে ডেকে ওঠে। রাত্রে পাশের ফ্যাক্টরির কোন অজ্ঞাত স্থান থেকে শেয়াল ডাকে নিত্য নিয়মমত।

আজ বিকেলে একটু সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে উঠেছিল আনন্দ। কমার্সিয়াল আর্টিস্ট আনন্দ কাল শনিবার করেছিল। রবিবার ও ঘুমোয়, আজ ভেবেছিল বেশি ক'রে ঘুমুবে। ঠিক করেছিল সন্ধ্যাতেও আর বের হবে না। কিন্তু তবুও ঘুম ভাঙল সকাল-সকাল। ঘুমের

মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে। কাল বিকেল বেলা মিশন রোয়ের একটা আপিসে গিয়েছিল, সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যু আর মিশন রোয়ের জংশনে তখন ট্রাফিক জাম হয়ে গেছে। সে আর প্রায় নড়ে না। সে যাচ্ছিল ট্যাক্সিতে। বড়বাজার থানার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা কপালীটোলার সঙ্গে মিশেছে, সেই রাস্তা ধরে বেরিয়ে এসেছিল একটি মেয়ে। ফিরিঙ্গি মেয়ে। হাঁটুর ওপরে ওঠা খাটো ফ্রক, মুখে ব্রন, সে ব্রনগুলো রঙেও ঢাকা পড়েনি। বগলে ভ্যানিটি ব্যাগ, হাতে সিগারেট। বেশভূষায় রংয়ে অশ্লীলতাকে সযত্নে ফুটিয়ে তুলেছে এবং সেটা তার বড় বড় চোখ আর এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলের জন্যে অত্যন্ত খাপ খেয়েছিল। নিজে আর্টিস্ট আনন্দ, সে বলতে পারে—এ ছেড়ে অন্য যে কোন রকম মেকআপ হোক ওকে ওর থেকে ভালো মানাতো না। সে দামী ঝলমলে হলেও না। সুশীলা সাজে মনে মনে ওকে সাজিয়েও আনন্দ দেখেছে কিন্তু তার থেকে করুণ ব্যাপার আর কিছু হ'তে পারে না—এটা সে নিশ্চয় করে বলতে পারে। সংসারে প্রত্যেক মানুষের একটা ক'রে স্টাইল আছে; এইটেই ওর স্টাইল। আনন্দ কপাল কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপনার মনেই, কতকটা স্থান কাল বিস্মৃত হয়েই, মৃদুস্বরে বলে উঠেছিল—হুঁ! মেয়েটা শুনতে পায়নি নিশ্চয়, কিন্তু ড্রাইভারটা পেয়েছিল। বুড়ো শিখ ড্রাইভার। সেও মেয়েটাকে দেখছিল, আনন্দের ছোট্ট 'হুঁ' শব্দটি শুনে তার দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীরভাবেই বলেছিল, চৌরঙ্গি খাতি হ্যায়! ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েটা সিগারেট টেনে উপর দিকে মুখ তুলে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়েছিল; সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোতে ঝড়ো হাওয়ার আমেজ লাগিয়ে ওই জাম ট্রাফিকের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে গাড়িগুলোকে পার হয়ে ওপারে উঠে আর একবার ধোঁয়া উড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। এবার ধোঁয়া ছেড়েছিল জাম ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর দিকে। ট্যাক্সি প্রাইভেট বাস লরীগুলো তারস্বরে হর্ন দিচ্ছিল; বোধ করি তাদের মুখেই ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে মেয়েটা ব্যঙ্গ করে গেল।

আনন্দ সকৌতুকে মৃদু শিষ দিয়ে উঠেছিল।

বুড়ো শিখও হেসে বলেছিল, বহুত্ মজেমে হ্যায়।

আনন্দ আর কথা বলবার সময় পায় নি। সামনে একখানা বাসে এবং একখানা প্রাইভেটে কাছ ঘেঁষে এসে গায়ে গায়ে লাগিয়ে এমন একটা তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক শব্দ তুলেছিল যে, চমকে উঠেছিল সে। প্রাইভেটখানার বাঁ দিকে মাডগার্ড চড় চড় শব্দে ছেড়ে গেল। মনটা চলে গেল ওইদিকে।

এরপর আর মনে হয়নি মেয়েটাকে। এরপর সে মিশন রোয়ে যে আপিসে কাজ ছিল সেখানে গেছে, তারপর সন্ধ্যাতে তাদের আড্ডায় গেছে। আড্ডা মানে একটা নিরিবিলি বার। সেখানে তাদের সমাজের—হ্যাঁ সমাজ ছাড়া আর কি বলতে পারে—আর্টিস্ট জার্নালিস্ট সাহিত্যিক সিনেমা পাবলিসিটির লোক এরা মোটামুটি এক গোষ্ঠী না হোক এক সমাজ, এদেরই কিছু লোক—এক্ষেত্রে এক গোষ্ঠী বলা যায়—তারা এসে জমে। আড্ডা মদ্যপান একসঙ্গে চলে। মদের গ্লাসের টুং-টাং শব্দের সঙ্গে রসিকতার প্রতিযোগিতায় তারই

মধ্যে মাঝে মাঝে প্রাণের কথা—সব নিয়ে চমৎকার জমে ওঠে। আবার ওই গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে ছোট ছোট দল—রাত্রির সঙ্গে দানা বাঁধে। তারপর দলগুলি খসে। এমনি এক দলে পড়ে কাল এরপর হৈ হৈ করেছে বারোটা পর্যন্ত। চুম্বক অবশ্যই ছিল। স্বজাতীয়া অর্থাৎ বাঙালিনীর নৃত্য—কোন এক গুপ্ত বারে। এর মধ্যে এই মেয়েটা যেন আসেই নি। একবার আধবার চকিতের জন্যে ওর দূরবর্তিনী সেই ট্রাফিকের দিকে ধোঁয়া ছাড়া ছবিটা যেন ধোঁয়া ছেড়েই পিছন ফিরে ভিড়ে মিশিয়ে গিয়েছিল। রাত্রে বাড়ি ফিরতে একটা হয়েছিল। এসেই শুয়ে পড়েছিল। চাকর জানে—শনিবার বাবু বাড়িতে খায় না, সে খেয়েদেয়ে শুয়েছিল—আনন্দ চাবী খুলে ঘরে ঢুকেছিল। ঘুম আসতে দেরি হয় নি। গাঢ় ঘুম ঘুমিয়েছে। রাত্রেও ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে নি। কিন্তু দুপুরবেলা স্বপ্ন দেখলে এবং সাড়ে তিনটে হতে হতে তার ঘুম ভাঙল। প্রথমেই মন বলেছিল—বেরিয়ে পড়। থানার পাশে রাস্তাটার মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকলেই দেখা মিলবে। কিন্তু শরীরটা কেমন যেন ভারী মনে হ'ল—যে মুহূর্তে তার মনে পড়ল যে, কাল যা পেয়েছিল সবই প্রায় শেষ করেছে কাল। বাড়িতেও টাকা নেই। আজ রবিবার ব্যাঙ্কও বন্ধ। শুধু ব্যাঙ্ক নয়—সব আপিসই বন্ধ। এসে সে দাড়িয়েছিল আটফুট বাই চার ফুট জানালাটার সামনে।

চৈত্রমাসের সাড়ে তিনটা। রোদ প্রসন্ন। তাত নেই। পার্কের গাছগুলোর উপর পড়েছে পশ্চিমদিক থেকে। পার্কটার চারিদিকে রাস্তা। ওপারের রাস্তায় ওয়ানওয়ে রুটে শহরের যত উত্তরমুখী গাড়িগুলো যায়। সারি সারি প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, বাস, লরী—ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে। কিছুটা দূরে পুলের মুখে যেমন যেমন ট্রাফিক ছাড়ছে—তেমনি এক এক ঝাঁক গাড়ি চলছে। চোখ তার সেইদিকে পড়ল। কিন্তু মন তার খুঁত খুঁত করছে। যাওয়া হবে না? মেয়েটা—। একবার গিয়ে আজও শুধু ওকে দেখে এলে কি হয়? কিন্তু—। নাঃ। পার্শটে টাকা না থাকলে অস্বস্তি অনুভব করে আনন্দ। চাকরটার কাছে আর কত ধার পাওয়া যেতে পারে? এই তো সাতদিন আগে হরিয়া তাকে দিয়েই মনিঅর্ডার ফর্ম লিখিয়েছে। চল্লিশ টাকা বাড়ি পাঠিয়েছে। মাইনে পায় পঁয়ত্রিশ টাকা। বাড়তি পাঁচটাকা। বাজার খরচ, নিত্য খরচ থেকে কমিশন-টমিশন বাবদ আর কত পায় যে—এরপরও ওর হাতে বিশ-পঁচিশ টাকা হতে পারে?

থাক্ গে। আগামী কাল। আগামী কাল। আগামী কাল। সেই টুমরো টুমরো অ্যাণ্ড টুমরো। এপারে তার বাসাটার ধারের রাস্তাটা নির্জন। বাড়িও কম। এপথে গাড়ি নেই। এখন সাড়ে তিনটেতে লোকজনও নেই। চৈত্রমাসে দেবদারু গাছগুলোর সব নতুন পাতা। কাঁচা সবুজ। বাতাসে দুলছে আর রোদের ছটায় পাতার কাঁচা রঙের পালিশ থেকে কাঁপানো ছটা বাজিয়ে ঝিলিকের একটা ঝিলিমিলি—ঝিকিমকি তুলছে। কয়েকটা শিমুল জাতীয় গাছের পাতা ঝরে গেছে নিঃশেষে। শুকিয়ে যাওয়া মতো ডালগুলোয় বড় বড় লাল ফুল ফুটেছে। ক'টা কাক পথে নেমেছে, রাস্তার উপর থেকে কিছু খুঁটে খাচ্ছে। ও—। বেলা দশটা নাগাদ ফুটো ময়লা ফেলা গাড়িটা গেছে রাস্তার উপর দিয়ে ময়লার ছড়া ছড়িয়ে। ক'টা চড়ুই পার্কের ধারে রাস্তার পাশে ধুলোস্নান করছে।

কলকল কচকচ করে ঝটপট করে মারামারি করতে করতে চার-পাঁচটা শালিক উড়ে যাচ্ছে। দুটোয় জড়াজড়ি করে ধপ করে মাটিতে পড়ল। চড়ুইগুলো আশেপাশে কোথায় অজস্র ক্রিচ-ক্রিচ ক্রি-র্-র্-র্; ক্রি-র্-র্-র্ করছেই করছে। চীনে চড়ুই নির্বংশ করেছে। এখানে করে না? মার্ক্সিস্ট সে নয়। কম্যুনিস্টদের প্রেমেও সে পড়ে নি, কিন্তু চীনের এইটেই তার ভাল লাগে।

কম্যুনিস্ট সে নয়, কোন বাদ বা বাদানুগদের ধার সে ধারে না। এখানকার কম্যুনিজমকে সে বাদ বলে না—বলে অনুবাদ। সেই হিসেবে সে বলে—ওসব বাদানুবাদে আমি নেই। তবে চীন রাশিয়াকে তারিফ করি—তার কারণ তারা ঈশ্বর নামক কল্পনাটিকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে। জীবনের সমস্ত পথে বাধা এই কল্পনার প্রস্তরখণ্ড! আর চীনকে তারিফ করি চড়ুই আর মাছি নির্মূল করেছে ব'লে।

অকস্মাৎ একটা কাক একটা বড় দেবদারু গাছের মাথা থেকে ছোঁ মারলে! এঁকে বেঁকে আশ্চর্য গতিতে ছোঁ মারা ওদের। একটা চড়ুই—! সেটাও আশ্চর্য গতিতে ছোট দেবদারু গাছটার পত্রপল্লবের ভিতরে জালের মধ্যে মাছের মতো পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কাকটা গতিবেগ সামলাতে এসে ইলেকট্রিক তারের উপর বসল।

পার্কটার ভিতরে কর্পোরেশনের ছোট অফিসটার ওখানে একদল ঝাড়ুদার জমেছে। গোলমাল করছে! ওধারে বাস চলা ওয়ান-ওয়ে রাস্তাটায় একটা বাস লম্বা একটা কাঁ-চ শব্দ তুলে ব্রেক কষে দাঁড়াল। পিছনে সারিবন্দী গাড়ি।

শিমুল জাতীয় পত্রহীন ফুল-ফোটা গাছটায় কয়েকটা ছেলেমেয়ে ঢেলা ছুঁড়ছে, ফুল পাড়বে। বাচ্চা ছেলেমেয়ে। আজ রবিবার বিকেলে পার্কে বেশ ভিড় হয়। পার্কটার একদিকে খানিকটা মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট। হরেক রকম সাজে সেজেগুজে মেয়েরা আসবে। কত রকম কাপড়পরা সত্তর বছরের বৃদ্ধা থেকে প্রৌঢ়া যুবতী কিশোরী বালিকা। নানারকম পোশাক—নানান খোঁপা—চুল বাঁধা—নানান চেহারা। এক প্রৌঢ়া আসেন—তিনি নিত্যই আসেন—কারণ যেদিনই আনন্দ বিকেলে বাসায় থাকে সেইদিনই সে তাঁকে দেখে—নাতি-টাতি জাতীয় একটি শিশুকে কোলে নিয়ে পার্কে ঢুকছেন। তার সাজসজ্জা, কেশ-পারিপাট্য দেখে সে চমৎকৃত হয়। মুখে পাউডরের পাফ না থাক স্নো-ঘষা হাত যে মুখে বুলোন তাতে সন্দেহ নেই। এককালে সুন্দরী ছিলেন। ও দেখে আনন্দ স্পষ্ট বুঝতে পারে—মহিলাটি মনে মনে আজও যৌবনবনে বিচরণ করেন। কৌতুক অনুভব করে সে।

সেদিন বারের আড্ডায় এক অনতিক্রান্তযৌবনা সমাজ-রাণী জাতীয় একটি মেয়েকে দেখে তার এক বন্ধু বলেছিল—চেন ওকে? ওই যে—রূপালী চুমনী সিগারেট পাইপ হস্তা? উনি স্বনামধন্যা—।

আনন্দ বিস্মিত হয়েছিল বিখ্যাত মহিলাটির নাম শুনে। অবশ্য তিনি বারে বসেন নি, তিনি একটা সেলুন থেকে বেরিয়েছিলেন। আনন্দ সেই কথার সূত্র ধরে মহিলাটির কথা বলেছিল।

বন্ধু বলেছিল—তুই বীটনিক না অ্যাংরি ইয়ংমেন রে?

—কেন?

—যে ভাবে তুনিয়াকে দেখছিস, বিচার করছিস—তাই বলছি।

সে বলেছিল—যা বল। তবে আমি নিজে তুটোর একটাও নই। আমি আনন্দ রায়। আমি ইস্কাপনকে ইস্কাপনই বলি। সে বিবি হলেও খাতির ক'রে মুখের চারিপাশে শেড দিই নে। কিংবা মুখে ইণ্ডিয়ান রেড লাগাই নে। আইভরি ব্ল্যাক ব্যবহার করি। সেজন্ম সত্য, মানুষ যত সত্য তত সত্য। এটা আমি জানি এবং মানি, কারণ আমি একজন মডার্ন মনুষ্য। এবং আমি নারীজাতিকে ভয়ও করিনে বা তার পশ্চাতেও উন্মত্তবৎ ছুটিনে। সংসারে নারীজাতির মধ্যে একটি নারী আছেন যিনি আমার মা। ভগ্নী সেই বাকী নারী জাতিকে ভাগ করি বৃদ্ধা প্রৌঢ়া যুবতীর মধ্যে। তাঁরা সবাই নারী। তাঁদের দেখি রূপ, দেখি ব্যবহার, বিচার করি। যিনি ভদ্রা তাঁকে রুচিতে না বাধলে লাভ করতে চাই। কিন্তু প্রেম ক'রে নয়—বিনিময়ে। তবে কেউ যদি সাময়িক প্রেম বিশ্বাস করতে পারেন তার সঙ্গে সাময়িক প্রেমেও আমার বাধা নেই।

বন্ধু বলেছিল—বাপ্‌স্‌। তুই তো নীভার রে বাবা—

—নো। সহস্রের মধ্যে বলব না—তবে আমি শতজনের একজন। তুমিও তাই। ও-ও তাই।

—গুড। উই আর অল বার্ডস অফ দি সেম ফেদার।

সে বলেছিল—উই আর অল ক্রোজ। কাক পক্ষী। কারণ কাকই সব থেকে বেশি এবং সাধারণ। এবং কাকদের কোন বিষয়ে কোন প্রেজুডিস্ নেই। এবং দারুণ ঐক্য তাদের মধ্যে। শালিকও কমন—কিন্তু শালিক আমরা নই, কারণ তারা বড্ড বেশি কলহ মারামারি করে—যা আমরা করিনে।

কাক-চরিত্র সে ছেলেবেলা থেকেই জানে। কিন্তু এখানে এসে অবধি এই পার্কটার জন্ত এবং এখানকার খোলা ড্রেনের জন্ত কাকেদের আধিক্য হেতু কাক-চরিত্র আরও ভাল ক'রে অধ্যয়ন করতে পেরেছে।

থাক। আজ কাক চরিত্র আর নারীচিত্র দেখেই বিকেলটা কাটুক। না। দেবদারু কচি পাতায় পড়ন্ত সূর্যের আলোর খেলাটা হঠাৎ যেন মনোহারিণী হয়ে উঠল! বাঃ। পশ্চিম আকাশে মেঘ ছায়া ফেলেছে। তাইতে শেড পড়েছে! প্রদীপ্তবর্ণা আলো এই ছায়ায় উজ্জল শ্যামাশ্রী হয়ে উঠেছে।

খিল খিল হাসির শব্দে নির্জন পথটা চমকে জেগে উঠল। নারীকণ্ঠ।

আলোর রূপ আছে—কিন্তু কায়া নেই; কায়ার আকর্ষণ আছে। সে চোখ ফেরালে। হুঁ। আরম্ভ হল নারী অভিযান। একদল মেয়ে—সম্ভবতঃ একই বাড়ির—আসছে। সে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। এক তুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত। সপ্তরথিনী না সপ্তসমুদ্র। না, সমুদ্র নারী নয়। চারটি যুবতী—তার মধ্যে একটি বিবাহিতা। মাথায় ডোনাল্ড খোঁপা। তিনজন বিশ থেকে ষোলর মধ্যে ডবল বেণী সিংগ্‌ল বেণী এলো খোঁপা বাঁধা। তিনটির তুটি বালিকা—একটি বছর তিনেকের। ওদের ববছাঁটা চুল।

—বাবু। চা করব?—হরিয়া চাকর।

—নিশ্চয়!

—রাত্রে?

—বাড়িতে খাব। নিরিমিষ। বুঝলি!

—হুঁ।

ছাতা—লেডিজ ছাতা আসছে! এ দল পার হয়ে গেল প্রায়। কিন্তু আনন্দের সব ঔৎসুক্য ধাবিত হল ছাতার দিকে। ছাতার দিকে নয়, ছত্রধারিণীর দিকে।

দীর্ঘাঙ্গী সুকৃষ্ণা। মানে সুন্দর কৃষ্ণা। আনন্দ রায় এই পাড়ায় নতুন এসেছে। মাসখানেক। মেয়েটি ঘড়ির কাঁটার মতো সকালে একবার বিকেলে একবার এমনই ছাতায় নিজের মুখ ঢেকে চলে যায়। পার্কের যাত্রিণী ও নয়। মুখ ঠিক দেখে নি তবে দেখেছে ওর কালো রঙ আর কালো চুল। একরাশি কালো চুল, এবং সে কেশরাশি ওর দীর্ঘাঙ্গীত্বের সঙ্গে সমতা রেখে দীর্ঘ। হয়তো একটু বেশি। কোমর ছাড়িয়েও নিচে নেমে থাকে। এই বিশেষ সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মেয়েটি সচেতন—শ্যাম্পু ক'রে খুলেই রাখে। ক্বচিৎ দেখা যায় মুক্তকেশী কৃষ্ণার পটভূমি কৃষ্ণ মেঘমালা আজ দুলছে না, ফুলছে না। আর একটি বিশেষত্ব ওর হাঁটার ভঙ্গি। দীর্ঘাঙ্গীদের পায়ের দিকটাই দীর্ঘতর হয়, সুতরাং পদক্ষেপ স্বাভাবিক-ভাবে হওয়া উচিত দীর্ঘ। কৃষ্ণা কিন্তু দীর্ঘ পায়ে খাটো খাটো করে খুব দ্রুত ছন্দে চলে। তাতে একটি নৃত্যভঙ্গির সৃষ্টি হয়। মেয়েটির নাচ জানা উচিত।

ময়না পাড়ার মাঠে মেঘ এলে কালো মেয়ের মতো আকাশের দিকে চেয়ে বারেক তার দিকে তাকিয়ে গাইটিকে ডাকবার জায়গাও এ নয়, কথাও ওর অবশ্যই নয়—কিন্তু কোনদিনই কোন কারণে ছাতাটিকে সোজার বদলে ঘাড়ে ফেলে আকাশে দিকেও তাকালে না, কোন ভাই বোনকেও ডাকলে তার দিকেও তাকালে না। ওর চোখ কালো হরিণ চোখ কি না সে দেখা আনন্দর আর হল না। মধ্যে মধ্যে মনে হয় দেখলে ছবি এঁকে কোন কালিওয়ালা কোম্পানিকে বেচে আসতে পারত। ক্যাপসন দিত—'যতই কালো হোক্'! উঁহু। ক্যাপসন দিত—'চিকন ছাঁদে লেখা আমার এমনই কালো হোক্'।

অবশ্য ঔৎসুক্য থাকলেও মনোযোগ আকর্ষণের কোন চেষ্টাই কোনদিন করেনি আনন্দ। ওর নিজেরও যে সে মাঠ চাই। আনন্দর সে মাঠ চৌরিঙ্গীপাড়া। আজ কিন্তু ইচ্ছে হ'ল সজোরে 'হরিয়া' বলে চীৎকার ক'রে ওঠে। না, থাক। ছত্রধারিণী চলে এসেছে তার জানালার সামনে। হাতের কনুই আর সঞ্চরমাণ পায়ের পাতা দুখানির অগ্রভাগ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। সাদা কাপড়। একহাতে ছাতা, অন্য হাতে খাতা বা বই। কাজেই কনুই ছাড়া গোটা হাত দুখানাও দেখা যায় না। ব্লাউজটা উজ্জ্বল জরদা রঙের।

আরে! কি হল? একটা কাক ছোঁ মেরে নেমে এসেছে ওর ছাতার উপরে! কি কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে ঘটল ঘটনাটি—একটা পিনকুশনের মতো কিছু এসে সজোরে লাগল আনন্দর ডান ভুরু চোখ এবং নাক ও ভুরুর সংযোগস্থলে। কটা পিনের ডগা যেন বিঁধে গেল। নিষ্ঠুরভাবে বিঁধে গেল। মুহূর্তে ডান হাতখানা আপনা-আপনি উঠে বস্তুটাকে

চেপে ধরলে এবং মুখ থেকে যন্ত্রণাকাতর এবং ক্ষুব্ধ চীৎকার বেরিয়ে গেল—আঃ। এবং টেনে ছাড়িয়ে নিল বস্তুটাকে। বিঁধে যেন আটকে গিয়েছিল। নরম। উষ্ণ। হাতের মুঠোর মধ্যে সে স্পন্দন অনুভব করছে! হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে কম্পন।—কি?

কি? একটা চড়ুই পাখী। আনন্দের দৃষ্টি যখন ছত্রধারিণীর ছত্রের কালো কাপড় থেকে মাটির দিকে ওর চুল, ওর জরদা রঙের ব্লাউজের হাতা, কনুই, ধবধবে পাড়হীন কাপড়ের বেড় বেয়ে স্যাণ্ডেল পরা পায়ের পাতার দিকে বিচরণ করছিল, তখন কাক শালিক চড়ুই প্রভৃতি পক্ষীরাজ্যের নিয়মানুযায়ী তাদের জীবনযাত্রা চলেছিল স্বাভাবিক ভাবে। ইলেকট্রিক পোস্টে বসে থাকা একটা কাক একটা উড়ন্ত চড়ুইকে লক্ষ্য ক'রে ছোঁ মেরে নেমে এসেছিল, —চড়ুইটা প্রাণভয়ে উন্মাদের মতো সম্মুখে ওই জানালাটার দিকে উড়ছিল, কারণ আর কোন আশ্রয় সামনে ছিল না। ওদিকে কাকটা ছোঁ মেরে এসে ঝোঁক সামলাতে না পেরে ছত্রধারিনীর ছত্রপ্রান্তে পাখার ঝাপট মেরে উপরে উঠে গিয়েছিল—এদিকে চড়ুইটা উন্মাদ পলায়নের বেগে এসে শিকের ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকে—আনন্দর চোখের উপর ও নাক-ভ্রূর সন্ধিস্থলে ঝপ ক'রে পড়ে নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল।

আনন্দ নিষ্ঠুরভাবে টিপে ধরলে চড়ুইটাকে। টিপেই মেরে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে টপ টপ করে দু-ফোঁটা রক্ত ঝরে এসে পড়ল তার পাঞ্জাবির উপর। ঘরের ভিতরে দেওয়ালে টাঙানো আয়নায় তার ছবি পড়েছে। চোখের কোণ থেকে রক্ত গড়িয়ে আসছে। মুখখানা রূঢ় কঠোর নির্মম হয়ে উঠেছে। দাঁতের উপর দাঁত শক্ত হয়ে বসেছে। হাতের মুঠোও শক্ত হচ্ছে।

—ইস্, এ যে চোখ থেকে রক্ত পড়ছে আপনার! মিষ্ট উদ্বিগ্ন নারী-কণ্ঠস্বর। ওই ছত্রধারিণী কৃষ্ণাঙ্গী। আনন্দ ফিরে তাকালে। হেসে বললে—হ্যাঁ। একটা চড়ুই।

হাতের মুঠোটা খুলে দেখালে সে। তালুর উপর চড়ুইটা হতচেতন হয়ে পড়ে আছে। পা দুটো মুড়ে বেঁকে গেছে। চোখ দুটো স্তিমিত। মধ্যে মধ্যে শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আবার আনন্দ মেয়েটির মুখের দিকে তাকালে। বেশ মুখ। লম্বা ধরনের মুখ। টিকলো নাক। চোখ দুটো আয়ত নয় কিন্তু লম্বা। পাতলা ঠোঁট। মসৃণ মুখ। নিরীহ, শান্ত। সে তার কথার পুনরুক্তি ক'রে প্রশ্ন করলে—চড়ুই!

—হ্যাঁ চড়ুই। একটা কাক ছোঁ মেরেছিল—সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আপনার ছাতায়—

—হ্যাঁ। চমকে উঠেছিলাম আমি। ছাতাটা একপাশে বেঁকিয়ে দেখলাম কাকটা উড়ে যাচ্ছে—আর আপনি চোখে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন। তারপরই দেখি রক্ত পড়ছে আপনার চোখ থেকে।

—চড়ুইটা প্রাণের ভয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে সামলাতে পারে নি—পাশ কাটাতে পারেনি বোধ হয় শিকগুলোর জন্যে। ঝপ করে এসে পড়েছে চোখের উপর।

সে আবার তাকালে—চড়ুইটার দিকে। এবার চোখ মেলেছে—তাকাচ্ছে। কালো চকচকে দুটি চোখ। দু ফোঁটা টলটলে কালির ফোঁটার মতো। আশ্চর্য ভাবে মনটা তার করুণার কোমলতায় ভরে উঠেছে। রূঢ়ভাবে সেটাকে টিপে ধরার জন্য যেন মনে একটু লজ্জা হচ্ছে। বেদনাও অনুভব করছে। আহা বেচারা প্রাণের ভয়ে তপ্ত খোলা থেকে

লাফিয়ে আগুনে পড়ার মতো তার মুখের উপর এসে পড়েছে মাথা ঠুকে। এবার নড়ছে।

মেয়েটি জানালার ওপাশ থেকে বললে—আপনি রক্তটা ধুয়ে ফেলুন। না—বরং ডাক্তারকে দেখান। চোখের ভিতরে কিছু—

—চোখের ভিতরে?—সে আয়নাটার দিকে তাকালে। ঠিক কোণ থেকেই রক্ত গড়াচ্ছে, কিন্তু চোখের ভিতরে নয়। শুধু জ্বালা করছে, বিন্দু বিন্দু করে রক্তও জমে জমে গড়াচ্ছে—কিন্তু কোন বেদনা নেই। কিন্তু—কিন্তু—। আয়নার মধ্যে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখে অবাক হয়ে গেল সে। এই মিনিট খানেক আগে, রক্তের প্রথম ফোঁটাটা জামায় পড়তেই চড়ুইটাকে হাতের মুঠোর টিপে ধরে যখন কি হয়েছে দেখবার জন্ত আয়নার দিকে তাকিয়েছিল—তখনকার ছবিটা তার মনে পড়ে গেল। রূঢ় হিংস্র নিষ্ঠুর একজনকে দেখেছিল সে। তার বদলে এ কে? শান্ত কোমল প্রসন্ন একটি মানুষ।

বাইরে থেকে মেয়েটি প্রশ্ন করলে—চোখে ক্ষত হয়েছে?

একটু হেসে সে বললে—না। তার মুখের দিখে সে আবার তাকালে। কালো লম্বা মেয়েটি—একটু শীর্ণা, লম্বাটে মুখ সরু কিন্তু টানা চোখ। ওই চোখের লম্বা টান এবং ওই একরাশ দীর্ঘ চুল ছাড়া শ্রী কোথাও নেই। তবু বেশ লাগল তাকে।

মেয়েটি বলেই যাচ্ছিল—তা হোক। চোখের ভিতর কিছু হয় নি—সে আপনার লাক্। কিন্তু পাখীর নখ—বিষ থাকে শুনেছি। তা ছাড়া পাখী তো ডালে পাতায় পথে ধুলোয় নোংরায় অহরহ ঘুরছে বসছে, বিষ লেগে নিশ্চয় থাকে। ওটা আপনি ধুয়ে ফেলুন। মানে আইডিন-টাইডিন দিয়ে। ডাক্তার দেখালেই ভালো করবেন।

আনন্দ বললে—ধন্যবাদ। হ্যাঁ তাই দেখাব।

বলে সে পাখীটার দিকে তাকালে। সেটা এখনও ধাক্কা সামলাতে পারে নি। উঠবার—পাখা ঝেড়ে উড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

মরে যাবে নাকি? ভারী কষ্ট লাগল। সে বললে—এটাকে একটু জল দি!

—আপনি আর্টিস্ট—না? হেসে বললে মেয়েটি। তারপর বললে—ওটাকে বরং কোন তাকে তুলে দিন—সামলে উঠবে। জল দেবেন—হয়তো নাকে ঠোঁটে বেশি জল পড়লে দম বন্ধ হবে নয় বুকে আটকাবে। আচ্ছা—নমস্কার।

চলে গেল সে। খাটো পাদক্ষেপে। লম্বা পা দুখানি খর খর ফেলে সে ছাতাটিতে নিজের মুখখানা যথাসম্ভব ঢেকে চলে গেল।

হরিয়া চা নিয়ে এল। তাকে বললে—টিংচার আইডিন আছে রে?

হরিয়া তার মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললে—কি হইল?

—কিছু হইল। কেটে গেল। একটু জল আর টিংচার আইডিন আন তো। চায়ের কাপটা সে হাতে নিয়ে চুমুক দিয়ে বললে—বাঃ, বেড়ে চা করেছিস তো।

বাইরে আলো যেন লালচে হচ্ছে। আকাশের মেঘে সূর্যের পড়ন্ত আলোর রক্তসন্ধ্যার ছটা ফুটছে। মেয়েটি বেশ! বাইরে মেঘের দল আসছে—এদিক ওদিক দুদিক থেকে। আনন্দ একমনে কিছু ভাবতে লাগল। রক্তসন্ধ্যার পটভূমিতে কালো দীর্ঘাঙ্গী এলোকেশী,

লম্বা টানা সরু চোখ।

*   *   *   *

পরের দিন তখন বেশ একটু বেলা হয়েছে। আনন্দ উঠল। একটু যেন জর্জর যন্ত্রণা সারা মুখে যন্ত্রণার কেন্দ্রবিন্দু চোখের কোণ, ভুরু ও নাকের সংযোগস্থল। হাত দিয়ে দেখল। ফুলেছে নাকি? একটু। আয়নার দিকে তাকালে। হ্যাঁ, একটু ফুলেছে। রাত্রে বুঝতে পারে নি। রাত্রে খুব গাঢ় ঘুমিয়েছে টিংচার আইডিন লাগিয়ে কিছুক্ষণ জানালার ধারে সেই পূর্বের মতোই দাঁড়িয়েছিল। মনটা খুব প্রসন্ন, তার থেকেও বেশি উল্লসিত, খুব খুশি হয়ে গেছে। বাইরের দিকে খুশি হয়ে তাকিয়েছিল কিন্তু কিছুই দেখে নি—মানে ঠিক দেখে নি—কারুর দিকে মন আকৃষ্ট হয় নি। সেই প্রৌঢ়া পক্ককেশা বিলাসিনী গেলেন, কোলে নাতি হাতে পান—মনে সে কোন কৌতুক অনুভব করে নি। একদল ছোট মেয়ে আছে, তাদের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে. তারা এসে চলে গেছে। কি যেন বলেও ছিল—সে বলেছিল—হুঁ। কিসের উত্তরে হুঁ বলেছিল মনে নেই। রক্তসন্ধ্যা গাঢ় হয়েছিল, কাঁচ পাতার ঝিকিমিকিতে লাল আভা একটু মেরেছিল বোধ হয়, সেদিকেও ভালো করে তাকায় নি। ভাবছিল—বেড়ে রোমান্সটুকু হয়ে গেল। এরপর? বিয়ে? রাম কহো! ও পথে আনন্দ হাঁটে নি—হাঁটবে না। একটু খেলা? তা মন্দ হয় না। মন অনেক দূর ছোটে। সে এ পাড়ায় থেকে হয় না। তবে; অন্য পাড়ায় উঠে গিয়ে তবে হয়। যা দেশ!

সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!

আনন্দের থিয়েটারে ঝোঁক আছে। সে অবশ্য সিরিও-কমিক পার্ট করে। সিরিয়াস পার্ট করতে পারে না; হাসি পায়। অবশ্য তার একারই নয়—এ যুগের সব তরুণেরই তাই! তরুণ তরুণী—সব। তবুও চন্দ্রগুপ্ত নাটকের 'কি বিচিত্র দেশ' ভাল লেগেছিল ছেলেবেলায়। সেটা আজও লাগে। সোজা বাঁকা সব কথাতেই দেশের কথা উঠলে এই কোটেশন দেয় সে।

এ দেশে একটি মেয়ে একটি ছেলে পরস্পরে হাস্যে লাস্যে রসিকতায় সঙ্গ সাহচর্যে কয়েক দিনের জন্যে মিলবে খেলবে, আবার ছাড়াছাড়ি হলে ভুলবে—এ হবার উপায় নেই। কাল তবুও মন বাঁধ মানে নি। রোমান্সহীন দেশ, বিয়ের আগে বর কনেতে আগে দেখা হত না। সাত পাকের সময়ে আজও পানে মুখ ঢেকে কনে শুভদৃষ্টি করতে আসে। বিংশ শতাব্দীর এটা যাট বছর পার হল, গোটা দেশে আজও ঘুঁটেতে উনোন ধরে। দামোদর প্রজেক্ট—ইলেকট্রিসিটির প্রসার করতে গিয়ে দেখা গেল, দামোদরের জল কমে গেছে। এ দেশে এখনও রোমান্স পত্রযোগে—বড়জোর আপিসে সহকর্মী-সহকর্মিণীর মধ্যে—তাও আপিসের পরে ধর্মতলায় কার্জন পার্কে কাগজ পেতে মাঠে বসে গোটাকয়েক আধা আধো কথা বিনিময়, একটু যাকে বলে—অনুচ্চ খাটো হাসিতে তাও সম্পূর্ণ হয়ে ফুলস্টপ পর্যন্ত এগোয় না, অন্য কেউ তাকালেই সেই তাকানোর কথা সেমিকোলনেই শেষ। সুতরাং আজকের এই চড়ুইয়ের নখে দু ফোঁটা নাকের কোণের রক্তপাত দেখে একটি তরুণী মেয়ের অকৃত্রিম সহানুভূতিতে

এগিয়ে আসা কি সোজা রোমান্স! আনন্দর মন আপনিই ছুটেছিল—স্বাভাবিক ভাবেই। মনে মনে কাল বিকেলে ওকে নিয়ে ময়দানে বেড়িয়েছে, হাতে হাত রেখে পাশাপাশি বসেছে। রাত্রে—জেটীর উপর রেস্টুরেন্টে বসেছে।

মনটা তার অধীর চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এমন দিনে তার কাছে টাকা নেই! কখন আপনার অজ্ঞাতসারেই ডেকে ফেলেছিল—হরিয়া।

হরিয়া সাড়া দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে,—যাই। এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই এসে, সামনে দাঁড়িয়েছিল।—কি ?

—ও! হাঁ। মানে, তোর কাছে টাকাকড়ি আছে ? কুড়িটে টাকা—

—অতো নাই। দশ টাকা আছে।

—দশ টাকা ?—আচ্ছা তাই দে। না—চলে যা বাজারে। বিলিতী মদের দোকান বের করে নিবি খুঁজে, বুঝলি ? একটা রম হুইস্কী পাঁইট নিয়ে আসবি। বুঝলি ? আর ভাল ক'রে মাংস বানাবি।

হরিয়া চলে গিয়েছিল। সে এবার গতি পেয়েছিল দেহে মনে। সর্বাগ্রে দেখতে গিয়েছিল চড়ুইটাকে। কই ? চড়ুইটা কোথায় গেল ? কই, উড়ে তো জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায় নি। ঘরখানা অপরাহ্নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হচ্ছে ক্রমশ। এরই মধ্যে আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। জানালার সামনেটায় খানিকটা মেঝেতে খানিকটা আলো যেন এলিয়ে শুয়ে পড়েছে মাটির উপর। উপর দিকটা চারিপাশ বেশ কালো দেখাচ্ছে। সে এগিয়ে গিয়ে সুইচটা টিপে আলো জাললে। কোথায় গেলেন তিনি ?

সঙ্গে সঙ্গে—চি-রি-ক—শব্দ করে চড়ুইটা উড়ল, ওই আলোটারই বাঁকা হোল্ডারটার উপর থেকে। ওই যে! তাক থেকে উড়ে গিয়ে কখন আলোটার উপর বসেছিল। আলোটা হঠাৎ জলে উঠতেই চমকে উঠে উড়ছে। ভয় পেয়েছে। বেচারা!

সারা ঘরখানায় উড়ে পাক দিয়ে গিয়ে বসল একবারে ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ইলেকট্রিক লাইনের বিটের উপর। কাঁপছে। নখ দিয়ে বিটের কাঠ আঁকড়ে ধরে দেয়ালের কোণে যেন লেগে আছে। একটু সকরুণ হেসে আবার সে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিল। থাক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিয়া ফিরে এসেছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোতল খুলে খানিকটা খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে খুশি হয়ে উঠেছিল। নেশা ধরতে দেরি হয় নি। হরিয়ার তুলনা হয় না। অদ্ভুত স্প্লেনডিড্, ওয়াণ্ডারফুল। মুখরোচক খাদ্যগুলি তৈরি করে ডিসে পরিপাটি করে সাজিয়ে দিয়েছিল।

গান সে গাইতে পারে না। তবুও মৌজের মুখে—বেশ গলা ছেড়েই গান ধরেছিল—

'কালো তা সে যতই কালো হোক—

দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।'

কিছুক্ষণ পর মনে পড়েছিল—কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে। কালো কেশে রাঙা কুসুম—। নাঃ—তারাশঙ্কর এখানে ফেল। হয় নি।

প্রমত্ত আনন্দের এলোমেলো চিন্তাগুলো চঞ্চল চড়ুই পাখীর মতোই মনের গাছের মধ্যে

লাফিয়ে লাফিয়ে এ-ডাল ও-ডাল করেই যেন ফিরছিল। বাইরে একটা বরফওয়ালা হাঁকছিল—ব্রোফ! তাকে ব্যঙ্গ না করেই সে তার নকল করেছিল—ব্রোফ! তারপরই সে নকল করেছিল চড়ুইয়ের ডাক—ক্রি-রি চ! হয়তো বা দুটো শব্দের রফলায় একটার সঙ্গে অন্যটার কোথাও মিল পেয়েছিল।

হঠাৎ মনে প্রশ্ন হয়েছিল—চড়ুইটা কি?

নারী অথবা—? কি? সে চেনে, চড়ুইয়ের কোনটা পুরুষ কোনটা মেয়ে। পুরুষ চড়ুইগুলো লালচে হয়, গলার নিচে একটা কালো রংয়ের ত্রিভুজ দাগ থাকে. বেশ ঘন কালো। মেয়েগুলো ধূসর হয়, মানে একটু ফর্সা, গলায় কালো দাগের হারের মতো একটা বেড় থাকে। ডাকেরও পার্থক্য আছে। এটা কি? নারী? নিশ্চয়। না—ভালো করে দেখে নি তখন। আছে নাকি এখনও? বেরিয়ে গেল কখন? সে উঠে খুঁজতে শুরু করেছিল। কই? কোণটা দেখেছিল সর্বাগ্রে। তারপর আলোর হোল্ডারটা। তারপর এদিক ওদিক। কই? পায় নি দেখতে।

পালিয়ে গেল?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল—'ওরে রাজহংস জন্মি দ্বিজবংশে এমন নিষ্ঠুর কেন হলি রে'?—ভুল হ'ল নাকি? হোক্। সে ছবি আঁকে—লাইনে ভুল না হলেই হল। রাজহংসের ছবিতে—। থমকে গিয়েছিল আনন্দ! হ-য়ে-ছে! হয়েছে! ইউরেকা! ইউরেকা!

—হ-রি-য়া! হরিয়া।

হরিয়ার পেটেণ্ট উত্তর—যাই। এবং মুহূর্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল।—কি?

—রঙ তুলি দে! ছবি আঁকা কাগজ—

—ছবি আঁকবে—এখন?

—এখুনিই।

ছবি আঁকবে সে। চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে। না—চটকদূত ও কৃষ্ণা। একটা জানালা—তার শিকে বসে আছে চটকদূত, বা পাখা মেলে এসে সদ্য বসছে। কালো—না কৃষ্ণা পথে থমকে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়েছে; একটা পা এইদিকে বাড়িয়ে দেবে। ইউরেকা!

হরিয়া বলে উঠল পিছনে রঙ তুলি কাগজ-রাখা দেওয়াল আলমারীর কাছ থেকে—চড়ুই পাখীটা!

—চড়ুই পাখী?

—হঁ। সেই বিকেল বেলার পাখীটা হবে।

—কোথায়?

—এই যে, আলমারীর তাকে রঙের বাস্কোটার উপর বসি রইছে।

—বসি রইছে?—আনন্দ অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠে পড়ল। বললে—ওড়াস নি। থাক।

—রঙের বাস্কোটার উপরে বসি রইছে যে!

—থাক। রঙের বাকসো নাড়িস নে। থাক ছবি আঁকা। সরে আয় তুই।

হরিয়া সরে এল। আনন্দ এগুলো না বেশি, দূর থেকে দেখলে।—ধূসর রঙ, গলায় কালো

একটি বেড় শুধু কালো হারের মতো। ত্রিভুজ নয়।—দূতী! দূতী!

দূত হলে আজ ওটাকে ওই বোতলের পানীয়ের সঙ্গে রোস্ট করে খেয়ে নিত আনন্দ।

কিন্তু দূতী—সখী তুমি থাক। তুমি থাক।

—হরিয়া।

—আঁ।

—পাউরুটি আছে?

—আছে।

—খানিকটা ভেঙে গুঁড়ো ক'রে ছড়িয়ে দে। সেই বিকেল বেলা থেকে ঘরে ঢুকেছে, বেরোয় নি তো, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়। আর রঙের একটা ছোট বাটিতে জল দে একটু। এঁ্যা?

হেসে হরিয়া বললে—রাত্রিবে উরা কানা হয়ে যায়। খাবে না।

—তুই দে তো! আলো থাকলে কানা হবে কেন? রাবিশ কোথাকার।

মুচকি হাসতে হাসতে হরিয়া চলে গেল। হরিয়া মনিবকে জানে। দিনের মনিব রাত্রিকালের মনিব আলাদা। সে দুজনকেই চেনে।

আনন্দ দূর থেকেই সস্নেহ মমতার দৃষ্টিতে চড়ুইটার দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট্ট জীবটি। এতটুকু! ওঃ, ওই কৃষ্ণা যদি সেই শঙ্কিত সহানুভূতি মাখানো কণ্ঠে, তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে—ইস্, আপনার চোখ থেকে রক্ত পড়ছে যে!—কথা কটি না বলত তাহলে মুঠোয় টিপে ধ'রে মেরে ফেলত সে। মনে পড়ছে, মাটিতে সজোরে আছড়ে ফেলে দেবার হিংস্র অভিপ্রায় গর্তের মধ্য থেকে ক্রুদ্ধ সাপের বের হবার মতো পাক দিয়ে উঠেছিল। হঠাৎ ওই কথা কটি এবং বলার সুরটি, তার সঙ্গে নারী-কণ্ঠটি বাঁশের বাঁশীর মতো বেজে উঠে সাপটাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিয়েছিল।

সে মৃদুস্বরে পাখীটাকে বলেছিল—Ask your God to bless her—not me. She is—কালো? তা সে যতই কালো হোক—আমি দেখেছি তার কালো-হরিণ চোখ!

হরিয়া ফিরে এসেছিল পাউরুটি গুঁড়ো এবং জল নিয়ে।

—দুধ তো আমাদের নেই। চায়ের জন্যে—সেও তো পাউডার মিল্ক। তাই একটু ক'রে দে না। না। থাক। ওই থাক এখন।

—খাবে না। রাত্তিরি যে—! হাসলে হরিয়া।

—তুই এত ফ্যাক্ ফ্যাক্ ক'রে হাসিস কেন বল্ তো?

হরিয়া বলেছিল—খাবার হয়ে গেছে। রাত্তিরি ইগারোটা বেজে গেল।

বোতলটার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল আনন্দ। সব শেষ হয়ে গেছে। রাত্রি এগারোটা। সুতরাং সে বলেছিল—দে, তাই দে।

খেয়ে দেয়ে বিছানায় পড়বামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিল। শেষরাত্রে তেষ্টা পেয়ে উঠে জল খেয়ে আবার শুয়েছিল। তখনই ক্ষতস্থানটা একটু টন টন করছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তখন ওটা হুইস্কীর প্রভাবে কিনা ঠাওর হয় নি। একটা সারিডন খেয়ে শুয়ে পড়েছিল।

তখন থেকে এখন বেলা সাড়ে আটটা পর্যন্ত নাগাড়ে ঘুমিয়েছে।

সকালবেলা উঠে মনে হয়েছে ব্যথার কথা। মুখ ধুতে গিয়ে হাত লেগে টন টন করে উঠেছে। আয়নায় দেখে দেখলে একটু ফুলেছে। বেশি না—সামান্যই। তবু ফুলেছে। কালো মেয়েটিকে মনে পড়ল।

* * * * *

চড়ুই পাখীটাকেও মনে পড়ল। সে পিছনের দিকে আলমারীটার দিকে ঘুরে তাকালে—নেই, পাখীটা উড়ে গেছে। আলমারীটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এঃ, রঙের বাক্সটার উপরটা ময়লা করে দিয়ে গেছে। পাঁউরুটির গুঁড়োগুলি তেমনিই ছড়ানো আছে। জলটা উল্টে পড়েছে।—তাহলে জল খেয়েছে। যাক্, গেছে ভালোই হয়েছে। আবুহোসেনের বাদশাহীর মতো এইসব উদ্ভট কল্পনা রোমান্টিসিজম্ একরাত্রির স্বপ্নের মতোই হওয়া উচিত। আবার মনে পড়ল কালো মেয়েটিকে। কোন্‌খানে ওর রূপ দেখেছিল—ভাবতে চেষ্টা করলে সে। রাবিশ্। কোথাও একফোঁটা রূপ নেই মেয়েটার। শুধু চুল। এবং সরু অথচ লম্বা টানা চোখ দুটিতে ফোঁটারও একটু, সিকি ফোঁটা শ্রী আছে।

সহমরণের দেশ—সতী বালিকের হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে হয়, ঘোমটা বর্ম চ্ছাদিতা, অন্তঃপুর দুর্গবাসিনী নারীকুল যেখানে—সেখানে অনন্তকাল ধরেই স্বাধীন প্রেমের দুর্ভিক্ষ! সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কঙ্কাল একজন; ডাস্টবিনের চারিপাশে ঘোরার মত চৌরিঙ্গীর বারে ও ধারে ঘোরে; কালকের সেই রঙ মাখা ব্রনওয়ালা ফিরিঙ্গী মেয়েটাকে দেখে চঞ্চল হয়, রোমান্স খোঁজে, এমনই যার আসল স্বরূপ—সে এই কালো একটি মেয়েকে দেখে আদ্ধেক রাত্রি মদ খেয়ে নানান কল্পনা করবে তার আশ্চর্য কি। যাক, সকালে নেশা কেটে আসল বাস্তববাদী মডার্ন মনুষ্যটি কবর ঠেলে উঠেছে এই সৌভাগ্য। গুড লাক্, আনন্দ, গুড লাক্!

ওঃ, কাজ কত!

ক'খানা বইয়ের কভার ডিজাইন। সুধীন মুখুজ্জের তাগাদায় কলেজ স্ট্রীট মুখো হবার জো নেই। উইলিয়ামস-এর ওষুধের প্যাকেট এবং লেবেলের ডিজাইনগুলো না দিয়ে কারু কাজ নয়। তার ভাতঘর।

—হরিয়া। হরি—। হ-রি-য়া—

কোথায় গেল? বাজার? তাহলে চা-টা নিজেই করে নিতে হয়। পারে সে সব। সব পারে। করেছেও তা। আজ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সে বাসা করেছে, হরিয়াকে রেখেছে। মাসে চার-পাঁচশো সে রোজগার করে, কিন্তু দুবছর আগে পর্যন্তও এসব ভাবতে পারে নি সে। ভাগ্য ছাড়া একে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

অনেক কাজ আছে। নিজেই চা ক'রে খাবার জন্য রান্নাঘরে ঢুকল সে। চা খেয়ে বাথ-রুম গেল। স্নান সেরে নেবে, মাথাটার মধ্যে নেশার প্রতিক্রিয়ায় কেমন একটা অস্বস্তি রয়েছে। মনের ভিতরটাও যেন অপরিচ্ছন্ন ঝাঁট না-দেওয়া না-মোছা ঘরের মতো হয়ে রয়েছে। শুধু অপরিচ্ছন্নতাই নয়। সারারাত্রি বন্ধ ঘরের মতো একটা ভ্যাপসানি যেন মেজাজকে ভার করে রেখেছে। স্নান করলেই পরিচ্ছন্ন হবে মন। জানালা খুলে দেওয়া ঘরের মতো

আলোয় বাতাসে উজ্জ্বল এবং হাল্কা হয়ে উঠবে। কাজ ওই সাফা হাল্কা মন ছাড়া হয় না। নোংরা মনের কাজে তার ছাপ পড়বেই। রঙ তুলি নিয়ে কাজ তার, সে তো জানে—তুলি ছেড়ে অন্য কাজে হাত দেবার আগে হাত ধুতে হবে। নইলে আঙুলে লাগা কালি কাপড় জামা থেকে মুখে পর্যন্ত লাগতে পারে। আবার তুলি ধরবার আগেও হাত ধুতে হবে। নইলে কোথায় কোন্ আঙুলের কোণে বা হাতে তালুর কোথাও লেগে থাকা দেওয়ালের রঙ বা মেঝের ময়লা নয়তো ঘামের ছোপ কাগজে ক্যানভাসে পড়বে, রঙের সঙ্গে মিশবে।

স্নানঘরে ঢুকে ঝাঁঝরি খুলে দিয়ে স্নান করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল এককালে সে স্নানের সময় মন্ত্র আওড়াতো—ওঁ সূর্য্যস্যমেতি মন্ত্রস্য প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা—। তারপরে ওসব ছেড়ে দিয়ে মন্ত্র পড়ার মতো ভঙ্গিতে আউড়ে যেতো—যে করবে পুণ্যি তাকে শাপমন্যি—যে করবে পাপ তাকে আশীর্বাদ—বিনা আশীর্বাদেই সে সাত বেটার বাপ। মনে পড়তেই হাসি পেল।

ওঃ! জলের ধারা ঝরঝর ক'রে মাথায় গায়ে ঝরে পড়তেই মনটা হাল্কা হয়ে গেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চুল আঁচড়ে কাজে বসল। মুহূর্তে আনন্দ পাল্টে গেল। এ আনন্দ আর এক আনন্দ। আনন্দ নিজেও তা জানে। একটা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মানুষকে দেখা যায়। একটা মানুষের মধ্যে দুটো তিনটে চারটে—এমন কি পঞ্চপাণ্ডবেরও বসবাস সম্ভব। ধার্মিক, সত্যবাদী, ঔদরিক, ক্রোধী, নারীবিলাসী, মিলিটারি এক্সপার্ট, অশ্ববিদ, একালে মোটরবিদ্ হতে পারে, জ্যোতিষবিদ—একটা মানুষই হতে পারে। আবার সেই বর্বর যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত সব যুগের মানুষই এই যুগের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে। দুর্যোধনেরা একশো ভাই—কিন্তু আসলে ওরা একটি। ওদের ভাগ্যে দ্রৌপদী জুটতেই পারে না।

রাম্ কহো। ছোড়ো। ও সব চিন্তা ছাড়ো। উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ, আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ। কাগজ নিয়ে বোর্ডে এঁটে সে রঙের পাত্র এবং তুলি তুলে নিলে।

হরিয়া এসে দাঁড়াল।—জলখাবার দি।

—কি করেছিস?

—ডিম ভেজেছি।

—তার সঙ্গে রুটি দু টুকরো। বাস্।

—মিষ্টি?

—না। কাল যা খাইয়েছিস!

—লোক এসিছে। বাইরে দাঁড়ায় আছে। একখানা কাগজ দিলে সে। আনন্দ পড়লে।

জর্দাওয়ালা রামেশ্বর। জর্দা বেচে বিখ্যাত হয়েছে, পয়সা করেছে। এখন কৌটোর প্যাকেটে রঙীন মোড়ক করবে। টাকা অগ্রিম দিয়ে গেছে। কাজটা হয় নি। মনটা খিঁচড়ে উঠল। ভুরু কুঁচকে ফুটে উঠল সেই বিরক্তি। কিন্তু উপায় নেই—তিন মাস টাকা

নিয়ে রেখেছে। মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললে—যা, বলগে আপনার কাজই করছে কাল এসে নিয়ে যাবেন। এখন দেখা করতে গেলে সময় যাবে। আপনার কাজই নষ্ট হবে।

হরিয়া চলে গেল। আনন্দ বললে—রাবিশ! চুপ ক'রে বসে রইল কিছুক্ষণ। হয়েছে। একটি পদ্ম—তার মধ্যে জর্দার কৌটো। একটি মেয়ে, তার এক হাতে পান অন্য হাতটি—ডান হাতটি বাড়িয়েছে জর্দা নেবার জন্যে। নিচে লেখা হবে—ও হরি! রামেশ্বরের জর্দা! আমি ভেবেছি পদ্ম! ওই যে বিলাসিনী স্থূলকায়া পক্ককেশী সুরূপা সুহাসিনী গরবিনী ধনী পার্কে আসেন নিত্য—ওকেই এঁকে দেবে।

খুশি হয়ে নিজেই বললে—গুড। ভেরি গুড!

কাগজের উপর পেন্সিল চালিয়ে স্কেচ শুরু করলে এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে মগ্ন হয়ে গেল। এ বেলাতেই সারতে হবে এটাকে। এ বেলাতেই! ওবেলা থেকে উইলিয়মস কোম্পানির কাজ!

সে আনন্দ পারবে। পারে সে। তার সে কিস্মৎ আছে।

ওঃ এক সময়—একদিনে পাঁচটা স্কেচ শেষ করে কাগজে যোগান দিয়েছে। ১৯৪৩।৪৪ সালে দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরের সময়।

আজও সে শক্তি তার আছে। পেন্সিল তার হাল্কাটানে চলেছে।

প্রৌঢ়ার মুখখানা একটু ভেবে নিলে; হ্যাঁ। গালে একটা কি দুটো পান পোরা আছে। একদিকের গাল আবের মতো ঝুলছে। কিন্তু তবুও সৌন্দর্যহানি হয় নি।

ঠিক আসছে। আজও সে শক্তি তার আছে।

তবে সেদিনের সে ক্ষোভ সে জ্বালা আজ তেমনটি নেই। আছে কিন্তু উগ্রতায় উত্তাপে ঠিক তাই নয়। ফায়ার। সেদিন ছিল শুধু আগুন। আজ আগুন জল একসঙ্গে। স্টীম হচ্ছে—ইঞ্জিন চলছে। সেদিন ছিল ঘরের মাথায় মাথায় বৈশাখের দুপুরের ছুটন্ত অগ্নিবর্ণ বুনো ঘোড়ার পাল। লাগাম বাঁধা নয় বন্য উন্মত্ত খুরে খুরে মাঠ ক্ষেতের ধুলো ওড়া ঝড়ের মতো। মন্বন্তর নেই আর। দুর্ভিক্ষ নেই। অভাব আছে। তিরিশ টাকা চালের মণ চার-পাঁচ টাকা মাছ—তা হোক, অভাবই বলতে হবে, দুর্ভিক্ষ নয়। ইংরেজ চলে গেছে। দেশ স্বাধীন। তার রোজগার আজ তিন-চারশো। সেদিন তার তিরিশ টাকা কেন তের টাকাও আর ছিল না।

উনিশ বছর বয়স। আশ্রয়হীন। মামার বাড়িতে ছেলেবেলা বড় হয়েছিল। আরও ছেলেবেলা পাঁচ বছর বয়সে বাপ মারা গিয়েছিল। নিতান্তই কেরানী চাকরে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হাজার আড়াই টাকা নিয়ে মা এসেছিল মামাদের আশ্রয়ে। মা মামাদের ভাত রান্না করতো, ভগবানকে ডাকত, স্বামী অর্থাৎ তার বাপকে গাল দিত, সঙ্গে সঙ্গে তাকে এবং তার ছোটকে। বড়ভাই ভাল ছেলে, বি. এ. পাস করে খড়গপুরে রেলে ঢুকেছে। সে দাদার থেকে তিন বছরের ছোট, ম্যাট্রিক বার দুই ফেল করে ইস্কুল ছেড়ে প্রাইভেট দেবে বলে ঘরে বসেই আছে। ঠিক বসে আছে নয়, এই ছবি দেখে ছবি কপি করছে। স্লেটে করত।

কাগজেও করত। একদিন মামার বাড়িতে একটা কাণ্ড ঘটেছিল। বাড়ির ড্রেন পায়খানা নিয়মিত সাফ করে না বলে উগ্রচণ্ডী মামী রাণীয়া জমাদারনীকে শাসন করতে গিয়েছিল। মাথায় খাটো মুখখানা খাপচো তাতে বসন্তের দাগ; মাথায় চুলগুলো কাফ্রি ধরনের রাণীয়ার। মামী উগ্রচণ্ডা হলে প্রচণ্ডা চামুণ্ডা। মামী বকাবকিতে হেরে একখানা ঘুঁটে ছুঁড়ে রাণীয়াকে মেরেছিল; মুহূর্তে ক্ষিপ্তা রাণীয়া তার মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে তাকে তেড়েছিল। মামী রান্নাঘরে ঢুকেছিল নিরাপদ স্থান ভেবে, কিন্তু রাণীয়া তা মানে নি। সে ঝাঁটা উদ্যত ক'রে ঘরে ঢুকতে পা বাড়িয়েছিল, তখন উপায়ান্তর না দেখে মামী তুলেছিল আঁশবঁটি। তারপর কাণ্ড অনেক দূর এগিয়েছিল, প্রায় এদিকে কোর্টের বার লাইব্রেরী ওদিকে মিউনিসিপালিটির কমিশনার মিটিং পর্যন্ত।

মামী মামাতো ভাইদের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না। মায়ের সঙ্গে ভাবটা যে কি—তা সে আজও ঠিক অনুমান করতে পারে না। তবে মা তার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। গালাগাল মাও কম করত না।

দু-দুবার ফেল করার পর মামা-মামী বার বার বলত—আবার পড়া কেন? বেশ তো প্রাইভেট দিবি তো সে তো চাকরি নিয়েও দিতে পারবি। মিথ্যে ঘরে ব'সে অন্নধ্বংস কেন? আর তোকে ভাত দিতে পারব না।

সে বলত—আমার মা তোমাদের ঘরে বিনা মাইনেতে ভাত রাঁধে। কাপড় পর্যন্ত দাও না। মা কিনে পরে বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা থেকে। আমার অন্ন মায়ের মাইনে থেকে হয়।

মা বলত—তুই মর মর মর!

—মরব। তার আগে বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকার ভাগ আমাকে মিটিয়ে দাও। ভাইকে বল, ধার বলে যা নিয়েছে ফেলে দিতে। ধার—ভাত! টাকার সুদ দেয় তোমার ভাই!

সে যে এমনটা কেন হয়েছিল বলতে পারে না। তবে হয়েছিল। এরই মধ্যে সে এই মামী ও রাণীয়ার কাণ্ডটা নিয়ে একটা ছবি—ছবি অবশ্য সাদা কাগজের উপর কালিতে এবং পেন্সিলে—এঁকে দিয়েছিল ওখানকার হাতে লেখা পত্রিকায়। নাম দিয়েছিল—উগ্রচণ্ডা ও চামুণ্ডা। একদিকে সারিবদ্ধ উকীল মোক্তার ভদ্রলোক, অন্য দিকে সারিবদ্ধ জমাদারেরা।

ছবিটার তারিফ হয়েছিল। ওখানকার নেতা (বামপন্থী) তাকে ডেকে বলেছিলেন—ভালো হয়েছে। ওটা আমি কলকাতার কাগজে ছেপে দেব।

বিপদ হল ওইখানে।

ছাপা হ'তেই নজরে পড়ল লোকের। তাতেও কিছু হ'ত না, কিন্তু মামী এবং রাণীয়াকে স্পষ্ট চেনা গিয়েছিল।

ফল বিপর্যয়।

মা মাথা ঠুকে কপাল ফাটিয়েছিল। মামা মামাতো দু ভাই তার সঙ্গে তার নিজের দাদা, গুডফ্রাইডের ছুটিতে দাদাও বাড়ি এসেছিল, সব মিলে চারজনে তাকে ধ'রে প্রহার করেছিল।

সে মার খেয়ে নীরবেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেই এসেছে। বাস্। আর ফেরে নি। ফিরবেও না কোনদিন।

কলকাতায় তাকে প্রথমটা সাহায্য করেছিলেন সেই বামপন্থী নেতাট। বেশিদিন সাহায্য করতে হয় নি, মাস কয়েক। সে তখন কলকাতায় ঘুরে ঘুরে দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকত। সাদার কালোয় ছবি।

জয়নাল সাহেব তখন ওই ছবির জন্ম বিখ্যাত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে তার কাছাকাছি গিয়ে পৌছুলো। সাদা কালো ছেড়ে রঙ ধরলে। মেসে থাকত। মেস থেকে বোর্ডিং—একলা একটা রুমে। তারপর নিজের একখানা ঘর। নিজে রান্না। তারপর এসেছে হরিয়া।

সে তখন ছিল ফায়ার। এখন জলে আগুনে স্টীম।

—খেলেন নাই!

হরিয়ায় কণ্ঠস্বরে তার ধ্যান ভাঙল।—কি?

—খাবার।

—কখন দিলি? বলে দিতে হয় তো!

—বললাম যি?

—বলেছিলি কি? তা হলে শুনতে পাই নি আমি। দুধটা একটু গরম ক'রে আন।

কাজ করতে বসে এমনই ডুবে যায় আনন্দ। কিছুক্ষণ কাজ ক'রে সেটাকে সে সরিয়ে রেখে দিলে। টাকা চাই। কিছু স্কেচ নিয়ে উইলিয়মসে যেতে হবে, দেখিয়ে টাকা আনতে হবে। না। আবার সেটাকেই টেনে নিলে। ওটাকেই শেষ করে দেবে সে আজ। একখানা চেক্ নিয়ে হরিয়াকে দেবে—ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনুক। কাজে অসৎ হলে চলবে না। যেখানে খুশি মিথ্যে বলো, কাজের ক্ষেত্রে মিথ্যে কথা বলো না। অন্তত—খুব বড়োর কাছে বলো না—আর একদম ছোটোর কাছে বলো না। মাঝারিদের কাছে বলতে পারো, দরকার হ'লে বলো। আবার তুলি চালাতে লাগল। টানে টানে বিলাসিনী প্রৌঢ়া স্থূলাঙ্গী ফুটে উঠেছে। হঠাৎ ক্রি-রিচ-ক্রি ক্রি, ক্রিরির ক্রিরির-ক্রিচ-ক্রিচ-ক্রিচ শব্দের সঙ্গে পাখার ফরর্ ফরর্ শব্দে সে চমকে উঠল। হ্যাঁ চমকেই উঠল। চড়ুইটা ঘরে এসে ঢুকেছে। মুখ তুলে সে দেখলে। হ্যাঁ—সেইটে এসেছে। সেইটেই। মাদী চড়ুই। ধূসর রঙ, গলায় সরু একটা কালো বেড় হারের মতো।

—তুমি আবার এসেছ? কি সংবাদ? আজ কে তাড়া দিলে?

—কেউ না?—না?—ওই যে একজন। একটা লালচে চড়ুই গলায় কালো ত্রিভুজ—জানালার শিকে বসেছে। ওই নরাধম তোমার পশ্চাদ্ধাবন করেছে! এবং তুমি ওকে পছন্দ কর না। অথবা এটা তোমার প্রণয়লীলার একটি অঙ্গ! আমাকে তুমি নারীরক্ষক বীর ভেবেছ! তোমার এ প্রকার বিশ্বাসের জন্ম ধন্যবাদ!—যাও, তুমি যাও হে!—

আনন্দ ডান হাতের তুলিটা উঁচিয়ে নারীলোলুপ পুরুষ চড়ুইটাকে তাড়া দিলে। তাতে সেটাই শুধু উড়ে গেল না, এটাও ত্রস্ত হয়ে ঘরময় দুপাক উড়ে—ফুড়ুৎ করে জানালা দিয়ে

উড়ে বেরিয়ে গেল। আবার সে কাজে মন দিলে। তুলি নিয়ে বসল। চলতে লাগল তুলি। কিন্তু মন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তুলি রেখে সে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। এগারটা বেজে গেছে। রোদ আজ চড়া মনে হচ্ছে। গরম হাওয়া আসছে। বাইরে, পার্কের ওদিক-টার বড় ওয়ানওয়ে রোডে লরী বাস প্রাইভেট চলছে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে। একবার এক ঝাঁক, তারপর একটু বিরতি, আবার এক ঝাঁক। দেখ—দেখ—দেখ—। একটা বাস আর একটাকে ওভারটেক্ করছে। লাগল বোধ হয়। না—বেরিয়ে গেল। প্রথম বাস-খানাই—ডাইনে চেপে—পিছনেরটার পথ মেরে জোরে বেরিয়ে গেল।

একখানা বাস থেকে হরিয়া নামল। ব্যাঙ্ক থেকে ফিরছে।

হরিয়া তার জীবনের একটা সম্পদ। এই তো ঘণ্টাখানেক আগে গেছে।

আঃ! আবার তার কানের পাশ দিয়ে চড়ুইটা ঘরে ঢুকল। মরেছে—এটা কি ভেবেছে! পাখীতেও কি ভাবে নাকি? ভাবে বইকি! নইলে তাকে গ্রাহ্য না ক'রেই ঘরে ঢুকল কি হিসেবে? অবশ্য হ'তে পারে, ওরা মানুষদেরই গ্রাহ্য করে না, বা মানুষকে জানে এই বলে যে—ওরা গ্রাহ্য করবার মতো জন্তুই নয়। শুধু ঘরটাকে ওর চেনা হয়েছে এবং নিরাপদ স্থান বা মনোরম স্থান বলে ধারণা হয়েছে।

হায় হায় হায়! তুমি জানো না, কার ঘরে তুমি ঢুকেছ—এইবার জানালা ক'টি বন্ধ ক'রে, তোমাকে তাড়া দিয়ে এখুনি ধরে ফেলে মেরে ফেলতে পারি। মরা তুমিকে ছুঁড়ে কোন কাককে দিয়ে দিতে পারি, অথবা তোমাকে ভেজে খেয়েও ফেলতে পারি। অবশ্য—তাহলে হরিয়াকে এখুনি পাঠাতে হবে মদের দোকানে। কিন্তু তার সময় এ নয়।

চড়ুইটা উড়ছে। ওই ঘরের কোণে বসল। আবার উড়ল। হোল্ডারে বসল—আবার উড়ল। এবার ও কোণে বসল। আবার উড়ল—কালকের আলমারিতে বসল।

চিরিক—চ্রিরিক। চ্রিক—চ্রিক—চ্রি—!

সঙ্গে সঙ্গে লেজটা নাচছে। গলার কাছটায় কাঁপছে। মাথাটা চঞ্চল ভঙ্গিতে নড়ছে। এপাশ ওপাশ—কখনও উপরের দিকে তাকাচ্ছে। কখনও নিচের দিকে। মধ্যে মধ্যে ঠোঁট ঘষছে। লাফাচ্ছে নাচার মতো।

সামনের দেওয়ালে ব্রাকেটে একটা পুরনো ক্লক ঘড়িতে ঢং শব্দ করে সাড়ে এগারটা বাজলে সে ফিরে এসে কাজে বসল। বসেই সে শুনলে—ক্রিরিচ—এবং ফ্রর-র্। পাখীটা পালাল। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে—ওই পাখার আওয়াজে বোঝা যায়। ঘরের মধ্যে ফ্রর শব্দ—বাইরে গেলেই হাল্কা হয়ে পড়ে। সিনেমার ফেড আউট।

সিনেমার পাবলিসিটি অফিসার বন্ধুটি এক নম্বরের চালিয়াৎ। সেদিন সিনেমা ড্যান্সার ব'লে একটা সস্তা বারে নিয়ে যা দেখালে!—

তার থেকে বউবাজারবাসিনী ব্রনশোভিতাবদনী ফিরিঙ্গিনী মেমসাহেব লিপস্টিক রুজে এবং সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ানোর কায়দায় ন্যুইয়র্কবাসিনী।

রাবিশ! হঠাও ও সব চিন্তা। হট্ যাও। রামেশ্বরের জর্দার পালায় পর্দা নিক্ষেপ আজ করতেই হবে। তুলি চলতে লাগল। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। সে কাজ ক'রেই চলেছে।

ঢং—সাড়ে বারোটা। ঢং—একটা। ঢং—দেড়টা।

—হরিয়া এসে দাঁড়াল—খাবার দিব ?

—এঁ্যা।

—দেড়টা বাজি গেল।

—বাজুক।

আবার ঢং ঢং। দুটো। হরিয়া এসে দাঁড়াল। মনিবের একাগ্র মনে তুলি চালানো দেখে ফিরে গেল। আরও কিছুক্ষণ পর আনন্দ কাজ শেষ করে উঠল। রামেশ্বরের জর্দা খতম।—হরিয়া! খাবার! ঘড়ির দিকে তাকাল—দুটো পনেরো। গরম হাওয়া বইছে। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। ওঃ। নিজেই সে জানালার পাল্লা টেনে দিতে লাগল।

ক্রিচ—ক্রিচ—ক্রিচ—ক্রিচ্!

তার সঙ্গে ফ্রর্‌র্ ফ্রর্‌র্ শব্দে ঘরখানাকে মুখরিত করে চড়ুই উড়ছে। সেই চড়ুইটা। ধূসর রঙ, গলায় হারের মতো কালো বেড়—ত্রিভুজওয়ালাদের থেকে আকারে একটু বড় কিন্তু দেখতে সুন্দর। সেই নারীটি। কখন এসে আবার ঘরে ঢুকেছে। বাইরের রৌদ্রে উত্তাপ এখন, সব পাখী এমন কি কাকগুলোও গাছের পল্লবের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে। ধুঁকছে। সবারই গলার কাছটায় ধুক্ ধুক্ করছে। ইনি—কালকের পরিচয়ে ঘরখানিকে জেনে এর মধ্যে এসে বসেছিলেন। বাইরে থেকে ঘর অনেক ঠাণ্ডা।

উড়ছে। ও ভাবছে—জানালা বন্ধ করছে যখন তখন ওকে ধরবে। অথবা অন্ধকারের ভয়।

খানিকটা ভয় দেখালে কি হয় ? ভয় কেন ? যাক। বন্ধই থাক না ঘরে। শ্রীমতী যখন আনন্দ রায়ের ঘরে ঢুকেছ, তখন কলঙ্ক না নিয়েই ফিরে যাবে ? থাক। বিকেলে উঠে আনন্দ জানালা খুলে দেবে তখন বেরিয়ে যাবে। বাইরেটা তখন ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। পুরুষ চড়ুইয়েরা কল কল করবে। কলঙ্কিনী বলবে। সে বন্ধ করে দিলে জানালাটা। অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা ফর ফর করে উড়ে অসহায় বন্দিনীর মতো কোনো কোণে আশ্রয় নিলে। আনন্দ শুয়ে পড়ে বিছানার পাশে রাখা টেবিল ফ্যানটার সুইচ অন্ ক'রে দিলে। ঘরে সিলিং-ফ্যান রাখেনি আনন্দ। টেবিল ফ্যান রেখেছে। খুব গরমের সময় ভিতর দিকে বারান্দায় শুয়ে টেবিল ফ্যানটা খুলে দিতে পারে। ফ্যানটা ভঁ-ভঁ শব্দ করে ঘুরতে লাগল—আঃ।

চড়ুইটা এখন খুব মৃদু একটা শব্দ করছে—চিনিক্ চিনিক্। চিনিক্ চিনিক্।

ওটা বোধ হয় ক্লান্তি বা অসহায় অবস্থার শব্দ। বেরুবার উপায় নেই। হেসে আনন্দ বললে—ছেড়ে দিতে পারি তোমাকে, যদি সেই কালো মেয়ে, যার দূতী হয়ে এসেছিলে, সে যদি আসে। বুঝেছ ? সে চারটার সময় যাবে তখন জানালা খুলে দেব. তুমি গিয়ে তাকে ডাকবে। একটু হাসল সে। তারপরই ঘুমিয়ে পড়ল। ভাবতে ভাবতেই ঘুমোল—সকাল সকাল উঠতে হবে। কিছুকাল কলেজ স্ট্রীট যায় নি। ওপানটা ঘুরে মিশন রো। উইলিয়মসকে বলে আসবে দু-তিন দিনের মধ্যেই আদ্ধেক কাজ সে দেবে।

বউবাজার থানার সামনেটা মনে ফুটে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

ব্রনমুখী, খাটো ফ্রক পরা, সিগারেটের ধোঁয়া আকাশে নিক্ষেপকারিণী কার দিকে সিগারেটের ধোঁয়া ছোড়ে? সে খুশি হবে যদি সে ঈশ্বরের দিকে ছোঁড়ে। ওরই মধ্যেই তো নীতির গুদাম। সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রলুব্ধ হয়ে নীতি মরালিটি—সিগারেট খেতে শিখুক না।

ঘুম কিন্তু ভাঙল দেরিতে। পাঁচটার কাছাকাছি। ঘুম ভেঙেই প্রায় ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। ক'টা বাজল? ঘড়ির সাদা ডায়েলটা দিনের বেলা দরজা জানালা বন্ধ সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে। পাঁচটা বাজতে দু'তিন মিনিট। এঃ! ছত্রধারিণী মুক্তকেশী দীর্ঘাঙ্গী কৃষ্ণা চলে গেছে। বউবাজারের থানার সামনে দিয়ে ব্রনমুখীও সিগারেটের ধোঁয়া আকাশে ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে গেছে। কলেজ স্ট্রীটে যেতে যেতে দোকানে দোকানে ক্যাশ মেলাবার পালা পড়বে। উইলিয়মসের জু সাহেব হয়তো বেরিয়ে যাচ্ছে। না গেলেও সে যাবা মাত্র বলবে—সরি রয়! আমি উঠছি। দেরিতে এসেছ। কাল ফার্স্ট আওয়ারে এস। স্কেচ দেখব। বাই-বাই!

টং টং শব্দ উঠতে লাগল, পাঁচটা বাজছে।

সিগারেট বের করে মুখে পুরলে সে, দেশলাইয়ের কাঠি বের করলে। হঠাৎ চি্রিক, চঞ্চল চি্রক-চি্রক-চি্রকের সঙ্গে পাখার শব্দ উঠল। চতুর চড়ুই তো। ঠিক বুঝেছে, উঠে বসেছে! বলছে, কথা রাখ, জানালা খোলো, যেতে দাও এবার। যা করলে—

আরে। আরে! তা তো না! উড়ে গিয়ে ঘড়িটার মাথায় বসেছে। টং—টং—টং—টং শব্দে বেজে চলেছে আর চড়ুইটা ঠোঁট দিয়ে ঘড়িটায় ঠোক্কর মারছে।

সবিস্ময় কৌতুকে আনন্দ সেই দিকে তাকিয়ে রইল—বা রে!

ঘড়িটার বাজনা থামল—পাঁচটা ঘণ্টা ফুরিয়ে গেল। চড়ুই আরও বার কয়েক ওটাতে ঠোক্কর মেরে থামল, ঘাড় কাত করে কয়েক সেকেণ্ড, অন্তত বিশ সেকেণ্ড তাকিয়ে দেখল, তারপর আবার ফ্ররর্ শব্দে পাখা মেলে জানালার গায়ের শিকে বসল। বাইরের পড়ন্ত বেলা ওকে ডাকছে। প্রাণ ওর ছট্‌ফট করছে।

ক্রিরিচ্—ক্রি-রিচ—ক্রিচ—ক্রিচ—ক্রিরিচ—

তারপর থেমে মৃদু কিনিচ—কিনিচ।

আহা-হা। সিগারেট না ধরিয়েই আনন্দ উঠল। জানালাটার কাছে যেতেই পাখীটা উড়ে গিয়ে বসল আলোর হোল্ডারে। আনন্দ জানালাটার এক পাট খুলতেই একটি সুউচ্চ সুদীর্ঘ ক্রি-রি-রি-চ ডেকে—একটি সোজা রেখা টেনে মুহূর্তে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আঃ, বেচারা বাঁচল। একটু হেসে আনন্দ সিগারেট ধরিয়ে ডাকলে—হরিয়া।

—যাই। হরিয়া 'যাই'টি বলে ভারী চমৎকার। একটি সুর আছে। তার সঙ্গে সস্নেহ আনুগত্য।

—আসতে হবে না—চা নিয়ে আয়।

জানালার বাকী পাল্লাগুলি এবার খুলে দিলে আনন্দ।

পড়ন্ত বেলায় দেবদারুর কচি পাতায় আলো চিকচিক করছে। আজ একটা হাওয়া এর

মধ্যেই উঠেছে—কলকাতার সুবিখ্যাত সমুদ্রস্পর্শবহ বাতাস। গ্রীষ্মের আগম। আজ প্রথম উঠেছে। তবে তো আজ ময়দানে যেতেই হবে। আকাশ পরিষ্কার। হরিয়া—চা আন, জলদি।

শিমুল ফুল জাতীয় লাল ফুলগুলো আলোতে চকচক করছে। একটা ফুল খসল। ফুটবল নিয়ে একটু কি একফালি খোলা জায়গার সন্ধানে বাচ্চা ছেলের দল চলেছে। পার্কে ওদের খেলতে দেয় না। ওপাশে জিমখানার মাঠে বড়দের খেলার আসর। তারা—ওই যে একদল যাচ্ছেন—সিগারেট ফুঁকছে, হেসে ঢলে পড়ছে, এ ওকে ঠেলছে এবং পার্কের ওদিকটায় মেয়েদের দেখে এসে তাই নিয়ে গ্যাঁজানো রসিকতার স্বাদে মুখ পাকলাচ্ছে। এযুগে এটা—এ যুগেই বা কেন—সব যুগেই আদিকাল থেকে আদিরস আছেই। তারা নিজেরাও করে। সেও করে। ঘরে বসে ভাবনার মধ্যেও করে। পাখী সবাই—এগুলো নেহাতই কউয়া। কাক। ওই একদল মেয়ে আসছে। স্কুলের ডবল বেণী; যুবতী হয়েছে, সেই স্বপ্নের ঘোর লেগেছে। সবে শাড়ি ধরেছে। দুটো মেয়ের এলো চুল। ছোট্ট বাচ্চা একটা ওদের পিছনে ট্রাইসিকিল চড়ে আসছে, সঙ্গে মা—মা একটা প্যারাম্বুলেটর ঠেলছে। এবার ছোঁড়ারা ফেনিয়ে বোধ হয় উপচে পড়বে। এবার একজনকে একজন ঠেলা দেবে। প্রাণপণ জোরে ঠেলা মারবে, হয়তো সে পড়তে পড়তে সামলাবে এবং হঠাৎ খুব রেগে গিয়ে উচ্চ বীর চীৎকারে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবে। ভগবান আশ্রিত এদেশের নীতিজ্ঞান সিগারেট ধরলে বাঁচতো, খায় না বলে ঘরের কোণে লুকিয়ে গাঁজা খায়। তার ফলে এই অবস্থা।

পাশের একটা গলিপথ থেকে ছাতা মাথায় দিয়ে লাঠি হাতে থপথপে বৃদ্ধটি বেরিয়েছে। ধপধপে সাদা রং—চুল ভুরু সব সাদা। ভুরুগুলো খুব বড়। বিচিত্র দেখায়। থপথপ ক'রে হাঁটে। যখন বের হয় তখন ছাতা লাঠি ছাড়া বের হয় না। ওকে দেখে আনন্দ বুঝতে পারে জরা দেখে গৌতম বুদ্ধ এত বিচলিত হয়েছিল কেন? বৃদ্ধের শবযাত্রা তাকে যেন দেখতে না হয়। তাহলে কে বলতে পারে গৌতমের তৃতীয় পাদে সে পা রাখছে না। বাকী থাকবে সন্ন্যাসী—। এদেশে ভালো সন্ন্যাসীরও অভাব নেই। তাহলেই সেও নির্বাণকামী হয়ে বেরিয়ে পড়বে।

—চা এনেছি।

হরিয়া পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকছে। ফিরে দাঁড়াল সে। টিপয়ের উপর ডাইজেস্টিভ বিস্কুট আর চা নামিয়ে দিয়ে হরিয়া দাঁড়িয়ে আছে। তরিবতে হরিয়া যাকে বলে অপরাজের! এমন পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিকতা-দুরস্ত হরিয়া যে এইটুকু প্রশংসা ওর সম্পর্কে কিছুই নয়।

বিছনায় এসে বসল আনন্দ, বললে—যার হরিয়া নেই তার কেউ নেই।

খুশিতে হরিয়ার এক ধরনের দাঁত বের করে নিঃশব্দ হাসি আছে। হাসলে হরিয়ার গালের খাঁজ দুটো চমৎকার হয়। মধ্যে মধ্যে ভাবে আনন্দ।

—একটা মেয়েছেলে এসেছিল।

—মেয়েছেলে?

—হঁ, কালো মেয়ে একটা—রোজ ছাতা মাথায় দিয়ে যায়—

—ও। এঃ—

এক ঝলক চা পড়ে গেছে আনন্দর কাপ থেকে। হরিয়া ব্যস্ত হয়ে উঠল পড়ে-যাওয়া চা মুছতে নিজের গামছাটা নিয়ে। আনন্দ বললে—থাক না।

—না, দাগ ধরে যাবে।

—কি বলছিল সে ?

—শুধোচ্ছিল, বাবু কেমন আছে। চোখের কোণটা পাখীর নখে কাটিল—তা মুখ-টুখ ফুলিছে কিনা। জ্বর-টর হয়েছে কিনা।

—তুই কি বললি ?

—বললাম, না কিছু হয় নাই।

—তা কেন বললি ? এই তো একটু ফুলে রয়েছে ?

অপ্রতিভ হয়ে গেল হরিয়া, মাথা চুলকে একটু হেসে বললে—সকালে তো বললে না। ডাক্তার দেখালে না। ওষুদ লাগালে না—। তাই—। দাঁত কটা বের করে হাসির একটা ভঙ্গি করে সে চুপ করলে।

এর উত্তর আনন্দও খুঁজে পেলে না। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—আমায় ডাকলিনে কেন ?

—ঘুমাচ্ছিলে। সকাল থেকে তুটো পর্যন্ত কাজ করিছ। খুব ঘুমাচ্ছিলে। নাক ডাকছিল। আর মেয়েটা বললে—ডাকতে হবে নাই। দরকার কিছু নাই। কেমন আছেন তাই শুধাচ্ছি। ভাল আছেন, ঘুমাচ্ছেন, কাজ করছেন সকাল থেকে—ঠিক আছে।

চুপ করে বসে রইল আনন্দ। একট দাঁড়িয়ে থেকে হরিয়া চলে গেল। চড়ুইটা আবার কখন এসে ঘরময় একটা পাক মেরে ডাকল—চ্রিক! চ্রিক! চ্রিক। চ্রিক। বিরক্ত হয়ে আনন্দ বললে—জ্বালালে তো এটা! ভাগ! ভাগ!

হরিয়া ফিরে এসে দাঁড়াল। তার কাজ আছে; আনন্দ বাইরে বের হবে, প্যান্ট জামা বের করে দিতে হবে। স্যুটকেস খুলে সে বললে—কালো প্যান্টটা দিব ?

—দে।

—নতুন হাওয়াইটা দি ?

—দে। যা ইচ্ছে দে। বিরক্ত করিস নে।

হরিয়া প্যান্ট সার্ট পাট খুলে হ্যাংগারে ঝুলিয়ে রেখে গেল। আনন্দ বসে রইল। চুপ করে বসে রইল। কেমন হয়ে গেল যেন। বাইরে তুটো বিপরীত রঙে মিলে সাদা রঙ হয় না। কালোও হয় না। সাদা কালো তুটোতে মেশালে কালচে হয়, সাদাটা কমজোরী হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের মনে তার থেকেও বিচিত্র কিছু হয়। রঙছুট রঙ, বর্ণহীন রঙ তো নেই—বাইরের জগতে হয় না। মন কিন্তু সব রঙছুট হয়ে শূন্যরঙা হয়ে যায়। সাদাও না, কালোও না। ভালোও না, মন্দও না। উল্লসিতও না, বিষণ্ণও না। তেমনি হয়ে গেছে তার মন। মেয়েটি তার খোঁজ করে গেছে। তাকে কিন্তু ডেকে দিতেও বলে নি, অর্থাৎ আগ্রহও ছিল না। ভালো

খারাপ দুই মিশে মন এমনি হয়ে গেল। কল্পনাতেও মেয়েটিকে নিয়ে খেলা করতে পারছে না।

বাইরে কারা চীৎকার ক'রে হরিবোল দিয়ে উঠল। বিকট চীৎকার বল হরি—হরি—বো—ল। বল হরি, হরি—বো—ল। বল হরি—হরি—বোল। নাগাড় চীৎকার ক'রে চলেছে। বিরক্ত হয়েই সে উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ, ছটা চ্যাংড়াতে একটা মড়া নিয়ে চলেছে। খুব দুঃস্থ কেউ মরেছে। খাটিয়াও জোটে নি। এরা পাড়ার বাউণ্ডুলে, মহানন্দে বিকট চীৎকারে হরিবোল দিয়ে মরণের কথা মনে পড়িয়ে ভয় দেখিয়ে ওরা চলে। অমৃতের উপাসক ওরা। মৃতসঞ্জীবনীরও উপাসক বটে তাতে সন্দেহ নেই। কবিরাজখানায় পাওয়া যায়।

রাবিশ। জানালাটা বন্ধ করে দিলে সে বিরক্তিভরে।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ররর্ শব্দে ঘরখানার স্তব্ধতা ভঙ্গ হল। সঙ্গে সঙ্গে দুপুরের মতোই সেই আতঙ্কিত চি্রিক, চি্রিক, চি্রিক, চি্রিক। চড়ুইটা আবার কখন এসে ঢুকেছে। না, বেরিয়েই যায় নি? লক্ষ্য তো করে নি আনন্দ! এ তো জালাতন করলে!

যা—যা—। একপাল্লা জানালা সে খুলে দিলে।

পাখীটা বেরিয়ে গেল না, ওই খোলা পাল্লাটারই মাথায় বসল।—চি্রিক। চি্রিক। আনন্দের বিরক্তিটা একটু দ্রবীভূত হয়ে গেল চড়ুইটার ব্যাপার-স্যাপার দেখে। ও ভেবেছে কি? হঠাৎ আনন্দ সম্ভবতঃ ঘরে কেউ নেই বলেই পাখীটার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে—কি? দুপুরবেলা দরজা জানালা বন্ধ ক'রে তোমাকে আটকে রেখেছিলাম—আমার সঙ্গে দুপুর বাস করেছ বলে দাবী করছ নাকি?

—চি্ক চি্ক চি্ক।

—কি? কালকে মুঠোয় চেপে তোমাকে ঘায়েল করেছিলাম?

মৃদুস্বরে পাখীটা ডাকলে। চি'নক্। চি'নিক্।

—উঁ—। হুঁ হুঁ। ভাল।

ঢং—ঢং—ঢং; ছটা বাজছে। পাখীটা চি্-রি-ক শব্দ করে চঞ্চল চকিত গতিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘড়িটার উপর একটু উড়ে ঘড়িটার মাথায় বসল এক ঘণ্টা আগের মতো। তারপর নেমে বসল ব্র্যাকেটের উপর।

ঢং ঢং ঢং—

—চি্ক—চি্ক—চি্ক—। ছটা বাজা শেষ করে ঘড়িটা শুধু পেণ্ডুলামের শব্দ করছে। পাখীটা বার তিনেক আবার চি্ক চি্ক শব্দ করে থামল। তারপর ঘড়িটার পেণ্ডুলাম ঢাকা কাঁচটায় দু-তিনটে ঠোকর দিয়ে একটি দীর্ঘ চি্—রি—ক শব্দে ক'রে বেরিয়ে গেল।

শিশুর হাসি অথবা ফুলভরা গাছ দেখে যে হাসি সকালের আলোর স্পর্শে ফুল ফোটার মতো মানুষের মুখে ফুটে ওঠে—সেই হাসি মুখে মেখে আনন্দ চুপ ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিকেলের রোদ্দুরে সন্ধ্যার শেড্ পড়েছে।

পার্কের গাছগুলির পাতা কলকাতার প্রসিদ্ধ বৈকালিক ঝড়ো হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে।

পত্রহীন শিমূল জাতীয় গাছ থেকে সে হাওয়ায় ফুল খসছে। সেই ফুল কুড়োচ্ছে ক'টি ছেলে-মেয়ে। একটি যুবতী যেতে যেতে ফুলগাছটার তলায় গিয়ে একটা ফুল কুড়িয়ে তার ডোনাট খোঁপায় গুঁজলে। হেসে ফেললে আনন্দ। 'কালো চুলে রাঙা কোসোম হেরেছ কি নয়নে'। মনে পড়ে গেল তার। কিন্তু এ মেয়ে সুন্দরী, অন্তত গৌরাঙ্গী।

এঃ! কালো কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটি এসে ফিরে গেছে!

—গেলে না? সন্ধ্যা হয়ে গেল! হরিয়া এসেছে।

মুখ না ফিরিয়েই আনন্দ বললে—না।

—যাবে না?

—না।

—চা করব?

—কর।

হরিয়া চলে গেল। আনন্দ তাকিয়েই রইল সামনের দিকে। পার্কের ওপাশের বড় রাস্তার উপর বাস যাচ্ছে, আলো জ্বেলে যাচ্ছে। ক'টায় লাইটিংয়ের টাইম? সম্ভবতঃ ছটায়। রাস্তার আলোগুলো কখন জ্বলে উঠেছে এতক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় বুঝতে পারা যাচ্ছে। এই ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে সারিবদ্ধ গাড়িগুলির চলন্ত আলো, বিশেষ করে ওই ওমাথার বাঁকটায় আশ্চর্য গতিশীল রূপের খেলা শুরু করে দিয়েছে। সব থেকে মনোহারী হয়েছে বাঁকের মাথায় গাড়িগুলির গতির মন্থরতা। পিচের রাস্তার উপর আলো-গুলির প্রতিবিম্ব পড়েছে। এ এক আশ্চর্য শোভা। মধ্যে মধ্যে পার্কের গাছগুলির আড়াল। বা-বা-বা!

হরিয়া চা নিয়ে এল।—চা!

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আনন্দ বললে,—বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারটা পেতে দে।

—দিচ্ছি। চা-টা কেমন? নতুন দিয়েছে দুকানদার।

—ভালো না খুব। প্যাকেট চা আনবি। ও সব লুজ চায়ের আজকেরটা ভাল হবে, কালকেরটা পচা হবে।

—উ বললে কি না খুব ভালো চা। ফিরত দিয়ে আসব। আমি বলে রেখেছি।

—তাই দিস।

তবুও হরিয়া দাঁড়িয়ে রইল। হরিয়ার—শুধু হরিয়ার কেন, হরিয়া মধুয়া যদুয়া থেকে হরিনাথ যদুনাথ এমন কি মাধবেন্দ্র যাদবেন্দ্র পর্যন্ত সকলেরই স্বভাব হ'ল কোন সঙ্কোচের কথা থাকলে বলতে এসেও বলতে না পেরে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। তবে হরিয়ার কথা আলাদা। ও মনিবের সঙ্গের জন্যও অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকে। এমন ক্ষেত্রে আনন্দ যদি বলে, কিছু বলছিস্? তাতে হরিয়া বোকা হয়ে হেসে বলে, না এমনিই। আনন্দ হাসে। আজও আনন্দ বললে—কিছু বলছিস্?

তাতে হরিয়া বললে—মান্সো আনব?

—আনবি?

—শুধাচ্ছি !

—তা আন।

হরিয়া বললে—আর—

—কি ?

-ব্রাণ্ডির দুকানে যেতে হবে নাকি ? উ তো আটটাতে বন্ধ হয়ে যায়। বাইয়ে গেলে না ?

—না।

হরিয়া চলে গেল।

আনন্দ আবার ডাকলে—শোন, হরিয়া।

—যাই।

একটু পর এল হরিয়া। হরিয়া শৌখীন লোক। বাইরে সে কখনও প্যাণ্ট হাওয়াই সার্ট ছাড়া বের হয় না। বাংলা বই পড়ে। ইংরেজী শিক্ষা পড়ে। ইংরেজী লেখা মক্‌সো করে। বছরে একবার ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে ইংরেজীতে চিঠি লেখে, My dear Babu, I come home, I well. Mother well, Go very soon. সব থেকে ভালো লেখে শেষকালে—you Pronam.

হরিয়া সেজেগুজেই এল। বললে—বাইরে চেয়ার দিলাম।

—শোন। ব্রাণ্ডির দোকানে যাবি। পাইট না। ছোট কোয়ার্টার পাওয়া যায়, তাই আনবি।

—হুঁ।

—শিগ্‌গির ফিরবি। আর একটা ঝোলা নিয়ে যা। হাতে ক'রে আনিস নে। এখানকার লোক সব দেখে !

বাইরে ব'সে সে ওই পার্কের ওদিকের বড় রাস্তাটার বাঁকের মুখে মোটরের চলন্ত আলোর আশ্চর্য শোভার দিকে তাকিয়েছিল। এই রূপের খেলাটি এর আগে সে না দেখেছে এমন নয়, কিন্তু আজই সে খেলা আনন্দের মনে ধরা পড়েছে। বিস্ময় বোধ করছে যে, এর আগে সে দেখেও দেখতে পায় নি। তবে সে সন্ধ্যেতে তো প্রায়দিনই বাসায় থাকে না। কাল ছিল। কিন্তু কাল মেজাজ ছিল অন্য মেজাজ। কালো মেয়ের মুখ—তার সহানুভূতি মাখানো কথা ; এ দুটো নিতান্তই কাল্‌চে চোরা বালি ;—তার উপর মদের নেশার পাগলামিবশে কার্ডবোর্ডের গলিঘুঁচি—কোন কোণার এবং তারই সঙ্গে চিলে কোঠাওলা বাড়ি বানাতেই মত্ত ছিল। আজ বাড়িটা নেই, উড়েই যাক, আর ডুবেই যাক, গেছে। আজ চোখ পড়েছে। আজও মনটা মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে বাইরে বের হবার জন্য। হোটেলের বারে বন্ধুরা এতক্ষণ এসে জমে গেছে। বাক্যের অসিযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। যশোদা-দা—অশ্লীল রসিকতার আমীর। এক-একখানি ছাড়ছে—আর মদের গ্লাসের মদের নেশায় বুঁদ হয়ে যাচ্ছে। হোয়াট নট যশোদা-দুলাল সেন ? জার্নালিস্ট, সাহিত্যিক, লেফ্‌টিস্ট, পেন-ইংক আর্টিস্টও বটে। থিয়েটারের দূতও

সাজে। তবে কিছু মূল্যবান কথা বলে যশোদা-দা।—আশিককো পতা কাঁহা? দিন কঁহি, রাত কঁহি। খাতা কেয়া? পিতা কেয়া?—পিতা জরুর দারু। যো মিলতা সোহি খাতা। না মিলে তো ভুখে মরে। পিয়ারী ক্যায়সা? গোরী তো গোরী, কালী তো কালী। যো নয়ী সোহি ভালি। আজ যো ভালি—কাল সো নহি; এই হল সাচ্চা মডার্ন মানুষ। পথে চলে যশোদা-দা আপন মনে কথা বলতে বলতে, নিঃশব্দে কথা বলে, হাসে, চোখ পাকায়, জ্যাঙায়, কিন্তু আশ্চর্য, হাত ছোঁড়ে না, যে সস্তা প্যাঁচ নাকি সিনেমা বা থিয়েটারের নাটকে করে, একজনের নাকে ছোঁড়া হাত লাগিয়ে দিয়ে, তাকে রাগিয়ে খানিকটা কমিক করিয়ে লোক হাসায়। যশোদা দা খুব মুখ নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে আপন মনে কথা বলতে বলতে পথ চলছে—তুমি হঠাৎ সামনে এসে গেলে, দেখে আশ্চর্য হয়ে বলছে—কি যশোদা দা?

সঙ্গে সঙ্গে যশোদা দা আত্মস্থ। মুহূর্তে একমুখ হেসে বলল—আরে! ছোট্ট এবং দ্রুত উচ্চারিত একটি—আরে!

—কি ব্যাপার? আপন মনে, মুখ নেড়ে নেড়ে—

—তবে আর 'আরে' বললাম কেন? মনে হল একটা প্রেতাত্মা আসছে। মন্ত্র পড়ছিলুম, তা দেখি চোখের ভুল। প্রেতাত্মা নয় দুরাত্মা। মানে তুই। শ্রীমান আনন্দ।

হঠাৎ উঠে পড়ল আনন্দ। ঘরে গিয়ে পোশাক পরতে লাগল। প্যাণ্টটা বড় ভালো কেটেছে! ক্রীম রঙের হাওয়াইটা—, না সাদা শার্ট প'রে টাই বাঁধলে আজ। মুখখানা তোয়ালে দিয়ে ভালো করে ঘষে একটু ভ্যানিসিং ক্রীম মেখে নিলে। তারপর বুরুশটা চালিয়ে সামনের চুলগুলোকে ফাঁপিয়ে দিলে। গুড্। নট্ শুধু আনন্দ, বাট্ আনন্দকুমার। অক্ষরে অক্ষরে—মানে আক্ষরিক অর্থে সত্য। নিজেকে বেশ সুন্দর লাগছে পোশাকটায়। বিপদ করেছে নাকটায়—বড্ড ধারালো। এমনি মন্দ লাগে না, কিন্তু ফটোতে নাকটা যেন জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে যায়। নিজের ছবিকেই সে বললে—নো হোপ সার। সিনেমা জগতে কুমার হয়ে নায়ক সাজবার নো হোপ্। তাতে দুঃখ করো না। ছবিতে মিছে অভিনয় ক'রে কি করবে? ছোড দো। পথে নেমে পড়। বিংশ শতাব্দী। আজাদ হিন্দোস্তান। নয়া জিন্দিগী। সিঁথী টু চৌরিঙ্গী—এমন কি রাজভবন অ্যাসেম্বলি হাউস পর্যন্ত অবাধ গতি। চৌরিঙ্গীতে আনন্দলোক বানিয়ে খাও দাও আর যশোদা-দা বলে—'মজেমে রহো। খাও পিও, পরদেশ যাও, ঘুমো, মহব্বতি করো, হররোজ নয়া মহব্বতি, বাস্। বাস এক রোজ মর যাও।' শেষে বলে—জীবন রঙীন গ্যাস বেলুন। সুতোয় বাঁধা তে-কোণা। কেটে ভেসে পড়। ওঠ ওঠ, ভেসে বেড়াও। সুখ তাতেই! তারপর—ফট্। মানে কেটে গেল। গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশল। কটুকু রবার এসে পড়ল ধুলো মাটির ধরণীতে। বাস মিশে গেল।

বায়ুমণ্ডলে ভাসতে বেরিয়ে পড়ল আনন্দ—হরিয়া ফেরবা মাত্র। ব্যাঙ্ক থেকে আনা টাকার দশটা রেখে বাদবাকী সবই প্যাণ্টের পকেটে পুরলে। হঠাৎ কি মনে হল—জরদাওয়ালার ছবিটা নিলে। ও লোকটাকে দিয়ে যাবে। একটা বিজ্ঞাপন হবে—হ্যাঁ, কথার মানুষ বটে। নিজে এসে পৌঁছে দিয়ে যায়। এক ঢোক খেয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এখান থেকে বাস ধরাই এক হাঙ্গামা। রাবিশ! জীবনটাই হাঙ্গামা করে তুলেছে এরা। সমাজ গভর্নমেণ্ট—

সব—সব মিলেছে, জোট বেঁধেছে। সাধে মানুষ চেঁচায়, বলে—সব বরবাদ। সব বরবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

বাসও চলছে হরদম। ভিড়েরও অন্ত নেই। আপিস ভেঙেছে কখন। আপিসের পর সব এদিক-ওদিক সুখের সন্ধানে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে ফিরছে। বাড়িতে অভাব-অশান্তি-অনটন-অসুখ-যন্ত্রণার শেষ নেই। স্ট্যাণ্ডে লোক দাঁড়িয়ে একগাদা—সব চলছে। বাড়ির আবহাওয়া থেকে পালাচ্ছে।

সব বরবাদ।

ওদিক থেকে একখানা বাস এসে দাঁড়াল। লোক নামছে। এদিকের বাসে সে উঠে বসল। হঠাৎ নজরে পড়ল লম্বা কালো মেয়ে—হাতে বেঁটে ছাতা। বাড়ি ফিরছে। রাত্রে ছাতা মাথায় দেয় নি, নতমুখী হয়ে চলেছে।

নামবে? না। পেটের মধ্যে ঢোক্‌টা চন চন করছে। রাবিশ। চলো—। মনে মনে বলতে বলতেই বাসখানা ছেড়ে দিলে। ওই চলছে—লম্বা পা খাটো খাটো ক'রে ফেলে চলছে। হ্যাঁ, স্টাইল একটা আবিষ্কার করেছে বটে। রূপ না থাকলে স্টাইল ভিন্ন বাঁচে কি করে?

কালো মেয়ে তার উপর ঢ্যাঙা। চলনটা ওর স্টাইলই বটে। তবে নিজে থেকে ওটা ও আবিষ্কার এবং আয়ত্ত করে নি। ধমকে শাসনে আবিষ্কৃত হয়েছে। ধমক এবং শাসনের জন্যে আয়ত্ত হয়ে এখন ওইটেই ওর অকৃত্রিম চলনে দাঁড়িয়েছে। লম্বা পায়ে দীর্ঘপদক্ষেপে যখন ও চলত আট-দশ বছর বয়সে তখন মা ধমকাতো। একে তো রঙ কাঠকয়লা তারপর ঢ্যাঙা তালগাছ। পাগুলো সরু সরু তাতে চলছে এই পা ফেলে এই পা ফেলে। যেন হাড়গিলে কাদাখোঁচা পাখী চলছে। খাটো—পায়ের চলন খাটো! ছোট করে ফেল্। তখন ফ্রক পরত। ফ্রকে ওকে খুব খারাপ লাগতো। কিন্তু শাড়ি! পাবে কোথায়? জুটবে কি থেকে? বাপ ইস্কুল মাস্টারি করত, তাও নিচের ক্লাসের মাস্টার! মাইনে ছিল ষাট, তারপর যুদ্ধের সময় কিছু বেড়েছিল মাগ্‌গি ভাতা হিসেবে। দেশ স্বাধীন হ'তে সাড়ে বিরেনব্বুই হয়েছিল। সংসার বড় ছিল না; এক ছেলে এক মেয়ে, মেয়েই ছোট। সুরাহার মধ্যে সিঁথিতে বাড়ি ওদের ডুপুরুষের, বাড়িভাড়া লাগত না। চলে যেত কোনরকমে। মা অবিশ্যি মনসা পুজার কথার মনসার মতো বিষ ঢালত, খেতো আবার উগলাতো: শ্যামলীর ইস্কুল মাস্টার বাপ কালো মেয়ের নাম রেখেছিলো শ্যামলী। বাপকে মা বলতো—পোড়াকাঠ! বাপ মেয়ের মতোই কালো এবং লম্বা ছিল, ছেলেও তাই কিন্তু ছেলের কালো রঙ তখনও সমাজে সংসারে সমস্যা ছিল না। শ্যামলীর বাপ হেসে বলতো—দেখ আমাকে মদনমোহন বলতে বলছি না, তবে পোড়াকাঠ-শব্দটা একটু সরস করে বলতে পার না। আমারও ভাল লাগে, পাঁচজনের কাছেও তোমাকে পতিনিন্দার দোষভাগিনী হ'তে হয় না। শুকনো কাঠ তাকে শুষ্কং কাষ্ঠংও বলা যায়—আবার নীরস তরুবরও বলা যায়। কালাচাঁদ বললে তো পার। কাঠ বলতেই যদি চাও তবে তমাল তরুও বলতে পার।

মা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠত। আর একটা সম্বোধন তার ছিল—সেটা মড়ুইপোড়া।

তিনি ওই নাম দিয়ে শুরু করতেন—মড়ুইপোড়ার বাকিটা শোন। মড়ুইপোড়া কালাচাঁদ! সে কৃষ্ণের শতনাম থেকেও বড় একটা গালাগাল পর্ব।

বাপ মারা গেল হার্টফেল করে, শ্যামলী তখন ষোল বছরের। উনিশশো বাহান্ন সালে মাথায় প্রায় চার ফুট ন-দশ ইঞ্চি হয়ে উঠেছে। ইস্কুলে পড়ত। ছাত্রী হিসেবে মাঝারি, তবুও দরিদ্র ইস্কুল মাস্টারের মেয়ে এবং পুরনো বাসিন্দেও বটে—তার জন্যে ইস্কুলে ফ্রিশিপ জুটেছিল। মা এই সময়টায় উঠতে বসতে তাকে ধমকে ধমকে এই চলনে অভ্যস্ত করেছিলেন। বাড়ির উঠোনে তাকে নিজের চোখের সামনে হাঁটিয়ে অভ্যাস করাতেন। তখন শাড়ি পেয়েছে। বাপ সাদা মিলের শাড়ি কিনে দিতেন। তাই পরত। বাপ মারা গেল, শ্যামলী ফেল করলে ম্যাট্রিকে; মা তাকে হেঁসেলে ঢোকালে, আর ভাইকে বললে—যেমন তেমন ক'রে যা হোক একটা পাত্তর জোটা। বিয়ে তো দিতে হবে। ভাইও ম্যাট্রিক ফেল, তবলা বাজনায় খুব ভালো হাত, তবলা বাজায় থিয়েটারে, কলকাকলী মিউজিক সেন্টারে তবলা শেখায়, মধ্যে মধ্যে সিনেমায় লম্বা সিঁটকে মানুষের পার্ট করে। তার সময়ও ছিল না—তাগিদও ছিল না। এবং মায়ের থেকে বুদ্ধি একটু বেশি। বিয়ের চেষ্টা সে করে নি। চমৎকার কাজ একটা তাকে জুটিয়ে দিয়েছিল। কোত্থেকে কে বুদ্ধি দিয়েছিল শ্যামলী জানে না, তবে একদিন কাপড়কাচা সাবানের এক মালিক ভদ্রলোকের বাড়ি তাকে নিয়ে গিয়ে সাবান ক্যানভাসিংয়ের কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল। কালো মেয়ে, ধবধবে সাদা কাপড় জামা পরে লোকের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে এবং এই সাবানের গুণ বর্ণনা করতে হবে। হাল আমলে এসব সাবানের নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে যাতে সাবান খানিকটা জলে ফেলে হাত দিয়ে নাড়া দিলেই ফেনা হয় এবং তার মধ্যে কাপড় ফেলে দিয়ে কিছু ডুবিয়ে রেখে তুলে নিংড়ে নাও, বাস হয়ে গেল। একেবারে বকের পালক হয়ে যাবে। সাবানটার নামও দিয়েছে কোম্পানি 'বলাকা'।

তিনটে সাড়ে তিনটের সময় বের হয় শ্যামলী। সতের বছর থেকে এখন চব্বিশ পার হতে চলেছে। উনিশশো ষাট সাল; আট বছরে শ্যামলী চাকরির পথে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে। একটা হ'ল, সকালে বা ভর্তি দুপুরে গৃহস্থ বাড়িতে ক্যানভাসিং-এ গেলে বিপরীত ফল হয়। সকালে কাজকর্ম—আফিস ইস্কুলের ব্যবস্থা—দুপুরে মেয়েদের খাওয়া বিশ্রাম, এর মধ্যে গেলেই তাদের মেজাজ বেগড়ায়। সাড়ে তিনটে থেকে পাঁচটা তাদের মেজাজ ভাল থাকে। ব্যাটাছেলেদের কাছে সে তার কালো চেহারা নিয়ে গেলে তারা চটে। মেয়েরা খুশিও হয় করুণাও করে। ছাতাটা সে নিজেকে আড়াল দেবার জন্যে ব্যবহার শুরু করে নি—করেছিল রোদ্দুরের জন্যে। ব্যবহার করতে করতে সে বুঝেছে এতে মাথায় রোদ লাগে না, কালো মুখ ঘামে চকচক ক'রে আরও খারাপ দেখায় না তো বটেই তা ছাড়াও পথচারীরা একটু তাকায় তার দিকে। তাকে দেখতে চেষ্টা করে এবং দু-চারজন ঔৎসুক্য-বশতঃ খানিকটা পথ পিছন পিছন কি সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। হাতে-পায়ের কালো রং সবাই দেখতে পায়, সে কালো জেনেও সঙ্গ নেয়—তার ওই চলনের স্টাইলের জন্যে। লোকে এজন্যে ব্যঙ্গও করে, কেউ—বাপরে, কেউ ছোট্ট একটি—হুঁ, কেউ মাই গড্, কেউ কিছু কেউ কিছু, যারা

একদিন দেখেছে, তারা—ওই রে! বা ওই যায়!—বলে ওঠে। তাতে প্রথম প্রথম সে আহত হ'ত, নিষ্ঠুরতম ব্যঙ্গ শুনে এক-একদিন তখন জলও আসত চোখে কিন্তু এখন আর আসে না; বরং একটু কৌতুকই অনুভব করে। বাংলা বইও সে পড়ে। পড়ে শুনে জীবনের সূক্ষ্মবোধগুলিও তার কিছু কিছু জেগেছে। সে জানে এর থেকে মর্মান্তিক লজ্জা, হয়তো অপমান কোন মেয়ের পক্ষে হতে পারে না, তবুও সে আত্মসংবরণ করতে পারে না,—ছাতা মাথায় দিয়ে—এই চলনেই হাঁটে। তবে তার চুলের রাশি দেখে তারিফ সবাই করে। চুল সে অধিকাংশ দিনই এলো রাখে। ডোনাটে খোঁপা এত বড় হয় যে তাকে আরও বিশ্রী করে তোলে। এলো খোঁপাও একটি তালের মতো হয়। মধ্যে মধ্যে একটা বেণী করে ডগার দিকটা এলিয়ে দেয়। তেল সে মাখে না, তাতে কালো রঙ চক্ চক্ করে—খারাপ দেখায়।

বাংলা 'কবি' বইটা তার খুব ভাল লাগে। তার কারণ কবির নায়িকা ঠাকুরঝি তারই মতো কালো মেয়ে। আর ভাল লাগে শরদিন্দুবাবুর একটি গল্প। তাতে ধনী বিদ্বান নায়ক ছদ্ম পরিচয়ে দুটি মেয়েকে পড়াতে এসে—সুন্দরটিকে ফেলে কালো মেয়েটিকেই পছন্দ ক'রে বিয়ে করলে। সে কালো মেয়েরও তারই মতো একরাশি চুল। সে মেয়ে নিজেকে উপেক্ষিতা ভেবে যখন টেবিলে মাথা রেখে কাঁদছিল তখনই নায়ক এসে বললে—কর্তাদের মত নিয়ে এসেছি। এখন তোমার মত চাই। কিন্তু কাঁদছ কেন? আর যদিই কাঁদছ তবে চুল এলিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে কাঁদো। কারণ কবি কালিদাস বলেছেন—কাঁদতেই যদি হয় তবে চুল এলিয়ে কাঁদো।

সে চুল এলোই রাখে। কিন্তু কাঁদবার অবকাশ হয় নি হবে না। তবুও সে এটুকু ছাড়তে পারে না। মধ্যে মধ্যে কটূক্তি শুনে ভাবে—ছি। তারপর ভুলে যায়। এ সেই অতি দরিদ্রের নিয়মিত চার আনা দামের লটারীর টিকিট কাটা! কোনবারই পায় না এবং তার ভাগ্যকেও সে স্থির জানে কখনও পাবে না তবু কিনেই যায়, কিনেই যায়। লজ্জা তার রূপ, লজ্জা তার দারিদ্র্য, লজ্জা তার এইভাবে হাঁটা, লজ্জা তার বাড়ি বাড়ি গিয়ে গিন্নীদের স্তব করা, সব জড়িয়ে গোটা জীবনটাই তার লজ্জা—তার সঙ্গে এ লজ্জাটাকেও সে মাথায় করে নিয়েছে।

মধ্যে মধ্যে দুষ্ট মানুষ আসে। কুৎসিত প্রস্তাব নিয়ে। সে কিন্তু তাও মেনে নিতে পারে না। কালনাগিনীর মতো ফোঁস করে ওঠে। চোখ দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে।

কয়েক বারই এমন ঘটেছে।

নিজেকে তারপর প্রশ্ন করেছে, তাহলে এমন করে হাটে কেন? এমন ছাতা ঢেকে চলেই বা কেন। বর্ষার সময় নীলচে প্ল্যাস্টিকের বর্ষাতি আর টুপি পরে। কোম্পানি অর্ধেক দাম দিয়েছে। তার উপরেও সে ছাতা ঢাকা দেয়।

তার আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর সে পায় নি, দিতে পারে নি।

না—এও সে চায় না। আবার ওইটুকুও ছাড়তে পারবে না।

এই সব কারণে সে কখনও চৌরিঙ্গীর দিকে হাঁটে না। সন্ধ্যের পর তো নয়ই। সন্ধ্যের পর এক ঘণ্টা আর একটা কাজ করে সে। সাবান কোম্পানীর বুড়ো ম্যানেজারের বাচ্চা নাতিকে পড়াতে হয়। পনের টাকা দেন বৃদ্ধ। আটটায় সে বাড়ি ফিরে আসে।

* * * *

পথে পড়ে এই ভদ্রলোকের বাড়ি। নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে, বাগান ভেঙে বসতি বসেছে, পথঘাট আলো-ঝকঝকে সব বাড়ি। মাঝখানে পার্ক রেখে নতুন এইখানটা একেবারে বালিগঞ্জের মতো হয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শী পুরনো বাসিন্দেরা এখানকার জায়গা বিক্রী করে ক্রমে ক্রমে উত্তরে সরছে। তারা এখনও বাড়ি বিক্রী করে নি। বিক্রী হয়ে যেতো কিন্তু এক খুড়ো আছে, তার বাপের সহোদর, সে সন্ন্যেসী হয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে আসে, মরে নি বলে কেউ কেনে না। তার মা দিনরাতই বলে—মরেও না। আবার মধ্যে মধ্যে বলে—তা মরে নি বলেই আছে, নইলে বাদল তো বিক্রী করে দিয়ে টাকা নিয়ে স'রে পড়ত। পথে বসতে হ'ত। মেয়ের বিয়ের ভরসা আর করে না মা। বরং এই তার ভালো হয়েছে। বাদল তবলা বাজায়, রোজগারও ক'রে কিন্তু তার অনেকটাই যায় তার বাইরের টানে। নইলে ভাল। নেশা করে না, বাবুগিরিও নেই, শুধু থিয়েটারের নাচিয়ে আশার ওখানে আড্ডা তার পাকা। ভোরবেলা বাড়ি ফেরে, বারোটা পর্যন্ত থাকে, খেয়েদেয়েই বেরিয়ে যায়। বলে থিয়েটারে। কিন্তু আশার বাড়ি দিবানিদ্রা দেয় গিয়ে। সেখান থেকে থিয়েটারে। আর সিনেমার কাজে ডাক থাকলে তো কথাই নেই—দশটাতেই বেরিয়ে যায়। মাসে পঞ্চাশ টাকা দেয়, তার বেশি সে দেয় না। বললে—চুপ করেই থাকে। বেশি বললে বলে—একটা পেট একবেলা পঞ্চাশ টাকার বেশি কি লাগে বল? আর শ্যামলীর তো একটা পথ আমিই করে দিয়েছি। ও তো মাসে ক্যানভাসিংয়ে টুইশনি করে পঁচাত্তর আশী টাকা পায়!

এরপরও কথা বললে—পরের দিন থেকে আসাই বন্ধ করে। খুঁজতে যেতে হয় শ্যামলীকে। আনন্দর বাসার ধার দিয়ে পথটাই ভাল পথ, চওড়া পথ, ভদ্র পথ। এই পথেই সে যায় আসে। তাছাড়া এ পথ দিয়ে যেতেও তার ভালো লাগে। বাংলা বইয়ের সে ক্ষুধার্ত পাঠিকা, বই সে গোগ্রাসে গেলে। এ পথে ক'জন লেখক এসে বাড়ি করেছেন, বাসা নিয়েছেন। তাদের বাড়ির ধার দিয়ে যেতেও ভাল লাগে। মধ্যে মধ্যে দেখতেও পায়। কেউ বারান্দায় বসে থাকেন। কাউকে দেখা যায় জানালার মধ্যে দিয়ে। কাছে যেতে বা গিয়ে আলাপ করতে সাহস পায় না। তাদের বাড়িগুলি পার হয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে একতলা একখানি ছোট বাড়ি, সেই বাড়িতে এসেছেন এই ভদ্রলোক, তারপরই পার্ক শেষ। ওদিকে একটা বড় রাস্তা চলে গেছে এ রাস্তাটা তার সঙ্গেই মিশেছে জ্যামিতির সমকোণ সৃষ্টির ঊর্ধ্ব রেখার মতো। সে রাস্তাটা সোজা পার হলেই পুরনো কালের পাড়া শুরু। ছোট অপ্রশস্ত রাস্তা। আঁকাবাঁকা। দু পাশে পচা ড্রেন। এরই মধ্যে গিয়ে তাদের নোনাধরা পলেস্তারা খসা পুরনো বাড়ি। উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ। ফাটা খোয়া ওঠা উঠোনে দূর্বাঘাস মুথো ঘাস। যেখানে সান আছে সেখানে শ্যাওলা। তার দু পাশে ঘর। একদিকে একখানা ছাদ-ফাটা দরদালান, তার কোলে দুখানা ঘর, অন্যদিকে একখানা রান্নাঘর একটা ভাঙা চাল। অন্য একদিকে খাটা পাইখানা। অন্য একদিকে পাঁচিল।

এই নতুন একতলা বাড়িটা নাকি এক অভিনেত্রীর। তার বাড়ি হচ্ছে খবরটা দিয়েছিল

তার দাদা ! সেদিন খুব আগ্রহ হয়েছিল তার। দাদার দৌলতে থিয়েটারটা দেখতে পায় মধ্যে মধ্যে। এই অভিনেত্রীর অভিনয় সে দেখেছে। নামও তার খুব। পথ দিয়ে যেতে আসতে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করত আর কত বাকী। একদিন শেষ হল। যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে কাছ থেকে দেখত। রাস্তার উপরেই বাড়ি, দেখতে অসুবিধা ছিল না। দাঁড়িয়ে দেখত কি বড় একটা জানালা। আর তার কোলে প্রায় ছোট্ট একটা ঘরের মতোই চৌকো একটি বারান্দা। বারান্দা ঘিরে গ্রিলের মতো বেড়া পড়ল। পর্দা ফেলে দিলেই ঘর। চমৎকার। দাঁড়িয়ে দেখত আর নতুন রঙের গন্ধ শুঁকত। ভারী মিষ্টি লাগে তার। তারপর বাড়ি বন্ধই রইল। দাদা বললে শুভদ্রা দেবী এখানে আসবে না বাস করতে। ভাড়া দেবে বাড়ি। হতাশ হয়েছিল। যাঃ। ইনি এলে হাজার হোক মেয়েছেলে কাছে যেতে পারত, দাদার সূত্র ধরেও আলাপ করত। একজন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আলাপ হত। নিজের জীবন তো সবটাই দৈন্য। সে তো মুছবার নয়। কোন সম্বলই তো নেই তার! শুধু মধ্যে মধ্যে মনে হয় এ আর ভাল লাগছে না! কর্পোরেশনে টিকেদারী করে তার পরিচিত একটি বন্ধু, তার জন্যে দরখাস্ত করলে হয়। কখনও ভাবে নার্স হলে হয়। কিন্তু সে হয় না। হবেও না। বড় নিরুৎসব ঠেকে জীবন। তবু এই বিখ্যাত মহিলার সঙ্গে দেখা হলে ভাল লাগত। তাঁকে ধরে অভিনয় শিখতে পারত। কালো রঙ আটকায় না পেন্টের দৌলতে। তা এলেন না তিনি। হঠাৎ একদিন দেখা গেল এই মাস দেড়েক আগে বাড়িতে লোক এসেছে। সে ছাতার আড়াল থেকেই দেখলে বারান্দাটায় টবের গাছ ঝুলিয়ে দিয়েছে। ছবি টাঙানো হচ্ছে। অনেক ছবি! একজন পাজামা পাঞ্জাবী পরা উস্কোখুস্কো চুল মানুষ ছবি টাঙাচ্ছে।

তারপর শুনলে লোকটি নাকি শিল্পী। ছবি আঁকে। ছোট গেটটায় বেশ চমৎকার করে কাঠের প্লেটে লেখা আনন্দ রায়—আর্টিস্ট। নাম সে শোনেনি। শিল্পের খোঁজ সে বড় রাখে না। সামর্থ্যই বা কোথায় আর অবসরই বা কোথায়! তবে ছবি সে ভালবাসে। মাসিক পত্রে ক্যালেণ্ডারে আঁকা ছবি খুব ভাল লাগলে বাঁধিয়ে ঘরে টাঙায়। সেও সহজ ব্যাপার নয়। ফ্রেম কাঁচ বাঁধাই খরচ আছে। বাড়িতে মায়ের পুজোর জায়গায় ঠাকুরের ছবি আছে। অনেক ঠাকুর। সে বেছে বেছে প্রাকৃতিক দৃশ্য পেলে বাড়ির পুরনো আমলে ফ্রেমের কাচ নিয়ে পুরনো ছবি ফেলে দিয়ে নিজেই বাঁধিয়ে টাঙায়। শিল্পীদের মধ্যে নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, গোপাল ঘোষের নাম শুনেছে। অবনীন্দ্রনাথের নাম সব থেকে উঁচুতে তাও জানে। সন্ধ্যাবেলা ফার্মের ম্যানেজারের বাড়িতে তাঁর নাতিকে পড়াতে গিয়ে কাগজ পড়তে পায়। রবিবারের কাগজের সাপ্তাহিকীর পাতাগুলি বাড়ি নিয়ে এসে খুঁটিয়ে পড়ে। তারই মধ্যে এদের কথা অনেক থাকে। আনন্দ রায় নতুন। এ কালের ছবি সব সে বুঝতে পারে না। তবুও দু-চারটে ভাল লাগে রঙের জন্য। আনন্দ রায়ের জানালা প্রায় বন্ধ থাকে। বাইরের বারান্দায় ছবিগুলি সে তিনটের সময় বেরুবার পথে কয়েক দিনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে গেছে। ছবিগুলো কেমন জড়ানো জটিল, বেশ কিছুক্ষণ না দেখলে বোঝা যায় না, হেঁয়ালির মতো। কিন্তু রঙ বড় ঝকমকে। লাল নীল গাঢ় হলুদে যেন ঝলমল করে। আরও ভাল লাগে সাজানোর ব্যাপারটা। কি চমৎকার

সাজানোর ভঙ্গি। কটিই বা জিনিস। একটা উঁচু টুলে একটা এবড়ো-খেবড়ো বিচিত্র কাঠের গুঁড়ি, কিন্তু দূর থেকে মনে হয় একটা জন্তু! কাছে গেলে বুঝতে পারে কাঠের গুঁড়িতে ত্রিভুজের মতো তিনটে খোঁদড় তার দুটোতে চোখ আঁকা, একটাতে মুখ। দুটো টুলের উপর দুটি ফুলের টব। বারান্দায় ছাজার মাথায় কয়েকটা ঝোলানো টব। মাঝখানে দুখানি চেয়ার একটি ছোট্ট টেবিল। টেবিলে একটা বেশ ফাঁপা বাঁশের ফুলদানী। বাঁশই তবে মাঝখানে চমৎকার নক্সা আঁকা। বোধ হয় নিজেই এঁকেছেন। দেখে কতদিন ভেবেছে এ সব তো সস্তা জিনিস, এ দিয়ে তাদের একখানা ঘর, যেখানা নামে দাদার জন্য, আসলে পড়ে থাকে—সে ঘরখানা এমনই করে সাজানো যায় না। তাতেও মায়ের বাধা, হাঁ-হাঁ করে উঠবে। পুরনো আমলের ভাঙা খাট, তার তলায় ভাঙা কুলো, ভাঙা চ্যাঙারি, ঘুঁটের ঝুড়ি, রাজ্যের জিনিস। সে সব বস্তুগুলির প্রত্যেকটি মায়ের বুকের এক একখানি পাঁজরা! অথচ নিত্য দেখে যায় আর এমনই একটি বাসনা, গোপন বাসনা বুকের মধ্যে পুষে নিয়ে যায়, কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্য নয়; এখান থেকে রেল পুল পার হয়ে ওপারে খালের পুল পর্যন্ত যেতে যেতেই শেষ হয়ে যায়। আপনা-আপনিই ভুলে যায়। আর একটি আফসোস জাগে সেটা বন্ধ বড় জানালাটা। সেই প্রথম দিন সে আনন্দ রায়কে ছবি টাঙাতে দেখেছে তারপর আর দেখেনি। উস্কোখুস্কো রুক্ষ বড় বড় চুল, বেশ লম্বা চেহারা একটু রোগা। মুখখানা কেমন কড়া, চোখের কোণে কালি, লোকটাকে ভয়ও করে আবার মন্দও লাগে না। ভালোই লেগেছিল। ব্যাটাছেলের চেহারা ননীগোপাল হলে মানাবে কেন? আনন্দ রায়কে আর দেখেনি, এই কাল পর্যন্ত আর জানালাটাও খোলা দেখেনি। ওই ঘরখানাতে একটু উঁকি মেরে দেখবার ইচ্ছে ছিল। এবং আনন্দ রায়কে ভালো করে একটু দেখতে। তা হয়নি। এই কাল হয়ে গেল সে সুযোগ। ছাতা আড়াল দিয়ে চলে বটে সে কিন্তু ওর মধ্যে থেকে বাইরের দুই পাশ, সামনের সব কিছুই সে দেখে নেবার একটি সুকৌশল আবিষ্কার করে নিয়েছে সেই ঈশপের গল্পের তৃষ্ণার্ত কাক পক্ষীটির মতো। সে যেমন জল খেতে এসে একটা পাত্রের কানায় বসে দেখলে জল অনেক নিচে তার ঠোঁটের নাগালের বাইরে, তখন সে যেমন নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে পাত্রের তলায় ফেলে জলকে নাগালের মধ্যে এনেছিল তেমনি সেও তার এই বিশেষ ভঙ্গির চলনের দোলার সঙ্গে ছাতাটিকে এক-একবার এমনভাবে অল্প পিছনের দিকে চকিতের জন্য ফেলে যে আশপাশ সামনের সব কিছু দেখে নিতে পারে। কাল সে একটু দূর থেকেই প্রথমটা দেখেছিল জানালার পাল্লা বাইরের দিকে খোলা রয়েছে। মনটা কৌতূহলী এবং খুশি হয়ে উঠেছিল। এবং আরও একবার ছাতাটা পিছনে ফেলে দেখে না নিয়ে পারে নি। দ্রুত চলন আরও একটু দ্রুত করে হেঁটেছিল। তার পরের বার দেখতে পেয়েছিল আনন্দকে। সে দেখেছিল ভদ্রলোকের চোখ তার দিকেই। বুকটা একবার ধড়াস করে উঠে ঢিব ঢিব করতে শুরু করেছিল। মনে ঠিক কি হয়েছিল বলতে পারবে না, হয়তো লজ্জা, হয়তো তার কালো রোগা মুখখানাকে ভাল করে ঢাকবার জন্যেই সে ছাতাটা একটু বেশি নামিয়ে নিজেকে ঢাকতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ঘটল কাণ্ডটা। কাকটা একেবারে সামনে ছোঁ মেরে এসে পড়ল, চড়ুইটা চকিত, একটি জোরে ছোঁড়া কিছুর মতো আগেই বেরিয়ে গেছে।

আবছা দেখেছিল ঠিক নয়, মনে হয়েছিল। তার পিছনে কাকটা কালো পাখায় শব্দ তুলে আশ্চর্য একটা আঁকাবাঁকা গতিতে ছাতার কিনারা ঘেঁষে চলে গেল। চমকে উঠে স্বাভাবিক ভাবেই ছাতাটা একেবারে পিছনে ঠেলে দিয়ে নিজেকে অনাবৃত করে দিলে—মাঃ! সঙ্গে সঙ্গে শুনলে—অঃ শব্দ! ক্ষুব্ধ এবং যন্ত্রণা-কাতর একটি মোটা গলার অঃ! উঃ! এবং আঃ! যেন মিশে গেছে একসঙ্গে। সে তাকালে সেই দিকে, সেই জানালাটার দিকে। শিউরে উঠল সে! ইস্!—শিল্পী আনন্দ রায়ের চোখ থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে। কেউ বোধ হয় ঢেলা ছুঁড়েছিল কাকটার দিকে, সেটা ছুটে গিয়ে আনন্দ রায়ের চোখে লেগেছে। তাই বোধ হয় কাকটা ঢেলা এড়িয়ে এমন গোত্তা খেয়ে নিচে নেমে এঁকেবেঁকে এমনভাবে বেরিয়ে গেল। আনন্দ রায়ের চোখে রক্ত পড়তে দেখে ঢেলা লেগেছে বলে শিউরে উঠে বলে উঠেছিল—ইস্! আপনার চোখে যে রক্ত পড়ছে! ঠিক কি বলেছিল মনে নেই। কিন্তু আনন্দ রায় যখন হাতের তালুর উপরে চড়ুইটা দেখিয়ে একটু হেসে বলেছিল—একটা চড়ুই। সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। একটা পিঁপড়ে হঠাৎ কামড়ালে মানুষ চমকে উঠে সেটাকে টিপে ধরে মেরে দেয়। কেউ আগে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তারপর দেখে কঠিন আক্রোশে মেঝের উপর দ'লে দেয়। লোকটি বিচিত্র। হেসে বেশ স্নেহের সঙ্গে বললে—চড়ুই। তাকে জল নিয়ে বাঁচাতে ব্যস্ত হল। সযত্নে কোথায় যেন তুলে রেখে দিলে। তার ইচ্ছে হয়েছিল—ঘরে গিয়ে চোখটা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে দেয়। কিন্তু এতটা সে পারেনি। লজ্জা পেয়েছিল। আর বলবার কথা না পেয়ে চলে গিয়েছিল। রাত্রে কাল ফিরবার সময়ও সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল খোঁজ নিয়ে যাবে—ডাক্তার দেখিয়েছেন কিনা। যা হোক—সে তার ওই 'একটা চড়ুই' কথাতেই সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু লজ্জায় পারেনি। কি ভাববেন? তা ছাড়া পাড়ার লোক, তারা তো এতেই নানান রটনা করে। নাম দিয়েছে দালাল কালী। আর তাকে নিয়ে যে সব গল্প তৈরি করে তা শুনে তার মতো ক্যানভাসার মেয়েও লজ্জা পায়।

আজ দুপুরবেলা জানালা বন্ধ ছিল। ভেবেছিল কি লোক, বেরিয়ে গেছেন এই চোখ নিয়েই! তবে ভাল নিশ্চয় আছেন অনুমান করতে হয়নি। ভাল না থাকলে বেরুলেন কি করে? হাসপাতাল-টাসপাতাল যেতে হয়নি তো? না, এতদূর হবে না। একটু দাঁড়িয়ে সে এসে কড়া নেড়েছিল। চাকরটা তো আছেই; তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে যাই। বাড়িতে না থাকলে বাড়ির ভিতরটা দেখতে চাই—; না। সে থাক। চাকরটা যদি বলে হুকুম নাই। তার থেকে জিজ্ঞাসা ক'রে আর দুটো খবর নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু উনি ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন এবং ভাল আছেন শুনেই পালিয়েছিল। থাক বাবা।

বাড়ি ফিরবার পথে সে আবার দাঁড়াল।

জানালাটা খোলা আছে তবে ভিতরটা অন্ধকার। এপাশের চারফুট গলিটার ভিতরের রান্নাঘরের একটা জানালা দিয়ে আলো বেরুচ্ছে। চাকরটা রয়েছে—রান্নাবান্না করছে। আনন্দ রায় নেই। চলে গেছেন বেরিয়ে। হয়তো সিনেমায় হয়তো তাদের আড্ডায় কিংবা হয়তো কোন আত্মীয়ের বাড়ি নয়তো শ্বশুরবাড়ি। কলকাতাতেই শ্বশুরবাড়ি, বউ এখন সেখানে

গেছেন। বাসায় কোন মেয়েছেলে নেই। একা থাকেন। একলা কেন থাকেন কে জানে? কেউ নেই? হতে পারে। না পারে না। কেউ নেই তো বাসা কেন? কার জন্যে বাসা? দিব্যি তো ভালো ভালো মেস আছে বোর্ডিং আছে, আজকাল হোটেল রয়েছে। সেখানে তো বিনা ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারেন। বাসায় তো ঝঞ্ঝাট আছে। রান্নাবান্না নিয়ে একটা সংসার। একটা চাকর। নিশ্চয় বাসায় থাকবার মতো কেউ আছে। ঘরখানা দেখতে পেলে ঠিক ধরতে পারত। তবে সে বেশ অনুমান করতে পারে ঘরখানায় পাশাপাশি দুটো খাট জোড়া দেওয়া আছে। নইলে ছোট হোক দুখানা ঘরের কি প্রয়োজন। ভাবতে ভাবতেই সে চলতে শুরু করেছিল।

বড় রাস্তাটা পার হয়ে গলিপথে ঢুকল। গ্যাসের বাতি ঘুচে ইলেকট্রিক হয়ে জীবনে ঐশ্বর্য বেড়েছে। কথাটা শুনতে ভাল লাগে, যখন প্রথম ইলেকট্রিক আসে তখন সবাই বলেছিল বাঁচলাম। সেও খুশি হয়েছিল। এ তো তার আমলেই হল। তখন সদ্য বাবা মারা গেছেন। কিন্তু আলো হয়ে দুঃখ আরও বেড়েছে। গ্যাসের আলো যতগুলো ছিল ততগুলো তো দেয়নি। পথ আরও অন্ধকার হয়েছে। অন্য লোকেরা অনেকে বাড়িতে ইলেকট্রিক নিয়ে সুখ পেয়েছে নিশ্চয়, সুইচ্ টিপলেই আলো, উজ্জ্বল আলো। কিন্তু তাদের মতো লোকের বাড়িতে এখনও সেই হ্যারিকেন আর চিমনী।

এঃ! কিসের পচা গন্ধ উঠছে। কোথায় ইঁদুর পচে পড়ে আছে। দুর্গন্ধ বারো মাস চব্বিশ ঘণ্টা; নর্দমাগুলোই এখানে ছেলেদের পাইখানা।

পিছন থেকে শিষ উঠেছে।

পাড়ায় কতকগুলো চ্যাংড়া আছে। একেবারে জানোয়ার! আজ তো শুধু শিষ। অন্যদিন ছড়া বলে। গান ধরে। তাদের দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা থাকে 'ভালোবাসি গো'! প্রথম প্রথম রাগ হ'ত। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলত। একবার সে একটু দূরের বাড়ির রোয়াকে আড্ডাবাজ ছেলেদের কাছে গিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিল—এ সব আপনাদের কি ব্যবহার? লজ্জা করে না? কি ভেবেছেন, বাবা মারা গেছেন বলে আমাদের কেউ নেই? আমরা পাড়ার পুরনো বাসিন্দে। পুরনো বাসিন্দে যাঁরা এখনও আছেন আমি তাঁদের কাছে যাচ্ছি!

মা চীৎকার করত—পাড়ায় কি মানুষ আছে! সমাজ আছে!

তারা তার পিছনে হো-হো করে হেসেছিল। তখন দাঙ্গার পর বোমা ফাটানোর সময়। একদিন তাদের দরজায় বোমাও ফাটিয়েছিল কেউ। সহে যেতে হয়েছে। তবে আগের থেকে এখন অনেক কম। বোমাবাজেরা তখন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। এখনও মধ্যে মধ্যে প্রেমপত্র পায়। সে আর চঞ্চল হয় না। প্রথম পড়েই ছিঁড়তে যায়। কিন্তু হাত দুটো সক্রিয় হয় না, একটু ধরে থেকে ভাবে পুলিসের কাছে যাবে। তারপর একটু পর আর একবার পড়ে। এবার হাসি পায়। তারপর আস্তে আস্তে কোনটা ছিঁড়ে দেয় কোনটা নর্দমায় ফেলে দেয়।

বাড়ির দরজায় এসে সে কড়া নাড়লে—মা।

ভিতর থেকে মায়ের বকুনি শুরু হয়ে গেল।—তুই আবার আজ একখানা নতুন কাপড় ভেঙেছিস! কালকের কাপড়খানা বিছানায় বালিশের নিচে পাট করা রয়েছে। এ তোর

কি রকম ব্যাভার। ওই তো ছিরি!—

সে হাসলে। কি উত্তর দেবে?

—আর ওসব কি বিচ্ছিরি বই পড়িস তুই? তিনটে বোন একটা ছোঁড়াকে নিয়ে সারারাত ধরে টানাটানি—মরণ। বিকেলবেলা কোমরের ব্যথায় মরি। রান্না চাপাতে পারলুম না। শুয়েই বা করি কি? তোর বালিশের নিচে বই থাকে—নিতে গিয়ে দেখি কাপড়খানা। বইটা নিয়ে পড়ে বেন্নায় বাঁচিনে।

—চল। ভেতরে যেতে দাও। হেসেই সে বললে।

—আগে উত্তর দে কথার।

—উত্তর? বই পড়ে বা নিত্য নতুন কাপড় পরে যদি খারাপ হতাম মা—তবে অনেক দিন আগেই হতাম। বয়স আমার চব্বিশ পার হয়ে গেল।

মা সরে দাঁড়াল।

* * * *

চারিদিন পর। চারদিন জানালাটা বন্ধই ছিল। পাঁচদিনের দিন শ্যামলী দেখলে জানালাটা খোলা। যেখান থেকে প্রথম সে দেখতে পেলে সেখানেই সে আপনা-আপনি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বুকটা স্পন্দিত হয়ে উঠল।

আনন্দ রায় ফিরে এসেছে।

পুরী চলে গিয়েছিল। সেই যেদিন সে ওঁর চাকরের কাছে ওঁর খোঁজ নিয়েছিল অর্থাৎ ওঁর চোখে আঘাত লাগবার পরের দিন। উনি ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন; সেইদিন রাত্রেই উনি পুরী চলে গিয়েছিলেন।

তার পরের দিন সকালেই সে বাজারে গিয়েছিল। দাদা ফিরে আসে ভোরবেলায় আশার বাড়ি থেকে; এসেই চা দিতে হয়, চা-টা খেয়ে দাদাই বাজারে যায়। সেদিন দাদা ফেরেই নি। সে-কথা অবিশ্যি আগের দিন বলেই গিয়েছিল দাদা। আর বলে না গেলেই বা কি হ'ত!

বাজারে দেখা হয়ে গিয়েছিল আনন্দ রায়ের চাকরের সঙ্গে। দুজনেই কুমড়োর ফালি কিনছিল। চাকরটি দাঁড়িয়েছিল সামনে। ভিড় ছিল। ঠেলে ঢোকা ঠিক ভালো লাগছিল না। পিছনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, দু-তিনবার মৃদুস্বরে সামনের লোককে বলেছিল—দয়া করে একটু সরবেন? শুনছেন?

কিন্তু শোনেনি কেউ। শুনেছিল ও চাকরটি, সে কথা শুনে পিছন ফিরে তাকে দেখে চিনেই চলেছিল—আপনি কুমড়ো নিবেন?

সকৃতজ্ঞ হেসে সে বলেছিল—হ্যাঁ। বড্ড ভিড়।

—আমাকে দিন। আমি কিনব।

পয়সা সে দিয়েছিল। চাকরটি শুধু কুমড়ো কিনে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, কুমড়োর ফালিটা তার থলেতে ফেলে দিয়ে বলেছিল—আর কি নিবেন? ভিড় সবখানেই।

শ্যামলীর লজ্জা হয়েছিল সামান্য বাজারের কথা বলতে। সলজ্জভাবেই বলেছিল—

সামান্ত বাজার। একপো বেগুন, একপো আলু, শাক আর একপো ছোট কুচো মাছ—আর খানিক—থাক, সে আমি কিনে নিচ্ছি। তুমি বেগুন আর আলুটা কিনে দাও।

পয়সা হাতে দিতে দিতে বলেছিল—তোমার বাবু কুমড়ো খান নাকি?

—বাবু নাই আজ।

—কোথায় গেলেন? নেমন্তন্ন?

—না। কাল রাত্রে পুরী চলে গেল।

—পুরী?

—হঁ। সনঝেতে বেরিয়ে গেল, এক ঘণ্টা পর ফিরে এল ট্যাক্সিতে—বললে বিছানা বেঁধে দে, পুরী যাচ্ছি। আরও সব বন্ধুলোক গেল।

একটু হেসেছিল শ্যামলী। আর্টিস্ট লোক। রোজগার ভালই করেন, যাবেন নাই বা কেন? জিনিসগুলি কিনে এনে চাকরটি যখন দিলে—তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেই সে বলেছিল—কি উপকার যে করলে তুমি!

—কি করলাম?

—অনেক উপকার করলে। তোমার নাম কি?

—হরি। বাবু বলে হরিয়া। একটু হেসে মৃদুস্বরে বললে—মাঝে মাঝে হরিয়া রাজা।

—খুব ভালোবাসেন বাবু। না? তুমিও বাসো!

—বাবু যে খুব ভালো লোক!

—বড়লোক! ছবি এঁকে অনেক পয়সা পান। না?

—তা পায়। তবে খুব খরচ করে!

—কেন? ওঁর স্ত্রী বারণ করেন না?

—বাবু তো বিয়ে করেনি।

—বিয়ে করেননি?

—না। উ আর বিয়া করবেও নাই।

চুপ করে গিয়েছিল শ্যামলী। তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখেই হরিয়া বলেছিল—আমি যাই।

—আচ্ছা। তুমি বড় ভাল লোক।

সে হেসে চলে গিয়েছিল। অন্যমনস্কভাবে আরও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল শ্যামলী। হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল—সে দাঁড়িয়েই আছে। ব্যস্ত হয়ে সে মাছ কিনতে এগিয়ে গিয়েছিল।

সেইদিনই সাড়ে তিনটের সময় হরিয়াকে দেখেছিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে হেসে বলেছিল—দাঁড়িয়ে আছ?

—হ্যাঁ, আপনি যাচ্ছেন?

তারপর তিনদিন আর দেখা হয়নি। বাজারেও না—বাসার বাইরের বারান্দাতেও হরি দাঁড়িয়েছিল না। আজ হঠাৎ দেখলে, আনন্দ রায়ের শোবার ঘরের জানালা খোলা। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল আপনা-আপনি।

আবার চলতে শুরু করলে। খোঁজ করে যাবে? বলবে, আশ্চর্য মানুষ আপনি! চোখের ওই কাটাকুটো নিয়েই চলে গেলেন? আর কিছু নয়, চোখ জিনিস তো! কিন্তু—?

কিন্তু কি ভাববেন, কি বলবেন?

আবার সে দাঁড়াল। ছাতাটা একটু উপরে ঠেলে দিয়ে সর্বাগ্রে পিছনের দিকে তাকালে। বেশি ভয় তার নিজের পাড়ার পরিচিত লোকদের। নেই কেউ। সামনেও না, পাশে পার্কটাতেও না। সামনে অনেক দূরে দুজনে আসছে। গ্রীষ্ম এই ক'দিনেই বেশ চড়া হয়ে উঠেছে। রাস্তার পিচ নরম হয়েছে। মাঝে মাঝে চটির তলায় কিছু যেন নরম নরম অনুভব করছে। যাবে? চলতে চলতে তার দ্রুত চলন মন্থর হয়ে এল। কিন্তু বুকটা স্পন্দিত হচ্ছে দ্রুততর গতিতে। না যাবে না, থাক! গলাটা তার যেন হঠাৎ শুকিয়ে গেছে।

* * * *

আনন্দ রায় ঘরে ইজিচেয়ারটায় শুয়েছিল। ঘরের পাল্লাহীন দেওয়াল-আলমারির বইয়ের মাথায় বসে চড়ুইটা ডাকছে চি-রি-ক। বেশ একটুক্ষণ ছেদের পর আবার চি-রি-ক। বইয়ের তাকের মাথায় পা দুটো সম্পূর্ণ ভেঙে একেবারে বুক পেতে বসে আছে। সম্ভবতঃ ওইটেই ওদের শোওয়া। দুপুরে পাখীরাও বিশ্রাম করে। পত্রপল্লবের মধ্যে এমনি করে বসে নিস্তব্ধ ঝিমিয়ে থাকে। ইনি ঘরটাকে কিংবা আনন্দকে ভালোবেসে এখানে এসে নিরাপদ স্থানটি আবিষ্কার করে জেঁকে বসেছেন। খেয়াল ঠিক নয়, ওরা ঘরের আনাচকানাচ, দেওয়ালের ফোঁকর, ভেন্টিলেটার, পাড়াগাঁয়ে চালের ছাঁচে, এমন কি খড়ের ছাউনির মধ্যে ফোঁকর তৈরি ক'রে নিয়ে বাসা বাঁধে। ইনি ঘরের মধ্যে আলমারির তাকে বইয়ের মাথায় জায়গা বেছেচেন দেখছে আনন্দ।

পুরী থেকে ফিরে ঘরে ঢুকবার সময়ই ওর কথা মনে হয়েছিল প্রথম। চড়ুই প্রেয়সী আছেন তো। না এই ক'দিনের অদর্শনেই অধিকাংশ সময় জানালা বন্ধ দেখে সরে পড়েছেন! সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে রাস্তায় ওই পুরনো পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। কালো মেয়ে! একটু হেসে নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ করছিল—প্রেমে পড়লে যে! পুরীতে এ ক'দিন সমুদ্রতীরে এ নিয়ে অনেক সরস পরিহাস-মুখর ঘণ্টা কেটেছে তাদের। আজ ও নিজেকে পরিহাস করলে না, এ সময় তাকে কোথায় পাবে?

ঘরে ঢুকে চড়ুইটার কথা জিজ্ঞেস করতে হয়নি। হরিয়া ঘরের জানালাটা খুলে দিতেই মুহূর্তের মধ্যে খোলা জানালাটার মাথায় এসে বসে তাকে অভ্যর্থনা করেছে—চি্রিক। চি্রিক। চি্রিক। চি্ক-চি্ক-চি্ক!

আনন্দ বলেছিল—এই যে! এসেছে।

হরিয়া বেডিংটা খুলছিল। সে মনিবের কথায় তার দিকে তাকিয়ে মনিবের দৃষ্টি এবং চড়ুই পাখীটাকে দেখেই বলেছিল—ভারী জ্বালাচ্ছে পাখীটা। খড়-কুটো আনছে—

—খড়-কুটো আনছে?

—হ্যাঁ। ফেলে দি রোজ, আবার দেখি আবার এনেছে। ওই আলমারির বইয়ের মাথায় জড়ো করে। আজ সকালেও ফেলে দিয়েছি।

পাখীটা ছোট পাখার ফ্ররর্ শব্দ করে গিয়ে বইয়ের মাথায় বসল। একবার ঠোঁট দিয়ে ঠোকরালে। নাচনের মতো বার কয়েক লাফিয়ে লাফিয়ে চারপাশ ঘুরে ফ্ররর্ ক'রে বেরিয়ে গেল। আনন্দ হরিয়াকে প্রশ্ন করলে—ঘরে ঢোকে কি ক'রে? জানালা খুলে রাখিস নাকি?

—সকালে একবার খুলি, খানিকক্ষণ খুলে রাখি, আর খুলি একবার সন্ধ্যার সময়। তখন জানালা দিয়ে আসে। আর বন্ধ থাকলে কি হবে, ওই যে পিছন দিকের দেওয়ালে ভারার বাঁশের গর্তটা ইপার উপার ফুটা রইছে পলেস্তারার সময় বন্ধ করেনি—ওই ফাঁক দিয়া ঢুকছে।

ফ্ররর্ শব্দ ক'রে চড়ুইটা ঘরে ঢুকে জানালার মাঝখানের আড়ার পাটির উপর বসলো। মুখে একটা লম্বা শুকনো ঘাস। তারপর স্টান গিয়ে বসলো আলমারির মাথায়!

—ওই দেখেন—আবার আনিছে। ধ্যাৎ-ধ্যাৎ।

—থাক।

—নোংরা করিছে।

—করুক।

পাখীটা বইয়ের তাকের মাথায় কুটোটা রেখে ঠোঁট এবং পায়ের নখ দিয়ে কারিগরী ক'রে বিছিয়ে ডেকে উঠল—চি-রি-ক। চি-রি-ক।

তারপর ফ্ররর্ শব্দ তুলে উড়ে গেল। আনন্দ ইজিচেয়ারটায় বসে হেসে একটু একটু দোল খেতে লাগল। ক্যাম্বিসের ডেক চেয়ারটা একটু নতুন ধরনের, রকিং চেয়ারের মতো দোলে।

হরিয়া চলে গেল চা আনতে।

আবার পাখীটা এল, এবারও একটা সরু কাঠি। আবার উড়ে গেল। আবার এল ঘাস নিয়ে। আবার গেল। প্রতিবারই ডেকে কিছু বলে গেল।

হেসে আনন্দ বললে—কি বলছ? ইনকিলাব জিন্দাবাদ! না ভালোবাসি তাই তো আসি! তা এস! যখন একদিন তোমাকে নারীমুখ দেখে তুমি নারী ব'লে টিপে আছড়ে মারতে গিয়ে মারিনি, তারপর দুপুরটা জবরদস্তি ক'রে বন্ধ ঘরে আটকে রেখে কলঙ্কিনী করেছি তখন মানতে হবে তোমার ঘর বাঁধার দাবী।

পাখীটা চি্ক-চি্ক-চি্ক ক'রে ডাকছিল। এবার একটু চুপ করে ওই বইয়ের মাথায় জিরিয়ে নেবার জন্যে বুক পেড়ে বসল। বসে ডাকলে চিনিক চিনিক। শান্ত অথবা ক্লান্ত ডাক। পুরীর কথা মনে পড়ে গেল।

পুরীতে একদিন সমুদ্রের ধারে চড়ুই এবং ওই কালো মেয়ে, ওর নাম দিয়েছে ও কৃষ্ণা, ওদের গল্প বলেছিল। কৃষ্ণাকে নিয়ে পরিহাস করছিল নীরদ। যশোদা দা বলেছিলেন—দেখ নীরদ তোকে গল্পের প্লট দিচ্ছি—লেখ দেখি, দেখবি ফুঁ দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবি। কিন্তু তুই কি লিখবি?

—বলুন না। নিশ্চয় লিখব মনে লাগলে।

—মনে লাগবে না।

—কি ক'রে জানলেন ?

—চীন আসবে যে গল্পে।

আনন্দ বলেছিল—বলুন আমি লিখব। নীরদ না লিখুক।

—পারবি ? তুই পেন ইঙ্কে ছবি এঁকে গল্প কর।

—আগে বলুন।

—ধর, চীনে হুকুম হয়েছে চড়ুই বরবাদ। বিলকুল মার ডালো। কেমন ? এখন একজন শিল্পীর ঘরে একটা চড়ুই এসে ঢুকেছে। অবিশ্যি আর্টিস্টের অজ্ঞাতসারেই। পাক্কা রাষ্ট্রভক্ত। নীরদের মতো আধা নয়। তারপর সে একদিন দেখতে পেল চড়ুইটাকে। কিন্তু মানুষ তো। রাত্রের অন্ধকারে চড়ুইটাকে মারতে গেল—কিন্তু কি হল; মারতে পারলে না। কি হল মানে—দেখতে পেল তার বাসায় দুটি ডিম। সে তখন একটা ছোট্ট খাঁচায়—চড়ুই-এর ডিমসুদ্ধ বাসা তার সঙ্গে চড়ুইটাকে পুরে দিয়ে লুকিয়ে রাখলে। খেতে দিত—জল দিত। কিন্তু ছোট্ট খাঁচাটার একটা কাঠির শলা ছিল পচা। সেটা ভেঙে সে একদিন বেরিয়ে পড়ল। বাইরে পল্টনের লোক মারবার জন্য তাড়া করতেই—ধর এয়ারগান ছুঁড়তে সেটা মিস্ করল। পাখীটা উড়ল। একেবারে তোর চড়ুইয়ের মতোই উড়ে এসে ঘরের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল। তখন সেপাইরা ঢুকল আর্টিস্টের ঘরে। খুঁজে দেখতে গিয়ে বের করলে খাঁচাটা। খাঁচায় তখন আর একটি চড়ুই নয়—তখন দুটি বাচ্চা হয়েছে। বুঝলি। তার খাঁচা এবং আর্টিস্টকে ধরে নিয়ে গেল। হুকুম হল আর্টিস্টকে—তুমি মার নিজে হাতে। সে বললে—না পারব না। হুকুম হ'ল—শুট্ হিম।

নীরদ বলেছিল—এটা কি গল্প হল ? অ্যামেরিকায় লিখে পাঠাও যশোদা দা—, ইংরাজী ভালো লেখো, ওরা লুফে নেবে এবং মোটা টাকা দেবে।

আনন্দ বলেছে—আমি লিখব বা ছবিতে গল্প বলব। তবে উইথ সাম অল্টারেশন ! সেটা হল—কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। গল্পটা বলছে বন্দী আর্টিস্ট—ছেঁড়া কাপড় পাতলুন। এ্যাঁ ? এবং শেষটা হচ্ছে—সে যখন না বলছে—তখন হুকুম হল পাঁচ বছর র্ডি লেবার কনসেনট্রেশন ক্যাম্প।

পুরীর প্রমোদ পর্বটায় কিন্তু এতেই ছেদ পড়ে গেল হঠাৎ। মধ্যরাত্রে দুর্ঘটনায় বাসর ভাঙার মতো। নীরদ ক্রুদ্ধ হয়ে আনন্দকে বললে—দেখ না তোর ওই কৃষ্ণা আর তোকে নিয়ে কেমন একখানা ঝাড়ি, দেখবি। তোদের এই পচা সমাজ—একেবারে খুলে দেব পর্দা।

সূত্র এ থেকেই।

বাদানুবাদ থেকে শেষ পর্যন্ত আনন্দ একটা ঘুঁষি মেরেছে নীরদকে। নীরদ রোগা প্যাকাটি কুঁজো।—সামান্য মদ খেলেই কাত হয়ে পড়ে এবং চেঁচায়।

পড়ে পড়েও সে কৃষ্ণাকে গাল দিচ্ছিল পেটি বুর্জোয়া ঘরের হার্লট বলে। গোড়ায় মদের নেশার ঘোরে এবং রসাধিক্যে বলে ফেলেছিল কতকগুলি লোভাতুর কুৎসিত কথা। যার মধ্যে খানকি শব্দটাও ব্যবহার করে ফেলেছিল। আনন্দ সহ্য করতে পারেনি। প্রথমে মেরেছিল এক চড়। তাতেও থামেনি নীরদ—তখন মেরেছে ঘুঁষি।

এরপরই পালা ভাঙল।

আনন্দই বললে—আমি আজই চলব যশোদা দা।

যশোদা-দাও অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—সবাই। আজই সন্ধ্যেতে, এক্সপ্রেসে না হয় প্যাসেঞ্জারে। জগন্নাথ মন্দির একবার যাবি নাকি ?

আনন্দ বলেছিল—না।

আজ ভোরে এসে নেমেছে।

হরিয়া চা নিয়ে এল। আনন্দ একটু পাঁউরুটির টুকরো গুঁড়ো করে বইগুলোর মাথায় ছড়িয়ে দিলে। তারপর খেতে বসল।

চড়ুইটা ফিরে এসে পাঁউরুটি গুঁড়ো পেয়ে খেয়ে লেজ নাচাতে লাগল। অথবা ঠুকরে খেতে গেলেই ওর লেজ নাচে।

রাত্রে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ঘুম হয়নি। তবুও জানালাটা খুলেই শুয়েছিল আনন্দ। পাখীটা তখনও ঘন ঘন আসছে যাচ্ছে—নীড় নির্মাণে ব্যস্ততার ব্যগ্রতার ওর সীমা নেই। সম্ভবতঃ ডিম পাড়ার সময় খুব কাছে এসেছে। দেওয়ালের ওই ছিদ্রটা দিয়ে কুটো ঘাস মুখে নিয়ে আসায় নিশ্চয় অনেক অসুবিধে।

কিন্তু গরম হাওয়ার জন্য নিজের অসুবিধে কম হয়নি। ঘুমটা ভেঙে গেল পৌনে তিনটেতেই। পাখীটাও বাসায় বুক পেড়ে শুয়ে ঘুম ভেঙে উঠছে। ডাকছে—মৃদু শান্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে—চিনিক, চিনিক। অনেকক্ষণ বাদে বাদে। কালো মুগদানার মতো চোখ দুটো কখনও খুলছে আবার বন্ধ করছে। নিদ্রাজড়িমা জড়িত নয়নে চাচ্ছেন শ্রীমতী।

ঘড়ির দিকে তাকালে আনন্দ—দুটো আটচল্লিশ।

আনন্দ পাখীটাকে বললে—কি ? কি বলছ ? তোমার কথা তো অনেক শুনলাম। তার কথা বল কিছু। তুমিই তো দূত ! সে আসছে ! ভালো আছে তো ? কাল এসেছিল ?

চিনিক চিনিক। তারপর ভাঁজা পা সোজা করে উঠে বার দুই গা-ঝাড়া দিয়ে সরব বা সহজ চিরিক-চি্রিক-চি্ক—ডাক দিয়ে সোজা টানে ফ্ররর্ শব্দ তুলে জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

আনন্দ উঠে জানালার কাছে দাঁড়াল।

রোদে ঝাঁজ হয়ে তাপ বেড়ে আজ নিশ্চয় একশোর উপরে। দেবদারুর কচি পাতাগুলো আমৃলে গেছে। এই ক'দিনের মধ্যে শিমুল জাতীয় গাছগুলোর অনেক ফুল ঝ'রে গেছে, দু-চারটে শুকনো দেখতে ডালের ডগায় কচি পাতা বেরিয়েছে। রাস্তায় কেউ নেই। গরম হাওয়া মুখে লাগছে। ক'দিন পুরীর পর এখানে রোদের উত্তাপ বিশ্রী রকম ঝলসানো মনে হচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকালো সে। দুটো পঞ্চাশ। সে ফিরে এসে আবার চেয়ারে শুলো। চোখ বুঁজলো।

নাঃ। শুয়ে থাকা যায় না। ক'দিনের ছুটির পর আজ কাজের তাড়া ছেলেবেলায় ইস্কুল-টাস্কের মতো তাগিদ নিয়ে এসেছে। উঠে সে রঙ তুলি কাগজ নিয়ে বসল—উইলিয়মসের

কাজ দিতেই হবে।

চ্রিরিক। চ্রিক। চিরিক। পাখীটা আসছে যাচ্ছে।

টং—টং—টং। চ্রিক। চ্রিক। চ্রিক। আনন্দ সকৌতুকে ঘড়িটার দিকে তাকাল। হেসে উঠল। চড়ুইটা হেরে গেছে। বাজনা শেষ হবার পর গিয়ে বসেছে ব্রাকেটে। ডাকছে—চ্রিক-চ্রিক-চ্রিক। তাকিয়ে আছে ঘড়িটার দিকে। আর বাজছে না। বেচারা! কয়েক মুহূর্ত ব্যর্থ অপেক্ষা করে সে উড়ে গেল—চ্রিরিক।

আবার একবার উঠল আনন্দ। নাঃ। ওই শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। নাঃ। এই তো তিনটে। সে ফিরে এসে বসল আবার। আঁকতে লাগল।

পাকস্থলীর ছবি আঁকছিল মাল্টিভিটামিনের জন্যে। সেটাকে সরিয়ে দিলে। নতুন কাগজ নিয়ে আঁকতে লাগল। মাদারস্ টনিক। একটি মেয়ের কোলে একটি ছেলে—স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। সাঁওতাল মেয়ে আঁকবে। কালো মেয়ে—মুখখানা ঠিক কি মনে পড়ছে? যা পড়ছে তাতে তো কালো কুরূপা বলে মনে হচ্ছে না। তাই আঁকবে সে; তুলির টান দিয়ে সে হঠাৎ গুনগুনিয়ে গান ধরে দিলে—'দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। কালো? তা সে যতই কালো হোক।'

হঠাৎ বাইরে সশব্দে কিছু পড়ল। চেয়ার একখানা? কে ফেললে? বারান্দার দিকের জানালাটা সে খুলে ফেললে। বাইরে এই ঝাঁজেই দেওয়াল ঘেঁষে হরিয়া ঘুমুচ্ছে। চেয়ারখানা উল্টে গেছে, আর তার পাশেই পা হাত দিয়ে চেপে ধরে নুয়ে পড়েছে কালো মেয়েটি! হাতের ছাতাটা পাশে পড়ে আছে। বেশ লেগেছে তাতে সন্দেহ নেই! জানালা খোলার শব্দ পেয়ে, মুখ তুলে আনন্দকে দেখে তার মুখ হয়ে গেছে ধরা পড়া চোরের মতো। তবু হাসতে চেষ্টা করছে।

আনন্দ ব্যস্ত হয়েই বললে—লেগেছে খুব? কোথায় লাগল?

সে অপরাধীর মতো বললে—পায়ে লেগে চেয়ারখানা উল্টে গেল।

আনন্দ বললে—হরিয়াটা একটা ইডিয়ট। এমন সামনে চেয়ারগুলো রাখবে। এই হরিয়া! এই!

হরিয়া উঠে বসল।—অঁ।

আনন্দ ঘুরে সামনের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বললে—কোথায় লেগেছে?

—হাঁটুতে চেয়ারখানার কোণাটায় লেগে গেল। দোষ আমারই। বলে সে চেয়ারখানাকে তুলতে গেল। আনন্দ কেড়ে নিয়ে নিজে তুলে বললে—এখনও কনকন করছে?

ম্লান হেসে মেয়েটি বললে—কমে গেছে। বলে সে হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেই একটি ছোট্ট উঃ শব্দ ক'রে আবার চেপে ধরলে পা-খানা!

আনন্দ বললে—ও লোহার চেয়ারের কোণ লেগেছে হাঁটুতে! দেখুন তো বিপদ! হাঁটু জায়গাটা ভারী খারাপ। ভাঁজ তো—ছোট ছোট হাড় থাকে। ভেঙে না গিয়ে থাকলে হয়। হরিয়া, তুই চট করে গিয়ে খানিকটা বরফ নিয়ে আয় তো। আপনি ভেতরে এসে বসুন।

—থাক, এইখানেই বসছি আমি।

—না না। এখানে বসবেন কি? এই তো সামনে বসবার ঘর। এখানে কি গরম দেখেছেন।

হেসে শ্যামলী বললে—এই গরমে আমাকে রোজ বেরুতে হয়, গরমে কষ্ট হয় না আমার।

—হয়। আপনারও হয়। সহ্য করেন। আজ আমার এখানে এসে হাঁটুতে লাগালেন, আর বাইরে বসবেন সে হয় না। তা ছাড়া এখানে বরফ ঘষবেন কি টিপবেন রাস্তায় লোক জমবে। চলুন ভেতরে চলুন।

আর আপত্তি করলে না। শ্যামলী আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে পা ফেলে এসে ঘরে ঢুকল। আনন্দ বললে—ধরব?

প্রায় যেন আর্তস্বরে শ্যামলী বলে উঠল—না—না—না। দোহাই আপনার। আনন্দ ধরল না বটে কিন্তু শ্যামলী ঘরে ঢুকবামাত্র ড্রইংরুমে বেতের সোফাসেটের একখানা চেয়ার ঠেলে এগিয়ে এনে সামনে ধরে বললে—বসুন। হাঁটুতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে আঘাতটি সামান্য হয়নি। বসুন।

শ্যামলী তা অনুভব করছিল। বিনা বাক্যেই সে চেয়ারখানায় বসতেই আনন্দ বললে—পা দুটো একটু তুলে আলগা করে রাখুন, আমি টেনে ভিতরে নিচ্ছি। এটা একেবারে দরজার সামনে।

শ্যামলী ধীরে ধীরে কেমন হয়ে যাচ্ছে। এমন সমাদর কেউ তাকে করে না। সে সামান্য ক্যানভাসার। সে একটি শ্রীহীন কালো মেয়ে। সে অর্ধশিক্ষিতা নিতান্ত সামান্য ঘরের মেয়ে। এত সমাদর তো কেউ করেনি। তরুণের দল পাড়ায় তাকে ব্যঙ্গ করে, অশ্লীল ইঙ্গিত করে, পাড়ার বাইরে ভদ্রবেশী তরুণ প্রৌঢ়রাও পিছন নেয়—ইঙ্গিত করে। তাতে সে অভ্যস্ত—এতে সে অভ্যস্ত নয়। বড় অস্বস্তিবোধ করছে সে। আবার কি যে ভালো লাগছে। ডান হাতে হাঁটুটা চেপে ধরে সে বসে রইল মাথা হেঁট করে। মাথা সে তুলতে পারছে না আনন্দর চোখে চোখ পড়বে বলে। মধ্যে মধ্যে তার কান্না পাচ্ছে।

আনন্দ একদৃষ্টে তাকিয়েছিল তার চুলের রাশির দিকে। একরাশি রুক্ষ কালো চুল। ফেঁপে ফুলে—তার অবনত দেহখানাকে ঢেকে রেখেছে। ভাল লাগছে। তার জীবনে এ এক নতুন স্বাদ। একটি মেয়েকে এমন কাছে পাওয়া নতুন নয়! কিন্তু এমনভাবে এই করুণা, এই স্নেহের সঙ্গে কাছে পাওয়া নতুন। তার মনের প্যালেটে কালো রং আর সাদা রং যেন মিশে নতুন রঙ হচ্ছে। আকাশের মতো নীল রঙ হয়ে উঠেছে। কখনও বেশি কালো পড়ে কালচে হচ্ছে। কখনও সাদা বেশি এসে তাকে চোখ জুড়ানো নীলাভ করে তুলছে। হঠাৎ একসময় সে তার মাথায় হাত দিল। চমকে উঠল শ্যামলী। আনন্দ বললে—যন্ত্রণা খুব বেশি হচ্ছে?

মাথাটা না-এর ভঙ্গিতে দুলে উঠল।

—তবে এমন করে রয়েছেন? মনে হচ্ছে যেন যন্ত্রণা হচ্ছে সেটা দেখাতে চাচ্ছেন না।

এবারে ম্লান হেসে মুখ তুললে শ্যামলী। মনোরম মিথ্যা এমন সুখের আনন্দের পরিবেশে

বোধ হয় মন জুড়িয়ে দেয়। যাতে সবটাকে আরও মধুর ক'রে তোলে। এক্ষেত্রে আনন্দের করুণাই শ্যামলীর কাছে সে মাধুরীর উৎস—মধু। সে বললে—ভাবছি আজ আর কাজে যেতে পারব না। হয়তো দু-তিন দিনই আটকে থাকতে হবে। যেখানে কাজ করি সেখানে তারা কি বলবে? ম্লান হাসিটুকু আরও একটু বিষণ্ণতায় যেন সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো মনে হল।

—পা-খানা ধরে একটু টেনে দেব? হয়তো কমে যাবে।

—না—না।

হরিয়া বরফ নিয়ে এল।—বরফ এনেছি।

আনন্দ বললে—ভেঙে নিয়ে আয়। আর তোয়ালে দে।

শ্যামলী হঠাৎ বলে উঠল—আপনার ঘরখানি এত সুন্দর করে সাজানো!

—ভাল লাগছে?

—খুব। এমন আমি দেখিনি।

—অথচ খুব সহজ! সস্তাও খুব। খরচ বেশি নয় মোটেই। রূপ উপকরণের প্রাচুর্যে নয়, তাকে পরিচ্ছন্নতায় সাজানো। এই যে আজ আপনি পাড়হীন সাদা কাপড়খানি পড়েছেন আর জরদা ব্লাউস—এতে যে আপনাকে সুন্দর লাগছে একখানা বেনারসী পরলেও তা লাগত না। আপনার নিজের তো সে রুচি রয়েছে।

শ্যামলীর মুখখানা কেমন দেখালো সে শ্যামলী জানে না, কিন্তু সারা অন্তর তার শরতের অজস্র সাদা ফুলে ভরা মালতী লতার মতো হয়ে উঠল। একটা মালতী লতার গাছ তাদের বাড়িতে আছে উঠোনের কোণের গাছটাকে জড়িয়ে।

আনন্দের কিন্তু ভারী ভাল লাগলো। মেয়েটির তো আশ্চর্য একটি লুকনো শ্রী আছে। কিছুটা পুষ্টি আর কিছুটা মার্জনা প্রসাধন হলে ও সত্যিই সুন্দর মেয়ে। চোখ দুটি সরু কিন্তু টানা। ভারী সুন্দর। কিন্তু হরিণ চোখ নয়। এ চোখ নারীর! হরিণেরও নয় পুরুষেরও নয়। খানিকটা লাল রঙ—দেহে রক্ত পুষ্ট—আর খানিকটা নীলাভ সাদা রঙ।

হরিয়া একটা গামলায় বরফ ভেঙে নিয়ে এল, তোয়ালেটা চেয়ারের হাতায় নামিয়ে দিলে। আনন্দ বললে—ঘরের দরজা বন্ধ করে দে হরিয়া। আমরা বাইরে যাচ্ছি। আপনি বরফটা ওখানে ঘষুন। কেমন? দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে।

আনন্দ নিজের শোবার এবং কাজ করবার ঘরে এসে জানালার ধারে দাঁড়ালো। মনটা খুশিতে ভরে আছে। বাইরে অপরাহ্ন নামছে। কাক শালিক পথে নেমেছে, আকাশে উড়ছে, ইলেকট্রিক তারে বসেছে। ডাকছে। চড়ুইগুলোর অজস্র কিচকিচিনিতে ভরে দিয়েছে আশ-পাশ। তিনি কই? তিনি! দুতী? নাঃ, সে ঘরে নেই। ঢং-ঢং করে চারটে বাজল। ঘরের মধ্যে পাখার শব্দ হল না, ঘড়ির কাঁচে ছোট ঠোঁটের ঠোক্কর উঠল না, ক্রিরিচ—ক্রিচ-ক্রিচ শব্দ করে কেউ ডাকল না। সে নেই। আরে আরে এই যে, তার কানের পাশ দিয়ে পাখার ফ্রর্‌র্‌ শব্দ হল। তার সঙ্গে ক্রিরিচ। তার পিছনে আর একটা। গলায় কালো

ত্রিভুজ। সেটা জানালার ধার পর্যন্ত এসে আনন্দকে দেখে গোঁত্তা খেয়ে ঘুরল। সামনের ইলেকট্রিক পোস্টের উপর বসে লেজ নাচিয়ে ডাকতে লাগল। ঘরের মধ্যে দুতী তখন আপন বাসায় গিয়ে বসে ডাকছে ক্রিচ-ক্রিচ—। ওর তাড়ায় পালিয়ে এসেছে। ওটা পুরুষ।

তার অন্তরে রঙটা কেটে দু ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে সে চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। কত এলোমেলো চিন্তা কল্পনা। সামনের রাস্তায় তখন লোক চলাচল শুরু হয়েছে। কিন্তু সে আনন্দের চোখে পড়ল না। ঘরের মধ্যে থেকে পাখীটা বেরিয়ে গেল, আবার এল, আবার গেল। সেদিকেও তার মন আকৃষ্ট হল না। খেলাটা অর্থহীন। না। অর্থ আছে একটা। এই তো জীবনের স্বরূপ! এর উপর এত নানারকম রং চড়ানোর কিছু মানে আছে? একবার মনে হয়, নেই। একবার মনে হয়, আছে। না—নেই। মানুষই চড়িয়েছে। মানুষই সেটা ধরে ফেলেছে। তার মনে সাদা কালোয় মিলে যে শূন্য আকাশের নীল অলীক রহস্যের সৃষ্টি করেছিল সেটা কেটে যাচ্ছে।

—হরি! হরি!—ওঘর থেকে মিষ্ট নারীকণ্ঠের সসঙ্কোচ ডাকে আনন্দর চিন্তা ভেঙে গেল। সে এসে ও-ঘরের ও এ-ঘরের মধ্যের দরজাটায় একটু শব্দ ক'রে বললে—ডাকছেন? ভিতরে যাব?

—হ্যাঁ! আমি এইবার যাব।

দরজাটা খুলে আনন্দ ঘরে ঢুকল। বললে—কমল ব্যথা?

দাঁড়িয়ে ছিল শ্যামলী। হেসে বললে—খুব কমে গেছে। দেখছেন না, উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি! দু পা ফেলে বললে—একটু খোঁড়াতে হচ্ছে কিন্তু চলতে পারব।

—চলতে পারবেন হয়তো, কিন্তু চলবেন না।

—আপনি আমাকে আপনি বলছেন আমার কিন্তু ভারী লজ্জা করছে। আপনি বড় সব দিক দিয়ে। আপনার মতো ভালো লোক আমি দেখিনি! পরের জন্যে—কে আমি কোথাকার নগণ্য মেয়ে—তাকে যে যত্ন করলেন—

—এই দেখুন! সেদিন আমার চোখে দুফোঁটা রক্ত দেখে যে উৎকণ্ঠা আর মমতার সঙ্গে কথা বলেছিলেন—এ তার থেকে বেশি নয়।

—কি বলছেন! কি করেছিলাম আমি?

—সুযোগ পেলে হয়তো করতেন।

—তা করতাম। এবং নিজেকে ধন্য মানতাম। আপনি একজন শিল্পী। কত বড় মানুষ!

—কত বড় মানুষ! সেও মেপে ফেলেছেন?

—ফেলিনি? ও মাপ কি লুকোয়? হাতের চড়ুই পাখীটা? একটা চড়ুইয়ের ওপর এত করুণা! আমি দেখিনি শুনিনি।

হেসে আনন্দ বললে—সে আমার ঘরেই বাসা বেঁধেছে। দেওয়াল-আলমারির পাল্লা নেই, বইয়ের থাকের উপর সে খড়কুটো এনে দিব্যি গেড়ে বসেছে।

—সত্যি?

—দেখবেন ?

—না। দেখবে বললে তবে দেখব।

—আচ্ছা এস, দেখ। সে হয়তো ঘরেই রয়েছে।

চড়ুইটা ঘরে ছিল না। আনন্দ দেখালে—ওই দেখ বইয়ের মাথায় খড়কুটোর গাদা।

—তাই তো!

চড়ুইটা কুটো মুখে এনে তাদের পাশ দিয়ে পাখার শব্দ করে উড়ে গিয়ে বসল। শ্যামলী বললে—ও মা! তারপর বললে—যে সুন্দর সাজানো ঘর, আর ঘরের মালিকের যে দয়া তাতে ও লোভ সামলাতে পারেনি।

যাবার সময় আনন্দ বললে—আজ থেকে আমরা কিন্তু বন্ধু!

—বন্ধু! আবার তেমনি শ্রী ফুটে উঠল তার মুখে। আপনি বন্ধু, আমার?

—বাধা কি? আপনার খারাপ লাগে?

—না।

—তবে?

মুখখানা এবার একটু নত হয়ে পড়ল। হাসলে। ম্লান হাসি। বললে—এখানকার লোকদের আপনি জানেন না। তারা—

—লোকের কথা সবখানে সমান। এখান সেখান নেই। কিন্তু তা নিয়ে আমাদের কি? ও গ্রাহ্য করলে জীবনে শুধু না পাওয়ার দুঃখই বোঝা হয়।

—তা বটে। তবে, বন্ধুত্ব হোক জমুক তারপর হবে।

—আচ্ছা,—একটু হাসলে আনন্দ, তারপর বললে—এবার আপনার নামটি বলুন।

—আমাকে আপনি নাই বললেন।

আনন্দও বললে এবার—বলব, বন্ধুত্ব হোক আগে। আপনার—একটা নাম আমার দেওয়া আছে। মাসদেড়েকের মধ্যে যেদিন বাড়িতে থেকেছি সেইদিনই আপনাকে ছাতায় মুখ ঢেকে যেতে দেখেছি। ছাতা দেখেও চিনতে পারি। চলার মধ্যেও একটা ছন্দ আছে। তার থেকেও আপনার চুলের শোভা দেখে মনে মনে তারিফ করি।

লজ্জায় আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল শ্যামলী। এমন সব কথা শোনবার ভাগ্য তার হবে এ তার কল্পনারও অতীত। সে যেন ভিতরে ভিতরে থর-থর করে কাঁপছে, স্পর্শাতুর লজ্জাবতী লতার মতো সব স্নায়ুগুলি নুয়ে পড়ছে। সে বললে—আমার নাম শ্যামলী।

আনন্দ বলতে গেল—আমি রেখেছিলাম সুকৃষ্ণা। কিন্তু বলতে গিয়েও বললে না। বললে—আমি রেখেছিলাম কাজল। ও নামটা আমার ভারী মিষ্টি লাগে।

শ্যামলী আর একটু হেসে কোন কথা না বলে চলে গেল। সত্যিই কাজল নামটি ভারী মিষ্টি।

আনন্দ দাঁড়িয়ে রইল। শ্যামলী একটু খুঁড়িয়ে চলছে। বেচারা কালো মেয়ে! আনন্দের সমস্ত অন্তরটা একটি আনন্দে ভরে উঠেছে। উল্লাস—পরিচ্ছন্ন উল্লাস। পুরীর ঘটনার পর ওর মন আজ অত্যন্ত সংযত।

সেই উল্লাসে সে এ ঘরে এল। চড়ুই দূতীকে বলবে—তোমার দৌত্যের অপমান করিনি সখী। চড়ুই নেই। বাইরে কোথায় নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ বাইরে বেড়াবার জন্যে সে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠল। আজ সে যথেষ্ট পরিমাণ পান করবে। টাকা আছে। পুরী যাওয়ার সময় চেক দিয়ে যশোদা দার কাছে টাকা নিয়েছিল। বারে যাবে।

কিন্তু হল না। বেরুবার আগেই ঝড় এল। প্রবল ঝড়। সে সেজে বেরুতে যাচ্ছিল। আকাশের অবস্থা দেখে দাঁড়াল। ঝড় তখন দূরে উঠেছে—হু-হু ক'রে আসছে। সে বসল বাইরে চেয়ারখানায়। পার্কের দেবদারু গাছের মাথাগুলো পুবমুখো হয়ে নুয়ে পড়ল। ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিদিক। হরিয়া ছুটল জানালা বন্ধ করতে। হঠাৎ আনন্দ উঠল এবং ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললে—দাঁড়া-দাঁড়া। সে ঘরের আলোটা জেলে দিয়ে তাকালে আলমারির দিকে। ওই যে। চড়ুইটা বুক পেড়ে নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে জুলজুল করে তাকাচ্ছে। আলোর ছটা পেয়ে সেটা এবার ডেকে উঠল—সেই মৃদু স্বরের মিষ্টি শব্দ—চিনিক্-চিনিক্।

আনন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বাইরে বসল। ঝড় দেখতে বসল। একটু পর বৃষ্টি এল। বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। হরিয়া বললে—বাইরে বেরুবে না?

—না। বৃষ্টির জলে ভিজে পিচের পথের উপর ওপারের রাস্তাটায় বাস কার্ চলেছে ঝাঁকে ঝাঁকে। সামনের হেড লাইটগুলি জ্বলছে—নিচে ভিজে পিচের উপর তার প্রতিবিম্বও চলছে—দুটো আলো চারটে হয়েছে। পার্কের মধ্যে জমা জলে ছটা পড়ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় সে চঞ্চল হয়ে উঠে ভাবলে—বেরুব। উৎসাহ সংগ্রহের জন্যে ব্রনমুখী ফিরিঙ্গী মেয়েটা কোন বার-টেবিলে বসে সিগারেট খাচ্ছে কল্পনা করতে চেষ্টা করলে। আবছা ঝাপসা ছবি উঠে উঠে মিলিয়ে গেল। শ্যামলীকে মনে পড়তে লাগল। কল্পনা করলে শ্যামলীর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে জেটীর ওপর রেস্তোরাঁয় বসে গল্প করছে। শ্যামলীর মুখে পুষ্টির রক্তাভা, মার্জনা, প্রসাধনের শুভ্রতা! তার পরনে কি রঙের কাপড়? ফিকে জরদা ব্লাউস—গাঢ় লাল কি ফিকে নীল। না! ফিকে নীলাভ্র শুভ্র পাড়হীন শাড়ি, ব্লাউস গাঢ় হলদে সোনার মত নয়তো জরদা রঙের। শ্যামলীর সিঁথিতে কি—? না, সুপ্রচুর ফাঁপানো রুক্ষ চুলের মাঝখানে সাদা টোয়াইন সুতোর মত সিঁথি—সেখানে কোন দাগ নেই। বন্ধু এবং বান্ধবী। পার্কের ওপাশের রাস্তাটার বাঁকে কয়েকখানা কার বা ট্যাক্সি উত্তরমুখে ঢুকে বাঁয়ে বেঁকে পশ্চিমমুখী হচ্ছে। দুটি করে আলো, ঝকঝকে উজ্জ্বল আলো। পরের পর। পরের পর। রাস্তার জল শুকিয়েছে। তবু পিচের উপর আভা পড়ছে লম্বা হয়ে। পার্কের ভিতরে ভিজে ঘাসে জমা আলোগুলো জেগে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় মনে হ'ল—না। এ ভালো লাগছে না।—ওরে হরিয়া। তুই যা একবার, রিক্সা ট্যাক্সি যা পাস নিয়ে যা। শ্যামলী কাজল থাক, সে আনন্দ। কিন্তু উল্লাস বার ভিন্ন হয় না। বৃষ্টিতে বারের আসর জমে ভাল।

দুই

সেদিনও বৃষ্টি হয়েছিল। চার মাস পর। বর্ষার বয়স। তবে কলকাতার রাস্তা জলে ডুবে দুর্গম দুস্তর পারাবার হয়ে ওঠে নি। আকাশে কিন্তু মেঘ এসেছে সেজেগুজে। নিকিত কালো মেঘ। আনন্দ ট্যাক্সি করেই ফিরল। রাত্রি তখন এগারটা বেজে গেছে। গাড়িটা পার্কের পূব মাথায় ঢুকে পশ্চিম দিকে ধনুকের ভিতর দিকের বাঁকের মতো রাস্তাটার মোড় নিচ্ছিল, আনন্দ বললে—নেহি সর্দারজী, ডাহিনাসে সিধা চলিয়ে।

আনন্দের কণ্ঠস্বর জড়িত। মদ খেয়েছে।

কিছুদূর উত্তরমুখে এসে বাঁয়ে পশ্চিমমুখী রাস্তা ধরে বাসায় উঠবে। মোড়টায় এসে সে বললে—রোখিয়ে তো।

—হিঁয়েই উতরেঙ্গে সাব?

নামতে গিয়ে আনন্দ অনুভব করলে পায়ে জোর কম হয়ে পড়েছে। মদ বেশি খেয়েছে। শুধু তাই নয়, মদ বেশ কিছুদিন পর খেয়েছে। কিছুদিন মদ সে খায় নি। অনেকদিন পর কতটায় ঠিক থাকতে পারবে তা ঠিক বুঝতে পারে নি। এবং মেজাজে সে ক্ষুব্ধ ছিল, নিষ্ফল ক্ষোভ। রাগ হয়েছিল নিজের উপর। শ্যামলা! শ্যামলী তাকে অপমান করেছে, তাকে ফেলে তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে, নিষ্ঠুর কথা বলেছে। অপমানের এবং ব্যর্থতার ক্ষোভে সে একটা বারে ব'সে মদ খেয়েছে।

এই কয়েক মাসের মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক গতিতে তারা অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছিল। সেই যেদিন শ্যামলীর পায়ে আঘাত লাগে তার পরদিন তার অনেক কাজ ছিল, বেরুনো উচিত ছিল বারোটার মধ্যে। বেরোয় নি। চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। কালো মেয়ে কাজল—সে নাম দিয়েছে—তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বীকার করেছে। না, বন্ধুত্বের চেয়েও কিছু বেশি তার তলায় ছিল। জোড় কলমের মতো। সনাতনই বল আর আদিমই বল একটি নারী এবং একটি পুরুষের মধ্যে চোখাচোখি হলে বিদ্যুতের গতিতে যে একটি অদৃশ্য শিহরণ বয়ে যায় পরস্পরের, অঙ্গের দিকে মনের দিকে চুম্বকের লোহা আকর্ষণের মত সেই আসল গাছের মাথাটা কেটে স্নেহ মমতা শ্রদ্ধা বন্ধুত্ব যে কোন একটার ডাল কেটে বাঁধা হয়। কোন ঝড়ে ওই জোড় ভেঙে জোড়া দেওয়া ডালটা যখন ভাঙে তখন আসল গাছটা ডাল মেলে গজায়। ও গাছটা অক্ষয়বটের মতো, দূর্বাঘাসের মতো। ওর মৃত্যু নেই। জীবনই ওর শেকড়। ওটা ছিল, অন্যে অস্বীকার করে করুক, আনন্দ অস্বীকার করে না। সে নতুন কালের নতুন মানুষ, সে পুরানো কালের সব সংস্কারকে কাটিয়েছে। সে ইস্কাপনকে ইস্কাপন বলে। তবে হ্যাঁ, সে মানুষ। মানুষ মানুষীকে যেকালে বলপ্রয়োগে অপহরণ করত সে কালকে অনেক পিছনে রেখে এসেছে। সে জয় করে তার মনকে আগে, মন দিতে এলে দেহ দিতে হয়। এখানে পাখী আর খাঁচা, ভ্রমরা আর সোনার কৌটো পৃথক নয়। খাঁচা খুললে কৌটো খুললেও ওরা উড়ে পালায় না। সেদিন তার করুণা সত্য, অকপট

রূপে সত্য, তাকে যে কলুষিত বলবে সে ভ্রান্ত, তাকে যত্ন করার মধ্যে তার শিক্ষা সত্য স্বভাবও সভ্য। একজন পুরুষ কেউ এমন ভাবে হাঁটুতে লাগালে এমনই যত্ন করত। তবে হ্যাঁ, সে মানুষী নারী বলেই তাকে করুণা ক'রে তাকে যত্ন করে অনেক বেশি খুশি—না শব্দটা খুশি নয়—পুলকিত হয়েছিল। আগ্রহ অবশ্যই অনেক বেশি দেখিয়েছিল। তাকে ভাল লেগেছিল, কালো মেয়েটির মধ্যে সে রূপ আবিষ্কার করেছিল শিল্পীর চোখে। এবং তার রুচি পছন্দে সে রূপ ভাল লেগেছিল। তার সঙ্গে কথা বলে আরও খুশি হয়েছিল। ওর কথার মধ্যে তার প্রতি গাঢ় প্রশংসার মুগ্ধতা, তার নম্রতা, সব থেকে বেশি তার সরল মিষ্টতা, না তারও থেকে বেশি কিছু যেন—হয়তো তার নাম অনুরাগ এবং নিজের বিনীত রূপগুণের দারিদ্র্যবোধ আনন্দর আরও ভাল লেগেছিল। স্পর্শকাতর লজ্জাবতীর মতো নমনীয় ভঙ্গিগুলি। এ কার না ভাল লাগে ? মেয়েটি সেদিন চলে গেল, বাড়ি ফিরে গেল ; তারপর সারা বিকেল সে তার ভাবনা ভেবেছিল। তার মনে রঙের স্পর্শ লেগেছিল। কাজ না থাকলে বা কোন কাজের আগে রঙ তুলি নিয়ে সে কাগজে দাগের পর দাগ টেনে চলে, এ রঙ ও রঙ সে রঙ। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের সময় কেউ যেমন আকাশে তুলির দাগের উপর তুলির দাগ টানে, রঙ বদলায়, তেমনি ভাবেই মনের আকাশে সে নানান রঙের দাগ টেনেছিল।

মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় করেছিল আপন কল্পনার মধ্যে।

যেন সে পথে যেতে যেতে দাঁড়িয়েছে তার জানালার সামনে—কি করছেন ? আজ বাইরে বেরুন নি ? শরীর ভাল আছে তো ? না, কাজ করছেন ? ছবি আঁকছেন ? কি ছবি আঁকছেন ? সে বলেছে—আপনি কাল পায়ে লাগিয়ে গেলেন তাই দাঁড়িয়ে আছি, পথের দিকে চেয়ে রয়েছি, দেখছি আপনি বেরুতে পারলেন কিনা।

—তাই নাকি ! না না। আমি ভাল আছি। এই তো কাজে বেরিয়েছি। একটু কন্‌কন্ করছে। কাল এখান থেকে গিয়ে আরও অনেকক্ষণ বরফ ঘষেছি। মা রেগে খুন। বললে—সেঁক দে। আমি শুনি নি। এখানে উপকার যা পেয়েছিলাম।

—দাঁড়ান না, তা হলে আমিও বের হই। একসঙ্গে যাই। আসুন না একটু বসুন, আমি তৈরি হয়ে নিই। চা-টাও খেয়ে নি। হরিয়া দরজা খুলে দে। আর চা কর।

হরিয়া দরজা খুলে দিল। সে একটু ইতস্তত করেই এল ভেতরে।

ঢুকে বললে—যে সুন্দর সাজানো ঘর আপনার। আপনিই মন টানে। আচ্ছা ছবিগুলি তো সব আপনার ?

—অধিকাংশই। দু-একখানা বন্ধুবান্ধবের আছে।

—এখানা ?

—ওখানা আমার।

—কি সুন্দর।

—দেখুন, সবগুলি—এঘর ওঘরে। বলুন সব থেকে কোনখানা ভাল। আমি মুখ হাত ধুয়ে পোশাক পরে নিই।

আনন্দ পোশাক বাছাই করে। বেছে বেছে সাদা সিল্কের হাফশার্ট আর গাঢ় নীলচে ডেক্রনের প্যাণ্ট নিয়ে বাথরুমে চলে গেল।

ঘরে চড়ুই পাখী বাসায় বসে আছে, এখনও তার দিনের বিশ্রামের জড়তা ভাঙে নি। মৃদুস্বরে থেমে থেমে ডাকছে—চিনিক! চিনিক! আনন্দ তখন এমনই মগ্ন যে কৌতুকবশে সে ডাকের কোন ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে নি। বাথরুম থেকে পোশাক পালটে ফিরে দেখলে কাজল, হাঁ সেদিন সে কাজলই বলেছিল মনে মনে; কাজল তখন তার শোবার ঘরে বর্ষার ছবির দিকে তাকিয়ে আছে, একদৃষ্টে দেখছে। আনন্দ এক সময় ষড়ঋতুর ছবি এঁকেছিল ছখানা। ছবিখানা সত্যই ভালো হয়েছে। কালো একটি মেয়ে মাথায় জলের ঘড়া নিয়ে আকাশ থেকে মাটিতে নামছে। তার রাশি রাশি সুদীর্ঘ চুল, মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গীও বটে। চোখ দুটি লম্বা টানা। সম্ভবতঃ কাজল ওর সঙ্গে নিজের মিল দেখতে পেয়েছে। মিল সত্যই নেই—অথচ একটা মিল আছে!

সে হেসে বললে—কি দেখছেন! আপনার সঙ্গে মিল আছে, না?

লজ্জাবতীর মতো নম্রতার আবেশ লাগল ওর সর্বাঙ্গে, বললে—আমার সঙ্গে? আমি এমনই সুন্দর? ছবিখানি কিন্তু সত্যিই সুন্দর।

—একখানা এঁকে আপনাকে দেব। শুধু দিন দুই ঘণ্টাখানেক করে আমার সামনে সিটিং দিতে হবে।

—কি করব নিয়ে?

—ঘর সাজাবেন।

—ঘর? সে ঘর আপনি দেখেন নি।

—ঘর যেমনই হোক। সাজালেই সেজে ওঠে। আচ্ছা আমি নিজে সাজিয়ে দিয়ে আসব।

—ওরে মা! আমার জননীকে আপনি জানেন না।

হরিয়া চা দিয়ে যায়। চা বিস্কুট। অনেক অনুরোধে একখানা বিস্কুট তুলে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে খায় কাজল, তারপর বেরিয়ে যায়।

এমনি কল্পনা সে করেছিল। মিলেও গিয়েছিল। এই কল্পনার পর প্রায় কয়েক দিনের মধ্যে বাস্তবে তাই ঘটে গিয়েছিল ঠিক ঠিক। অমিল শুধু তারিখের। ঠিক পরদিন, অর্থাৎ আঘাত লাগার পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও দীর্ঘাঙ্গী সুত্রধারিণীকে দেখতে পায় নি। সেদিন ওর ইচ্ছে হয়েছিল, খোঁজ নিতে, ওপাড়ার দিকে ঘুরেও এসেছিল কিন্তু কারুর কাছে ওর বাড়ি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে নি। সঙ্কোচ যা আনন্দের প্রকৃতিতে নেই, সেটা যে সেদিন কোথা থেকে এসেছিল তা সে বুঝতে পারে নি। সেদিন সন্ধ্যাতে বেরিয়েও বারে গিয়েও মদ খায় নি। যশোদা দা প্রশ্ন করেছিলেন—কি হ'ল রে? এ্যাঁ?

—কিছু না। শরীরটা ভাল নেই।

সে—মানে লেখক বন্ধু, যার সঙ্গে পুরীতে ঝগড়া হয়েছিল—নেশার মধ্যে ওর নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। লোকটাকে আদৌ পছন্দ করে না আনন্দ। সেই বন্ধুটি বলেছিল

—মন ?

উত্তর দেয় নি আনন্দ। যশোদা দা ওদের মিটমাট অবশ্য করিয়ে দিয়েছিলেন, মিটমাট করে সে কিছুক্ষণ পরই উঠে চলে এসেছিল। সেদিনও ট্যাক্সি ক'রে ফিরেছিল। এই মোড়েই গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভেবেছিল, কিসের সঙ্কোচ ? যাবে সে। কিন্তু পারে নি।

পরের দিন সে গিয়েছিল। ওর মা বিস্মিত হয়েছিল। আপনি কি করে চিনলেন শ্যামলীকে। বলেছিল—আমি ওদের আপিসের কতকগুলো সাবানের নমুনা দেখতে চেয়েছিলাম। ওরা আমার কাছে ওঁকে পাঠিয়েছিলেন। হঠাৎ চেয়ারের কোণে ধাক্কা লাগল হাঁটুতে। আমি ডাক্তার দেখাতে বলেছিলাম। পাড়াতে থাকি, আমার বাড়িতে লাগালেন—তাই খোঁজ করতে এসেছি।

শ্যামলী, না, কাজল তখন বাজার গিয়েছিল। দেখা হয় নি, ফিরে এসেছিল। বাজার যেতে ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু সেটা পারে নি। আবার কেমন সঙ্কোচ হয়েছিল। এত লোকের সামনে! বলে এসেছিল—বলবেন ওঁকে, আমি খোঁজ করে গেছি। সকালে নটাতেই সে বেরিয়েছিল। উইলিয়াম্‌সের সাহেব খুশি হয়েছিলেন তার কাজে। তার আগের রাত্রে বার থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে প্রায় সারারাত্রি কাজ করে কাজ প্রায় শেষ করেছিল। পেমেন্ট পেয়েছিল। ফিরেছিল বেলা একটায়। স্নান করে খেয়ে উঠে সে ঘুমোয় নি। জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল। অনুমান করেছিল আজ সকালে যখন বাজারে যেতে পেরেছে তখন নিশ্চয় কাজে বেরুবে।

রৌদ্র প্রখরতর হয়ে উঠেছে। পথ জনহীন, সামনের পার্কে একদল হিন্দুস্থানী আজ পিক্‌নিক করতে এসেছে। ওপারে বাস কার লরী চলছে। গাছের পাতাগুলি ম্লান কিন্তু ঝকমক করছে রৌদ্রের ছটায়। পাখীরা স্তব্ধ। তার ঘরের মধ্যে চড়ুইটা নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে রয়েছে। চোখ দুটি বন্ধ।

সে হঠাৎ তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল—কি গো ? বলতে পার—আসবে ?

পাখীটা চমকে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠেছিল।

—চমকে উঠলে যে ? সংবাদ দাও!

পাখীটা আরও চকিত হয়ে লম্বা চি-রিক শব্দ করে বেরিয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু আবার মিনিট দুই-তিনের মধ্যে ফিরে বাসায় বসেছিল। আনন্দ আর ওকে নিয়ে কৌতুক করে নি। থাক—নিরীহ ক্ষুদ্রের জীব। থাক।

এর কিছুক্ষণ পরেই দেখা গিয়েছিল ছোট লেডিজ ছাতা। আজ কিন্তু চলনটা ঠিক তেমন দ্রুত নয়। তারপর যা সে কল্পনা করেছিল তাই। না—যা ঘটেছিল তাই মনে পড়ছে, মনে হচ্ছে এমনি কল্পনাই করেছিল।

সেদিন একসঙ্গেই দুজনে বেরিয়েছিল। একসঙ্গে চলার শুরু। মনে পড়ছে চলার সময় দুজনেই চলে নি—আরও দুজন চলেছিল। অপরাহ্ণ বেলা, পশ্চিম মুখে চলেছিল তারা দুজনে—আর দুজন পিছনে আসছিল। কথা বলছিল কাজল, সে শুনছিল। ওই তার মায়ের

কথা থেকে শুরু ক'রে তার জীবনের সব কথা—বেদনার কথাই বেশি। তাই বলে সাধারণ মানুষ, সংসারে এত দুঃখ আমার, তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ো না, করুণার আবরণ দিয়ে ভালবাসা দাও। এইটেই সব নয়, কথার মধ্যে—অত্যন্ত সহজ সুস্থ মন কাজলের—অনেক দুঃখের কথার সঙ্গে সুখের কথাও বলেছিল দুটো একটা। ওদের ভাঙা বাড়ির ছাদে কটি টবের ফুলগাছের কথা, আর পাশের বাড়ির মালতীলতাটার কথা; যার শিকড় মালিকের বাড়িতে কিন্তু লতাটা এসে উঠেছে তাদের বাড়ির উঠানের গাছটায় এবং সব ফুলগুলিই ফোটায়, সব শোভা সব গন্ধ ঢালে তাদের বাড়িতে। বলেছিল পুরনো আমলের বাড়ি দুজনদেরই। উঠানের মাঝখানে পাঁচিল আর আমাদের বাড়িটাই পূর্বদিকে। ওরা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু লতাটা পূর্বদিকের গাছটার টান ছাড়তে পারে না।

পরের দিনই কিছু বেলফুল এনেছিল সে। ভিজে রুমালে খুব আলতো ক'রে বেঁধে কাপড়ের আঁচলে ঢেকে এনেছিল। বাড়ির দোরে দাঁড়িয়ে ডেকেছিল, হরি! হরি! সেদিনও আনন্দ বাড়িতে ছিল। কিন্তু ঘুমিয়ে ছিল। ঘুম ভাঙে নি। পার্কের দিকের জানালাটা বন্ধ ছিল। শ্যামলী ভেবেছিল আনন্দ বাড়ি নেই। কিন্তু ডাক শুনবামাত্র আনন্দর পাতলা হয়ে আসা ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হরিয়ার ঘুম ভাঙবার আগেই সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসবার ঘরের দরজা খুলে সামনের দরজাটা খুলে দিয়েছিল। আসুন।

মুহূর্তের মধ্যে চড়ুইটা পাখায় ফুরর্ শব্দ করে বেরিয়ে গিয়েছিল ওই দরজা দিয়েই। বেচারার বের হবার সময় হয়ে গেছে তবু জানালা খোলা পায় নি। এই ঘরের দরজা খোলার সঙ্গে আলোর ঝলকের ইসারা অনুসরণ ক'রে বেরিয়ে বাঁচল। কাজল বলেছিল—আপনার জন্যে আমার গাছের—ওমা সেই চড়ুইটা বুঝি? ঘরে বন্ধ ছিল?

হেসে দুঃসাহসী আনন্দ বলেছিল—আপনার সাড়া পেয়ে লজ্জায় ছুটে পালাল। বেচারা ধরা পড়ে গেছে। আরও বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বলে নি। বলা উচিত হবে না বলেই বলে নি। কাজল ঠিক ধরতে পারে নি ইঙ্গিতটুকু। সে নিজের অসমাপ্ত কথাটাই শেষ করেছিল। কাল আমার টবের গাছের কথা বলেছিলাম, খুব সুন্দর মতিয়া বেল। ভোরবেলা উঠে তুলে একটা বাটিতে জল একটু দিয়ে ভিজিয়ে পদ্মা চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। মা তো একটি ফুল তুলতে দেয় না। নিজে চান করে ফুলগুলি তুলে নেয়। সব পুজোতে বলি—বেশ, দেবতাকে দিলে বেশ করলে, এখন আশীর্বাদী হিসেবেও দাও। বিছানার মাথার—পুটে রেখে দি। তাও না। সন্ধ্যার সময় সব [illegible] উঠোনের এক জায়গায় একটা গর্ত মতো আছে তার মধ্যে ফেলে দেবে।

সত্যই মতিয়া বেলগুলি সুন্দর। যেমন বড় নিটোল গড়ন তেমনি রঙ তেমনি গন্ধ।

আনন্দের ইচ্ছে হয়েছিল বলে—তুমি তো মালা গাঁথার কল্পনা কর না—গাঁথো না, তাহলে মায়ের দেবতার দাবী মানতে না। গাঁথো না! কিন্তু বলে নি।

* * * *

হঠাৎ আনন্দর জীবনে যেন একটা নতুন খেলা শুরু হয়ে গেল। মেয়েটি আসে—কথা বলে, ফুল দিয়ে যায়। আনন্দ ওকে বলে—কই ছবি আঁকবার সিটিং কবে দেবেন?

মেয়েটি হাসে। বলে—খেপেছেন আপনি!

—কেন?

মেয়েটি বলে—জানি না। আমি পালালাম।

আনন্দ ওর সঙ্গ নেয়। শ্যামবাজার পর্যন্ত এক বাসে যায়, তারপর ফিরে আসে!

বেশ লাগে—খেলার মত—।

হ্যাঁ খেলাই। এ খেলা তার ভাল লেগেছিল। ভালো লেগেছিল বলেই সে সন্ধ্যায় আর বারে যাচ্ছে না। ব্রনমুখী ফিরিঙ্গিনীকে উইলিয়ামস কোম্পানির আপিসে যাবার পথে অনেক দিন দেখেছে, তার দিকে তাকিয়ে দেখেছেও, কিন্তু সে তাকে টানতে পারে নি। তার রূপ আনন্দের চোখে ঠেকে না তা নয়; নিশ্চয় ঠেকে, ভাল লাগে। একসময় তার মনের কল্পনা ছিল সে যদি জীবনে বান্ধবী পাতায় তবে এই ফিরিঙ্গী মেয়েকেই বান্ধবী করবে। ওদের মধ্যে দুটো রূপ আছে—পূর্ব পশ্চিম দুই। ওরা জীবনের খেলাকে খেলা ব'লে নিতেও জানে। সে খেলোয়াড়ী মন ওদের আছে। কিন্তু তার মধ্যেও ওদের পাওনার হিসেবটা বড়। এবং খেলাটাকে এমন হিসেবের ব্যাপার করে তোলে যে মন তৃপ্তি পায় না। এই কালো মেয়েকেও সে দিয়েছে অনেক। এই ক'মাসে অনেক জিনিস দিয়েছে। তা সে খুশি হয়ে নিয়েছে। কিন্তু টাকা সেও দেয় নি, এও চায় নি। কিন্তু খেলাও তো দুজনে হয় না। দুজনে খেলতে গেলেই চারজন হয়। দিনের বেলা তো হয়ই। রোদ পূর্বদিকে থাকলে অন্য দুজন পশ্চিমদিকে, পশ্চিমদিকে থাকলে পূর্বদিকে, দুপুরবেলা হলে পায়ের তলায় চারজন তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খেলে যায়।

মন দিয়ে দেখলে সে বড় মজার খেলা। বসে আছ দু'জনে—বেশ ব্যবধান রেখে, অথচ অন্তরে ইচ্ছে হচ্ছে আরও কাছাকাছি বসি—তখন হয়তো দেখবে ছায়া দুটো প্রায় গায়ে গায়ে মিশে গেছে। তোমার হাত এদিকে—ওর হাতও এদিকে বেশ কিছুটা দূরে—সূর্য আকাশে তেরচাভাবে আলো ফেলে হাতের উপর হাতখানি রাখিয়ে দিয়েছে—কিম্বা জড়িয়ে দিয়েছে। সে নিজে শিল্পী এবং তার মন অত্যন্ত সচেতন বলেই এ ছায়ার খেলা তার চোখে পড়েছে। শুধু তাই নয় তার মনেও ঠিক সে এইভাবে কায়া আর ছায়ার খেলা খেলে যাচ্ছিল। যুবক সে—এ যুগের যুবক—তার যৌবন অর্থ দিয়ে যৌবন ভোগের ব্যাপারে দোষ দেখে না। —সেকালেও যারা দোষ দেখত—নানা বিধি নিষেধ মুখে মানত, তারাই কাজে তাকে লঙ্ঘন করে—গোপনে আড়ালে বীভৎস ব্যভিচার করত এবং পরের দিন ভাল ভাল কথা বলত এমন কি গঙ্গাস্নান করত। তা সে নয়; তার সব প্রকাশ্য, সে ধার কিছুই ধারে না—শুধু আইনগত বাধা এড়িয়ে চলে; এই বিকিকিনির খেলা সে বেশ কিছুদিনই খেলেছে; তার জন্য গ্লানিবোধ সে করে না, নিজেকে কারুর চেয়ে খাটোও মনে করে না। কিন্তু একটা নতুন তৃষ্ণা যেন জেগেছে—এই কালো লম্বা মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়ে। টাকা দিয়ে দেহ কেনা নয়—মন কেনা। না মন কেনা নয়, মন জেতা। ভারী মিষ্টি লাগছে খেলাটা।

একটা মমতা! হ্যাঁ একটা মমতা। না—মমতাও নয়। প্রথম প্রথম উদ্দেশ্যটার মধ্যে কুটিল এবং জটিল কিছু না থাক—খুব সোজা সহজও ছিল না। একটা খেলার ইচ্ছা ছিল।

কাঙাল মেয়ের কাঙালীপনা এবং মেয়ের মধ্যে চিরন্তন কালের যে সত্য নারী—পুরুষ সাহচর্যে উত্তপ্ত হয়ে বিগলিত হয়—তার সন্ধান করবার জন্য কৌতূহল জেগেছিল। ভেবেছিল—তাকে আবিষ্কার করেই বলবে—ওগো মেয়ে তোমাকে আমি খুঁজি—মানে পুরুষ বরাবর খোঁজে—কিন্তু এই দেউলে কালো রূপের আবরণের মধ্যে তোমাকে পেতে আমার আর ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু কয়েকদিন একসঙ্গে শ্যামবাজার পর্যন্ত যাওয়ার ফলে—মনের মধ্যে আরও কিছু যেন জাগল। ভাল লাগল—মেয়েটির সারল্য। সোজা মন সহজ মন। মনটি অনুদ্ধত বিনীত বটে কিন্তু ঠিক যেন কাঙাল নয়। ভালো লাগার স্বরূপটা বেশ চিরে চিরে কেটে কেটে দেখলে আনন্দ। মনে হল একটা করুণা নামক বস্তু কেমন করে বর্ষার জলে-ভেজা শুকনো ডাণ্ডা দূর্বাঘাসের মত মাথা তুলে একটু সবুজ আভা ফুটিয়েছে। মনকে সে সাবধান করেছিল। উঁহু—এ ভাল নয়। সে সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছে। এমন কি পুরীর কাণ্ডটার জন্য সে লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল—অন্যায়টা তো তারই। বন্ধুই তো ঠিক ধরেছিল। রসিকতা স্বভাবটাই সোজা জিনিসকে বাঁকা করা, সুঁচালো কথা। সুঁচালো বাঁকা কিছু বিঁধলে টানলেই বেরিয়ে আসে না—খানিকটা ছাড়িয়ে নিয়ে তবে ছাড়ে। এবং এর রসটা মিষ্টি নয়, নোন্তা। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটেতে জ্বালা ধরায়। ওখানে পটুতার সঙ্গে—মুখ বেঁকিয়ে বাঁকা কাঁটাকে বের করে দিতে হয়। রাগ করে ও সোজা টান মেরে গেঁথে গিয়েছিল। মনে মনে সতর্ক হবার সংকল্প ক'রে পরের দিন আগেভাগেই বেরিয়ে পড়েছিল। রাত্রে ফিরেছিল একটার পর। বেশ প্রমত্ত অবস্থায়। বার থেকে বেরিয়ে—ট্যাক্সি ক'রে ঘুরেছিল। পার্ক স্ট্রীট—ফ্রি-ইস্কুল স্ট্রীট ঘুরে অনেক বাঙালিনী এবং ফিরিঙ্গিনীর দেখা পেয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে ব্রণমুখীকে খুঁজে পায় নি।

সকালে ঘুমিয়েছিল আটটা পযন্ত।

স্নান করে মাথাটা সুস্থ ক'রে কাজে মন দিয়েছিল। একবারও জানালার দিকে তাকায় নি। চড়ুই পাখীটার আসা যাওয়ার বিরাম ছিল না। ওঃ, কুটো মুখে করে আসা যাওয়ার বিরাম নেই! একসময় তার রাগ হল। সে কাজ করছিল—ঘরের মাঝখানে বসে, জানালা-টাকে টেবিলের সামনে রেখেছিল বটে কিন্তু নিজে বসেছিল অনেকটা পিছন হয়ে। একসময় পাখীটার মুখ থেকে একটুকরো ঘাস খসে স্কেচের উপর পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে পাখীটাকে খেদিয়ে দিয়ে—বইয়ের তাকের উপর থেকে কুটো দিয়ে আধ-গড়া বাসাটাকেই ভেঙে দিয়ে এসে কাজ করতে বসেছিল। নিবিষ্ট মনে কাজ করছিল, মনটা অনেকটা একাগ্র হয়েছিল; পাখীটা আবার এসে বাসাটার অবস্থা দেখে সে যে এক কি ধরণের ডাক ডাকতে শুরু করেছিল—সে যে না শুনেছে তাকে বোঝানো যাবে না। ঘরময় বার দুয়েক সেই ডেকে ডেকে উড়ে গিয়ে জানালার মাঝের পাটাটার উপর বসে—কয়েকবার ডাক উড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর আসে নি। কিছুক্ষণ পর কেমন একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা হয়েছিল আনন্দেরই। ওই একটা ক্ষুদ্র জীব—বেচারা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে এখানে তার আশ্বাসে এবং প্রশ্রয়ে বাসাটুকু করেছিল। তার উপর এই ক্রোধ—ছি-ছি-ছি। সে উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়েছিল।

কই—চড়ুইটা কই? অসংখ্য চড়ুই উড়ে বেড়াচ্ছে—পার্কের গাছে, তার জানালার সামনের দেবদারু গাছটায়। ইলেকট্রিকের তারেও কয়েকটা বসে রয়েছে। কাক শালিক উড়ছে। এ ওকে তাড়া করছে। গাছগুলোর ডালপালা পাতা বাতাসে দুলছে। অনেক উপরের আকাশে চিল উড়ছে অনেকগুলো। তার মধ্যে শকুনিও রয়েছে। নামছে ওই কোণটায়। সম্ভবতঃ কিছু মরেছে। ও দিকটায় পাতিপুকুরের পড়ো জমিগুলো। সেই গন্ধওয়ালা খালটার ধার বোধ হয়! ওইখানটায় হবে।

হঠাৎ ঘণ্টা অর্থাৎ পেটা ঘড়ি বেজে উঠল। জলের কলে ঘড়ি পিটে ঘণ্টা ঘোষণা করছে। এক দুই, তিন চার, দেশ জোড়া মিলিয়ে ঘণ্টা বাজায়। জোড়া মিলিয়েই ঘণ্টা শেষ হল। তা হলে দশটা! আটটায় তো সে উঠেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে সে। হ্যাঁ দশটা। ঘড়িটাও থামতে শুরু করেছে। কয়েক মিনিট স্লো হয়েছে তা হলে। কিম্বা জলের কলেই দু মিনিট আগে বাজিয়েছে। কলে আর মানুষে অনেক তফাৎ। মানুষ অধীর হয়, কল তা হয় না। তবে তেল না পেলে—বেগড়ায় বটে। কিন্তু তার ঘড়ি বেগড়ায় নি!

হঠাৎ সে মনে মনে চমকে উঠল।

জানালাটা বন্ধ করতে হবে! লেডিজ ছাতা দেখা যাবে এক্ষুনি। জানালাটা বন্ধ করে দিলে আনন্দ। খোলা দেখলেই লেডিজ ছাতা থমকে দাঁড়াবে। কিম্বা এসে বারান্দায় উঠবে। সে সাহস তার হয়েছে! হরিয়াকে ডাকবে।—বাবু রয়েছেন? কি করছেন? ছবি আঁকছেন বুঝি? হয়তো বলবে—একবার খবর দাও না। কি আঁকছেন দেখি! কিম্বা বলবে—ফুল এনেছিলাম—দেব!

সে হতে সে দেবে না! জীবনে বিকিকিনিটাই আসল। নগদ বিকিকিনি। বিকিকিনি সবই। তবে ধার আর নগদ। ধারে দেওয়া-নেওয়ায় বাঁধন পড়ে। একালে—'আজ নগদ কাল ধার' এ বোর্ডটা দোকানেও বাতিল হয়ে গেছে।

আনন্দ ডাকলে—হরিয়া!

—যাই।

এসে দাঁড়াল হরিয়া। নীরবে। ওটা ওর স্বভাব।

আনন্দ বললে—শোন—ওই—এ যদি আসে না—

—কে?

—ওই যে সেই মেয়েটি রে!

হরিয়া বললে—বাজারে দেখা হ'ল যে। শুধাচ্ছিল।

—কি শুধাচ্ছিল?

—বাবু কেমন আছেন? কাল দেখলাম না! কাজে গিছলেন বুঝি?

—কি বললি?

—বললাম—হ্যাঁ!

একটু চুপ ক'রে থেকে আনন্দ জিজ্ঞাসা করলে—আর কিছু জিজ্ঞাসা করে নি?

বলছিল—কখন ফিরল বাবু ? রাতে যখুন ফিরলাম—তখনও তো জানালা বন্ধ ছিল !

—হুঁ। বললি তো অনেক রাতে ?

—হুঁ বললাম।

—বেশ করেছিস। এখন যদি আসে-যায় সে এই সময়—বলবি—আমি বেরিয়ে গিয়েছি। বুঝলি !

—হুঁ।

চলে গেল হরিয়া। আনন্দ জানালা-বন্ধ ঘরের অন্ধকারে ঘুমের রেশ অনুভব করলে। কাল অনেক রাত্রি জেগেছে। অন্ধকার হলেই ঘুমের আমেজ আসছে। সে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললে—টেবিল ফ্যানটা মাথার গোড়ায় দে !

হরিয়া বললে—একটা টাঙানো পাখা কেন। দিব্যি ঘুরবে।

—না। ওকে মশারি খাটিয়ে হাওয়া মেলে না।

ঘুমিয়ে পড়ল সে।

হরিয়া তাকে ডেকে তুললে খাবার সময়। টেবিলে চায়ের প্লেটে খাওয়া বেল রয়েছে। একটু হাসলে সে ! তারপর মনে হল—লুকোচুরি খেলছেই বা কেন সে ? সোজা কেনা-বেচার কথা—বললেই তো পারে।

তাই বলবে সে ! খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গেল সে। সন্ধ্যেতে সকালেই ফিরলে ; একটা কোয়াটার পাইট কিনে নিয়েই ফিরেছিল। খেয়ে সে সামনের বারান্দায় টেবিল ফ্যানটা খুলে একটা নীলবাল্বের স্ট্যাণ্ডিং ল্যাম্প জেলে বসে রইল। কিন্তু মেয়েটিকে তো ফিরতে দেখলে না সে। দেহেমনে সে বেশ প্রফুল্ল ছিল। ঘুমিয়ে শরীর সুস্থ হয়েছে। সারা দিনে কাজ করেছে অনেক। তারপর সন্ধ্যের সময় থেকে বসে আছে তার প্রতীক্ষায়। কিন্তু সে কই ?

হঠাৎ একসময় উঠে নির্জন রাস্তাটায় পায়চারি করতে করতে কখন যে ওদের বাড়ীর ধার পর্যন্ত গিয়ে পড়ল—তা তার খেয়াল ছিল না। খেয়াল হতেই থমকে দাঁড়াল।

যাবে নাকি ওদের বাড়ী ? গিয়ে ডাকবে—শ্যামলী দেবী আছেন ? কাজল বলে ডাকা চলবে না। না। মুখে মদের গন্ধ উঠছে। পাড়ার ছোঁড়ারাও ভাল নয়। ওর মাও অত্যন্ত খট্‌খোগা ! ফিরে এল সে।

এসেই মনে হ'ল—আবার বেরোবে কি বাইরে যাবে। এ যেন কেমন সব ফাঁকা শূন্য হয়ে গেছে। জীবনটার রঙ হারিয়ে যাচ্ছে। সে ডাকলে—হরিয়া !

—যাই !

—আমি বেরুচ্ছি। বলে সে ঘরে ঢুকে স্যুট পরলে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিল সে নিজেকে। হঠাৎ আয়নার ভিতর দেখলে পিছনের দেওয়ালের আলমারিতে বইয়ের থাকের উপর চড়ুইটা বসে আছে। নিশ্চিন্ত হয়ে বুকটা পেড়ে চোখ বুজে ঘুমুচ্ছে।

ভাল লাগল তার। যাক কৃষ্ণের জীবটি ফিরেছে। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি তার নাই কিন্তু জীবটির প্রতি করুণা আছে। হাসলে একটু।

হেঁটেই বেরিয়ে গেল। বাস ধ'রে শ্যামবাজার যাবে। সেখান থেকে ট্যাক্সি নেবে। শ্যামবাজারে এসে ট্যাক্সিতে চড়ে কিছুদূর গিয়েই বললে—ঘুরিয়ে নাও ট্যাক্সি। জরুরী কাজ ভুলে এসেছি। চল!

ঘণ্টাখানেক না যেতেই ফিরল সে :—শরীরটা যেন অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ঘরে এসে হরিয়াকে বলল—খেতে দে!

পরের দিন সে দশটা না বাজতেই বাইরের বারান্দায় বসে ছবি আঁকতে শুরু করলে। ঢং ঢং করে ঘরের ঘড়িতে দশটা বাজছে, আজ কলের ঘড়িতে এখনও বাজে নি। চড়ুই পাখীটা চি্‌ক-চি্‌ক শব্দ করছে। এরপর ঘড়ির কাচে ঠোকরাবে। বলবে, বোধ হয় থামলে কেন? আনন্দের দৃষ্টি কিন্তু সামনের দিকে। অর্থাৎ পূর্বদিকে।—ওই—ওই—লেডিজ ছাতা!

সে বসেই রইল। বুকের স্পন্দন খানিকটা বেড়ে গেল। একবার মন বললে—এ করছ কি? মনই উত্তর দিলে—কেন? যা কাল থেকে ভেবে রেখেছি তাই করব। সোজাসুজি বলব। দেখ আমি এ যুগের অতি আধুনিক। তুমি যদি অতি আধুনিকা হতে পার—তবেই আলাপের জেরটা চলুক। নইলে বল, এখানেই শেষ হোক পালা।

মনের সঙ্গে মনের কথা শেষ হতে-না-হতে ছাতা কাছে এল। ছাতাটা মধ্যে মধ্যে পিছনে হেলছে। মানে সে তাকে দেখছে। ওর নিজের মনের কথা ওইখানেই খেই হারিয়ে শেষ হয়ে গেল। চাঞ্চল্যের মধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, যেন কথা বলবার জন্যেই উঠে দাঁড়াল।

সেও থামল। এবং হাসল। কাজলের দাঁতগুলি বড় সুগঠিত। ঝিকমিক করে ওঠে। কালো মেঘের বুকে হাল্কা বিদ্যুতের মত হাসিটা দাঁতের সারির সাদা ঝিলিক হেনে ফুটে ওঠে। সে-ই আগে বললে—খুব কাজ করছেন বুঝি?

মিথ্যে বলতে বিব্রত হ'ল আনন্দ। মিথ্যে সে বলে না। তবে বলতে কোন প্রেজুডিস তার নেই। কিন্তু অনভ্যাসে থতমত খেতে হয়। বললে—হ্যাঁ। কাজ করছিলাম। তবে খুব না।

—রাতে বুঝি খুব বেড়ান?

সে তাকালে তার মুখের দিকে। অত্যন্ত সহজ মুখ সরল দৃষ্টি।—আনন্দ বললে—হ্যাঁ, পরশু একটার পর ফিরেছি। হোটেলে গিয়েছিলাম।

কাজল এতেও হাসলে। বললে—হোটেল খুব ভাল লাগে বুঝি? আর্টিস্ট লোক তো। বিস্মিত হল আনন্দ। এ তো বিচিত্র মেয়ে। যে কথাটা বললে তাতে হোটেল যাওয়া সম্পর্কে তার তো কোন গা-ঘিন-ঘিন করা মনোভাবের পরিচয় নেই। এ দেশের অর্ধশিক্ষিতা মেয়ে···! তবে কি সে ওই মেয়েদের দলে গিয়ে পড়েছে যারা কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রুটির টানে পেটের দায়ে, লোভের আকর্ষণে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যের পর গিয়ে পৌঁছয় এসপ্লানেডে?

—রাগ করলেন?

—কেন ?

—কথাটা বললাম বলে ?

—না! হাসলে আনন্দ। তারপর হঠাৎ ঝপ ক'রে জিজ্ঞাসা করে বসল—

—হোটেল দেখেছেন ? গেছেন কখনও ?

—ওই সব জায়গায় এত আলো এত জাঁকজমক, যেখানে চায়ের কাপ আট আনা সেখানে আমি কোথায় যাব ? তবে অবাক হয়ে বাইরে থেকে দেখেছি !

—যাবেন ?

—না।

—কেন ? আমি নিয়ে যাব।

—না। একটু চুপ ক'রে থেকে মেয়েটি হঠাৎ বললে—দেখুন ক্যানভাসারি কার পেটের দায়ে। জীবনে না আছে অর্থ না আছে রূপ না আছে গুণ। কোন রকমে ক'রে খাই। ক্যানভাসারি করতে গিয়ে হোটেল যাওয়া লোকেদের দেখছি। তারা তো ভালো লোক নয় ! অন্তত আমার পক্ষে ! একটি বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

আনন্দর কথা হারিয়ে গেল। হোটেলে যাওয়ার কথা বলার জন্যে একটু লজ্জা হল তার। মেয়েটি বললে—আমি যাই। কটা বাজল ?

হাতঘড়ি দেখে আনন্দ বললে—সাড়ে দশটা।

—বড্ড দেরি হয়ে গেল। আমি যাই।

আনন্দ কিছু বলতে পারলে না ! কাজল চলে গেল। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে আনন্দ ঘরে ঢুকে যত তাড়াতাড়ি পারে পোশাক বদলে বেরিয়ে পড়তে চাইলে। সে যাবে, ওকে গিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে ধরবে। বলবে—আমাকে মাপ করুন।

আনন্দর ব্যস্ততায় চড়ুই পাখীটা চঞ্চল হয়ে ফর ফর করে ঘরময় পাক খেতে লাগল। আনন্দর নজরে পড়ল আবার সকাল থেকে কুটো কুড়িয়ে এনে বইয়ের থাকের মাথায় জড়ো করে বাসা বাঁধছে। একটু হাসলে। বুঝলে কাল সে বাসাটা ভেঙে দিয়েছিল বলেই আজ পাখীটা আনন্দের ব্যস্ত হয়ে ঘোরা-ফেরা দেখে ভয় পেয়েছে। সে হেসে বললে —ভয় নেই চড়ুই সখী। ভয় নেই। বাঁধো তুমি বাসা বাঁধো।

খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে স বাস স্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি এসে দেখলে—কাজল বাসে ব'সে আছে। বাস্ ছাড়ছে। হাত তুলে হাঁকলে—রোখো ভাই রোখো ! এই !

বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। সে বাস স্ট্যাণ্ডে এসে হাঁপাতে লাগল। ভাবছিল—কি করবে ? ফিরে যাবে ? পরের বাসে গিয়ে তো ওকে ধরতে পারবে না !

ওই বাসটা চলে যাচ্ছে। ওই দূরে—পরের স্টপে থেমেছে ! পরের বাসখানা হাঁকছে—শ্যামবাজার—শ্যামবাজার

ও—কি ? পরের স্টপে কালো নেমে পড়েছে। ওই তো—ওই তো ! ওই ফিরে আসছে। বোকা মেয়ে। ও এখানে আসতে আসতে এখানাও ছেড়ে চলে যাবে ! কিন্তু ও বুঝতে পেরেছে যে আনন্দ তার জন্যেই ছুটে এসেছে। ও নেমে পড়েছে।

একখানা রিক্সা ডেকে সে চড়ে বসল—চল্। যা নিবি দেব। পথে ওই ও দাঁড়িয়েছে, রিক্সায় আনন্দ আসছে—তা দেখেছে কাজল। পথে রিক্সা থামিয়ে আনন্দ বললে—উঠুন।

সে স্বচ্ছন্দে উঠে বসল। বললে—কই বললেন না তো যে আপনি বেরুবেন!

আনন্দ বললে—না। কিন্তু আপনি আসবার পরই আমার মনে হ'ল—আপনার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই চাওয়া উচিত।

বিস্মিত হয়ে সে বললে—কেন? আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন? কিছু তো হয় নি।

—হয়েছে। আপনাকে হোটেলে যেতে বলি নি? আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

কাজল চুপ ক'রে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললে—দেখুন পাড়ার খারাপ ছেলেরা থেকে পথে আপিসে দোকানে নানান জনেই নিত্যই এমন কথা ইসারায় বলে—স্পষ্টও বলে। শোনাটা সয়ে গেছে। তবে আপনার কথাটা তো সে ভাবে আমি নিই নি। হোটেল দেখাতে চেয়েছেন, তার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকি, ওখানকার খাবারের কত নামডাক—গরীব মেয়ে যাই নি—খাওয়াতে চেয়েছেন। এইভাবেই নিয়েছিলাম। সাধারণ মানুষ তো নন আপনি! সে আমি ওই ছোট ঘটনাটি থেকেই বুঝেছি। ওই চড়ুইটার প্রতি যে মমতা দেখেছি! একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে—নইলে এমন সাহস করে আপনার সঙ্গে মিশতে পারি? ভাবি কি জানেন—ভাবি—সামান্য একটা চড়ুইকে যে এমন ভালবাসে—সে আমার মত মেয়ে কাল মূর্খ হলেও—মানুষ ভেবে নিশ্চয় ভালবাসবে।

চড়ুই পাখীটার প্রতি আনন্দ মনে মনে কৃতজ্ঞ হল। পরক্ষণেই সত্যটা মনে পড়ল। বললে—যদি বলি—চড়ুই পাখীটা সেদিন আপনার জন্যেই বেঁচেছে!

—তার মানে?

—তার মানে, যেমন ওটা এসে ঝপ করে চোখের উপর পড়ে নখ দিয়ে চোখের কোণ বিঁধে ধরলে—অমনি ওকে নিষ্ঠুর আক্রোশেই ধরেছিলাম হাতের মুঠোতে চেপে। টিপে ওটাকে পিষে আছাড় মেরেই ফেলতাম কিন্তু সেই মুহূর্তেই আপনি বলে উঠলেন—আঃ—এ যে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে! কথাগুলো ঠিক মনে নেই কিন্তু এমন মিষ্টি মমতার সুর শুনে আপনার মুখের দিকে তাকালাম—দেখলাম সেখানেও কত মায়া কত উৎকণ্ঠা। আমি আর পাখীটাকে মারতে পারলাম না। দেখলাম আমার হাতের চাপেই মর-মর হয়েছে। তখন ওকে বাঁচাতে ইচ্ছে হল।

শ্যামলী চুপ করে রইল। একটু পর বললে—না-না। আপনার মনেই ওসব ছিল। আমি না ডাকলেও, না এসে পড়লেও—এই-ই করতেন! প্রথম আঘাতের ঝোঁকে আক্রোশ হয়, রাগ হয়। কিন্তু যার মায়ামমতা আছে, হৃদয় আছে তার সে সব পরমুহূর্তেই জেগে ওঠে। নইলে আমার মত সামান্য কালো একটা গরীব ক্যানভাসার মেয়ের স্নেহ ভালবাসার দাম আপনার কাছে কতটুকু?

—অনেকটুকু! আপনি জানেন না। বলে আনন্দ সামনের দিকে চেয়ে রইল। ওর বিচিত্র মন। মন মনের সঙ্গে কথা কয় এক-একজন মানুষের। আনন্দের মন—সেই মানুষের মন। মন বললে, সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছ। মনই ধমক দিলে—কথা বলো না থাম।

কোন মেয়ের সঙ্গে কথা ব'লে এমন আনন্দ তো হয় নি কোন দিন। এ কথা কাটাকাটির বাণ-যুদ্ধ নয়, তলোয়ার খেলা নয় ; এতে হার-জিতের খেলাই নেই। এ মেয়ে তা খেলে না বলেই—মনকে অভিভূত করে গভীরে কি যেন স্পর্শ করে ; সেটা হৃদয় হলে হৃদয়। হৃদয় স্পর্শ করা আর কথার মারপ্যাঁচে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়ানো আলাদা ব্যাপার।

রিক্সায় ওরা দুজনেই চুপ হয়ে বসেছিল। সাড়ে দশটা বেজে গেছে। বাস্, ট্রাক, মোটর, গরুর গাড়ী, ঠেলার ভিড়ে রাস্তা প্রায় জাম হয়ে গেছে! ওদের কিন্তু কেউ দেখছে না; একটি ছেলে একটি মেয়ে রিক্সায় চলেছে—এ একটা সাধারণ ব্যাপার!

হঠাৎ ওরা সচেতন হল। একটা মোষের গাড়ীর সঙ্গে একটা মোটরকারের ধাক্কা লেগেছে। বিশেষ কিছু নয়, জখম কেউ হয় নি, মোটরকারটাই মোষের গাড়ীর শিগের সঙ্গে দরজার ঘেঁষ লাগিয়ে জখম হয়েছে! শ্যামলী বলে উঠল—যাক—কারুর লাগে নি।

আনন্দ কথা বললে না।

শ্যামলী আবার বললে—নতুন মোটর, দরজাটা কি হল দেখুন! এঃ!

আনন্দ এবারও কথা বললে না।

শ্যামলী বললে—কি ভাবছেন বলুন না!

আনন্দ ফিরে তাকালে ওর দিকে! পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে রইল। শ্যামলী লজ্জা পেলে। আনন্দ বললে—আজ থেকে আমরা বন্ধু, কেমন?

—বন্ধু? আমি আপনার বন্ধু?

—হ্যাঁ আরও একদিন বোধ হয় বলেছি। আজ পাকা হয়ে গেল।

শ্যামলী হঠাৎ চোখ বুজল! একটা আবেগ ওকে বিচলিত করে তুলেছে! আনন্দ ওর হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললে—আজ থেকে আমরা আপনি নই। তুমি।

ঘাড় নাড়লে শ্যামলী—না। আনন্দ বললে—আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

এবার শ্যামলী বলল—না—আপনাকে আমি তুমি বলতে পারব না।

—পারবে! আজ না পার কাল পারবে।

—জানি না।

—আমি তোমাকে তুমি বলব।

শ্যামলী হাসলে—সে হাসি অত্যন্ত মিষ্টি—বললে—খুব ভালো লাগবে আমার।

আরও কতকটা দূর ওরা পরস্পরে ... হাত রেখে চুপচাপ চলল। তারপর আনন্দ বললে—তুমি আরও পড়—কাজল। তোমাকে কাজল বলব, কেমন?

সলজ্জ হেসে ঘাড় নেড়ে কাজল জানালে—হ্যাঁ, তাই বলো! তারপর বললে—পড়ব? কি করে পড়ব? পড়তে খরচ কোথায় পাব? খাবই বা কি?

—ব্যবস্থা আমি করব।

—না! টাকা নিতে আমি পারব না।

—আমি তোমাকে একটা ভাল চাকরি দেখে দেব!

—ভাল চাকরি?

—হ্যাঁ।

—সে খুব ভাল হবে। কাজলের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল! রিক্সা তখন শ্যামবাজারে এসে পড়েছে।

পরের দিন—কাজল আবার অনেকগুলি ফুল মতিয়া বেলা ওকে এনে দিল! নিজেই প্লেটে সাজিয়ে—আনন্দের কাজের টেবিলের পাশে একটি টি-পয়ের উপর রেখে দিলে! আনন্দ হাসলে! আনন্দের হাসি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবাধ্য মন মনে মনে বললে—মালা গেঁথে আনতে পারলে না?

ঘড়িতে দশটা বাজতে শুরু করল! চড়ুই পাখীটা এসে ব্রাকেটে বসে লেজ নাড়িয়ে চি রিক-চি রিক শব্দে ডাকতে লাগল!

কাজল বললে—আরে এটা তো বেশ!

আনন্দর আর কথাটা বলা হল না! সেও হেসে বলল—হ্যাঁ—ও বেশ!

*　　　*　　　*

ওই কথাটা মালার কথাটা বললে আনন্দ সেদিন! বন্ধুত্ব পাতানোর অনেক দিন পর। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে।

কাজল বললে ওর বাড়ীর ফুলের কথা।

আনন্দ বললে—মালার কথা। বললে—ফুল হল ঝ'রে গেল। আমার টেবিলে সাজিয়ে দিলে শোভা হয়েই রইল। মালা গাঁথতে তো পারলে না!

কাজল সলজ্জ ভাবে হেসে বলেছিল, বক্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—বেশ গাঁথব। পরবে তো?

—পরালে নিশ্চয় পারব। বান্ধবীর মালা পরব না! কিন্তু বরমাল্য করতে চেয়ো না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিল—বেশ তাই—তাতেই যদি খুশী হও তবে তাই হবে!

কালকের কথা। এর মধ্যে কিন্তু বেশ কিছুদিন চলে গেছে। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পার হয়ে গেল। চার-পাঁচ মাস চলে গেল। এর মধ্যে ঘটেছে অনেক কিছু ছোটখাটো, বড় একটা ঘটেছে। ক্যানভাসারি ছেড়ে দিয়ে কাজল, উইলিয়াম কোম্পানীর আপিসে কাজল রেকর্ড কীপারের চাকরি করছে। সেখানে রেকর্ডরুমে বসে থাকে—আর বই পড়ে। ডাক পড়লে ফাইল খুঁজে হাতে নিয়ে উঠে যায় হাসিমুখে। ঠোঁটে ওকে লিপস্টিক মাখতে হয়। চুল ওর সম্পদ। তার কায়দা ওর পুরাতন। ভাল শাড়ী জামা পরতে হয়। ইংরাজীটাও দুরস্ত হয়েছে।

কাজটা করে দিয়েছে আনন্দই।

উইলিয়ামস্ কোম্পানির সাহেব আনন্দের প্রকৃতির জন্যে এবং তার কাজের জন্যে তাকে ভালবাসে। সাহেবকে আনন্দ বলেছিল।—একটি মেয়েকে একটি কাজ দিতে পার সাহেব?

জু সাহেব দিলদরিয়া মেজাজের লোক। সে রসিকতা করেছিল। বলেছিল—তোমার তো কেউ নেই। কার জন্যে কাজ চাচ্ছ?

—ফ্রেণ্ডও কি থাকবে না সাহেব!

—গার্ল ফ্রেণ্ড ?

—যদি বলি হ্যাঁ !

—তাহলে দেব। নিশ্চয় দেব। কি কাজ করতে পারবে ?

—বড় কাজ পারবে না সাহেব। ম্যাট্রিক ফেল।

সাহেব তাকে রেকর্ড ডিপার্টমেণ্টে কাজ দিয়েছিল বুড়ো রেকর্ড-কীপারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসেবে। মাইনে সব নিয়ে একশো দশ টাকা।

শ্যামলী অবশ্য ইণ্টারভ্যুতে সাহেবকে খুশি করেছিল। সাহেব বলেছিল আনন্দকে—ভেরী সার্প, ইণ্টেলিজেণ্ট, তার থেকেও বেশি রয়—চার্মিং বিহেভিয়ার। শী ইজ এ গুড গার্ল। যা ভেবেছিলাম তা নয়। তুমি ওকে বিয়ে করবে ?

—না—না সাহেব। সে সব নয়।

শ্যামলী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে অনেক। তাতে তার ত্রুটি হয় নি। তার জন্যে কৃতজ্ঞতা সে কোনদিন চায় নি, কোন মূল্যও কামনা করে নি। শুধু ভাল লেগেছে তাই সে করেছে। তার বেশি কিছু নয়।

* * *

এর পর থেকে দুজনের বন্ধুত্ব বল বন্ধুত্ব—প্রীতি বল প্রীতি, প্রেম বলতে আনন্দের আপত্তি আছে। ফুলের মালা যাতে বরমালা না হয় সেদিকে ও সতত জাগ্রত। মেয়েটির উপকার করতে ওর ভাল লেগেছে। হয়তো করুণা। কিম্বা মমতা। তা ছাড়া ওকে যেন ও নতুন করে গড়ছে। একটি অর্ধসমাপ্ত মূর্তিকে ও যেন ঘষে মেজে রঙ দিয়ে পরিপূর্ণ করে তুলছে। খেলাই সে শুরু করেছিল—খেলা এখনও খেলাই আছে কিন্তু খেলার রকমটা পাল্টেছে। আনন্দই ওকে সাজতে শিখিয়েছে, রুচি শিখিয়েছে। কিছু কিছু পোশাকও উপহার দিয়েছে। কিন্তু শ্যামলীর নিজেরও গুণ আছে, সামান্য পোশাককে রুচির সঙ্গে প'রে দুইয়ে মিলে, অসামান্যা নিশ্চয় নয়, তবে বেশ সুশোভনা হতে পারে। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে যে ইংরেজীটুকু শ্যামলী—না—কাজল শিখেছিল—এবং যা ও ক্যানভাসারী ও টিউশনি করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিল—সেটুকুও আনন্দই আবার সাহায্য করে রপ্ত করে দিয়েছে। জানাজানিও হয়ে গেছে পাড়ায় এবং মায়ের কাছে। পাড়ার কথা ছেলেরা ওর সাজসজ্জার এমন সুচারু ভোল বদলের জন্যে এবং লিপস্টিকের জন্য বলে মেমসাহেব। তবে সাহেব কোম্পানীর চাকরি, এটা ওকে একটা ইজ্জত দিয়েছে।

আনন্দ মধ্যে মধ্যে ওদের বাড়ীও যায়। শ্যামলী না—কাজল—সকালে আপিস যাবার সময় নিত্যই যায় আনন্দের কাছে।

পাড়ায় জানে আনন্দ ওর উপরওয়ালা। সাহেব কোম্পানীর বাঁধা আর্টিস্ট আনন্দ এখন ওর সঙ্গে আর শ্যামবাজার যায় না। এখন ওর সঙ্গে দেখা হয় নিত্য বিকেলে। ওইটেই পাকা বন্দোবস্ত হয়েছে। ওদের দেখা হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান এসপ্ল্যানেডে ট্রামের দোতলা ঘরটার নীচে। ওখান থেকে কোনদিন সিনেমায় যায়, গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে। আনন্দ ওকে নিজের জীবনের কথা বলেছে। শ্যামলীও বলেছে। ওর জীবনের কথা আর কি ? শুধু দুঃখ

কষ্টের কথা। অপমানের কথা। আনন্দ একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল—ভালবাস নি কাউকে ?

সেদিন গঙ্গার ধারে বসেছিল ওরা। কাজল খিল খিল করে হেসে বলেছিল—আমি তো দুনিয়াসুদ্ধ লোককেই ভালবাসতে চাই। কিন্তু কালো মূর্খ মেয়েকে ভালবাসতে দেয় কে ? বন্ধুই জীবনের আমার একজন, প্রথম ও শেষ। সে তুমি! বান্ধবীও নেই। যাদের সঙ্গে হয়েছিল—তারা বিয়ে হয়ে কে কোথায় চলে গেছে। আমি পড়ে আছি একলা।

কাজলের ছবিও এঁকেছিল আনন্দ। কাজল তার সামনে বসে থেকেছে ছবি আঁকাবার জন্য। সে ছবি একজিবিশনে নাম করেছে, প্রাইজ পেয়েছে। সে বলে—আমি ধন্য হয়ে গেছি। কিন্তু তার জন্য আনন্দ তাকে টাকা দিতে চেয়েছিল সে নেয় নি। কিছুতেই নেয়নি।

বলেছিল—আমার রূপ নেই। ও রূপ যা ছবিতে তুমি দিয়েছ তা তোমার দেওয়া, তোমার সৃষ্টি। আমি ধন্য হয়েছি ছবি আঁকিয়ে। কিন্তু ওর জন্যে টাকা নিলে তোমার কাছে দাঁড়াতে পারব না। আমি কেনা হয়ে যাব।

—ছবিটা যে পাঁচশো টাকায় বিক্রী হয়েছে কাজল।

—তা হোক। তুমি বরং আমাকে একখানা শাড়ি কিনে দিয়ো।

শাড়ি সে নিয়েছে। কিন্তু সেও ছ'খানা এণ্ডির রুমাল তাকে উপহার দিয়েছে। সে তাকে ফুল দেয়, রুমাল দেয়, ছোটখাটো জিনিস নিতান্তই মূল্যের দিক থেকে নগণ্য—এ তাকে দেয়। মাটির পুতুল তার ভাল লাগলে তাও দিয়েছে।

কাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ওরা বেড়াচ্ছিল। একটু বেলা ছিল। আষাঢ় মাসের বেলা। বেলফুলের মালা, চাঁপাফুল, যুঁইয়ের গ'ড়ে বিক্রী হচ্ছিল। কাজল বলেছিল—আঃ, আজকাল যা আমার টবের গাছে ফুল দিচ্ছে কি বলব তোমাকে। এই বড় বড় এবং অজস্র ফুটছে।

সে খপ্ করে সুযোগটা ধরেছিল। না। ঠিক সুযোগ সে ধরে নি। সুযোগ সে নেয় না। হ্যাঁ—সঙ্কোচ একটা ছিল সেটা কাটিয়ে নিতে পেরেছিল। মানুষের জীবনে যেটা ন্যায্য পাওনা সেটা দাও বলবার একটা সময় আছে, সেই সময়টা এসেছিল অকস্মাৎ, শ্যামলীই যেন এনে দিয়েছিল সে সময়। সে বলেছিল বেলফুলের কথা—আজকাল যা আমার টবের গাছে ফুল দিচ্ছে কি বলব তোমাকে। এই বড় বড় এবং অজস্র।

সে বলে উঠেছিল—মা সেগুলি গর্তে ফেলে পচাচ্ছে তো!

—হ্যাঁ। আমি আর কি করব ? আগে তোমার ওখানে দিয়ে আসতাম। এখন বরাবর চলে আসি।

—মালা গাঁথলেই পার।

—কি হবে ?

—পরবে।

—মা ঝাড়ু মারবে।

—তা হলে পরাতে পার।

—পরবে ? তুমি ?

—বান্ধবী দিলে বন্ধু অবশ্য পরবে। বন্ধুত্বের মালা বন্ধনের নয়। পার পরাতে?

বক্র কটাক্ষ হেনে কাজল বলেছিল—পারি না? নিশ্চয় পারি! পরবে? আনব কাল!

—এনো। কালকের সন্ধ্যাটি হয়ে থাকবে স্মরণীয় চিরদিনের মতো। কথা রইল?

—কথা রইল।

—দেখব।

ওরা বাড়ী ফিরল একসঙ্গে কিন্তু নীরবে। কাজল দু'চারটে কথা যাও বললে—আনন্দ তার উত্তর দিলে না।

পাড়ায় এসে আনন্দের বাড়ীর সামনে দুজনে থমকে দাঁড়াল। আনন্দ বললে—কাল!

হেসে কাজল বললে—হাঁ কাল! কিন্তু তোমার কি হল বল তো? সারা পথ চুপ করে এলে।

আনন্দ বললে—কি হবে? ভাবছি কাল আমার বান্ধবীকে আমি কি দেব?

—তোমার দেওয়ার সীমা আছে?

—ওসব কথা কাল হবে।

—বেশ—বেশ। কাল। কাল! কাল! কাল।

—হ্যাঁ কাল আমাদের চিরকাল স্মরণীয় থাকবে।

—আচ্ছা!

আনন্দ এসে ঘরে ঢুকল। কান তার ঝাঁ-ঝাঁ করছে। বুকের ভিতরটা স্পন্দিত হচ্ছে।

ঘরে পায়চারি করতে করতে সে ডাকলে—হরিয়া!

হরিয়া এসে দাঁড়াল:—কি?

—অনেক দিন আগে বড় বোতল একটা ছিল। তাতে খানিকটা ছিল। ছিল না?

—হুঁ। আছে।

—দে সেটা।

প্রায় তিন মাস পর আনন্দ মদ খেল।

পরদিন সকাল থেকে কেমন অধীর হয়ে রইল সে। বিকেল ছটা কখন হবে। আজকের এই অধীর উল্লাস একটু বিচিত্র ধরনের। এমন সে কখনও অনুভব করে নি। কাজল তাকে মালা পরাবে। একটা যেন আশ্চর্য কিছু। মালা পরে কি করবে জানে না। কিছু করবে। এ যেন একটা গান—তাকে কেউ শোনাচ্ছে। সকাল থেকে—তাই বা কেন—কাল রাত্রি থেকেই কেউ শুরু করেছে গান।

জীবনের গান। জীবন তার ধন্য হয়েছে। একটি নারীকে সে জয় ক'রেছে। তার থেকে তার রূপান্তর হয়েছে। অন্ধকার রাত্রি এসে জীবনকে তিমির নিবিড় নিশীথিনীর মতো আবৃত করে তার সকল আবরণকে হরণ করে নিয়েছে। প্রভাত হয়েছে তবু সে আলো সে তিমির নিশীথিনীর যবনিকা ভেদ করতে পারে নি। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে সে সেই আদিম কালের মানুষের মতো অভিসারের জন্য সেজেছে। সন্ধ্যার জন্য জপ করেছে।

সারাটা দিন কোন কাজে মন বসে নি। শুধু মন আকৃষ্ট করতে পেরেছিল—চড়ুই

পাখীটা। আজ এই দু'মাসের মধ্যে সে পাখীটার দিকে মন দিতে পারে নি। তাকে সে ভুলেই গিয়েছিল। সে আছে, সে থাকত, উড়ত, ডাকত, বেরিয়ে যেত ফিরে আসত, ঘড়ি বাজবার সময় ঘরে থাকলে ঘড়িটার ব্র্যাকেটে ব'সে চি্ক-চি্ক করে ডাকত, ডায়েলে ঠোকরাতো। আনন্দ ঘরে থাকলেও তা দেখত কিন্তু সে ঠিক সেই দেখা নয়। হরিয়া ঘোরে ফেরে—সে যেমন দেখে—তেমনি। একটি করুণা ছিল কিন্তু তার বিশেষ কোন আবেদন ছিল না। যে ভিক্ষুক তার দুর্দশার জন্তে প্রথম দিন যে করুণা আকর্ষণ করে যে উত্তাপ তার মধ্যে থাকে, তার পরে সে যখন নিত্য এসে দাঁড়ায় তখন যেমন দান পেলেও তার সে সরসতা আর থাকে না—এ তেমনি। আজ সকালে দীর্ঘদিন পর সে চড়ুইটাকে অবলম্বন করেই দিনটা কাটিয়ে দিয়েছিল। অনেক রসিকতা অনেক কথা সে তার সঙ্গে বলেছিল। দুপুরবেলা একটু শুয়েছিল। কিন্তু আধঘণ্টা অন্তর তার ঘুম ভেঙেছে। ক'টা বাজল। ঘড়ির দিকে তাকাবার আগে কান পেতে শুনেছে মৃদু চিনিক চিনিক শব্দ উঠছে কিনা। চড়ুই পাখীর ঘড়ির দরকার নেই। তার ঘুম ঠিক সময় ভাঙে। চড়ুইটার প্রথম চি'নিক ডাক শুনেই সে উঠে জানালা খুলেছিল। রোদ তখনও ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ঘড়িতে তিনটে বাজতে দশ মিনিট। তার পরও আড়াইঘণ্টা। হঠাৎ তার নজরে পড়েছিল চড়ুই সখীর সখা জুটেছে। এর মধ্যে চড়ুই পাখীর ডিম হয়েছিল কিন্তু ডিম দুটো ভেঙে গেছে। সখার সঙ্গে তার খেলা দেখে তার নেশা লেগেছিল।

পাঁচটার সময় বেরিয়েছিল সে তার সব থেকে সুন্দর পোশাকটি প'রে। দোকান থেকে পাখা এসেছে। হরিয়া বলেছিল, ওটা খাটাই! সিলিং ফ্যান একটা। টেবিল ফ্যানটার চলছে না।

সে বলেছিল—থাক আজ। আজ সময় নেই আমার। কাল আসতে বলে দে।

পৌনে ছটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এসপ্লানেডে ট্রাম টার্মিনাসে। অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল ট্যাক্সি নিয়ে যায় উইলিয়ামস্ কোম্পানির আপিসে। কিন্তু কাজল বলেছে—না। আপিসে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না। আমার লজ্জা তোমাকে নিয়ে নয় অন্ত জনের কথা সইবে না।

ছটা বাজতে পাঁচ মিনিটেই এসেছিল কাজল। তার পোশাকও ছিল আনন্দের রুচিমত, তারই দেওয়া। গাঢ় লাল ব্লাউজ, ফিকে নীল পাড়হীন শাড়ি। হেসে বলেছিল—এসেছি।

সেও বলেছিল—আমি অনেক আগে এসেছি নেবার জন্তে।

নীরবে পথ চলেছিল। কথা যেন মনে মনে চলছে। অন্ততঃ—চল। আনন্দের তাই মনে হয়েছিল। এসে বসেছিল গঙ্গার ধারে নির্জনে। হাঁটতে হাঁটতে যেতে অন্ধকার হয়ে এসেছিল। অনেকটা দূর গিয়েছিল। যেখানেই দাঁড়ায় সেখানেই যেন মানুষ। কখনও সে বলেছে—আর একটু চল। কখনও কাজল বলেছে—এখানে ওই সব লোক রয়েছে। শেষে মনের মতো নির্জন জায়গা পেয়ে বসেছিল দুজনে।

—এই নাও। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটি অ্যালুমিনিয়মের কৌটো থেকে বের করে খুলেছিল কৌটো। মুহূর্তে মধুর গন্ধে ভরে উঠেছিল আনন্দের নিশ্বাস। মালা বের করে.

বলেছিল—

—নাও, পর।

—না। তুমি পরিয়ে দাও।

—আনন্দ!

—কি?

—না, তুমি পর।

—না। পরিয়ে দাও। নইলে দাও আমি তোমায় পরিয়ে দি! নইলে থাক।

—বাবাঃ! আচ্ছা জেদী লোক তুমি। যা ধরবে তুমি ছাড়বে না। পরিয়ে দিয়েছিল মালা সে তার গলায়।—বলেছিল ধন্য বন্ধু।

—এবার আমি পরিয়ে দি।

—না। তুমি প'রে থাক। আমি সেইজন্তে গেঁথেছি।

—না।

—না।

মুহূর্তে উদ্দাম আবর্ত বাঁধভাঙা জলের মতোই যেন কল্লোল তুলে ছুটেছিল বুক তোলপাড় ক'রে। সে দুই হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু আশ্চর্য! কাজল আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠেছিল—আনন্দ!

—চুপ কর, চেঁচিয়ো না। কাজল।

কিন্তু সে থামে নি, আর্তকণ্ঠেই বলেছিল—আনন্দ। না না না। দুহাত দিয়ে তার মুখ ঠেলে দিয়েছিল। নিজেকে ছাড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু আনন্দ তাকে ছাড়তে চায় নি! অকস্মাৎ কি ক'রে একটা হাত ছাড়িয়ে কাজল তাকে চড় মেরেছে, খামচে দিয়েছে। প্রায় চীৎকার করে উঠেছে।

ঘাটের উপর মোটরের থামবার শব্দ হয়েছিল এই মুহূর্তটিতে। ছেড়ে দিয়েছিল আনন্দ। কাজল উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল। ছি—ছি—ছি! ছি তোমাকে! বলে সে অন্ধকারের মধ্যেই কাপড় ঠিক করে নিয়ে হন্ হন্ করে ঢাল থেকে উপরে উঠে এসেছিল। আনন্দ কয়েক মুহূর্ত পর উঠে তার পিছন ধরেছিল। সে এর শোধ নেবে। কিছুদূর এসেই গঙ্গার ধারে জনসমাগমের মধ্যে কাজল মিশে দাঁড়িয়েছিল। আনন্দ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চলে এসেছিল একটা ট্যাক্সি ধরে। এসে উঠেছিল বারে। বারে মদ খেয়ে সে গোটা ময়দান ঘুরেছে ট্যাক্সিতে কাজলের সন্ধানে নয়। অন্তের সন্ধানে। যবনিকা পড়ুক। মাথায় আগুন জলছে। ফিরেছে রাত্রে। রাত্রি প্রায় বারোটা। কাজলদের পাড়ার রাস্তাটার মোড়ে গাড়িকে থামতে বলে সে নামতে গিয়ে দেখল পা ঠিক নেই। তা ছাড়া রাত্রি বারোটা। বললে—চলো। থোড়া দূর। বাঁয়ে রাস্তেসে।

হরিয়া তাকে ধরে নামালে। শুইয়ে দিলে। আনন্দ বললে—শুইয়ে দে।

হরিয়া শোওয়াতে গিয়ে বললে—সে এসেছিল।

—কাল শুনব। আজ যেতে বলে দে।

সকালে উঠল সে ক্ষোভে ক্রোধে জ্বালাধরা অন্তর নিয়ে। সমস্ত কিছুর প্রতি নিষ্ঠুর আক্রোশে তার মন ভরে উঠেছে। ভুল! সে ভুল করেছে এতদিন। সকালবেলা চা দিতে এসে হরিয়া বললে—কাল রাতে সে এসেছিল। চিঠি লিখে গেল। বললে, বাবুকে দিয়ো।

—চিঠি? কে? কে লিখে গেছে—কে?

লেখা দেখে মনটা আরও জ্বলে গেল। কাজল, না শ্যামলী। সেই কালো ভিখিরী মেয়েটা। সে-ই। তিরস্কার করেছে। হয়তো ভয় দেখিয়েছে। ছিঁড়ে ফেলে দিতে গেল সে। কিন্তু কি ভেবে সে খুললে—চিঠিখানা খুললে। কি লিখেছে সে।

প্রিয়তম আনন্দ,

আত্মহত্যা ছাড়া আমার পথ নেই। ভুল করেই, হয়তো অভ্যাসবশে তোমাকে বাধা দিয়েছিলাম। নিজেকে ছাড়িয়ে তোমাকে আঘাত করেছিলাম। পালিয়ে এসেছিলাম। এসপ্লানেডে এসে বুঝতে পারলাম তোমাকে হারাচ্ছি আমি। তোমাকে হারিয়ে কি করে বাঁচব আমি? এই ভালবাসা তো কাউকে বাসি নি আমি। বিশ্বাস কর। আমাকেও তুমি ছাড়া কেউ দয়া করে তো ভালবাসে নি। ভোগ হয়তো করতে চেয়েছিলো। কিন্তু বাবার কাছে শিক্ষায় তা পারি নি। সে আত্মহত্যা। সেই কারণেই, সেই অভ্যাসেই আজ তোমার প্রতি এমন রূঢ় হয়েছি। কিন্তু তারপর? তোমাকে হারিয়ে কি করে বাঁচব? বুঝতে পারছি, নিশ্চয় বুঝছি তোমাকে হারিয়ে বাঁচতে পারব না আমি! আত্মহত্যা করতে হবে। বাঁচতে না পারলেই আত্মহত্যা করতে হবে। তাই ভেবে ফিরে তোমার বাসায় এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, বলব—আমাকে নাও। যা ইচ্ছে হয় কর। আমি ঢেলে দিলাম নিজেকে। আত্মহত্যা যদি করতে হয় আনন্দ তা হলে তোমাকে পেয়েই মরব। সে মরণে সুখ পাব। কিন্তু তুমি ফিরলে না। আজ ফিরে যাচ্ছি। কাল আসব। আত্মসমর্পণ করতে আসব। দুপুরবেলা আসব। তুমি বাসর সাজিয়ে রেখো—এটা আমার সাধ।

—কাজল।

আনন্দের ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মন আক্রোশে পরিতৃপ্তিতে উল্লাসে ভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষা বাসনা যেন ফেনিল হয়ে উঠল। সে আসবে। সে আসবে। এই জীবন। দিস্ ইজ লাইফ।

—হরিয়া!

—আঁ।

—মিস্ত্রী ডাক। পাখাটা টাঙা। আমি আসছি।

সে বেরিয়ে গিয়ে বাজার থেকে কিনে আনলে ফুল, নতুন বিছানার চাদর বালিশ। কিনে আনলে মদ! হয়তো কাজল শেষ মিনতি করবে। বলবে বিয়ে কর! না। মদ খেয়ে সে শক্ত হবে। উল্লসিত হল। ট্যাক্সিতে বসেই সে মদ খেলে খানিকটা। একটুক্ষণের মধ্যেই মাথাটা রমরম করে উঠল। ঘরে ঢুকে হরিয়াকে বললে—নতুন চাদর পাত! ফুলগুলো সে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিলে। হরিয়াকে বললে—খাবার শিগ্‌গির তৈরি কর।

—বেরুবে?

—না।

—দশটার পর কাজল আসবে। বুঝলি? তুই আজ দুপুরে সিনেমায় যাবি।

সে আসবে! সে আসবে! সে আর একটু মদ খেলে।

বেলা বারোটার সময় সে খেয়ে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল। মাথায় নতুন সিলিং ফ্যান, নতুন শয্যা। চারিদিকে রজনীগন্ধার ঝাড়। সে আসবে। আয়নায় নিজেকে দেখলে। থম থম করছে তার মুখ। প্রদীপ্ত উল্লাসে উগ্র হয়ে উঠেছে। উঠুক। সে পুরুষ! নীল আলোটা জ্বেলে ঘরের জানালা বন্ধ করে দিল সে। নীলাভ অন্ধকার হোক। ঘরটা ঠাণ্ডা হোক। অকস্মাৎ শব্দ উঠল—

—চি্-রি-ক। চি্ক্-চি ক! চিক।

পাখার ক্রর্র্ শব্দ তুলে চড়ুইটা বাসা থেকে বেরিয়ে ঘরময় উড়তে লাগল।

এসে বসল কোণে। সেখান থেকে উড়ে হোল্ডারে। সেখান থেকে ঘরময় বেড়াতে লাগল—আতঙ্কিতের মতো। এখনও ওর জানালা বন্ধের সময় হয় নি। ও বাইরে যাবে! হঠাৎ তার মাথায় এসে ধাক্কা খেলে। কিন্তু সেবারের মতো নয়। সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে গেল। উড়তে লাগল—

সে আসবে। চড়ুইটার উপর নিষ্ঠুর আক্রোশ হল তার। সে এক পা এগুলো জানালা খুলে দিতে। পরমুহূর্তেই ঘুরল। আপদ! জ্বালালে! দীর্ঘদিন থেকে জ্বালাচ্ছে। সে ঘুরে এগিয়ে গেল এবং পাখার সুইচটা টিপে দিলে। বোঁ-ও শব্দে ঘুরে উঠল পাখাটা। প্রথমে ধীরে তারপর জোরে। পাখীটা দিশাহারার মতো উড়ছে। পাখাটা নতুন। সে এক ভয়। উড়ছে। আনন্দ তাকিয়ে আছে। খট ক'রে একটা শব্দ হল। তারপর একটা পিন্ কুশন মাটিতে পড়ার শব্দ। পড়েছে। মদের উত্তেজনায় উত্তেজিত আনন্দ—পাখীটাকে কুড়িয়ে নিলে। থরথর করে কাঁপছে পাখীটা। তার সেই স্পন্দন আনন্দের শিরায় স্নায়ুতে যেন কেমন অস্বস্তিকর ঠেকছে। সে টিপে ধরলে। ঠোঁটের উপর নিজের দাঁতও টিপে বসল সঙ্গে সঙ্গে। সোজা হয়ে উঠতে গিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ও কে? ও কে? ওই আয়নার মধ্যে! আদিম অরণ্যচারী হিংস্র মুখ রেখায় রেখায় বীভৎস। ও কে? আনন্দ!—এই জন্তুটা তার মধ্যে ছিল। এই জন্তু সে! এমন জন্তু? তার হাতখানা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। পাখীটার রক্ত! গরম। বড় বেশি গরম। এত গরম! ভয় পাচ্ছে আনন্দ আয়নার মধ্যে মূর্তিটা দেখে। নীলাভ অন্ধকারের মধ্যে ওই ভয়ঙ্কর হিংস্র মানুষ,—ওঃ! সে চোখ বন্ধ ক'রে বার বার মাথা ঝাঁকি দিয়ে যেন সজোরে সবেগে অস্বীকার ক'রে বললে—না—না—না।

—হরি!

চমকে উঠল আনন্দ।

পরমুহূর্তে আবার ডাক এল—আনন্দ!

আনন্দ মরা পাখীটা হাতে দাঁড়িয়ে আছে বীভৎস—রক্তাক্ত হাত, মরা পাখীটার চোখ

দুটো আশ্চর্য কালো এবং করুণ! ওঃ!

—আনন্দ, আমি এসেছি।

আনন্দ আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—না—না—না। ফিরে যাও। তুমি ফিরে যাও! আনন্দ পাগল হয়ে গেছে ভয়ে, দুরন্ত ভয়ে!

—রাগ করোনা তুমি আনন্দ!

আনন্দ চীৎকার করে বললে—না—না—না।

হঠাৎ সে থেমে গেল। দৃষ্টি শূন্য হয়ে গেল।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল রবিবর্মার একটা ছবির কথা। ছেলেবেলায় দেখেছিল। জটায়ুবধ। রাবণের হিংস্র নিষ্ঠুর দম্ভর ভঙ্গিতে পৈশাচিক আনন্দ; চোখে ক্রোধ, নিষ্ঠুর কৌতুক হাতে তলোয়ার; জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ করেছে, বিরাট জটায়ু পড়েছে। বেপথু সীতা কাঁপছে।

সে কি রাবণ? চড়ুইটা কি ছোট থেকে বড় হয়ে উঠেছে? প্রকাণ্ড বড়? জটায়ু? ও ঘরে কাজল থর থর করে কাঁপছে?

না—না। সে রাবণ? হতে পারে না। পারবে না। রামও হতে চায় না। কাজলও সীতা নয়। কিন্তু পাখীটা—

পরমুহূর্তে হাতের মরা পাখীটার দিকে সে তাকাল। আঃ মেরে ফেললে সে? এমন নিরীহ জীবটাকে অবলীলাক্রমে মেরে ফেললে! কি ক'রে মারলে? কিন্তু এ কি? অকস্মাৎ তার এ কি হল। হু হু করে জল বেরিয়ে আসছে। অজস্র অশ্রু। একটা ছোট পাখার এত রক্ত?

ওদিকে বাইরে একটি ক্যাঁচ শব্দ উঠল। বেরিয়ে যাচ্ছে সে। সে ডাকলে—কাজল! কাজল! আবেগ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ধরা গলায় উঠছে বুকের মধ্যে।

—আনন্দ।

দরজা খুলে দিলে আনন্দ। কাজল বাইরে দাঁড়িয়ে।

—তুমি কাঁদছ আনন্দ!

—পাখীটাকে মেরে ফেললাম কাজল।

—তার জন্যে কাঁদছ?

—কাঁদছি।—

অবাক হয়ে গেল কাজল। কি বলবে ভেবে পেলে না।

আনন্দ চোখ মুছে বললে—শোন।

—কি?

—তুমি বাড়ি যাও কাজল এখন। না। চল আমি তোমার সঙ্গে তোমার মায়ের কাছে যাই। তোমায় চেয়ে নিয়ে আসি। আমাকে তুমি বিয়ে করবে তো কাজল? বন্ধুত্ব নয়। বিয়ে। যে বিয়েতে মৃত্যু পর্যন্ত বিচ্ছেদ নেই।

কাজল এবার কেঁদে ফেলল। নীরব অশ্রু। দরদর ধারায় তার সারা মুখ ভেসে যেতে লাগল। আনন্দ কি বিচ্ছেদহীন মিলনের কল্পনায় বিভোর হয়ে উঠেছে!

জঙ্গলগড

উৎসর্গ

শ্রীমান হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

১. ২. ৬৪

১১৬১ হিজরীর বর্ষার প্রারম্ভ। আষাঢ় মাস। ইংরিজী ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস। মুর্শিদাবাদে ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী খাঁ মারাঠাদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে কটক পর্যন্ত জয় করে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেই অসুখে পড়েছিলেন। কিন্তু তিন মাস পর অসুখ থেকে সেরে উঠেই সংবাদ পেলেন উড়িষ্যা আবার মীর হবিবের সাহায্যে মারাঠারা দখল করেছে। নিজেকে ধিক্কার দিলেন তিনি। ধিক্কার দিলেন—একটা প্রায় ভিক্ষুক শ্রেণীর লোভীকে বসিয়ে এসেছিলেন উড়িষ্যার নায়েবের গদীতে। তিনি জানতেন, কিন্তু তাঁর যে এ ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। কোন চিন্তাশীল ওমরাহ কি আমীর এ গদীতে বসতে চান নি। কারণ বর্গীদের অত্যাচারে তখন উত্তরে দিল্লী পর্যন্ত পূর্বে বাংলা পর্যন্ত অশান্তির আর শেষ ছিল না। তার উপর উড়িষ্যা মারাঠা রাজ্য এবং সুবা বাংলার প্রান্তসীমা, আজ এ দখল করে কাল ও দখল করে। কাজেই এ উড়িষ্যার গদীতে কোন চিন্তাশীল ওমরাহ বসার চেয়ে সামান্য জীবন যাপন করাকেও নিরাপদ মনে করেছিলেন। কিন্তু রাজা দুর্লভরামের পল্টনের এই মুসলমান সামান্য মনসবদার শেখ আবদুস সোভান—সে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে বলেছিল—'জনাব আলি, মুলুকের মালিক, এই গরীব বান্দার শির জামিন, আর ভরসা দিনদুনিয়ার মালিকের। গোলাম এই দায় পুরতে রাজী।' অগত্যা পাঁচ হাজার আফগান পল্টন তারই তাঁবে রেখে আলিবর্দী সঙ্গে সঙ্গে কটক ত্যাগ করেছিলেন। কারণ সামনে আসন্ন বর্ষা। তাঁর পল্টনের সিপাহিরা একেবারে থ'কে গেছে। তারা যে পরিশ্রম করেছে সে তাদের চেয়েও তিনি বেশি জানেন। তাঁর নিজের কথা তিনি ভাবেন না। বর্ষার সময় বর্গীদের মুলুকে একেবারে সামনে থাকাটা নিরাপদ মনে করেন নি তিনি, ফিরে এসেছিলেন।

বর্গী হাঙ্গামার আগে পাটনায় ছ মাস থাকা তাঁর অন্যায় হয়েছিল। পাটনায় নাতি সিরাজুদ্দৌলাকে নায়েব করে রাজা জানকীরামকে দেওয়ান করে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন গত অগ্রহায়ণে। মারাঠারা তখন বাংলায় ঢুকেছে। জানোজী কাটোয়ায় তাঁবু গেড়ে বসে আছে, সঙ্গে তার মীর হবিব। একটা সাক্ষাৎ শয়তান। পারস্যের সিরাজ থেকে ভাগ্যান্বেষী মীর হবিব হিন্দোস্তানে এসে প্রথমে হুগলীতে গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে ফিরি করে বেড়াত, ব্যবসার বস্তুর কোন কিছু ঠিক ছিল না। আজ হীরা জহরৎ মুক্তা নিয়ে বেড়াত, কাল মসলিন মলমলের বোঝা পিঠে ফেলে ফিরত। যেটা সে মহাজনের কাছে বলে কয়ে ধারে পেত তাই নিয়ে বের হত। তা থেকেই তার জীবিকা নির্বাহ হত। লিখতে জানে না, পড়তে জানে না—আছে শুধু আশ্চর্য মিষ্ট মুখ ও কৌতুক পারঙ্গমতা, তার সঙ্গে কুটিল বুদ্ধি। শয়তানের মত কুটিল বুদ্ধি। আর বলতে পারে খাসা ফারসী বয়েৎ, তা তার অনেক মুখস্থ। তারই জোরে বড় আমীর মহলে তার ঢুকবার সুবিধা হয়েছিল। এবং সুজাউদ্দীনের জামাই হুগলীর ফৌজদার রোস্তম জং-এর পারিষদ হয়ে নোকরি পেয়েছিল। রোস্তম জং হুগলী থেকে ঢাকা গেল নায়েব হয়ে। মীর হবিব গেল তার পরামর্শদাতা ও পারিষদ হয়ে। মানুষের নসীবের চাকা যখন ঘোরে এবং তখন যদি উঁচু ডালের পর উঁচু ডাল বা উঁচু ধাপের পর উঁচু ধাপগুলিকে আঁকড়ে আঁকড়ে যেতে পারে তবে তার উন্নতির সীমা থাকে না। মীর হবিব রোস্তম জং-এর

উন্নতি করে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও অর্থ সঞ্চয় করেছিল প্রচুর। বিশেষ করে ত্রিপুরার রাজার কাছ থেকে সে কয়েক লক্ষ টাকা ঘুষ খেয়ে আরও উন্নতি করে নিয়েছিল। তারপর ঢাকা থেকে রোস্তম জং-এর সঙ্গে এল উড়িষ্যায়। উড়িষ্যার সে নায়েব হয়েছিল। নবাব আলিবর্দী যখন মুর্শিদাবাদ দখল করে রোস্তম জং-এর বিদ্রোহ দমন করতে উড়িষ্যায় যান তখন রোস্তম জং পালিয়ে গেলে সে আলিবর্দীকে আশ্রয় করেছিল—তার চাতুর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে চাকরি দিয়েছিলেন। আলিবর্দী নিজে বিচক্ষণ চতুর—চতুর লোক ভালবাসতেন। তবে চোখে চোখে রেখেছিলেন।

প্রথম বর্গী হাঙ্গামার সময় ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে যখন যুদ্ধ করছেন আলিবর্দী, তখন মীর হবিব নবাবের সঙ্গে। বর্ধমানে ঘটল বিপর্যয়। আলিবর্দী কোনমতে আত্মরক্ষা করে লড়াই দিতে দিতে এসে ঢুকলেন মুর্শিদাবাদে। হবিব বন্দী হল মারাঠাদের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক সুবিধাবাদী যোগ দিলে মারাঠাদের সঙ্গে। উড়িষ্যা থেকে বাংলা পর্যন্ত পথঘাট সব তার নখদর্পণে। নবাবী শক্তি তার জানা; এবং ফৌজের নাড়ীনক্ষত্র তার মুখস্থ। উড়িষ্যা মেদিনীপুরের সমস্ত রাজা জমিদারের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। এই রাজারা বিচিত্র চরিত্র। আজ নবাবের পক্ষে, কাল বর্গীর পক্ষে। মীর হবিব তাদের নিয়ে খেলা করছে। এইসব মূলধন নিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সে খেল খেলে আসছে। বাংলার সর্বনাশ করছে। আজ আট বৎসর সে বাংলাদেশের নসীবের আসমানে শনি নক্ষত্রের মত দৃষ্টি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে। শৃগালের মত ধূর্ত। নেকড়ের মত ক্ষুধার্ত। বাঘের মত তার রক্তের তৃষ্ণা। আবার শশকের মত সে বনেজঙ্গলে লাফ দিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কটক থেকে আলিবর্দী খাঁ বর্ষার কথা ভেবে তাঁর পল্টনের অবস্থা বিবেচনা করেই তাড়াতাড়ি ফিরেছিলেন। ওই উল্লুক অপদার্থ আবদুস শোভানকেই উড়িষ্যার নায়েবীতে বসিয়ে চলে এসেছিলেন। ঠিক সাত দিনের মধ্যেই ধূর্ত শিয়াল চিতাবাঘের চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছিল। অর্থাৎ মীর হবিব এসেছিল বর্গী নিয়ে। শোভান লড়াই দিয়ে আহত হয়ে পালিয়েছে। চরের খবর—শোভান এখন ডাকাতি করছে। উড়িষ্যার জঙ্গলে তার বাসা। ওদিকে মীর হবিব বালেশ্বরে মারাঠা শক্তিকে নতুন বাংলা অভিযানের জন্য সমবেত করছে। মোহন সিং এসেছে মারাঠা ফৌজ নিয়ে. মুস্তাফা খাঁর ছেলে মুর্তজা তার পাঠান পল্টন নিয়ে যোগ দিয়েছে। আলিবর্দী তাঁর আয়োজনে ব্যস্ত হয়েছেন। বাংলাদেশে লোকের মুখ শুকিয়েছে। আবার বর্গী আসছে। অনেক লোক ভাবছে দেশ ছেড়ে পালাবে। কিন্তু পালাবেই বা কোথায়, গোটা হিন্দুস্থানে বর্গী কোথায় নেই। আসে তারা কালবৈশাখীর ঝড়ের মত। দেখতে দেখতে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। ঝড় ওঠে, বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পড়ে, শিলাবৃষ্টি হয়। ঘরের চাল উড়ে যায়, গাছ ভাঙে, পাতা ছিঁড়ে আকাশময় ওড়ে। নিরাশ্রয় মানুষ বাজে পুড়ে মরে, শিলার আঘাতে জখম হয়ে মরে, বৃষ্টিতে ভিজে থরথর করে কাঁপে—বর্গীর হাঙ্গামাও ঠিক তাই।

এরই মধ্যে মেদিনীপুর অঞ্চলে মানুষ ব্যস্ত-ত্রস্ত বেশী। বিশেষ করে জমিদার রাজারা। এই অঞ্চলটিতে—বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে জমিদার রাজার সংখ্যা অনেক। সে বহুকাল থেকে।

কর্ণগড়, ঝাড়গ্রাম, মহিষাদল, ময়নাগড়, ময়নাবাসান, হিজলী, ময়না, নয়াগ্রাম, কিয়ারচান্দ; বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর রাজ প্রভৃতি নিয়ে এ অঞ্চলটি জমিদার জায়গীরদারদেরই রাজত্ব। নবাবের শাসন এখানে ঠিক কোনকালেই কায়েম নয়। সেই পাঠান আমল থেকে মোগল পাঠানের আধিপত্যের যুদ্ধের লীলাভূমি এবং প্রাচীনকাল থেকে উড়িষ্যা এবং বাংলার সীমান্ত হিসাবে এই অঞ্চলটি সামন্তদের দ্বারাই শাসিত হয়ে আসছে। নবাবের শক্তি যখন থাকে, দেশে শান্তি বিরাজ করে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় যখন থাকে না তখন নবাব রাজাদের কাছে কর পেয়ে থাকেন, কিন্তু শান্তি না থাকলে পান না। তখন তিনি এদের সীমান্ত রক্ষার জন্য সাহায্য পেলেই সন্তুষ্ট থাকেন। সামন্তেরা, নিজেদের রাজ্য বা জায়গীরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। নিজেদের সৈন্য, নিজেদের সেনাপতি, নিজেদের বিচার, নিজেদের কোতোয়ালী—সব নিজেদের। জমির চেয়ে জঙ্গল বেশী। বিরাট ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল এখানেই। সে জঙ্গল মেদিনীপুরের সমস্ত পশ্চিম অংশটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং বাংলার সীমান্ত পার হয়ে উড়িষ্যার উত্তর-পশ্চিম ও বিহারের দক্ষিণ-পূর্বের মধ্য দিয়ে মধ্যভারতের পৌরাণিক দণ্ডকারণ্য নৈমিষারণ্যের সঙ্গে মিশে গেছে। এরই মধ্য দিয়ে বর্ধমান হুগলী আরামবাগ হয়ে বাদশাহী সড়ক চলে গেছে। ওদিকে বিহার অঞ্চল থেকে সড়ক এসে মিশেছে। আবার চলে গেছে মধ্যভারত অভিমুখে উত্তর-পশ্চিম উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে। অন্যটি চলে গেছে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত—আধুনিক তমলুক অভিমুখে। আবার একটি সড়ক চলে গেছে উড়িষ্যার পূর্বভাগে ঢুকে নীলমাধব জগন্নাথদেবের অধিষ্ঠানভূমি পুরী পর্যন্ত। অন্যদিকে কটক পর্যন্ত। দক্ষিণভাগে সমুদ্র। পূর্বভাগে সমুদ্র। পশ্চিমভাগে সব অরণ্যভূমি। চাষের জমি কম। সাধারণ হিন্দুগৃহস্থেরা চাষ করে, গ্রামের আশেপাশে জমি। কতকাংশ লাল মাটি ও কাঁকরে ভরা রাঢ়ের মাটি। কতকাংশ কালো মাটি। চাষীরা চাষ করে কিন্তু খুব বেশি নয়। কারণ সামন্তে সামন্তে বিবাদ লেগেই আছে। তার উপর আজ তিনশো বছর ধরে চলে এসেছে মোগল আর পাঠানের লড়াই। কয়েকটি নবাব উপাধিধারী পাঠান জমিদারও রয়েছে। তাদের সঙ্গে ছত্রি জমিদারদের বিরোধ বাধে নানান কারণে। কখনও কন্যা দাবি করে। কখনও বলে মন্দিরের চূড়া বেশি উঁচু হয়েছে, খাটাও। ভাঙো।

এ ছাড়া আছে পাইকদের উপদ্রব। পাইকরা এইসব সামন্তদের পাইক। এ দেশের আদিম অধিবাসী। যুগ যুগ ধরে এইসব যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে প্রয়োজনে সামন্তদের দলভুক্ত হয়ে যুদ্ধ করে এসেছে; যুদ্ধবিগ্রহ না থাকার জন্য নিরুৎসাহ এবং ক্লান্তি বোধ করলে শান্ত কৃষকদের গ্রাম লুঠ করে এসেছে। অন্য সময়ে এইসব জঙ্গল মহলে বাঘ ভালুক নেকড়েদের সঙ্গে লড়াই করেছে। চাষ এরা করে না। অরণ্যের মধ্যেই বাস; অরণ্যের মধ্যেই ঘোরাফেরা। পাইকদের ব্যবহার রূঢ়, এদের চুয়াড় বলে থাকে। এ ছাড়া উত্তর অঞ্চলে আছে বাগ্দী। এরাও রণনিপুণ। সামরিক জাতির মত উগ্রস্বভাব তখন। বাঁকুড়ায় আছে বাউরি-বাগ্দী ডোম। রাজা লাউসেনের ছিল ডোম বাহিনী—সেনাপতি ছিল কালু সর্দার। বিষ্ণুপুরের রাজার ছিল বাগ্দী বাহিনী, তারা দলমাদল কামান নিয়ে লড়াই করেছে। লড়াই এরা কখনও কখনও এই সব ছত্রিরাজাদের সঙ্গেও করেছে। ছত্রিরাজাদের রাজ্যেও ডাকাতি করেছে। উপদ্রব করেছে। সেই প্রথম যুগে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করেই রাজ্য স্থাপন করেছিল ক্ষত্রিয়েরা।

ক্ষত্রিয়েরা এদের বশ মানিয়ে বর্বর যুদ্ধের বদলে উন্নত ধরনের যুদ্ধ শিখিয়ে শক্তিশালী সৈন্য-দলে পরিণত করেছিলেন। এমনি একটি দল, বাগ্দী পাইক সেনাদল নিয়ে গভীর অরণ্যে বাস করত দলুই সর্দার—দলপৎ সিং।

দলুই সর্দার ক্ষত্রিয়। এককালের রাজবংশধর। শোলাঙ্কী রাজপুতরাজার বংশের সন্তান। কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে, স্বাধীনতা এবং জীবনরক্ষার জন্য আজ অরণ্যচারী। কয়েক পুরুষ ধরে এইভাবে বনে বাস করে বিচিত্র ধরনের মানুষে পরিণত হয়েছে।

দলুই সর্দার শোলাঙ্কী রাজপুত। অর্থাৎ অগ্নিকুলের রাজপুত। অগ্নিবংশ, সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের মতই পবিত্র। পুরাণে আছে দৈত্যদের অত্যাচারে মুনি-ঋষিদের যাগযজ্ঞ বন্ধ হয়ে গেলে স্বয়ং মহাদেব যজ্ঞ করে তাতে আহুতি দিতেই চারজন ক্ষত্রিয় বীর আবির্ভূত হয়েছিল। প্রমার প্রতিহার শোলাঙ্কী (চালুক্য) আর চৌহান। তাঁরা দৈত্যদের অত্যাচার নিবারণ করেছিলেন। শোলাঙ্কী বা চালুক্য বংশ একদিন ভারতবর্ষে প্রবলপ্রতাপ ছিল।

চালুক্য বংশের শুরু দ্বারকায় রাজা ছিলেন, গুজরাট ছিল তাঁর রাজ্য। গুজরাটে শোলা-ঙ্কীদের বিপর্যয় ঘটল পাঠান সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সময়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অগ্নি-বংশীয় বীরেরা পরাধীন হয়ে গুজরাটে বাস করতে চান নি। তাঁরা স্বাধীনতাকে মাথায় করে দেশ ছেড়েছিলেন, বলতে গেলে নিরুদ্দেশে। ভারতের নানান দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন নূতন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করবার জন্য। একদল এসেছিলেন বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তভূমে। মেদিনীপুর জেলায়। এখানে কেদারেশ্বর মহাদেব ছিলেন মাটির তলায়। স্বপ্ন পেয়ে তাঁরা মহাদেবকে এবং উষ্ণ প্রস্রবণ সিদ্ধকুণ্ড আবিষ্কার করে রাজ্য স্থাপন করেন। এই ভূমির নাম তাঁরাই দিয়েছিলেন 'কেদার কুণ্ড'। রাজা ছিলেন মহাবীর মহারাজ বীরসিংহ। রাজধানীর নাম হয়েছিল বীরসিংহপুর।

তখন এখানকার বাগ্দীরা ডাকাতের দল বেঁধে রাজার রাজ্যে উপদ্রব শুরু করেছিল। ক্ষত্রিয়দের উচ্ছেদ করবার ইচ্ছেই বোধ হয় ছিল তাদের। কিন্তু মহারাজা বীরসিং তাদের পরাজিত করে সাতশো জন দুর্ধর্ষ ডাকাতের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। তারপর সাতশো মুণ্ড আর সাতশো ধড় দিয়ে পাশাপাশি দুটো স্তূপ তৈরী করে মাটির পাহাড় তৈরী করিয়েছিলেন মুণ্ড-মরাই ও গর্দা-মরাই। এর ফলে বাকী বাগ্দীরা তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। রাজ-পুতেরাও তাদের যুদ্ধশিক্ষা দিয়ে করে তুলেছিল সত্যকারের সৈনিক।

ভাগ্যের দোষে অদৃষ্টের চক্রান্তে যখন মন্দ সময় আসে তখন তাকে রোধ করা বোধ হয় মানুষের অসাধ্য। তা ছাড়া কলিকাল। এই কালে সারা হিন্দুজাতির অদৃষ্টে মন্দ সময় এসেছিল। নইলে যে মুসলমানের কাছে গুজরাটের রাজ্য হারিয়ে ধর্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শোলাঙ্কীরা এসে কেদার কুণ্ডে রাজ্য স্থাপন করে নিশ্চিন্তে বসবাস করছিল, সেখানেও একদিন আবার কেন এল মুসলমানের হানা? গৌড়ের সুলতান মহম্মদ ইলিয়াস শাহ উড়িষ্যা বিজয়ের পথে কেদার কুণ্ড আক্রমণ করলেন। সে যুদ্ধ হয়েছিল প্রবল প্রচণ্ড যুদ্ধ। রাজ-পুতানার মরুবিজয়ী ক্ষাত্রবীর্য আগুনের মত জ্বলে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু সংখ্যা যুদ্ধে একটা গুরুত্ব-পূর্ণ প্রশ্ন। গৌড়ের সুলতান মহম্মদ ইলিয়াস শাহের বিশাল বাহিনীর কাছে মুষ্টিমেয় শোলাঙ্কী

রাজপুতের বীর্য বহ্নিবীর্য হলেও কতক্ষণ জ্বলবে ? সঙ্গে বাগ্দী সৈন্য অবশ্য ছিল। কিন্তু রাজত্ব ক্ষুদ্র, তার বাহিনীও ছোট, সুলতানের সৈন্যবাহিনীর শক্তি ধুলোঝড়ের মত বয়ে গিয়ে ধুলো চাপা দিল বহ্নিবীর্যকে, আগুন নিভে যেতে বাধ্য হল। তারপর শুরু হল নিধন-পর্ব। সুলতানের সেনাপতি কঠিন আক্রোশে শোলাঙ্কী রাজপুতদের হত্যা করতে হুকুম দিলেন। এ বহ্নিবীজ রাখা চলবে না। এ আবার কোনদিন জ্বলে উঠে সর্বনাশ করবে। নারী শিশু বৃদ্ধ সব হত্যা কর। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তারা বাঁচতে পারে। যুদ্ধে সবল শক্তিমান যারা তারা সকলেই প্রাণ দিয়েছিল, বাকী যারা ছিল তারা ওই বৃদ্ধ শিশু আর নারী।

বৃদ্ধেরা পরামর্শ করলেন—কি করবেন ? শাস্ত্রে আপদ্ধর্মের বিধান আছে। সেই বিধান অনুসারে জাতির বীজ এবং অবশেষকে রক্ষা করবার জন্য স্থির হল আপাতত আত্মগোপন করে বাঁচতে হবে। যারা বয়স্ক, যাদের উপনয়ন সংস্কার হয়ে গিয়েছিল, রক্তবর্ণ উপবীত যাঁদের চিহ্ন তাঁরা বনের মধ্যে সমবেত হয়ে, অগ্নিকুণ্ড জেলে রক্তবর্ণ উপবীত অগ্নিকে সমর্পণ করে বললেন—তুমি আমাদের বংশের আদিপুরুষ কুলদেবতা, তোমার কাছে গচ্ছিত রইল আমাদের উপবীত। স্বাধীনতা অর্জন করে এই উপবীত যেদিন চাইব সেদিন তুমি আমাদের ফিরিয়ে দিয়ো। এই ভূমিকে চিহ্নিত করবার জন্য ভূমির নাম হল সুতাছাড়া।

তারপর তাঁরা আশ্রয় নিলেন স্থানীয় অধিবাসীদের ঘরে। মাইতি মণ্ডল অধিকারী সামন্ত প্রভৃতি নানান ঘরে আত্মগোপন করলেন, এবং আশ্রয়দাতার উপাধিতে পরিচয় দিয়ে আত্মগোপন করে তখন বাঁচলেন।

পরে অবশ্য একাংশ আবার পূর্ব উপাধি এবং উপবীত গ্রহণ করে উড়িষ্যার ক্ষত্রিয় রাজাদের অধীনে কর্ম নিয়েছেন। একাংশ সেই উপবীতহীন অবস্থায় আশ্রয়দাতার উপাধি গ্রহণ করেই কৃষিকর্ম করেন। আর দিন গণনা করেন কবে আসবে স্বাধীনতা। আজ তাঁরা শোলাঙ্কী রাজপুত হলেও শুক্লী নামে পরিচিত। প্রতীক্ষা করে আছেন এদিন কবে ঘুচবে।

এরই মধ্যে দলপৎ সিং-এর পিতামহ প্রথম যৌবনে একদল বাগ্দী সৈন্যদের নিয়ে এসে দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বাগ্দী সৈন্য নিয়ে রাজত্ব করতেন অরণ্যের মধ্যে। একেবারে আরণ্য জীবন। অরণ্যই রাজত্ব। সেখানে অবাধ স্বাধীনতা। না থাক সভ্যতা।

* * *

এর দুপুরুষ পরের পুরুষ দলুই সর্দার।

দলুই সর্দারের জীবনেও একটা দারুণ বিপর্যয় এসেছিল। সেই বিপর্যয়ের ফলে দলুই সর্দার তার অনুগত বাগ্দী পাইকদের নিয়ে পিতামহের স্থাপন করা অরণ্য রাজ্য ছেড়ে আরও নিবিড়তর জঙ্গলে এসে বসতি স্থাপন করে, সেই দিন গণনা করছে কবে আসবে সুদিন সুপ্রভাত। সে আজ বিশ বৎসর হয়ে গেল।

দলুই সর্দার নিজেই জায়গাটার নামকরণ করেছে 'ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়'। 'জঙ্গলগড়' কথাটার সঙ্গে ছত্রিশ জাতিয়া শব্দটা যোগ হওয়ার একটা কারণ আছে। এখানে বিশ বছর আগে—ছত্রিশ জাতিয়া নামে একটা বিচিত্র জাত বাস করত। তারা এদের কাছে হার মেনে

এদের সঙ্গেই বাস করছে।

উড়িষ্যার সড়ক থেকে দূরে একটা গভীর জঙ্গল এবং পাহাড়ে জায়গার উপর ছোট একখানি গ্রাম—ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড় গ্রামে ঘর তিরিশেক পাইকের বাস। তবে পাহাড়টার মাথাটা এবং আরও কয়েকটা ছোট পাহাড়ের মাথায় আরও খান-আষ্টেক গ্রাম নিয়ে বেশ ছোট একটি পাইক রাজত্ব বলা চলে। এরই মধ্যে খড়ের চাল কিন্তু মোটা মোটা পাথর ও কাদায় গাঁথা দেওয়াল, খোয়া পিটানো মেঝে, একখানি অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ি। সামনে একটা চণ্ডীমণ্ডপ। তার সামনে শক্ত শালকাঠের খোদাই খুঁটির উপর তৈরি একটা আটচালা। আটচালার সামনে পাথর কাদায় গাঁথা দুটো মোটা খাটো থাম—অর্থাৎ ফটক। আটচালায় একটা বড় নাগরা। এটি এখানকার এই দশখানা গ্রামের পাইক সমাজের সর্দার দলুই শুক্লীর বাড়ি। দলুই সর্দার নতুন অভিযানের খবর পেয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসে ভাবছিল বিশ বছর আগে যখন তারা এখানে প্রথম এসেছিল তখনকার কথা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল মীর হবিবের ধ্বংস না হলে লোকসমাজে সে ফিরবে না। শোলাঙ্কী রাজপুতদের জীবনে যে বিপর্যয় কয়েক পুরুষ আগে এসেছিল তার পিতামহের আমলে, তারপর দলুই সর্দারের আমলে এই মীর হবিবের চক্রান্তে এসেছিল দ্বিতীয় বিপর্যয়। তখনই এই প্রতিজ্ঞা করেছিল সে।

বিশ বছর পূর্বে চন্দনগড় জায়গীরের রাজা মাধব সিং-এর মৃত্যুর পর তারা ওই জায়গীরে তাদের বসত ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে আত্মগোপন করে এখানে এসে বসবাস স্থাপন করেছে। তখন ওরা সংখ্যায় ছিল কম। মীর হবিবের চক্রান্তে মাধব সিং রাজা—তাঁর জামাই খুন হয়েছেন। সমস্ত সক্ষম শুক্লীরাজপুত আর বাগ্দী পাইকরা লড়াই করে মরেছে। বাকী কিছু সক্ষম পাইক আর নিজের কন্যাকে নিয়ে দলুই সর্দার এখানে এসেছিল। আর সঙ্গে ছিল কেবল পাইকদের মেয়েছেলেরা। এখন ওরা দশখানা গ্রামে বিশ থেকে তিরিশ ঘর হিসেবে আড়াইশো ঘর। তখন সংখ্যায় ছিল একশোজন। তার মধ্যে তিরিশজন জোয়ান, বাকি সব মেয়েছেলে। চন্দনগড়ে ওরা ছিল চার-পাঁচশো জোয়ানের একটি দল। কিন্তু চন্দনগড়ের ছত্রি সেপাইরা তাদের সমূলে ধ্বংস করবে বলে আক্রমণ করবার উদ্যোগ করতেই ওরা বেরিয়ে পড়ে। হাজার দেড়েক ছত্রি পল্টন তাদের আক্রমণ করতে তারা ঘুরে দাঁড়ায়। জনকয়েক ছেলেমেয়েদের নিয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করে। যারা লড়াই দিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল তাদের বড় কেউ ফেরে নি। দলুই সর্দার বাকি জোয়ান আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিবিড় থেকে নিবিড়তর জঙ্গলে প্রবেশ করে। এখানে এসে একদিন রাত্রে বিশ্রামের জন্য থামে। অনেক রাত্রি অনেক জায়গায় তারা থেমেছে, আবার সকালে যাত্রা করেছে। থামবার ইশারা ছিল জল। সন্ধ্যার মুখে জল সন্ধান করে যেখানে জল পেত, সেখানেই তারা গাছতলায় গাছতলায় রাত্রের আস্তানা পাতত। কিন্তু রাস্তার ধারে নয়। যাত্রা বলতে গেলে নিরুদ্দেশ।

সেদিনও সন্ধ্যার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে সর্দার কয়েকজনকে চারিদিকে জলের সন্ধানে পাঠিয়েছিল। যারা যেত তারা হাতে কাটারি আর পিঠে বর্শা বেঁধে নিয়ে যেত; যাবার

সময় যেত পথের গাছে কোপ মেরে দাগ রেখে রেখে, অধিকন্তু গাছের ডালও কেটে কেটে ফেলে যেত। যেটার নিশানা ধরে তারা পথ না হারিয়ে ঠিক ফিরে আসত। সেদিন দলুই সর্দারের চিন্তার অবধি ছিল না। কারণ তার একমাত্র কন্যা পূর্ণগর্ভা, তার শরীর সেদিন ভাল ছিল না। দলের মেয়েদের মধ্যে প্রবীণা অম্বিকে বাগ্দিনী এসে তাকে বলেছিল—সর্দার, আর হাঁটা হবে নাই বাপু, থামতে হবেক।

তখন বেলা তিন প্রহর। দলুই জিজ্ঞাসা করেছিল, ক্যানে? তু যদি না পারছিস তো ওই একটো ছালার ঘোড়ার পিঠে চড়্। লইলে কারুর পিঠে ওঠ্। না পারিস তো থাক্ পড়ে। বাঘে তুকে ধরে খাক।

—উঁহু। সি লয়। রুক্মিণীর শরীলটো খারাপ করছেক। কি হয়।

চমকে উঠেছিল দলুই। রুক্মিণী আসন্নপ্রসবা। তার এই প্রথম সন্তান এবং রুক্মিণীর এই শেষ।

রুক্মিণী বিধবা হয়েছে। সদ্য-বিধবা সে। সিঁথির সিঁদুর মুছে সে চেপেছে ডুলিতে। কেঁদেছে যদি তবে ডুলির মধ্যে বসে কেঁদেছে। জানলে একমাত্র জানে ওই বুড়ী অম্বিকা বাগ্দিনী। অম্বিকাই তাকে মানুষ করেছে তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর। লোকে অম্বিকাকে তার দাসী ও স্নেহের পাত্রী বলে—সে তা অস্বীকার করে না।

সে এখন শুক্রী—আগে ছিল শোলাঙ্কী। রাজপুতানার শোলাঙ্কী রাজপুত। তারা ভীলেদের কন্যা ছিনিয়ে আনত। এখনও আনে, আনে এই সব জাত থেকে।

যে জায়গাটার কথা হচ্ছিল সেটা আস্তানা গাড়বার পক্ষে ছিল অত্যন্ত খারাপ জায়গা। একজন ছোকরা বাগ্দী একটা খুব উঁচু গাছে চড়েও জল দেখতে পায় নি। তার উপর জঙ্গলের আবরণ ছিল বড় পাতলা। আধ ক্রোশ দূরে একটা সড়ক। সেখানকার রাহীদের চোখে পড়বার ভয় আছে। দলুই সর্দার বলেছিল সকলকে ডেকে—হাঁকিয়ে চল, জোরে চল।

ডুলির বাহকদের সঙ্গে চলেছিল জন বিশেক জোয়ান, আর ঘোড়াগুলো। দলে মানুষই শুধু ছিল না, তার সঙ্গে কুড়িটা ঘোড়া ছিল। গোটা তিরিশেক গরু ছিল। তাদের পিঠে ছিল তাদের ঘর-সংসার—যাযাবরের সংসারের মত। ছেলেমেয়ে গরু প্রভৃতি নিয়ে তিরিশ জন জোয়ান, অনা দশেক বৃদ্ধ মন্থর গমনে পিছিয়ে আসছিল পথের নিশানা ধরে। আগের দলের জোয়ানেরা ওই গাছের ডাল কেটে কেটে নিশানা রেখে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যে হয়-হয় এমন সময়ের মুখে উৎকণ্ঠিত দলুই সর্দার পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত মুখে জল খুঁজতে পাঠিয়েছিল। এখনও দণ্ড দেড়েক বেলা আছে। যে জায়গায় তারা এসে পৌঁছেছিল—সে জায়গার বনটা নিবিড়। সামনে খানিকটা পশ্চিমে কয়েকটা পাহাড়, তার তলায় জঙ্গল আরও ঘন। রাত্রিতে আর অগ্রসর হওয়া যাবে না। গেলে ওই পাহাড়ের বাধায় ঠেকতে হবে। রাত্রে ক্লান্ত মানুষ জানোয়ার কারু পক্ষেই সম্ভবপর নয় পাহাড়ে ওঠা বা পথ খুঁজে বের করা। সড়ক অনেকখানি ছেড়ে বনের ভিতর ঢুকছে তারা। সেখানেই

থেমেছিল। মনে ভরসা হয়েছিল পাহাড় যখন আছে তখন নিশ্চয়ই ছোটখাটো কোন জোড় বা নদী মিলবেই। বইবে তারা পূর্ব মুখে, কিংবা দক্ষিণ মুখে। কারণ পূর্ব-দক্ষিণে সমুদ্র আছে।

কিছুক্ষণ পর লোক ফিরে এসে বলেছিল নদী একটা আছে। জল সে সঙ্গে এনেছিল। রাস্তার নিশানাও রেখে এসেছিল। সেই নদীর কাছাকাছি গিয়ে তারা আস্তানা গেড়েছিল রাত্রির মত। সারারাত্রি প্রসববেদনায় কাতরেছিল রুক্মিণী, কিন্তু প্রসব হয় নি। একটা জায়গা কাপড় দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে রুক্মিণীকে নিয়ে বসে ছিল অম্বিকা এবং ওদের অন্য প্রবীণারা। দলুর বিধবা বোনও ছিল। থাকবার মধ্যে দলুর আছে ওই বোন আর মেয়ে। সন্তান হয়েছিল ভোরবেলা সূর্যঠাকুরের উদয়-লগ্নে। পাখির ডাকের সঙ্গে শিশুর কান্না মিশে গিয়েছিল। দলু সর্দার সারা রাত্রি উদ্বেগে জেগেই বসে ছিল। ঘুম আসে নি। বনের রাত্রির স্তব্ধতা বড় বিচিত্র। সারা অরণ্য জুড়ে ঝিঁঝির ডাক, বনজোড়া অন্ধকারের মধ্যে একটা বন-জোড়া নিরবচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহ বেয়ে যায়। অন্ধকারই যেন গুনগুন করে কাঁদে, নয়তো অবিরাম মৃদু তরঙ্গে হাসে। নয়তো ঘুঙুর পরে নাচে। তার আর উঁচুনীচু পর্দা নেই, একটানা—এক পর্দায়। মধ্যে মধ্যে নিশাচর পাখি ডাকে। কোন পাখি হা-হা করে হাসে, কোন পাখির বাচ্চারা চেঁচায়—যেন কাঁদে। প্রহরে প্রহরে প্যাঁচাদের সমবেত ডাক ওঠে। শেয়ালেরা ডেকে ওঠে। মধ্যে মধ্যে হৌ-হৌ, নেকড়েরা ডাকে। বড় খ্যাঁকশেয়ালী খ্যাক-খ্যাক শব্দ করে ডাকে। দূরে শম্বরেরা ডাকে। সারারাত্রির মধ্যে বার তিনেক বড বাঘের গর্জনও শুনেছে দলু।

তারই মধ্যে পথশ্রান্ত ছেলে-মেয়েরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে ; কোন উদ্বেগ হয় নি, আতঙ্ক হয় নি। জঙ্গল মহলের বাসিন্দা তারা, এসবের কিছুই তাদের কাছে নতুন নয়। রাজাদের বাসস্থান মাত্র একটা বড় গ্রাম। একটা মাটি ও পাথরের পাঁচিলের মধ্যে গড়, সেই গড়ের মধ্যে রাজবাড়ি। দু-চারখানা পাকা ছাদের দালান, বাকি সবই মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, পোক্ত শালকাঠের কাঠামো। শালকাঠ এখানে প্রচুর। শালকাঠের দেওয়াল, মেঝে ঘরেও আছে কিছু কিছু। গড়ের বাইরে গ্রাম। দু-চার, বড়জোড় ন-দশখানা দোকান ; আর থাকে একটা হাট। হাটগুলো বড় হয়। গ্রামের আশপাশ থেকেই জঙ্গল শুরু। গ্রামের বাসিন্দারা প্রকৃতপক্ষে বনের মধ্যেই শুয়ে থাকে, ঘুমোয়, বাস করে। কিছু কিছু চাষের জমি থাকে। তার চারিদিকেও অরণ্য।

নবাবী সেরেস্তায় অঞ্চলটার নামই জঙ্গল মহল। আর বাগ্দীদের বসবাস বলে একটা পরগণার নামই হয়ে গেছে বাগড়ী পরগণা।

পাইক বাগ্দীদের ছেলে-মেয়েরা পুরুষ বৃদ্ধ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে। ঘুমোয় নি কেবল যারা পালা করে পাহারা দিচ্ছিল তারা। আর ঘেরার মধ্যে প্রসবযন্ত্রণাকাতর রুক্মিণী, তার দুই পাশে অম্বিকা বাগ্দিনী ও দলুইয়ের বিধবা বোন অহল্যা আর দাইয়ের কাজ জানা মাসী। দলুই চোলাই মদ খেয়েছে, আর কল্কেতে সেজে শুখা তামাক টেনেছে। তার সঙ্গে শুধু ভেবেছে —রুক্মিণী যদি মরে যায়? হে ভগবান, হে গোবিনজী, হে কিষণজী, হে রাম! তার গোবিন্দ-কিষণজী তার সঙ্গেই আছে। তাকে সে ভুলে আসে নি। সারাটা পথ সেই চন্দনগড় থেকেই

সে বলতে বলতে আসছে, তুমি শেষে এই করলে কিষণজী! এই তোমার মনে ছিল গোবিনজী! সে সব কথা আজ এই খবর শুনে যেন নতুন করে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সেদিন সে ভেবেছিল—হায় কপাল! এককালের শোলাঙ্কী রাজপুত তারা। তাদের দেবতা শিব আর কিষণজী। বীরসিংহে তাদের শিব এখনও আছেন। মহারাজ বীরসিংহের বংশ তারা। তারা বারভাইয়া শুল্কি। মহারাজার রাজ্যে সেনাপতি মন্ত্রী নিয়ে ছিল বাহাত্তরজন রাজপুত, তাদের বংশধরেরা বাহাত্তর-ঘরি, বাকি পল্টনের লোক সাধারণ রাজপুত। তারা দশাশই। দলুইয়ের পিতামহ জ্ঞাতি এবং পাইকদের নিয়ে বাস করত তখন আর এক জঙ্গলের মধ্যে—বীনপুরের থেকেও পাঁচকোশ দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটি গ্রামে। একটা ছোট নদী ওখান থেকে গিয়ে মিশেছিল কাঁসাইয়ে। সেই ছোট নদীর ধারে; অঞ্চলটা ঘন বনের অঞ্চল। তারা রাজপুত দশ বারো ঘর ছাড়া বাগ্দীরা ছিল প্রায় শ'দুয়েক ঘর। তার পিতামহ ছিলেন সকলের মালিক। তার পর তাঁর এক ছেলে—ছেলে মারা গেল জোয়ান বয়সে তিন ছেলে রেখে। এই তিন ছেলেকে মানুষ করেছিলেন সেই বৃদ্ধ বীর ভূপৎ সিং। তিন তিন নাতির মধ্যে ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিলেন পাইকদের মালিকানি স্বত্ব। দলুই ছিল পঁচিশ ঘরের সর্দার। পঁচিশ ঘর মানে—একশো পঁচিশ ত্রিশ বাগ্দী পাইক। পঞ্চাশ বছরের বাপ—তার দুই তিন ছেলে। বত্রিশ থেকে বাইশ। তাদের সঙ্গে বড় ছেলের ছেলে চোদ্দ-পনের বছরের। আবার যার বয়স ষাট-বাষট্টি—তার ছেলের বয়স বিয়াল্লিশ চল্লিশ থেকে ছোটর বয়স বত্রিশ। তার ঘরে বাইশ থেকে পনের-ষোল বছরের ছয় সাত নাতি। বাগ্দী পাইকের ছেলে, চুয়ার পাইকের ছেলে বারো বছর থেকে লড়াই শেখে। লাঠি, তীর, ধনুক, গুলতি, তলোয়ার, বর্শা চালাতে শেখে।

দলুর বড় ভাই গুণা সর্দার ছিল সবার উপরে মানুষ। গণপৎ আর দলপৎ তাদের নাম। ছোট ভাইয়ের নাম ছিল ধনপৎ—ধনা সর্দার। এরা ভগবান ছাড়া কারুর অধীন ছিল না। এই অরণ্যরাজ্যে আপন আপন সর্দারি নিয়ে বাস করত। কোন রাজার সঙ্গে কোন রাজার বিবাদ উপস্থিত হলে এরা সে সময় তাদের কাছে টাকা নিয়ে যুদ্ধ করত। মধ্যে মধ্যে বনে বনে দূরদুরান্তর গিয়ে চাষেবাসে সমৃদ্ধ সমতল গ্রামগুলি লুঠে ধান চাল টাকাকড়ি নিয়ে আসত, অনেক সময় হুকুমনামা পাঠাত—আমরা যাব, আমাদের জন্য যেন এই সব মাল মজুত থাকে। অনেক সময় ওদিকে উড়িষ্যা, এদিকে চন্দ্রকোণা সড়ক ধরে এগিয়ে যেত। যে সব মহাজন মাল নিয়ে যেত, তাদের কাছে কর আদায় করত। বাধা দিলে সব লুঠে নিত। নবাবী ফৌজের পিছনেও তারা লুঠেছে, পাঠান ফৌজেরও লুঠেছে। ছোটখাট ফৌজের দলের উপর এদের লোভ বেশি, আর তাদের সঙ্গে লড়াই করে আনন্দও বেশি। তাতে শুধু রসদই মেলে না, টাকাকড়িই মেলে না, তার সঙ্গে হাতিয়ার মেলে। এবং এইসব পেশাদার সিপাহীদের সঙ্গে লড়ে হারিয়ে গৌরবও অনুভব করে বেশি। লুটতরাজ করে এসে তাদের পিতামহের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরে জয়ধ্বনি দিত। থরথর করে গাছের মাথা কাঁপত। বনে বনে শব্দ ছুটে যেত দূরে-দূরান্তরে। ঘণ্টা বাজত দেবতার মন্দিরে—বলত খাজনা এসেছে তাদের রাজ্যের। ওদের বাড়িতেই ছিল ওদের ঠাকুর। উপবীত ত্যাগ করে ভিন্ন উপাধি নিয়েও

স্বধর্মের বীজটুকু ওরা হারায় নি। পৈতে ফেলেও ওরা কিষণজী গোবিনজী যোগমায়াকে ভোলে নি। পিতামহের ঠাকুর—গোপাল, কিষণজী আর মা যোগমায়া। ঠাকুরগুলি পাথরের। উড়িষ্যা থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন ওদের বাপ। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পিতামহ ভূপৎ সিং। তাদের তিন ভাইকে ভাগও করে দিয়েছিলেন ওই তিনি—ভূপৎ সিং—দলুর দাদ্দো অর্থাৎ পিতামহ। বড় নাতিকে তিরিশ ঘর, মেজকে পঁচিশ ঘর, ছোটকে বিশ ঘর পাইক যেমন দিয়েছিলেন তেমনি দিয়েছিলেন তিন ঠাকুর তিন জনকে। গোপাল তাদের প্রথম ঠাকুর, পেয়েছিল গণপৎ, দলপৎ পেয়েছিল কিষণজী, ধনপৎকে দিয়েছিলেন যোগমায়ার সেবা।

তিন ভাই বিপদে এক হলেও অন্য সময়ে ছিল পরস্পরের বিরোধী। কত প্রতিযোগিতা চলত দেবসেবার সমারোহ নিয়ে। তা ছাড়া ছোটখাটো ঝগড়া তো ছিলই।

দলুর কন্যাভাগ্যে কিষণজী যেন জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন। সাত আট বছর বয়স থেকে 'ফিরানি' কাপড় (গামছার আকারের) কোমরে জড়িয়ে গায়ে একটা কাঁচুলি পরে কিষণজীর মন্দির-অঙ্গন পরিষ্কার করত, পূজার ফুল তুলত, সন্ধ্যার সময় হাতে তালি দিয়ে নাচত। মাঝে-মধ্যে সন্ন্যাসী সাধু আসতেন। অরণ্যভূমের শুক্রী যাদের দেহের ভিতরে রাজপুতানার শোলাঙ্কী রাজপুতের রক্ত, তাদের ঘরের মেয়েরা খেলতে খেলতে চলে যেত বনের মধ্যে। তখন থেকেই বনকে চিনত। বনের মধ্যে যে রহস্যময়ী প্রকৃতি আছে—যার বিচিত্র রূপ, যার এক অঙ্গে ফুলের হার ফুলের কঙ্কন, সে অঙ্গের পরনে গাছের বাকল, পাতার পাড়, লতার বালা, সেদিকের হাতের বীণায় বাজে পাখির গান, ঝরনার শব্দ—তার অন্য অঙ্গের দিকে তাকালে শিউরে উঠতে হয়। অন্য অঙ্গে ফুলের হারের আধখানা হয়েছে সাপের হার। সেদিকের হাতে বৃশ্চিকের বাজুবন্ধ, প্রকোষ্ঠে হাড়ের কঙ্কন, হাতের আঙুলে বাঘের নখ। সে হাতে আছে ভয়াল শিঙা, তাতে ফুঁ দিলে জাগে বাঘের ডাক, হাতীর গর্জন। সেদিকের অঙ্গে পরনে আছে বাঘের ছাল—তাতে অজগরের চামড়ার পাড় বসানো। বনের ঠাকুরাণীর একদিকের ঠোঁটে হাসি, অন্যদিকে ক্রোধ হিংসা। একদিকের মুখে খায় মধু—অন্যদিকের মুখে ওগরায় বিষ। এ প্রকৃতিকে বনের মেয়ে চেনে। বনের মেয়ে, তার উপর শুক্রীর মেয়ে, তাকে সে ভয় করে না। ছেলেবেলা থেকে তার সঙ্গে মিতালি তার। চলে যেত বনে ফুল তুলতে, চলে যেত ফলের সন্ধানে, চলে যেত সজারুর কাঁটা খুঁজতে। পাখি দেখতে। সঙ্গে থাকত বাগ্দিনী সঙ্গিনীরা। একবার বনের মধ্যে গাছতলায় এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে তাকে হাতের ফুলগুলি দিয়ে জোড় করে বলেছিল, সাধুজী, আমাদের বাড়িতে কিষণজীর মন্দিরে সেবা লিবেন আসুন।

সন্ন্যাসী এই মেয়েটির অনুরোধ আর কিষণজীর নাম—এ ঠেলতে পারেন নি। এসেছিলেন। কিষণজীকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করে বলেছিলেন, ক্যা নয়া খেল খেলনে কো লিয়ে ইয়ে বনমে ফিন বনবিহারী বন্ গিয়া রে খেল্‌নেওয়ালা। বড়া বদ্‌মাস হো তুম—বড়া বদ্‌মাস। ইয়ে লেড়কী কি বন্ধনমে গির গ্যয়া ? অাঁ ?

যাবার সময় বলেছিলেন, সর্দার, শুনো বেটা। ইয়ে লেড়কী তুমহারা বহত ভাগ্‌মানী হায়, কিষণজীকে পিয়ারী হায়। ইয়ে তো বাবা রাণী বনেগী, রাজমাতা হোগী। ইন্‌কি কভি

কুছ খারাব নেহি বোল্না। কভি না। হাঁ! তোমারা কুল, বন্‌শ্ উজ্ঝালা কর্ দেগি।

সেই অবধি দলু মেয়েকে কিছু বলে নি। বলত না কখনই। স্ত্রী মেয়েকে দু বছরের রেখে মারা গিয়েছিল, কিন্তু সে আর বিয়ে করে নি। তা বলে সে ব্রহ্মচারী ছিল না। অরণ্য জীবনে দুর্বার মোহ আছে। সেই মোহবশে তার তখন তিন-চারটি সেবিকা। তারা বলে 'রাখনি'। তার মধ্যে দুটো ছিল লুঠে আনা মেয়ে। আর এই অম্বিকে বাগ্দিনী। বালবিধবা অম্বিকেকে সে প্রথম যৌবনে স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভালবেসে ঘরে এনেছিল। অম্বিকেই মানুষ করত রুক্মিণীকে।

রুক্মিণীর আদর ছিল যথেষ্ট। সে আদর আরও বাড়ল সাধুজীর কথায়। সে কিষণজীকে নিয়ে প্রায় খেলা শুরু করে দিলে। মধ্যে মধ্যে বাপকে বলত, বাবুজী, আজ কিষণজী এই মিঠাই খেতে চেয়েছে। দলু বিশ্বাস করত এবং সেই মিষ্টি যোগাড় করে ভোগ দিত। এমনি নানানতর কথা বলত রুক্মিণী।

একবার সে বললে, বাবুজী, কিষণজী বলেছেন তুই নাচ শেখ রুক্মিণী, তোর নাচ আমি দেখতে ভালবাসি। গীত তুই ভালই গাস। আমি নাচ শিখব বাবা।

দলু সর্দার তাও অবিশ্বাস করে নি। অনেক ভেবেচিন্তে বিষ্ণুপুরের দরবারে গিয়ে সেখান থেকে নিয়ে এসেছিল নাচিয়ে এক প্রৌঢ়া বাঈকে। নিয়ে আসা ঠিক নয়, প্রায় চুরি ডাকাতি করে এনেছিল। পাণ্ডা সেজে গিয়ে বলেছিল, আমি আসছি পুরী থেকে। মহাপ্রভুর বড় ইচ্ছা তোমার নাচ দেখেন। অবিশ্বাস করো না। তোমার টাকা অলঙ্কারের ভয় তুমি করো না। তুমি শুধু চল, একটি অলঙ্কার নেবে না, একটি পয়সা নেবে না, সব আমাকে দিতে হুকুম হয়েছে। ভেবে দেখ, তোমার যৌবন গেছে, রাজদরবার তোমাকে ডাকে না, যারা রূপ যৌবন বিলাসী, তারা তোমার দিকে তাকায় না। সুতরাং কোন লোভে আমি আসি নি। দেবতার হুকুমে এসেছি।

প্রৌঢ়া অবিশ্বাস করে নি। সে সানন্দে রাজী হয়েছিল। দলু বলেছিল, কিন্তু একলা যেতে হবে। আমি তোমাকে ডুলি করে নিয়ে যাব।

শহরের বাইরে তার দল ছিল, ডুলি ছিল। সকলেই পুরীর লোক সেজেছিল। তারপর নিয়ে এসে তুলেছিল তাদের অরণ্যের আস্তানায়। সেখানে কিষণজীর মন্দিরের সামনে তাকে নামিয়ে বলেছিল, ইনিই মহাপ্রভু। যিনি জগন্নাথ তিনিই কিষণজী। এঁর আদেশেই আমি গিয়েছিলাম। রুক্মিণীকে কাছে এনে দেখিয়ে সকল বৃত্তান্ত বলেছিল শপথ নিয়ে। তারপর বলেছিল, রুক্মিণীকে আমার নাচ শিখিয়ে দাও বাঈ। আমি তোমাকে বলছি তুমি আমার মা, আমি তোমাকে ছেলের মত রক্ষা করব, যত্ন করব, আর নাচ শেখানো হলে আমি নিজে তোমাকে পুরীতে নীলমাধব দর্শন করিয়ে আনব।

সে কথা সে রেখেছিল। এককালের নামকরা লাস্যময়ী সরস্বতী বাঈ যে যৌবনে লাস্য ও রূপের জন্যে নাম পেয়েছিল সুরতিয়াবাঈ, সে প্রৌঢ়া বয়সে এখানে ওই কিষণজীর সামনে রুক্মিণী বেটিয়াকে নাচ গান শেখাতে এসে বদলে গিয়েছিল। এবং পুরী যাবার সময় বলেছিল, সর্দার বাপুজী, তোমাকে, তোমার বেটীকে আমার বহুৎ বহুৎ আশীর্বাদ দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা

আমাকে ওই নাগরের প্রসাদ দেওয়ালে। আমার জিন্দগী সফল হয়ে গেল। ধন্য তোমার বেটী। তবে তোমার বেটীকে আমি শুধু নাচ আর গান শেখাই নি, আরও অনেক দিয়েছি। ও যদি কোন রাজার সামনে দাঁড়ায় তবু ঠকবে না। ওই নাগরের সামনে দাঁড়াবার মূলধন—সে ওর আছে। তাই ও আমাকে দিয়েছে।

রুক্মিণী সত্যসত্যই আশ্চর্য কন্যা হয়ে উঠেছিল। লাস্যে হাস্যে বাক্‌চাতুরীতে সুরতিয়াবাঈ বলতে গেলে ওকে নাগরী করে তুলেছিল। মুখে মুখে উর্দু গান বয়েৎ মুখস্থ করিয়েছিল।

রুক্মিণীর বয়স যখন ষোল তখন বিয়ের সমস্যায় দলু সর্দার খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। একে তারা শুক্রী তার উপর দলুরা বনে বাস করে অরণ্যের মানুষ হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে নিজের জাত ছাড়া কারুর সঙ্গে চল নেই। এ মেয়ে দেবে কার হাতে? নিজেদের জ্ঞাতির মধ্যে তারা আবার বারোভাইয়া; জানাশোনা বারোভাইয়া যারা তাদের ঘর খোঁজ করে কোন ছেলেকেই পছন্দ হচ্ছিল না তার। এমন সময় একদিন রুক্মিণী বললে, বাপ্‌!

—কি বেটী?

—তুমি আমার শাদির লেগে মাথা ঘামিয়ো না। আমার মন উঠছে না বাপ।

সাধুর কথা স্মরণ করেও দলু বলেছিল, কার হাতে তুকে দিয়ে যাব বেটী? আমি অমর লই। মরব তো একদিন।

—কেন বাপ্‌, ওই তো রয়েছে কিষণজী!

—তোর সঙ্গে কথা হয় বেটী?

—না বাপ্‌, আমি বলি, ও বলে না। তা বলাব একদিন। আর না বলে তোমার সর্দারী আমি করব।

—তুই আমার কাছে ঠিক বাত বলছিস না। কিষণজীর সঙ্গে বাত তোর হয়।

রুক্মিণী হেসে বলেছিল, না গো, বাপ্‌, আমি ঝুটা কেন বলব তোমাকে

তবু বিশ্বাস করে নি দলু। সে বিশ্বাস করেছিল তার মেয়ের সঙ্গে কিষণজী কথা কয়, সে তার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু হাজার হলেও বেটী, আর সে তার বাপ, লজ্জায় বলতে পারছে না।

অম্বিকাও তাকে তাই বলেছিল।

রুক্মিণী শুক্রীর মেয়ে, ছেলেবেলা থেকে অরণ্য জীবনের স্বভাবধর্মে আত্মরক্ষার জন্য তীর-ধনুক বর্শা ছুঁড়তে শিখেছিল। একটা বাজপাখি পুষেছিল। পাখিটা ছিল পক্ষিণী। ইচ্ছে করেই সে পুরুষ পাখি পোষে নি। বলেছিল, ওই একটা পুরুষ পুষেছি, তাকেই মানাতে পারছি না, আবার পুরুষ পোষে!

পাখিটা নিয়ে শিকার করতে যেত। তীরধনুক নিয়েও শিকার করত। আজ থেকে একুশ বছর আগে দোলের পর কিষণজীকে নিয়ে সে এবং তার সখী সম্প্রদায় মিলে গিয়েছিল বনভোজনে। তাদের গ্রাম থেকে ক্রোশখানেক দূরে ঝরনার ধারে বনভোজন। ঠাকুরকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে চলছিল তাদের নাচ গান। তামাশা রঙ্গ সব ওই দেবতাটিকে নিয়ে। এরই মধ্যে হঠাৎ তার বাজপক্ষিণী—সেটা ছিল একটা গাছের ডালে বাঁধা, সেটা উড়বার জন্য ঝটপট করে সারা হয়েছিল। কি হল তারা প্রথমে বুঝতে পারে নি। হঠাৎ এক

সখী আকাশের পানে তাকিয়ে বলেছিল, হুই দেখ সর্দার বেটি, হুই দেখ বলে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

—কি? কি?

—হুই! হুই! দেখ আকাশের পানে চেঁয়ে। হুই সাদা পারা—হুই উড়ছে—ছুটছে গ!

দেখছিল তারা। এবং বুঝতে পেরেছিল আর একটা বাজপাখি উড়ে চলেছে ঠিক সাদা হাউইয়ের মত। আর প্রাণভয়ে উড়ে পালাচ্ছিল একটা সারস।

মেয়েটা তখনও হাসছে। মেয়েটার নাম মেনী, ভাল নাম মেনকা।

—এতে হাসছিস ক্যানে?

বলে সে খুলে দিয়েছিল নিজের বাজকে। পক্ষিণীর নাম ছিল বাঁট্‌লী। অর্থাৎ বাঁটুলের নারী নাম।

পাখিটা ঝটকা মেরে আকাশে উড়েছিল এবং তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করেছিল। বাজপাখি শিকারের সময় ডাকে না। সে নিঃশব্দে যায়।

রুক্মিণী আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, মর্‌—ডাকিস কেন? খুব তো তাগদের গুমোর দেখি!

মেনী আবার হেসে বলেছিল, ডাকবে নাই? পরাণ বলে আনচান করছে উয়ার। উটা মরদ লাগছে গ—সর্দার বেটী।

কথাটা মিথ্যা নয়। ওরা তাকিয়ে দেখতে দেখতেই দেখলে, বাঁট্‌লী আকাশে উঠতেই সেই বাজটা শিকার ছেড়ে বোঁ করে পাক দিয়ে একেবারে নিচের দিকে মুখ করে পাখা গুটিয়ে নিজেকে ছেড়ে দিলে, পড়তে লাগল রাত্রির আকাশ থেকে খসা তারার মত। তারপর মেলল পাখা। তখন তার থেকে আর মাত্র খানিকটা দূরে বাঁট্‌লী উড়ছে। বাঁট্‌লীও বাজপাখি। সেও বাজপাখির বিচিত্র ওড়ার কৌশল দেখিয়ে বাজকে নিচে রেখে উঠল উপরে। বাজও উঠল। বাঁট্‌লী পাশ কাটাল। বাজও বেঁকল। বাঁট্‌লী আবার ঘুরল। শূন্য মণ্ডলে সে যেন চোর ধরাধরি খেলা। বাজটাকে বাঁট্‌লী প্রায় নাজেহাল করে রাগিয়ে দিয়েছে। সে বিপুল বিক্রমে এবার যেন আক্রোশভরে তার দিকে ছুটল। বাঁট্‌লী কিন্তু আরও চতুরা—সে এবার সাঁ সাঁ করে আকাশ থেকে নামতে লাগল পাখা গুটিয়ে ছোঁ মারার ভঙ্গিতে। তারপর পাখা মেলে এসে বসল যে ডালটিতে সে বসেছিল সেই ডালে। বসেই দিল আর একটা ডাক। দেখতে দেখতে বাজটা এসে ঝপ করে বসল পাশে। বাজটা বড়। পুরুষ কিনা। পায়ে মলের মত সোনার গোল মল পরানো।

এবার সব সখিরা মিলে কলরব করে হেসে উঠল। তাই তো, একি? মেনী বলেছিল, মরণ! কাকে নিয়া আলি ল! অ বাঁট্‌লী!

রুক্মিণীও হেসেছিল এবার। সে বলেছিল, দে লো, বাঁট্‌লীর বর এসেছে, ওকে খেতে দে।

সাধ হয়েছিল ওকে ধরবে। ভাল জাতের বাজ আর খুব শিক্ষিত বাজ। তাকে খেতে দিয়েছিল দুধের বাটি। সর চিনি। তা ছাড়া মাংসও ছিল। হরিণের মাংস।

শোলাঙ্কী রাজপুত শুক্লী হয়েছে, পেশায় যুদ্ধব্যবসায়ী। বহু বাগ্দী পাইকের মালিক। ওরা উপাসনায় কিষণজীর উপাসক হলেও মাংস খায়, হরিণ শিকার করে, বুনো বরা মারে। তবে

কিষণজীর ভোগে তা দেয় না।

এখানেও হরিণের মাংস আলাদা রান্না হচ্ছিল, বাগ্দীদের মেয়েরা খাবে। খাবার সময় হতে হতে ছোট ছোট বাচ্চারা আসবে, তারাও খাবে।

মাংস খেতে দিয়ে সে একজন বাগ্দিনীকে পাঠিয়েছিল একটা ভালুকের বাচ্চা-রাখা খুব শক্ত লোহার খাঁচা আছে সেটা আনতে। ঠিক করেছিল খাঁচার ভিতর খাবার দিয়ে আগে ডাকবে বাট্লীকে। বাট্লী তার ডাকে ঠিক এসে ঢুকবে খাঁচায়, তখন তার পিছন পিছন বাজটাও ঢুকবে। বন্দী হয়ে যাবে পুরুষ।

কৌতুকে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল তার মন।

সে গান গাইতে লেগেছিল—রে কানাইয়া, আজ সব সখিরা মিলে তোকে ঘিরে বন্দী করব। আঁচলের পাকে পাকে বাঁধব। হাতের বাঁধনে বাঁধব। বাঁধব তোর গলা, বাঁধব তোর দুই হাত, বাঁধব তোর দুই পা। আমার ঠোঁটে রাখব তোর ঠোঁট। দেখি, তুই পালাস কেমন করে।

এরই মধ্যে কখন যে একজন ঘোড়সওয়ার এসে সামনে ঝরনাটা যেখান থেকে ঝরছে সেই উঁচু পাথরের মাথায় দাঁড়িয়েছে তা কেউ দেখে নি। ঝরনা ঝরার শব্দের মধ্যে ঝরনাটার পিছন দিকে ওঠা ঘোড়ার খুরের শব্দও পায়নি তারা। যখন দেখল তখন তারা অবাক হয়ে গেল।

মাথায় পাগড়ি, পরনে চুস্ত পাজামা, গায়ে লম্বা পাঞ্জাবি চাদরের বেড় দিয়ে বাঁধা। পিঠে তূণ বর্শা। কোমরে তলোয়ার। রেকাবের উপর পায়ের নাগরা জুতো ঝক্‌ঝক্ করছে; কোন সম্ভ্রান্ত লোক এবং হিন্দু। মুসলমান নয়।

রুক্মিণীর দল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এমন এক অপরিচিতের আবির্ভাবে। আবার খিলখিল করে হেসে উঠেছিল সেই মেনী। স্তব্ধতা ভঙ্গ হয়েছিল।

অপরিচিত বিশিষ্ট জনটি মেনীকে বলেছিলেন, হাসছ কেন?

—হাসব নাই! আপনি এলেন—কাঁদতে পারি?

রুক্মিণী এবার সংযত হয়ে এগিয়ে গিয়ে রাজকীয় ঢঙে সেলাম করে বলেছিল, জনাব, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি কোন মুলুকের মালিক। রইস আদমী। আপনি কে? আমরা এখানে মেয়েরা কিষণজীকে নিয়ে বনভোজনে এসেছি। শুধু মেয়েরা। এখানে আপনি?

তিনি বলেছিলেন, আমার হাউয়ের সন্ধানে এসেছি। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন বাজটাকে। হেসে বলেছিলেন, একটা সারস দেখে ওকে ছাড়লাম। ও উঠল। হঠাৎ দেখলাম আর একটা বাজ। ভাবলাম, বাজে বাজে শিকার নিয়ে লড়াই বাধবে। তারপর দেখলাম এই বাজটা ঘুরপাক খেয়ে নেমে পড়ল। আমার হাউইও তার পিছু পিছু ধাওয়া করে নেমে পড়ল এই বড় গাছটার কোলে। গাছটাকে নিশানা করে এখানে এসে দেখছি তোমরা নাচে গানে এমন মত্ত যে আমার ঘোড়ার খুরের শব্দও কানে গেল না। পরে বুঝলাম, ঝরনার শব্দের জন্য শুনতে পাও নি। কিন্তু খুব আনন্দে মত্ত ছিলে দেবতার সম্মুখে,

আমি সাড়া দিই নি। ভালও লাগছিল।

রুক্মিণী বলেছিল, তাহলে মেহেরবাণী করে আসুন, নেমে আসুন। নিয়ে যান আপনার বাজ।

নেমে এসেছিলেন তিনি। রুক্মিণী তাকে বসিয়ে বলেছিল, আপনার বাজকে আমরা খাইয়েছি দুধ, সর, মাংস। আপনি কিছু খান। দেবতার প্রসাদ।

তিনি বলেছিলেন, কি জাত? এদের তো দেখে মনে হয় বাগ্দী। তুমি? তুমি তো তা নও! চেহারাতেও পৃথক, তা ছাড়া এমন সহবতের কথা তো বাগ্দী মেয়ের নয়!

রুক্মিণী বলেছিল, আমি শুক্লী রাজপুতের মেয়ে। এরা বাগ্দীর মেয়েই বটে। সহবতের কথা? আমার বাবা এক বাঈকে এনে রেখেছিলেন, তার কাছে শিখেছি। বিষ্ণুপুরের সুরতিয়াবাঈ।

—হাঁ হাঁ, শুনেছি বটে। সুরতিয়াবাঈ পাকা চুল ভাঙা গলা নিয়ে জগন্নাথ গিয়েছিল। বিষ্ণুপুর থেকে পুরী পৌঁছতে তার তিন বছর লেগেছিল। লোকে বলে, বনের ভিতর কোথায় সে তপস্যা করছিল। পুরীতে যখন গান গাইত তখন তার দুই চোখে ধারা বইত।

—দু বছর সাত মাস তিনি আমাদের এখানে ছিলেন, আমাকেই শেখাতেন নাচ গান সহবত।

—তোমার নাম কি?

রুক্মিণী কুর্নিশ করে বলেছিল, জনাব আলি, আপনি রইস আদমী; তমিবৎ সহবতের রাজা। আপনিই ফরমাস করুন, আমি কুমারী মেয়ে আপনার নাম আপনার পরিচয় না পেলে কি করে আমার নাম বলব?

—চন্দনগড়ের নাম তো জান?

সঙ্গে সঙ্গে নত হয়ে প্রণাম করেছিল রুক্মিণী। তারপর সখীদের বলেছিল, প্রণাম কর, প্রণাম কর।

তারা সার বেঁধে নত হয়ে প্রণাম করেছিল।

তিনি হেসে হাত তুলে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, আমার নাম মাধব সিং।

—আমি জানি জনাব আলি, মালিক বাহাদুর! আমি বোকা, হাজার হলেও বুনো মেয়ে। দেখেই আমার অনুমান করা উচিত ছিল। অন্তত কপালের ওই দাগটা দেখে বোঝা উচিত ছিল। ষোল বছর বয়সে শুধু তলোয়ার নিয়ে একটা শেরকে মেরেছিলেন। তখন শেরের নখ বসেছিল আপনার কপালে। এটা মুলুকের সবাই জানে।

—হাঁ, দাগটা আমার চিহ্ন বটে।

রুক্মিণী বলেছিল, আমার নাম এবার বলি—

বাধা দিয়ে মাধব সিং বলেছিলেন—বলতে হবে না। আমি বোকা নই। তোমার নাম রাধা। অন্তত এই নামটা আমি দিলাম।

সেলাম করে রুক্মিণী বলেছিল, না মালিক, আমার নাম রুক্মিণী।

—ওই হল। দুয়ে তফাৎ কি?

—আমার গোস্তাকী মাফ হয় মালিক ; তুইই কিষণজীর প্রিয়তমা হলেও রাধাকে তিনি ছেড়ে পালিয়েছিলেন, দুখ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া রাধার অনেক কলঙ্ক। আমি দুখও চাই না, কলঙ্কও আমার সইবে না। রাধা গোয়ালিন, আমি রাজপুত্তিন।

—সাবাস, সাবাস, সাবাস রুক্মিণী। আমি বোকাই বটে।

সখীরা অবাক হয়ে রুক্মিণীর এই বাক্‌চাতুরি শুনছিল। তাদের সঙ্গে যে রুক্মিণী হাসে খেলে নাচে গায় এ তো সে নয়!

রুক্মিণী বার বার অভিবাদন করেছিল।

এই সময়ে এসেছিল খাঁচাটা। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ওটা কি হবে?

এবার চন্দনগড়ের রাজা—লড়াইয়ে যাকে লোকে বলে রুস্তম, সেই রুস্তম, মাধব সিং সম্মুখে জেনেও মেনী আবার হাসতে শুরু করেছিল।

রাজা বলেছিলেন, তুমি বড় হাস। হাসছ কেন?

মেনী ভয় পেয়ে বলেছিল, আপনি রাজা সাহেব, আমি ছোট বাগ্দীর বেটী, হাসি আমার রোগ বটে। দাঁতগুলান দুশমনের হাড়ে বিধাতা গড়ে বসায়ে দিয়েছে, ঠাঁই বাছে না, মানুষ বাছে না, বেরায়ে পড়ে।

—না না, তুমি হাস। ভাল লাগছে তোমার হাসি। কিন্তু হাসছো কেন?

—হুজুর, আপনি নিজে বললেন, আপনি বোকা। তা খানিক বটেন। খাঁচা আপনার হইটাকে বন্দী করবার তরে—

হেসে রাজা বললেন, ওকে বন্দী করবে কে? ধরে পুরবে কে?

—আমাদের বাঁটুলি। সে দেখিয়ে দিয়েছিল রুক্মিণীর বাজকে।

—আচ্ছা!

—উটা মেয়ে বটে হুজুর!

—ও! তা আর তো হবে না। আচ্ছা, একটা বাজ আমি তোমাদের দেব।

—উটাই লিব। দেখেন। লেন, আপুনি ডেকে লেন আপনার হইকে। বলেই বলেছিল, দাঁড়ান। তারপর খাঁচার দোর খুলে রুক্মিণীকে বলেছিল, লাও গো সর্দার বেটী, লাও, ভর তোমার বাঁট্‌লীকে খাঁচাতে, ডাক তুড়ি দিয়া। রাজা হুজুরকে ভেল্কিটা দেখায়ে দাও।

রুক্মিণীরও কৌতুকের সীমা ছিল না। সে বলেছিল, আপনি হুকুম দিলেন তো?

রাজাও কৌতুকভরে বলেছিলেন, দিলাম।

খাঁচার ভিতর বাঁট্‌লীর প্রিয় খাদ্য সর গুড় আর মাংস দিয়ে রুক্মিণী তুড়ি দিয়ে ডেকেছিল, বাঁট্‌লী, আয় আয়—বাঁট্‌লী—

বাঁট্‌লী একবার অপাঙ্গে হাউইয়ের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় তাকে ইঙ্গিত করেই মাটিতে নেমে পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে খাঁচার দরজার মুখে মুখ পুরেছিল। ওদিকে হাউই চঞ্চল হয়েছে। রাজা তাকে ডাকলেন, হাউই, হাউই, এই, আয় আয়। কিন্তু হাউই তাঁর কথা শুনল না, সেও পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে বড় খাঁচাটার মধ্যে বাঁটলীকে অনুসরণ করে ঢুকে বসল।

সব মেয়েরা এবার খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

রাজা সেদিন সারাদিন থাকলেন। গান শুনলেন, নাচ দেখলেন। রুক্মিণীর সঙ্গে আলাপ করলেন। প্রসাদও খেলেন।

যাবার সময় রুক্মিণী খাঁচাটা তাঁর হাতে দিয়ে বললে, মালিক বাহাদুর, আপনি রাজা, আমি গরীব শুক্রীর মেয়ে, এককালে আমরাও ছিলাম শোলাঙ্কী রাজপুত। আজ আপদ্ধর্মে শুধু শুক্রী। বনে বাস করি। আমরা বনেই স্বাধীন হয়ে আছি। পৈতে নেই। আপনি তবু আমার ঠাকুরের প্রসাদ খেলেন, এ খাঁচা আপনাকে আমার নজরানা। বাঁটলীকে শুদ্ধ নিয়ে যান।

রাজা বলেছিলেন, ও নজরানায় তো মন ভরল না আমার।

—আর কি আছে আমার মালিক?

রাজা বলেছিলেন, ওই যে কিষণজী, তুমি তাঁর সেবিকা। আমি তাঁর সেবক। আমার নামও মাধব সিং। রুক্মিণী, যদি তোমাকে আমি তোমার বাঁটলীর সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই?

চুপ করে ছিল রুক্মিণী। সে ভাবছিল। সেকালে রাজাদের উপপত্নী রাখার কথা সে জানে। সমাজে দেশে সেটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু সেটা আভিজাত্যের লক্ষণ। কিন্তু সে বারোভাইয়া শুক্রী সর্দারের মেয়ে—ছেলেবয়স থেকে এ সময় পর্যন্ত কিষণজীকে ভজনা করে এবং ওই সুরতিয়াবাঈয়ের কাছ থেকে রাজপুতানার গল্প শুনে এমনই একটি মন পেয়েছে, ভাবনা পেয়েছে, যাতে সে উপপত্নী হতে ঘৃণা বোধ করে।

—কি ভাবছ রুক্মিণী?

সে হাত জোড় করে বলেছিল, রাজা সাহেব, রুক্মিণী মাধবের গুণ শুনেই অনেক আগে থেকে মুগ্ধ। তবে সে তাকে কামনা করতে সাহস করে নি। মাধব যখন তাকে কামনা করেছেন তখন তার থেকে বড় ভাগ্য আর কি হতে পারে?

রাজা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রুক্মিণী হাত সরিয়ে নিয়ে বলেছিল, তবু একটা কথা সে বলবে। উত্তর শুনবে।

—বল।

— রুক্মিনীর মাধবের কাছে মিনতি তাঁর চরণের দাসী যে হবে সে রুক্মিণী নাম নিয়েই হবে তো?

রাজা তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। উত্তর দিতে পারেন নি।

রুক্মিণীই বলেছিল, সত্যভামা জাম্ববতী ষোলশো মহিষী মাধবের ছিল। রুক্মিণীর তাতে তো বলবার কিছু নেই। কিন্তু সে তো নাম পাল্টাতে পারবে না হুজুর। রাধা ভাগ্য আমি চাই না রাজাবাহাদুর। তার থেকে আমি মীরাবাঈয়ের পথ ধরব।

রাজা তাকে বলেছিলেন, তুমি রুক্মিণী হয়েই যাবে রুক্মিণী।

রাজা মাধব সিং শুধু রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বীর, বড় শিকারী, দুর্দান্ত সাহসী। আর একটা কথা চলিত হয়েছিল যেটা লোকের মুখে মুখে চলে। সেটা হল—মরদ কি বাত

হাতীকা দাঁত। মর্দানী মাধব সিংকা—বাত দেতা তো জান দেতা। বাত কি খিলাপ কভি নেহি হোতা।

তিনি বিয়ে করেই নিয়ে গিয়েছিলেন রুক্মিণীকে। বাধা পড়েছিল অনেক। কিন্তু সে বাধা তিনি মানেন নি। মুর্শিদাবাদে তখন নবাব সুজাউদ্দীনের আমল। সুজাউদ্দীন যখন উড়িষ্যা থেকে মুর্শিদাবাদে বসতে চলেছিলেন তখন মাধব সিং তাঁকে নজরানা পেষকষ পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু নিজে যান নি। তার কারণ তিনি বলেছিলেন, ছেলের সম্পত্তি যে কেড়ে নেয় সে বাদশাহী সনদে নবাব হয়েছে বলে নজরানা পাঠাচ্ছি, কিন্তু সেলাম দিতে যাব কেন? এমনই চরিত্রের লোক। সুতরাং যে কথা তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন রুক্মিণীকে, তা তিনি রেখেছিলেন।

রাজার আরও তিন বিয়ে ছিল। তিনটিই ছত্রি রাজার কন্যা। এ ছাড়াও উপপত্নী ছিল। উপপত্নীতে রাণীদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই সৈতে ছাড়া শোনাকী রাজপুত শুক্লী সর্দারের মেয়েকে বিবাহে তাদের প্রচণ্ড আপত্তি হয়েছিল। ছত্রি মনসবদার ব্রাহ্মণ দেওয়ান এবং অন্যান্য ছত্রিদেরও আপত্তি ছিল প্রবল। শেষ পর্যন্ত নতুন শুক্লী রাণীর জন্য আলাদা মহলের ব্যবস্থা করিয়ে তবে তারা সম্মতি দিয়েছিল। রাজা জেদ ছাড়েন নি। জেদ বজায় থেকেছিল কিন্তু বিয়েতে ছত্রি এবং ব্রাহ্মণেরা এসেই চলে গিয়েছিল সামান্য ফলমূল মিষ্টান্ন খেয়ে। বিয়ে হয়েছিল চন্দনগড়ে। দলু সর্দার কন্যা নিয়ে গিয়েছিল। তার ভাইরা যায় নি, ছেলে পাঠিয়েছিল। কিন্তু বাহাদুর-ঘড়িরা গিয়েছিল, দশাস্বীরাও গিয়েছিল। আর গিয়েছিল বাগদী পাইকরা।

বিয়ে হয়ে গেল। রাজা ভেবেছিলেন লড়াইয়ে তিনি জিতলেন। কিন্তু বিয়ের পর দেখলেন, না, তিনি জেতেন নি, লড়াই লেগে রয়েছে এবং প্রথম দফায় তিনি জিতেছেন একথা সত্য হলেও দ্বিতীয় দফার জন্য প্রতিপক্ষরা দস্তুরমত লড়াই সাজিয়ে রেখেছে। রাজা দেখলেন— আলাদা-মহলে বাস করার জন্য রুক্মিণী রাণীর মর্যাদা পাচ্ছে না।

মাধব সিং জেদী, দুর্দান্ত জেদী। কিন্তু তার থেকেও সমবেত জেদ আরও কঠিন, আরও শক্তিশালী।

গৃহদেবতা রাধামাধবের পুরোহিত বললে, পর্বে-পার্বণে রাণীদের কাজ আগের রাণারা করবেন। নতুন রাণীকে করতে দেব না—এ হতে পারে না।

অন্য রাণীরা, দেওয়ান এবং ছত্রিরা তাতে সায় দিলে। এদের মূল শক্তি মনসবদার সুচেত সিং—বড় রাণীর সহোদর।

রাজা কি করতেন তা বলা যায় না, কিন্তু রুক্মিণী এর সমাধান করলে। বললে, তুমি আমার কিষণজীকে এনে দাও, আমার এখানে তাঁকে স্থাপন কর। তাঁকে পূজো করলেই তোমার বংশের ঠাকুরকে পূজো করা হবে। আর এ সমস্যার সমাধানও তিনি করে দেবেন।

রাজা খুশী হলেন। তাই হোক। খবর পাঠিয়ে তিনি শ্বশুর দলু সর্দারকে আনিয়ে বললেন সমস্ত। তারপর বললেন, সর্দার, রুক্মিণীকে রক্ষা করতে একলা আমি। আমার ভয় হচ্ছে এরা কোন দিন—

হেসে বললেন, নিজের জন্যে ভাবি নে কোনদিন। কিন্তু রুক্মিণী?

রুক্মিণী বলেছিল, তার জন্যে তুমি ভেবো না রাজা। দ্বারকার কিষণজী দেহত্যাগের আগেই রুক্মিণী বৈকুণ্ঠে চলে গিয়েছিলেন।

দলু বলেছিল, তুমি রাজা, তবু আমার জামাই। আমাদের বহু পুরুষ আগে হারানো সম্মান তুমি দিলে রুক্মিণীকে বিয়ে করে। যদি কিছু বাসের জায়গা আমাদের দাও তবে আমার পৈতৃক পঁচিশ ঘর পাইক এখন চল্লিশ ঘর হয়েছে, তাতে মরদ পাইক এখন দুশোর উপর—তাদের নিয়ে এখানে আমি চলে আসি, বাস করি। কাজ করি। দুশো পাইকের জান থাকতে তোমাদের কেউ ছুঁতে পারবে না।

মাধব সিং সানন্দে মত দিয়ে বলেছিলেন, তুমি শ্বশুর, তোমার সঙ্গে বাপ বেটার সম্পর্ক হয়েছে। তোমাকে আমার প্রণাম। যাও, নিয়ে এস পাইকদের যত জলদি হয়।

ওদের কিস্তীর উত্তরে মাধব সিং ঘোড়া তুলে কিস্তীটাই শুধু ঢাকলেন না, তাঁর ফিলের মুখে উঠ-কিস্তী পড়ে গেল। মাসখানেকের মধ্যে চন্দনগড়ের পাশটায় যে জঙ্গলটা ছিল সেই জঙ্গল কেটে বসে গেল নতুন পাইকরা। চন্দনগড়ের শক্তিবৃদ্ধি হল। চল্লিশ ঘর নয়, এল ষাট ঘর। বাহাত্তর-ঘরিদের তাঁবে থেকে বিশ ঘর পাইক দলু সর্দারের দলভুক্ত হয়ে ষাট ঘরের তিনশো জোয়ান এসে নিজেরাই নিজেদের ঘরদোর সব গড়ে নিল।

তারপর হঠাৎ একদিন বিপদ বাধল আবার। ঠিক এক বছর পর মারাত্মক কিস্তী পড়ল। কটকের শাসনকর্তা সুজাউদ্দীনের জামাই রুস্তম জং-এর দরবার থেকে পত্র এল। মীর হবিব রুস্তম জং-এর দেওয়ান। সুজাউদ্দীনের ছেলে তকী খাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে নবাবের জামাই রুস্তম জং উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হয়েছে, মীর হবিব তার দেওয়ান। তিনি লিখেছেন পত্র: "সুবা বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সুবাদার মতোমন উল্‌মুল্ক সুজাউদ্দীন আসদ জং বাহাদুরের প্রতিনিধি উড়িষ্যার নায়েব নাজিম মহামান্য আমীর উলমুল্ক মুর্শিদকুলী রুস্তম জং বাহাদুরের আদেশক্রমে এই হুকুম-নামা চন্দনগড়ের রাজা বাহাদুর শ্রীযুত মাধব সিং সাহেবের উপর জারী হইতেছে। নায়েব নাজিম বাহাদুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে ইহা অকাট্য সাচ্চা খবর বলিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, আট নয় বৎসর পূর্বে এক গুক্রী সর্দার—দলপৎ গুক্রী বিষ্ণুপুর রাজদরবারের আশ্রিত এক সুরতিয়াবাঈকে ভুলাইয়া অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। এই শয়তান সর্দার অতি ব্যভিচারী এবং ডাকাতিই তার একমাত্র পেশা। এই সুরতিয়াবাঈ প্রথম জীবনে হিন্দু থাকিলেও বাঈ হইয়া সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সুরতিয়াবাঈকে যখন দলপৎ অপহরণ করে তখন তাহার সঙ্গে তাহার এক পালিতা বা আপন কন্যা ছিল। সেও পবিত্র ইসলামের আশ্রিতা মুসলমানী সুরতিয়ার কন্যা, সেও মুসলমানী। সেই কন্যা সুরতিয়ার মৃত্যুর পর হইতে দলপতের কাছে ছিল। সে তাহাকে কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এবং রাজা মাধব সিং সমস্ত জানিয়া বা না জানিয়া তাহাকে আপনার উপপত্নী করিয়া রাখিয়াছে। ইহার তুল্য ইসলামের অপমান কি হইতে পারে? সুতরাং নায়েব নাজিম বিচারক-শ্রেষ্ঠ রুস্তম জং-এর হুকুম, অবিলম্বে ওই কন্যাসহ রাজা মাধব সিং উড়িষ্যায় আসিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবেন। অথবা ওই কন্যাকে উপযুক্ত মর্যাদার সহিত নাজিমের মহলে পাঠাইয়া দিবেন।

অন্যথায় উড়িষ্যার নবাবী ফৌজ চন্দনগড় ভূমিসাৎ করিয়া ইসলামের অপমানের শোধ লইবে।"

রাজা মাধব সিং জ্বলে উঠেছিলেন। তবুও নিজের মর্যাদা, এবং রাজ্যের বিপদের দিকে লক্ষ্য রেখে পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলে দেন নি। উত্তরে নিজে হাতে পত্র লিখে দিয়েছিলেন। সংক্ষিপ্ত পত্র : "যাহার তরবারির শক্তি আছে, সঙ্গে বহু অনুচর আছে, তিনি খেয়ালমত আলোর রঙকে কালো বলিলে উত্তরে কোন দুর্বল মানুষ কোন প্রমাণ দিয়া প্রমাণ করিতে পারে না যে, আলো কালো নয়, আলো সাদা। যে অভিযোগ করা হইয়াছে—তাহা কোন শয়তান আমার এবং আমার বিবাহিতা পত্নীর অনিষ্ট কামনায় নায়েব নাজিমের দরবারে হাজির করিয়াছে। বিনা প্রমাণ প্রয়োগে বিচার করিতে পারেন একমাত্র ঈশ্বর, খোদাতায়লা। নায়েব নাজিম সূক্ষ্ম বিচারক ন্যায়বান হইলেও তিনি ঈশ্বর নহেন। সুতরাং প্রমাণ প্রয়োগ গ্রহণ করার পূর্বে কোন আদেশদান হইতে পারে না। এই কন্যার নাম রুক্মিণী, সে দলপৎ শুক্লীর কন্যা, সুরতিয়াবাঈ পুরী যাত্রার পথে দলপৎ রায়ের গ্রামে দুই বৎসর সাত মাস থাকিয়া তাহাকে নৃত্যগীত শিখাইয়াছিলেন। সুরতিয়াবাঈও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। পুরী মন্দিরে তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। আমাকে যে কোন অজুহাতে ধ্বংস করা উদ্দেশ্য হইলে স্বতন্ত্র কথা। অন্যথায় নবাব ইহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া আশা করি।"

অন্দর মহল থেকে রাজসভার রাণী ও সরকারী কর্মচারীরা এ উত্তর শুনে বেঁকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, একি কথা! নবাব দরবার থেকে যে অভিযোগ এসেছে সে মিথ্যা হবে কি করে!

সাধারণ প্রজারা নবাবী ফৌজ রাজ্য আক্রমণ করতে পারে জেনে ভীত হয়েছিল।

রাজা মাধব সিং রুক্মিণীকে কাছে ডেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, কোন ভয় নেই।

দলু সর্দারের দল অহরহ প্রস্তুত হয়ে থাকতে শুরু করেছিল। মেয়েরা তাদের পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে রেখেছিল, পুরুষেরা লড়াই শুরু করলে তারা বনে ঢুকে বসবে। দলু সিং সর্দারের বাগদী নায়কেরা আরও পাইক সংগ্রহ করে এনেছিল। সবসুদ্ধ মিলে তারা তখন পাঁচশো। তারা দুর্দান্ত, তারা মরীয়া। তাদের কাছে রাজ্যের ছত্রি এবং চুয়াড় সৈন্য হীনবল হয়ে পড়েছে। তারাও সংখ্যায় শ পাঁচেক।

রাজা, দলু এবং রুক্মিণী সকলেই বুঝতে পেরেছে—এ সবই বড়রাণী এবং তার ভাই সুচেত সিং-এর ষড়যন্ত্র। রাণী দুহাতে টাকা ছড়াচ্ছেন গোপনে।

রাজা মাধব একটা অন্যায় করেছিলেন। রুক্মিণীকেই তিনি সব করে তুলেছিলেন তাঁর জীবনে। অন্য রাণীদের মহলে যেতেন না। ঠাকুর-বাড়িতে গিয়ে বাইরে থেকে প্রণাম করে চলে আসতেন। নিমন্ত্রণ কাউকে করতেন না, কারুর বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতেনও না।

তিনি দলুকে মধ্যে মধ্যে ডেকে পরামর্শও করতেন যে একদিন রুক্মিণীকে এবং সর্দার আর পাইকদের নিয়ে চন্দনগড় ছেড়েই চলে যাবেন দুর্গম অরণ্যের মধ্যে। সেখানে নতুন করে গড়ে তুলবেন নতুন রাজ্য। কিন্তু রুক্মিণী প্রায় আসন্নপ্রসবা। একমাস দেড়মাসের মধ্যেই তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা। প্রতীক্ষা করছিলেন সেই সন্তান প্রসবের।

রুক্মিণী কখনও কখনও ছুরি নিয়ে খেলা করত। রাজা মাধব সিং হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিতেন। অবশেষে তাকে একদিন কিষণজীর সামনে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, সামনে

কিষণজী, একটা সত্য কথা বলবে রুক্মিণী?

—কি?

—ছুরি নিয়ে যখন খেলা কর তখন কি ভাবো?

রুক্মিণী চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কথা বলে নি।

—রুক্মিণী!

এবার রুক্মিণী কেঁদেছিল। রাজা তাকে বুকে নিয়ে বলেছিলেন, একটা শপথ করতে হবে তোমাকে।

—বল।

—যতদিন তোমার গর্ভে আমার বংশধর রয়েছে ততদিন এসব ভাববে না।

সে বলেছিল, ভাবব না।

ঠিক তার পরদিনই সংবাদ এসেছিল মীর হবিব আসছেন সরজমিন তদন্ত করবেন। রাজা শঙ্কিত হয়ে দলুকে বলেছিলেন, কোন্ পথে কোন্ দিকে চন্দনগর ছেড়ে যাবে খশুর ঠিক করে রাখ। ডুলি ঘোড়া এসব যেন অষ্টপ্রহর তৈরি থাকে। মীর হবিব বাঘ নয়, সে সাপ।

তবে নবাবী চিঠির সুর এবার ভাল। পত্রে আছে: "নায়েব নাজিম সহিষ্ণু এবং সূক্ষ্ম বিচারক। তিনি রাজা সাহেবের নির্ভীক পত্রে অসন্তুষ্ট হন নাই, তুষ্টই হইয়াছেন। একটা সংবাদ ইতিমধ্যেই পাইয়াছি। সুরতিয়াবাঈ সত্যই শেষ জীবন পুরীতে অতিবাহিত করিয়াছে। এবং সে বলিত তাহার কেহ নাই। রাজা সাহেবের অন্য কথাগুলিও বিশ্বাসযোগ্য। তবুও তদন্ত না করিলে সূক্ষ্ম বিচার করা যায় না। সেহেতু নায়েব মীর হবিব আমীর সাহেব যাইতেছেন। সঙ্গে তাঁহার এক শতের বেশী সিপাহী থাকিতেছে না। সুতরাং কোন আশঙ্কা করিবেন না। জানি, রাজা সাহেব সাহসী এবং ধীর ব্যক্তি। রুস্তম বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।"

তবু রাজার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু কিছু করার তো উপায় ছিল না। রাজ্যে কিন্তু অসন্তোষকে তখন প্রবল করে তুলেছে মাধব সিং-এর মনসবদার বড় রাণার ভাই সুচেত সিং। দিন দিন নানা গুজব রটছে। 'একশো সিপাহী নিয়ে আসছে মীর হবিব কিন্তু তার পিছনে আসছে পাঁচ হাজার পল্টন আর তোপখানা। রাজা মুসলমানী বাঈয়ের মেয়েকে না দিলে একেবারে সব ভূমিসাৎ করে দিয়ে যাবে। ও মেয়ে মুসলমানী।'

'রাজার পুরুত রাধামাধবের পূজারী বলছে, দেবতা বিমুখ হয়েছে। পূজোর ফুল পায়ে থাকে না, পড়ে যায় মাটিতে। ভোগও নাকি হয় না। ভোগের উপর তুলসী পাতা দিতে গেলে হাত থেকে খসে মাটিতে পড়ে যায়।' তবু মাধব সিং অটল রইলেন। দাঁড়িয়ে থেকে একদিন পূজো দেওয়ালেন, পূজো করালেন। ভোগ দেওয়ালেন। সেদিন কিছু হল না, ফুলও পায়ে থাকল, তুলসীপাতাও ভোগের মাথায় থাকল। তবু গুজব ফিরতে লাগল। দলপৎ সিং-এর পাইকরাও অহরহ তৈরি হয়ে ঘুরতে লাগল। রাজা অন্য সিপাহীদের টাকা দিলেন একটা উপলক্ষ করে। সুচেত সিংরা চুপ হয়ে গেল। রাজা বললেন, দেখ, আসুক মীর হবিব। হোক তদন্ত।

মীর হবিব এলেন। তাঁর তাঁবু পড়ল গ্রামের বাইরে। সিপাহী একশোর বেশি নয়। তোপ নেই। হবিবকে অভ্যর্থনা করলেন রাজা। হবিব খুব কেতাদুরস্ত আমীর। কথাবার্তায় ভারী পারঙ্গম।

দলু সর্দার সঙ্গে যায় নি। মাধব সিং তাকে রুক্মিণীর ভার দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। রাজার বুদ্ধি ছিল খুব তীক্ষ্ণ। অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন, এ কথা দলু জানত। তবে দলু বার বার বলেছিল, তুমি বল রাজা সাহেব, একদিন রাত্রে সুচেত সিংকে কেউ শেষ করে দিক। কিন্তু রাজা তা দেন নি। বলেছিলেন, কতজনকে খুন করবে শ্বশুর? বড়রাণী? সে যে বুকে বিঁধে আছে। আর দুই রাণী? তারা? স্ত্রী হত্যা কি করে করব? করতাম ব্যভিচারিণী হলে, কিন্তু সে অপরাধ তো তারা করে নি।

চুপ করেছিল দলু। হ্যাঁ, ঠিক বলেছে জামাই। রাজবিচার! রাজবুদ্ধি!

সেদিন রাজার সঙ্গে ছিল গণেশ পাইক আর ভীম পাইক ডাইনে বাঁয়ে। পিছনে ছিল বিশজন পাইক একটু দূরে।

হবিব আমির রাজাকে বসিয়ে হেসে বলেছিল ফার্সী বয়েৎ। তারপর বলেছিল, এ হল দেওয়ানা কবি হাফিজের বয়েৎ রাজা সাহেব। অর্থ হল—হাফিজ বলেছিল তাঁর যে প্রিয়া তার গালে একটি তিলের জন্ম তিনি বোখারা সমরখন্দ দিয়ে দিতে পারেন। তুমি রাজা সাহেব তেমনি দেওয়ানা, মোহব্বতিতে দেওয়ানা আদমী!

রাজা বলেছিলেন, আমীর সাহেব, আপনি পারসীতে পণ্ডিত, রসিক লোক। কিন্তু রুক্মিণী আমার বিবাহ করা ধর্মপত্নী।

—সগাই?

—না, শাদী।

—আচ্ছা! তা হলে তোমার মুল্লুক জুড়ে এমন চেল্লায় কেন?

—কেউ চেঁচায় না। সুচেত সিং আর তার বোন চেঁচায়। তার বোন, আমার প্রথম স্ত্রী।

হা-হা করে হেসে হবিব বলেছিলেন, সতীনের কাণ্ড! ঔরতি গোস্সা! তা হতে পারে। তবে মীর হবিবের পরখ একটি। এক পরখেই সে ঠিক ধরে নেবে—সত্যিটা কি। এক পরখ!

রাজা বলেছিলেন, বেশ, পরখ করুন।

একটু চুপ করে থেকে হবিব বলেছিলেন, জানেন রাজা, গুলাব তামাম মুল্লুকেই এখন ফোটে। কিন্তু বসরাই গুলের কাছে কেউ না। সে ধরবার ক্ষমতা কজনের? সবাই দেখে এক গুলাব। কিন্তু যার বাড়ি বসরা সে ঠিক ধরে দেবে—এ গুলাব বসরাই কি বসরাই নয়!

রাজা সাহেব চমকে উঠে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

হবিব বলেই চলেছিলেন, দেখিয়ে রাজা সাহাব—এ তো আপনি মানবেন যে এতকাল আপনারা রাজপুতানার রাজপুত শের এই বাঙ্গালে ভাত মুড়ি আর মচ্ছির মুল্লুকে বাস করছেন। তবু আপনাদের রাজপুত ঔরতদের একটা আলাদা জলুস আছে, একটা ছাঁচ আছে। তবিবতে সহবতে চোখের চাউনিতে বাংলার কালী লেড়কীর সঙ্গে ফরক অনেক। তেমনি, ঠিক মুসল-

মান যারা ইসলামি একটা ছাঁচ একটা গড়ন একটা তরিবৎ থাকবেই। যতই হিন্দুস্থানির রঙ দিয়ে ঢাকুক সে ঢাকা যায় না। মুসলমানী বেটী আমি এক নজরে ধরতে পারি।

রাজা উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিলেন, হবিব সায়েব! অর্থাৎ রাজা বুঝেছিলেন হবিব সায়েব এর পর বলবে রুক্মিণীকে এর পর হাজির করা হোক। উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

হবিব চিৎকার করে উঠেছিল, এও বেওকুফ্, বে-তরিবৎ জংলী রাজপুত, বৈঠ যাও।

রাজা ডেকেছিলেন, ভৈরব! ভীম! গণেশ! চলো।

হবিব সাহেব চিৎকার করেছিলেন, সি-পা-হী লোক! স-ন-স-ব দার!

সব তৈরিই ছিল। কিন্তু বোধ হয় কিছু আগে ঘটে গিয়েছিল। কিছু পরে হবার কথা ছিল। হবিবের সিপাহীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাজা এবং ভীম ভৈরবদের উপর। রাজা লড়াই করতে করতে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, একজন যাও, খবর দাও দলুকে, রুক্মিণীকে।

বলতে বলতে তিনি পড়েছিলেন।

ভীম আর গণেশ ফেরে নি। ভৈরব ফিরেছিল,—সর্দার, সর্বনাশ, সব শেষ।

এরপর কি করতে হবে রাজা তা আগেই বলে রেখেছিলেন দলপৎকে। রুক্মিণীকে তিনি বাঁচাতে বলেছিলেন। তিন রাণীর মধ্যে কারুর পুত্রসন্তান নেই। সব কন্যা। রাজা বলেছিলেন রুক্মিণীর গর্ভে যদি বংশধর থাকে? ওকে বাঁচিয়ো শ্বশুর। তোমার আমার দুজনের জলপিণ্ড। এখানে সুচেত সব বিষিয়ে দিয়েছে। ওরা তোমাদের মারবার চেষ্টা করবে। পালিয়ো—যে কোন উপায়ে পালিয়ো। দুর্গম বনে। গভীর বনে। যে ভাবে তোমার দাদো পালিয়েছিল। তাদের সঙ্গে তুমি বেঁচো। নইলে রুক্মিণীর পালানোর মানে হয় না। নিজেদের পুরনো বনে ফিরে যেয়ো না, সেখানে ওরা তোমাদের পাত্তা করবে। নতুন দুর্গম বনে চলে যেয়ো।

দলপতের হুকুমে পাঁচশো জোয়ানের চারশো দিয়েছিল লড়াই। আর দলপৎ নিজে মেয়েছেলে, গরু, ঘোড়ার পিঠে নিতান্ত দরকারী জিনিস এবং ডুলিতে রুক্মিণীকে চাপিয়ে ঢুকে পড়েছিল বনে। সঙ্গে একশো জোয়ান, বাদ বাকি মেয়ে বুড়ো আর বাচ্চা। সেই আসছিল তারা। বন থেকে বনে, গভীর বনে বনে, নালা ঢিবি পার হয়ে চলে আসছিল। সেদিন দুদিন পুরো হয়ে তিন দিনে পড়েছিল। তিন থাকি হয়ে চলেছে তারা। সামনে বিশ জোয়ান আর সে। তাদের সঙ্গে ডুলি আর ঘোড়ার পিঠে গরুর পিঠে জিনিসপত্র, তার সঙ্গে বাচ্চা বুড়ো আর রোগা লোক। তার কিছু পিছনে শক্তসমর্থ মেয়েরা। তাদের পিঠে জিনিস, কারুর পিঠে কচি বাচ্চা। তাদের সঙ্গে পঁচিশ জোয়ান। একেবারে পিছনে পঞ্চাশ জোয়ান। যারা পিছু নেবে—তাদের সঙ্গে প্রথম লড়াই তারা দেবে। হাঁকবে। মাঝের জোয়ানেরা ঘাঁটি গাড়বে। তাদের সঙ্গে শক্ত মেয়েরা। তারাও বাঁটুল ছুঁড়তে জানে, তীর ছুঁড়তে জানে।

এদিকে সামনের দল ডুলি আর মেয়েদের পিছনে রেখে আর একটা ঘাঁটি পাতবে, নইলে চেষ্টা করবে আরও গভীর বনে ঢুকবার। পঞ্চাশ জোয়ান যারা সবার পিছনে আসছিল—প্রথম লড়াই দেবার জন্যে তারা কেউ ফেরে নি। লড়াই দিয়ে তারা মরেছিল। বাকিরা ঢুকেছিল গভীর বনে।

দুই

বিশ বছর আগেকার কথা। তিন দিনের শুরুতে আবার এল বাধা, বিকেলবেলা প্রসব বেদনা উঠল রুক্মিণীর। খুব জোর কদমে হেঁটে সামনে পাহাড় দেখে থামতে হল। একজন লোকও ফিরে এল। একটা জোড় অর্থাৎ ছোট নদী পাওয়া গেছে। আস্তানা পড়ল। কাপড় ঘিরে ঘেরা দিয়ে রুক্মিণীকে নিয়ে অম্বিকে বাগ্দিনী আর দলপতের বিধবা বোন অহল্যা ঢুকে বসল। লোকেরা চিঁড়ে ভিজিয়ে খেলে। আটটা গরুর পিঠে শুধু চিঁড়ে বোঝাই ছালা নিয়েছিল দলপৎ। দুটো ছালায় ভেলি গুড়। লোকজনেরা খেয়েদেয়ে শুল। মদ নেই। মদের জন্য প্রাণ হাঁইফাঁই করছে। পথে কিছু শিকার হয়েছে—দুটো বড় সম্বর হরিণ। তার চামড়া ছাড়িয়ে দুপুরে আগুন করে পুড়িয়ে নিয়ে খেয়েছে। নুন নেই। নুনের টিন ফেলে এসেছে। পাঁচ-সাতটা গাইয়ের দুধ আছে। ছেলে আর রোগারা খেয়েছে। রুক্মিণী খেয়েছে। আর পথে পেয়েছে গোটা দশেক মধুর চাক। এ দুদিনের মধ্যে চন্দনগড়ে কি ঘটেছে তার খবর তারা পায় নি। তবে পিছন কেউ নিতে পারে নি। তারা উড়িষ্যার এলাকার দিকে যায় নি। পুরীর পথকে বাঁ পাশে রেখে বনে বনে চলেছে। এলাকা বাংলার—সে দলপৎ চেনে। ঠিক করে নি কোথায় যাবে। তবে চলেছে। রুক্মিণীকে বাঁচাতে হবে আর তার বাচ্চাকে। মাধব সিং বলে গেছে, শ্বশুর, বেটাছেলে হবে আমার বিশ্বাস। আমার তোমার দুজনের বংশধর, জলপিণ্ডের আধার। তাকে যেখানে হোক গিয়ে বাঁচাতে হবে।

সারাটা রাত্রি গাছের তলায় বসে। সে কি করবে? রুক্মিণীর এক একটা কাতরানি ভেসে আসছিল আর বুকটা ধ্বক ধ্বক করে উঠছিল। সে চুপ করলে কি করবে ভেবেই যাচ্ছিল ঘটনাগুলো।. দুদিনের মধ্যে ভাববার অবকাশ ছিল না। ভাবতে পায় নি। রাজার দেহটা? আঃ, কেউ ফিরল না? যাক্, যাই হোক বাবা, রাজা মাধব সিং, তুমি ক্ষমা করো। তোমার বংশধর আর রুক্মিণীকে বাঁচাতে তোমার দেহ উদ্ধার করে সৎকার করতে পারলাম না। আসুক, আজ তোমার বংশধর আসুক। ওই কাতরাচ্ছে রুক্মিণী। সে আসছে। সে করবে তোমার সৎকার।

তখন জোয়ান বয়স দলুর, তখনও সে নোয়ায় নি, সোজা ছিল। চামড়া কোঁচকায় নি। দু-চার গাছা চুল পেকেছে। পাকুক, না হলে দাদো বলে মানাবে কেন? দাদো হয়ে সে এখনও পঁচিশ বছর পার করবে। তোমার বাচ্চা ষোল বছরের হলে তার হাতে তোমার তলোয়ার দিয়ে সে তলোয়ার ছাড়বে। দলপতের পাশে যে তলোয়ারখানা রয়েছে সেখানা মাধব সিং তাকে দিয়েছিলেন। যেদিন সে চন্দনগড়ে এসে তার পাইকদল নিয়ে রাজার পল্টন-ভুক্তান হল সেই দিন। আর রুক্মিণীর কাছে আছে তোমার ছোরা। তারপর তাকে দিয়ে তোমার সৎকার করাব। গয়াধাম নিয়ে যাব। আর?

ঝিঁঝি ডাকা রাত্রির বনে ঝিঁঝির ডাক ঢেকে দিয়ে পাখিরা ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ও কি শব্দ? একটা কাতর আর্তনাদ রুক্মিণীর। তার সঙ্গে ও কি! শিশুর কান্না! পাখির ডাকে ঢাকা পড়ল।

চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল অহল্যা। জয় কিষণজী! জয় কিষণজী! জয় কিষণজী!

—অহল্যা! চিৎকার করে উঠল দলপৎ।

অহল্যা বললে, শিঙাটা বাজা রে দাদা, শিঙাটা বাজা।

—কি হল বল্?

—কালা হয়েছিস? শুনছিস নাই চেল্লানি। কি চেল্লানি, কি চেল্লানি! বাপ রে বাপ। মার্ মার্ করছে যেন! বাজা, শিঙা বাজা, সবকে তুল্।

—ছেলে হল?

—আঃ, সাত কাণ্ড রামায়ণের বাদে বলে সীতে কে? বললাম নাই চেল্লানির কথা! শুনছিস নাই?

হ্যাঁ, ছেলে চিৎকার করে কাঁদছে। চিৎকারে কান্নার বিলাপ নেই, রোষ রয়েছে যেন। হাসিতে ভরে উঠল দলপতের মুখ।

অহল্যা দুই হাতে একটা মাপ দেখিয়ে বললে, অ্যাই ছেল্যা, এই হাতের বাই। সদল বদল—

—কি ছেলে রে?

—কি আবার! বেটাছেলে না হলে অহল্যে চেল্লায়? শিঙা বাজাতে বল্। কে, শিঙা বাজা।

—না। শিঙা বাজালে সব ধড়মড়িয়ে উঠবেক। মনে করবেক কে কোথা দুশমন আইচে। সে গোলমাল হবেক। হবে, বাজবে শিঙা, বাজবে নাকাড়া, বাজবে ঢোল—সে দিন আসবেক। আজ লয়। জয় কিষণজী! জয় কিষণজী! জয় গোপাল! জয় যোগমায়া! জয় রাধামাধব! না, রাধামাধবের নাম সে করবে না। রাধামাধবের মন্দিরে রুক্মিণী ঢুকতে পায় নি। জয় কিষণজী! জয় গোপাল! জয় যোগমায়া। তোমার বাচ্চার মঙ্গল করো। হে বনের দেবতা, তুমি মঙ্গল করো।

উপরের দিকে সে তাকালে। আকাশ ফরসা হয়েছে। ওইটা পুব দিক। গাছের ফাঁকে ফাঁকে লাল বরণ দেখা যাচ্ছে। পূবে সূর্য উঠছে। পশ্চিমে বন—কেবল বন, কেবল বন, দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়গুলো এখনও কালো দেখাচ্ছে। আকাশের গায়ে মেঘের মত।

সে উঠল, কালকের লোকেদের কাটা ডালগুলোর ইশারা ধরে যাবে সে নদীর ধারে। তার আগে সে ডাকলে, ভূপালে, এ ভূপালে উঠ্। জেগে বস্। শুনছিস? রুক্মিণীর ছেল্যা হল রে শুয়াররা। উঠ্। আমি আসছি।

আর একবার তাকালো সে রুক্মিণীর প্রসবস্থানের ঘেরাটার দিকে। গাছতলাটা সুন্দর। গাছটাও প্রকাণ্ড শাহী গাছ। অর্জুন গাছ। ঠিক হয়েছে। রুক্মিণীর বেটার নাম হবে অর্জুন সিং। আচ্ছা নাম।

কিষণজীর দোস্ত অর্জুন। বহুৎ আচ্ছা হয়েছে।

[ক]

ভোরবেলা সে মুখ হাত ধোবার জন্যই ছোট নদীটির সন্ধানে ওই কাটা ডাল ফেলা বনতল দেখে ঘাটে গিয়ে পৌঁছল। ঘন বনের মধ্যেই নদীটি বয়ে যাচ্ছে। পাথরে বালিতে ভরা নদীবক্ষের উপর দিয়ে কাচের ধারের মত জল তরঙ্গময় হয়ে উঠে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। এখন জল কম। অনেক বড় বড় কালো পাথরের মাথা উঁচু হয়ে বেরিয়ে রয়েছে। জলের দিকে তাকিয়ে দেখলে, স্বচ্ছ জলের তলায় পাথরগুলি সুন্দর গোলালো, নানা আকারের, নানা রঙের। কিছু কিছু পাথরের মাঝখানে সাদা সরু একটি বা দুটি দাগ পৈতের মত বেড় দিয়ে রয়েছে। দলু সর্দারের সম্ভ্রম হল। এ তো সবই শিব ঠাকুরের জাতের পাথর। নদীটিকে তার পুণ্যময়ী বলে মনে হল। সে খানিকটা জল মাথায় নিয়ে হাত জোড় করে বললে, মা, তুমি নিশ্চয় কোন শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। কোন শাপ শাপান্তে নদী হয়েছ। স্বর্গে শিবপুজো করতে নিত্য, সেই পুণ্যে শিবঠাকুর তোমার কোলে হাজার লাখ হয়ে তোমার ছেলের মত খেলা করছে। মা, আমি খুব বিপন্ন। আমার জামাইকে মেরেছে অন্যায় করে। আমার মেয়েকে নিয়ে বনে বনে ঘুরছি। কোথায় নিরাপদ ঠাঁই পাব যেখানে দুশমনেরা খোঁজ পাবে না। পেলেও তোমার মত দেবতার দয়ার বেড়া ঠেলে আমাদের নাগাল পাবে না। দয়া কর মা!

হঠাৎ একটা গর্জনে চমকে উঠল দলু। এ কি! মা রাগ করলে! ওপারে একটা পাথরের উপর একটা বাঘ দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। সর্বনাশ! বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে শুক্লা বংশের ছেলে দলপৎ, শোলাঙ্কী রাজপুত ভয় খায় না। কিন্তু তার হাতে যে কিছু নেই বললেই হয়। একটা ভোজালী শুধু। সে অবশ্য পালাতে পারে। এখনও ওটা নদীর ওপারে। এক লাফে নদীটা পার হতে পারবে না। শয়তান ডোরা নয়, চিতা। কিন্তু ছুটলেই বেটা লাফ দিয়ে নদী পার হয়ে পিছু নেবে। এবং গিয়ে হাজির হবে ওদের আস্তানায়। রুক্মিণীর ছেলে হয়েছে। একটা সোরগোল হৈ-চৈ হবে। ভয় পাবে রুক্মিণী বাচ্চার জন্যে। ধাঁ করে একটা মতলব তার এসে গেল। সে যদি নদীর ধার ধরে আস্তানাকে দূরে পিছনে রেখে এগোয় তো কি করবে বেটা? বেটা কি তার সঙ্গে সঙ্গে জিভ চাটতে চাটতে ওপার ধরে চলবে না? তারপর দূরে গিয়ে যা হয় বোঝাপড়া ওর সঙ্গে করবে দলু। একটা ভোজালীই যথেষ্ট, সে শোলাঙ্কী রাজপুত।

তাই সে করলে। ছুটে সামনের দিকে এগুলো সে যাতে আস্তানা দূরে পড়ে। হাঁ, ঠিক হয়েছে। তার মতলব হাসিল হয়েছে, বাঘটা একবার নদীতে নামবার উদ্যোগ করে আবার তীরে উঠে ঠিক দলুর সঙ্গে সঙ্গে চলল। দলু হেসে এবার বললে, আবে আও। আও মিয়া, আও। চলো, আওর থোড়া সামনে চলো। আওর থোড়া।

চলেছিল সে নদীর উজানে। ক্রমশ যেন বন মাটি উঁচু হয়ে উপরে উঠছে। নদীটা গভীর হয়েছে। সামনেই একটা জায়গায় উঁচু পাথরের গা বেয়ে নদীটা ঝোরার মত ঝর ঝর ঝরে

পড়ছে। নদীও সংকীর্ণ হয়েছে গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে। নদীর জল নিচে ঝরছে, নিচে একখানা পাথরের উপর পড়ে ছিটকে উপরে উঠছে, চারিপাশে ছড়াচ্ছে। কুয়াশার মত হয়ে বাতাসে ভাসছে। সে দাঁড়াল মুগ্ধ হয়ে। বাঘটাও ওপারে দাঁড়িয়েছে। দলু দেখতেই লাগল। ওঃ, অনেক—অন্তত পঁচিশ হাত নিচে পড়ছে জল। নদীগর্ভ প্রায় পঁচিশ হাত গভীর এখানে। নিচে জল যেন ভাতের হাঁড়ির মত ফেনায় ফেনায় টগবগ করে ফুটছে।

ওদিক থেকে 'ওঁও' শব্দ উঠল, বাঘটা শব্দ করছে। অর্থাৎ যেন বলছে কি বিপদ, লোকটা যে বিশ্রী জায়গায় দাঁড়িয়েছে। বেটার আর তর সইছে না। দলু বুঝতে পারলে এই ঝোরাটার কাছ থেকে সরলেই বাঘটা যা হোক একটা কিছু করবে। হয় লাফ দেবে, নয়—নয় কি করবে? নামবে নদীতে? কিন্তু সেই বা কি করবে? এইবার সোজা উলটো-মুখো পালাবে? আপসোস হল বর্শাটা না আনার জন্যে। তলোয়ারখানা আনলেও হত। হঠাৎ একটা ঘোঁত ঘোঁত শব্দে ওপারে বাঘের সামনের জঙ্গলটা নড়ে উঠল। বাঘটা চকিতে তার দিক থেকে সামনে দৃষ্টি ফিরিয়ে গর্জন করে লড়াই দেবার জন্যে দাঁড়াল যেন। দলু বুঝেছে, কিছু নয়, এক বুনো শুয়োর। ঝোপের মধ্যে ছিল, বাঘটাকে দেখে ক্ষেপেছে। সে নিশ্চিন্ত হল, সে খালাস। যা শত্রু পরে পরে। এবার বাঘটা পড়বে শুয়োরটাকে নিয়ে এবং ওই শুয়োরের মাংসেই আজ খুশি হবে। কিন্তু দুর্ধর্ষ শোলাঙ্কী রাজপুতরক্তের কৌতূহল কম নয়। রক্তারক্তি জীবন-মরণের লড়াই দেখতে বিপুল উল্লাস। লড়াইটা তাকে দেখতেই হবে। সামনের ওই উঁচু জায়গাটা—যেখান থেকে ঝোরার জলটা ঝরছে ওখানটা থেকে বেশ দেখা যাবে। উঁচু একটা পাথরের চত্বরের মত। চারিপাশের ঘন ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য থেকে পাথরটার খানিকটা বেরিয়ে আছে। পাহাড় এপাশ ওপাশ দুপাশেই এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সে জায়গাটায় ওঠা সহজ নয়। অনেক ছোট বড় পাথরের চাঁই-এর ফাঁকে ফাঁকে কাঁটা জঙ্গল জন্মেছে। অবশ্য বনের মানুষ পাইক সর্দারের কাছে তা আদৌ দুঃসাধ্য নয়। সে পাথরটার উপর উঠে দাঁড়াল। ওপারটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঝোরাটা একটু আগে পড়েছে। ওঃ, ঝোপটা খুব জোরে দুলছে এবং বুনো শুয়োরটার গোঙানী শোনা যাচ্ছে। বাঘটা টান হয়ে দাঁড়িয়ে লেজ আছড়াচ্ছে। বা বা বা, লড়াইটা জমবে ভাল। প্রত্যাশা মত শুয়োরটা একেবারে তীরের মত বের হল, সামনে ছুটল; বাঘটাও একটা হাঁকাড় মেরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল: লাগল দুই অসুরে মারামারি। শূকরাসুর আর বাঘাসুর। ঝোরার জল ঝরার শব্দ ছাপিয়ে তাদের হুঙ্কার উঠতে লাগল। চারিপাশের গাছ থেকে ভোরবেলার সত্যজাগা পাখিগুলো পাখা মেলে উড়ল। দলুর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল দুটো ময়ূর। দলু ভুলে গেল রুক্মিণীর কথা, নাতির কথা, তার আস্তানা এবং নিজের কথা। দুই চোখ বিস্ফারিত করে দেখতে লাগল। সে নিজে বুনো শুয়োরটার দিকে। বাঘটা তার শত্রু। বাহবা বাহবা বাহবা। মুখে বাহবা দিয়ে হাতে তালি দিয়ে সে শূকরাসুরকে উৎসাহিত করতে লাগল। শুয়োরটার অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে কখনও নিজেই সামনে ঝুঁকছিল, কখনও বেঁকে যাচ্ছিল। বাঘটার সুবিধা হলেই সে তার দুই হাত হাঁটুর উপর রেখে স্থির হয়ে দেখছিল। হে মাতাজী, হে দেবকন্যা নদী, করুণা করো মায়ী—জিতিয়ে দাও ওই বরাহবীরকে।

সত্যই ওই নদী মাতাজী শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। তা নইলে বাঘের হার হয়! বরাহকে মাতাজীই জিতিয়ে দিলেন। বাঘটাকে এমন গুঁতো মারলে বরাহবীর যে বাঘটা ঘায়েল হয়ে পড়ল এবং পরক্ষণেই জান বাঁচাবার জন্তে জলে দিলে লাফ। বে-হিসেবী লাফ হয়ে গেল। হিসেবের ভুলে পড়ল একেবারে নদীর ভিতর। একেবারে আছাড় খেয়ে পাথরের উপর। সেই পঁচিশ হাত তলা থেকে ছিটকে উঠল জল।

সাবাস! সাবাস! সাবাস! বুনো শুয়োরটাও জখম হয়েছে কিন্তু খুব বেশী নয়। তার সামনের শত্রু অদৃশ্য হতেই সে গোঁ গোঁ করে চলে গেল সামনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। দলু দেখলে বাঘটা নিচে জলের ঘুরনচাকে ঘুরছে—ডুবছে। পাক কতক ঘুরেই সেটা জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে সজোরে ধাক্কা খেলে একটা উঁচু পাথরের সঙ্গে। একটু আটকে থেকে পাথরটাকে বেড় দিয়ে ছুটে চলা জলের স্রোতে চলল নিচের দিকে। দলুও ছুটল; এবার নিচের দিকে ভেসে যাওয়া বাঘটার সঙ্গে। কিছু দূর গিয়ে নদী যেখানটায় কম গভীর হয়েছে সেখানে সে নেমে পড়ল নদীর পাড় ভেঙে। জলের স্রোতের তোড়টা পা দিয়ে পরখ করে নিয়ে জলে নামল। জল এক কোমর। ওই বাঘটা আসছে ভেসে। সে একটা চওড়া উঁচু পাথরের উপর বসল। বাঘটা ভেসে আসছে। এখনও চেষ্টা করছে যা কিছু পাচ্ছে তাই ধরবার। দলু ভোজালী হতে সেই পাথরের উপর বসে অপেক্ষা করে রইল। বাঘটা পাথরটার সামনে এসেই থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরল পাথরটাকে। এবং আঘাতের যন্ত্রণায় জলের শ্বাসরোধী কষ্টের বিরক্তির উপর সামনে দলুকে দেখে দাঁত বের করে ভীষণ হয়ে উঠল। দলু সেই মুখের উপর তার ভোজালী দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করলে। ইয়ে লে—ইয়ে লে—ইয়ে লে! ইয়ে—। আ! বাঘটার থাবা ছেড়ে গেছে। পাথর থেকে সেটা জলে ডুবছে। দলু অপেক্ষা করে বসেছিল। লেজটা পেতেই সে হাতে চেপে ধরলে। তারপর এপাশ থেকে জলে নেমে টানতে টানতে নিয়ে এল কিনারায় ধারে। বাঘের মুখখানাকে সে কোপে কোপে একেবারে চুর করে দিয়েছে। নিচের দাঁতের পাটিটাই ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। সে শক্তিশালী লোক। সেটাকে টেনে কিনারায় ছেঁচড়ে তুলে আরও কটা কোপ মেরে উঠে দাঁড়াল। তারপর নদীকে প্রণাম করে বললে, জয় মাতাজী! এই বাঘের রক্ত নিয়ে গিয়ে অর্জুন সিং-এর কপালে তিলক লাগাবে। আর চামড়া ছাড়িয়ে ওর পাঁজরার সেই ছোট্ট হাড়টা, যেটা মানুষকে সৌভাগ্য দেয়, সেইটে পুরে একটা তক্তি বানিয়ে এখন গলায় ঝুলিয়ে দেবে। বড় হলে সেটা পরবে হাতে।

বাঘটাকে টেনে আনতে আনতে তার মনে হল এটা তাকে নদীমাতা ইশারা দিলেন। বললেন, দলু বেটা, আমার কিনারায় থাক্, আমি তোকে এমনি করেই রক্ষা করব। আমার খুশি হলে আমি সব পারি শিবের বরে। শিব আমার ছেলে। আমি বুনো শুয়োর দিয়ে বাঘ মারি। বাঘ হল দুশমন। মীর হবিবও ওই—সুচেত সিংও ওই। থেকে যা এখানে।

হ্যাঁ, ঠিক কথা। মাতাজীর কথা ঠিক। এবার একবার থমকে দাঁড়িয়ে সে ভাল করে চারিদিক চোখ মেলে দেখলে। সামনেই সেই পাহাড়। যা কাল সন্ধ্যে থেকে দেখে আসছে। এখন স্পষ্ট হয়েছে। সকালের রোদ পড়েছে পাহাড়ের উঁচু চূড়াগুলোর উপর। ওঃ, চূড়া তো

একটা নয়! এক দুই করে গুনে গেল দলু। বারোটা। পাহাড় খুব উঁচু নয়। ছোট। একটাই বেশ উঁচু। গায়ে ঘন জঙ্গল। যেন বারোটা পাহাড়ের চূড়ো বারোজন ভারী জোয়ানের মত গোল হয়ে পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসেছেন এই মাতাজী। হ্যাঁ হাঁ, তা হলে তো এই বারো জোয়ান পাহাড়ের হাত ধরাধরি করা গোলাইয়ের ভিতরটা দেখতে হয়। ওর ভিতর তো ওই নদীর কিনারায় বড় ভালো জায়গা মিলবে বসতের। হাঁ, দুশমন হলে বারো পাহাড় রুখবে। আর তারা যদি বারো পাহাড়ের গায়ে দুই বারো চব্বিশ ঘাঁটি গাড়ে, তাহলে পাহাড়ের হাত ধরার মত নিচু জায়গাগুলো খুব সহজে রুখতে পারবে। স্রেফ পাথর গড়িয়ে দিলেই কাম ফতে। এক পাথর পাঁচ-দশ সিপাহীকে পিষে মেরে দেবে। বর্শা কিছু করতে পারবে না, তীর না, তলোয়ার না, এমন কি কোন শয়তান দুশমন কামান দেগেও তার কিছু করতে পারবে না।

ওই ভিতরটা তো গিয়ে দেখতে হয়! নিশ্চয় বসতের খুব ভাল জায়গা মিলবে। মিলতেই হবে। নইলে এমন হয়! এখানে থামাবার জন্যে নদীমাতার লীলাতে এইখানেই রুক্মিণীর প্রসব-বেদনা উঠল। অর্জুন গাছতলায় অর্জুন সিং ভূমিষ্ঠ হলো সকালে নদীমাতা তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন বুনো বরা তার দুশমন বাঘকে মেরে দিল। আর ইশারা কাকে বলে?

[খ]

বেলা একপ্রহর হয়ে গেলে দলু সর্দার পঞ্চাশ জোয়ানকে রুক্মিণী, অর্জুন সিং, বালবাচ্চা গরু-বাছুর পাহারায় রেখে, পঞ্চাশ জোয়ান সঙ্গে নিয়ে বের হল এই নদীমাতার কিনারা ধরে পাহাড়-ঘেরা জায়গাটা দেখবার জন্যে।

দু ভাগ হয়ে তারা দুই কিনারা ধরে এগোতে লাগল। দলু হুকুম দিলে, বাঘ দেখলে মারবে —সে দুশমন। হরিণ মারবে—সে খাদ্য। ময়ূর—সে দু'চারটে মারবে, মদের সঙ্গে চাট হবে। সাপ মারবে—সে সব দুশমনের উপর দুশমন। গো-সাপ মারবে না, সে সাপ খায়। দু-একটা মারতে পার। মারবে না শুধু বুনো শুয়োর। না, ও মারা চলবে না। দুই দল নদীর কিনারা ধরে সেই ঝোরাটা পার হয়ে উপরে উঠে বাহবা বাহবা করে সাবাস দিয়ে উঠে থমকে দাঁড়াল।

দলু যা ভেবেছিল তাই। বারো পাহাড় গোল হয়ে সত্যিই বারো জোয়ানের মত হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরটাও প্রায় একটা গোলাই। বারো পাহাড়ের গা বেয়ে পনের-ষোলটা ঝরনা নেমে এসে একটা বিলের মত হয়েছে। সেই বিলের জল এই ঝোরাটার মুখে হরদম ঝর ঝর করে ঝরে নদীমাতাকে তৈরি করেছে। বিলের চারিপাশটায় ঘন জঙ্গল। বড় বড় গাছ। শাল অর্জুন বট অশ্বত্থ। শাল অর্জুন বেশি। তেমনি নিচে ঝোপঝাড়

আর জঙ্গল। বড় বড় লতা গাছে জড়িয়ে উঠেছে। লতাগুলোর গোড়া পাহাড়ে চিতির মত মোটা। সরু কাঁটা ভরা ছোট লতার অন্ত নেই। হুঁশিয়ারির সঙ্গে পা ফেলতে হবে। নইলে কাঁটা কাঁটা আর কাঁটা। শুধু তাই নয় নিচের গোলাইটার সমস্তই স্যাঁতসেঁতে। পাহাড়ের কোণগুলি থেকে অবির ম জল চুঁইয়ে পড়ে মাটিকে প্রায় কাদার মত করে রেখেছে। বস-বাসের চাষবাসের অযোগ্য। একটা সোঁতা ভবজবে গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে। তবে একটা খবর ওই ভিজে মাটিতে লেখা ছিল সেটা দলু সর্দার আর তার বনচারী সঙ্গীদের চোখে পড়ল। নির্ভুল খবর এবং তারা তা নির্ভুল ভাবেই পড়ে নিল। নরম মাটির উপর পায়ের ছাপে ছাপে লেখা আছে এই পাহাড়ের বনের ভিতরকার বাসিন্দাদের সংবাদ। হরিণ আর বুনো শুয়োর বেশি। ভালুক কম নয়। বাঘের পায়ের ছাপও মিলল, তবে ছোট; চিতার পায়ের দাগ গোটা কয়েক। বড় পায়ের ছাপও রয়েছে। বাঁদরের হাতপায়ের ছাপও দেখা গেল। আর পাখির পায়ের আলপনা। সজারু খরগোশ শেয়াল এসব তো আছেই। সাপের পেটের অঁাকাবাঁকা দাগও রয়েছে তার মধ্যে। পাখিরা আকাশে উড়ছেও। বাঁদরেরা গাছের ডালে রয়েছে। দুটো ময়ূর তাদের সামনেই ঝপ করে এসে জলের ধারে বসল। দলু বললে, মারিস না। দুই দল দুপাশে দাঁড়িয়েছিল। বললে, এক কাজ কর্ ইবার, তোরা সব উদিক দিয়ে পাহাড়ে উঠ্। আমরা ইদিকে উঠি। দুদিক থেকে সামনে এক মুখে চলি, তাহলে ঠিক মাঝবরাবর দেখা হবেক।

তাই উঠল। দলু নিজের দল নিয়ে উঠল, সব থেকে উঁচু পাহাড়ের মাথাটা তার দেখার এলাকার মধ্যেই পড়বে। দলু আরও বলে দিলে, প্রথমেই প্রথম পাহাড়ের একেবারে মাথায় উঠে খুব উঁচা দেখে গাছের মাথায় চড়াবি কাউকে। দেখে লিবি আশপাশ। নিজের দিকের পাহাড়ে মাঝখান পর্যন্ত এসে সে খুশি হল। মাটি পাথরে জমে বেশ শক্ত জমাট জমিন। গাছগুলো এখানে নিচের গাছের মত বড় নয়, জমির উপর পাহাড়ের লতাজঙ্গল আছে কিন্তু তা খুব ঘন নয়। বন পাহাড়ের আজীবন অভিজ্ঞতায় সে বুঝতে পারলে এখানকার জমি কেটেকুটে সমান করে নিলে বাস করা চলবে। খানিকটা মাটি হাতে নিয়ে দেখে একটু মুখে দিয়ে চাখলে, হাতে গুঁড়ো করে দেখলে, শুঁকেও গন্ধ নিয়ে দেখলে।

দলু উৎসাহিত হয়ে বললে, ঠিক আছে। মাটি ভাল। চল।

একজন বললে, চুপ। হরিণ! হুই!

বনের গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে একটা বড় সম্বর, ঘাড় উঁচু করে মুখ তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত বাতাসে মানুষের গায়ের গন্ধ পেয়েছে। কান খাড়া করেছে। বড় শিঙওয়ালা মরদ হরিণ। দলু ইশারায় বললে, দুই দল হয়ে দুদিক থেকে। হরিণ চতুর, অত্যন্ত সতর্ক। কিন্তু মানুষ তার চেয়েও চতুর। একদল এড়াতে গিয়ে সম্বরটা ছুটে একেবারে দলুর দলের সামনে এসে পড়ল। দলুদের বর্শা তৈরি হয়েই ছিল। একসঙ্গে তিনটে বর্শা তার ঘাড়ে বুকে গিয়ে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল। একটা গাছের ডাল কেটে বনের লতা দিয়ে সম্বরটা চার পা বেঁধে ওই ডালে ঝুলিয়ে কাঁধে তুলে তারা চলল। আরও মারা পড়ল একটা

ভালুক। বড় বাঘ দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল বনের মধ্যে। বড় সাপ দেখে দলু থমকাল। 'শঙ্খচূড় লাগে! হিতে?'

হিতলাল পাইক সাপের বিদ্যা জানে। সাপ ধরে। সে গুণী ওস্তাদ। সাপটা একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে উঠছিল। হিতলাল দেখে বললে, শঙ্খচূড় ঠিক লয়, ওই জাতের বটেক। বেদো জাতের বটেক। ইয়ার মাটো বটেক শঙ্খচূড়, বাবাটো বটেক ঢ্যামন। উ জাতের মেয়াগুলান বড়া ছেনাল। তবে ইও কম লয়। উয়ার লেগ্যা ভেবো নাই গ। বনে আমি ঈশের-মূল দেখে এসেছি। এনে লাগায়ে দিলে তার গন্ধে শালারা সে মুখে হাঁটবেক নাই।

বড় পাহাড়টার উপর উঠে তারা থমকাল। পাহাড়ের বুকে পায়ে হাঁটা পথের চিহ্ন। মানুষের পায়ের পথ। মানুষ আছে এখানে! অতি সন্তর্পণে তারা এগিয়ে চলেছিল। মানুষের সব থেকে সেরা দুশমন মানুষ। তারা আছে এখানে। কিন্তু কারা? বনে পাহাড়ে বুনো মানুষ অনেক জাতের আছে। একেবারে উলঙ্গ মানুষও আছে। বনের পশুর মতই ফল-মূল-পাতা জন্তু মেরে মাংস পুড়িয়ে খায়। অখাদ্য কিছু নেই, সাপ মেরেও মুণ্ডটা এবং কঙ্কালটা বাদ দিয়ে বাকিটা ঝলসে নিয়ে পরমানন্দে খায়। তার থেকে ভাল মাংস নাকি তাদের নেই। ঘাসের বীজ সেদ্ধ করে ভাতের অভাব মেটায়। তাদের সড়কি আছে তীর আছে, সবই বিষ মাখানো। এবং লক্ষ্য তাদের অব্যর্থ। ওঁরাও মুণ্ডা সাঁওতালদের মত। অথবা আরও বুনো।

দেখাও মিলল কিছুক্ষণের মধ্যে। দলুরা সন্তর্পণে এগোচ্ছিল—হঠাৎ একটা গাছের আড়াল থেকে একটা কালো উলঙ্গপ্রায় মূর্তি যেন গাছের গুঁড়ির ভিতর থেকেই বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের ভাষায় চিৎকার করতে করতে ছুটল। এদেশেরই ভাষা তবে অনেক ওদের নিজেদের শব্দ মেশানো আছে। তারা আশ্চর্য হয়ে গেল লোকটা যা বলছে শুনে। কুটুম এসেছে কুটুম এসেছে বলে চিৎকার করছিল সে। কুটুম অর্থাৎ কুটুম্ব আত্মীয়। সে কি? দুশমন নয়?

দলু বললে, বজ্জাতি। বজ্জাতি বোধ হয়। সব তৈয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে যা।

গোল করে ব্যূহ রচনা করলে দলু। উল্টো দিকে মুখ করে দলুকে ভিতরে রেখে তারা গাছের আড়ালে আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। একজন গাছে উঠল দেখতে। কোন্ দিক থেকে আসছে সে দেখে নিচের লোককে হুঁশিয়ার করবে।

সে হঠাৎ বললে, আসছে। হুই উপর দিক থেকে।

—কত জন রে?

—সদ্দার!

—কি?

—ই তাজ্জব! সবগুলান মেয়ে লাগছেক।

—মেয়ে?

—হুঁ গ।

—ভাল করে দেখ্।

—দেখছি। উয়ারা আধা নেংটা গো। বুক দেখা যেছে। চুল দেখা যেছে। হাতে

পাতায় করে কি সব আনছে। পিছাতে মরদরা। পিছাকার উরা মরদ বটেক। হাতে ধেনুক রইছে, কাঁড় রইছে।

—কত গুলান?

—তা, অ্যানেক বটেক। মেয়াতে মরদে একশো হবে।

দলু তাকে বললে, উদিকে, উদিকের পাহাড়ে আমাদের নোকদের দেখতে পেছিস?

—উঁহু। হাঁকাব?

—থাক্। আসতে আসতে সব শেষ হয়ে যাবেক যা হবার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল অর্ধ-উলঙ্গ মেয়ে একটু দূরে এসে থামল। তাদের হাতে পাতায় ঠোঙায় ঠোঙায় কিছু রয়েছে। জন দুয়ের মাথায় হাঁড়ি। বুনোজাতের ধেনো মদের তীব্র গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। তারা এসে থমকে দাঁড়াল। তাদের পিছনে একদল প্রায় উলঙ্গ পুরুষ, তাদের হাতে মোটা বাঁশের ধনুক, পিঠে ফলাওয়ালা তীরের চোঙা এবং সড়কি।

মেয়েগুলো হেসে বললে তাদের ভাষায়, কুটুম এস, কুটুম বস। বস কুটুম, মদ খাও। মদের সাথে পিঠা খাও। মাংস খাও। আবার কুটুম, মদ খাও। না খাও তো ফিরা যাও। এ হুকুম মায়ের বটেক, এ হুকুম সাধুবাবার বটেক। খাও যদি তো কুটুম, লইলে দুশমন। ওই দেখ মরদগুলান কাঁড় সড়কি লিয়ে তৈরি বটেক।

অবাক হয়ে গেল দলু। সে জিজ্ঞাসা করলে, তোরা কে?

—ছত্রিশ জেতে আমরা। খাও কুটুম, খাও। বস কুটুম, বস। না খাও তো মা ঠাকুর কোপ করবে। সাধুবাবা বলে গেছেক ইখানকার জ্বর ধরবে। ই জ্বর মরণজ্বর। ধরলে পরে বাঁচবে না।

তারা পাতাগুলি নামালে কিছু দূরে তাদের সামনে। মদের হাঁড়িও নামালে। তারপর আবার ডাকলে, এস, খাও।

[গ]

বিচিত্র জাত। তিন পুরুষ অরণ্যভূমবাসী, দলুদের কাছেও তারা অতি-বন্য এবং অতি-বর্বর। কিন্তু দলু তাদের সঙ্গে ঝগড়াটা করলে না। তাদের দেওয়া খাবার এবং মদ খেলে। তবে প্রথমেই বলেছিল, ওদের ভাষাতেই বলেছিল, খাবারে বিষ নাই কে বললে? দিস নাই তো?

—ওরে বাবা! ওরে মা! হেই ঠাকুর! হেই সাধুবাবা! না না না!

দলু বলেছিল, বেশ, তবে তোরাও আমাদের সঙ্গে খা।

খাবার—অন্য কিছু নয়, ঘাসের বীজের মোটা পিঠে আর মাংস।

তারা বলেছিল, তুমি খাঁটি কুটুম, খাঁটি কুটুম। তুমি খাও আমি খাই। ভেঙে ভেঙে খাই।

দলু জিজ্ঞাসা করেছিল, মাংস কিসের? সাপ নয় তো?

—সাপ লয়, বুনো শুয়োর বটেক। খুব ভাল বটেক।

—আমাদের জাত যাবে যে!

—জাত ইখানে নাই। ইটা ছত্রিশ জাতের মায়ের হুকুম। আর সাধুবাবার হুকুম। আমরাই ছত্রিশ জেতে।

দলু বলছিল, আগে মদ দে। তোরা খা আগে।

তারা হেসেছিল খিল খিল করে। মরদরা হেসেছিল হো হো শব্দে —পেসাদ—আমাদের পেসাদ খাবেক?

মদ খেয়ে দলু তাদের বিবরণ শুনেছিল।

এই যে নিচে নদীর দু ধার, স্যাঁতসেঁতে জবজবে, এই যে ঘন জঙ্গল, এখানে এক মরণজ্বর আছে। সে জ্বর ধরলে মানুষের আর রক্ষা নেই। আর আছে ওই সাপ। ওই সাপে কামড়ালে হাতী মরে। এখানে আগে আগে মানুষ এসেছে। তারা সব ওই জ্বরে আর সাপের কামড়ে মরেছে। এখানে মানুষ আসে না। একদিন এক সন্ন্যাসী এল। এসে এই পাহাড়ে গাছ-তলায় বসল। সে মা মা করে কাঁদছিল। মা তাকে স্বপন দিয়েছে কি ওই মরণজ্বরের পাহাড়ে যা, সেখানে আমার দেখা মিলবে।

কদিন পর জ্বর হল সাধুর। খুব জ্বর। সাধু জ্ঞান হারাল। তখন একটি মেয়ে এসে মাথার কাছে বসে বললে, এই শিকড়টি খা। জ্বর তোর ভাল হবে।

সাধু বললে, তুমি কে মা?

মেয়ে বললে, আমি ছত্রিশ জাতের মা। আমি মদ খাই, শুয়োরের মাংস খাই। এই রাজ্য তোকে দিলাম আমি। আমার পূজা কর্। ওই মদ, ঘাসের বীজের পিঠা আর শুয়োরের মাংসে ভোগ দে। আর এই দিলাম জ্বরের ওষুধ। এই শিকড় পুঁতে দে, গাছ হবে। জ্বর হলে এই শিকড় দিবি, ভাল হবে। এখানে ছত্রিশ জাত এনে বাস করা। যত ঘর-ছাড়া, ঘর-হারা মানুষ নিয়ে ছত্রিশ জাত। উঁচু নাই নিচু নাই—সব এক।

সেই সাধুর শিষ্য হয়ে বাস করেছিল এরা। যারা এসেছিল কেউ ছিল খুনে, কেউ ছিল ডাকাত, কেউ পলাতক, কতক হা-ঘরে বেদে। নিরাপদ আশ্রয় এটি। জ্বরের ভয়ে কেউ আসে না। আসতে চায় না। তা ছাড়া চারিদিকে পাহাড়। আবার শুধু জ্বরও নয়, এখানে এসে ছত্রিশ জেতেও হয়ে যায়। জাত থাকে না। জাত মানলে ওরা লড়াই করে, তাড়ায়, মেরে ফেলে। যদি কোন আগন্তুকেরা জেতেও তাহলেও থাকতে পারে না। কারণ তাদের ওই জ্বর ধরে। যে জাত মানে তাকে ওষুধ দিতে মানা। ওষুধ কি তা কেবল একজন চেনে, আর কেউ চেনে না। তার মরবার সময় হলে সে আর একজনকে চিনিয়ে দিয়ে যায়। মায়ের আদেশ আছে সে যদি মায়ের আদেশ ভঙ্গ করে অন্য কাউকে ওষুধ বলে দেয় তবে তার হাতে ওষুধ খাটবে না। আর যে বলে দেবে—তার ছেলেপুলে সব মরবে। মায়ের দেওয়া আরও একটি ওষুধ আছে, সেটা ওই সাপের ওষুধ। সে ওষুধ কেবলমাত্র চার-পাঁচঘরের লোকের মধ্যে জানে। তারা এখানে যখন আসে তখন বেদে ছিল—এখন সবার সঙ্গেই একজাত—

ছত্রিশ জাতিয়া।

দলু এবং দলুর দল মদের নেশায় লাল চোখ বিস্ফারিত করে গল্প শুনছিল। মদটা খুব কড়া। নেশা যেন সাপের বিষের মত শন-শন করে রক্তের মধ্যে ফিরছে। মাথায় উঠে ঝিম্-ঝিম্ ঝিম্‌ঝিম্ করিয়ে দিচ্ছে মগজকে। কিন্তু দলু পাকা মদ খাইয়ে এবং তার সর্দারী করা বুদ্ধি এরই মধ্যে বেশ হুঁশিয়ারির সঙ্গে খেলছিল। সে ইশারায় সকলকে বারণ করেছিল মদ খেতে। তাতেও সকলে বোঝে নি। তখন সে বলেছিল, হাঁ হাঁ বাবা পাইকরা, গুরুর আদেশ ভুলবি না। যে ঠাঁই যাবি সে ঠাঁইয়ের নিয়ম মানবি। মানলি তো বাঁচলি, সুখ পেলি। না মানলি তো মরলি, দুখ পেলি। কি বল্ কুটুমরা?

খুব খুশি হয়ে তারা বলেছিল, হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তুমি কুটুম ভারী কুটুম, তুমি কুটুম হিয়ার কুটুম।

একটা পূর্ণযৌবনা মেয়ে, সে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল।

ওদের মাতব্বর বলেছিল, উ তুর কাছে গেল। তু উকে পেলি। তুকে দিলম। তুকে আমরা নিলম।

মেয়েটা দলুর হাত ধরে টেনে বলেছিল, চল্ আমার ঘরকে।

—বস্। তাহলে আমার গুরুর আর একটি কথা বলি। তুদের গুরুর কথা মানলাম। আমাদের গুরুর কথা শোন্। গুরু বলেছে, নিয়ম মানবি। সুখে থাকবি। কখনও গলা ঠেঁসে খাবি না পরের পেয়ে, খেলে পরে মরবি। আর তিন পাত্তরের বেশি মদ খাবি না কুটুম বাড়িতে পেথম দিন। কি? খারাপ কথা?

—না না, ভাল কথা।

দলুরা সেখানে সারাটা দিন রইল। ইতিমধ্যে ওদিকের দলটা ওদিকটা সমস্তটা ঘুরে প্রায় অপরাহ্ণ বেলায় এখানে এসে পৌঁছেছিল। সারাদিন ঘুরে তারা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। শিকার তারাও করেছে কয়েকটা ময়ূর, সজারু, কতকগুলো পাখি, দুটো হরিণ। একটা হরিণ তারা ছাড়িয়ে আগুন করে ঝলসে খেয়েছে। তবে ওদের দুজন জখম হয়েছে। একজন মরেছে। একটা পাহাড়ে নাকি ভিমরুলের গুহা আছে। আগে যারা যাচ্ছিল তারাই ওই গুহার মুখে এসে হঠাৎ ভিমরুলের সামনে পড়ে। দেখতে দেখতে ভন ভন শব্দ করে ঝাঁক বেঁধে তাদের তাড়া করে। তাদের কজন তাড়াতাড়ি করে ছুটতে গিয়ে শেষ পথ না পেয়ে পাহাড়ের পাথরের উপর থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে। তারা হাত পা ভেঙে বেঁচেছে। একজনকে ভিমরুলেরা ছেঁকে ধরে বিঁধে মেরে ফেলেছে। পিছনের দল থমকে গিয়ে পিছিয়ে যায়। তারপর শুকনো ডাল যোগাড় করে আগুন জেলে সেই জলন্ত ডাল মাথার উপর ঘুরিয়ে অনেক ঘুরে পাহাড়টা পার হয়েছে।

বুনোদের মাতব্বর বললে, বাপ্, উগুলান মায়ের বাহন বটেক। আগে আরও ছিল, ই পাহাড়ে ছিল। তা সি সন্ন্যাসী মাকে বলে বনে আগুন লাগায়ে মন্তর পড়ে যজ্ঞ করলেক। তখুন ই পাহাড় থেকে ভিমরুলরা পালাল। মায়ের আদেশ রইল—উ পাহাড় ভিমরুলের রইল। ওরা তুদের বিপদে আপদে সহায় হবেক। বিন্ধ্যাচলে মায়ের সৈন্য আছে—ভ্রমর।

এখানে ভিমরুল।

দলু সারা দু প্রহরটি সেই যুবতীর সঙ্গে কাটিয়েছিল তার ঘরে। মেয়েটা বলেছিল, তুমি একটা বীর বটেক। বাবা রে, গায়ে কত বল তুমার! তোর্মার কেমন রঙ বটেক গোরাপারা! চোখ দুটো বড় বড় বটেক! তুমি খুব সোন্দর।

দলুর বয়স তখন দু-কুড়ি সবে পার হয়েছে। সে তখন ভরা জোয়ান।

তার নিজের রূপের এবং শক্তির অহংকার ছিল। তার ভাল লেগেছিল যুবতীর স্তব প্রশংসা। তার শখের গোঁফে তা দিয়ে বলেছিল, ই দুটো?

—হুঁ। খুব খুব খুব ভাল। আমাদের মরদগুলার মোচ ইত্তিটুকুন টুকুন—ছাই।

দলু স্ফীত হয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ হয় নি। সে জেনে নিয়েছিল এখানকার সবকিছু এবং জানতে পেরেছিল যে এই এদের আত্মরক্ষার কৌশল। এখানে তাদের মত দু-চার দল কখনও কখনও এসেছে। এখানে থেকেছে। মদ আর নারীর সঙ্গ তাদের পা এখানকার মাটিতে পুঁতে দেয়। কিন্তু দশ বারো দিনেই তাদের জ্বর শুরু হয়। জ্বর প্রবল, তার সঙ্গে রক্ত দাস্ত। তিন দিন চার দিনের বেশি কেউ বাঁচে না। এদের সর্দারই ওদের ওঝা। সেই জানে শুধু ওই জ্বরের ওষুধ। সত্যিই জানে। তাদের নিজেদের মধ্যে জ্বর হলেই শুধু সেই শিকড় দেয়। কিন্তু যারা আসে তাদের অন্য শিকড় দিয়ে থাকে। তারা মরে।

এখানকার জ্বর নিয়ে যারা ফিরে যায় তারা সেই জ্বর নিজের গ্রামে ছড়ায়। সেই জন্য ছত্রিশ জাতের জঙ্গলে কেউ আসে না। এখানে ঢোকবার পথকে লোকে বলে যমদুয়ার। ওই যে নদীটা—যে মুখটায় বেরিয়ে ঝোরা হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে বয়ে যাচ্ছে, ওইটারই নাম যম-দুয়ার। কখনও কখনও দু একটা মানুষ মিশে থেকে গিয়েছে। তাদের মেয়ে এদের দিয়েছে। ওদের মেয়ে ওরা কুটুম্বদেরই দিয়ে খুশি করে।

মদের ঝোঁক কেটে আসছিল দলুর। দলু পাইকদের সর্দার, তার বুদ্ধি অনেক। সে নিজেদের মধ্যে দলে দলে প্যাঁচ কষেছে। এক রাজার হয়ে অন্য রাজার হয়ে লড়াই করতেও বুদ্ধি নিয়ে খেলতে হয়েছে।

রাজারা সোজা নয়, তারা খুব বাঁকা মানুষ। লড়াই জেতার পর কত বার, যে-রাজার হয়ে তারা লড়েছে, তাদের সঙ্গেই সময়ে আচমকা লড়াই দিয়ে লুটেপুটে পালাতে হয়েছে। নইলে সময় পেলে ওই রাজাই তাদের মেরে ফেলত। বুদ্ধি তার আছে।

সে অনেক ভেবে সেদিনের মত তার কাছে বিদায় নিয়েছিল। বলেছিল, কাল আসব। আজ যাই কুটুম। আজ আচমকা এসেছি। কাল জিনিসপত্র নিয়ে আসব।

তারা দিয়েছিল এক হাঁড়ি মধু।

দলু চেয়েছিল নুন, নুন দিতে পার?

তারা তাও দিয়েছিল। বলেছিল, নুন আছে—যত লিবে। উই নিচে জবজবে একটা ঠাঁইয়ে ফুটে ফুটে উঠে সাদা হয়ে।

আস্তানায় ফিরে এসে সারা রাত্রি অনেক চিন্তা করে পরামর্শ করেছিল ভৈরবের সঙ্গে। ভৈরবকে বলেছিল, ভৈরব, এই ঠাঁইটার মতন ভাল বসতের জায়গা মিলছে না। ওই বারো

পাহাড়। ইটার সঙ্গে উটা যেখানে যেখানে মিলেছে সেখানে ঘাঁটি বসালে—আর নদী মায়ের দু মুখ, একটা উ-মাথায় ঢুকার মুখ আর ই-মাথায় বেরুবার মুখ আগলে দিলে যমও ঢুকতে লারবে। তার উপরে আছে ওই জ্বরের বিষ। জ্বর ধরলে দশ দিনে হাজার জনা খতম করবেক। ই জাগা ছাড়া হবে নাই। শুধু জানতে হবেক ওই জ্বরের ওষুধের শিকড় গাছ, আর সাপের বিষের শিকড় গাছ। সাপের ওস্তাদ আমাদের আছে। কিন্তুক জ্বরের বিষের ওষুধটা—উটা আদায় করতে হবেক।

ভৈরব বলেছিল, সি কি করে আদায় করবেক? ওই একটি লোক জানে। সেই সদ্দার। সে তো দিবে নাই সিংজী।

—দিবে রে দিবে। সে ঠিক বার করে লিব আমি। হেসেছিল দলু।

—মেরে? যাতনা দিয়ে দিয়ে?

—সে শেষে। আগে শুলুকে।

—সিটা কি রকম?

—কটা খুব চালাক চতুর ছুঁড়ি চাই। চতুর হ' চাই, চটকদার হ' চাই। বেটাছেলেকে খেলাতে পারা চাই। যে সব মেয়ে আমরা ইখান উখান থেকে লুটে ছিনিয়ে এনেছি—তাদের ভিতর থেকে বেছে আন।

—হুঁ, বুঝলম। বলেছ ঠিক।

দলু বলেছিল, ইদিকে আমি রইলম। যে মেয়েটো আমাকে ধরেছে সিটা ওই সদ্দারের ছিল। সিটা আমাকে কাল খুব ভুলাতে চাইলে।

গোঁফে তা দিয়ে দলু বললে, তা সিটাই ভুলল আমার কাছে। আমিও দেখব, সি জানে কিনা। আমার সঙ্গে দশটা মরদ যাবেক। আর পাঁচটা ছুঁড়ি। দে দেখি দেখে। ঠিক সাত দিন বাদে আমি খবর দিব। না পেলে তু জানবি বিপদ। তখুনি তু যাবি দল নিয়ে। একবারে শালাদিকে সব শেষ করে দিবি। সাত দিন তু রইলি। আমি রুক্মিণীর বাবা, তু তার কাকা। রুক্মিণী আর অর্জুন ইদের ভার তখন তুর।

—তাই হবেক সদ্দার।

—তু পিতিজ্ঞে কর্। আমি যদি মরি তবে তোর জান থাকতে উদের দুখ হবে নাই। তিন সত্যি কর্।

—করলাম। করলাম। করলাম।

—আমিও বললাম, সদ্দারী তখুন তোর। রুক্মিণী তোর বিটী, অর্জুন তোর নাতি। বেইমানি করলে তোর দুটো বেটা আছে, দু বেটার মাথায় বাজ পড়বে।

—পড়বে। পড়বে। পড়বে। শুধু তাই নয়—বেইমানী করলে আমার কুঠ হবে। হল তো?

—সাবাস, সাবাস! তু আমার মায়ের পেটের ভাইয়ের বাড়া। এখুন দেখে দে পাঁচটা ছুঁড়ি, দশটা মরদ। আর একটা কথা ভৈরব—

—কি বল।

ওই ঝোরার ধারে উচা শাল গাছটোর ডগায় একটো সাদা কাপড় বেঁধে দে। কুনো বেপদ হলে, রুক্মিণী অর্জুনের কুনো রোগ হলে উটা নামায়ে লিবি, লাল কাপড় বেঁধে দিবি। হোক্।

—হোক্।

দশটা মরদ—সেরা মরদ আর চালাক মরদ বেছে দিল ভৈরব। আর পাঁচটা লয়, ছটা মেয়ে এনেছিল। সব কটিই যুবতী এবং চঞ্চলা, না, তারও বেশি তারা—চপলা। এরা সব ওদের হরণ করে আনা মেয়ে বা হরণ করা মেয়ের মেয়ে। ওদের মধ্যে এরা দাসীর মত থাকে। ওদের ভোগ্যা।

দলু বলেছিল, সব শুনেছিস গ— ছুঁড়িরা?

তারা মুখ নামিয়ে মুচকে মুচকে হেসেছিল।

দলু বলেছিল, শুন্ শুন্, লাজের কথা লয়। তুদের হতে হবে মেনকা রম্ভা। অপ্সরী হতে হবেক। অসুর ভুলাতে হবেক। হাঁ! আর এই ছোকরা বেটারা! উদের মেয়েদের সঙ্গে মাতেতে পারবি তো?

তারা খুক খুক শব্দ করে হেসেছিল।

দলু বলেছিল, হুঁ—শুধু মাতলে হবে নাই। মাতাতে হবেক।

মেয়েদের মধ্যে সেরা মেয়ে পঞ্চি—তাকে নিয়ে দলু ছত্রিশ জাতিয়াদের সর্দারকে দিয়ে বলেছিল—এই লে। ইটোকে তোকে দিলম। তু আমাকে ঝুমরীকে দিলি, ইকে আমি তোকে দিলম।

তিন

বুদ্ধির খেলায় দলুর জিত হয়েছিল। তিন দিন পরই দলু পেট ধরে পড়েছিল, পেটে যাতনা হচ্ছে। চার দিনের দিন পঞ্চিকে, যাকে দলু ছত্রিশ জাতিয়ার সর্দারকে দিয়েছিল, সেই পঞ্চিও একটা ইশারা দিয়েছিল। তারপর সেই যুবতী ঝুমরীকে বলেছিল, ঝুমরী, আমাকে বাঁচা, আমি কখুনও পালাব নাই।

ওদিকে পঞ্চিও পেটের যাতনায় ভান করে পড়ে ছিল এবং সর্দারকে বলেছিল, সর্দার, আমাকে বাঁচাও। সর্দার তাকে শিকড় দিয়েছিল খেতে। পঞ্চি তাকে দেওয়া সেই শিকড়টা চতুরালি করে খুঁটে বেঁধেছিল। এদিকে ঝুমরী দলুকে দেওয়া শেকড়টা দেখে, সেটা খেতে দেয় নি, বলেছিল, আমি ঠিক শিকড় আনছি, ইটা খেয়ো না। তারপর আর দেরি হয় নি গাছটা জানতে। দলুর গোটা অসুখটাই নকল। সে ঝুমরীর দেওয়া শিকড়টা খাবার ভান করেছিল; খায় নি। অবসর মত গোপনে পঞ্চির সংগ্রহ করা জড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বুঝেছিল—হ্যাঁ, এই আসল জড়ি।

ইতিমধ্যে পাঁচ দিনের দিন সত্যিই একটা জোয়ানের জর হয়েছিল। সেদিন ছত্রিশজেতে

সর্দার ওষুধ দিলে। সেটা দেখে দলু বলেছিল, সর্দার, ঠিক জড়ি দাও। জাল দিয়ো না।

সর্দার বলেছিল, জাল লয়। ঠিক বটেক।

—না। লয়। এই দেখ আমার কাছে আসল জড়ি আছে।

চমকে উঠেছিল সর্দার, উ তুমি কুথা পেলে?

দলু সোজা উত্তর না দিয়ে বলেছিল, কুটুম বলেছ, কুটুম হয়ে রইলাম। কিছু কইলাম না। এখুন বেইমানী করলে তোমার ই জাগা আমি চবে দিব, ধ্বসে দিব। তোমাদের সব লোককে কেটে ফেলাব। হাঁ!

ছত্রিশ জাতিয়া সর্দার এবার বোবা হয়ে গিয়েছিল। এদিকে দলু তার এক জোয়ানকে পাঠিয়েছিল ভৈরবের কাছে: যেন বিশ পঁচিশ বাছাই মরদ তুরন্ত এসে হাজির হয়ে যায় এক-বারে তৈয়ার হয়ে।

তাই এসেছিল। এবং ছত্রিশজাতিয়া দলের গুপ্ত অস্ত্র মরণজ্বরের ওষুধের জায়গাটিতে ওদের সর্দারকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, চেনাও ওষুধ। শোন কথা। ওষুধ যদি চেনাও, তবে তুমি থাকলে, আমি থাকলাম। মিতা হলব। আমার লোকেরা থাকবে, তোমরাও থাকবে। মুখের কুটুম সত্যি কুটুম হবে। তা নইলে তুমাদের বেটাছেলেদিগে মায়ের থানে লিয়ে গিয়ে কাটব। মেয়েগুলাকে লুটে লিব। চলে যাব ইখান থেকে। বাস, দেখ। তবে গাছ আমি চিনেছি। পঙ্খি দিয়েছে জড়ি, ঝুমরী সেও এনে দিয়েছে জড়ি, আমি গন্ধ দেখলম এক, চেখে দেখলম এক। ছাপি আমার কাছে নাই।

সর্দার বোকা হয়ে গিয়েছিল এবং সঙ্কিয়ে সব দেখিয়েছিল। কিন্তু লোকটা খাঁটি লোক ছিল। দলু তার নামে মাথা নামায়। সে যা করত তার ধরম পালন করত। কি করবে? ওইটাই ছিল এদের নিয়ম। কে করেছিল কে জানে! হয়তো সেই সন্ন্যাসী, নয়তো এরাই।

এদের বুদ্ধিমত এই মরণ জ্বরে জর্জর জায়গাটির রাজত্ব বজায় করবার এ ছাড়া অস্ত্রও তাদের ছিল না। গুপ্ত নিয়ম। নিয়ম ছিল—কুটুম্বিতার ভান করে জায়গা দেবে। তারপর জ্বর ধরলে আসল ওষুধ দেবে না; যা-তা জড়ি দেবে। তা হলে তারা জ্বরে সব মরবে—নয় তো প্রাণের ভয়ে পালাবে। এ সর্দার সেই নিয়ম পালন করতে চেয়েছিল। কিন্তু দলুর বুদ্ধির কাছে হার মেনে ওষুধ চেনাতে বাধ্য হয়েছিল। নিয়ম ভেঙে সে আর বাঁচে নি। মরেছিল ইচ্ছে করে। সেদিন সে খুব মদ খেয়ে ফুর্তি করেছিল। কিন্তু পঙ্খিকে নিয়ে নয় ঝুমরীকে নিয়ে। তবে পঙ্খি দলু সবাই ছিল। সে মদ খেয়ে দলুকে বলেছিল, আজ কিন্তু আমরা নাচব—সারারাত্ত নাচব।

দলু বুঝতে পারে নি। বলেছিল, বেশ তো।

সে আর ঝুমরী নাচ আরম্ভ করেছিল। সে মাদল বাজাচ্ছিল, ঝুমরী নাচছিল। মধ্যরাত্রি তখন। দূরে উঠেছিল বাঘের ডাক। বাঘের ডাক দূরে দূরে রোজই ওঠে। এখানে মরদরা পাহারা দেয়, টিন বাজায়, আগুন জ্বালে। বাঘেরও খাদ্যের অভাব হয় না। জানোয়ার আছে। হরিণ, বুনো বরা। হরিণ উপরের দিকে অনেক। কেবল বড় পাহাড়টায় নেই।

ছত্রিশ জাতিয়ারা তাড়িয়েছে। নইলে ওদের টানে বাঘ আসবে।

বাঘের ডাক শুনে সর্দার মাদল থামিয়েছিল। ঝুমরীও থেমেছিল। সর্দার এসে ঝুমরীর হাত ধরে বলেছিল, চল।

দলু ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি এবং তার তখন ঘুমও এসেছে। তার ঘুম ভাঙিয়েছিল পঙ্কি।

—সর্দার!

—কি?

—উরা চলে গেল। ঝুমরী আর সর্দার।

—কোথাকে?

—বনে বনে ছুটে চলে গেল।

দূরে তখন বাঘ ডাকছে। দলু বলেছিল, সে কি?

উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। ডেকেছিল, সর্দার! সর্দার! ঝুমরী!

ছত্রিশ জাতিয়ার একজন এসে বলেছিল, ডাকিস না উদের। উরা বনে গেল। ডাক এসেছে।

—কার?

—মায়ের। মায়ের বাঘ ডাকছেক শুনছিস না?

—কি বলছিস?

—ঠিক বুলছি। উ তো গেল বাঘের প্যাটে যাবে বলে। বাঘ আজ তাই লেগে তো আইছে। মা পাঠায়েছে।

—সে কি!

—হুঁ। তুকে সে ওষুধ দেছেলে। ইখানকার যাদুটি গেল। উর অপরাধ হল, পাপ হল। সাধুবাবার, মাঠাকরুনের আদেশ বটেক্ কি—যে সর্দার ই ফঁাস করবে তাকে পাপ লাগবে। কুঠ হবে। তবে বাঘে ডাকলে যদি তার প্যাটে যেতে পারে তবে পাপ খণ্ডাবে। উ চলে গেল। যেতে দে। আমরা তুর বশ মানলম।

পরদিন সকালে খুঁজে দেখেছিল দলু, সর্দারের দেহের কিছু পায় নি, পেয়েছিল তার গলার মালা। বুনো ফলের কালো আর লাল বীজের মালাটা। আর কোমরের গাছের ছাল থেকে বের করা সুতোর ছোট্ট কাপড়খানা। ঝুমরী কিন্তু মরে নি। সে মরতে ভয় পেয়েই উঠে পড়েছিল একটা গাছে। দলু সর্দার তাকে নামিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল। মেয়েটা কিন্তু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল—আমি লারলম গো, গাছে উঠে বাঁচলম।

দলু তাকে খুব সমাদর করে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

* * *

তারপর দলু ছত্রিশ জাতিয়ার জঙ্গলে নিয়ে এসেছিল তার সমস্ত দল। খুব হিসেব করে সে এখানে বাস পত্তন করেছে। খুব হিসেব করে।

শুধু ভৈরবের সঙ্গেই সে পরামর্শ করে নি। ঝুমরীর সঙ্গে আর পঙ্কির সঙ্গেও পরামর্শ করে-

ছিল। ওই দুজনকেই সে নিজের উপপত্নী করেছিল। পক্ষি লুঠ করে আনা মেয়ে, সে ভাল জাতের মেয়ে, বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। সে যখন ওষুধের শিকড়টা দেখেছে তখন তার স্বাদ জানে, গন্ধ জানে। খুঁজে বার করতে তার খুব দেরি হবে না। ঝুমরীর বুদ্ধি না থাক সে ওষুধ চেনে। এ ওষুধের উপর পুরো অধিকার না থাকলে ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গল পাহাড়ের রাজত্ব থাকবে না।

এ ওষুধ অন্যে জানলে সে দল বাঁধবে। দল নিজের শক্তিতে। তার দলকে না পারলে বাইরে থেকে অন্য দল ডেকে আনবে।

দল বাঁধবে এই ভয়েই সে তার একশো পাইককে পাশাপাশি তিনটে পাহাড়ে বাস করিয়েছিল। নইলে ভৈরব বলেছিল, সর্দার, সব পাহাড়ে ছড়িয়ে কিছু কিছু করে বসাও।

দলু বলেছিল, না ভৈরব। মন না মতিভ্রম রে! উ হবে না। বেশি ছড়ায়ে বসালে পরে পাড়ায় পাড়ায় কোঁদলের মতন কোঁদল বাড়বে। কোঁদল থেকে ঝগড়া খুনোখুনি।

ভৈরব সেটা মেনেছিল।

দলু বলেছিল, দেখ্ যা করছি, সব ওই কুমর অর্জুন সিং-এর জন্যে। রাজা মাধব সিং-এর বেটার জন্যে। তার জন্যে এই ছত্রিশ গড়িয়া জঙ্গলকে গড় বানিয়ে তার হাতে দিয়ে যাব। আর বলে যাব, কুমর অর্জুন সিং, তুমি আমার নাতি বট। বিটীর বেটা বট, কিন্তু তুমি খাঁটি ছত্রি, রাজপুত। আমি তোমার দাদো, মায়ের বাপ। আমরা এককালের শোলাঙ্কী রাজপুত। অগ্নিদেবের বংশ। আপদ্ধর্মে আত্মরক্ষার জন্য পৈতে হারিয়ে শুল্কী হয়েছি। আমরা আবার শুল্কীদের মধ্যে বারোভাইয়া, পৈতে ছেড়েছি কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্ম আমাদের অটুট রেখেছে; আমাদের বেটীরা দুবার শাদী করে না। বেটী আমার কিষণজীর ভজন করে, পূজন করে। আমার বেটী তোমার মা সাক্ষাৎ দেবী মহাসতী। মাধব সিং-এর রাখী হয় নি, সে শাদী করে তার রুক্মিণী নাম আর শোলাঙ্কী রাজপুতের ধরম রেখেছে। তোমার বাপের কাছে কথা দিয়েছিলাম তোমাকে বাঁচাব, তোমাকে রাজা করে বসিয়ে যাব। তা এই ছত্রিশ গড়িয়ার জঙ্গলকে গড় বানিয়ে তোমাকে রাজা করলাম। দিয়ে গেলাম এই পাইকদের। তুমি এদের রাজা, এদের দেবতা। এদের ভালবেসো। আর একটি কাম করো রাজা, আমার ভাইয়া, এদের সঙ্গে চলে তুমি এদের জাতে তুলো। এদের বেটী ভাল লাগলে শাদী করো, রাখনী করো না।

ভৈরব অভিভূত হয়ে শুনছিল। সে বলেছিল, সর্দার, বাহা! বাহা! বললে তুমি। বাহা বাহা বাহা! ধরমের কথা। মানুষের মত কথা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক সর্দার। তামাম পাইক কুমর অর্জুন সিং-এর গোলাম। দাঁত দিয়ে তার পায়ের কাঁটা তুলবে। জান দিয়ে তার হুকুম তামিল করবে। কুমর অর্জুন সিং বড় ভারী রাজা হবে তুমি দেখো, মুল্লুক তার নামে কাঁপবে। কুমর বড় হতে হতে আমাদের একশো জোয়ানের ছেলেপিলেতে পাঁচশো হয়ে যাবে বিশ বছরে। আমি বলি চন্দনগড়ে যারা বেওয়া হল, মরদ যাদের মরল তাদের সব সাঙা দিয়ে দাও! এক এক জোয়ান দুই তিন পরিবার। তাহলে পাঁচশো কেন হাজার হয়ে যাবে। আর একটা কাজ কর।

—কি ?

—এই বুনো মরদগুলোকে মেরে ফেল। এদের মেয়েগুলোকে দিয়ে দাও পাইকদের।

—না। ঘাড় নেড়ে দলু বলেছিল, না ভৈরব। সে বেধরম হবে, অধরম হবে। দেখ, মাধব সিংকে মারলে অধরম করে, আমাদের পাইকদের মারলে হাজার জনার তিনশো জনাকে ঘিরে। সে অধরম, সে পাপ। ভগবানের খাতায় সে পাপ উঠে গেল। সে অধরমে আমরা দুনিয়াতে দুঃখ পেলাম, ভগবানকে দেখালাম—বললাম বিচার করো। মরণের পর তিনি বিচার করবেন। জরুর করবেন। সুচেত সিং মার হবিব এদের মরণের পর এর বিচার জরুর হবে। চাঁদ সুরয এখনও উঠছে, দিন হচ্ছে রাত্রি হচ্ছে। বিচার হবে না ? কুমর অর্জুন সিং বড় হবে, মস্ত বীর হবে। ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার হাতে ছুটবে টগাবগ টগাবগ। দুশমন দেখবে কি যম আসছে। সে তীর ছুঁড়বে, দুশমনের বুকে বাজবে বাজের মত। ওই মীর হবিব, ওই সুচেত সিং-এর খুন নিয়ে আসবে। রুক্মিণীর পায়ে ঢালবে, বলবে, লাও মা—দুশমনের খুন। বাপের খুন তারা নিয়েছিল, আমি আনলাম তাদের খুন। দুনিয়া ধন্যি ধন্যি করবে। উপরে দেবতা বলবে, সাধু সাধু। জিতা রহো। তেমনি বেইমানী করে এই মানুষ কটিকে অনেকজনা মিলে মেরে ভগবানের অভিশাপ আমি কুড়োতে পারব না। আমি ছত্রি রে। শোলাঙ্কী রাজপুত। অগ্নিদেবের বংশ। তা ছাড়া এখানে যে মাতাজী আছেন তিনি রুষ্ট হবেন। যে সাধু ওদের বসিয়ে গেছেন তাঁর আত্মা কোপ করবেন। খবরদার—খবরদার।

ভৈরব বার বার ঘাড় নেড়ে বলেছিল, ঠিক। ঠিক। বহুৎ বহুৎ ঠিক।

দলু বলেছিল, ওই ওষুধটার জন্যে সর্দারের সঙ্গে চাতুরি খেলে মনটা খচ্‌খচ্‌ করছে। লোকটা নিজে গেল বাঘের পেটে। তবে—

একটু ভেবে বলেছিল, না, আমার দোষ নাই ভৈরব। ও লোকটাই তো চাতুরি খেললে প্রথম। আমি তো নই। ভেবে দেখ, কুটুম বলে ডাকলে, মদ দিলে, পিঠা দিলে, বুনো বরার মাংস দিলে,—আমরা জাত মানলাম না, কুটুম্বিতে মেনে নিয়ে ভগবানকে ডেকে খেলাম। কিন্তু উর মতলব ছিল আমাদের জর ধরিয়ে মেরে ফেলা। জাল ওষুধ দিলে বলেই আমি জাল ফেললাম পাল্টা। ঠিক কি না ?

—হাজার বার ঠিক।

দলু বলেছিল, বাস্। তবে আর অধরম করব না। উ দিকে মারব না। উরাও থাকুক আমাদের অধীন হয়ে। আমরাও থাকি। এখন এক কাজ কর—জলদি গাছ কেটে ফেলে সব আগে একখানা ঘর বানিয়ে দে কুমর অর্জুন সিং আর রুক্মিণীর জন্যে। তা'পরে সব চলে আয়। এসে ঝপাঝপ ঝুবড়ি বানিয়ে লে পেত্থম। তা'পর হবে ঘর বাড়ি। কি বল ?

—ঠিক বলেছ।

দলু বলেছিল, তবে যে দিন আসবে সেইদিন ওই মা আর সাধুর স্থানে পুজা দিতে হবে, হাঁ। তারপর হবে বসত একে একে।

—ঠিক আছে, ঘর একখানা বানাতে কদিন ? চার চার মিস্ত্রি আছে, পঞ্চাশ ষাট জোয়ান আছে, বুড়া আছে চল্লিশ, চৌদ্দ পনের ষোল বছরের ছেলে আছে পঞ্চাশ। শক্ত পোক্ত মেয়ে

আছে, দু তিন শো আছে ছুঁড়িতে আধ বুড়িতে। সবাই খাটবেক। ক দিন লাগবে?

পরদিন সকাল থেকে গাছ কাটা শুরু হয়েছিল। ছত্রিশ জাতিয়া বুনোরা থাকে ছোট ছোট ঝুবড়ীর মধ্যে। তারা আয়োজন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

দলু ভৈরবকে বলেছিল, ভৈরব, এদের জন্তে কাপড় চাই রে। মেয়েগুলা আধ ল্যাংটা থাকলে চলবে না। ছোঁড়াগুলান জাহান্নামে যাবে। বেটাছেলেগুলাকে কাপড় দে। নইলে আমাদের মেয়েরাই বা বেরাবে কি করে?

—কাপড় কোথা মিলবে?

—কাছে পিঠে হাট কোথা খোঁজ্‌।

—কিনবার টাকা কোথা?

—বেকুব বেহদ্দা কুথাকার! কিনবি কিরে? কিনবি কি? অাঁ? লুঠ! হাঁ। খাজনা আদায়! কুমর অর্জুন সিংয়ের নজরানা! আদায় শুরু করে দে।

চার

এ সব হল বিশ বছর আগেকার কথা। আজ বিশ বছর বাদ দলু সর্দার এখন পঁয়ষট্টি বছরের প্রৌঢ়। বালেশ্বর অঞ্চল থেকে সন্ত-ফেরত ভীম পাইকের ছেলে গণ্ডারের কাছে বর্গীদের নতুন সমাবেশের কথা শুনে ভাবছিল। খবর ওই গণ্ডার এনেছে। পথে সে শুনে এসেছে—বর্গীরা আবার আসছে। ভাবতে ভাবতে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে একটা কারণে। কুমর অর্জুন আজ বিশ বছরের মরদ। বহুৎ আচ্ছা জিন্দা জোয়ান। এইবার তাকে একদিন সকলকে ডেকে ওই মায়ের মন্দিরের সামনে পাথরে বাঁধানো সর্দারীর বেদীর উপর আচ্ছা এক কাঠের চৌকি রেখে রাজা করে দেবে কি না। সমস্ত কথা বলে বলবে কি না যে, কুমর অর্জুন, তোমার বাপকে অধরম করে খুন করেছিল মীর হবিব। সে সাক্ষাৎ শয়তান। সে চলল আবার বাংলা মুলুকে তোমার গড়ের পাশ দিয়ে। তুমি পার তো শোধ নাও তোমার বাপের মৃত্যুর। এই মস্ত সুযোগ। ওদিক থেকে আসবে নবাব আলিবর্দী। তার সঙ্গে লড়তে হবে মীর হবিবকে। মীর হবিব বর্গী, এরা সামনাসামনি লড়ে না। এরা নবাব এলে পালায়, নবাব ফিরলে পিছু নেয়। ঠিক নেকড়ের দল। আবার নবাব ফেরে তো ওরাও ফের পালায়। যারা শক্তিমান তাদের সামনে শেয়াল, পিছনে বাঘ। তোমার এই সুযোগ অর্জুন সিং। এমন সুযোগ আর মিলবে না। আমরা সবাই তোমার পিছনে আছি। দলু সর্দার শুধু তোমার দাদো, তোমার বাপের শ্বশুর নয়, তার নোকরীও করেছে, নিমকও খেয়েছে। বিশ বছর ধরে এর জন্তে অনেক কষ্ট সয়ে অনেক কৌশল করে সব আয়োজন করে রেখেছে। ছত্রিশ জাতিয়ার জঙ্গলগড় গড়ে তুলতে কি কম মেহনত করেছি? কম তকলিফ সয়েছি? লোকের জান গিয়েছে। জরে আমাশয়ে কি কম মানুষ মরেছে! ওষুধ এখানে আছে। গাছের শিকড়,

সে দলু জানে। সে ছাড়া আর এক শিখিয়ে রেখেছে তোমার মা রুক্মিণীকে। হঠাৎ যদি মরে সে—তবে! তবে যে বিলকুল বরবাদ হবে। ওষুধ থাকতেও ওষুধ খেয়েও মরেছে মানুষ। এক এক বছর এমন হয়েছে যে এখান থেকে পালাবার জন্যে লোকে পাগল হয়ে উঠেছে। এখানকার মাতাজীর পূজা দিয়েছি। বরার রক্ত দিয়েছি। নিজেরা বুক চিরে রক্ত দিয়েছি। এক একবার তবু মাতাজী প্রসন্ন হন নি। ফের পূজা দিয়েছি। তারপর কমেছে।

দলু সর্দার অনেক বুদ্ধি ধরে। কুমর অর্জুন সিং সে লোকদের জোর জবরদস্তি করে ধরে রাখে নি। তার বুদ্ধি আছে, সে এই বারো পাহাড়ের মাঝবরাবর ক্ষেতি করিয়েছে। কেটেকুটে পাহাড়ের গায়ে জমিন করে তাতে জোয়ার ভুট্টার চাষ করিয়ে প্রতিটি পাইককে জমি দিয়েছে। চাষ করো, খাও, ছোটখাটো হোক বেশ মজবুদ মজবুদ ঘর বানিয়ে দিয়েছে। মাটিতে পাথরের চাঁইয়ে দেওয়াল গেঁথে শাল কাঠের চাল কাঠামো করে ঘাস দিয়ে ছাইয়ে খাসা ঘর হয়েছে। সর্দারদের ঘর বড়। তোমার ঘর সকলের থেকে বড়, সকলের থেকে ভাল। তোমার জন্যে রাজার ছেলের মত ঘরও বানাতে পারত, তা বানায় নি। বাইরের লোকের চোখ পড়বে। এখানেও বহুৎ লোকের হিংসা মনে হবে। বাইরের লোক জানে এরা সব ছত্রিশ জাতিয়া। তা জানুক। ছত্রিশ জাতিয়াদেরও সে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওরা আর সেই ন্যাংটা নেই। ওরাও এখন প্রায় পাইক হয়ে উঠেছে। এখানকার সাপকে জব্দ করেছে ওরা। প্রতি বছর সাপ মারিয়েছে দলু সর্দার। সাপের কামড়ে প্রথম প্রথম লোক কম মরে নি। লোক মরেছে, গরু মরেছে, ঘোড়া মরেছে। সাপ এখনও দশ বিশটা আছে, তবে লুকিয়ে থাকে। ওরাও মানুষকে ভয় করতে শিখেছে। বিশ বছরে বাঘের পেটে ভালুকের আঁচড়ে বুনো বরার দাঁতে তাও অনেক আদমী গিয়েছে। তাদেরও মেরেছে।

নদীর ধারে স্যাঁতসেঁতে জবজবে জমি এখন অনেক শুখা শুখা হয়েছে। নালা কেটে কেটে নদীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। সেখানে কিছু কিছু ধান হয়। লোহার বাগদা এনে কামারশাল করেছে। হাতিয়ার শানায়, বানায়ও। লুটেপুটে হাতিয়ারও জড়ো করেছে অনেক। ছুতার তৈরি করেছে।

ছত্রিশ জাতিয়া গড়ের বারো পাহাড়ে, পাহাড়ে পাহাড়ে যেখানে যেখানে জোড়, সেখানে সেখানে মোটা মোটা কাঁটা গাছ, বড় বড় বট অশ্বত্থ গাছ লাগিয়ে তার আড়ালে মজবুত মজবুত ঘাঁটি বানিয়েছে। আর নদী যায়ী যেখানে ঢুকেছে, আর যেখানে ঝোরার মুখে ঝরে পড়ে চলে গিয়েছে, এই দুই মুখে দুই দুই চার ঘাঁটি রেখেছে। সব জায়গায় আছে নাকাড়া। গাছের উপর মজবুত মাচান করা আছে। দেশে মুল্লুকে ঝঞ্ঝাট হলে মাচানে পাইকরা বসে যায়। পাহারা দেয়। বড় বড় পাথর জমা করা আছে। গড়িয়ে দিলে সিপাহী ঘোড়া গুঁড়িয়ে যাবে, হাতী পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে যাবে। এখানকার চারিপাশে গাঁওয়ের লোকের সঙ্গে কোন ঝগড়া রাখে নাই। তাদের চুলেও হাত দেয় না। অনেক দূর দূর গিয়ে তারা গাঁও থেকে ধান আদায় করে আনে। দূর থেকে হাট লুট করে আনে কাপড় মসলা তেল সরষা। সব জিনিস আনে। আয়না আনে, কাঁকুই আনে, দস্তার গহনাও আনে। টাকা আনে। কাছের হাটে ঠিক দাম দিয়ে কেনে। এখান থেকে দু কোশ দূর দিয়ে গিয়েছে বাদশাহী

সড়ক। সেখানে যাত্রীদের উপর কোন হামলা করতে দেয় না। স্রেফ রাস্তা পাহারা দেয় বলে মানুষ পিছু এক পয়সা আদায় করে নেয়। তবে লুট করে অনেক দূরে। সে সবই অন্য জায়গার পাইকদের নামে যায়।

কুমর অর্জুন সিং, তুমি বিশ বছরের হয়েছ। তোমার বাপের মত জোয়ান তুমি। গোঁফও তোমার বাপের মত। চোখ দুটোও তেমনি মোহনিয়া। রঙটা শ্যামলা হয়েছে সে তোমার মায়ের জন্যে। সাহসও তোমার খুব, বীরও তুমি বাপের মত। ভৈরবের সঙ্গে লাঠি ধরতে পার। আমার সঙ্গে তলোয়ার। তীরধনুকেও ওস্তাদ। সব থেকে তোমার হিম্মত সড়কিতে। গত দু বছরে দুটো বাঘ মেরেছ। একটা চিতা, একটা ডোরা। তুমি ডোরাটাকে এক সড়কিতে প্রায় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করেছ। সাবাস! সাবাস! সাবাস! কিন্তু তুমি মাতাল হয়ে গেছ; বড় বেশি দারু খাও। দারু পেলে জলের মত ঢক ঢক করে খাও। নেশায় হুঁশ থাকে না। কখনও কখনও বেহেড হয়ে যাও। আর বড় রাগীদার। তোমার মা আমার বেটী। বেটী বলে বলছি না, এখানকার সবাই বলে, তুমিও বলবে যে এ মেয়ে এ মা যেমন তেমন নয়—সাক্ষাৎ দেবী। খাঁটি রাজপুত রাজার রাণী। তাকে আমি সুরতিয়াবাঈয়ের কাছে নাচা-গানা শিখিয়েছিলাম। সে এখন সেই তার কিষণজীর কাছে ভজন ছাড়া কোন গীত গায় না, কেশে সে তেল দেয় না। ব্রাহ্মণের বিধবার মত এক বেলা এক মুঠি খায়। বাঘের চামড়ায় শোয়। তার মুখে আজ বিশ বছরের মধ্যে, এই তুমি যখন ছোট ছিলে, যখন তুমি খলখল করে হাসতে তখন হাসি দেখেছি, আর হাসি দেখি নি। বেটীকে এখন দেখলে মনে হয় সে যেন মনে মনে কাঁদছে কাঁদছে কাঁদছে। তার আর বিরাম নেই। কেন? স্রিফ তোমার জন্যে। তুমি তার মনের মত হলে না অর্জুন সিং। তুমি লাঠি শিখলে, তলোয়ার শিখলে, সড়কি শিকলে, বীর হলে, কিন্তু রাজার ছেলের সহবৎ শিখলে না কেন?

তোমার মা আমার বেটী, নইলে তাকে প্রণাম করতাম। কেন জান? গোড়াতে আমি তোমাকে বলতাম কুমর অর্জুন। ভৈরবও বলত। তোমার মা বারণ করেছিল। বলেছিল, না বাপ, না। কখনও বল না। বাচ্চা বয়স থেকে কুমর কুমর শুনে মগজ যদি খারাপ হয়ে যায় তবে বিপদ হবে। বাপ, তুমি সর্দার, তোমার নাতি—এতেই তো সবাই খাতির করবে। তাতেই হয়তো মগজ গরম হবে। তার উপর 'কুমর' বললে সে ওর পক্ষে বহুৎ খারাপ হবে। তা ছাড়া বাপ, ওকে যদি কুমর বল তবে ক্রমে ক্রমে এ কথাও তো বাইরে ছড়াবে। কে ওখানকার অর্জুন সিং, রাজার ছেলে কুমার সাহেব? তখন লোকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন্ রাজার ছেলে? কোথাকার কুমার? ছত্রিশ জাতিয়ার মধ্যে কুমার কি করে এল? কোথা থেকে এল? তখন? চন্দনগড়ের নাম যদি ছড়ায় তবে তো বিপদ হবে বাপ!

বুঝে দেখ অর্জুন কত বুদ্ধি ধরে আমার বেটী। সে ঠিক বলেছিল। তা হলে তোমাকে বাঁচানো, এই জঙ্গলগড় তৈরি করা বিপদ হত। আজ বিশ বছরের চন্দনগড়ে মাধব সিং-এর কথা লোকে ভুলে গেছে। জানে রুক্মিণীবাঈ কোথা মরে গেছে কি কোথায় চলে গেছে। আজ এখানকার লোকেরাও ঠিক জানে না। সে আমলের বুড়ো বুড়ী নাই। আমার বয়সী

আছে ভৈরব আর গোবর্ধন, তাদের বউরা। তারাও চেপে আছে। অল্পস্বল্প মনে আছে সে আমলে বারো থেকে বিশ তিরিশ বছরের যারা তাদের। কিন্তু সে অল্প। আমরা ওটার উপর জোর দিই নি বলে তারা আপনা-আপনি ভুলেছে। জোর দেয় না। কেউ মনে করিয়ে দিলে মনে পড়ে। তারা তোমাকে দলু সর্দারের নাতি, আমার পরের সর্দার বলেই জানে। তবে তোমারও গুণ আছে। তুমি বীর, তুমি খুব হাসতে পার, খুব দিলদরিয়া তুমি। খুব হৈ হৈ করতে পার, সব থেকে বড় গুণ সকলকে ভালবাস। আপন পর নাই। কিন্তু দোষ তোমার তা থেকেও অনেক বেশী। তুমি এমন মায়ের ছেলে, রাজা মাধব সিং-এর বেটা। খাঁটি ছত্রি হয়ে তুমি সহবৎ শিখলে না, ধীর হলে না। তোমার মা সুরতিয়াবাঈয়ের কাছে লেখাপড়াও কিছু শিখেছিল। তোমার মা তোমাকে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিল, তুমি শিখলে না। তুমি মদ খাও। তুমি ওই ছত্রিশ জাতিয়াদের সঙ্গেও মদ খেয়ে হুল্লোড় কর। তাদের জোয়ানী বেটীগুলোকে নিয়ে খেলা কর। পাইকদের বেটীদের সঙ্গে মেলামেশাও কর। কিন্তু পাইক-দের বারণ করা আছে, তারা মেয়েগুলোকে শাসনে রাখে। কিন্তু ঝুমঝুমিকে নিয়ে তুমি মেতে আছ। তোমার মাকে পর্যন্ত মেনে নিতে হয়েছে তা। তবে ঝুমঝুমি তো ভাল মেয়ে।

ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়ে এখানকার দেবীজির বারণ আছে জাত মানা। তবু অর্জুন সিং-তুমি কুমর, রাজা মাধব সিং-এর বেটা। তোমার একটা জাত আছে। জাত না মান, ইজ্জত আছে। ইজ্জত না থাকলে সব হুশ্যা যায় অর্জুন সিং—সে রাজা হয় না, কুমরও হয় না।

তবু ভাবছি অর্জুন সিং, তুমি যাই হও—মাতাল হও, মুরুখ হও, হাল্লাবাজ হও—এইবার তোমাকে সব বলে, ওই পাথরের বেদীর উপর কাঠের চৌকি পেতে তোমাকে বসিয়ে, তোমার হাতে তোমার বাপের তলোয়ারখানা দিয়ে বলব—এই নাও তোমার বাপের তলোয়ার। এই তোমাকে আমরা সবাই বললাম রাজা। তোমাকে বললাম সব বৃত্তান্ত। তোমার বিশ বছর বয়স হল, এদিকে কিষণজীর খেলার আবার লাগল গোলমাল। এবার তুমি যা হয় কর। মীর হবিব এই পথে আসবে শুনছি। চন্দনগড়ের সুচেত সিং-এর সঙ্গে তার দোস্তি টুটেছে। এবার দুশমন। এবার সে সুচেত সিং-এর দুশমন।

গত বার এই ক মাস আগে এই বৈশাখ মাসে একটা সুযোগ চলে গেছে। গতবার উড়িষ্যা দখল করে, মীর হবিব এই জঙ্গলের ধার দিয়েই গিয়েছিল; মেদিনীপুর দখল করে তাঁবু গেড়ে বসেছিল। চন্দনগড়ের সুচেত সিং তখনও দোস্ত। চন্দনগড়ে খানাপিনা করে সেলামী নিয়ে তাকে খেলাত দিয়ে মেদিনীপুরে ছাউনী গেড়েছিল। কি সাবধানেই তখন রাখতে হয়েছিল তোমাকে এবং কি সাবধানেই ছিল ছত্রিশগড়ের তামাম পাইকেরা। তোমার তখন বেমার।

লোকে বাচ্চা ঘুম পাড়ায়, অর্জুন সিং, বর্গীর ছড়া বলে, "ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দোব কিসে।" ঠিক সেইরকম করেই ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়ে পাইকরা ঘুমের ভান করে পড়েছিল। তবু তুমি দুরন্ত দুর্দান্ত, তোমার কয়েকটা দুরন্ত সঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে পালিয়েছিলে। তখনও তোমার বেমার হয়নি। পথের ধারে জঙ্গলের উঁচু গাছে চড়ে বর্গীদের যাওয়া দেখতে গিয়েছিলে। তোমার মায়ের পুণ্যবল আর তোমার

নসীব। তোমার একটা ফাঁড়া ছিল সেটাই তোমাকে বাঁচালে। ওই গাছে কিসে তোমাকে কামড়ালে, তার জ্বালাতে তুমি গাছ থেকে নেমে নদীর জলে পড়লে; হুঁশ হারালে। সঙ্গীরা তোমাকে নিয়ে এল, তখন সর্বাঙ্গ তোমার ফুলেছে। আর তোমার সঙ্গে ছিল ঝুমঝুমি। দু মাস ভুগে প্রাণে বাঁচলে। দলু সর্দারের বুদ্ধি আর ধরম যিনি তাঁর মহিমা, অর্জুন সিং। তোমাকে চিকিৎসা করে বাঁচালে ওই ছত্রিশ জাতিয়ারা। আর ওই মেয়েটা ঝুমঝুমি। ওদের যে সাপের ওস্তাদ সেই করলে চিকিৎসা। আর সেবা করেছে ছত্রিশ জাতিয়ার মেয়েটা ওই ঝুমঝুমি। তোমার পেয়ারী। সে ওই সাপের ওস্তাদেরই বেটী। ওই যে কালো নাগিনের মত ছিপছিপে লম্বা বেটীটা, যার চোখ দুটো লম্বা ছুরির মত, নাকটা একটু ছোট, মনে হয় সূচলো নাকের ডগাটাকে কনী দিয়ে কেউ একটু টিপে মেজে দিয়েছে। তাতে বাহার খুলেছে খুব। ঠোঁট দুটো পাতলা, কপালটা ছোট, চুল একরাশ, কিন্তু করকরে কোঁকড়ানো। হাসলে গালে টোল পড়ে; কোমরখানা এতটুকু—যাকে নিয়ে তোমার পাগলামীর শেষ নেই। নামটাও—ঝুমঝুমি। বহুৎ মিঠা মেয়েটা, ছেলেবেলা ভাল নাচত, চব্বিশ ঘণ্টাই প্রায় নাচত বলে দলু সর্দারই হাট থেকে গোটা দশেক ঘুঙুর এনে দিয়েছিল; তাই গেঁথে পরে ঝুম্‌ঝুম্ করে নাচত। নামই হয়ে গিয়েছিল ঝুমঝুমি। হায় হায় হায়! তখন কি দলু জানত যে ওই কালুটে রোগা মেয়েটা বড় হয়ে এমন হবে যে অর্জুন সিং-এর মন ভুলাবে! এমন খুবসুরতি হবে! এমন দুরন্ত হবে যে অর্জুনের সঙ্গে পাল্লা দেবে! তুমি বন্‌শী বাজাও ভাল, ছোকরী নাচে ভাল। বনের ভিতর গিয়ে তুমি বন্‌শী বাজাও আর মেয়েটা বেহায়ার মত নাচে তা দলু শুনেছে। তুমি শিকারে যাও, ও গাঁওয়ের ধারে বসে থাকে গাছে চড়ে কখন ফিরবে কোন পথে ফিরবে তার জন্তে।

ভাইয়া, তোমাকে চুপি চুপি বলতে পারি, দলু মনে মনে তোমার তারিফ করে। রুচির তারিফ করে। দলু যদি জোওয়ান হত তোমার মত তবে তোমার সঙ্গে ওই ছোকরীর মালিকানা নিয়ে লড়াই হয়ে যেত। জোয়ানী বয়স তোমার—এ হবে। কিন্তু তোমার মায়ের যে মুখ ভার। আর বাড়াবাড়িটা বড় বেশি করছ।

দলু সর্দার খানিকটা তামাক খয়সান ঠোঁটে টিপে নিয়ে পিচ ফেলে ভাল করে নড়েচড়ে বসল। ভীম বাগ্দীর ছেলে গণ্ডারের আনা বালেশ্বরের খবর শুনে সে গণ্ডারকে পাঠিয়েছে রুক্মিণীকে খবর দিতে। রুক্মিণী সকালে স্নান করে কিষণজীর সেবায় লাগে। তাকে শয়ান থেকে ওঠানো, মুখ ধোওয়ানো, বেশ করানো, বাল্যভোগ দেওয়া, কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে আরতি করা। অনেক কাজ তার। অহল্যা বুড়ি হয়েছে, সে তাকে সাহায্য করে। অম্বিকে নেই, সে মরেছে। বাগ্দীদের দুই বিধবা আছে, দুই কুমারী আছে, তারা কিষণজীর মন্দির উঠান ঝাঁট দেয়। তাদের নিয়েই দিন কাটে রুক্মিণীর। ছেলের নাম বড় করে না। বলে—ভাগ্য! আমি কি করব!

ফুরসত তার কম, খুব কম। তাই গণ্ডারকে বলেছি দাঁড়িয়ে থাকবি, ফুরসত পেলেই বলবি, বহুৎ জরুরী কাম, তোমার বাপ বসে আছে। কথা না হলেই নয়। এবং এসে তাকে খবর দেবে। সে যাবে রুক্মিণীর কাছে।

পাঁচ

খরসান ঠোঁটে টিপেও বেশ জমল না দলুর। সে ডাকলে, ঝুমরি!

ঝুমরী আজও আছে। বুড়ি হয়েছে। সেই তার সেবা করে। সে বেরিয়ে এল। ঝুমরীর পরনে এখন মোটা তাঁতের শাড়ি। আঁচলটা খুব বাহারে। হাতে মোটা কাঁসার কাঁকনী। গলায় মোটা পুঁতির মালা, রূপদস্তার হার। হাজার হলেও সে সর্দারের দাসী।

—কি?

—মদ দে।

ঝুমরী বিনা বাক্যব্যয়ে মদ এনে দিল। একটা ঠোঙায় এনে দিল খানিকটা ময়ূরের মাংস।

খেয়ে সে বসে আপন মনেই ঘাড় নাড়তে লাগল। অর্থাৎ নিজের মনের সঙ্গেই কথা বলছিল।

ঝুমরী বললে, উ কি হছেক? অঁ?

—কি হছেক?

—আপন মনে ঘাড় লাড়ছ?

—ঘাড় লাড়ছি ভাবছি তুকে কাটব ওই মায়ের থানে।

—ক্যানে, বুড়া বয়সে ছুকরীর শখ হয়েছে নাকি? বুড়িকে কেট্যা পথ সাফ করবে?

—হুঁ। তুর মাথা।

—কি করবেক? খাবেক?

—তুর বুড়া মাথা খেয়ে কি হবেক? কি সুখ মিলবেক? তার চেয়ে ওই ঝুমঝুমির মাথাটা এনে দিতে পারিস?

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ঝুমরী। ঝুমঝুমির সঙ্গে অর্জুনের ভালবাসার কথা ছত্রিশ জাতিয়ার জঙ্গলে মানুষ জানে, জন্তু জানে, পাখিরা জানে, গাছেরাও জানে। বুড়ো দলু তার দাদো। কিন্তু এখানে এই মুল্লুকে তো এসব ব্যাপারে দাদো নাই নাতি নাই, দাদা নাই ভাই নাই। হয়তো বাপ বেটাও নাই। ঝুমরী দলুর জন্তে সব পারে। কিন্তু এ যে নাতি—যে-সে নয়। এ যে অর্জুন। ঝুমঝুমি যেমন সবার মনে দোলা দেয়, অর্জুন তেমনি—না, তার চেয়েও বেশি দোলা দেয় সবার মনে সবার বুকে। আর সে তো যে-সে নয়—সে অর্জুন। ঝুমঝুমির মাথা যে খাবে তার কলিজা সে ছিঁড়ে নিয়ে চটকাবে, খাবে।

হঠাৎ দলু বললে, শোন্। ইখানে আয়।

ভয়ে ভয়ে সে এগিয়ে এসে বললে, কি?

—মেয়েটাকে—

গলা শুকিয়ে যাচ্ছে দলুর। ঝুমরীও কাঠ হয়ে গেছে। তবুও দলু বললে ফিস ফিস করে, মেরে ফেলতে পারিস?

ঝুমরীর মুখটা শুধু হাঁ হয়ে গেল।

দলু বললে, ওরে, অর্জুনের নেশা না ছুটলে যে চলবে না রে!

ঝুমরী বললে, একটা কথা বলব রাগ করবে নাই তুমি?

—না।

—তা হলে তুমার অজুন বাঁচবেক নাই। আর তার আগে তুমাকে আমাকে মেরে ফেলায়ে বুকে চড়ে নাচবেক। তারপরে নিজে মরবেক।

—হুঁ। তা সত্যি। ঘাড় নাড়লে দলু।

—তবে? আর নেশা ছুটায়ে বা কি হবেক। ছুটিতে উরা কেমন নেচে গেয়ে বেড়ায় বল দিকিন।

—হুঁ তা বটে। ভেবে দেখি। তুকে আজ রেতে সব বলব। সব শুনে বুঝবি ক্যানে বলছি।

গণ্ডার এসে দাঁড়াল—সর্দার—

—হয়েছে রুক্মিণীর?

—হাঁ, তুমার তরে বসে রইছে।

—চল্ ঝুমরী।

—আঁ।

—মুখটা হাঁ করবি তো জিভটো ধরে টেনে ছিঁড়ে লিব! বুঝলি?

—বুঝলাম, মুখ আমার হাঁ হবেক নাই।

—অাচ্ছা।

রুক্মিণী বসে ছিল তার অপেক্ষায়; দলুর জন্যে একটা কাঠের পিঁড়ি পেতে রেখেছিল। পাইকদের ঘরে পিঁড়ি আছে। তবে ব্যবহার নেই। রুক্মিণী রাণী ছিল, সে বাপকে পিঁড়ি পেতে দিয়েছিল। সে পিঁড়ি ব্যবহার করত। রুক্মিণী বললে, বস বাপ, জরুরী খবর কিছু নাকি? তোমার গণ্ডারের যে তাগিদ! গণ্ডারের মত ঠায় দাঁড়িয়ে, নড়ে নি।

গণ্ডারের দেহের আকারের জন্য আর ধৈর্যের জন্য নাম গণ্ডার। আসল নামটা হারিয়ে গেছে।

রুক্মিণী একটু হাসলে, কিন্তু দলু হাসলে না। বললে, হাঁ মা, খবর জরুরী আর জোর। জবর বল জবরও বটেক।

—কি?

গণ্ডারকে বললে দলু, বোল্ রে—তুই বোল্।

গণ্ডার স্বল্পভাষী। সে বললে, বর্গীরা বালেশ্বরে ফের জমছে।

—সব বোল্ না রে উল্লুক।

—তুমি বল।

—আমি বলব? সে রুক্মিণীর দিকে তাকিয়ে বললে, চার মাহিনা হয় নাই নবাব আলিবর্দী বর্গীদের কটক ছাড়া করে দিলেক, সে জান। বদমাশ বর্গী আর মীর হবিব যখন মেদিনীপুরে

ছাউনি ফেলে তখন সুচেত সিং অনেক টাকা দিয়েছিল। তাও জান। কিন্তু বর্গীরা যখন নবাবের ভয়ে পালায়, নবাব যখন মেদিনীপুরের ওপারে এসেছে—কাঁসাই পার হচ্ছে, তখন সুচেত দেখলেক বিপদ। নবাব তাকে পাকড়াবে বর্গীর দোস্ত বলে, আর তার সঙ্গে জুটল লুটের লোভ। বর্গী যখন চন্দনগড় পাশে রেখে পালাইছে তখন সুচেত সিং বর্গীর পিছন দিকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুট নিলেক! শুনেছি. রসদ আর মালখানার অনেক কিছু পেয়েছিল।

রুক্মিণী বললে, সেও আমি জানি বাপ। তখন অর্জুন রোগে প'ড়ে। আমি কিষণজীর দোরে ধর্ণা দিয়েছি তবু এ সব আমার কানে এসেছিল।

—মা! আমি তোমাকে তো এসব শোনাই না। কেন না, তুমি দুখ পাবে। দুখ পাবে অর্জুনের লেগে। আমারই কি কম দুখ হয়েছিল মা। তখন একটা কত বড় সুবিস্তা মিলেছিল। অঃ! সেদিন যদি অর্জুনকে নিয়ে দলবল জুটে ওই শিয়ালের মত ছুটে পালানো ওদের পথ রুখে ওই নেকড়ে ওই মীর হবিবটার গর্দান নিয়ে মুণ্ডুটা বর্শায় গেঁথে নবাব আলি-বর্দীর কাছে হাজির হতে পারতাম আর তোমাকে সঙ্গে নিয়ে নবাবকে দেখিয়ে তোমার দুখ শুনাতাম, তা হলে সব শোধবোধ হয়ে যেত মা। নবাব আলিবর্দী যেমন বীর তেমনি আদমী সাচ্চা। ঔরতের লালস্ নাই। জীবনভোর এক বেগম; তার তিন বেটী। বেটীর দরদ সে বুঝত মা। তুমি যদি বলতে সুচেত সিং-এর বেইমানির কথা, দুমুখো সাপের কামের কথা তাহলে ঠিক বিশ্বাস করত নবাব।

রুক্মিণী অতি বিষণ্ণ করুণ হেসে নিজ কপালে হাত দিয়ে বললে, আমার ললাট!

—হাঁ মা, লালাট। তা ছাড়া কি বলব!

—বল বাপ, আজ কি বলচ বল।

—বলছি মা। সবটা সমঝে নিতে হবে মা। তাই বলছি, নবাব কটক পর্যন্ত গিয়ে দখল করলে কটক, সে জান।

—হাঁ বাপ।

—মীর হবিব কটক পার হয়ে যে জঙ্গল সেই জঙ্গল হয়ে হটল। কেল্লাতে রেখে গিয়েছিল সৈয়দ নূর, ধরম দাস আর সরন্দাজ খাঁকে। তারা যখন কেল্লা নবাবের হাতে দেয় তখন নবাবের সঙ্গে তকরার করেছিল সরন্দাজ খাঁ পাঠান। নবাব সঙ্গে সঙ্গে তার গর্দান নিয়েছিল। সুচেত সিং নিয়েছিল তার গর্দান, সে ছিল নবাবের কাছেই।

—বকশিশ খেলাত মিলে থাকবে সুচেত সিং-এর। হাসলে রুক্মিণী। অথচ শুনেছি পাঠান সর্দারের সঙ্গে সুচেত সিং-এর বহুৎ দহরম-মহরম ছিল।

—হাঁ মা, তা ছিল। আবার রাগও ছিল ভিতরে ভিতরে। সরন্দাজ খাঁ সুচেত সিং-এর মুর্শিদাবাদ থেকে আনা এক বাঈকে চেয়েছিল। নিয়েও গিয়েছিল।

—এ খবর নতুন বাপ জানতাম না।

—হাঁ। এখন নবাব এক কোথাকার কে আবদুল শোভানকে কটকের নাজিম করে ফিরল মুর্শিদাবাদ; মীর হবিব নেকড়েও সঙ্গে সঙ্গে ফিরল—আর শোভানকে হারিয়ে কটক দখল

করলে। বেওকুফ বদমাশ শোভান বনে এখন ডাকাইতি করছে তা জান। মুর্শিদাবাদ যেতে পারছে না নবাবের ভয়ে।

—হাঁ। এ খবর জানি।

—তবে তো তুমি সবই জান মা।

—সব জানি বাপ। কিন্তু কি করব জেনে? ওই মাতাল বুদ্ধিহীন একটা ছত্রিশ জাতিয়ার মেয়ে নিয়ে পাগল ছেলে, তাকে যে বলতে সরম লাগে আমার—তুই রাজার বেটা। তোর বাপকে এমনি করে কেটেছে, তুই শোধ নিয়ে আয়। উল্টো ফল হবে বাপ। হয়তো এমন কথা বলবে যা শুনে আমার তখুনি তখুনি মরা ছাড়া পথ থাকবে না।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ল তার বুক থেকে।

—কেন মা? কি বলেছে অর্জুন?

একটু চুপ করে রুক্মিণী বললে, একদিন ওকে ডেকে বললাম, তুই এমন করে মদ খাস, ওই ঝুমঝুমিকে নিয়ে বনে বনে ঘুরিস, তুই সর্দারের নাতি, তোর সরম হয় না? সে বললে, তা কেন হবেক। উতে দোষটা কি? বড় হয়েছি মদ খাব, ছুকরী নিয়ে আমোদ করব তো কিসের সরম? সবাই তো করে। দাদো মদ খায়। দাদোর ঘরে ঝুমরী আছে।

দলু মাথা হেঁট করে বললে, হাঁ বেটী, তা তো উ বলতে পারে।

রুক্মিণী বললে, এখনও শোন বাপ, কথা তো শেষ হয় নাই আমার। তুই যা রে গণ্ডার এখান থেকে। তখন আমি বললাম, তোর দাদো সর্দার। তার বেশি তো নয়। তুই যদি তার বেশি হস? সে হেসে বললে, কি? রাজার বেটা? হুঁ—শুনেছি—তোমরা গুজগুজ করে বল। তা রাজার দাসীর বেটা কি রাজপুত্তুর হয়? নবাবদের বাঁদী থাকে, রাজাদের দাসী থাকে—এমন বেটাও কত থাকে।

দলুর সারা শরীর শক্ত হয়ে উঠল। সে হিংস্রভাবে বললে—মা!

রুক্মিণী বললে, কার উপর রাগ করছ বাবা, একটা জানোয়ার জন্মেছে আমার পেটে। আমি বললাম, বস্ তুই, সব শোন্ তাহলে। কিন্তু জন্তুটা বললে, কি শুনব? শুনে কি করব? বাবা মরে গিয়েছে, তোকে ফেলে দিয়ে গিয়েছে রাস্তায়। আমি পথে হয়েছি গাছতলায়; আমি সব জানি। কি শুনব? আমি চললাম, ঝুমঝুমি বনে আমার লেগে বসে আছে। আমি রাগ করে বললাম, তোর ঝুমঝুমিকে আমি বাবাকে বলে কেটে ফেলব। সে বাপ এক লহমায় যে কি হয়ে গেল তোমাকে কি বলব, দাঁতে দাঁত টিপে বললে, কি বললি? তা হলে—। আমি ভয় পাই নি বাপ। আমার মাথায় খুন চেপেছিল। সামনে গিয়ে বললাম, কি করবি তাহলে? নে—মার্ আমাকে। মার্! মেরে ফেল্। কি বলব বাপ—আঁ-আঁ চিৎকার করে সে ওই শালগাছটার মোটা ডালটাকে টেনে মড়মড় করে ভেঙে আছড়ে ফেলে বললে, এই লে। আমি অবাক হলাম বাপ। এ যে দানো একটা। রাগও হল। বললাম, ওরে, তুই তবে মর্, তুই মর্, তুই মরলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব। বলেই আমি কিষণজীর পায়ে পড়ে বললাম, বল কি করব? বল? পড়েই ছিলাম। কিছুক্ষণ পর ঝুমঝুমি এসে ডাকলে, মা গো, মায়ী! আমি জবাব দিই নি। সে কাঁদতে কাঁদতে বললে, ওগো

মায়ী, তুমার পায়ে পড়ি গো, শীগ্রি এস গো। দেখ গো তুমার অর্জুন কি করছেক গো। আর আমি থাকতে পারলাম না বাপ। বেরিয়ে এলাম। দেখলাম ঝুমঝুমির দুই চোখে জলের ধারা বইছে। বললাম, কি হল ? সে বললে, দেখসে মায়ী সে কি করছে। এস। গেলাম তার সঙ্গে, গিয়ে দেখলাম বনের ভিতর ধুলোয় পড়ে কাঁদছে, মধ্যে মধ্যে বুক চাপড়াচ্ছে আর বলছে, মরে যাই আমি মরে যাই ঠাকুর, আমাকে মার, আমাকে তুমি মার। মা বলছে—মর্ মর্। অনেক বুঝিয়ে উঠিয়ে নিয়ে এলাম। মনে মনে ঠিক করেছি বাপ এবার তোমাদের নিয়ে আমিই লড়াই করব। দুশমনের সঙ্গে। মরব লড়াইয়ে। ও থাকবে এইখানে। আর যারা থাকতে চায় থাকবে এই ছত্রিশ জাতিয়াদের সঙ্গে জাত হারিয়ে জন্ম হারিয়ে কুল হারিয়ে বংশ পরিচয় হারিয়ে।

দলু মাথা হেঁট করে রইল। কি বলবে ভেবে পেলে না।

রুক্মিণী বললে, আমাকে রাণী করে তোমরা লড়তে পারবে না বাপ ?

—খুব পারব মা। খুব পারব। সেই ভাল হবে মা, সেই ভাল হবে।

—তা হলে তাই হবে। তুমি ডাক সকল পাইক মাতব্বরকে।

—ডাকব মা, আজই ডাকব।

—আজ নয় বাপ, আর পাঁচটা দিন সবুর কর। পাঁচদিন পর সেই তারিখ হবে বাপ—যে তারিখে আমার রাজাকে দুশমনেরা কেটেছিল।

—ঠিক আছে মা, তাই হবে। তবে আমি সব তৈয়ার রাখতে বলি। কি বল ?

—তা বল। কিন্তু গণ্ডার যে বললে খবর এনেছে, জরুরী জবর খবর। এ পর্যন্ত যা বললে তা তো পুরনো।

—হাঁ হাঁ হাঁ। তুমি আমার বেটী কিন্তু তুমি সত্যিই রাণীর বুদ্ধি ধর। এখন বালেশ্বরে মীর হবিব আবার এসে হাজির হয়েছে। নবাব মুর্শিদাবাদে। বুড়ো হয়েছে নবাব। তিয়াত্তর বছর বয়স হয়ে গেল। সেখানে গিয়ে বেমারীতে পড়েছে। উঠেছে, তবে খুব কাহিল। মীর হবিব এ মওকা ছাড়ে নি, একদম হাজির হয়েছে বালেশ্বরে। বর্গীপল্টন নিয়ে এসেছে মোহন সিং। আর এসেছে মুস্তাফা খাঁ পাঠানের ছেলে মুর্তাজা খাঁ। সরন্দাজ খাঁর ছেলে এসেছে। তারা এবার সব থেকে আগে পড়বে চন্দনগড়ের উপর। এর চেয়ে বড় মওকা আর কি হবে বেটী ?

রুক্মিণীর চোখ জলে উঠল। বললে, ঠিক আছে বাপ, সব তুমি তৈয়ার কর। বল, বর্গী আসছে ফের। আমাদের তৈয়ার হতে হবে। শুধু বলবে না যে আমি তোমাদের সঙ্গে যাব রাণী হয়ে। কথাটা বাহরে বেরুলে বিপদ হবে।

দলু বেরিয়ে এল। গণ্ডার অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার অপেক্ষায়। পথে অহল্যার সঙ্গে দেখা হল। অহল্যা আপন মনে বকতে বকতে আসছে উদিক থেকে। 'মা ছেলে বলে দেখবেক নাই। দাদো কিছু বলবেক নাই। এত বড় ছেল্যা হল, ঝুমঝুমি মেয়েটাকে নজরে লেগেছে তার, নিয়ে নিয়ে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াইছে। তাই তাকে রাখনী করে রেখে দে ঘরে। ছেল্যাটা ঘরে থাকুক—তা না; ই এক আচ্ছা

কাণ্ড বটেক !'

দলু চিন্তিত মনেই চলেছিল। অহল্যা তাকে দেখে বললে, ছোঁড়াটা চলে গেল।

—চলে গেল ? ছোঁড়াটা ? কে ? অর্জুন ?

—তা না তো কে ? কার এত বুকের পাটা হবেক বল্ ? আপন খুশীতে কাম করবেক ?

—কোথাকে গেল ?

—ওই গেল সেই শঙ্করীপুর। কাল মহাষ্টমীতে মেলাই পাঁঠা কাটবেক, তার পরেতে বীর ষ্টমীতে সব খেল হবে—লাঠি, কুস্তি। ওই, ওই তো রইছে তোমার সঙ্গে তার এক চেলা। ওই যে শালা গণ্ডারে। উ যে কুস্তি লড়বেক। উও তো যাবেক। বলেছে, তোমরা এগোও, আমি যেছি। সদ্দারকে খবরটা দিয়েই আমি ছুটব। পঁচিশ তিরিশটা ছোঁড়া গেল তার সাঁতে, আর সেই ঝুমঝুমিকে নিয়ে সাত আটটা ছুঁড়ি।

—কখন গেল ?

—তা যমদুয়ার পারাইলো। পথে পড়েছে এতক্ষণ।

দলু বললে, এই গণ্ডারে।

—আঁ!

—তু বললি নাই আমাকে ? হারামজাদা ?

—অর্জুন সদ্দার যে বললেক, কাউকে বলতে হবে নাই। আমার সাঁতে যাবি ভরটা কিসের। সি ফিরে এসে বলব, যা বলবার আমি বলব। বললে পরে সাত ফেচাও তুলবেক।

—ওরে শালা, ছোটু। ছোটু বলছি। গিয়ে ফিরায়ে নিয়ে আয়। বলবি, সদ্দারের হুকুম যে যাবেক তাকে আর ঢুকতে দিব নাই ছত্রিশ জাতিয়ার গড়ে। সে অর্জুনকেও না। যা শালা, যা।

গণ্ডার ছুটল সঙ্গে সঙ্গে।

অহল্যা বললে, তা যাক ক্যানে গিয়েছে। পুজো বলে কথা, তার ওপর ছেলে ছোকরা বয়েস—

—অহল্যা, অহল্যা তোর মুখটা ভেঙে দোব। চুপ করবি ?

বলেই দলু হনহন করে গিয়ে তাদের সেই বড় নাকাড়াতে ঘা মারতে লাগল। ডুম—ডুম—ডুম ডুম ডুম ডুম।

সারা বারো পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিটা প্রতিহত হয়ে একটা ধ্বনি বারোটা হয়ে বেজে উঠল।

প্রতিটি পাইক বাড়ি থেকে মেয়েরা উঠোনে নেমে তাকালে এই দিকে। পাইকরা যে যা করছিল, ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়ল।

ভৈরব হনহন করে সর্বাগ্রে ছুটে এসে দলুর কাছে দাঁড়াল।

—সর্দার!

—ভৈরব, তু যারে, তু যা। গণ্ডারের কথা তো সি মানবেক নাই, তু যা। ফিরায়ে আন্ ঘাড়ে ধরে, তাকে ফিরায়ে আন্। সি দাত্যিটা গেল শঙ্করীপুরে অষ্টমীর রাতে খেল জিততে।

তু যা, শঙ্করীপুরের জমিদার এখন চন্দনগড়ের তাঁবে। সেখানে চন্দনগড়ের মরদরা আসে। তু যা।

—কি বাপ? গোলমাল নাকাড়া শুনে বেরিয়ে এসেছিল রুক্মিণী—সে জিজ্ঞাসা করলে, কি বাপ?

—অর্জুন! মা, অর্জুন চলে গেল শঙ্করীপুর অষ্টমীর রাতের খেল জিততে।

রুক্মিণী বললে, যাক বাবা যাক। তার অদৃষ্ট তাকে যেখানে নিয়ে যায় যাক। তার অদৃষ্টে যা থাকে থাক। সে যাক। তোমাকে যা বললাম তুমি তাই কর। সব সাজতে বল। না হয়—আমি এবার চিতা জ্বালিয়ে তার উপর চড়ে বসব। চলে যাব আমার রাজার কাছে। তার চোখ দুটো যেন জ্বলছিল।

ছয়

প্রতিবাদ করতে সাহস করলে না শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে গেল দলু সর্দার। সেই ভাল। সেই ভাল। অর্জুন সিং, কুমর সাহেব, তোমার নসীব তোমার হাতে। আপসোস! এমন মাতাজীকে তুমি চিনলে না। নিজের পরিচয় তুমি জানলে না। তোমার নসীব—আর কিষণজীর খেল! তাঁর ইচ্ছা—তাঁর ইচ্ছা যে দিন হবে—সেদিন তুমি জানবে নিজেকে। কিন্তু তার জন্যে দলু সর্দার আর অপেক্ষা করবে না। করবার তার উপায় নেই। মাতাজী তার বেটি রুক্মিণী—রাণী মাতাজীর হুকুম হয়ে গিয়েছে। তার থমথমে মুখ দেখে ভয় করছে দলুর।

*   *   *   *

এতকাল পরে, অর্জুনকে না নিয়েই লড়াইয়ের উদ্যোগ করতে দলুর মনে হচ্ছে অর্জুনের কথা। রাজা মাধব সিংএর ছেলে। সে হয়ে গেল মূর্খ, গোঁয়ার, বুদ্ধিহীন। হায়রে হায়!

দলু বেশ জানে—গণ্ডার গিয়েও অর্জুনকে ফেরাতে পারবে না। সে ফিরবে না, ফিরবার ছেলে সে নয়।

সে কারুর হুকুমে আমোদ ছেড়ে ফিরবে না। বাল্যকাল থেকে সে সবল স্বাস্থ্যবান। একবার তার ওই জ্বর আমাশয় হয়েছিল। দলুর উদ্বেগের সীমা ছিল না। রুক্মিণী মাথার শিয়রে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। দলু ওষুধ দিয়েছিল, মাত্রা ছাড়িয়ে বেশিই দিয়েছিল। অসুখ সারতে দেরি হয় নি। কিন্তু তখন থেকেই তার মেজাজের উগ্রতা বেড়ে প্রায় তাকে পাগলই করে তুলেছিল। তার উপর দলুরই সমাদর। সমাদরের সীমা-পরিসীমা ছিল না। দলু মদ খেতো, সেও বলত আমি খাব। দলু তাই দিত। পনের ষোল বছর থেকে সে মাতাল। পাখি শিকার করত বাল্যকালে। চোদ্দ বছর বয়সে হরিণ মেরেছে, বরা মেরেছে। ষোল বছরে প্রথম মারে চিতা বাঘ। তারপর ডোরা বাঘ মেরেছে। বনে বনে উল্লাস এবং দুর্দান্তপনা করে বেড়িয়েছে ইচ্ছামত। তার নিজের দল একটা গড়ে নিয়েছে সে। গড়তে হয় নি, আপনি গড়েছে। গণ্ডারের বয়স প্রায় তিরিশ। ওদিকে

ত্রিশ, নিচের দিকে ষোল পর্যন্ত নিয়ে পঁচিশ জোয়ানের এক দল। সে জোয়ানেরা শহরের ষণ্ডা জোয়ান নয়, গ্রামের নওজোয়ান নয়, বনের বুনো জোয়ান। সকলেরই প্রায় এক একটি তরুণী প্রিয়া আছে। তাদের মধ্যে ছত্রিশ জাতিয়াদের বেটি আছে, আছে পাইকদের লুঠ করে আনা নানান শ্রেণীর মেয়েদের গর্ভজাত মেয়েরা। পাইকদের নিজেদের মেয়েরা বন্য হলেও বন্ধন আছে। নিয়মকানুন আছে। কড়া কানুন। কঠিন শাস্তি হয়। পুরুষেরা নিজেরা যা করুক মেয়ের অনাচার সহ্য করে না। বুনো মানুষ, লুণ্ঠক; ডাকাত বললে ডাকাতও বটে। আসল পেশা পাইকগিরি অর্থাৎ যুদ্ধবাজী। তারা নির্মম প্রহার করে অনাচারের ক্ষেত্রে। আঙুল দিয়ে দেখায় রুক্মিণীকে। বলে, দেখ্। রুক্মিণীকে মেয়েরা সত্যিই ভক্তি করে। শ্রদ্ধা করে। তবে গোপন অনাচার সব সমাজেই আছে, তা গোপনেই চলে। পুরুষদের এই সব লুঠে আনা মেয়েদের ও ছত্রিশ জাতিয়াদের মেয়েদের সঙ্গে উল্লাস রঙ্গরস প্রেম ব্যভিচার নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করে না। দেশে ছত্রিরাজা থেকে বড় জোতদার, তালুকদার, সর্দার—ব্রাহ্মণ কায়স্থ থেকে সব শ্রেণী ও থেকে সমাজের মধ্যেই ওটার রেওয়াজ রয়েছে। লোকে কুকুর বিড়াল পোষে, ঘোড়া রাখে একটার জায়গায় দুটো তিনটে, বাজপাখি পোষে, ময়না পোষে; এও তাই প্রায়। সুতরাং তরুণ অর্জুনের দলের ছোকরা ও জোয়ানদের তরুণী প্রিয়া প্রকাশ্যেই ছিল। কিছুদিন পর ঘরেই নিয়ে আসবে। আবার বিয়েও করবে। এ মেয়েটাও প্রতিবাদ করবে না, পালাবে না; সমান হাসবে, ঘরের কাজকর্ম করবে; বাড়ির বউকে খাতিরও করবে আবার কখনও তার সঙ্গে কলহও করবে। কিন্তু প্রথম প্রথম এরা শুধু লীলাসঙ্গিনী। কৈশোর থেকে খেলা করতে করতে যৌবন শুরু হলেই জোড় বেঁধে বনে পালায়। নাচে, গায়, গল্প করে, গাছের উপর চড়ে—এ ওকে ধরতে যায় ও তাকে ধরতে যায়। মধুর চাক ভেঙে খায়। মদ খায়। খরগোশ পাখি শিকার করে পুড়িয়ে খায়। সারা দিনই হয়তো কেটে যায়। সন্ধ্যাতে ফেরে। কোথাও মেলাখেলা হলে তখন জোড় বেঁধে যায়। পাঁচটি দশটি জোড়ে দল বাঁধে। একসঙ্গে মেলা দেখে; প্রিয়ার মনের মত পুঁতির মালা, পায়ের ঘুঙুর, কাঁসার কাঁকনি, রূপদস্তার চুড়ি, রঙীন গামছা কিনে দেয়। অর্জুনের মত তাদের শাড়ি কিনে দেবার ক্ষমতা নেই। অর্জুন ঝুমঝুমিকে দুবার দুখানা শাড়ি কিনে দিয়েছে। তাঁতের মোটা শাড়ি। শুধু শাড়ি নয়, শাড়ির সঙ্গে উপরের অঙ্গে পরবার আঁচলা পর্যন্ত। ঝুমঝুমি কপালে একটা রূপোর টিকলি পরে। তার কপালটি ছোট, কালো কপালের উপর সাদা রূপোর চাঁদ ঝিকমিক করে। অর্জুনের সঙ্গে কার সঙ্গ? সে দলু সর্দারের নাতি; ছোট সর্দার; হবু সর্দার। দলুর কাছে সে টাকা আদায় করে, তার অহল্যা দিদি দেয়। তা ছাড়া সে ধার করে। ভৈরব গোবর্ধন স্বরূপ ভূপাল চার সর্দার দলু সর্দারের পরেই, তারাও তাকে ধার দেয়। অর্জুন অবশ্য শোধ করে, দাদোর কাছে নিয়ে দেয়। তার নিজের রোজগারও আছে। সে মধুর চাক এনে মধু জমা করে, ময়ূর মেরে পালক পেখম সংগ্রহ করে, সজারুর কাঁটা জড়ো করে। তারপর দেয় ছত্রিশ জাতিয়াদের, তারা হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে এনে টাকা দেয়। তারা নেয় সিকি, অর্জুন নেয় বারো আনা। অন্য সকলেও এসব করে। কিন্তু বনের যে এলাকাটা অর্জুনের সেটাই সবার

চেয়ে বড়। তাকে সর্দারি মাসুল দিতে হয় না। অঙ্গদের নিজের বন নেই। সাজার বনে তারা এ সব সংগ্রহ করে, তার সিকি দিয়ে আসতে হয় সর্দারকে। অর্জুনের নিজের এলাকা আছে, তার থেকেও সর্দারের সিকি দেবার নিয়মও বটে, কিন্তু অর্জুন সে দেয় না। প্রথম প্রথম দিয়ে একদিন বলেছিল, নেহি দেঙ্গা।

দলু বলেছিল, কি বিপদ! সর্দারি তো আমার নয় হে কত্তা। ই তো সরকারি তবিল। আমি নাড়িচাড়ি, এর সিকি আমার, কিন্তু বারো আনার মালিক তোমার মা।

অর্জুন বলেছিল, সে সব আমি নাহি জানতা হায়। নেহি মানতা হায়। দাদোও জানি না, মাও জানি না, সর্দারিও জানি না। নেহি দেঙ্গা। জোর করেঙ্গা তো এসো কার জোর বেশি দেখি।

মা বলেছিল, আমার হুকুমে সকলে মিলে তোকে ধরে বেঁধে সাজা দেবে।

—তাহলে হামি চলে যাঙ্গা। নেহি থাকেঙ্গা এখানে। চলে যাঙ্গা ঝুমঝুমিকে নিয়ে।

দলু হেসে বলেছিল, আচ্ছা আচ্ছা। তু যদি আমার সঙ্গে পাঞ্জাতে জিততে পারিস তবে তোকে লাগবে না। আয়। কার জোর বেশী দেখি বলবি তু, তা দেখি আয়।

—এসো।

তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়েছিল সে। কিন্তু অর্জুনের মা লড়তে দেয় নি। রুক্মিণী বলেছিল, না। এমন জোরে বলেছিল যে দলু এবং অর্জুন দুজনেই চমকে উঠেছিল।

দলু বলেছিল, মা!

রুক্মিণী বলেছিল, না।

অর্জুন বলেছিল, তবে হাম চলে যাঙ্গা। আমার টাকা চাই। ঝুমঝুমিকে কাপড় দোব গয়না দোব। দাদোর কাছে কত হাত পাতব? নেহি পারেঙ্গা। আমি মরদ। আমার সরম নাই!

দলু বলেছিল, আমি দোব।

—নেহি। নেহি লেঙ্গা।

অহল্যা বলেছিল, ওরে ধর্মের ষাঁড়, আমি দোব।

—না। না। না।

—ওরে, আমার ভাল ভাল শাড়ি আছে—

—পুরনো ঝুটা এঁটো। নেহি মাংতা। হাম কিনে দেঙ্গা।

রুক্মিণী বলেছিল, বাপ, আমার হুকুম, ওই বদমাস বেতমিজকে ধরে এই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে দাও।

—অ্যা-ও। বলে জন্তুর মত চিৎকার করে উঠেছিল অর্জুন। একগাছা লাঠি ধরে সে লড়াইয়ের জন্য তৈয়ার হয়ে খাড়া হয়ে গিয়েছিল।

মা চিৎকার করেছিল, আমার হুকুম কি তামিল হবে না বাপ!

সেই মুহূর্তে ঘটেছিল একটি বিচিত্র ঘটনা। ঝুমঝুমি দাঁড়িয়েছিল গাছের আড়ালে। ছিপছিপে পাতলা কালো মেয়ে। পরনে হাঁটু পর্যন্ত খাটো গামছার মত একখানা কাপড়, বুকে

একখানা রঙীন গামছা, হাতে শাঁখার চুড়ি দুগাছা কালো নিটোল হাতে ঝলমল করছিল। মাথায় একরাশ করকরে কোঁকড়া চুল একফালি ন্যাকড়া দিয়ে একটা খোঁপার মত বাঁধা। নাকে একটা রূপদস্তার কাঠি। সে গাছের আড়াল থেকে ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিল অর্জুনের রুদ্রমূর্তির সামনে—আমাকে আগে মার তুমি, আমাকে আগে মার।

অর্জুন থমকে দাঁড়িয়েছিল। সে এক মুহূর্তের জন্যে, তারপর ক্রুদ্ধ গর্জনে বলেছিল, সরে যা।

—না।

—তবে তু মর্।

সে লাঠি তুলেছিল।

কিন্তু তাতেও ঝুমঝুমি সরে নি। বলেছিল, মার্ মার্। মরে যাই। মার্।

অর্জুন স্থির হয়ে গিয়েছিল। ঝুমঝুমি তখনও বলছিল, মার্ মার্।

অর্জুন লাঠি ধরেই দাঁড়িয়ে ছিল। রুক্মিণী আবার বলেছিল, লাঠি ফেল্ অর্জুন। তুই ওই ছত্রিশ জাতিয়ার মেয়েটার চেয়েও বর্বর।

অর্জুন লাঠিটা ফেলে দিয়েছিল। তারপর ঝুমঝুমির হাত ধরে বলেছিল, চল্, ইখান থেকে চলে যাব তুকে লিয়ে।

—না। ঝুমঝুমি তার হাত ছাড়িয়ে হাত জোড় করে রুক্মিণীকে বলেছিল, মা!

রুক্মিণী মন্দিরে ঢুকে দোর বন্ধ করেছিল। অর্জুন হনহন করে চলে গিয়েছিল বনের দিকে। দলু চমকে উঠেছিল—অর্জুন!

—আমি যেছি সদ্দার, ফিরায়ে আনছি উকে। ডেকো নাই, রাগ না পড়লে তো উ ফিরবে নাই। বলেছিল ঝুমঝুমি এবং সেও ছুটেছিল।

বহু কষ্টে বুঝিয়ে ঝুমঝুমি যখন তাকে ফিরিয়ে এনেছিল তখন দলু সর্দার পাইক সর্দারদের নিয়ে বৈঠকে বসেছে। বেলা তখন অপরাহ্ণ। সকলের মাঝখানে মুখ নিচু করে বসে আছে রুক্মিণী। ঝুমঝুমির সঙ্গে অর্জুন এসে দাঁড়াল। চুপ করে দাঁড়াল। ঝুমঝুমি বললে, যাও যাও।

—না। ইরা সবাই থাকতে সি পারব না আমি। না।

সকলে আশ্চর্য হয়েছিল। কি বলছে অর্জুন!

ঝুমঝুমি বলেছিল দলুকে, সর্দার!

—কি?

—যেতে বল। ইদেরকে যেতে বল।

—ক্যানে?

সে কথা ঝুমঝুমিকে বলতে হয় নি, বলেছিল অর্জুন নিজে।—ক্যানে? আমি আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলব, সে কথা উরা শুনবেক ক্যানে? শুনবার কে? সদ্দার! ভারী বুদ্ধি সদ্দারের। আমি পায়ে পড়ব। সবারই ছামনে পড়তে হবেক নাকি হে?

সকলে উঠে চলে গিয়েছিল সেই মুহূর্তেই। দলুও যাচ্ছিল। কিন্তু অর্জুন বলেছিল, বুড়া, তু থাক। তু দাদো। তু যাবি কোথা? বস্।

বলেই সে এসে মায়ের পা দুটো চেপে ধরেছিল, মা!

ওই একটি কথাই বেরিয়েছিল। তারপর হো হো করে কান্নায় প্রায় ভেঙে পড়েছিল। অনেক কষ্টে শেষে বলেছিল, আমার নরক হবেক। আমার নরক হবেক।

এরপর মা আর থাকতে পারে নি। তার চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়েছিল। সে নিঃশব্দে তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল।

—মা!

মা নির্বাক, পাথরের মত। অশ্রুর ধারা দুটি বারো পাহাড়ের ঝর্ণার ধারার মত ঝরছিল।

—মা গো! মা!

—অর্জুন!

—আমার পাপ হল মা। মাফ কর মা।

—করেছি অর্জুন।

দলু তার হাত ধরেছিল এবার—উঠ হে বাবু সাহেব, রাজাবাহাদুর উঠ।

অর্জুন উঠে দাদোর গলা জড়িয়ে ধরেছিল—তা পারব। দাদো, তোর চুমো খেছি দাদো, দাদো রে—

দলু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, চল হে পঞ্চায়েতের কাছে। তোমাকে বনের লেগে বছরে জননীকে আশ্বিন কিস্তি চোত কিস্তি দু কিস্তিতে দু সিকা লাগবেক। বাস্। চল এখুন। পঞ্চায়েতে গিয়া বল, দোষটা তুমার হইছিল।

—হঁ। তা হইছিল। তা চল। বলব।

তারা দুজনে গিয়েছিল, কিন্তু ঝুমঝুমি ছিল রুক্মিণীর কাছে। হাত জোড় করে সে বলেছিল, মায়ী!

রুক্মিণী তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ঝুমঝুমি বলেছিল, মায়ী!

—কি বলছিস, বল্।

—মায়ী, তুমি উকে বুঝায়ো মা, বুকে জড়ায়ে রেখো। তা লইলে তো বাঁচবে না উ। পাহাড় থিকে ঝাঁপ খাবে। লইলে নিজের বুকে ছুরি বসাবেক। তুমি উকে বাঁচায়ো।

—কেন ঝুমঝুমি? ও যে মাপ চেয়ে গেল, কাঁদল।

—আরও কাঁদবে মায়ী, পাগল হবেক। আমি মলে—

—ঝুমঝুমি!

—তুমি কথা দাও মা। আমি নিশ্চিন্তি মরব।

—ঝুমঝুমি! না।

—আমার লেগে উ এমুন হইছে মা। তবে উ পাগল বটেক। আমার লেগে বেশি পাগল হল। আমি মরব রেতে। সাপের বিষ আছে বাবার শামুকের খোলায়। খেলেই মরে যাব। তুমি উকে—

—না না না। ঝুমঝুমি, না। ওরে না।

রুক্মিণী উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। ঝুমঝুমি অনুভব করেছিল, রুক্মিণী থরথর

করে কাঁপছে।

ঝুমঝুমি বলেছিল, মায়ী!

—না ঝুমঝুমি, তুই মরিস নে। খবরদার রে, খবরদার। ওকে তোকে দিলাম রে। ও তোর। তুই শুধু—

—কি মায়ী?

—ওকে মদ ছাড়া। মানুষ কর্।

—সে কি আমি পারি মায়ী, তুমি পার না?

—পারতেই হবে তোকে। ওরে, তোরা জানিস না, ও আমার পেটের ছেলে হলেও ও রাজার ছেলে।

—মায়ী!

নিজেই চমকে উঠেছিল রুক্মিণী। এ কাকে সে কি বলছে! পরক্ষণেই বলেছিল, কিন্তু খবরদার ঝুমঝুমি, এ কথা কাকেও বলবি না। কাকেও না, ওকেও না। খবরদার, তা হলে তোর মুখ দেখব না।

—বলব না মায়ী।

রুক্মিণী সেদিন ওকে নিজের পুরনো কাপড় যা তোলা ছিল, তাই পরিয়ে নিজে কেশসজ্জা করে দিয়ে মাথায় নিজের ছেলেবয়সের রূপোর টিকলি পরিয়ে দিয়েছিল। তারপর অহল্যাকে ডেকে বলেছিল, পিসী, দেখ তো।

পিসী ঝুমঝুমিকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সবিস্ময়ে বলেছিল, ঝুমঝুমি! অর্থাৎ এ কি সত্যই ঝুমঝুমি! রুক্মিণী সন্ধ্যার সূর্যের আলোতে ঝুমঝুমির চিবুক ধরে মুখখানি তুলে ধরেছিল। সেও মুগ্ধ হয়ে বলেছিল, হ্যাঁ।

—ই যি কালো রাধা লো রুক্মিণী!

—তাই বটে!

সত্যই অপরূপা লাগছিল কালো মেয়েটিকে। সুনিপুণ প্রসাধনে তার বন্য বর্বর রূপ পাল্টে গিয়ে দ্রুপদ রাজার স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণবর্ণা কৃষ্ণার মত লাগছিল।

রুক্মিণীর পিসী অহল্যা তাড়াতাড়ি রুক্মিণীর ঘরের ভিতর থেকে আয়নাখানা এনে ঝুমঝুমির সামনে ধরে বলেছিল, নিজে দেখ্ লো একবার। ছত্রিশ জাতিয়া বেদেনী মোহিনী হয়ে গিয়েছিল।

অবাক হয়ে নিজেকে নিজে দেখছিল ঝুমঝুমি।

রুক্মিণী বলেছিল, আয় এবার। ঝুমঝুমির হাত ধরে সে তাকে কিষণজীর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, শোন্। এই ঠাকুরকে সাক্ষী করে তোকে আমার বেটার সেবা করবার জন্যে নিলাম। তার সেবা করবি। বল্, ঠাকুরের সামনে বল্।

অবাকের উপর অবাক হয়েছিল ঝুমঝুমি। তাদের কতজনের কত পাইকের সঙ্গে প্রেম হয়, একদিন তারা মেয়েদের নিয়ে যায় নিজেদের ঘরে; কই, ঠাকুরের সামনে এমন করে বলতে হয় না, এমন করে সাজিয়ে দেয় না, সাজতে পায় না। কিন্তু এ কি হল তার! মাথার

ভিতর ঝিম্‌ঝিম্ করছে। কেমন ভয় লাগছে, বুকের ভিতরটায় যেন গুরু গুরু করে মেঘ ডাকছে।

—বল্—

—তার সেবা করব।

—বল্, তাকে ছাড়া অন্ত পুরুষকে ভজব না। বল্।

—কখুনও না। কখুনও ভজব না মা। তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি।

বল্, তার মদ খাওয়া কমিয়ে তাকে মানুষ করবি। সে রাজার ছেলে, তাকে তাই করে দিবি?

ঝুমঝুমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, রাজার ছেলে কেমন সি তো জানি না মায়ী।

—বেশ, আমি যেমন মা, তেমনি মায়ের ছেলে করে দিবি।

—করব মা।

রুক্মিণী তারপর পিসীকে বলেছিল, পিসী, বাপকে ডাকতে বল্; ঝুমরীকে আর সর্দারদের।

সর্দাররাও এসে এই কালো মেয়েটির আশ্চর্য রূপ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। অর্জুন ছুটে এসেছিল ঝুমঝুমির কাছে। রুক্মিণী বলেছিল, এই উজবুক, থাম্।

অর্জুন অন্তদিন হলে থামত কি না সে ভগবান জানেন, কিন্তু সেদিন থেমেছিল। শুধু বলেছিল, তু সাজালি মা? তু?

—বর্বর কোথাকার, তুমি বলতে হয়।

—আমার লাজ লাগে।

অহল্যা বলেছিল, ঝুমঝুমির হাত ধরতে ছুটে আসতে লাজ লাগে না বেহায়া?

—হুঁ। আজ লাগছে।

সকলে হো হো করে হেসে উঠেছিল। অর্জুন আরও লজ্জা পেয়েছিল। রুক্মিণী বলেছিল, বাপ!

—মা!

—তোমাকে, সর্দারদিকে সাক্ষী করে ঝুমঝুমিকে আজ থেকে অর্জুনের দাসী করে দিলাম। শুধু তোমরা নও, কিষণজী সাক্ষী রইলেন। আজ থেকে দিনরাত্রি ও অর্জুনের ঘরে থাকবে। অর্জুনকে বলতে হবে, কখনও সে ঝুমঝুমিকে ছাড়বে না বিনা দোষে। তার অপমান করবে না, অন্ত মরদকে তার গা ছুঁতে দেবে না। বল্ অর্জুন, কিষণজীর সামনে বল্। আয়, বল্।

অর্জুন অবাক হয়েই বলে গিয়েছিল বাক্যগুলি। সেও এমন করে কথা কখনও বলে নি।

* * * *

সেদিন থেকে ঝুমঝুমি অর্জুন একসঙ্গে থাকে। ঝুমঝুমি তার রাখনী। কিন্তু অন্তদের রাখনার মত নয়। একটু আলাদা। এবং সেবাও তার আশ্চর্য। এই মাস কয়েক আগে

বর্গীরা যখন মেদিনীপুরে ঢোকে তখন গাছে চড়ে লুকিয়ে দেখতে গিয়ে কিসের কামড় খেয়ে যাতনার জ্বালায় অস্থির হয়ে সে নদীর জলে ঝাঁপ খেয়েছিল। ঝুমঝুমি তার সঙ্গে ছিল। ঝুমঝুমিকে নিয়ে সে মাস কয়েক বলতে গেলে প্রমত্ত জীবন যাপন করেছে। দিনরাত্রি বনে বনে ঘুরেছে। সে বাঁশী বাজিয়েছে, ঝুমঝুমি নেচেছে। সে মদ আরও বেশী খেয়েছে, ঝুমঝুমিকেও খাইয়েছে। ঝুমঝুমি যে কথা রুক্মিণীকে দিয়েছিল তা সে রাখতে পারে নি। তার সাধ্য ছিল না। হয়তো এতে তার সাধও ছিল। তার ছত্রিশজাতিয়া বেদিয়া জীবনের এমনিই ছিল ছেলেবেলা থেকে সাধ। সে-সাধের বিরুদ্ধে সে যেতে পারে নি। রুক্মিণীর সাময়িক স্নেহ সব মুছে গিয়ে ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল। নিজেকেই দোষ দিয়েছিল সে। তার এমন প্রত্যাশা করাই ভুল হয়েছিল। মেয়েটা যে ছত্রিশজাতিয়া বেদেনি। কিন্তু সেবার ক্ষেত্রে ঝুমঝুমি তার কথা রেখেছিল। সে যে কি কষ্টে তাকে বাড়ি এনেছিল সে কেউ কল্পনা করতে পারে না। এমন দশাসই জোয়ান অর্জুন, তাকে ওই কৃশাঙ্গী মেয়েটা কেমন করে বয়ে আনলে ঘরে! তারপর সর্বাঙ্গ ফুলে উঠল অর্জুনের। ঝুমঝুমির বাপ বেদে। সাপের ওস্তাদ, বিষের ওঝা চিকিৎসক। সে করলে চিকিৎসা। রুক্মিণী মাথার শিয়রে বসে থাকত। আর এই মেয়েটা নিদ্রা নেই আহার নেই সেবা করেছে। অর্জুনের শরীরে চাকাচাকা মত হয়েছিল। দুর্গন্ধ রস গড়াত। মেয়েটা শিমুল তুলো ভিজিয়ে মুছত। ময়ূরের পালকে ওষুধ ভিজিয়ে লাগাত ক্ষতে।

মীর হবির বর্গী নিয়ে এলেন, নবাবের তাড়ায় শেয়ালের মত পালালে। অর্জুন গাছে চড়ে বর্গী দেখতে গিয়ে কিসের কামড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল দু মাস। রুক্মিণী তখন কিষণ-জীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলত, তুমি ওকে নিলে না কেন? ওকে যদি নিতে, ও যদি মরত তা হলে যে বর্গীদের ওই পালানোর সময়েই রুক্মিণী যেমন পারত মীর হবিবের রক্ত নিতে জান নিতে চেষ্টা করে মরত। এমন কথা দলু মন্দিরের বাইরে বসে শুনত আর চোখের জল ফেলত।

অর্জুন সেরে উঠে আবার যে অর্জুন সেই অর্জুন হয়ে উঠল।

রুক্মিণী একদিন বলেছিল, এতেও তোর শিক্ষা হল না?

হেসে অর্জুন বলেছিল, শিক্ষা? কিসের শিক্ষা? একদিন ভাত খেয়ে জ্বর হয়েছে বলে ভাত খাবে না লোকে? ভাত তো বারো মাস খায় লোকে। হুঃ! যত সব!

রুক্মিণী আর কিছু বলে নি।

মাস দেড়েক আগে একবার ক্ষেপেছিল মনসার মেলা যাবে। মনসা মায়ের মন্দিরে মেলা। যেতে দেয় নি রুক্মিণী।

এবার অষ্টমীর খেলা। বিজয়া দশমীর মাতনে সেই জন্যে কাউকে না বলে তার দল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তার সাঙ্গোপাঙ্গ চেলা চামুণ্ডের দল শুধু তার মোহগ্রস্তই নয়, তাদের স্বাস্থ্য আছে, শক্তি আছে, উল্লাসের তৃষ্ণা আছে; সাহস আছে দুর্দান্ত। তারাও বেরিয়ে গিয়েছে তাদের নবীন বয়সের সঙ্গী নবীন সর্দারের সঙ্গে। তার উপর সঙ্গে আছে আপন আপন সঙ্গিনী, তারাও প্রমত্তা। তারা ফিরবে না দলু জানে।

সাত

শঙ্করীপুরের মা শঙ্করী সাক্ষাৎ শঙ্করী। সাক্ষাৎ দুর্গা চণ্ডী চামুণ্ডা। প্রশস্ত বাঁধানো চত্বরের মধ্যে পাথরের গাঁথনি। দেওয়ালের উপর ছাদ, একতলা ঘর, তার মধ্যে মা চণ্ডীর আটন। আগে ছিলেন গাছতলায়। গাছটা মরে গেছে কিন্তু শুকনো গুঁড়িটা এখনও আছে, তারই কোলে শিলামূর্তি। শিলার সর্বাঙ্গ সিন্দূর-লেপা, শুধু সোনার বা পিতলের দুটো গোল চোখ ঝক্‌ঝক্ করে।

বহুকাল থেকে এখানে আশ্বিনের পুজার সময় পূজা হয়; পূজা অষ্টমী নবমী দুদিন। তারপর দশমীর দিন ও অঞ্চলের লোক ঝেঁটিয়ে এসে জড়ো হয়, ভদ্রলোকে মাকে প্রণাম করে। হাতে অপরাজিতার লতা বাঁধে। কোলাকুলি করে। আর পাইক চুয়াড়রা এসে মদ খেয়ে গান করে, নাচে। সে এক হুল্লোড়।

অষ্টমীর দিন রাত্রে বলি হয় অষ্টমীর ক্ষণে। সেদিন পুজোর পর সব বড় বড় ওস্তাদ খেলোয়াড় আসে। লাঠিতে তলোয়ারে সড়কিতে তীর ধনুকে শঙ্করী মায়ের সিঁদুর লাগায়। আর একটা খেলা হয়। সে খেলার বিচার করে শঙ্করীপুরের ছত্রী নায়ক। খেলা দু ভাগে হয়। একটাতে খেলে শুধু ছত্রিরা, অন্যটাতে অন্য সকলে।

শঙ্করীপুরের অষ্টমীর দিন খেলায় যারা সকলকে হারায় তারা শির প্রসাদ পায় এবং তারাই হয় এ বছরের জন্য সেরা জোয়ান। বহুদিন থেকে অর্জুনের সাধ, তারা একবার গিয়ে এই প্রসাদ জিতে আনে। শির প্রসাদ হল এক একটা পাঁঠার মুণ্ডু, ওরা বলে 'মুড়ি'। অষ্টমীতে বলি হয় পঞ্চাশ বাট। তার মুণ্ডগুলো সারি সারি সাজানো থাকে মন্দিরের মেঝেতে। প্রতি মুণ্ডুর উপর জ্বালা থাকে এক একটি মাটির প্রদীপ। খেলা শেষ হলে লাঠি তলোয়ার সড়কি তীর ধনুক আর কুস্তির সেরা খেলোয়াড়কে এক একটা করে মুড়ি প্রসাদ দেন পুরোহিত। ছত্রিরা আলাদা পায়, পাইকেরা আলাদা পায়।

* * * *

এ অঞ্চলের মধ্যে চন্দনগড়ের খেলোয়াড় ছত্রি এবং পাইক দুয়েদেরই খুব নামডাক। তারাই বলতে গেলে প্রতি বছরই শির প্রসাদ লুটে নিয়ে যায়। দু'চারটে মুড়ি অন্যেরা পায়। এলাকাটাও বলতে গেলে চন্দনগড়ের এলাকা। চন্দনগড়ের রাজা সুচেত সিং-এর পড়তাও খুব, প্রতাপও খুব। সুচেত সিং আগে বর্গীদের দোস্ত ছিল। উড়িষ্যার কাছে এই অঞ্চলটায় বর্গীদের প্রতাপই বেশি। নবাবের রাজত্ব মাসে দশ দিন থাকে, বিশ দিন থাকে না। কাজেই সুচেত সিং-এর প্রতাপ বড়, বাড়ন্তও খুব। এখানকার ছত্রি নায়ক চন্দনগড়ের অধীন নয়, সে শঙ্করী মায়ের দেবোত্তরের সেবায়েত। তার উপর হাত কেউ দেয় না। এলাকাটিও ছোট। শঙ্করীপুর মৌজাই এলাকা। গ্রামে বাসিন্দাও বেশি নয়। ঘর পঞ্চাশেক। পূজক ব্রাহ্মণ আছে কয়েক ঘর, ছত্রি ঘর বিশেক। বাকি সব কয়েক ঘর সদ্গোপ আর বাগ্দী চুয়াড়। আর ঘর চারেক বাস্তকর।

সদ্‌গোপেরাও দেবতার কাজ করে জমি ভোগ করে। দেবতার কাজেই জমি সব বেঁটে দেওয়া আছে। কেউ ফুল যোগায়, কেউ বেলপাতা, কেউ আতপ, কেউ গুড় চিনি, কেউ পাঁঠা। নিত্য বলি আছে। কেউ পাঁঠা বলি করে, কেউ ধরে, কেউ পাঁঠা বাঁধবার দড়ি দেয়! কেউ খর্পরের জন্ম মাটির খুরি দেয়, কেউ ঘট। কেউ মন্দির ঝাঁট দেয়। কেউ বহুদূর থেকে ভারে বয়ে গঙ্গাজল আনে। এমনি ব্যবস্থা। গ্রামে ধনী কেউ নেই। তার উপর জাগ্রত দেবস্থান। ছত্রিরাও এখানকার রাজায় রাজায় যুদ্ধে দাঙ্গায় কারুর পক্ষ নেয় না। এখানকার ছত্রিদের খেতাবই হল—মায়ের দেওয়ান। কিন্তু অধীন কারুর না হলেও যে রাজার যখন বাড়বাড়ন্ত হয় তখনই তার প্রতাপের প্রভাব এসে পড়ে। চন্দনগড়ের প্রভাব এখানে অনেক দিনের। সুচেত সিং-এরও আগের আমলের। তাদের পুজো বছরে অনেকবার আসে। এবং তাদের পুজাই দেওয়ানদের পুজোর পর প্রথম। রাজা সেনাপতি সিপাহীরা সব দল বেঁধে আসে। রাণীরাও আসেন ডুলি করে। তখন কাপড়ের ঘের পড়ে। অন্য কেউ মন্দিরে ঢুকতেও পায় না। তারপর খেলা আরম্ভ হয়। মহাষ্টমীর রাত্রে—এ খেলা বীরের খেলা। তলোয়ার খেলা, সড়কী লাঠির খেলা, ধনুর্বাণের খেলা,—নামেই খেলা—আসলে সে যুদ্ধ। জখম প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে—মধ্যে মধ্যে খুনও হয়ে যায়। আঘাত তো খেলার আঘাত নয়। যুদ্ধের আঘাত। বিশেষ করে তলোয়ার খেলায় মধ্যে মধ্যে তলোয়ার আমূল বসে যায় বুকে কিংবা আঘাতে হাত মুণ্ডু দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

চারি দিকে মশাল জ্বলে, রাত্রির অন্ধকার উপরে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে, চারি পাশে স্তব্ধ জনতা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে, মধ্যে মধ্যে আপন অজ্ঞাতসারেই মুখভঙ্গি করে হাত পা নিয়ে আস্ফালন করে। খেলা শেষ হলেই অর্থাৎ একজন পরাজিত হলেই ধ্বনি ওঠে, রাত্রের আকাশের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়ে শূন্যলোকে। একজন ধরাশায়ী হতেই আর একজন লাফ দিয়ে পড়ে, বিজয়ীকে যুদ্ধে আহ্বান করে বলে, এস।

মন্দিরের দাওয়ায় বসে থাকেন বিচারকমণ্ডলী, তাদের পাশে থাকে অস্ত্রধারী সিপাহী। একালে তাদের হাতে বন্দুকও থাকে। এই প্রতিযোগিতায় যুদ্ধের নিয়ম কেউ লঙ্ঘন করলে তারা এগিয়ে এসে মাঝখানে দাঁড়ায়। প্রয়োজন হলে বন্দুকও ব্যবহার করে। এদের অধিকাংশেরাই চন্দনগড়ের। এখানকার ছত্রিরাজা মা চণ্ডিকার দেওয়ান সাহেব নামে প্রধান বিচারক হলেও চন্দনগড়ের রাজা সুচেত সিংই সর্বোচ্চ আদালত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এবার চন্দনগড়ের কেউই আসে নি। রাজা না, সেনাপতি না, কোন সিপাহীও না। এমন কি সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে যে সব জোয়ানেরা এসে খেলায় বেশী মাতে তারাও না। এমন কি এখানকার ছত্রি রাজা মায়ের দেওয়ান তিনিও হাজির নেই। মহাষ্টমীর রাত্রেও এবার মা চণ্ডীর স্থানটার যেন জমজমাট নেই। স্থানীয় লোকেরা আছে কিন্তু সে হৈ হৈ জমজমা গমগমা যেন ছাই-ঢাকা-পড়া আগুনের স্তূপের মত মনে হচ্ছে।

অর্জুনের দল এসে জয়ধ্বনি দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকল—জয়, মা চণ্ডীর জয়।

তাদের দেখে লোকজনেরা চকিত হয়ে একবার তাকালে মাত্র। কিন্তু তারপর আপন কথায় মত্ত হয়ে গেল।

কথা আর কিছু নয়। 'বর্গী'। তাই বর্গী শব্দটাই কানে আসছে বার বার। অর্জুনেরা প্রণাম করে উঠে একটা ফাঁকা দেখে জায়গায় আসর পেতে বসল। অর্জুন বললে, ধুৎ তেরি। বর্গী—বর্গী—আর বর্গী। বর্গী কত দূরে ঠিক নাই, সব ভয়ে মরে গেল আগে থেকে। শালা! লোক কই রে? লড়ব কার সঙ্গে.?

গণ্ডার বললে, বললাম তোমাকে ছোট সন্দার ফিরে চল। বড় সন্দার বারণ করেছে, মা বারণ করেছে, আমি নিজে বর্গীর খবর নিয়ে আইচি সেই বালেশ্বরের ধার থেকেন—তা তুমি শুনলা না। বললা ভাগ্ শালা। বালেশ্বরের আগে বর্গী তা তারা কি উড়ে আসবেক না কি? বর্গী এলে লড়াই হবে—সি যখন হবেক তখন হবেক। এখন আমোদ হবে নাই? মহাষ্টমী বন্ধ থাকবেক? শালারা মায়ের ওপর ভরসা করতে লারিস তো পূজোতে কাজ কি?

অর্জুন বললে—সি তো এখুনও বলছি রে। মায়ের পূজা করবি। মা আজ পাঁঠা খেলে ভোগ খেলে ঘরে এল, আজও বর্গীকে ভয়? ধুরো শালাদের পূজো! আর ধুরো শালারা অবিশ্বাসী! ভাগ!

ওদিকে ঢাক আর ঢোলে কাটি পড়ল।

প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে।

অর্জুন বললে মদ দে রে ঝুমঝুমি। লে রে, সব তৈরী হয়ে লে। চল্, এ 'কয়ো' কেটে আমোদ তাই হোক। ইবারে 'কয়ো' কেটেই আমোদ হোক।—অর্থাৎ কাক কেটেই আমোদ হোক।

বলে উঠে তাদের ধ্বনি দিয়ে উঠল—আবা-আবা-আবা-আবা জয়, মা চণ্ডী কি জয়!

* * * *

সত্যি এবার খেলাটা জমলই না। ছত্রিদের আসরে যারা খেললে তাদের খেলা দেখে অর্জুন হেসেই সারা হয়েছিল।—এই ছত্রিদের খেলা! ধু-রো! এক বুড়ো ছত্রি হরিহর সিং তলোয়ার সড়কি খেললে বটে। ভাল খেলা।

ছত্রিদের আসরে সে খেলে নি। সে পাইক বাগ্দীদের আসরে খেলেছিল। কিন্তু একটা কাণ্ড হয়েছিল। বুড়ো পুরোহিত; পাকা চুল, পাকা দাড়ি গোঁফ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে তামার তাগায় রুদ্রাক্ষ। আচ্ছা মানুষ! তিনি এখানকার লোক নন; অনেক দূর থেকে আসেন এই পূজোর সময় আর কাতিকের অমাবস্যায় কালীপূজোর সময়। খেলার আসরে নামবার আগে মাকে পুরোহিতকে প্রণাম করে আশীর্বাদী নিয়ে আসরে নামে—এই নিয়ম। সেই নিয়মবশে মালসাট মেরে লাঠি হাতে অর্জুন গিয়ে প্রণাম করে হাত পেতে দাঁড়াতেই তিনি যেন চমকে উঠেছিলেন।

চমকের সুরেই বলেছিলেন, তুমি!

—আজ্ঞে আমি খেলব।

—তুমি এদের সঙ্গে খেলবে কেন? তুমি ছত্রিদের সঙ্গে—তুমি ছত্রি নও?

—আজ্ঞে না।

—নও?

—না।

—বাগ্দী ?

—না। আজ্ঞে উ সব খবর আমি রাখি না। দেন, ফুল দেন, খেলি গা।

তিনি তার হাতে ফুল দিয়েছিলেন। লাঠি, তলোয়ার, সড়কি তিনটেতে সে জিতেছিল। তীর ধনুকে একটুর জন্যে হয় নি। তাও দুজনের সমান হয়েছিল। কুস্তিতে গণ্ডার জিতেছিল। শির প্রসাদ নেবার সময় পুরোহিত আবার তাকে বেশ করে দেখেছিলেন মশালের আলোয়। দেখে বলেছিলেন, তোমার নাম কি ?

—অর্জুন।

—অর্জুন কি ?

—সিং।

—তবে বললে যে ছত্রি নও ?

—না, আমি ছত্রি নই। উ মাথায় আমি জানি না।

—জান না ? বাবার নাম—

—সে সব জানি না, বাবা মরে গিয়েছে আমার জনমের ক মাস আগে। তা সি সব কথা আমাকে কেউ বলে না। আমি জানি না।

—এটি ? এটি কে তোমার ?

অর্জুনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল ঝুমঝুমি।

—উটো আমারই বটেক।

—বউ ?

—তা বটে বইকি।

—হুঁ।

বলে তিনি তাকে চারটি পাঁঠার মুড়ি দিয়ে বলেছিলেন, দাঁড়াও।

মন্দিরের ভিতর থেকে দুগাছি অপরাজিতার মালা এনে একগাছি দিয়েছিলেন অর্জুনকে, অন্য গাছি ঝুমঝুমিকে। আরও বলেছিলেন, তুমি যেয়ো না। সব হয়ে গেলে আমার সঙ্গে দেখা করো। নির্জনে।

—আজ্ঞে মদ খাব গা যি।

—মদ আমি দেব। মায়ের প্রসাদী মদ। বস।

সব হয়ে গেলে মন্দিরপ্রাঙ্গণে পুরোহিত অর্জুন আর ঝুমঝুমিকে ডেকে প্রসাদী মদ এবং মাংস প্রসাদ তাদের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, খাও।

অর্জুন খানিকটা খেয়ে তাকিয়েছিল ঝুমঝুমির দিকে। ঝুমঝুমি লজ্জা পেয়েছিল, সলজ্জভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে বলেছিল, না।

অর্জুন হেসে বলেছিল, আপনাকে লাজ করছেক।

ঠাকুর বিচিত্র একটু স্নেহের হাসি হেসে বলেছিলেন, খাও মা, মায়ের প্রসাদ। খাও। তুমি তো নায়িকা মা। সাক্ষাৎ নায়িকা। তুমি খাবে না তো খাবে কে ? তবে মা, কখনও

কদাচারের জন্তে খেয়ো না। যখনই খাবে, মা খাও—বলে মনে মনে ডেকে খাবে। না হলে নিজেও ধ্বংস হবে, একেও ধ্বংস করবে।

দুজনেই ওরা থরথর করে কেঁপে উঠল। অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়েছিল ঠাকুরের।

ঝুমঝুমি বলে উঠেছিল একটু পর, বাবাঠাকুর!

—আগে খাও। প্রসাদ নাও।

ঝুমঝুমি মদের পাত্র শেষ করে কপালে ঠেকাল। ঠাকুর বলেছিল, এই তো।

অর্জুনের অস্বস্তি লাগছিল। সে বললে, এইবারে আমরা যাই বাবা? সঙ্গীরা সব বসে রইছে।

—তুমি বড় অস্থির। নিজের কাছ থেকে ছুটে পালানো যায় না। স্থির হয়ে দাঁড়াও। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। সত্যি বলবে?

ভয় পেয়েছিল অর্জুন। অন্ধকারের মূলে যে ভয় আছে সেই ভয়। সে সভয়ে বলেছিল, আজ্ঞে?

—তোমার মা বেঁচে আছে? রুক্মিণী?

চমকে উঠেছিল অর্জুন। আজ্ঞে! তাকে জান আপুনি?

—আগে বল বেঁচে আছে?

—আছে।

—সে—না, শুক্লীরা সাড়া করে না। সে কি নিয়ে আছে? কি করে?

—দিন রাত্রির কিষণজী আছে তার, তাই নিয়ে থাকে।

—দলু বেঁচে আছে?

—আছে।

—তবে তুমি কেন বললে, তুমি ছত্রি নও? কেন মিথ্যে বললে দেবতার কাছে?

—আজ্ঞে আমি জানি না। কেউ আমাকে বলে নাই। মা বলে মাতাল, পেটের কলঙ্ক—

—তুমি ছত্রি। তুমি রাজপুত। তুমি রাজার ছেলে।

চমকে উঠেছিল অর্জুন। তার দেহের মধ্যে রক্ত যেন শন শন করে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছিল। কান দুটো গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। তার ইচ্ছা হয়েছিল সে চিৎকার করে ওঠে। উঠেওছিল। চাপা চিৎকারে সবিস্ময়ে সভয়ে প্রশ্ন করেছিল, ঠা-কু-র!

—চুপ কর। বুঝতে পারছি তুমি জান না, তুমি—

—বাবাঠাকুর! ঝুমঝুমি হাত জোড় করে সভয়ে বলেছিল, বাবা, ওর মা দেবতা, তিনি বলতে বারণ করেছে বাবা। উকে বল নাই। বাবা গো!

—থাক তা হলে, সে-ই বলবে। তবে শোন অর্জুন, আমি তোমার মায়ের গুরু। আমার বাবা ছিলেন তোমার বাবার গুরু। যার জন্তে তোমাকে ডেকেছি।

বলে তিনি আবার ঘরের মধ্যে গিয়ে একগাছা পৈতে ওই মায়ের অঙ্গের সিঁদুরে রাঙিয়ে এনে বলেছিলেন, মাথা পাত।

—কি?

—উপবীত। তুমি ছত্রি, তোমার উপবীত হয় নি—

—না।

—অর্জুন!

—না। আমার মা তো রাজার রাখনী ছিল—

—আ্যা—ই! গর্জে উঠেছিলেন ঠাকুর। তারপর বলেছিলেন, আমি নিজে তোমার মায়ের বিবাহ দিয়েছি। ও কথা উচ্চারণ করো না। মহাপাপ হবে।

এবার এগিয়ে এসেছিল অর্জুন। এসেও থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ও?

আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল ঝুমঝুমিকে।

—ও তোমার সঙ্গে থাকবে। চিরদিন থাকবে। ও লক্ষ্মীবতী নায়িকা। ও অপরাজিতা। তারপর ঝুমঝুমির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, কি নাম মা তোমার?

—ঝুমঝুমি।

—তোমার নাম আমি দিলাম অপরাজিতা। কখনও এর অপমান করো না।

অর্জুন গলা পেতেছিল। ঠাকুর সেই রাঙা উপবীত তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি ছত্রি। তোমার বিবরণ তোমার মায়ের কাছে শুনবে। বলবে, তোমার গুরু শঙ্কর ভট্টাচার্য বলতে বলেছেন।

অর্জুন পৈতেটা পরে কেমন হয়ে গিয়েছিল। নেড়ে দেখেছিল। দেহ মন কেমন যেন জরোত্তাপে হয়ে উঠেছিল উত্তপ্ত, জর্জর। ঝুমঝুমি জিজ্ঞাসা করেছিল, ঠাকুর!

—ওকে কি নিয়ম পালতে হবে? খাওয়া-ছোঁওয়া—

—কিছু না। আমি বুঝতে পারছি যে অবস্থায় আছে তাতে মানা চলে না। মানতে হবে এই কটি নিয়ম। ছত্রি কখনও ভয়ে মাথা হেঁট করে না। ধর্ম ইজ্জত সব থেকে বড়। ধর্ম হল দেবতাকে প্রণাম করা, বিগ্রহ গো-ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা, বিপন্নকে রক্ষা করা, কারুর উপর অত্যাচার না করা। ইজ্জত মর্যাদা হল ধর্মের আভরণ। দেশের স্বাধীনতা নিজের স্বাধীনতা হল মর্যাদা। নিজের স্ত্রীর সতীত্ব হল মর্যাদা। শুধু স্ত্রী নয়, নারী জাতি হল মর্যাদা। তাকে রক্ষা করবে প্রাণ দিয়ে।

অর্জুন ঠাকুরের পায়ে হাত দিতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল। ঠাকুর বলেছিলেন, নাও, পায়ের ধুলো নাও।

—আমি? ঝুমঝুমি বলেছিল।

—নাও মা। তুমি নায়িকা। মহা পবিত্র তুমি।

ওরা প্রণাম করে চলে আসছিল। ঠাকুর বলেছিলেন, আর একটু দাঁড়াও।

—ঠাকুর!

—তোমাদের সৌভাগ্য—দুর্গা সিং নেই। চন্দনগড়ের কেউ আসে নি। এলে তোমাকে চিনতে বাকি থাকত না। তোমার রঙ ছাড়া মুখ চোখ নাক আকার অবয়ব সব তোমার বাবার মত। তোমরা বোধ হয় দলুকে রুক্মিণীকে লুকিয়ে এসেছ।

—হ্যাঁ বাবা। উ কিছুতে মানলেক নাই।

—মানবে না। হয়তো কালচক্র টানছে। তা তোমরা চলে যাবে?

যেন নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলেন।

অর্জুন বলেছিল, না বাবাঠাকুর। দশমীর নাচন না নেচে যাব না।

—হ্যাঁ। দশমীর আশীর্বাদ নিয়ে গেলেই ভাল। তা শোন, এক কাজ কর। তোমরা একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাক। সাবধানে থাকবে। কারুর সঙ্গে ঝগড়া করো না। বুঝলে? না মানলে বিপদ হবে। বুঝেছ, বিপদ হবে। কোথায় আছ?

—কোথায় আবার? গাছতলায়।

—আরও একটু সরে গিয়ে বনের ভিতর থাকো। অমান্য করো না, বিপদ হবে। আর দশমীর দিন যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করবে। সঙ্গীদেরও কাউকে কিছু বলবে না। কোন কথা না। তুমি ছত্রি তাও না। বুঝেছ। ঘরে ফিরে সর্বাগ্রে বলবে মাকে। মায়ের কাছে নিজের কথা শুনবে। তারপর সকলকে বলবে। মা অপরাজিতা, ও চঞ্চল, তুমি মনে রেখো। ও ভুলে গেলে তুমি এসো।

* * * *

বিজয়ার দিন সন্ধ্যাবেলা।

প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করে তারাও নেচেছে বলিদানের পর ওই দঙ্গলের সঙ্গে। সন্ধ্যায় ফিরে এল আস্তানায়। চণ্ডীতলা থেকে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে ঘন বনের মধ্যে একটা ছোট ঝরনার ধারে তারা আড্ডা গেড়েছিল ক'দিন। জায়গাটায় গাছপালা একটু কম। সেইখানটা তারা কোদাল দিয়ে চেঁচেছুলে, গোবরজল দিয়ে নিকিয়ে নিয়ে বেশ ঝরঝরে করে নিয়েছিল। একদিকে রান্নার জায়গা। এখানে এসে চণ্ডীতলার মেলায় হাঁড়ি মালসা কয়েকটা খুরি-গেলাস কিনে রান্নাবান্না করেছে। শুধু ভাত আর মাংস। নবমীর দিন অষ্টমীর রাত্রে পাওয়া পাঁঠার মুড়ির মাংস খেয়েছে। তার উপর বনে ঢুকে একটা ছোট হরিণ মেরে এনেছিল। সেটাতেই চলেছে নবমীর রাত্রি, দশমীর দিনের বেলা; রাত্রির জন্যও রান্না করা মাংস হাঁড়ির গলায় দড়ি বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে। আজ সন্ধ্যাবেলায় খাওয়াদাওয়া করে রওনা হবে রাত্রে। চণ্ডীতলার মা চণ্ডীর মূর্তি শিলামূর্তি। এখানে বিসর্জন নেই। ক্রোশখানেক দূরে মাটির প্রতিমায় পুজো হয়, এক মাহিষ্য জোতদারের ঘরে—ইচ্ছে সেই বিসর্জন দেখে রাত্রি দুপুর নাগাদ রওনা হবে তাদের বারোপাহাড়ী জঙ্গলগড়ের দিকে। পৌঁছে যাবে ভোর ভোর।

অর্জুনের স্ফূর্তি খুব। সে এবারকার আসরে শির খেলোয়াড়। এ দুদিন যখনই গিয়েছে চণ্ডীতলায় তখনই লোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছে—এই। এই। এই এবারকার শির খেলোয়াড়। বুকের উপর তার লাল পৈতে। পৈতেটা দেখে সঙ্গীরা বিস্মিত হয়েছে। প্রশ্ন করেছে। কিন্তু সে ঠাকুর মশায়ের বারণ মেনেছে, বলেছে শির খেলোয়াড়কে পৈতে দেয়।

স্ফূর্তিতে তার ইচ্ছে হত ডাক ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে শূন্যে মালকবাজী দেয়। কিংবা মাটির উপর বাঁ হাতটায় ভর দিয়ে দেয় মালকবাজী। মায়ের পুষ্প এবং রঙীন গামছা সে মাথায় বেঁধেই রেখেছে কদিন। দেখুক, লোকে দেখুক। বাড়ি গিয়ে মাকে দাদোকে দেখিয়ে তবে খুলবে—তার আগে নয়।

অর্জুন বললে, লে, পাড়, হাঁড়ি পাড়। আর পাতা লে হাতে হাতে। মাংস আর মদ

খেয়ে লে। তারপর চল্ মাইতি বাড়িতে ড্যাং ড্যাং ড্যাং সো—ড্যানাক-ড্যানাক বাজতে লেগে গেয়েছে। চল্। শিগগির শিগগির সব সেরে লে।

গণ্ডার শুধু একপাশে মনমরা হয়ে বসে আছে।

অর্জুন বললে, কি রে গণ্ডারে, তোর হল কি ভ্যালা বল দিকি? ভাম ক্যানে রে শালো?

গণ্ডার এবার একটু নড়ে বসে বললে, তোমরা যাও ছোট সদ্দার। আমি যাব নাই।

—যাবি নাই? ক্যানে রে? কার পীরিতে পড়লি রে মানিক? বল্, দেখায়ে দে। শালা—আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কাঁধে তুলে তু দে ছুট। আমরা পিছাতে থেকে রুখব। তার জন্মে মনখারাবি ক্যানে রে গাড়োল!

গণ্ডার এবার হাত মুখ নেড়ে বলে উঠল, পীরিত! তুমি বাবা ছোট সদ্দার, তোমার সাত-খুন মাপ। তুমি যা খুশি করতে পার হে। তোমার সঙ্গে আমাদের সঙ্গ? পীরিত! বলে ভয়ে প্যাটের পিলাটা উপর বাগে মাথার উঠছেক! তোমাদের কিছু হবেক নাই। বিপদ আমার। বড় সদ্দারের শাহী কিল, ভাদর মাসের তাল পিঠে পড়বেক আমার। হ্যাঁ, বলে কিলায়ে কাঁঠাল পাকায়ে দিবেক! বুঝেছ? আমি যাব নাই।

হো হো করে হেসে উঠল অর্জুন।

একজন প্রশ্ন করলে, যাবি না তো করবি কি?

—গলায় দড়ি দিব হে। লইলে চলে যাব যি দিকে দু চোখ যায়।

অর্জুন তখনও হাসছিল। গণ্ডার বললে, তোমার পায়ে ধরি ছোট সদ্দার, এমন করে হেসো নাই বাপু। আমার বলে—

বেচারা কেঁদে ফেললে এবার হাউ হাউ করে।

এবার অর্জুন গম্ভীর হয়ে গেল। উঠে এসে হাত ধরে বললে, থাম গণ্ডার। আমি তুকে বাত দিছি হে—তুর কিল আমি পিঠ পেতে লিব। আর সদ্দারের সঙ্গে বুঝাপড়া করে লিব। না হয় তুদিকে নিয়ে চলেই যাব শালার জাগা ছেড়ে। লতুন গড় করব। মা কালীর দিব্যি, মা চণ্ডীর দিব্যি, কিষণজীর দিব্যি!

গণ্ডার মুহূর্তে হেসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে, ছোট সদ্দার, এই লেগেই তো তোমাকে এত ভালবাসি হে। তুমার লেগে জানটাও দিতে পারি।

অর্জুন বললে, লে, হাঁ কর্। আমি নিজে মদ ঢালব তুর মুখে। কোঁৎ কোঁৎ করে গেল্। লে।

খানিকটা মদ তার মুখে ঢেলে দিয়ে সে বসল, বললে, লে, ইবারে মাংস আন। দে গো—সব মাংস দে। ওই ছুঁড়িগুলান কুনো কম্মের লয় হে! এই ঝুমঝুমি! এই!

চারিদিক তাকিয়ে দেখলে অর্জুন। কই! ঝুমঝুমি কই!

—আরে! ঝুমঝুমি কুথা গেল হে?

মেয়েগুলি হাসতে লাগল।

—মরণ! হাসছিস ক্যানে?

একটা মেয়ে বললে, সি চণ্ডীতলা গেইছে কবচ আনতে। বুললে ঠাকুর বুলেছে তাকে

কবচ দিবেক। বশীকরণ কবচ।

খিলখিল করে হেসে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ মেয়েরাও। মুহূর্তে অর্জুনের মনে পড়ে গেল ঠাকুরের কথা।

'দশমীর দিন যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করো। সঙ্গীদের কাউকে কিছু বলবে না। ভুলো না।'

আট

শঙ্করীতলায় তখন অনেক লোকের ভিড়। অধীর স্বভাব অর্জুনের, সে খুব দ্রুতই চলেছিল মন্দিরের দিকে। নানান জনের নানা টুকরো কথা মিলে কলরব উঠেছে। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আকাশ নির্মেঘ। দশমীর চাঁদ পূর্ব দিকের আকাশে বড় তালগাছ-গুলোর মাথায় বিকেল থেকেই দেখা যাচ্ছিল। এখন আলোর দীপ্তিতে ঝলমল করছে। শঙ্করীতলা ফাঁকা জায়গা, জ্যোৎস্নায় বেশ দেখা যাচ্ছে সব। এক জায়গায় সাঁওতাল মেয়েরা নাচছে। সাঁওতালেরা বাঁশী মাদল বাজাচ্ছিল। সে একবার থমকে না দাঁড়িয়ে পারলে না। বাবাঠাকুরের কাছে যাবার তাগিদ মনে থাকতেও দাঁড়াল। পিছন থেকে দু-তিন জনে ভিড়ের মাথার উপর ঝুঁকে পড়ল। খুব মদ খেয়েছে, গন্ধ পাচ্ছিল অর্জুন। একজন বললে, মেয়েগুলো বেশ রে। কালো হলে কি হবে—বাহারে কালো!

হাসি পেল অর্জুনের। ছোঁড়া নয় আধবয়সী। চাঁদের আলোয় ঝুঁকে-পড়া মাথার চুল দেখে বোঝা যায় চুল আধপাকা আধকাঁচা। কিন্তু রস আছে। রসিক বটে।

অন্য একজন বললে, দূর, উ কি বাহারে কালো। একটা কালো ছিপাছপে ছত্রিশ জাতিয়ার মেয়ে এসেছে দেখেছিস। শালা কোঁকড়া চুল। বাঁশের পাতার মত লম্বা চোখ, ছুরির মতন নাক, শালা দেখলে মাথা ঘুরে যায়।

মাথার ভিতরটা চন্ করে উঠল অর্জুনের। প্রথম জন বললে, দেখেছি। হাঁ হাঁ। গেল কোথা বল্ দেখি?

—সন্ধ্যের সময় তাদের দল বোধ হয় চলে গেল। বনের ধারে দেখেছি।

—শালা—তবে যাবে। হয়ে গেল।

—মানে?

—মানে, বনের ভেতর শোভান সাহেবের দল রয়েছে।

—আবদুস শোভান? কটকের?

—হ্যাঁ।

—কি করে জানলি?

রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল অর্জুন। লোকটি উত্তর দিলে, ওই বনেই তো আমাদের রম্বা বাগ্দীরা কজনা মিলে রাহাজানি করে। তারা শোভানের দলের ভয়ে পালিয়ে এসেছেক। তারা

বলেছিল শোভানদের আজ একটা বড় লুট আছে। কি চন্দনগড়ের একটা ব্যাপার। ও মেয়ে বলছিস বনে ঢুকল—যাবে! তবে জানি না, শোভানের তাক চন্দনগড়ের ওপর। যদি জানাজানি না করে।

অর্জুন আর দাঁড়াল না। এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়াল। দেখলে ঝুমঝুমি হাঁটু গেড়ে বসে অঞ্জলি পেতে আশীর্বাদী কিংবা মাদুলী নিচ্ছে। ঠাকুর তাকে দেখে বললেন, এসেছ? বড় চঞ্চল তুমি। বস, ঠিক সময়ে এসেছ। অপরাজিতা অঞ্জলি পেতেছে, ওর অঞ্জলি তুমি নিজের হাতে জোড় করে ধর।

ঠাকুর মনে মনে আশীর্বাদ করে ঝুমঝুমির হাতে দুটি তামার কবচ দিলেন। একটি চৌকো তক্তির মত, অন্যটি মাদুলী। বললেন, এই তক্তি তুমি গলায় কিংবা হাতে পরো। আর মা, তুমি এটি গলায় পরো। ধর্মকে মেনে চলো। মা তোমাদের বিজয় দেবেন। কিন্তু তোমরা কি রাত্রেই যাবে বনের পথে? না গেলেও বিপদ আছে। খবর পেলাম চন্দনগড়ের সুচেত সিং এখানে আসছেন দশমীর প্রসাদ নিতে। এসে পড়লেন বলে। দশমী তিথি একপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত। তার আগেই আসবে সুচেত সিং। তার আর দেরি নেই। তোমাকে দেখলে—

চুপ করে গেলেন ঠাকুর। বললেন, বিপদ হবে তোমার। দাঁড়াও।

বলে তিনি চোখ বুজলেন। যেন ধ্যান। প্রায় মাথার উপর মন্দিরের বারান্দায় ষড়দলের মাথা থেকে একটা টিকটিকি টক্ টক্ শব্দ করে উঠল। ঠাকুর চোখ মেলে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখনও শব্দটা হচ্ছে। তিনি এবার আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, মাথার উপর থেকে বলছে। যাও, চলে যাও। রাত্রেই চলে যাও। তোমরা জোয়ান-বীর, তুমি ছত্রি। শুধু মেয়েরা আছে সঙ্গে—

অর্জুন বললে, উদের হাতেও সড়কির মত হালকা খোঁচা আছে বাবা। আর বাঘনখীও আছে। দেখা ক্যানে রে ঝুমঝুমি।

ঝুমঝুমি নিজের পেট-আঁচল থেকে টুপ করে বের করলে বাঘনখ। এবং একটু হাসলে।

—ঠিক আছে, চলে যাও। জ্যোৎস্না কুড়ি দণ্ডের ওপর। প্রায় প্রহর রাত্রি পর্যন্ত। চলে যাও। মায়ের আদেশ হয়েছে, চলে যাও। কোন ভয় নেই। তিনি একটা শ্লোক বললেন।

দূরে মনে হল কোলাহল উঠছে। একটা কলরব ভেসে আসছে। ঠাকুর বললেন, বোধ হয় এসে পড়ল। চলে যাও। হাঁ, তোমার মাকে বলো চন্দনগড়ের খুব বিপদ। গতবার সুচেত সিং নবাবের পক্ষ নিয়ে কটকে সরন্দাজ খাঁর গর্দান নিয়েছিল। এক নাচনেওয়ালী নিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া ছিল সরন্দাজ খাঁর। এবার সরন্দাজ খাঁর ছেলে বর্গীদের সঙ্গে জুটে দাবি করেছে চন্দনগড়ের দুই মেয়ে পাঠাতে হবে। মাধব সিং-এর বিধবা মেয়ে, আর সুচেত সিংএর নিজের মেয়ে। না দিলে চন্দনগড় তারা রাখবে না। বলো, তোমার মাকে বলো। আজ রাত্রের মধ্যে খবরটা মাকে দিলে ভাল হয়। কাল একাদশী সাইতের দিন। বলো, সব জেনে যা সংকল্প নেবার কালই যেন নেয়। বড় শুভদিন। আগের কালে এই দিনে রাজারা বিজয়া সেরে দেশ জয়ে বের হত।

মাধব সিং, চন্দনগড়, সুচেত সিং নামটা বহুবার সে শুনেছে। দাদো মা এই নাম নিয়ে গুজগুজ ফুসফুস করে। তাকে দেখলেই থেমে যায়। ভৈরব গোবর্ধনও করে। সে কোনদিন জিজ্ঞাসা কাউকে করে নি। আজ মনের মধ্যে নাম কটা ঘুরতে লাগল। মাধব সিং তার বাবা এটা সে জানে আর কিছু সে জানে না। সে ডান হাতে বুকের তক্তি, পৈতেটা নাড়ছিল অন্যমনস্কভাবে। ঝুমঝুমি তার সঙ্গে প্রায় ছুটে চলেছে। অর্জুনের পদক্ষেপ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর এবং দ্রুত হয়ে উঠেছে আপনা থেকে। একটা কিছু যেন আজ তার চারি পাশে তাকে ঘিরে থমথম করছে, ফিসফিস করছে। পথে শোভানের দল আছে। আবদুস শোভান। কটকের নাজিমি হারিয়ে নবাবের কাছে ভয়ে লজ্জায় ফিরতে পারে নি। বনে ডাকাত হয়েছে। আস্তানা তার উড়িষ্যায়। সে হঠাৎ চন্দনগড়ের বিপদের খবর পেয়ে বোধ হয় এ বনে ঢুকছে সুযোগমত হানা দেবে। শোভানের দল সিপাহীর দল। শোনা যায় প্রায় পঞ্চাশজন নবাবী সিপাহী তার সঙ্গে জুটে রয়েছে। ভারী বদমাশ। সব থেকে বড় লোভ তার ঔরতের উপর। তারপর টাকা।

—ঝুমঝুমি!

—হুঁ? দাঁড়ালা ক্যানে গ?

—বনে ডাকাত আছে।

—ডাকাত তো থাকেই গ। আমরাও তো করি। হাট লুটে নিয়ে আসি। গাঁ লুটি।

—না। এরা বড় ডাকাত। শোভানের দল।

—অ! তা হলি? কি করবেক?

—ভয় লাগছেক তুর?

—ভয়? না। তোমার সঙ্গে রইছি। বাঘনখী রইছে। ভয় ক্যানে করবেক!

—ওরা যদি ধরে তুদের?

—উদের কথা আমি কি করে বুলব”

—তুর কথা?

—মরে যাব। অত্যন্ত সহজ সুরে বললে ঝুমঝুমি।

—বাস্, চল্।

বনের মুখেই পথে গণ্ডার দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে, আজ যাবেক নাই নাকি? বাবা, কি ভুক করছিলা ঠাকুরের কাছে!

—চল্, চল্। বলব সব। বিপদ বটেক!

—বিপদ! সদ্দারের লোক আইছে?

—উহু। বনে বিপদ।

—বাঘ?

—না। শোভান ডাকাতের দল।

চমকে উঠল গণ্ডার—শোভানের দল!

—হাঁ।

—তবে না হয় আজ রেতে যেঁয়ে কাজ নাই হে ছোট সদ্দার। থাকা যাক। সদ্দারের কিল চড় বকুনি সিতো আছেই। কিল ধমাধম পড়ে সই কিল ধমাধম পড়ে, সি পড়বেকই। না হয় দু কিল বেশি পড়বেক। কি ঝুমঝুমি ?

—উকে যেতেই হবেক। ঠাকুর বলেছে, রাতে যেঁয়েই মাকে একটো কথা বলতে হবেক।

—তাহ

—তাহলে তুরা না হয় থাক, উতে আমাতে চলে যাই।

—তুরা যাবি, তুদের ভয় নাই ? বেশ বাঁকা সুরেই গণ্ডার জিজ্ঞাসা করলে।

অর্জুন চুপ করে পথ হাঁটছিল। তার মনে কে যেন একটা বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। সে বোঝার মধ্যে আছে তার নতুন পরিচয়, সে ছত্রি। সে রাজার ছেলে। তার মা বামুন ছত্রি ঘরের সতীর মত সতী। তার মা তার বাবার—না, কথাটা তার জিভে আর আসছে না। তার মাকে তার বাবা রাজা মাধব সিং মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছিল। তার সঙ্গে আরও কটা রহস্যময় নামের ভার, চন্দনগড়ের বিপদ, তার মাকে আজই বলতে হবে; রাজা মাধব সিং। তার বিধবা মেয়েকে দাবি করেছে পাঠানে নিকা করবে। সে তার বোন। সে মাধব সিং-এর ছেলে। সুচেত সিং-এর কুমারী মেয়েকে চেয়েছে শাদি করবে। সে ছত্রি। মেয়ের সতীত্ব ইজ্জত তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচাতে হয়। মাকে খবর দিয়ে সে আসবে চন্দনগড়ে। ঠিক করে ফেলেছে সে। চন্দনগড় লুঠ করে নেবে বর্গীতে। হয়তো দখল করে নেবে পাঠানে। সে যাবে। ভাবতে ভাবতে চলছিল সে। ঝুমঝুমি কথা বলছিল গণ্ডারের সঙ্গে। এবার গণ্ডারের কথাটা তাকে যেন একটা ঝাপটা দিয়ে গেল। সে বললে, ভয় রইছে বইকি গণ্ডার। কিন্তু করব কি! ছত্রিকে ভয় করতে নাই।

—ছোট সদ্দার! চমকে উঠল গণ্ডার।

—হাঁ রে গণ্ডার। ঠাকুর আমার সব জানে। উ আমার মায়ের গুরু বটেক। বুঝলি, আমার চেহারাটো ঠিক আমার বাবার মত বটেক, দেখেই চিনে ফেলাইছে। বললে, তুমি ছত্রি বটে। তোমার মাকে তোমার বাবা মন্তর পড়ে বিয়ে করেছিল। আবার বাবা আমার রাজা ছিল। সিদিন মা শঙ্করীর গলা থেকেন পৈতে নিয়ে আমাকে পরায়ে দিয়ে বললে, তুমি ছত্রি। তুমি রাজার বেটাও বট। ই কদিন ই সব কথা তুদিকে বলতে বারণ ছিল বলে বলি নাই। আজ না বললে নয় রে। তা ছত্রি হয়ে রাজার বেটা হয়ে ভয় কি করে করি বল্ ?

—ছোট সদ্দার! দাঁড়াও।

—ক্যানে ?

—তোমাকে পেনাম করি হে। দণ্ডবৎ করি। না জেনে কত কি পাপ করলাম বল দেখি নি। হায় হায় গ কিষণজী! হে বাবা ভগবান!

—দূর। সে সব অজান্তি। উতে পাপ নাই। তা ছাড়া বুঝলি কিনা, ঠাকুর বলেছে আচার আচরণ বাছবিচার আমার নাই। শুধু ছত্রি ধরম মানলেই হবে। এই দেখ তক্তি একটা দিলেক কি, ই যতক্ষণ থাকবেক যমে কিছু করতে লারবেক। ঝুমঝুমিকেও একটা মাদুলি

দিয়েছে।···দেখা ক্যানে গ! আর উকে কি বললে জানিস!

ঝুমঝুমি বললে, না, সি ক্যানে বলবে তুমি?

—ক্যানে বলব না আমি—অঁঃ?

—বড়া বেহারা হে তুমি!

—সি তো বটে। তুকে তো কাঁধে নিয়া নাচি, নাচতে পারি। শুন্ গণ্ডার, বললেক ঠাকুর ঝুমঝুমি নায়িকে মেয়ে বটে। নায়িকে বুঝিস তো? হঁ্যা, মায়ের সব ডাকিনী যোগিনী থাকে তেমুনি নায়িকে থাকে। উ আমার শক্তি বটেক। বুঝলে, উর অপমান করলে ভাল হবেক নাই।

গণ্ডার বললে, এই দেখ।

—কি?

—ঝুমঝুমি কাঁদছেক।

—ঝুমঝুমি! না, অপরাজিতে। উর নাম দিলে ঠাকুর অপরাজিতে।

গণ্ডার বললে, ওরে বানাস রে! হেই বাবা!

হঠাৎ তিনজনেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। গণ্ডার অবাক হয়ে ভাবছিল। ঝুমঝুমি কাঁদছিল পরম সুখে। কাঁদছিল আর চোখ মুছছিল। অর্জুন ভাবছিল তক্তিতে হাত দিয়ে, এই শক্তি এ দেবতার প্রসাদ। এর বল তার দেহে তার মনে তার হাতের হাতিয়ারে ছড়িয়ে পড়বে নিশ্চয়। তখন কিসের ভয়! পঞ্চাশ জনের সামনে জয় মা শঙ্করী, জয় কিরণক্ষী বলে তলোয়ার ধরে দাঁড়াবে। চোখ থেকে বেরুবে আগুন, অস্ত্রের ধারে জ্বলবে আগুন, তার হাঁকে বেজে উঠবে বাজের ডাক। শত্রু থমকে যাবে। তারা থরথর করে কাঁপবে। অনায়াসে সে জয় কালী বলে কেটে ফেলবে। তখন সবাই হাত জোড় করবে।

* * * *

সবসুদ্ধ ওরা ছিল একত্রিশজন। পঁচিশ জন পুরুষ ছজন মেয়ে। কেউ থাকল না। মেয়ে পুরুষ সবাই কাপড়চোপড় সেঁটে লড়াই দাঙ্গার সময় যেমন পরে তেমনি করে পরে নিলে। মেয়েরা কাছা দিয়ে কাপড় পরে বুকের কাপড় সেঁটে টেনে পাক দিয়ে কোমরে জড়িয়ে গিঁঠ দিলে। সে প্রায় গায়ে আর একদফা চামড়ার মত হয়ে গেল। চুলগুলো মাথার উপরে রাখলে ঝুঁটি করে। তার উপর কাপড় বা গামছা দিয়ে পাগড়ি করলে। পুরুষেরা মালসাঁট দিয়ে কাপড় পরে নিলে। অন্য কাপড় দিয়ে মাথায় পাগড়ি করলে। গামছাখানা কষে বাঁধলে কোমরে।

মেয়েরা বাঁ হাতে বাঘনখী পরলে, কোমরে একটু পিছন দিকে হালকা মাঝারি আকারের বগি দা গুঁজলে। লম্বা বড় গাছে উঠে ডাল কাটবার সময় যেমন করে গুঁজে নেয় তেমনি-ভাবে। ডান হাতে রইল ওদের লাঠির মত হালকা সড়কিগুলো।

পুরুষেরা হাতিয়ার ভাগ করলে। গণ্ডারের সর্দারিতে দশজন নিলে লাঠি। মাথায় তার লোহার বোলো পরানো। যার ঘা লাগলে মাথা ফেটে যাবে। দেহের যেখানে লাগুক হাড় ভাঙবেই। তা ছাড়া কোমরে গুঁজলে বড় বগি দা। যার এক কোপে দুটো পাঁঠা একসঙ্গে

কাটা যায়। আর পিঠে বাঁধলে সড়কি। আটজন নিলে তীর ধনুক বগি দা, চারজন নিলে সড়কি তলোয়ার বগি দা। তার নায়ক নিজে অর্জুন। দুজন শুধুমাত্র কপনি পরে কোমরে ছোট বগি দা গুঁজলে। একজন বাড়তি লাঠি তীর ধনুক নিয়ে চলল। ওরা থাকতে আজ কেউ চায় নি।

গণ্ডারই সব বলেছিল ওদের। অর্জুন থম হয়ে বসেছিল। সে থমথমে হয়ে গেছে। পাশে বসেছিল গায়ে গা দিয়ে ঝুমঝুমি। তাকে মধ্যে মধ্যে অর্জুন বলেছিল, মদ দে।

ঝুমঝুমি দিচ্ছিল অল্প অল্প করে। সে একবার বললে, কম করে দিছিস ক্যানে?

—কম করে খাও। মাতাল হলে গো চলবেক নাই। ভাব। ভেবে দেখ।

—হুঁ, ঠিক বলেছিস। বেশি চাইলে তু দিস না।

গণ্ডার বলছিল, যা সে শুনেছিল অর্জুনের মুখে। সে ঝুমঝুমিকে বলেছিল, দেখা ঝুমঝুমি ছোট সদ্দারের পৈতেটো আর তক্তিটো। দেখা তো—

ঝুমঝুমি দেখিয়েছিল। গণ্ডার বলেছিল, ইবার তুর কবচটা দেখা। এই দেখ্। ঠাকুর উকে কি বলেছে জানিস, বলেছে উ ছত্রিশ জাতিয়ার ঘরে জন্মালে কি হবেক, উ হল নায়িকে কন্যে। মায়ের ডাকিনী-যোগিনী তারাই মর্ত্যে আসে নায়িকে হয়ে। উ ছোট সদ্দারের শক্তি বটেক। উকে অপমান করলে সদ্দারের ভাল হবে নাই। উর ঝুমঝুমি নাম বদুলে নাম দিয়েছে অপরাজিতে। ছোট সদ্দার ছত্রি, ছোট সদ্দার রাজার ছেলে।

সকলে হাঁ করে শুনছিল। সভয়ে দেখছিল পৈতে-পরা তক্তি-পরা গম্ভীর অর্জুন সিংকে। অর্জুন সিংকে সিংহ উপাধিধারী বলে তাদের কোনদিন মনে হয় নি। তার গড়ন; তার চেহারা, তার গায়ের বর্ণ তাদের থেকে পৃথক বটে। কিন্তু সে কখনও তাদের থেকে পৃথক ছিল না। সর্দারের নাতি সে ছোট সর্দার। তার আলাদা বন আছে, তার পয়সা তাদের থেকে বেশি এও তাদের কখনও পীড়া দেয় নি। তার যতক্ষণ থাকত ততক্ষণ যার যা দরকার হয়েছে দিয়েছে। সে তাদের সঙ্গে খেলা করেছে, তাদের সঙ্গে হেসেছে, তাদের সঙ্গে নেচেছে গেয়েছে। শিকার করেছে একসঙ্গে, এক পাতায় খেয়েছে পর্যন্ত। বললে বলেছে, দূরো জাত। জাত কি রে? উ যা মানে মানুক। আমি মানি না। একসঙ্গে না খেলে আমোদ হয়? এক সমান হয়? লে, খা। আর জাত থাকলে সে মায়েক কে রে? তার নামটি কি বটেক? ভাগ্। বনে তাদের এঁটো পাত্রেই মদ খেয়েছে। সে চিরদিন উল্লাসময়; হা হা হাসি আর উঁচুগলায় কথা সব দুঃখ বিমর্ষতাকে মুছে দিয়ে মুহূর্তে হল্লা উঠিয়েছে। আজ সেই অর্জুন থমথম করছে। কথা বলছে না। ভাবছে। তার মাথায় কি যেন একটা চেপেছে।

গণ্ডার সব বলে বলেছিল, সিং বলছে, তুরা সব রাতটোর মতন এখানে থাক। দিনে দিনে কাল যাবি। উ চলে যাবে রেতে রেতে ঝুমঝুমিকে নিয়ে ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলে মাকে খবর দিতে। রেতেই খবরটি দিতেই হবেক। ঠাকুরের হুকুম বটেক। কাল একাদশীর সাত। কালকেই মাকে যা হয় করতে হবেক। কাল শুভদিন।

রতন পাইক বললে, তাই হয় নাকি নি! আমরা থাকবকটা ক্যানে?

—আমরাও যাব। হা-রে-রে-রে করতে করতে চলে যাব। বাঘ ছামুতে এলে শালার

জান লিব। ডাকাত এলে তাকে অ্যাই মারব লাঠি।

বলে লাফিয়ে উঠে নিজের লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিল একটা গাছের গুঁড়িতে। রাত্রির বন। আঘাতের ঠুই শব্দটা বিচিত্রভাবে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে গিয়ে অনেক—অনেক দূরে গিয়ে তবে যেন মিলিয়ে গিয়েছিল।

সকলে বলে উঠেছিল, হাঁ তো কি। সবাই যাব আমরা। মেয়েগুলান না হয়—

একটা মেয়ে বলেছিল, মর্ খালভরা! মেয়েগুলান থাকবেক পড়ে। ক্যানে রে মুখপোড়া! আর একজন বলেছিল, আমরা কি খোঁড়া নাকি? না, তুর কাঁধে চড়ে যাব বলেছি? মরণ! আমরা সবাই যাব। যদি সাতে সাতে চলতে না পারি তো ফেলে চলে যাস্।

এতক্ষণে কথা বলেছিল অর্জুন। বলেছিল, .হঁ। গেলে সবাই যাবেক। তাই চল্। একসাতে অনেক খেল হল রে ভাই, আজকের খেলাটাও হোক।

—সাবাস, সাবাস, সাবাস! একসঙ্গে বলে উঠেছিল সকলে।

—একটি কথা কিন্তু—

—বল।

—পা ছুটবেক, চোখ দেখবেক, ইশারা দিবেক কিন্তু কথা নয়। বন, রাতের বন। বাঘ শিকার মনে রাখতে হবেক। শালা বাঘ রইছে বনে। আব্দুস শোভান।

সবাই কথা বলে উঠল একসঙ্গে, কিন্তু চাপা গলায়, ঠিক বলেছ। চাপা গলার দুটি কথা আশ্চর্য রকমের ভারী এবং ভয়ঙ্কর মনে হল ওদের কাছেই। তার সঙ্গে মিলল মৃদু বাতাসে আন্দোলিত বনের পাতার খসখস শব্দ।

অর্জুন বললে, মদ খেয়ে লে। কিছুক বেশি নয়। বাকি ফেলে দে। মদ খেয়ে মাতাল হলে হবেক না। তার পরেতে—

অনেক ভেবে রণনিপুণ সেনাপতির মত বনের জোয়ানেরা নিজেদের ছোট বাহিনীকে সাজালে।

শুধুমাত্র কৌপীন পরে কোমরে ছোট ধারালো বগিদা গুঁজলে ঘোঁতন আর ছিদাম। পাতলা ছিপছিপে ষোল সতের বছরের দুই কিশোর। তারা গাছে চড়ে বাঁদরের মত। ঘন গাছ যেখানে সেখানে তারা মাটিতে নামে না, গাছের ডালে ডালে চলে যায় স্বচ্ছন্দে।

ঝুমঝুমি বললে, সর্বাঙ্গে নিমের তেল মা.. তার সঙ্গে আমার ঝুলিতে রইছে শেকড় পাতা। বিছে পোকা-মাকড়ের ওষুদ। বেটে মিশায়ে লে তেলের সঙ্গে। গন্ধ উঠবেক। সে গন্ধে পোকামাকড় পালাবে বিশ হাত। তবে ভাই, ইয়ের পরে গায়ের ছাল উঠে যাবেক এক-পুরু মরামাসের মত। ঘা হবে নাই, ভয় নাই। সাপও ঘেঁষবে নাই।

—বহুৎ আচ্ছা। ছাল উঠলে শালা ফরসা হবেক রঙ। লে রে, মাখ্। ছিদাম আর ঘোঁতা আগে আগে চলবে। বড় গাছে চড়বে। চড়ে বনের চারিদিক দেখে বলবে কোথাও আলো আছে কি না। আগুন কিংবা মশাল। কান পেতে শুনবে, আওয়াজ শুনলে বলবে, ততক্ষণে ছিদাম আরও কতকটা এগিয়ে অন্য গাছে চড়ে দেখবে।

স্থির হল নিরাপদ দেখলে লক্ষ্মীপেঁচার প্রহর ঘোষণার মত ডাক ডাকবে। বিপদ দেখলে ডাকবে কালপেঁচার ডাক।

নিচে চলবে তেইশ জোয়ান আর ছজন মেয়ে। আটজন তীর ধনুকধারী প্রথম, তারপর লাঠিয়াল দশজন। তারপর তিন তলোয়ারধারী ; তারপর নিজে অর্জুন, তার পাশে ঝুমঝুমি। তার পিছনে পাঁচজন মেয়ে, তাদের কোমরে পিছন দিকে গোঁজা বগি দা, বাঁ হাতে বাঘনখী। ডান হাতে সড়কির মত হালকা বল্লম। তার পিছনে বাকি লাঠির বোঝা মাথায় গণ্ডারের মতই বলশালী হাঁদা। আলো নয়। মশাল আছে। সে লাঠির বোঝার সঙ্গে রইল। বোঝার সঙ্গে আরও রইল মেলায় কেনা জিনিস।

দেবীপক্ষের দশমীর রাত্রি। রওনা হতে ওদের এক প্রহর হয়ে গেল। চাঁদ পূর্বদিকে আকাশের মাঝখান পার হয়ে খানিকটা উপরে উঠেছে। আকাশ নীল। একেবারে ঝকঝক করছে। তারা উঠেছে। তলোয়ারধারী কালপুরুষ সামনে, চাঁদের ওপারে খানিকটা পশ্চিম দিকে। তা বাঁয়ে রেখে তাদের যেতে হবে দক্ষিণ মুখে। তারপর পশ্চিম মুখে। পথ নেই। মানুষ বড় চলে না এদিকে। এই তো ক্রোশখানেক ক্রোশ দেড়েক পাশে সড়ক চলে গিয়েছে পুরী পর্যন্ত। ঘাটাল চন্দ্রকোণা হয়ে বীনপুরকে ডাইনে রেখে দক্ষিণ মুখে ঘুরে ঝাড়গ্রাম হয়ে চলে গিয়েছে। সুবর্ণরেখা পার হয়ে নয়াগ্রাম হয়ে সেই দাঁতনের রাস্তায় মিশেছে। মাঝে মাঝে ছোট সড়ক বেরিয়ে এদিক ওদিক গিয়েছে। যাত্রীরা এই পথে চলে। নবাবী ফৌজ বর্গী ফৌজও এই পথেই চলে। মধ্যেমাঝে এ ওর চোখে ধুলো দিতে বনে ঢোকে বটে। কিন্তু সে আগে থেকেই বোঝা যায়। এবং তারাও যেমন তেমন পথ একটা রাখে কাছাকাছি। এটা ছত্রিশ জাতিয়াদের নিজস্ব পথ। এ পথের ইশারা ওরাই জানে। কোথাও গাছে, কোথাও পাথরে, কোথাও ঝোপে নিশানা দেওয়া আছে। দিনে তো দেখা যায়ই—রাত্রেও তাদের হুঁশিয়ার চোখে অনেক কিছু পড়ে। অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষের রাত্রেও পড়ে, সাদা ধবধবে খড়ি মাটির মোটা টাই। ওগুলো এক রশি দু রশি অন্তর রাখা আছে। আজকের রাত্রি অন্ধকার নয়। আকাশে চাঁদ। বনের ভিতরটা গাছের মাথার ঢাকা সত্ত্বেও আবছা আভা ফুটছে। গাছের ডাল পাতার ফাঁক দিয়ে লম্বা লম্বা ফালির মত জ্যোৎস্না এসে মাটিতে পড়েছে। গাছের গুঁড়িতে পড়েছে চুনের দাগের মত।

উদ্যোগ করতে প্রথম প্রহরের শেয়াল ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল অর্জুন, জয় মা! জয় কিষণজী! চলো। শিয়াল যা-তা নয়, শিয়াল শিবা। শিবার ডাক। ইশারা। চলো। ওরা একত্রিশ জন চলেছে। একত্রিশ জনের পায়ের শব্দ উঠছে শুধু। আর বনে পাতা নড়ার শব্দ। আর মধ্যে মধ্যে একটু আগে বনের গাছ থেকে লক্ষ্মীপ্যাচার ডাক—কুক্ কুক্ কুক্। কুক্ কুক্ কুক্। ওরা গাছতলা পৌছুতে পৌছুতে ঝুপ করে গাছ থেকে নেমে পড়ছে হয় ঘোঁতন, নয় ছিদাম। কেউ জিজ্ঞাসা করছে, কি রে?

সে বলছে, কোথা পাবা? উসব গুল।

ওরা চলেছে আবার। আবার সামনে কোন গাছ থেকে শব্দ উঠছে—কুক্ কুক্ কুক্।

কিছুক্ষণের মধ্যেই থমথমে নীরবতা কেটে গেল। দুটো চারটে ফিসফিসানি কথা, হাসি,

গাছের পাতার খসখসানির সঙ্গে মিশতে লাগল।

বনের মধ্যে জন্তুরা ইশারা দিচ্ছে। ঝিঁঝিরা গানের জাল বুনছে। মধ্যে মধ্যে খেঁকশিয়াল খ্যা-খ্যা-খ্যা-খ্যা শব্দে ডেকে উঠছে। রাত্রিচর পাখি ডাকছে—যেন হাসছে। কখনও পাশের জঙ্গল নাড়া দিয়ে শেয়াল বা খরগোশ কি সজারু ছুটে পালাচ্ছে।

মানুষ থাকলে এরা সাড়া দেয় না। এক ঝিঁঝি ছাড়া সবাই চুপ করে থাকে। একটা মেয়ে, নাম আদুরী। সে ফিসফিস করে বললে, আঃ! মিছে মদগুলান ফেলে দিলে লো! টুকচা হলে কেমুন হত!

অর্জুন বললে মৃদু স্বরে, কাল তোকে মদের জালাতে ডুবায়ে দিব রে।

আবার চলল তারা। কতক্ষণ চলেছে ঠিক নেই। তবে অনেকক্ষণ মনে হচ্ছে। অনেকক্ষণ, কিন্তু পথের নিশানায় তো বেশি মনে হচ্ছে না। পাঁচ ক্রোশ পথ, এখনও দু ক্রোশ আসে নি। দু ক্রোশের মাথায় একটা সড়ক চলে গেছে পুব-পশ্চিমে চন্দনগড় থেকে বেরিয়ে পুরীর বড় সড়কের সঙ্গে মিশে আবার একটা ফ্যাকড়া চলে গিয়েছে বনের ভিতর দিয়ে। গিধনী পাশে পড়ে থাকবে, দীনপুর আর এক পাশে। তারপর দুটো ফ্যাকড়া। একটা গিয়েছে পশ্চিমে ধলভূম মানভূম। অন্যটা উত্তর মুখে বাঁকড়া। সে সড়ক এখনও পার হয় নি তারা। তবে এলো বলে; আর দেরি নাই।

হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দের তীর যেন সকলের কানে পাশ দিয়ে সর্বাঙ্গ শিউরে দিয়ে ছুটে চলে গেল—ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ।

কালপেঁচার ডাক। দলটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সকলের হাতিয়ার ধরা হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল। একটা মেয়ে বলে উঠল, বাবা টেঃ!

চাপা গলায় শব্দ হল, চু—প!

আর পায়ের শব্দ উঠছে না। বনে পাতার খসখসানি শব্দ উঠছে শুধু। ঝিঁঝি ডাকছে। জন্তুর শব্দ? কই?

দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে অর্জুন বললে, মেয়েরা গাছে চড়ে যা। হঁা। আর সব তৈয়ার থাক্।

সে গিয়ে গাছের তলায় দাঁড়াল। প্যাচাটা এখনও ডাকছে।

এ কি? মানুষের সাড়া?

সড়ক দিয়ে পথ চলছে রাহীর দল। বেহারার বুলি শোনা যাচ্ছে। এ কি? আলো? ও। মশাল ফুঁ দিয়ে জেলে পথ দেখে নিচ্ছে। কিন্তু? যাদের সঙ্গে বেহারা পাল্কী বা ডুলি আছে তারা মশাল নিভিয়ে দিচ্ছে কেন? মধ্যে মধ্যে জ্বালছে!

ঝুপ করে নামল ছিদাম।

—কি?

—জনা বিশ লোক। ডুলি সঙ্গে রয়েছে দু-তিনখানা না কখানা বোঝলাম না। মশাল জেলেই নিভিয়ে দিলেক। আরও একটো আলো সদার উই বাঁকটোর মোড়ে। বুয়েছ আমি গাছে উঠেছি, ইদিক থেকে একটো লোক ছ্যাবাজীর মতন সাঁ করে চলে গেল। আমি উপরে

উঠে দেখলাম বাঁকের মোড়ে আলোর ছটা। দেখছি, এমন সময় দপ্‌ করে 'নিবে গেল; তবে জ্যোৎস্না রয়েছে তো! লোক আছে। বেশ জনা কতক।

—ওঠ, আবার গাছে ওঠ। দেখ।

ছিদাম মুহূর্তে একটি ছোট লাফ দিয়ে একটি ডাল ধরে ঝুলে উপরে উঠে গেল।

সেই মুহূর্তে ওই বাঁকটায় একটা পৈশাচিক চিৎকারে রাত্রি চমকে উঠল।

—সদ্দার! ডাকাত! ডুলির দলটাকে মারছে।

মনের উত্তেজনায় ছুটে বন থেকে বেরিয়ে এসে সড়কের উপর দাঁড়াল। রশি দেড়েক দূরে চিৎকার উঠছে। হা-হা-হা চিৎকার। হিংস্র উল্লাসের পৈশাচিক চিৎকার।

দপ-দপ করে মশাল জ্বলে উঠছে। আগুনওয়ালা মশালে ফুঁ দিয়ে জ্বালছে মশাল, ডাকাতেরা। শিকার পেয়েছে তারা।

কে তার অঙ্গস্পর্শ করলে! কে? ঝুমঝুমি!

ঝুমঝুমি বললে, ভিতরে ঢোক। দেখতে পাবে।

—না, তু গাছে ওঠ্‌ গিয়ে। যা। আমাকে ডুলি বাঁচাতে হবেক।

—তা হলে আমি তুমার সাতে থাকব।

—ঝুমঝুমি! কথা সে বলছে কিন্তু তাকিয়ে আছে সে ওই দিকে। মশালের লাল আলোয় সব দেখতে পাচ্ছে। তিনটে ডুলি। সঙ্গে জন আষ্টেক পাহারার লোক। আটজনকে চল্লিশজন আক্রমণ করেছে। বন্দুকের শব্দ উঠল। পাহারাদারদের হাতের বন্দুক গর্জে উঠল। ওদিকে পড়ল জন কয়েক ডাকাত। তারপর বাকি ডাকাতেরা ছুটে এল চিৎকার করে। লাঠিতে তলোয়ারে চলছে লড়াই। বেহারারা পালাচ্ছে।

চিৎকার উঠল অকস্মাৎ। নারীকণ্ঠের চিৎকার।

চমকে উঠল অর্জুন—ভগবান! রক্ষা কর—ভগবান!

একটা লোক ঘোড়ায় চড়ে বন থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসছে। কজনে ডুলির ভিতর থেকে মেয়েদের টেনে বার করছে।

অর্জুনের বুকের ভিতরটায় কি যেন তাকে ঠেলছে। সে ঝুমঝুমির হাত ধরে টেনে বনের ভিতর ঢুকে বললে, তৈয়ার হো যা রে। তৈয়ার। তীর ধনুক। ওরে, তীর ধনুক। সবাই নে। চল্‌, বনে বনে ছুটে চল্‌। দু ভাগ হয়ে। এক ভাগ এদিক এক ভাগ ওদিক। মশাল জ্বলছে। চাঁদের আলো রয়েছে। গাছের আড়াল থেকে প্রথমে তীর। তারপর হাতিয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবেক। গণ্ডার, পেথমেই আমি আর রামু দুপাশ থেকে ঘোড়াওয়াকে লিব। বুঝলি? ওই—ওই সদ্দার! ওই শোভান! হুঁশিয়ার! যা যা যা। দু ভাগ। বাঘের মতন চুপি চুপি—

ওদিকে তখন হা হা চিৎকারের সঙ্গে মানুষের মরণ আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে। মশালের আলোয় ভয়াল হয়েছে রাত্রি এবং বন। আটজন রক্ষকই পড়েছে। ডাকাতদেরও কজন। গুলিতেই প্রথম পড়েছে চার-পাঁচজন। সে অর্জুন দেখেছে।

ডুলির ভিতর থেকে টেনে বের করেছে তিনটি মেয়েকে। চেপে ধরেছে তাদের হাত।

ঘোড়ায় চড়ে শোভান হাসছে।

হঠাৎ দুটি তীর দু দিক থেকে এসে বিঁধল শোভানকে। একটি কাঁধে, একটি বুকে। সে চিৎকার করে উঠল—আ! দুশমন!

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তীর কপালে। তার সঙ্গে আরও কজন ডাকাত বিদ্ধ হয়েছে তীরে। চীৎকার উঠল—বুতাও, মশাল বুতাও রে। জলদি!

মাটির উপর জ্বলন্ত মশাল গুঁজে দিল তারা।

তীর আবার এক ঝাঁক এসে পড়েছে দু দিক থেকে। ডাকাতেরা চিৎকার করে হল্লা করে উঠল, দুশমন! কিন্তু কই? কোন্ দিকে?

একজন বলছে, সর্দার পড়ে গিয়েছে। খতম!

তারপরই আবার এসে পড়ল সড়কি। পঁচিশ জন জোয়ান লাঠি তলোয়ার নিয়ে উন্মত্ত তাণ্ডবে প্রেতের মত চিৎকার করে দু পাশে বন থেকে বেরিয়ে এসে পড়ল তাদের উপর। তাদের সঙ্গে একটা কালো ছিপছিপে মেয়ে। হাতে তলোয়ার।

অনেক ডাকাত পড়েছে। প্রায় বাইশ-চব্বিশ জন। প্রথম রক্ষকদের গুলিতে এবং তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে আটজন। আর আকস্মিক এই আক্রমণে পড়ের ষোল জন। পাইকদের লাঠি বড় সাংঘাতিক। মাথা দু ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। তার উপর নায়ক পড়েছে। তারা ছুটে পালাল। পালাল প্রায় কুড়িজন।

গণ্ডার কজনকে নিয়ে চিৎকার করতে করতে তাদের অনুসরণ করলে।

—গণ্ডার, ফিরে আয়। গণ্ডার—

গণ্ডার একজনের চুলের মুঠো ধরে টেনে এনে সামনে ফেলে দিলে।

ডুলি যাত্রী মেয়ে তিনটি শঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে এখনও। অর্জুন তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হাত জোড় করলে। এরা যেন রাজার ঘরের মেয়ে। তার মায়ের মত। একজনের বয়স বেশী।

তিনি কি বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বলা হল না। মেয়ের গলার একটা ক্রুদ্ধ অথচ শঙ্কিত চিৎকারে চমকে উঠলেন। অর্জুন চমকে উঠে চিৎকার করলে, ঝুমঝুমি!

ঝুমঝুমি উপুড় হয়ে পড়ছে একটা ডাকাতের উপর।

—ঝুমঝুমি!

ঝুমঝুমি উঠছে। সে উঠল। তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হয়ে গেছে। বাঁ হাতের বাঘনখে ডাকাতটার পেট চিরে তার নাড়িভুঁড়ি তুলে এনেছে; লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে সকলের অজ্ঞাতসারে তলোয়ার তুলেছিল। ঝুমঝুমিও পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘনখ বিঁধে দিয়েছে।

সে অর্জুনের পাশে এসে দাঁড়াল।

বয়স্কা মহিলা যিনি, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে?

—আমরা মা, মানুষ বটি বনের। যেতে যেতে দেখলম আপনাদের বিপদ, ছুটে এলম।

—তোমরা ডাকাত নও?

—না মা। এখন ডাকাত লই। মিছা বলব ক্যানে—হাট টাট লুট করি। যেমন করে পাইকরা।

—তোমরা পাইক?

—হঁ। পাইক বটি। বটি বইকি।

—তুমি বাগ্দী?

—না। আমি ছত্রি।

—ছত্রি?

—হঁ। এই দেখেন পৈতে। তাতেই তো ছুটে এলম মা। গুরু বলেছে ছত্রির এই ধরম।

ঠিক এই সময়ে একটা মশাল জেলে নিয়ে এল গণ্ডার—সর্দার!

—হঁ—

—যা আছে লিয়ে লি ডাকাতগুলার? তরোয়াল, ঢাল, সড়কি, বন্দুক—

গণ্ডারের কথা ঢাকা দিয়ে মেয়েটি তীক্ষ্ণ বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ছত্রি?

বিস্ময়ের আর অবধি রইল না অর্জুনের। সে মুখ তুলে আরও বিস্মিত, বিস্মিত কেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ কি মহিমা! এ কে!

—তুমি ছত্রি?

—হাঁ মা।

—তোমার বাবার নাম কি? কে তোমার বাবা?

—আমার বাবার নাম রাজা মাধব সিং। আমি তাকে দেখি নাই। বনেই আমার জন্ম। বাবা যখন মরে আমি তখুন মায়ের গভ্ভো ছিলম। আমার দাদো আমার মাকে লিয়ে পালিয়েছিল। লইলে মায়ের সঙ্গে আমাকেও মেরে ফেলাতো তা'হলে।

—হাঁ বাবা। ফেলত সে রাক্ষসী। আজকের কথা ভাবত না। হাসলেন।

অর্জুন বললে, গুরু বললে, অর্জুন, আজ রেতেই যাও। কাল একাদশী। মাকে বল গা একটি কথা। চন্দনগড়ের বিপদ। আর শুধায়ো তোমার পরিচয়। বলো, গুরু বলতে বলেছে। সময় হয়েছে। আমি সব জানি না।

—হয়েছে বাবা। সময় হয়েছে। রুক্মিণীকে বলতে হবে না। আমি বলব। আমি বলব সব কথা। কিন্তু আর দেরি করো না বাবা। চলো। ডাকাতরা আবার তো দল বেঁধে ফিরতে পারে।

গণ্ডার বললে, হাঁ মাঠাকরুণ। এক বেটাকে ধরেছিলাম। তাকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে সব খবর লিয়েছি। শোভানের বড় দল গিয়েছে লালতেহাটের দশমীর মেলা লুটতে। আর শোভান নিজে এখানে ছিল, তোমরা পালিয়ে যেছ কোন কুটুম বাড়ি সেই খবর পেয়ে। তোমাদের বেহারাদের মধ্যে একজনা গুপ্তচর ছিল মা।

—শোভানের মুণ্ডুটা আমাকে এনে দিতে পার?

অর্জুন নিজে গিয়ে মুণ্ডুটা কেটে নিলে। সেটা তুলে আনলে ঝুমঝুমি—নাও মা।

—এটি ?

—উ আমার বটে মা।

—তোমার ?

—হাঁ মা, আমার।

—হে ভগবান! চল বাবা—চল।

—চড় মা ডুলিতে।

—বেহারা তো নেই।

—আমরা পঁচিশ মরদ রয়েছি। বারো জনায় তিন ডুলি হৈ হৈ করে নিয়ে যাব।

—দাঁড়াও বাবা, ভাবি।

—কি ভাবছে মা ?

—চন্দনগড় যাব, না রুক্মিণীর কাছে গিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়াব।

—আমার মাকে তুমি জান মা ?

—জানি।

—আমার বাবাকে ? তিনি সত্যিই রাজা ছিল ?

—হাঁ। চন্দনগড়ের রাজা মাধব সিং ছিলেন তোমার বাবা।

—চন্দনগড়ের রাজা মাধব সিং আমার বাবা!

—হাঁ। তুমিই চন্দনগড়ের রাজা। তোমার মা শুক্রী রাজপুতের মেয়ে। শুক্রীরা পৈতে হারা, তাই তাদের মেয়ে বিয়ে করেছিল বলে আমার সহ্য হয় নি। ভেবেছিলাম শ্বশুর বংশের জাত ধর্ম গেল। তাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু—

অবাক হয়ে শুনছিল অর্জুন। তার গা ঘেঁষে ঝুমঝুমি। তার চারিপাশে সকলে।

তিনি বললেন, ভগবান সাক্ষী, তাঁকে খুন করাতে আমি চাই নি। না, চাই নি। কিন্তু, আমার ভাই, বিশ্বাসঘাতক ভাই, পিশাচ ভাই মীর হবিবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করেছিল এই বিজয়া দশমীর দিন। তারপর—যখন হয়ে গেল—তখন আমি বলেছিলাম, তা হলে রুক্মিণীকেও মেরে ফেল। নইলে ওর গর্ভের সন্তান একদিন গদী চাইবে। আমরা আরও দুই সতীন ছিলাম। আমার সন্তান হয় নি। সতীনের ওই মেয়ে। বিধবা। আজ এসেছে শান্তি। মীর হবিব চেয়েছে চন্দনগড়ের দুই মেয়ে। রাজা মাধব সিং-এর বিধবা মেয়েকে, আর সুচেত সিং-এর মেয়েকে। আমি ওদের নিয়ে পালাচ্ছিলাম। দূরদেশে চলে যাব। সুচেত সিং শঙ্করী মায়ের ওখানে গিয়েছে। আর সেই অবসরে পালিয়েছি। পথে এই বিপদ। তুমি কোথা হতে এসে বাঁচালে। তাই ভাবছি, চন্দনগড় যাব, না তোমার সঙ্গে যাব।

হাত জোড় করে অর্জুন বললে, আমার সঙ্গে চল মা। চন্দনগড়ে বিপদ হবে। ওখানে তা হবে না মা। আমরা বেঁচে থাকতে হবে না।

—তোমার দিদি উনি, প্রণাম কর। তোমার থেকে ক'মাসের বড়।

—দিদি!

অর্জুন মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। এত সুন্দর দিদি! এত রূপ!

—আর ওই আমার ভাইঝি। ওরে হিঙ্গন, তুই প্রণাম কর্।

ঝুমঝুমি অর্জুনের গা ঘেঁষে যেন তার অঙ্গের সঙ্গে মিশে গিয়ে দাঁড়াতে চাইলে।

ডুলি উঠল। অর্জুন বললে হুঁশিয়ারির সঙ্গে, তবে আর ভয় নাই। ওরা আর আসবে না। মশাল জ্বাল।

মশাল জ্বলল।

নয়

দু বছর পর।

ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়ের কিষণজীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ছিলেন রত্নাদেবী। মাধব সিং-এর প্রথমা মহিষী। মন্দিরের দাওয়ায় বসেছিল রুক্মিণী। তার দুই পাশে আর দুটি ছত্রি তরুণী। মাধব সিং-এর দ্বিতীয় মহিষীর বিধবা কন্যা ভবানীবাঈ আর সুচেত সিং-এর কন্যা কুমারী হিঙ্গনবাঈ। তারা মালা গাঁথছিল।

জঙ্গলগড়কে আর সে জঙ্গলগড় বলে চেনা যায় না। দু বছরে তার বহু পরিবর্তন হয়েছে। কিষণজীর মন্দির আর কাঠের নয়, পাথর দিয়ে কাদায় গেঁথে প্রশস্ত চতুষ্কোণ চত্বরের উপর চারিপাশে অলিন্দ-ঘেরা মন্দির হয়েছে। সামনের অঙ্গন সমান করে পাথর বসিয়ে বাঁধানো হয়েছে এখন। চারিপাশে পাথরে গাঁথা ছোট পাঁচিল, প্রবেশপথের দুই পাশে দুটি থাম।

আরও কয়েকখানি পাথরে গাঁথা বাড়ি তৈরি হয়েছে। অলিন্দ ঘেরা একখানি সুপ্রশস্ত বাড়ি, তার চারিপাশে উঁচু দেওয়াল। প্রবেশ দরজাটি সুন্দর। বাড়িটির নাম মাতাজী মহল। এই বাড়িতে থাকেন রত্নাদেবী, ভবানীবাঈ, হিঙ্গন এবং রুক্মিণীদেবী। রুক্মিণী এখন আর শুধু রুক্মিণী নয় এখন তার নাম রুক্মিণীবাঈ অথবা রুক্মিণীদেবী, মাতাজী রুক্মিণীদেবী। রত্নাদেবী রাণীসাহেবা রাজমাতা। দরজার সামনে একজন পাইক একটা বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পাইকও আর সে পাইক নয়, তার মাথায় পাগড়ী, গায়ে একটা কুর্তা, পরনে মালসাঁট মেরে কাপড় পরা। চোখে তার সম্ভ্রম, কান তার সজাগ।

মন্দিরপ্রাঙ্গণের পাশে আর একখানি সুদৃশ্য বাড়ি, তার ফটকেও একজন পাইক। রাজা মহল। তার পাশেই পাথরের একটি নাটমন্দিরের মত খোলা প্রশস্ত স্থান। একদিকে তার প্রশস্ত বেদী। জঙ্গলগড়ের দরবার। সামনে পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত একটি উঠান। চারিপাশে নতুন লাগানো শাল গাছের ঘেরা। পুরনো জঙ্গলগড়ের রুক্মিণী মায়ের আগুনে বলে চেনাই যায় না।

শুধু এই থানটি নয়, গোটা গড় বারো পাহাড়ের চেহারা পাল্টেছে। এই মহলে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালে প্রথমেই নজরে পড়বে পাহাড়গুলির মাঝবরাবর পাহাড়ের গায়ের জঙ্গলের সবুজের বুক চিরে একটি লম্বা গেরুয়া চাদরের বেড়। যেন গোল পাথরের বুকের পৈতের সাদা

দাগের মত এঁকে দিয়েছে। গোটা চাদরটা অবশ্য চোখে পড়ে না। কোথাও বাঁকের মোড়ে গাছের আড়ালে সবটাই ঢাকা পড়েছে, কোথাও সরু ফালির মত দেখা যায়। তবে একটু অবহিত হয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালেই বুঝতে পারা যায় যে একটি প্রশস্ত রাস্তা বারো পাহাড়ের বুকের ওপর তৈরি করে চলাচল সুগম করা হয়েছে। পাহাড়ে পাহাড়ে সংযোগ-স্থলের অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গাগুলিতে শক্ত প্রশস্ত পাথরের দেওয়াল হয়েছে। তার উপর পাইকরা সড়কি, তীর, ধনুক, বন্দুক নিয়ে পাহারা দেয়। যমদুয়ারে বড় ফটক তৈরি হয়েছে।

পাইকদের বাড়িঘরের উন্নতি হয়েছে। কয়েকটি পাড়াতে ভাগ করে চার-পাঁচটি পাহাড় নিয়ে এখন তাদের বাস। রাস্তা হয়েছে।

সব থেকে পরিবর্তন হয়েছে নিচের সেই স্যাঁতসেঁতে জবজবে জমি ও জঙ্গলের। সেখানকার জমিতে জঙ্গল সাফ হয়েছে। মাটি এখন শুকনো, তার উপর ক্ষেত হয়েছে। নিচের দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে অনেক গরু চরছে, ঘোড়া চরছে।

পাইকদের মধ্য থেকে এখন সওয়ার তৈরি হয়েছে একদল। যমদুয়ার থেকে বেরিয়ে বনের মধ্য দিয়ে অচিহ্নিত পথটাও আর বনের সঙ্গে মিশে নেই। শুধু সংকেতে আর ইশারাতেই তাকে চিনতে হয় না। একটি সুগম চিহ্নিত সড়ক হয়ে সে গিয়ে মিশেছে দক্ষিণ দিকে বড় সড়কের সঙ্গে, উত্তর দিকে যেখানে শোভান খাঁ মারা পড়েছিল সেখানকার রাস্তার সঙ্গে। এই দিকটাই যেন মূল পথ হয়েছে। এই পথ ধরেই যেতে হয় চন্দনগড়। এখানে একটা গম্বুজের মত আছে যেখানে পাইক মোতায়েন থাকে।

জঙ্গলগড়ে বন্দুক এসেছে, বারুদ এসেছে। ঘোড়া এসেছে, আস্তাবল হয়েছে। মানুষের জন্য ক্ষেত হয়েছে, খামার হয়েছে। রত্নাদেবী একালে বৈদ্য এনেছেন। রুক্মিণী রত্নাদেবীর অনুরোধে এবং গুরুত্ব বুঝে সপজ্বরের ওষুধের গাছ তাঁকে চিনিয়েছেন। বৈদ্য চিকিৎসা করে। ব্রাহ্মণ এসেছে, সে পূজা করে।

এ সবই হয়েছে এই আশ্চর্য শক্তিময়ী রত্নাদেবীর বুদ্ধিতে, তাঁর চালনায়। দু বছর আগে যে দশমীর রাত্রিশেষে অর্জুন তার দল নিয়ে এঁদের উদ্ধার করে ডুলিতে করে জঙ্গলগড়ে নিয়ে আসে, তার তিন মাসের মধ্যেই দেশে এসেছিল বর্গী। বর্গীরা এসে আক্রমণ করেছিল চন্দনগড়। এখান থেকে একশো পাইক নিয়ে ছুটে গিয়েছিল অর্জুন। কিন্তু সে কিছু করতে পারে নি ; চন্দনগড় রক্ষা হয় নি। ব্যর্থ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিল কিন্তু বর্গীরা তার পিছন ধরে জঙ্গলগড়ের সন্ধান জেনেছিল। ওদিকে চন্দনগড়ের অন্তঃপুরে সরন্দাজ খাঁর দুই ছেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ভবানীবাঈ এবং হিঙ্গনবাঈ-এর সন্ধান না পেয়ে খুঁজেছিল কোথায় গেল তারা।

আবদুল শোভানের হত্যার পর খবরটা আর চাপা ছিল না। চারিদিকে জঙ্গলগড়ে অর্জুন সিং-এর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। আহত ডাকাতরা যারা কোনরকমে বেঁচেছিল তারা অর্জুন সিং নামটা শুনেছিল। অর্জুন সব আহতদের মেরে ফেলবার হুকুম দিয়েছিল গণ্ডারকে। গণ্ডার লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে মেরেছিল। তলোয়ার তার পছন্দ নয়। বাকি সে কাউকে রাখে নি বলেই তার ধারণা। কিন্তু প্রাণের ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করেও

দু-তিন জন মরার ভান করে বেঁচে ছিল। এবং যারা পালিয়েছিল তারাও কিছুটা খবর জেনেছিল

অর্জুন সিং, একটা আশ্চর্য কালো মেয়ে আর গণ্ডার। এই তিনটে কথা।

একজন বেহারা জঙ্গলগড়ের নাম শুনেছিল। কথাকটি ছড়াতে বাকি থাকে নি। সরন্দাজ খাঁর ছেলেরা পিতৃহত্যার প্রতিহিংসায় এবং নারী লালসায় ঘুরছিল জঙ্গলগড়ের দিকে। অর্জুন একশো পাইকের মধ্যে ষাট জনকে নিয়ে জঙ্গলগড়ে ঢোকে। তখনও তার আক্ষেপ, তার বিষণ্ণতা, তার বেদনাকে ঠেলে ফেলতে পারে নি। মুহ্যমান হয়েই ছিল। চন্দনগড়, তার বাবার রাজ্য চন্দনগড়, তার চন্দনগড় বর্গীরা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়েছে। তোপ দেগে উড়িয়েছে। নরনারীর উপর অত্যাচারের বাকি রাখে নি। সে বাইরে থেকে গিয়ে বার বার পিছন দিক থেকে বর্গীদের আক্রমণ করেছে। বর্গী হত্যা করেছে তারা অনেক। তার দলের গেছে চল্লিশ জন, তারা মেরেছে অন্তত একশো জন। তাদের বন্দুক ছিল না। বন্দুক থাকলে আরও বেশি হত্যা করতে পারত। কিন্তু তাতেই বা কি হত? চন্দনগড় রাখবার শক্তি তো তার ছিল না। সে শঙ্করীমায়ের ভক্তির বলেও সম্ভবপর হয় নি। সে নিজেও আহত হয়েছিল। একটা তীর বিঁধেছিল উরুতে। একটা চোট খেয়েছিল বাহুতে। অবশ্য একটা আঁচড়। সে মুহ্যমান হয়ে বসেছিল, সেবা করছিল অপরাজিতা। সে তখন অপরাজিতাই বলত ঝুমঝুমিকে। অবশ্য আদর করে ঝুমঝুম বলে ডাকা ছাড়ে নি।

এরই মধ্যে খবর এসেছিল। এনেছিল ছিদাম। সে প্রায় গাছে গাছে চলে এসেছে। মাটির উপর দিয়ে আসে নি। খবর এনেছিল, বর্গীরা চন্দনগড় থেকে মেদিনীপুরের দিকে চলে গেল বটে কিন্তু সরন্দাজ খাঁর ছেলেরা পাঁচশো সিপাহী নিয়ে ঘুরছে। ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়ে আছে চন্দনগড়ের দুই বেটী। তার সঙ্গে আছে রত্নাবাঈ। এখন তারা তিন জনকেই নিয়ে যাবে আর জঙ্গলগড় ধ্বংস করে দেবে।

লাফ দিয়ে উঠে বেরিয়ে এসেছিল অর্জুন।

ঝুমঝুমি বলেছিল, আস্তে। এত জোরে না।

—জোরে না? ঝুমঝুমি?

—না। ঘায়ের মুখগুলা ফাটবেক। চল, আমি সাতে যাব।

—ঝুমঝুমি!

—আঁ!

—কি করব?

—গুরু যা বলেছে—লড়বে। তুমি ছত্রি।

বাইরে তখন কিষণজীর মন্দিরের সামনে সর্দাররা এসে জুটেছে। সর্দারের গদীর উপর গম্ভীর মুখে বসে আছে দাদো দলু। সামনে ভৈরব, গোবর্ধন, গণেশ। তাদের পরে আর কয়েকজন। বাকিরা সব ঘিরে উৎকণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

মন্দিরের দাওয়ায় বসে রুক্মিণী। তার পাশে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রত্নাবাঈ। অর্জুনের রাণীমাতাজী। স্থির গম্ভীর। এসে অবধি তিনি নির্জনেই থাকতেন। ওই দুটি মেয়ে ছিজন

আর ভবানীকে নিয়ে বসে থাকতেন, পূজো করতেন। রুক্মিণী এবং অর্জুন তাঁর কাছে যেত। অর্জুনের সঙ্গে যেত ঝুমঝুমি। এ কয়েক মাসে এই বিচিত্র মহিমময়ীকে মনে হত যেন আগুনের স্তূপ, পাতলা ছাইয়ের আবরণের মধ্যে ক্রমশ ঢেকে ফেলছেন নিজেকে। আগুনে ছাই আপনি পড়ে। ইনি যেন নিজে ইচ্ছে করে ফেলছেন। নিত্য সেই এক কথা। এবং সে এক কথা কেবল কটি কথা।

ভাল আছ রুক্মিণী? ভাল আছ বাবা? আমি? ভালই আছি বাবা। কোন দুঃখ নেই। বড় সম্মানে রেখেছ তোমরা। এত চুপচাপ? ভাবছি। কি ভাবছি? সবই কি নিজেই বুঝি? তবে ভাবছি নিজের জীবনের কথা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন।

এই কথাকটি তিনি বলেছিলেন প্রথম দিন এসেই। তারপর সমানে বলেই যাচ্ছেন। সেদিন তাঁদের ডুলি নিয়ে অর্জুনের সাঙ্গোপাঙ্গরা যখন কিষণজীর মন্দিরের সামনে নামিয়েছিল, তখন মা, দাদো, অহল্যা দিদি, বিস্ফারিত দৃষ্টি ও ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে বলেছিল, ওরে লুচ্চা, বদমাশ, কুলাঙ্গার, এ কি করলি? কোন্ বড় ঘরনা মেয়েদের লুটে আনলি! এ কি মহাপাপ করলি রে তু!

ডুলির কাপড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছিলেন রত্নাদেবী। বলছিলেন, না, মহাপাপ ও করে নি রুক্মিণী, ও মহাপুণ্য করেছে। ওর বংশের নাম উজ্জ্বল করেছে। ছত্রির ছেলে ছত্রির কাজ করেছে। ও শয়তানের হাত থেকে ছত্রি মেয়ের ধরম রক্ষা করেছে। তার চেয়েও বড় পুণ্য রুক্মিণী, ও তার মাকে রক্ষা করেছে, বিধবা বহিনকে রক্ষা করেছে বিধর্মীর লাঞ্ছনার হাত থেকে।

ওদিক থেকে বিস্ফারিত চোখে এক পা এক পা করে যেন কোন ভয়ঙ্কর কিছুর দিকে এগিয়ে আসছিল দলু সর্দার। এদিকে স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়েছিল তার মা—রুক্মিণী দেবী।

ঈষৎ একটু তিলের মত এক তিল হাসি ফুটে উঠেছিল রত্নাবাঈ-এর ঠোঁটে মুখে। মনে হয়েছিল যেন ওই এক তিল হাসির মধ্যে কান্নার একটা সমুদ্র লুকানো আছে; সেটা অর্জুনের চোখেও ধরা পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন—চিনতে পারছ সর্দার? রুক্মিণী? আমি চন্দনগড়ের রাজা মাধব সিং-এর বড় রাণী। তোমার সতীন। আমি রত্নাবাঈ।

অহল্যা কঠোরকণ্ঠে বলে উঠেছিল, তুই সর্বনাশী। তুই রাক্ষসী।

—হ্যাঁ, তা স্বীকার করছি আমি।

মা বলে উঠেছিল, পিসী! পিসী!

পিসী বারণ শুনবে কেন। সে বলেছিল, কি বলে এলি? কোন্ মুখে এলি? বেসরমী!

—পিসী! পিসী!

উনি হেসে বলেছিলেন, বেসরমী নই পিসী। রুক্মিণী তোমাকে পিসী বলছে, আমিও তোমাকে তাই বলছি। সরম আছে বলেই আজ এসেছি। অপরাধ স্বীকার করতে এসেছি। হ্যাঁ, অপরাধ আমার হয়েছে। কি বলে এসেছি? বলতে এসেছি রুক্মিণী বহিন, তুই আমার সতীন। তুই আমার বহিন, তুই সতী, রাজরাণী আমারই মতন। তোর গর্ভের সন্তান আমারও সন্তান। নইলে এই বিপদে রাজা মাধব সিং-এর চরম সর্বনাশের সময় সে এল

কেন, এল কোথা থেকে ? মন বললে পূর্বপুরুষ পাঠিয়েছে তার বংশধরকে। সে আমাকে মা বললে। আমি তাকে সব বললাম, জিজ্ঞাসা করলাম এর পরেও আমি তোমার মা ? সে বললে, হ্যাঁ, নিশ্চয়। মুখ উজ্জ্বল হল। সেই উজ্জ্বল মুখে এখানে এসেছি। বলতে এসেছি রুক্মিণী, তোর কাছে আমার অপরাধ হয়েছে। তোর ছেলে মাধব সিং-এর বংশের মান রেখেছে।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অর্জুন কাঁদতে শুরু করেছিল। তার সঙ্গে ঝুমঝুমিও। মা এসে তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

দলু দুই হাত উপরে তুলে বলেছিল, জয় কিষণজী ! হে ভগবান !

রুক্মিণীকে হাত ধরে তুলে উনি বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, এ ভবানী। মেঝলির ছোট বেটী। বিধবা। আর এ আমার ভাইঝি, সুচেতের বেটী হিঙ্গন। তারপর দলুকে বলেছিলেন, সর্দার, তোমাকে যদি বাপ বলি তুমি গোঁসা করবে ?

দলু সর্দার কেঁদে ফেলেছিল। আবার হাত তুলে বলেছিল, ধন্য, আমি ধন্য হয়ে গেলাম মায়ী। আমার হারানো ইজ্জত আবার ফিরে পেলাম। হায় হায়, আজ যদি এখানে বামুন থাকত তবে তোমাদিগে সাক্ষী করে আমি ফের পৈতে নিতাম।

রাণী রত্নাবাঈ বলেছিলেন, তার জন্যে আক্ষেপ কর না বাপ, হবে। সময় যখন হবে তখন সুতা ছাড়ার মত সুতা ফেরা গাঁয়ের প্রতিষ্ঠা হবে। কখনও না কখনও হবেই এ তুমি জেনো। বলে তিনি ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

বাস্। ওই পর্যন্ত। আর না। তার পর থেকে ঘরেই আছেন। ওই কথা। তবে বলে রেখেছেন, হাঙ্গামা মিটলেই চলে যাবেন পুরী, জগন্নাথ-ধাম।

আর একদিন কথা বলেছিলেন। যেদিন অর্জুন বর্গীদের চন্দনগড় আক্রমণের সংবাদ পেয়ে একশো পাইক নিয়ে লড়তে যায় সবার অমতে সেইদিন। অমত ছিল দলুর, ভৈরবের, গোবর্ধনের, গণেশের প্রবীণদের সকলেরই। ছিল না মায়ের। আর ছিল না অল্পবয়সী জোয়ানদের।

ঝুমঝুমি তার মুখে চুমু খেয়ে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে বলেছিল, যাও। আমি শঙ্করীমায়ের কবচটা বুকে ধরে পড়ে রইলাম। যাও।

সেদিন রত্নাবাঈ তাকে বুকে চেপে ধরে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, ধন্য রুক্মিণী। ধন্য রাজা মাধব সিং। ধন্য আমি। গর্ভে না ধরেও আমি তোর মা। তারপর একখানা ছোরা তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, তোর বাপের ছোরা। বলেই আবার ঘরে ঢুকেছিলেন।

আহত হয়ে হেরে যেদিন অর্জুন ফিরে আসে সেদিন দেখতে এসেছিলেন। আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন। চন্দনগড়ের অবস্থার কথা শুনে কেঁদেছিলেন।

হঠাৎ বেরিয়ে এলেন ওই দিন। সরন্দাজ খাঁয়ের ছেলেরা পাঁচশো সিপাহী নিয়ে আক্রমণ করতে আসছে খবর যেদিন এল সেইদিন।

এসে দাঁড়িয়ে বললেন, সর্দার !

নীরব সকলে তার দিকে তাকালে। সবার মুখে বিরক্তি। কারণ সকল উপদ্রবের মূল এরাই। এদের জন্যই আসছে সরন্দাজ খাঁর ছেলেরা।

তিনি বলেছিলেন, জানি, তোমাদের এ বিপদ আমাদের জন্য। এক কাজ কর। ডুলি করে আমাদের পাঠিয়ে দাও। আমরা এবার তৈরি হয়ে যাব। আমি ঝুমঝুমির কাছে শুনেছি, তার বাপের কাছে খুব চড়া বিষ আছে। সেই বিষ খেয়ে চড়ব ডুলিতে।

চিৎকার করে উঠেছিল অর্জুন, না না—কভি না।

রুক্মিণী এসে তাঁর হাত ধরে বলেছিল, বিষ যদি খেতে হয় তবে ডুলিতে চেপে তোমরা তিনজনে খাবে কেন। ঘরে কিষণজীর মন্দিরে তাঁর সামনে বসে তোমাদের সঙ্গে আমিও যাব। বলব, কিষণজী, তুমি বিগ্রহ। আমার বাপ, আমার পাইকরা অপারগ—

দলু উঠে বুক চাপড়ে বলে উঠেছিল, আমার মাথায় বজ্রাঘাত কর হে কিষণজী। আমার মাথা তোমার চক্র দিয়ে কেটে ফেল। এই কথা আমার সেই বেটী বলে যার জন্যে আজ বিষ খাবয়—

হা হা করে কেঁদে উঠেছিল সে।

—বাবা বাবা! পিতাজী! বলেছিলেন রত্নাবাঈ।

অর্জুন ছুটে এসে দাদাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, কেউ না লড়ে আমরা দুজন লড়ব।

অধীর ভৈরব উঠে হাত জোড় করে বলেছিল, আমরা তো না বলি নাই। কিন্তুক আমরা তো কি লড়তে হয় জানি না। লড়াইয়ের সময় চেঁচাতে জানি।

দলু বলেছিল, এবার বিলকুল তৈরি হয়ে যা। বিলকুল। এখন থেকে।

রত্নাবাঈ বলেছিলেন, দাঁড়াও পিতাজী। বলে ডেকেছিলেন, ভবানী, নিয়ে আয় ও পেটিটা।

একটি পেটি এনে নামিয়ে দিয়েছিল ভবানী। পেটি খুলতে বেরিয়েছিল—মোহর, সিক্কা আর জড়োয়া গহনা জহরত।

রত্নাবাঈ বলেছিলেন, ধান চাল গঁহু জোয়ার যা মেলে কাছে পিঠে যত পার কিনে আন। তিনগুণ চারগুণ দশগুণ। যদি সিক্কা দামের জিনিসে মোহরের দাম দিতে হয় তবে তাও দিয়ে মাল কিনে এনে বোঝাই কর। খবরদার, লুঠ করো না। আশেপাশের লোক যেন না চটে। আর কিনে আন তীরের ফলা, সড়কির ফলা, তলোয়ার। না হয়তো পাশের গাঁও থেকে লোহা আর লোহার জন কতককে এখানে আন। স্মুলুকে আসে ভাল না আসে জবরদস্তি করে আন, চুরি করে আন। কামারশাল পেতে দাও।

—ঠিক বলছে মা। রাজবুদ্ধি।

—যদি হুকুম দাও বাপ, তবে দেখি নিজে সমস্ত পাহাড় ঘুরে। রাজপুতের মেয়ে লড়াই বুঝি, জানি। আমি কিছু বুদ্ধি দিতে পারি।

—নিশ্চয়।

সমস্ত দেখে ফেরবার সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এখানে নিমগাছ তো অনেক সর্দার। এর বিচ কি হয়?

—জড়ো করে মা তেল হয়।

—যত পার বিচি যোগাড় করে পেষাই করাও। বর্গী যে মুখে হানা দেবে সেই মুখে পাথর গড়াবে। সঙ্গে সঙ্গে গরম তেল গড়াবে। আর ওই যমদুয়ারের মুখ বিলকুল বন্ধ করে দাও।

—বন্ধ করে দেব!

—হাঁ, নিচেটা ভরে থাক জলে। দুশমন ঢুকলে যেন নিচে দাঁড়াবার জায়গা না পায়। পাথর ঢেলে ঢেলে বন্ধ করে দাও। জল আটকালে বাইরে নদীতে জল থাকবে না। বনে জল পাবে আর কোন্ পাহাড়ে ভীমরুল আছে শুনেছি? সেই পাহাড়ের মুখটাতে একটা ফটকের মতন গড়ো। যেন বাইরে থেকে মনে হয় সেটাই ঢুকবার জায়গা। বুঝেছ? ভীমরুলরা আমাদের হয়ে লড়বে।

—সাবাস, সাবাস মা! বহুত সাবাস! তুমি রাজরাণী, রাজমাতা।

* * *

কৌশলটা ব্যর্থ হয় নি। সরন্দাজ খাঁর ছেলের দল ঢুকতে পারে নি। একদিন রত্নাদেবী পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চালনা করেছিলেন। একদিন পাঠানকে এই মুখে ইচ্ছে করে ঢুকতে দিয়েছিলেন। খুব উৎসাহের সঙ্গে তারা যেমনি দুই পাহাড়ের জোড়ের মাথায় উঠেছিল, অমনি ঠিক সেই মুহূর্তে তীরের পর তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ভীমরুলের চাকের দিকে। বাস্, তারপর আর দেখতে হয় নি। সেখানে ছত্রিশ জাতিয়াদের কেউ সামনে ছিল না। আর যারা ছিল তারা মেখেছিল নিমের তেল আর সেই পাতার বাটা। তৈরি করেছিল ঝুমঝুমি অন্য মেয়েদের নিয়ে। সেইদিন যে পাঠানরা পালিয়েছিল সেই বোধ হয় শেষ পালানো। ওদিকে খবর এসেছিল মেদিনীপুর পর্যন্ত হটে এসে বর্গীরা আবার উড়িষ্যা পালাচ্ছে। বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী আবার এসে পৌঁছেছেন খড়্গপুরে। মীর হবিব, জানোজী, মুস্তাফা খাঁ মেদিনীপুর থেকে ছাউনি তুলে দ্রুত হটছে। সরন্দাজ খাঁর ছেলেরা যদি এখনও ওই ঔরতের মামলা নিয়ে কটা শুকনো পাহাড় ঘিরে বসে থাকে তবে তার দায় তাদের।

পাঠানরাও বিরক্ত হয়েছিল। তারা না পেয়েছিল লুটের মত গ্রাম শহর, না পাচ্ছিল ভাল জল। তার উপর ভীমরুলের সঙ্গে কে লড়াই করতে পারে? মানুষে পারে না।

অগত্যা পালিয়েছিল সরন্দাজ খাঁর ছেলেরা।

বারো পাহাড়ের মাথা থেকে বারো পাহাড়ের বাইরে এসে বনের গাছে গাছে ফিরে যখন আর একটিও পাঠানকে দেখতে পায় নি, তখন সকলে এসে রত্নাদেবীর চরণে লুটিয়ে পড়েছিল। রত্নাদেবী যিনি আসা অবধি হাসেন নি, তিনি সেদিন হেসেছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রতিজনকে একসিক্কা পুরস্কার দিয়েছিলেন। সারা পাইকমহলে আনন্দের অবধি ছিল না। হাট থেকে কাপড় আনিয়ে মেয়েদের দিয়েছিলেন। দেন নি শুধু দাদোকে কিছু। দাদোর তখন অসুখ। জখম হয়েছিল দাদো। দাদোকে দেখতে গিয়ে বলেছিলেন, প্রণাম তোমাকে পিতাজী।

দাদো বলেছিল, আমি নিশ্চিন্ত মায়ী। আমি গেলে রুক্মিণী আর অর্জুনকে দেখবার

শোক রইল। তুমি প্রণাম করলে, আমি ধন্য হলাম। আজ ফের আমি শোলাঙ্কী রাজপুত।

সবশেষে রত্নাদেবী অর্জুনকে রুক্মিণীর কাছে বসিয়ে বলেছিলেন, তুমি আজ থেকে শুধু অর্জুন সিং নও—কুমার অর্জুন সিং। রাজা মাধব সিং-এর ছেলে। সিংহের বাচ্চা সিংহ। তোমাকে এবার চন্দনগড়ের গদীতে বসতে হবে। নবাব বাহাদুরের কাছে আমি পাঠাব তোমার হয়ে দরখাস্ত। তার আগে তোমাকে পরিচয় করতে হবে নবাব সাহেবের সঙ্গে। তা ছাড়া বেটা তোমার বাপকে যে ষড়যন্ত্র করে মেরেছে তার একজন সুচেত সিং, আমার ভাই, সে মরে তার মাসুল দিয়েছে। এখন আসল শয়তান বেঁচে—মীর হবিব। বেটা!

—মাতাজী!

—বল রুক্মিণী, বল বহিন।

—তুমি বল দিদি—

—বেশ, আমি বলছি। বলছি মীর হবিবকে সাজা তোমাকে দিতে হবে। রাজা মাধব সিং-এর খুনের বদলা নিতে হবে। বল, তার খুন এনে দেবে আমাদের দুই বহিনকে? তোমাকে চন্দনগড়ের গদীতে বসিয়ে আমরা দু বহিন তোমাকে দু হাত তুলে আশীষ করব। তোমার পুরস্কার তোলা রইল। দেব আমি।

অর্জুন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, যাব আমি মাতাজী, আমি যাব।

কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত ঝুমঝুমি ছিল পাশে দাঁড়িয়ে, সে কেঁপে উঠেছিল।

রুক্মিণী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, না না না। ঝুমঝুম, কিসের ভয়? আয়, আমার কাছে আয়।

মাতাজী বলেছিলেন, শুনেছি গুরু বলেছেন তুই নায়িকা। সে যে শঙ্করীমায়ের জয়া বিজয়া রে। আঁ! নায়িকা, তুই ডর খেলে চলবে কেন? আয় শোন্, এই নে।

নিজের গলা থেকে খুলে লাল প্রবালের মালা পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আজ ভবানী বেটী তোর কেশবন্ধন করে দেবে, সাজিয়ে দেবে। সারা রাত আনন্দ করবি। বলবি অর্জুনকে, লড়াই ফতে করে নবাব সাহেবের কাছ থেকে মুক্তাহার এনে দেবে তোকে। আঁ! তুই নায়িকা, রাণী নোস। তুই নাচবি, নাচাবি নায়ককে, তবে তো রে বেটী!

অভিভূত হয়ে গিয়েছিল অর্জুন, ঝুমঝুমি দুজনেই।

রাত্রে কিন্তু ঝুমঝুমি বলেছিল, জান সিং, মাতাজীকে কেমন ভয় করছেক গো!

—হাঁ। মহিমা কেমন দেখছিস না!

পরদিন বাছা বাছা পঞ্চাশজন পাইক নিয়ে অর্জুন রওনা হয়ে গিয়েছিল উড়িষ্যার পথে। নবাব চলেছেন বর্গীদের পিছন পিছন। নিজে হাতে কলম ধরে মাতাজী এক আর্জি তৈরি করে দিয়েছিলেন। মহামহিম মহিমার্ণব সুজাউল মুল্ক হেসামউদ্দৌলা বাংলা বিহার উড়িষ্যার মালেক নবাব আলিবর্দী খাঁ বাহাদুর বরাবরেষু—

সে আর্জির বাঁধুনি কি! তিনি যখন পড়ে শুনিয়েছিলেন তখন রোগশয্যায় শুয়ে দলু সর্দার বার বার সাবাস সাবাস করে সারা হয়েছিল। পাইক সর্দারেরা অবাক হয়েছিল।

আর্জিতে নবাবী ফৌজে অর্জুনের চাকরি ভিক্ষা করেই ক্ষান্ত হন নি এই সুচতুর মাতাজী, দাবি করেছিলেন চন্দনগড়ের গদী তাঁর সন্তান এই দরখাস্তবাহক পুত্র কুমার অর্জুন সিং-এর জন্য। সঙ্গে দিয়েছিলেন রেশমী রুমাল আর দিয়েছিলেন পাঁচখানি মোহর। নবাব সাহেবের সামনে কুর্নিশ করে হাঁটু গেড়ে বসে কেমন করে নজরানা দিতে হবে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

যাবার সময় অর্জুন বলেছিল, মাতাজী, দাদো রইল, মা রইল, পাইকরা রইল, তুমি দেখো।

—নিশ্চিন্ত হও।

অর্জুন মা রুক্মিণীকে বলেছিল, মা!

—অর্জুন!

—আসি মা।

একটু ইতস্তত করে বলেছিল, ঝুমঝুমিকে দেখো মা। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল রুক্মিণী, কেমন শিউরে উঠেছিল ঝুমঝুমি, অর্জুনেরও বিস্ময়ের শেষ ছিল না নিজের কথাগুলি শুনে। সে যেন দোসরা মানুষ হয়ে গেছে। কুমার অর্জুন সিং।

রুক্মিণী উত্তর দেয় নি। দিয়েছিলেন রত্নাদেবী। বলেছিলেন, কুমার, তোমার নায়িকা সে আমাদের খুব আদরের। শুধু দেখা কি—আমরা সবাই আদর দিয়ে ভুলিয়ে রাখব ওকে। ওকে চন্দনগড়ের রাজা-বাহাদুরের নায়িকা করে গড়ে রেখে দেব। দেখবে এসে।

তারপর থেকে জঙ্গলগড়ের এই পরিবর্তন করিয়েছেন রত্নাদেবী। দলু সর্দার মারা গেছে। সর্দার রত্নাদেবীকে ডেকে বলেছিল, আমি নিশ্চিন্ত মায়ী। আমি নিশ্চিন্ত।

রাণীজী ছত্রির মত সৎকার করে তার শ্রাদ্ধ করিয়েছিলেন। তারপর গোবর্ধন আর গণেশকে নিয়ে এই জঙ্গলগড়কে গড়েছেন। সুচেত সিং-এর মৃত্যুর পর চন্দনগড় নবাবী শাসনে মেদিনীপুরের ফৌজদারের অধীন; তবুও সেখানকার ছত্রিরা, পাইকরা রাণীমাতাজীর কাছে আসে যায়। সেখান থেকে রাজমিস্ত্রী ছুতোরমিস্ত্রী আনিয়ে এসব গড়ে তুলেছেন।

উড়িষ্যা থেকে পাইকরা গিয়ে সংবাদ আনে। অর্জুন সিং নবাবের ফৌজে নাম করেছে। তার পদ হয়েছে। নবাব একবারের যুদ্ধে তার বীরত্বের জন্যে তলোয়ার দিয়েছেন। পোশাক দিয়েছেন। সে এখন ঘোড়া কিনেছে। ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করে। মীর হবিব হটছে—হটছে—হটছে। অর্জুন সিং-এর আপসোস এখনও পিতৃহত্যার শোধ হয় নি। মীর হবিব এখনও মরে নি। একবার খবর এল, ভৈরব মরেছে। ভৈরব অর্জুনের সঙ্গে গিয়েছিল। রাণীমাতাজী ভৈরবের ছেলে গোরাচাঁদকে সর্দারী দিয়েছেন। তলোয়ার দিয়েছেন। টাকাও দিয়েছেন—একশো টাকার তোড়া। গোটা জঙ্গলগড় অন্যরকম, শুধু বাইরের চেহারাতেই হয় হয় নি। ভিতরের চেহারাতেও পাল্টেছে। আর ছোকরারা মদ খেয়ে বারো পাহাড়ের এলাকায় আসে না। সকালে সন্ধ্যায় মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজে। রাত্রে আলো জ্বলে।

আগের মত বারো পাহাড়ে অন্ধকার নিরন্ধ্র নয় ; সে অন্ধকার দলবদ্ধ তরুণ পাইকদের স্খলিত চিৎকারে চমকায় না। ছত্রিশ জাতিয়া আদিবাসীরা নেমে গেছে নিচে। সমতলের কাছাকাছি তাদেরও বেশ একটি পল্লী তৈরি হয়েছে। তাদের মেয়েরা আর স্বল্পবাসা নয়—তাদের মধ্য থেকে উপপত্নী সংগ্রহ এখনও করে পাইকরা, কিন্তু তারা সে উদ্দাম বেদিয়ার মেয়ে নয়।

ঝুমঝুমি কেশ বন্ধন করে মুখে সরময়দা মেখে প্রসাধন করে। বেশ-বাস তার কাচুলি, ওড়না, ঘাঘরি। হাতে রূপার কঙ্কন, কোমরে রূপার চন্দ্রহার। তাকে ভবানী তরিবৎ সহবৎ শেখায়। কুমার অর্জুন সিং-এর নায়িকা সে। মহাভারতের রামায়ণের গল্প শোনায় তাকে।

কিন্তু আশ্চর্য, আজ সে নেই।

গতকাল খবর এসেছে মীর হবিব নেই, সে খতম। কুমার অর্জুন সিং একখানা রুমালে তার রক্ত মাখিয়ে মাথার পাগড়ীর মধ্যে নিয়ে ফিরছে বারো পাহাড় ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়ে। ফিরবে আট দশ দিনের মধ্যে। রাণীমাতাজী বারো পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় পতাকা উড়িয়ে দিয়ে জঙ্গলগড়ের বারো পাহাড়কে সাজাচ্ছেন। পাইকদের পাগড়ী কুর্তা বিলকুল নতুন হয়েছে। শালগাছের ডালে পাতায় ফটক্ হচ্ছে। স্থির হয়েছে কুমার এখানে যেদিন আসবেন তার তিনদিন পরই সব রওনা হবে চন্দনগড়।

চন্দনগড়ে অর্জুন সিং-এর দাবি মেনে নিয়েছেন নবাব আলিবর্দী খাঁ। ফরমান দিয়েছেন মেদিনীপুরের ফৌজদারকে, হুকুম দিয়েছেন চন্দনগড়ের দখল রাজা মাধব সিং-এর ছেলে অর্জুন সিংকে দেবার জন্যে। অর্জুন সিংকে রাজা খেতাব দিয়েছেন। অর্জুন সিং বছর বছর নবাবী খাজনার তঙ্কা আমানত করবেন মুর্শিদাবাদের খাজাঞ্চীখানায়।

তিন মাস পূর্বে এসেছে ফরমান। দখল পাওয়া গেছে। নবাব আলিবর্দী ফিরে গেছেন মুর্শিদাবাদ। মীর হবিব নবাবের কাছে দাঁতে খড় নিয়ে মাফ চেয়ে তাঁর হাত থেকে বেঁচে উড়িষ্যায় রয়েছে। সেই দুঃখে অর্জুন ফরমান পেয়েও ফেরে নি। সে ঘুরছিল, তীর্থের অজুহাত করে ফিরছিল। সংকল্প সিদ্ধ না হলে ফিরবে না জানিয়েছিল লোক মারফত। বারণ করেছিল ভয় করতে। প্রকাশ করতেও নিষেধ করেছিল। রাণী জানিয়েছিলেন শুধু রুক্মিণীকে। বলেছিলেন, বীরমাতা তুমি। বুক বাঁধ।

—দিদি, আজ বাইশ বছর বুক বেঁধে আছে রুক্মিণী। জীবনের বাকি কটা দিনও সে তা পারবে।

চঞ্চল হয়েছিল ঝুমঝুমি। সে বার বার জিজ্ঞাসা করেছিল, মা, কেন ফিরল না সে ?

রত্নাদেবী বলেছিলেন, চুপ কর ঝুমঝুম। তার বাপের মৃত্যুর শোধ নিতে পারে নি। ছত্রির ছেলে সে।

সে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলে তাঁর দিকে।

—মহাভারতের গল্প ভবানী তোকে শোনায় ঝুমঝুম ?

—হাঁ মা।

—তবে সেই। ছত্রির কসম—প্রতিজ্ঞা তাই।

পরের দিন সন্ধ্যায় রাণীমাতাজী দরবার করেছিলেন। ঘোড়সওয়ার গিয়েছিল চন্দনগড়। সেখান থেকে কজন ছত্রি সর্দার এসেছিলেন। আর এসেছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত, কয়েকজন মাহিষ্য সদ্‌গোপ জোতদার।

অনেক মশাল জ্বেলে চারিপাশে খুঁটো পুঁতে তার সঙ্গে বেঁধে দরবার করেছিলেন রাণীমাতাজী। পাশে ছিল মাতাজী রুক্মিণী। ভবানী, হিঙ্গন ছিল পিছনে। একপাশে ঝুমঝুমিও বসেছিল। ভয় করছিল তার। এসব সে জানত না, বুঝত না। আজ বুঝতে হয়েছে, বুঝতে হচ্ছে, কিন্তু ভয় করছে। তার নিজেকে দেখেই কেমন যেন ভয় করে। তার মা বাপ, তার আত্মীয়স্বজন তার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। আবার রাণীমাতাজী, ভবানীবাঈ, হিঙ্গনবাঈও তার থেকে অনেক দূরে ও পরে। মাতাজীও ওদের সঙ্গেই রয়েছেন। শুধু সে একা। একেবারে একা। রুক্মিণী মাতাজী ওদের কাছ থেকে মধ্যে মধ্যে নেমে এসে তাকে সমাদর করেন। কিন্তু সে কতক্ষণ? সে নিঃসঙ্গ। তার পরিচর্যার জন্ম একটি বেদিয়া মেয়ে দাসী আছে। তার স্বজাতি। কিন্তু সে একা—সে একা হয়ে গেছে। ঝুমঝুমিকে ভয় করে।

মেয়েটাও অর্জুন অর্জুন করে কাঁদে। ভবানী তাকে মহাভারতের অর্জুনের গল্প বলে। বলে, অর্জুনের বনবাসের কথা। তার বিয়ের কথা। উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, কত কত বিবাহ! তারা সারাজীবন অর্জুনের জন্য কেঁদে কাটিয়েছে। তাকেও কি তেমনি করে—? সে কাঁদে, আবার নিজেই সান্ত্বনা খুঁজে নেয়। না না, তার অর্জুন তেমন নয়। সে আসবে। কবে আসবে? তবু ভয় করে। সেই ভয় নিয়েই সে সেদিনও দরবারে বসেছিল।

রাণীমাতাজী বসে আদেশ দিয়েছিলেন বাজী পোড়াবার। আতশবাজী এসেছিল চন্দনগড় থেকে। বারো পাহাড়ের আকাশ আতসবাজীর ফুলঝুরিতে ভরে গিয়েছিল। বোম ফুটেছিল; ত্রস্ত পাখির ডাকে বন মুখরিত হয়ে উঠেছিল সেই রাত্রে। দূরে উঠেছিল একটা বাঘের গর্জন। হুঙ্কার দিয়ে সেটা পালিয়েছিল এক লাফ দিয়ে। সেটা বুঝতে কারুর কষ্ট হয় নি। সকলে হো হো করে হেসে উঠেছিল।

রাণীমাতাজী উঠে দাঁড়াতেই সকলে থেমে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, ভগবান রাধামাধব, কিষণজীর করুণা—আর সুবিচারক মেহেরবান নবাব আলিবর্দীর মেহেরবাণী। চন্দনগড় আবার ফিরে এল রাজা মাধব সিং-এর পুত্রের হাতে। কুমার অর্জুন সিং বাহাদুর। আমার ভাই হলেও সুচেত সিং তার বাপের শত্রু ছিল। কেমন করে আমাকে প্রতারিত করে সিংহাসন থেকে নামাবার বদলে মীর হবিবকে দিয়ে খুন করিয়েছিল, নিজে গদী দখল করেছিল সে সবাই জানে। আমার ভুল হয়েছিল—ছত্রিদের ভুল হয়েছিল রাণী রুক্মিণীকে রাণী বলে স্বীকার না করা। আমি স্বীকার করছি। অর্জুন সেই রাণী রুক্মিণীর ছেলে। সেই বিপদের দিনে শুধু তার মা আমাকে, তার বহিন ভবানীকেই রক্ষা করে নি, সুচেতের বেটী হিঙ্গনকেও রক্ষা করেছে। ছত্রির কাজ করছে। আমাদের জন্যে পাঠানদের সঙ্গে লড়েছে। শুধু সে নয়, এখানকার পাইকরা সবাই। চন্দনগড় রাখতেও সে গিয়েছিল। কিন্তু পঞ্জপালের

মত বর্গীর সঙ্গে পারে নি তখন। তার শোধ সে নিয়েছে। নবাবের ফৌজে যোগ দিয়ে সে বর্গী পাঠানদের অনেক রক্ত ঝরিয়েছে। ভগবান তার পুরস্কার দিয়েছেন। দেশের নবাব তাকে চন্দনগড়ে জায়গীর মঞ্জুর করে রাজা খেতাব দিয়ে ফরমান দিয়েছেন। তার কল্যাণে চন্দনগড় পূর্বের মত আপনা রাজ্য হয়ে গেল। কুমার অর্জুন এখনও ফেরে নি। সে তীরথ ঘুরছে। নবাবী খেলাত পেয়েছে। এবার পিতৃঋণ শোধ করে পিতৃপ্রসাদ দেবতার প্রসাদ নিয়ে ফিরবে। কুমার ফিরলে আমি তাকে নিয়ে চন্দনগড়ে যাব। সে গদীতে বসবে। তার আগে আমি তাকে দেব মায়ের আশীষ। এই কন্যা—সুচেত সিং-এর কন্যা ছিঙনকে তার হাতে দিয়ে আশীষ করব। রাজার শাদি আর অভিষেক একসঙ্গে হবে।

সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছিল। •রাণীমাতাজী আবার বলেছিলেন, এখানকার পাইকরা চন্দনগড়ে বসতের জমি পাবে। পাইকান ক্ষেত পাবে। এখানেও থাকবে তারা। ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়ে রাস্তাবাহাদুরের অবসর যাপনের ঠাঁই হবে।

আবার জয়ধ্বনি উঠেছিল। ধন্য ধন্য করেছিল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।

শুধু নিজেদের অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে গিয়েছিল ছত্রিশ জাতিয়া বেদিয়ারা। আর পাথর হয়ে গিয়েছিল ঝুমঝুমি।

দরবার ভেঙে গেলেও সে বসেছিল। রুক্মিণী তার গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছিলেন, ঝুমঝুমি!

—মা!

—চল। ওঠ।

উঠেছিল সে নীরবেই, সঙ্গে চলেছিলও নীরবে। রুক্মিণী বলেছিলেন, তুই যেমন আছিস তেমনি থাকবি ঝুমঝুমি। সে তোকে ভালবাসে।

সে প্রশ্ন করেছিল, অর্জুন?

—হাঁ। ভালবাসে কিনা তুই বল্।

—হাঁ মা। তারপর চুপ হয়ে গিয়েছিল। তার অন্তরের কথা রুক্মিণীর বুঝতে কষ্ট হয় নি। তাঁর কাছে তো দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু কি করবেন? একটি মানুষ একটি মানুষী সারাজীবন এক হয়ে থাকা সে কোথায়। ছত্রি রাজা। রাম কোথায়? সীতা এখনও আছে। হায় শবরী সীতা!

ঝুমঝুমি নীরবেই গিয়ে বসেছিল মন্দিরে আরতির সময়। মধ্যে মধ্যে চোখ মুছছিল। রুক্মিণী লক্ষ্য রেখেছিলেন তার উপর। আরতি শেষ হতে কিষণজীকে প্রণাম করে তাঁদের প্রণাম করে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন।

পরদিন সকালে ঝুমঝুমিকে খুঁজে কেউ পায় নি। তার বেশভূষা সব পড়ে ছিল। কিন্তু তাকে পাওয়া যায় নি। খোঁজ অনেক করেছিলেন রাণীমাতাজী। কিন্তু কোন খোঁজ মেলে নি। রুক্মিণী কোন কথা বলেন নি। তিনি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

কয়েকদিন পাইক মহলে কথা হয়েছিল। কথা বুঝতে কারুর বাকি থাকে নি। তারা কেউ সমর্থন করতে পারে নি ঝুমঝুমিকে। ছত্রিশ জাতিয়া বেদিয়ারাও না।

তিন মাস পর। ফিরছেন কুমার অর্জুন সিং। মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে তাঁর। বর্গীরা সন্ধি করেছিল নবাবের সঙ্গে। উড়িষ্যা ছেড়ে দিয়েছিল নবাবকে, কিন্তু চৌথ পেয়েছিল। মীর হবিব তাঁর স্বভাবমত এবার দল বদল করে আবার হয়েছিলেন নবাবের চাকর। কিন্তু বর্গীরা তাঁকে ক্ষমা করে নি। জানোজী কটকের প্রান্তে ছাউনি ফেলে সুযোগ খুঁজছিলেন। অর্জুন তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। একদিন জানোজী মীর হবিবকে নিমন্ত্রণ করে এনে হিসাবনিকাশের কথা পেড়েছিলেন। তারপর বর্গীরা করেছিল আক্রমণ। মীর হবিব তাঁর দল নিয়ে লড়াই করে পারেননি। মরতে তাঁকে হয়েছিল। কুমার অর্জুনের তলোয়ার আরও কয়েক জনের সঙ্গে বিদ্ধ হয়েছিল মীর হবিবের বুকে। তাতেই ভিজিয়ে নিয়েছিল সে তার রুমাল।

সেই রুমাল মাথার পাগড়ীতে বয়ে নিয়ে ফিরল কুমার অর্জুন। সঙ্গে তার চল্লিশজন পাইক। ঘোড়ার উপর চড়ে ফিরছে। সঙ্গে আসছে এক ডুলি।

শঙ্খধ্বনির মধ্যে কোলাহলের মধ্যেও কথাটি প্রশ্নের সুরে ধ্বনিত হল—ডুলি ?

ছত্রি রাজপুত! বীর! কোথা থেকে কোন বিমুগ্ধাকে নিয়ে এসেছে! আশ্চর্য কি!

রাণীমাতাজী সবিস্ময়ে তাকিয়েছিলেন দরবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে। তাঁর পাশে রুক্মিণী। তিনিও বিস্মিতা।

অর্জুন নেমে এসে প্রণাম করে রক্তাক্ত রুমালখানা নামিয়ে দিয়ে বললে, এই নাও মাতাজী, মীর হবিবের রক্ত।

গম্ভীরভাবে রত্নাদেবী বললেন, দীর্ঘজীবী হও। তোমার সুযশে চন্দনগড় দেশ মুখরিত হোক। কিন্তু ডুলিতে কে? কাকে নিয়ে এলে অর্জুন? আমি যে হিঙ্গনের সঙ্গে তোমার বিবাহের দিন স্থির করেছি।

—সে তো হয় না রাণীমাতাজী। আমি জীবনে একটি মেয়েকেই ভালবেসেছি। তাকেই জগন্নাথ সাক্ষী করে বিবাহ করেছি। ঝুমঝুমি নাম-প্রণাম কর।

সলজ্জিতা বধূবেশিনী কৃষ্ণাঙ্গী কন্যা নেমে এসে প্রণতা হল।

—ঝুমঝুমি ?

—হ্যাঁ রাণীমাতাজী। অসীম ওর সাহস। ভয়ডর নেই। আমার জন্যে পাগল হয়ে রাত্রে জঙ্গলগড় থেকে বেরিয়ে ভিক্ষা করতে করতে গিয়েছিল পুরী। সেখানেই ছিল। অসীম সাহসিনী ও। পুরী থেকে কটকে গিয়ে আমার কাছে গিয়েছিল। আমার বুকে পড়ে কি কান্না! বল, তুমি শুধু আমার, শুধু আমার। আমি তো তাই। আমি আর কারু হতে পারব না মাতাজী। আমি ওকে বিবাহ করেছি জগন্নাথের সামনে। তাঁকে সাক্ষী করে। ভাগ্যক্রমে শঙ্করীপুরের মায়ের গুরুকে সেখানে পেয়েছিলাম। তিনি বিবাহ দিয়েছেন। এই পাইকরা সাক্ষী। তিনি বললেন, তোমার মায়ের সঙ্গে তোমার বাবার বিবাহে আমি মন্ত্র পড়েছিলাম। তোমার বিবাহেও পড়ছি। বললেন, তোমার জাত যায় না অর্জুন।

—কিন্তু চন্দনগড়ের ছত্রিয়া প্রজারা তো এ সহ্য করবে না!

—হবে না মাতাজী সহ্য করতে। চন্দনগড়ের গদীতে বসবে আমার বড় বহিনের ছেলে। রাজা মাধব সিং-এর দৌহিত্র। হিঙ্গনকে তার হাতে দাও মা।

—ভাল। সেই বসবে। কিন্তু হিঙ্গন—। হাসলেন রাণীমাতাজী। বললেন, আমারই ভুল। হিঙ্গনকে যে জগন্নাথের কাছে যেতেই হবে। আমি যে চন্দনগড় থেকে বেরুবার সময় তাঁর নাম করেই ওকে বলেছিলাম—চল্, তাঁর হাতে তোকে দিয়ে আসি। তাই হবে।

রুক্মিণী নেমে এসে কৃষ্ণাঙ্গী বেদিয়ার মেয়েকে বুকে টেনেই নিলেন না, সকলের সমক্ষে তার কপালে চুম্বন দিয়ে চোখ বুঝলেন। দুটি জলের ধারা তাঁর চোখ থেকে নেমে এসে ঝড়ে পড়ল বধূর মাথার উপর।

মহানগরী

মহানগরী। স্বর্গলোকের ইন্দ্রপুরীর নাম বৈজয়ন্তী। সেখানে অন্ধকার নাই—আলোর রাজত্ব। সেখানে দুঃখ নাই শুধু সুখ আছে। সেখানে অশান্তি নাই শুধু শান্তি আছে। সেখানে অতৃপ্তি নাই শুধু তৃপ্তি আছে। সেখানে দৈন্য নাই, পরম ঐশ্বর্যে ঝলমল করছে সে পুরী! সেখানে জরামরণ নাই আছে অনন্ত যৌবন এবং অমরত্ব। হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, পাপ নাই, প্রেমের রাজত্ব, প্রীতির নিলয়, পুণ্যের পবিত্রতায় নিষ্কলুষ, পবিত্র। তাই ধ্বংস নাই; মানুষ বলে মানুষ ধ্বংস হয়ে গেলেও স্বর্গপুর থাকবে।

এ মহানগরী মাটির বুকের উপর রচনা করেছে মানুষ। সম্ভবতঃ ওই বৈজয়ন্তীর মতই একটি পুরী রচনা করবার কল্পনায় সে সভ্যতার উন্মেষের প্রথম দিন থেকে পুরুষানুক্রমে বিভোর হয়ে আছে। ভাঙছে-গড়ছে, গড়ছে-ভাঙছে। অনিচ্ছায় ভাঙে স্বেচ্ছায় ভাঙে। প্রকৃতির মধ্যে চলে ভাঙাগড়া, শীতের পর আসে গ্রীষ্ম—গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা—আকাশে ওঠে কালবৈশাখীর ঝড়, ঝড় আনে মেঘ—মেঘের বর্ষণে আসে প্রলয় প্লাবনের মত বন্যা—সেই ঝড়ে নগর ভাঙে, বন্যায় ডুবে যায়, পলিমাটি চাপিয়ে দিয়ে যায় স্তরে স্তরে। ঝড় বন্যার সঙ্গে আছে আগুন। নগরকে যে দীপমালা মানুষ পরায়—তারই আগুন লাগে, যে অগ্নিকুণ্ডের আয়োজন মানুষ করে জীবনের প্রয়োজনে—সেই আগুন লাগে। আগেকার কালে আসত লুণ্ঠনকারী দস্যুদল—আসত নিষ্ঠুর অভিযানকারীর দল—তারা আগুন লাগিয়ে দিত—নগরীর মাথায় মাথায়, সম্পদভরা নগরীর ঘরে, নগর পুড়ে ছাই হয়ে যেত। মানুষ কিন্তু আবার গড়ত। এই নূতন গঠনে তার রূপ হত অভিনব, উজ্জ্বলতর। তার জীবনের আধুনিকতম আবিষ্কারকে সে কাজে লাগাত। আজকালকার অভিযানকারী আগেকার কালের মত ঘোড়ার ক্ষুরে ধুলা উড়িয়ে বর্শাফলকে মানুষের মুণ্ড গেঁথে দাউ দাউ করে জ্বালানো মশাল হাতে নগরে ঢুকে আগুন লাগায় না! মাথার উপরে ওড়ে এরোপ্লেন—তাই থেকে ফেলে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফারক বোমা—বিপুল শব্দ করে বিস্ফোরণ হয়—মানুষের সাধের রচিত নগরীর ঘরবাড়ী টুকরো টুকরো হয়ে ধুলো হয়ে ভেঙে পড়ে, ইনসেণ্ডারী বোমায় আগুন লাগে। যেকালের কথা বলছি তখন অ্যাটম বম তৈরী হয় নি, যুদ্ধ তখনও লাগে নি; সুতরাং অ্যাটম বমের কথা থাক। আগুনে পুড়ে বোমায় ভেঙে নগর ধ্বংস হয়; মনে হয় এ আর কখনও মাথা তুলে উঠবে না। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের উপর আবার মানুষ গড়ে সমৃদ্ধতর নগর। আগুনের পর আছে ভূমিকম্প—তারপর আছে মহামারী—মানুষের সৃষ্ট আবর্জনা থেকে উদ্ভব হয় মৃত্যুরোগের মহামারীতে নগর হয় জনশূন্য—খাঁ-খাঁ করে।

ইতিহাসে গল্প আছে—গৌতম বুদ্ধ কুশীনগরে মহানির্বাণ লাভের জন্য যাত্রাপথে গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে পাটল বৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে আনন্দকে বলেছিলেন—আনন্দ শোন, আমি দেখতে পাচ্ছি—ভাবীকালে এইখানে গড়ে উঠবে এক মহানগরী। কিন্তু উত্তরকালে অগ্নিদাহে এবং জলপ্লাবনে সে নগর ধ্বংস হয়ে যাবে।

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ অবশ্য হয় নাই। অজাতশত্রুর পত্তন করা পাটলীপুত্র ভারতবর্ষের

রাজধানী হয়েছিল একদিন, সে নগর ধ্বংসপ্রাপ্তও হয়েছিল। মাটির তলা থেকে আজ তাকে খুঁড়ে বের করছে মানুষ। কিন্তু পাটলীপুত্র একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, ইতিহাসের অজ্ঞাত এক অধ্যায়ের পরে আবার পাটলীপুত্র গড়ে তুলেছিল মানুষ, মুসলমানের রাজত্বে পাটনা ভেঙেছে গড়েছে, আবার ইংরেজের আমলে ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে আজ সে নূতন করে গড়ে উঠেছে।

বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর স্বর্গলোক কলকাতা মহানগরী। সমগ্র দেশের ভাবীকাল এইখানে রচিত হচ্ছে, বর্তমান নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে এইখানেই হয় এ দেশের মানুষের ভাববিনিময়, লেনদেনের বোঝাপড়া। বিমল এ মহানগরীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই সে পল্লীকে পরিত্যাগ করে এখানে এসেছে, এইখানেই সে বাস করবে, এইখানেই তার স্থান তাকে করে নিতে হবে।

বিমল গাছতলায় একটি বেঞ্চে বসে ছিল। সেখান থেকে উঠে ধীরে ধীরে এল এসপ্ল্যানেড ট্রাম ডিপোয়। পিছনে স্ট্র্যাণ্ডের ওধারে গঙ্গায় জাহাজের স্টীমারের বাঁশী বাজছে। গঙ্গার ধারে মিলে ভোঁ বাজল। খিদিরপুর বেহালা আলিপুরের ট্রামগুলো আসছে বিপুল গতিতে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে, ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ এবং ঘণ্টার শব্দ উঠছে। চৌরঙ্গি ধরে চলেছে বাস, মোটর, লরী; হর্ণ বাজছে, ইঞ্জিন গোঙাচ্ছে। কোথাও বোধ হয় কোন হোটেলে যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে। পার্কটার মোড়েই বিক্রী করছে ঘুঘনি, দহিবড়া, পকৌড়ি, গরমভাজা বেগুনী, আলুর চপ। কাগজওয়ালারা সান্ধ্য সংস্করণ কাগজ বিক্রী করছে। কয়েকজনে রেসের বই নিয়ে হেঁকে বেড়াচ্ছে। উত্তরে সাততলা বাড়ীটার মাথার উপরে গোলকের মাথায় খুব জোরালো একটা বাল্ব জ্বলছে, ধর্মতলার মোড়ে গিসগিস করছে লোক; আলো ঝলমল করছে; উত্তর-পশ্চিম কোণে খাবারের দোকানটার মাথায় ইলেকট্রিক লাইট দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলছে।

—শুনুন।

ফিরে তাকিয়ে দেখেই বিমল বিরক্ত হল। বিশ-বাইশ কি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে ডাকছিল। আধুনিক রুচি অনুযায়ী কাপড়চোপড় পরা, পায়ে স্যাণ্ডেল, হাতে একটা ব্যাগ। সে তাকে ডাকছিল—শুনুন।

মেয়েটির সঠিক পরিচয় না জানলেও মেয়েটিকে সে প্রায় নিত্যই এখানে দেখে। এমনি ভাবে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। তারপর অদৃশ্য হয় তাকে নিয়ে। শুধু ওই মেয়েটি একা নয়, আরও অনেকে আসে। কালীঘাটের ট্রাম থেকে একটি মেয়ে নামে, নামে উল্কার মত গতিতে, ভিড় চিরে চলে হন হন করে। পাশ থেকে কেউ ডাকলে সাড়া দেয় না। সামনে গিয়ে গতিরোধ করে দাঁড়ালে তবে সে দাঁড়ায়। তারপর গিয়ে ওঠে কোন রেস্তোরাঁয় অথবা ওঠে ট্যাক্সিতে অথবা ঘুরে পশ্চিম মুখে চলতে থাকে ইডেন গার্ডেনের দিকে।

বিরক্ত হয়েই সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু মেয়েটি এর পরেই যে কথা বললে তাতে সে আশ্চর্য হয়ে গেল, সে বললে—আপনিই তো বিমলবাবু?

চমকে উঠল বিমল। মেয়েটি তার নাম জানলে কেমন করে! শঙ্কিত হল সে। ব্ল্যাকমেলিংয়ের কোন ফন্দী নয় তো? কিন্তু তাকে ব্ল্যাকমেল করে ফল কি? শত্রুই বা তার এমন কে আছে? ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে বললে—হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।

মেয়েটি একটু এগিয়ে এল। কাছে আসতেই বিমল তাকে দেখে আরও একটু বিস্মিত হল। যাকে সে ভেবেছিল এ তো সে নয়। একে কখনও দেখেছে বলে মনে হল না। মেয়েটি বললে—আপনাকে আমি রেডিয়ো আপিসে দেখেছি। আজই বিকেলবেলায় আপনি গিয়েছিলেন। আপনি গল্প পড়লেন সেখানে। আপনার নাম বললে। পড়া শেষ করে আপনি বাইরের আপিসে এসে চেক নিলেন, আপনাকে তখনই দেখেছি আমি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনি সেখানে কেন গিয়েছিলেন? আমাকেই বা আপনার প্রয়োজন কিসের?

—আমি বড় বিপদে পড়েছি।

—বিপদ? কি বিপদ?

—কলকাতায় এসেছি আমি। আমার বাড়ী ঢাকায়। রেডিয়োতে গান করেন—ওখানে খুবই প্রতিপত্তি আছে বলে শোনা যায়—অরুণ রায়, চেনেন আপনি? চুল কোঁকড়া, খুব ফরসা রঙ।

—চিনি বৈ কি!

—তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমার গান শুনে তিনি বলেছিলেন কলকাতায় এলে আমি অনেক বড় ফিল্ড পাব। রেডিয়োতে তিনি প্রোগ্রাম করে দেবেন—সিনেমাতে বলে দেবেন, সেখানে আমি স্কোপ পাব। আমি তাই এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে—

মেয়েটি হঠাৎ কেঁদে ফেললে—কোন রকমে আত্মসম্বরণ করে বললে—আমার কোন আশ্রয় পর্যন্ত নেই। আমি—আমি—।—আর সে কথা বলতে পারলে না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

—সে কি? স্তম্ভিত হয়ে গেল বিমল।

—আজ রাত্রিটার মত আমায় কোন ভদ্র-পরিবারের মধ্যে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

বিমল একটু চিন্তায় পড়ল। ঠিক বুঝতে পারছে না সে। মেয়েটি যার নাম করছে সেই অরুণ রায়কে সে জানে। অনেকেই জানে কলকাতা শহরে। বিশেষ করে ফ্যাশানেবল সোসাইটিতে। কখনও ধুতি-পাঞ্জাবি, কখনও সুট, কখনও পায়জামা আচকান, কখনও পাঞ্জাবি ও চুস্ত পায়জামা পরে বেড়ায়, মোটরেই দেখা যায় বেশীর ভাগ। সাহিত্যে শিল্পে সঙ্গীতে কিসে সে বিশেষজ্ঞ নয়। কোন্ দলে সে মেশে না। তার পাশে অহরহ কোন না কোন তরুণী বান্ধবী থাকেই। যাকে বলে আলট্রামডার্ণ। বাপ দিল্লীতে বড় চাকুরে। সম্ভবত পুত্রের যোগ্য বাপ মা। সম্প্রতি কোন বিখ্যাত শিল্পীর বাড়ীতে তাকে দেখেছিল বিমল, তার সঙ্গে ছিল পাঞ্জাবিনীর পোশাকপরা এক তরুণী—পরিচয়ে জেনেছিল সে অরুণ রায়ের সহোদরা,

তাদের সঙ্গে ছিল একজন পাঞ্জাবী মুসলমান ভদ্রলোক সে হল অরুণের ভগ্নীপতি। কোন বিখ্যাত সমালোচকের আসরে তাকে দেখেছিল, সেখানে ছিল একটি ভিন্ন-প্রদেশবাসিনী কবিযশপ্রার্থিনী এক বান্ধবী। মেট্রো সিনেমার দরজায় দেখেছিল—সঙ্গে ছিল একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে, সে নাকি ভারতীয় নৃত্যে পটিয়সী। অরুণ রায় খ্যাতিমান এবং সকল কর্মে পারঙ্গম।

মেয়েটি বললে—আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করছেন না?

বিমল স্পষ্টই বললে—দেখুন, আপনাকে আমি চিনি না। আপনি যে কাহিনী বললেন—

বাধা দিয়ে মেয়েটি বললে—কাহিনী নয়, সম্পূর্ণ সত্য। হাতের ব্যাগ খুলে সে একখানি পত্র বার করে বিমলের হাতে দিয়ে বললে—পড়ে দেখুন, অরুণবাবুর পত্র।

বিমল পত্রখানি হাতে নিয়েও পড়লে না, বললে—কিন্তু আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করব? এখানে আমি একা থাকি একখানি ঘরে, খাই হোটেলে—আপনার ব্যবস্থা কোথায় করতে পারি ভেবে তো পাচ্ছি না। আপনি উঠেছিলেন কোথায়?

—হোটেলে। মেয়েটি তিক্ত হাসি হাসলে। বললে—খরচপত্র দিয়ে অরুণবাবু হোটেলে ঘরভাড়া করে রেখেছিলেন। স্টেশনে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়েও এসেছিলেন। তারপর—। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল মেয়েটি। তারপর বললে—হোটেল থেকে কোন রকমে বেরিয়ে এসেছি।

—দেশে চলে গেলেন না কেন?

—না। দেশে আমি ফিরব না। সে বার বার ঘাড় নেড়ে তার সংকল্পের দৃঢ়তার ইঙ্গিত প্রকাশ করলে। দেশে আমার কেউ নেই; আশ্রয় আমাকে খুঁজে নিতেই হবে। মানুষের উপর বিশ্বাস করে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই খুব বড় ধাক্কা খেয়েছি। বড় অসহায় অবস্থায় বাধ্য হয়ে আপনাকে ধরেছি। একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে হঠাৎ বললে—নইলে—নইলে—। চোখ দুটো তার জলে উঠল। তারপর বললে—সাহিত্যিকদের দুর্নামের কথাও আমার অজানা নয়। তবুও দুর্নামে তাদের ক্ষতি হয় এবং ওই অরুণ রায় কি—হঠাৎ থেমে সে এসপ্ল্যানেডের গেটটার থামের গায়ে লাগানো একখানি সিনেমার পোস্টারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—ওই লোকটা—

—কে? বিস্মিত হয়ে বিমল প্রশ্ন করলে। কোন লোকটা?

—ওই যে পোস্টারে ছবি রয়েছে। লোকটার নাম করতেও ঘেন্না হচ্ছে আমার।

'অভিসারিকা' নামক নবতম চিত্রাবদানের পোস্টারে নায়ক রতন রায়ের হাসিমুখ দেখা যাচ্ছিল। আদর্শবাদী যুবকের ভূমিকায় রতন রায়কে দেখা যাবে। আগামী ২রা মার্চ ১৯৩৭ সালে শুভ উদ্বোধন হবে ছবির। দিনটি শুভদিন তাতে সন্দেহ নাই।

মেয়েটি বললে—অরুণ রায় কি ওই লোকটার সঙ্গে তাঁদের তুলনা আমি করি না। তা ছাড়া—এ সব বিষয়ে আপনার সুনামের কথাই শুনেছি। লেখা পড়ে বিশ্বাস করতে ভরসা হয়। তাই অসঙ্কোচেই উপযাচিকা হয়ে আপনার সাহায্য চাচ্ছি। রাত্রিটার মত কোন ভদ্রলোকের অন্দরমহলে আমাকে আশ্রয় দেখে দিতে হবে আপনাকে। এরই মধ্যে

কতকগুলো গুণ্ডা দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে।

বিমল শেষ কথাটায় চকিত হয়ে উঠল। চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখেই বললে—আসুন। কালীঘাটের ট্রাম।

সামনেই দাঁড়িয়েছিল কালীঘাটের ট্রাম। সে উঠে পড়ল। পিছন পিছন মেয়েটিও উঠল। বিমল তাকে লেডিস্ সিটে বসিয়ে দিয়ে সামনের সিটটায় বসল। ১২৩৭ সালের কথা—কলকাতায় এত ভিড় ছিল না তখন, ট্রামখানা খালিই যাচ্ছিল। সিটে বসে বিমল তার হাতের চিঠিখানা মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলে, বললে—রাখুন আপনার চিঠি।

—না। পড়ুন আপনি। আমি চাই চিঠিখানা আপনি পড়েন।

খামখানা ঘুরিয়ে দেখে বিমল চিঠিখানা পকেটে রাখলে। মেয়েটির নাম—অরুণা ঘোষ।

দুই

চৌরঙ্গির ভিজে পিচঢালা পথ আলোর ছটায় কালো অজগরের মসৃণ পিঠের মত চকচক করছে। পশ্চিমদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে; শীতের বাদলায় ময়দান আজ জনহীন। পূর্বদিকে ফুটপাথেও লোকের ভিড় নাই। দোকানের শো-কেসগুলি আলোকের প্রাচুর্যে ঝকমক করছে, বড়দিনের রঙীন কাগজের সজ্জা এখনও খুলে ফেলা হয় নি। ট্রামেও খুব ভিড় ছিল না। যারা ছিল তারাও সকলেই প্রায় নেমে গেল ভবানীপুরে, যদুবাবুর বাজার থেকে পূর্ণ থিয়েটারের মোড় পর্যন্ত। এদিকটায় লোকজনের ভিড় কিছুটা রয়েছে।

মেয়েটি স্তব্ধ হয়ে জানালার বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভাবছে। অরুণা ঘোষ, মেয়েটির চিঠিতে ওই নাম লেখা রয়েছে। কি ভাবছে ও-ই জানে। অনেক উদ্বেগের পর একটা আশ্রয় পেয়ে পথশ্রান্ত পথিকের গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়ার মত অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এমনও হতে পারে, অথবা নিরাশ্রয় অবস্থার উদ্বেগে অধীর হয়ে এই অপরিচিত আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরে এখন তার ভবিষ্যতের ভালমন্দ বিচার করছে স্তব্ধ হয়ে—এমনও হতে পারে। বিমল ভাবছিল। ভাবছিল কোথায় তাকে নিয়ে যাবে। তার কয়েকজন সম্পদশালী আত্মীয়স্বজন আছেন। একটা রাত্রির মত আশ্রয় দিতে তাঁরা অস্বীকার করবেন না। কিন্তু—। এই সম্পদ-সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিমল জীবনে দূরে রেখেই চলতে চায়। এই মানুষগুলির মনোভাব বিচিত্র, উদারতা আছে কিন্তু সে উদারতা চেষ্টাকৃত, স্বভাবস্ফূর্ত নয়, উপকার করেন কিন্তু চিরদিন মনে করে রাখেন উপকার করেছি বলে, প্রত্যুপকারেও এ শোধ হয় না; টাকা ধার দিয়ে সুদে-আসলে শোধ নিয়েও বলে থাকেন বিপদের সময় টাকাটা আমিই দিয়েছিলাম। শিক্ষাও এদের আছে—বি-এ, এম-এ, পাসও করেছে বংশধরেরা, বাড়ীর বহিরঙ্গে সাহেবীআনা প্রকট, সাহিত্য-আলোচনায়, জীবনের আচার বিচারের সমালোচনায়, নারীর অধিকার এবং নরনারীর সম্পর্কের গণ্ডী বিচারে যে সব ভাল ভাল কথা বলে থাকেন সে সব শুনে বিমলের মনে প্রথম প্রথম আক্ষেপ হত, মনে হত এঁদের

কত পিছনেই না পড়ে আছে সে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে হৃদয়ঙ্গম করেছে মিথ্যাভাষণে এমন অদ্ভুত পটুত্ব শ্রেণীগত সংস্কৃতি হিসাবে এ দেশের অন্য কোন শ্রেণী আয়ত্ত করতে পারে নি। মনের মধ্যে আসলে এই শ্রেণীর মানুষগুলি যত সন্দিগ্ধ তত সংকীর্ণ, রঙ্গমঞ্চে কুললক্ষ্মীর ভূমিকায় রঙমাখা লালপেড়ে শাড়ীপরা অভিনেত্রীর সঙ্গে তুলনা করলে তবেই স্বরূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁদের ওখানে নিয়ে গেলে স্থান তাঁরা দেবেন, সমাদর করেই স্থান দেবেন কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে কুৎসিত সন্দেহ, স্বভাব অনুযায়ী জেগে উঠবে তাকে স্থির সত্য বলে প্রচার করবার জন্য একমুখ অধীর পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। মিথ্যা নিন্দাকে বিমল ভয় অবশ্য করে না কিন্তু অকারণে তার অবকাশ দিতে সে চায় না কাউকে।

হাজরা রোড পার হয়ে কালীঘাটের ট্রাম ডিপোয় ট্রাম দাঁড়াল। বিমল উঠল—মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ডাকলে—উঠুন। এবার নামতে হবে।

চকিত হয়ে মেয়েটি বললে—ও। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠল।

বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে গেছে দুপাশে অসংখ্য ছোট রাস্তা। নূতন যুগে তৈরী শহরের এক অংশে গলি পথ নেই। এ যুগে গলি পথ অচল। পিচ-দেওয়া ঝকঝকে তকতকে রাস্তাগুলি—সুপ্রশস্ত না হলেও প্রশস্ত। তারই মধ্যে একটা রাস্তা ধরে একটা ছোট পাঁচ মাথায় এসে দাঁড়াল বিমল। একদিকে একটা বিস্তীর্ণ বস্তী। প্লটের মালিকরা বাড়ী না করে বস্তী তুলে ভাড়া দিয়েছেন। হিসেব করে দেখেছেন—এতেই সুদ পোষায় বেশী।

অরুণা প্রশ্ন করলে—কোন দিকে আপনার বাসা?

বিমল পশ্চিম দিকটা অঙ্গুলী নির্দেশে দেখিয়ে দিলে।

—ও যে বস্তী!

হেসে বিমল বললে—ওরই প্রান্তসীমায় থাকি। এই যে বস্তীর উত্তর দিকের রাস্তাটা—ওইটেই বস্তী এবং বাসার মধ্যে বাউণ্ডারী লাইন হয়ে রয়েছে। এ পাশে এই যে বাড়ীগুলো—এই সারিরই বাড়ীগুলোর মধ্যে একটা বাড়ীর একখানা ঘর নিয়ে থাকি আমি।

—আমাকে কোথায় রাখবেন? মেয়েটি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

বিমলের চট করে মনে পড়ে গেল তার স্বর্গত বন্ধু সাহিত্যিক রবীন্দ্র মৈত্রের নাটক—মাননীয় গার্লস স্কুলের একটা কথা। নিঃসম্পর্কীয় একটি পুরুষ ও নারী মনের জোর থাকলে—একই ঘরে ট্রেনের এক কম্পার্টমেন্টের সহযাত্রীর মত রাত্রিটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু রসিকতা করবার প্রলোভন ত্যাগ করলে সে। কথাটা মনে হতেই ঠোঁটে যে হাসিটুকু ফুটে উঠেছিল—সেটুকু সে গোপন করলে না, হাসিমুখেই বললে—ভাবছি সেই কথা।

তারপর বললে—আসুন।

একটু দূরে একটা কয়লার ডিপো—তার সঙ্গে একটি মুদীখানা। সেখানে গিয়ে বিমল ডাকলে—চিত্ত! সঙ্গে সঙ্গে একখানা লোহার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে—বসুন।

বিমলের গ্রামবাসী চিত্তরঞ্জন। বয়সে বিমলের কনিষ্ঠ—ছোটখাটো মানুষ—দেখে মনে হয় পনের ষোল বছরের ছেলে, কানে খাটো; আপন চেষ্টায় গড়ে তুলেছে এই মুদীখানা—কয়লার ডিপো। একদল লরীর মালিকের সঙ্গেও খানিকটা ভাগে কারবার আছে, নিজে

একখানা লরী ড্রাইভ করে, মাল বইবার অর্ডারও সংগ্রহ করে, তার জন্ম একটা বখরা পায় সে। ভাল ঘরের ছেলে কিন্তু লেখাপড়া শেখে নাই। প্রথম যৌবনে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। সন্ন্যাসী হয়ে আর্যাবর্ত ঘুরেছে। মধ্যপথে গেরুয়া ছেড়ে ড্রাইভারি করেছিল। দেশে ফিরে ফিরিওয়ালার ব্যবসা করেছিল। সে ছেড়ে—প্রাইভেট ট্যাক্সীর ড্রাইভারি করতে গিয়ে পেশোয়ারীদের স্মাগ্‌লিংএর ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছিল। নূতন মাস্টার বুইক গাড়ী নিয়ে কলকাতা থেকে যেত দুর্গাপুরের জঙ্গলের মধ্যের এক গোপন আড্ডায়, সেখান থেকে মাল নিয়ে রাত্রি দুপুরে ফিরত আড্ডায়। তার পাশে বসে থাকত একজন—কোমরে ছোরা, হাতে রিভলভার নিয়ে। কপটতা প্রকাশ করলে তখন সে ক্ষমা করে না, তার জন্যে ছুরি বার করে বসে প্রকাশ্যেই এবং তার জন্যে কোন ভয় নাই তার।

চিত্তরঞ্জন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই ভিতর থেকে উত্তর দিলে—দাদা! আসুন-আসুন-আসুন। এই রাত্রে? বলতে বলতেই সে এগিয়ে এসে অরুণাকে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—আপনি? কি চান—?

বিমল বললে—ওঁর জন্যেই তোমার কাছে এসেছি। উনি বড় বিপদে পড়েছেন, রাত্রিটার জন্ম তোমার বাড়ীতে আশ্রয় দিতে পার?

চিত্ত অরুণার মুখের দিকে চেয়ে ভ্রু কুঞ্চিত করলে, বললে—কিছু মনে করবেন না। কাল সন্ধ্যাবেলা আপনি হোটেল উজ্জয়িনীতে ছিলেন না? এ্যাক্টর রতনবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলেন পশ্চিম দিকের খোলা বারান্দায় উত্তর দিকের কোণটায়—!

অরুণার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। চিত্ত বললে—ভুল হচ্ছে কি না জানি না। আমি ওই হোটেলটায় কয়লা সাপ্লাই করি কি না! ম্যানেজার চেয়ার টেবিল সাজবার ব্যবস্থা করছিলেন, আমার তাড়াতাড়ি ছিল—সেখানেই গেলাম। ঠিক আপনার মত—।

অরুণা এবার বললে—হ্যাঁ আমিই।

ঘাড় নেড়ে চিত্ত বললে—আপনিই! তাই তো বলি—এত ভুলই কি হবে আমার? তা হোটেল থেকে চলে এলেন কেন?

বিমল বললে—সে অনেক কথা চিত্ত। তবে উনি চলে এসেছেন—না এসে উপায় ছিল না। হঠাৎ আমায় রেডিয়ো আপিসে দেখে আমার পরিচয় পেয়ে আমায় একটু আশ্রয়ের জন্যে ধরেছেন। কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাত্রিটার মত আশ্রয় করে দিতে হবে। আমার তো ওই একখানি ঘর। অবশ্য ওঁকে ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে আমি তোমার দোকানে থাকতে পারি।

—উঁহু। ঘাড় নাড়লে চিত্ত। বললে—কথা উঠবে। যারা ওঁকে দেখবে আপনার ঘরে, তারা নানা কথা বলবে।

বিমল বললে—আমি বলছিলাম ওকে যদি রাত্রিটার মত বউমার কাছে থাকার ব্যবস্থা করে দাও—তুমি আমার ঘরে থাক।

বাধা দিয়ে চিত্ত বললে—সর্বনাশ। আপনার বউমাটিকে তো জানেন না। সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে যাবে। ওঁর চৌদ্দপুরুষ—আমার চৌদ্দহুগুণে আঠাশ পুরুষ—আপনার

হয়তো বিয়াল্লিশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। চিন্তিত মুখে সে ঘাড় নাড়তে লাগল।

—বাবু! ডিপোর কুলী একজন এসে দাঁড়াল।

প্রশ্নের ভঙ্গিতে মাথা তুলিয়ে তার মুখের দিকে চাইলে চিত্ত। কানে খাটো চিত্ত ছোট-খাটো প্রশ্নোত্তর ইঙ্গিতেই সেরে নেয় স্বাভাবিক নিয়মে। কুলীটা বললে—বাবুলোক ডাকছে।

বিমল একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। সে জানে—ডিপোটার ভিতর দিকে কুলীদের ঘরে প্রায়ই চিত্ত এবং তার কয়েকজন বন্ধুর নৈশ আড্ডা বসে থাকে। এবং সে আড্ডায় চলে পান ভোজন। গোপনতা নাই, তবে সামাজিক ভদ্রতার খাতিরে ঘরের ভিতরেই বসে, গ্রীষ্মকালে ডিপোর কয়লার স্তূপের আড়াল দিয়ে খোলা জায়গায় পাতে প্যাকিং কেসের টেবিল এবং কয়েকটা মোড়া ও টুল। চিত্ত এখুনি গিয়ে মদ্যপান করে আসবে—তারপর অসঙ্কোচেই ফিরে এসে ক্রমশিথিল-বন্ধন রসনায় কথা বলতে সুরু করবে। সুতরাং সে ব্যস্ত হয়ে বললে—তা হলে ওকে আমি আমার ঘরটাই ছেড়ে দিচ্ছি। আমি তোমার এই মুদীখানাতেই শোব। বুঝলে!

চিত্ত বললে—দাঁড়ান দাঁড়ান। পাঁচ মিনিট। আমি আসছি। সে রাস্তায় নেমে পড়ল। বললে—এলাম বলে।

—কোথায় যাবে?

—আসছি।

অরুণা কুণ্ঠিত স্বরে বললে—আমি আপনাকে বড় বিব্রত করলাম।

বিমল কোন উত্তর দিলে না। বিব্রত হয়েছে সে কথা স্বীকার না করে বিনয় দেখাবার মত ঔদার্য তার ছিল না।

অরুণা বললে—আমি বুঝতে পারছি, হোটেল ছেড়ে চলে আসা আমার উচিত হয় নি। কাল সকালে বেরিয়ে যা হয় করাই বোধ হয় ঠিক হত। কিন্তু আমি ভয় পেয়ে গেলাম। রতনবাবু যে রকম উৎপাত সুরু করেছিলেন—তাতে থাকতে ভরসা পেলাম না। সঙ্গে টাকাকড়িও বেশী ছিল না, সম্বলের মধ্যে কয়েকগাছা চুড়ি বিক্রী করলাম দায়ে পড়ে, হোটেলের দেনা মিটিয়ে যা থাকল তাতে অন্য হোটেলে উঠতে ভয় পেলাম। তা-ছাড়া—।

বিমলের কোন সাড়া না পেয়ে মেয়েটি আর কথা বলতে উৎসাহ পেলে না তবু মনে মনে সে আহত হল। একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে নীরব হয়ে গেল।

চিত্ত এসে এই সময়টিতেই বললে—আসুন। একটা ব্যবস্থা করেছি।

অরুণা তাকালে তার মুখের দিকে, তার মুখ থেকে বিমলের মুখের দিকে। তার দৃষ্টির মধ্যে প্রশ্ন ছিল। সে জানতে চাইছিল—আশ্রয় স্থানটির বিবরণ। বুঝতে চাইছিল—সে স্থান গ্রহণ করা যেতে পারে কি না।

বিমলই প্রশ্ন করলে—কোথায় ব্যবস্থা করলে?

চিত্ত বললে—পাড়াতে তিন-চারটি বিধবা বেড়ায় দেখেছেন, বেশ আপ-টু-ডেট সাজ-পোষাক করে, পাড়ার ছোঁড়ারা যাদের কথা নিয়ে ঘোঁট পাকায়।

—হ্যাঁ। কিন্তু তারা কে? কি করে তারা?

চিত্ত হাসলে। বললে—আগে বিধবা মেয়েরা কাশী যেত। লোকেও পাঠাত—খারাপ মেয়েদের, আবার যার কেউ কোথাও নাই—সে যেত কাশী, বিশ্বনাথ রক্ষাকর্তা—আর খেতেও পেত—ছত্র ছিল—মঠ ছিল। এখন আর কাশী যায় না। আসে কলকাতায়, তীর্থ বলুন তীর্থ—নরক বলুন নরক—যা খোঁজে পায়। এ বিধবা চারটি থাকে একটি বাড়ীতে—আমার বাড়ীওয়ালার বাড়ীর পাশেই এক ভদ্রলোক থাকেন, তিনিই তাঁর বাড়ীতে দুখানা কামরা ভাড়া দিয়েছেন। ওদের একজন তাঁর নিজের লোকও বটেন। বাড়ীতে একটা সেলাইয়ের কল আছে, দোকান থেকে কাটা কাপড় নিয়ে এসে সেলাই করে দেয়, পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে ঘোরে, বালিশে ওয়াড়, টেবিল্‌ক্লথ, পর্দা তৈরী করে বিক্রী করে। আমার সঙ্গে জানাশোনা আছে—আমি অর্ডার-টর্ডার যোগাড় করে দি। তাদের ওখানে গিয়ে বললাম। তা তাঁরা রাজী আছেন; তবে বাড়ীটি পাকা মেঝে আছে বস্তী হলেও। তাতে আপনার অসুবিধা হবে না তো?

অরুণার চোখে মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠল।—না-না-না। আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব—

বাধা দিয়ে চিত্ত বললে—বিমলদা-কে দেন ধন্যবাদ। উনি যদি সঙ্গে করে না আনতেন আপনাকে—তা হলে—। কিছু মনে করবেন না যেন। ঐ হোটেলটায় ওই এ্যাক্টর রতনলালের সঙ্গে দেখার পর আমার বিশ্বাসই হত না—আপনি ভদ্রঘরের কি ভদ্রমেয়ে বলে। তবে উনি যখন এনেছেন—তখন আরও খারাপ দেখলেও বিশ্বাস করব আমি।

পাশের গলির মুখে লণ্ঠন হাতে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে। বললে—কই চিত্তবাবু কে আসবেন?

চমৎকার দেখতে মেয়েটি। দীর্ঘাঙ্গী, বড় বড় চোখ—টিকালো নাক—বেশ মর্যাদাময়ী সুশ্রী মেয়ে। তেমনি সপ্রতিভ—অরুণাকে দেখে বললে—আসুন ভাই।

বিমলের দিকে চেয়ে নমস্কার করে বললে—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে সাহসই হয় নি, ইচ্ছে থাকলেও। আজকে এঁর দৌলতে সে সুযোগ হল।

বিমল প্রতিনমস্কার করলে। বললে—আপনার কথা চিত্ত আমাকে বলেছে, আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি। সত্যই শ্রদ্ধা করি।

তিন

প্রকাণ্ড বস্তী। সাধারণতঃ বস্তী বলতে যা আমরা বুঝে থাকি বস্তীর আবহাওয়া বস্তীর মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কল্পনা, আমাদের শিক্ষিত সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনকে একসঙ্গে ভয় ঘৃণা এবং রোমাঞ্চকর বিস্ময়কে জাগিয়ে তোলে—এ বস্তী সে বস্তী নয়। ছিটে বেড়ার এবং কাঠের ফ্রেমে গাঁথা টিনের দেওয়ালের উপর খাপরা বা টিনের চালওয়ালা বাড়ীর বসতিকে আমরা বস্তী বলে থাকি বটে, তবে এ বসতিটিকে বস্তী না বলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থের পল্লী

বলাই উচিত।

দালালগিন্নী হিরণবাবুর মা—এই বস্তী বা বসতি স্থাপনের মূল। তিন পাশের পাকা বাড়ীর বাসিন্দাদের মধ্যে তখন এখানে বস্তী পত্তনের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ আন্দোলন মাটির নীচের এক মুঠো ছোলার মত চাপ বেঁধে অঙ্কুরিত হয়ে মাথা ঠেলে উঠেছিল। দালালগিন্নীর এই বাড়ীখানি দেখে সে আন্দোলনের মোড় ফিরে গেল। তাঁরা বললেন—এই ধরণের বসতি —যাকে বস্তী বলা যায় না—তা হতে দিতে আপত্তি নাই। জায়গাটির মালিকও ব্যবসায়ের মধ্যে নূতন পথ দেখলেন। খারাপ দিকটা অনেক ভেবে দেখলেন। দেখলেন, এইসব অসচ্ছল অবস্থার লোকগুলির কাছে ভাড়া আদায় করা কষ্টকর। বাকী পড়বার সম্ভাবনা বেশী। এরা আইন জানে এবং দেখায়। সমস্ত বিবেচনা করেও তিনি দালালগিন্নীর পন্থানুসরণ করলেন। কারণ আইন জানলেও এবং দেখালেও এরা অত্যন্ত অসহায় এবং দুর্বল। থানায় এবং আদালতে যার পয়সা আছে তার বিরুদ্ধে আইন দেখিয়ে কোন লাভ হয় না। আইন এবং বে-আইন এই দুইয়ের মধ্যে যে ছিদ্রপথ আছে সেই পথে যাতায়াতে তিনি অভ্যস্ত। এবং তার নিজের বাড়ীর সামনেই পড়বে এই বস্তী। এই বস্তীতেই একদিন এই দালালগিন্নী একটি বিধবা মেয়েকে দেখলেন। মেয়েটির নাম লাবণ্য। সন্তানহীনা—আত্মীয়হীনা—বিধবা হবার পর কলকাতায় এসেছিল অবলা শিক্ষাশ্রমে শিক্ষার্থীনী হয়ে। বৎসরখানেক থাকার পর—সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে এখন জীবিকার্জনের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্লাউজ-সায়া-সেমিজ সেলাই করে গৃহস্থ বাড়ীর বরাত মত। দালালগিন্নী তার মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টভাবেই বলেছিলেন—তাড়িয়ে দিলে কেন?

লাবণ্যের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। লাবণ্যের মুখের গঠনে দীপ্তি আছে, বড় বড় চোখ, টিকালো নাক, ধারালো ঠোঁট, রাগ বা ক্ষোভের রক্তোচ্ছ্বাসে মনে হয় শিখার মত জ্বলে উঠছে। লাবণ্য খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—সে অনেক কথা।

দালালগিন্নী আর কোন প্রশ্ন করেন নাই। তারপরও কয়েকদিন নিত্য দেখাশুনা হয়েছিল একই পথের এখানে বা ওখানে। দালালগিন্নী একই প্রশ্ন করেছেন—হেসে সস্নেহে প্রশ্ন করেছেন—কেমন সুবিধে হচ্ছে?

মেয়েটি কোনদিন বলত—হচ্ছে একরকম। কোনদিন চোখমুখ দীপ্ত করে বলত—ও সব জিজ্ঞাসা করে লাভ কি বলুন তো? কি বলব?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দালালগিন্নী প্রশ্ন করেছিলেন—কোথায় আছ আজকাল?

—প্রথম ওই কয়লার ডিপো করেন চিত্তবাবু। উনিই আমাকে এখানে একটা বস্তীতে আধাভদ্র আশ্রয় খুঁজে দিয়েছেন। ওই যে ওদিকে গয়লাদের বস্তী রয়েছে ওই গয়লাদের বস্তীতে রয়েছি। একটি বাঙালী ব্রাহ্মণের মেয়ে একজন হিন্দুস্থানীর সঙ্গে ঘরসংসার পাতিয়ে রয়েছে, ছেলে মেয়ে জামাই নিয়ে থাকে, তাদের বাড়ীতেই একখানা কুঠরী ভাড়া নিয়েছি। দেখেছেন বোধ হয় তাকে, খুব মোটা, গলায় সোনার হার, পোষাকে বিধবা, সকালে পিতলের বালতীতে দুধ নিয়ে যায়। সঙ্গে থাকে কয়েকটা বড় লোমওয়ালা ছাগল। ছাগলের দুধও বেচে থাকে।

দুগ্ধব্যবসায়িনী সম্পর্কে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে দালালগিন্নী তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—সময় করে একদিন আমার বাড়ী এসো না কেন? আসবে?

—আসব না কেন? আপনার সময় হলে আজই যেতে পারি।

—কাজের ক্ষতি হবে না?

—কাজ? হাসলে লাবণ্য। বললে—ঘরে থাকতে পারি না বলেই বাইরে বেরিয়ে আসি, বাইরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠি ঘরে যেতে ইচ্ছে করে। ঘরে গোয়ালিনীর সংসারের ঝগড়া—অশ্লীল কথা থেকে ঝাঁটা পর্যন্ত। বাইরে অভদ্র পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে পাশ ঘেঁষে যাবার ছলে মৃদুস্বরে অপমান—কখনও কখনও ইঙ্গিতময় স্পর্শ পর্যন্ত। কাজ পেলেও ঘরে থাকতে পারি না বলে কাজ শেষ হয় না, বাইরে ঘুরতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি বলে কাজ যোগাড়ও হয় না। বলে না—জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ—আমার সেই অবস্থা।

দালালগিন্নী তখনই তাকে নিয়ে ফিরলেন। লাবণ্য সেইদিনই এ বাড়ীতে এসেছে। লাবণ্যের ভাগ্যক্রমে তখন বাড়ীতে দুখানা ঘরের চত্বরটা খালিই ছিল। তারই একখানা ঘর তাকে দিয়ে বলেছিলেন—আমার ঘর দুখানা তো পড়ে রয়েছে, তুমি থাক। সঙ্গতি হলে ভাড়া দিও।

দালালগিন্নীর মমতা আন্তরিক। তিনি নিজে প্রথম জীবন থেকেই স্বাধীনভাবে ঘোরা-ফেরা করছেন—লোকচরিত্র তিনি জানেন এবং কথাবার্তা চালচলন থেকে ভালমন্দ তিনি বুঝতে পারেন, মেয়েটিকে তিনি অবিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু এই দুটি কারণেই তিনি লাবণ্যকে ঘরে স্থান দেন নাই। সম্প্রতি তিনি নিজের বিধবা কন্যাটি সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। পুত্রবধূটির নিজের অধিকার সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর আশঙ্কা হয়েছে। ভাবীকালে তাঁর অবর্তমানে বধূ পূর্ণ গৃহিণীত্বে আসীন হলে মেয়ের অবস্থা কি হবে এই চিন্তা তিনি না করে পারেন না। লাবণ্যকে তিনি নিয়ে এলেন, মেয়ে অমলাকে তার সঙ্গে জড়িয়ে দেবার জন্য।

মাসখানেক যেতে না যেতে লাবণ্য আর একটি বিধবা তরুণীকে নিয়ে এল, আরও কিছুদিনের মধ্যে এল আর একজন; তারপর কিছুদিনের মধ্যে এল আর একজন। তখন দুখানা ঘরই তারা ভাড়া নিলে—তারপর কিস্তীবন্দীতে কিনলে একটা সেলাইয়ের কল। ক্রমশঃ পিক্টোগ্রাফের সরঞ্জাম, পশম বোনার কুরুশকাঁটা, ব্যাগ তৈরীর চামড়ার উপর কারুকার্য করবার সরঞ্জাম এনে মাঝখানের ঘর ছেড়ে—রাস্তার দিকের দুখানা ঘর ভাড়া নিলে; এর জন্য প্রচলিত ভাড়ার উপর পাঁচ টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দিলে নিজে থেকেই। ক্রমে তিনজনের সঙ্গে আরও একজন এসে দল পুষ্ট করলে। দালালগিন্নীর মেয়ে অমলা ও চত্বরে থাকলেও সেও এখন এদের একজন। অমলার বড় মেয়ে রাণী বড় হয়ে উঠেছে, সেও কাজকর্মের অবসরে এখানে আসে, শেখে। কট্‌কট্‌ কট্‌কট্‌ শব্দে সেলাইয়ের কল চলে—মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলে, কাজের কথাই বেশী, মধ্যে মধ্যে হাস্য-পরিহাসও চলে। তার অধিকাংশই তাদের দৈনন্দিন কক্ষপথে আগন্তুক কোন বিভ্রান্ত পথিকের হুঁচোট খাওয়া বা পা পিছলে যাওয়া অথবা দুটি বিপরীত-মুখ বিভ্রান্তে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার কাহিনীকে

অবলম্বন করেই চলে। পরস্পরের প্রতি সরল বাক্যবাণও বর্ষণ করে। কখনও কখনও মৃদুহাস্য অকস্মাৎ কলহাস্যে ভেঙে পড়ে। মধ্যে মধ্যে বাইরের দরজায় কড়া নড়ে। ঝি দরজা খুলে দেয়, লাবণ্য উঠে যায় সামনের ঘরে। সামনের ঘরখানিতে একখানি লম্বা টেবিলের উপর কিছু কিছু সব রকম কাজের নমুনা সাজানো থাকে। খানচারেক সস্তা দামের চেয়ারও আছে। আগন্তুক অধিকাংশই দোকানের লোক; দোকানদারেরাই এখন এদের কাছে জিনিসপত্র নিয়ে থাকে। লাবণ্যই বেশীর ভাগ সময় কথাবার্তা বলে। মধ্যে মধ্যে আসে চিত্ত। কখনও কয়লার দাম, মুদীর দোকানের জিনিসের দাম নিয়ে যায়। কখনও নতুন অর্ডার আনে। কখনও এমনিই এসে বলে—একটু চা খাওয়াও লাবণ্যদিদি। কখনও এসে বলে—একটা ছোকরা ঘুরঘুর করছিল। ছোঁড়াটার কান মলে দিয়েছে মহাবীর। পার্সটাও কেড়ে নিয়েছে—সে কথাটা লাবণ্যকে অবশ্য বলে না। লাবণ্যও পুলকিত হয়। কখনও চিত্ত সংবাদ নিয়ে আসে, চোরাই ছিটের থানের নমুনাও বার করে দেয়।

কখনও কখনও আসে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে দুজন ভদ্রলোক, একজন প্রৌঢ় একজন তরুণ। এঁরা দুজনেই শিল্পী। ডিজাইন নিয়ে আসে। ব্লাউস, ফ্রক, সায়া, টেবিল ক্লথ, বালিসের ওয়াড়, বালিসের ঢাকা প্রভৃতির উপর কারুকার্যের নক্সার নমুনা।

অরুণা এদের মধ্যে এসে সমস্ত দেখে শুনে অবাক হয়ে গেল। অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত কল চলল, গল্প চলল। আজকের গল্প সবই অরুণাকে নিয়ে। অরুণাকে প্রশ্ন করছিল ওরা। কোন প্রশ্নের জবাব দিতে সঙ্কোচ বা দ্বিধা করলে তারা অসঙ্কোচে নিজেদের কথা বলে অরুণার সঙ্কোচ কাটিয়ে দিলে। গল্প বলা এবং শোনার মধ্য দিয়ে পরস্পরের কাহিনী শোনা হয়ে গেল। লাবণ্যদের এই বেঁচে থাকার টিঁকে থাকার বিস্ময়কর অথচ অতি সহজ দ্বন্দ্বের কথা শুনে অরুণা প্রায় অভিভূত হয়ে গেল। সে বললে—আপনাকে দিদি বলব ভাই লাবণ্যদিদি।

লাবণ্য বললে—ইচ্ছে বলে বলতে পারেন। আমরা কিন্তু এখানে ভাই সবাই সখী। প্রাণের কথা মনের কথা কারও কাছে কেউ গোপন করি না।

লাবণ্য হেসে বললে—তা হলে প্রাণের কথা বলি। আমি আপনার কাছেই থাকতে চাই।

লাবণ্য হাসলে।

অরুণা বললে—আপনার মনের কথা তো বললেন না?

লাবণ্য বললে—তুমি লেখাপড়া শিখেছ ভাই। তুমি কি দর্জির কাজ নিয়ে থাকতে পারবে? আর কেনই বা তা থাকবে। লেখাপড়া জানলে আমিই কি এই নিয়ে থাকতাম?

অরুণা হেসে বললে—আই. এ পর্যন্ত পড়েছি, এ কি লেখাপড়া জানা? তা ছাড়া—।

—তা ছাড়া?

—তা ছাড়া—একটু দ্বিধা করেই বললে অরুণা—লাবণ্যদি, আপনার রূপ আছে আপনি বুঝতে পারেন না—যাদের রূপ নেই তাদের লেখাপড়া জানলেও চাকরি পাওয়ার কত কষ্ট। কালো মেয়ের সঙ্গে লোক প্রেম করতে চায় কিন্তু বিয়ে—ওরে বাপ রে—কালো মেয়ে তখন কালনাগিনী হয়ে ওঠে তাদের চোখে। বলে, ওরে বাব্বা। কি চক্রান্ত! নাগপাশে জড়িয়ে ফেলে দংশাতে চায়।

তিনটি মেয়েই হেসে উঠল। লাবণ্য হাসল না।

অরুণা বললে—ও আমি মনে মনে স্থির করে ফেলেছি লাবণ্যদি। তবে যদি তাড়িয়ে দেন সে আলাদা কথা।

লাবণ্য বললে—ভেবে দেখ।

পরদিন সকালে উঠেছিল অরুণাই সকলের আগে। লেপের মধ্যে শুয়েই সে শিয়রের জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আজ বোধ হয় বাদলা কাটবে। কুয়াসা জমে উঠছে পৃথিবীর বুকে কিন্তু আকাশে মেঘ কাটা কাটা হয়ে দ্রুত ভেসে চলেছে। সে ভাবছিল গতরাত্রির কথা। রাত্রে ঘুমের মধ্যে মনের আবেগের ঘনত্ব অনেকটা লঘু হয়ে এসেছে। কয়েকদিন দুশ্চিন্তা এবং বিপদের আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছিল কাল। এখন ভাবছিল ভবিষ্যতের কথা। লাবণ্যের গতরাত্রির কথাটাই তার সত্য বলে মনে হচ্ছে। সারা জীবন সে এই দর্জির কাজ নিয়ে থাকবে কি করে? কেনই বা থাকবে?

ঠিক এই মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল লাবণ্য। স্মিত হাসিমুখে সে বললে—উঠেছ? রাত্রে ঘুম হয়েছিল?

হেসে অরুণা বললে—হয়েছিল। শরীরটা হাল্কা বোধ হচ্ছে।

লাবণ্য বললে— কাল রাত্রে ভেবে দেখলাম অরুণা। এখানে থাকাই তোমার ভাল। হোক না দর্জির কাজ! চাকরির চেয়ে অনেক ভাল। আর তোমাকে পেলে অনেক কাজ করতে পারব। বড় বড় সাহেবী দোকানে তুমি যদি আমাদের কাজ নিয়ে গিয়ে চালাতে পার—তবে আমরাই উন্নতি করতে পারব।

অরুণা তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, উত্তর দিলে না।

লাবণ্য বললে—মতের বদল করেছ না কি?

অরুণা বললে—বিমলবাবুর সঙ্গে আজ একবার পরামর্শ করব।

লাবণ্য—ওঁকে আজ ওবেলায় এখানে চায়ের নিমন্ত্রণ কর না। আমাদের এই সব দেখানোও হবে—পরামর্শ নেওয়াও হবে।

চার

মহানগরীর প্রভাত। আজকের সকালটি কুয়াসায় ঢাকা তীক্ষ্ণ শীতকাতর।

বিমল এরই মধ্যে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিল; এটি তার অভ্যাস। মহানগরীর এই নূতন অঞ্চলটিতে সমাজের নবোদিত অভিজাত বা আভিজাত্যের কোঠায় নূতন প্রমোশনপ্রাপ্ত শ্রেণীর সংখ্যাই বেশী। বনিয়াদী অভিজাত যাঁরা তাঁরা অনেক আগেই পুরাতন মহানগরীর শ্রেষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে বহুকাল আগেই এসে বাস করছেন। নূতন কালে ব্যবসায়ে, চাকরিতে অর্থ উপার্জন করে তার সঙ্গে নূতন কালের বাঙালী-জনোচিত সাহেবীয়ানা অর্থাৎ সস্তা মডার্ণ কালচার আয়ত্ত করে পুরানো কলকাতা থেকে সরে এসে উপনিবেশ স্থাপন করছেন। উপনিবেশ স্থাপনকর্তারা অধিকাংশই প্রৌঢ়—অনেকেই খেতাবধারী; রাজা, স্যার প্রভৃতি উপাধির সংখ্যা কম—রায়বাহাদুর অনেক। ডেপুটি, ডি-এস-পি, সাবজজেরা খেতাব এবং পেনসন নিয়ে এই উপনিবেশে সমাজপতি হয়ে রয়েছেন। বাত, ডিস্পেপসিয়া, এ দুটো রোগও তাঁদের মধ্যে খেতাব এবং পেনসনের মত সাধারণ। এর প্রতিকারের জন্য প্রাতর্ভ্রমণকারীর সংখ্যা অনেক। খোঁড়াতে খোঁড়াতে হন হন করে—একলা এবং দল বেঁধে লেক থেকে আরম্ভ করে পার্ক পর্যন্ত প্রাতর্ভ্রমণকারীর ভিড় জমে যায়। এঁদের উত্তরপুরুষ অর্থাৎ নবীনেরা পার্কে পার্কে টেনিস ক্লাব করেছেন: নিখুঁত পরিচ্ছদে তাঁরাও শীতের ভোরে একদফা টেনিস খেলেন। একটু রোদ চাড়া দিলে—খাস্বাদাওয়া সেরে পার্কে আসেন অন্য দল, তাঁরা খেলেন ক্রিকেট। থলে হাতে বাজারযাত্রী গৃহস্বামীদের সংখ্যা এখানে কম। যাঁরা আছেন তাঁরা বড় রাস্তা ধরে হাঁটেন না, গলিপথে হাঁটেন; দারিদ্র্যগত মানসিক জটিলতা ব্যাধিতে অধিকাংশই এঁরা ব্যাধিগ্রস্ত। অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশই বাজার করান চাকর দিয়ে, ভোজনবিলাস এবং কঠোর হিসাবীরা বাজারে যান চাকর সঙ্গে নিয়ে। কেউ কেউ যান মোটরে, তাঁরা লেকমার্কেট ছেড়ে যদুবাবুর বাজারেই যান।

যাক এত সব কথা। আজ কুয়াসা এবং শীতের জন্য প্রাতর্ভ্রমণকারীর সংখ্যা অনেক কম। কুয়াসার মধ্যে বিমলের কিন্তু ঘুরবার পথটা বেড়ে গিয়েছিল। নিয়মিত সে ওঠে মহানগরীর ঘুম ভেঙে হাঁক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। রাত্রি অবসানে মহানগরীতে জীবনের জাগরণ-সঙ্গীত পাখীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলেও শোনা যায় না, মহানগরীর নিজের ধ্বনি আছে। ধর্ম-জগতের সভ্যতায় হিন্দুরা বেদগান করতেন, ইসলাম জগতে আজান আজও ওঠে, মহানগরীর কালে—একসঙ্গে বাষ্প অথবা বিদ্যুৎচালিত বাঁশী বাজাতে থাকে। গঙ্গার বুকে, খিদিরপুর ডকে, গঙ্গার কূলে কূলে এপারে ওপারে মিলে মহানগরীর বুকের মধ্যে ছড়ানো ছোট বড় ফ্যাক্টরীতে বাঁশী বাজে। রাস্তার রাস্তায় কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা গাড়ীর চাকার লোহার হালের শব্দ ওঠে, ট্রামের ঘর্ঘরধ্বনি জেগে ওঠে, বড় বড় ট্রাক এবং মোটর বাসগুলির স্টার্ট নেওয়ার শব্দ ওঠে। মানুষের মধ্যে হোস পাইপ এবং মই কাঁধে ছুটতে থাকে কর্পোরেশনের উড়িয়া কর্মীর দল। রাস্তায় জল দেয়, আলো নিভিয়ে ফেরে। এ অঞ্চলে পথে গ্যাসলাইট

নাই বললেই হয় ; মই কাঁধে আলো নেভানো বড় একটা দেখা যায় না।

বিমল চলতে সুরু করেছিল। সময় সম্বন্ধে খেয়াল হল—কুয়াসা কেটে সূর্যের আলো উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে পরার পর। ফিরবার পথে 'দাদার দোকান', রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর উপরেই। এটি তার চা খাওয়ার আড্ডা। দাদা এ অঞ্চলে দোকানদার হিসাবে সর্বজন পরিচিত ; স্টেশনারী জিনিসের দাম যত বেশী, চা ও খাবার তেমনি অখাদ্য কিন্তু তবু দাদাকে অবহেলা করবার উপায় নাই, কারণ দু দিকে দুশো গজের মধ্যে আর কোন দোকান নাই।

দাদা বিমলকে চেনে লেখক বলে, যথাযোগ্য সমাদরও করে, নমস্কার জানিয়ে সম্মান জানায়, ভাল দেখে চেয়ারখানা এগিয়ে দেয়, দোকানের ছোকরাদের বলে—দেখিস, নিমকী বেছে দিস, চা যেন ভাল হয়। নইলে—। হাসতে সুরু করে দাদা—হেসে বলে—নইলে দেবেন কোন লেখার মধ্যে এইসা ঢুকিয়ে—বাপস্! তারপর একটু কাছে এগিয়ে এসে বলে —এ—মানে কে—যেন বলছিল, এই···বাবুকে নিয়ে কি একটা লিখেছেন!

—কই না তো! বিমল নিস্পৃহ ভাবেই বললে, সে জানে এই অন্তরঙ্গতার হেতু। এইবার এই অন্তরঙ্গতার সুযোগে মৃদুস্বরে সে বলবে—চা নিমকীর দামটা দিন তো দাদা··· রুটিওয়ালাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে—টাকা কিছু শর্ট আছে।

বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের দারিদ্র্যের খ্যাতি দাদার কাছে পর্যন্ত পৌঁচেছে। রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর উত্তরদিকেই অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রের মস্তবড় বাড়ী, তাঁর মোটরখানাকেও দাদা চেনে। কিন্তু শরৎচন্দ্র হিসেবে ভুল বলেই সকলে বিশ্বাস করে। ও কি রকম হয়ে গিয়েছে, নইলে লিখে টাকা হয়? দাদা এগুলি শিখেছে এ অঞ্চলের অভিজাত বাড়ীর ছেলেদের কাছে। যারা নাকি শরৎচন্দ্রের দর্জিপাড়ার দাদার বালীগঞ্জী সংস্করণ। সাহিত্য-সভা করে এরা সাহিত্যিকদের সভাপতি করে সম্মান দেয়, আবেগভরে আবৃত্তিও করে— 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান', আবার দরিদ্র সাহিত্যিকদের সম্পর্কে সাধারণ আলোচনায় বলে, ভ্যাগাবণ্ডস্ লোফারস্। মধ্যে মধ্যে দু'চারটে মিথ্যে গল্পও বানিয়ে ফেলে। বলে—আমাদের বাড়ী গিয়েছিল বাবার কাছে, টাকা ধার করতে। ফাদার সিম্প্লি বলে দিলেন—এই পাঁচটা টাকা দিচ্ছি ধার নয়, একেবারে। কারণ ধার দিলে আপনি শোধ দেবেন না এবং আপনার সঙ্গসুখ থেকে আমি বঞ্চিত হব। এমনি অনেক অনেক গল্প। দাদা সেইগুলি শুনেছে এবং সুকৌশলে দামটি আগে আদায় করে নেবার এই চতুর পন্থা আবিষ্কার করেছে। খেয়ে শেষ করে যদি লেখক মশাই বলেই বসেন—দামটা আজ রইল—তবে জামা টেনে ধরাটা সম্ভবপর হবে না। ধরলে, যে ছেলেরা ঐ সব গল্প করে তারাই দাদার উপর চড়াও হয়ে উঠবে। বিমল খাবারের দামটি—একটি সিকি—টেবিলের উপর রেখে দিলে বিনা বাক্যব্যয়ে। ছোকরাটাও এনে নামিয়ে দিলে নিমকীর ডিসটা।

রাস্তা দিয়ে হন হন করে হেঁটে চলেছেন বিখ্যাত প্রফেসার—একখানা বই বগলে নিয়েই প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। লোকের ধারে খুব মন্থর পদক্ষেপে বই পড়তে-পড়তেও তাঁকে বেড়াতে দেখেছে বিমল। পড়াটা তাঁর কৃত্রিম নয়—লোক-দেখানোও নয়—সে কথা বিমল জানে।

বাসায় ফিরে দেখলে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে দুটি গল্প লিখতে শুরু করেছে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, বিমলের ভক্ত। একটি ছেলের বাপ কোন জেলার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট—কলকাতায় বাড়ী আছে, অপরটি মেসে থেকে পড়ে। প্রথম ছেলেটি সাহিত্যিকদের সহিত সুপরিচিত হবার জন্য সাধ্যসাধনা করে সাহিত্যিকদের নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে আসে—চায়ে খাবারে আদরে—আপ্যায়িত করেন তার মা। ছেলের চেয়েও মা অনেক বেশী সাহিত্যানুরাগিণী, রোমাঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রত্যেক লেখকের লেখা পড়েন—কবিতা গল্প উপন্যাস—নাটক—সব—সব। সাহিত্যবিষয়ক সমালোচনাও পড়েন। তাঁরও অনেক অনুরোধ আজ পর্যন্ত অনেকবার এসেছে কিন্তু বিমল আজও তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই। ছেলে দুটিকে দেখে সে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। শুষ্ক কণ্ঠে বললে—কি খবর?

ছেলেটি হেসে বললে—আজ ওবেলা নির্মল রায় আসছেন—আপনাকে আজ যেতেই হবে, মা বলেছেন—

সঙ্গী ছেলেটি বললে—সুনীল একটা গল্প লিখেছে—পড়বে।

বিমল বললে—তোমার লেখাটা আমাকে দিয়ো, পড়ে দেখব কিন্তু যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে টেনে নিলে একটা ফাইবারের সুটকেস। এইটাই তার লেখার ডেস্ক। একসারসাইজ বুক তার উপরে রাখাই ছিল, পাশে ছিল দোয়াত এবং কলম। আজও ফাউণ্টেনপেন কেনে নাই বিমল। এদিক দিয়ে সে গান্ধীপন্থী। বিলাসের পর্যায়ে ফেলে সে ফাউণ্টেনপেনকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল লাবণ্য এবং অরুণা। স্মিত হাসিমুখে লাবণ্য বললে—লিখছেন?

বিমল মুখ তুলে তাকালে।

—একটু বিরক্ত করবো?

বাধ্য হয়ে বিমলকে আহ্বান জানাতে হল—আসুন।

সমস্ত ঘরটাই প্রায় খালি। আসবাবের মধ্যে একখানা ছোট—দুজন বসবার মত—পুরানো আমলের ভেলভেট-মোড়া কৌচ। এখানা চিত্ত জোর করে তাকে কিনে দিয়েছে—আলিপুরের নীলামী মালের আড়তদারদের কাছ থেকে ওই কৌচখানা আর একখানা ডেক চেয়ার।

ঘরের একদিকে তার সুটকেস আর ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের উপরেই থাকে তার বিছানা। মেঝেতে বিছানো থাকে একখানা মাদুর, তার উপরে বসে সে লেখে।

লাবণ্য বললে—আপনি নীচে বসবেন, আমরা কৌচে বসব এ কি হয়।

বিমল হেসে বললে—নিশ্চয় হয়—আপনারা অতিথি।

—না আমরা ভক্ত।

বিমল উঠে কোণে ঠেসানো ডেক চেয়ার টেনে পেড়ে নিয়ে বসে বললে—এইবার বসুন। বলুন কি খবর?

—আজ বিকেলে আমাদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।

গোড়া থেকেই বিমল মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিল। নিমন্ত্রণের কথায় তার অস্বস্তি ঘন হয়ে উঠল। বললে—হঠাৎ নিমন্ত্রণ কেন বলুন তো?

অরুণা বললে—আমার নিজের কিছু বলবার আছে আপনাকে, লাবণ্য দিদিদের অনেক কথা আছে। তা ছাড়া আপনাকে কিছুক্ষণ পেতেও চান নিজেদের মধ্যে।

একটু চুপ করে থেকে বিমল বললে—কথা যা আছে সে এখনই বলুন না। তার জন্য নিমন্ত্রণ কেন?

লাবণ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে। তারপর হঠাৎ বললে—আমাদের ওখানে যেতে আপনার কি সংকোচ বা আপত্তি আছে?

বিমল বললে—আপত্তি নেই কিন্তু সংকোচ থাকলেও কি আপনি রাগ করবেন। ওটা যে বুদ্ধিমানের ভূতের ভয়ের মত. যুক্তিবাদী বুদ্ধি বলে—ভূত নেই যখন তখন ভূতের ভয় কেন? মন বলে আমি নিরুপায়, ভয়টা মুলোর মত দাঁত মেলে কুলোর মত কান নেড়ে—তালগাছের মত লম্বা হয়ে খোনা গলায় হুঁ-হুঁ করে হাসছে, বুদ্ধি তোমার নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে।

অরুণা হেসে উঠল। লাবণ্যও না হেসে পারলে না।

বিমল বললে—আচ্ছা যাব। নিমন্ত্রণ নিলাম আপনাদের। কিন্তু কথাটা কি বলে রাখলে সুবিধা হত না? ভেবে রাখতে পারতাম।

—বল অরুণা। তোমার কথাতেই সমস্যা আছে। আমাদের কথায় সমস্যা নাই। আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের কথা বলব। সুখ নাই—দুঃখ। তবে দুঃখের মধ্যেও অনেক হাসির কথা আছে। সেটা চায়ের আসরেই হবে।

অরুণা বললে তার সমস্যার কথা।—কাল রাত্রে ওঁদের কথা শুনে—ওঁদের কাজকর্ম দেখে বলেছিলাম—লাবণ্যদি আমি আপনাদের মধ্যেই থাকব। লাবণ্যদি বলেছিলেন,—তুমি লেখাপড়া শিখেছ—গান গাইতে পার—তুমি এ দর্জির কাজ নিয়ে কেন থাকবে? আজ সকালে লাবণ্যদি বললেন—রাত্রে ভেবে দেখেছি তোমার এখানে থাকাই ভাল। কিন্তু সকালে উঠে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে লাবণ্যদি যা বলেছিলেন, তাই ঠিক। এ কাজ নিয়ে থেকে কি করব?

বিমল খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—কাল রাত্রে লাবণ্য দেবী যা বলেছিলেন, আজ সকালে আপনার মনে যা হয়েছে সেইটাই আমার মতে ঠিক।

লাবণ্যের চোখে এক বিচিত্র দৃষ্টি ফুটে উঠল। অস্বাভাবিক দীপ্তি তার মধ্যে। অরুণা তার দিকে তাকিয়ে একটু শঙ্কার সঙ্গেই ডাকলে—লাবণ্যদি!

লাবণ্য উত্তর দিলে না।

বিমল বুঝতে পারলে লাবণ্যকে। সে বললে—এই মহানগরীর জীবন—আমাদের সেকালের স্বপ্নে তুষ্টির জীবন নয়। মন্থর গতির জীবন নয়, দ্রুতগতির জীবন। কেরোসিন ল্যাম্পের জীবন নয়, ইলেকট্রিক লাইটের জীবন।

তারপর বললে—জানেন এককালে গান্ধীজীর আদর্শে অনুরাগী ছিলাম। ভাবতাম—গ্রামই একমাত্র সত্য, মহানগরীকে ভয় করতাম, মনে করতাম এই মহানগরেই হবে মানুষের সমাধি। আজ মনে হয়—এই মহানগরেই হবে মানুষের সাধনার সার্থকতা। সেকালে শ্মশানে যেমন হত সাধকের শক্তিসাধনার সিদ্ধি।

পাঁচ

নিমন্ত্রণটা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হল বটে কিন্তু মনে মনে বিমল অপ্রসন্নই হল। এই মেয়ে দুটির সঙ্গে এমন ভাবে চা মিষ্টান্ন সহযোগে আলাপ করতে মন যেন সঙ্কোচ অনুভব করছে। বাঙালী জীবনেরই এটা একটা জটিলতা! এই জটিলতা পশ্চিমবঙ্গের পল্লীসমাজে অত্যন্ত বেশী। আলোকপ্রাপ্ত সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অপেক্ষাকৃত সহজ মেলামেশা প্রচলিত হয়েছে বটে কিন্তু এই সমাজের লেখকদের লেখাতে দেখা যায় একটি তরুণ ও একটি তরুণী কোন একটি ঘটনার সুযোগে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলেই পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায়; আলাপ হবার অপেক্ষা! অর্থাৎ তাঁদের সমাজেও ঘি এবং আগুনের প্রবাদটা আজও সত্য। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে রক্তসম্পর্ককে বাদ দিয়ে বান্ধব ও বান্ধবী সম্পর্ক গড়ে তোলবার মত শিক্ষা ও রুচিকে মন দিয়ে আজও গ্রহণ করতে বাঙালী পারে নি। অথচ যে যুগে যে সভ্যতার ভিত্তিতে এই মহানগরী গড়ে উঠেছে তাতে স্ত্রী এবং পুরুষকে চলতে হবে কর্মপথে সহযাত্রিণীর মত, হাঁটতে হবে একই ফুটপাথে, মিলতে হবে একই কর্মক্ষেত্রে। যুক্তির দিক দিয়ে বিমল ঐ কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে কিন্তু মানতে পারে না। শিক্ষা এবং সংস্কারের দ্বন্দ্বে আজও তার সংস্কার এক্ষেত্রে প্রবলতর।

হঠাৎ তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। এসে উপস্থিত হল বন্ধু নীরেন। শ্রী নামক মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। এরই মধ্যে তার স্নান আহার সব সারা হয়ে গেছে, আপিস চলেছে। কাগজ বের হবে, আর মাত্র কয়েকদিন আছে। কাজের চাপ এখন বেশী। বিমল তাকে দেখে খুশী হল। মনে মনে সে যেন তাকেই কামনা করছিল।

নীরেন ধপ করে সেই ভাঙা সোফাটায় বসে পড়ে বললে—লেখা আছে? ভাল গল্প—খুব ভাল গল্প?

—গল্প কি হবে?

—চাই। খুব ভাল গল্প।

—কেন? এ মাসে তো রমেন বসুর গল্প দেবার কথা।

একটু চুপ করে থেকে নীরেন বললে—রমেনকে তো জানিস নে। লেখা শেষ করতে পারবে না জানিয়েছে। দিতে পারবি?

একটু ভেবে বিমল বললে—গল্প একটা ভেবে রেখেছি। চেষ্টা করে দেখতে পারি। রমেনবাবুর একটা গল্প পড়েই লেখার ইচ্ছে হয়েছিল। অভিজাত বংশ নিয়ে রমেনবাবু গল্প লিখেছেন। আমার ভাল লাগে নি, এদেশের অভিজাতের জাতকে রমেনবাবু জানেন না।

আবার একটু হেসে বললে—নীলরক্ত শব্দটা ব্যবহার করেছেন। Blue blood হয়তো ওদেশের অভিজাতদের শিরায় বয়ে থাকে, আমাদের দেশে কিন্তু নীলরক্ত চলে না।

—তবে বসে যা লিখতে। আমি রাত্রে আসব। উঠলাম।

নীরেন উঠল। বিমল খাতা-কলম টেনে বসল। কিন্তু কয়েকমিনিট পরেই নীরেন আবার ফিরল। বললে—তোকে সত্যি কথাটা বলে যাই। রমেন গল্প দিয়েছে কিন্তু সে গল্প পছন্দ হয় নি সুরেশবাবুর। আমি বললাম—বিমলকে বলে দেখতে পারি যদি বলেন। খানিকটা ভাবলেন—ভেবে সুরেশবাবু বললেন, দেখতে পার। ও পারতে পারে। ওর স্টাইল ভাল নয় কিন্তু ওর বলবার কথা অনেক আছে। ভরসা সেইখানে।

মহানগরী কলকাতার এক প্রাচীন অভিজাত বংশীয়ের প্রায় দেড়শো বছরের পুরানো বাড়ী। নূতন কালের রাস্তা এবং আশপাশের জমি বাড়ীর উঠান থেকে হাত দুয়েক উঁচু হয়ে উঠেছে। চকমিলানো বাড়ী। দোতলার কাঠের বারান্দায় কাঠের রেলিং। পর পর তিনটি মহল। বড় হলে পুরানো আমলের ভারী আসবাব। মেঝেতে পাতা কার্পেটের পশম উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সুতোর দড়ির বুনুনী, তারও মধ্যে মধ্যে ছিঁড়ে গিয়েছে। কড়ি বর্গায় দীর্ঘকাল রং পড়ে নি, বহুকালের ক্ষয়ে যাওয়া দুচারখানা কড়ি ফেটে নুয়ে পড়েছে। কতগুলো টালি ভেঙে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ছাদের জমানো খোয়ার দৃষ্টিকটু চেহারা। পলেস্তারা খসে গিয়েছে বহুস্থানেই। দেওয়ালে ফাটল ধরেছে; জানালা দরজাগুলোর খড়খড়ি ভেঙেছে, কব্জা খসেছে। ওই দেওয়ালের ফাটল এবং জানালার ভাঙা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে হু-হু করে। বর্ষার রাত্রি, বাইরে মৃদু বর্ষণের সঙ্গে উতলা বাতাস বইছে প্রবল বেগে! সেই বাতাস ঢুকছে ঘরে—শিসের মত শব্দ করে। কড়িতে বাঁধা লোহার শিকল এবং হুকে ঝুলানো পুরানো কালের কয়েকটা ঝাড়লণ্ঠন সেই বাতাসে দুলছে, কলসে কলসে আঘাত খেয়ে টুং টাং শব্দ উঠছে। এই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সে শব্দ শুনে মনে হবে, কে যেন গুন্ গুন্ করে এক অতি করুণ বিষণ্ণ সঙ্গীত গেয়ে চলেছে।

ঘরে জ্বলছে একটি কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প, চিমনীর মাথাটা ভাঙা এবং কালো হয়ে উঠেছে শিখার কালিতে। পুরানো আলো। কলের দোষে—পলতের জীর্ণতা এবং অপরিচ্ছন্নতার জন্য শিখায় কালি উঠেছে। এত বড় হলে ওই একটা দশবাতির জোরের লালচে আলো—অপর্যাপ্ত এবং অস্পষ্টতার জন্য কেমন একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে। এই আলোর অস্পষ্টতার মধ্যে ঘরখানার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক দীর্ঘাকৃতি শীর্ণ মানুষ; খাঁড়ার মত নাক, আয়তচোখে বিহ্বল উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি ঘুরছেন; দেহের বর্ণ পাংশু পীতাভ; কবরের পাথরের আবেষ্টনীর তলায় যে ঘাস তার রঙের সঙ্গে এ রঙের তুলনা দেওয়া যায়। লালচে দশবাতির আলো তাঁর মুখ এবং অনাবৃত হাত দুখানির উপর পড়ে ম্লান মনে হচ্ছে। মাথার চুল নাই, টাক পড়েছে; পিছনে পাশে স্বল্প-খুঁটিয়ে ছাঁটা চুল—মূর্তিটির উপর সব চেয়ে বড় মহিমা আরোপ করেছে।

বহু বিভক্ত এই বাড়ীর সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ইনি। আজই এটর্ণির আপিসে গিয়ে এই

বাড়ীর বিক্রী কোবালায় সই করে এসেছেন। কিনেছেন এক মিলওয়ালা। জীবন আরম্ভ করেছিলেন তিনি ভাঙা লোহার টুকরো কুড়িয়ে। এই বাড়ী ভেঙে নতুন বাড়ী করবেন তিনি। ফ্ল্যাট সিস্টেমে ভাগ করে পাঁচতলা বাড়ী।

না বিক্রী করে উপায় ছিল না। কয়েকজন অংশীদার অনেক আগেই তাদের অংশ এঁকেই বিক্রী করেছে। অন্তদিকে তাঁদের দেনাও হয়ে উঠেছে আকণ্ঠ, চিন্তায়, তাগাদার অপমানে শ্বাসরোধ হয়ে আসছে।

আর কিসের জন্য কার জন্য এই ভগ্ন প্রাসাদকে ধরে রাখবেন? ছোট ভাই ব্যারিস্টার হয়ে এসে—মেম বিয়ে করে—রেস এবং মদের দেনায় তলিয়ে গিয়েছে। তাঁর বড় ছেলে জোচ্চোর, সে তার বংশের দান দেহমহিমা এবং রূপকে মূলধন করে দেশে দেশে জাল রাজা সেজে প্রতারণার ব্যবসা ফেঁদে বেড়াতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে রয়েছে। মেজ ছেলে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ীতে বাস করছে, ধনী পিতার একমাত্র কুরূপা কন্যাকে বিবাহ করে আত্মরক্ষা করেছে! ছোট ছেলেটার ভরসা তিনি করেছিলেন। বংশোচিত দীর্ঘ অগ্নিশিখার মত চেহারা, প্রদীপ্ত বুদ্ধি, উজ্জ্বল ছাত্রজীবন—মিহিরকে দেখে তাঁর ভরসা হয়েছিল মনে। কিন্তু মিহির নেমেছে পথের ধুলোয়, কংগ্রেসী ঝাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে—চীৎকার করে হেঁটে চলে ধর্মঘটী মজুরদের শোভাযাত্রার পুরোভাগে। পূর্বপুরুষদের গাল দেয়। বলে—'ইংরেজ রাজত্ব যারা কায়েম করেছিল, বিদেশী বানিয়াদের বেনিয়ানি করে, তাদের অবস্থার দিকে চেয়ে দেখ, ভাঙা জাহাজের মত পুরোনো—পড়ো-পড়ো বড় বাড়ীগুলোর দিকে চেয়ে দেখ; তারা মরছে। তাদের জায়গা দিয়ে উঠেছে—নতুন বানিয়াদের দল।'

তিনি হাসেন—বিষণ্ণ হাসি।

অক্ষম উচ্চাভিলাষী ক্রোধ! কিন্তু মিহিরের লজ্জা হয় না—ওই হতভাগ্য নোংরা ছোটলোকদের সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়াতে?

মধ্যে মধ্যে পুলিস আসে। প্রথম যেদিন পুলিস আসে মিহিরের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে সেদিনের কথা তাঁর মনে আছে। অক্ষয় হয়ে আছে তাঁর স্মৃতির মধ্যে। চার বছর আগে দিল্লী থেকে এসেছিল এক ভারত-বিখ্যাত বাঈজী। প্রৌঢ়া বাঈজী, স্থূলতায় মেদবাহুল্যে তার মুখের দিকে চাওয়া যায় না। তিনি চোখ বুজে বসে এই ঘরেই গান শুনছিলেন। অল্প কয়েকজন বন্ধুও ছিলেন নিমন্ত্রিত। ঝাড়লণ্ঠনে সেদিনও জ্বলছিল বিজলী বাতি। এক একটি ঝাড়ে প্রায় দুশো আড়াইশো বাতির প্রভা। তিনটে ঝাড় জ্বলছিল। বেহাগ আলাপ চলছিল। অপূর্ব সে রাগিণীর আলাপ; প্রৌঢ়া বাঈয়ের কণ্ঠের স্বরমাধুর্য, সেই মাধুর্যের সঙ্গে সুদীর্ঘ সাধনার অপরূপ কারুকৌশল। হঠাৎ এল চাকর। কানে কানে এসে বললে—ডাকছেন জ্ঞাতি ভাই, পুলিস এসেছে নীচে। চমকে উঠলেন। ইচ্ছে হল চাকরটাকে গুলি করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে বললেন—বসতে বলো, গান শেষ হোক, যাচ্ছি।

হঠাৎ দমকা বর্ষার বাতাসের একটা ঝটকায় সশব্দে একটা জানালার একখানা ভাঙা কাচ

কাঠ ছেড়ে ছিটকে পড়ল ; সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল আলোটা। তিনি বিরক্ত হয়ে সুইচবোর্ডের স্থানটার দিকে পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তিন মাস আগে অর্থাভাবে ইলেক্‌ট্রিক কনেকশন কেটে দিয়েছে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

নীচে একটা ঘোড়া মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে উঠছে। বুড়ো ঘোড়াটা আজও রেখেছেন তিনি। আর আছে ভাঙা ব্রুহাম একখানা। আস্তাবলের দরজায় তেরপলের পর্দা ছিঁড়ে গিয়েছে ; নতুন কেনার সামর্থ্য নাই ; জলের ছাটে বাতাসের দমকায় কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়। বাড়ীতে বন্দুক একটা আজও আছে। কার্টিজ নাই। থাকলে আজ ওটাকে গুলি করে মেরে নিশ্চিন্ত হতেন তিনি। আজ এই মুহূর্তে তিনি নিশ্চয় মারতে পারতেন।

বাইরে শব্দ উঠছে সিঁড়িতে। বেশ জোয়ান মানুষের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের শব্দ। কাঠের সিঁড়ি কাঁপছে। বুঝেছেন তিনি কে এল এই দুর্যোগের মধ্যে। হ্যাঁ সে-ই। বাইরের বারান্দায় মৃদু কম্পন উঠছে। তিনি ডাকলেন—মিহির!

—বাবা! এ কি—আলো নিভে গেছে? ফস করে দেশলাই জ্বাললে মিহির।

তাঁর ইচ্ছা হল চীৎকার করে ওঠেন, কিন্তু সে অভ্যাস তাঁর নয়, মুহূর্তে নিজেকে সম্বরণ করে মৃদুস্বরে বললেন—না।

—আলো জ্বাল্‌ব না?

—থাক।

বিমলের লেখায় বাধা পড়ল। ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল একটি দীর্ঘ বলিষ্ঠ যুবক। তার দিকে তাকিয়ে বিমল চমকে উঠল। তার গল্পের মিহির—রক্তমাংসের দেহ নিয়ে তারা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। মিহির তার কল্পনার মানুষ নয়। সত্যকারের মানুষ। তাদের বাড়ী তাদের ইতিবৃত্ত তার বাপও সে বাস্তব সংসারের জীবন্ত মানুষ। তাদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তার মামার বাড়ীর সঙ্গে এদের সম্বন্ধ ছিল। তা ছাড়া রাজনৈতিক জীবনে যে দলের সঙ্গে একদা জড়িত ছিল, মিহির আজ সেই দলের সভ্য। পুরাতন দলের আদর্শবাদে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। নেতাদের একজন ছাড়া অন্যেরা আজ নানা দলে মিশে গেছেন।

মিহির বললে—গোপেন দাদা আপনার কাছে পাঠালেন।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ।

বাইরে থেকে নারীকণ্ঠে কেউ ডাকলে—বিমলবাবু! সঙ্গে সঙ্গেই সামনে এসে দাঁড়াল—লাবণ্য।

বাইরে বেলা পড়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে আলো কম হয়েছে। মিহির সুইচটা টিপে আলো জ্বাললে।

আর কেউ আসছে। ভারী পায়ের শব্দ উঠছে। ভ্রূ কুঁচকে বিমল প্রতীক্ষা করে রইল।

লাবণ্য সঙ্কুচিত হয়ে একটু সরে দাঁড়াল।

—বিমলদা! কাকে এনেছি দেখুন। চিত্তরঞ্জন এসে দাঁড়াল। তার পিছনে এসে দাঁড়াল তার গ্রামবাসী, প্রায় সমবয়সীও, কালীনাথ—কলকাতার আই-বি অফিসার।

ছয়

খাস বিলিতী পদ্ধতিতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অনুকরণে তৈরী—সার চার্লস টেগার্টের হাতে গড়া—বাংলাদেশের ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের পুলিস বাহিনী। অদ্ভুত শক্তিশালী এবং তেমনি কার্যদক্ষ। কর্মচারীগুলির মন এবং মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন যন্ত্রের মত কাজ করে যায়। কালীনাথ কেন্দ্রীয় আই-বি-তে পূর্ববঙ্গের একটা জেলার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর। ওই জেলাটির সঙ্গে এখানকার যোগসূত্র রাখাই তার কাজ—এবং ওই জেলার যে সমস্ত বিপ্লববাদী কলকাতায় থাকে বা আসে-যায় তাদের কার্যকলাপের সন্ধান রাখাই তার ডিউটি। ওই জেলার সঙ্গে সংস্রবহীন কলকাতার দলের কর্মীদের চেনা বা জানার কথা তার নয়। মিহির যে দলের অন্তর্ভুক্ত সে দলের কর্মক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার মধ্যেই আবদ্ধ। দলটি ভেঙে-ভেঙে এখন অত্যন্ত একটি ছোট দলে দাঁড়িয়েছে, কর্মী হিসাবে মিহিরও নূতন, বাংলাদেশের পুলিসেরা যাকে বলে পুরনো পাপী—সে গৌরবজনক আখ্যা লাভ করতে এখনও পারে নি। মিহিরকে দেখে তবু কালীনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

বিমল মিহিরকে বললে—বলবেন আমি দেখা করব।

মিহির কালীনাথকে সন্দেহ করে নাই। সে বললে—আমাকে কিন্তু বলেছেন—সঙ্গে নিয়ে যেতে।

—কিন্তু—। বিমল একটু দ্বিধা করলে, লেখাটা শেষ করতে হবে। কালীনাথ দাঁড়িয়ে আছে—লাবণ্য দাঁড়িয়ে আছে, সে ফিরে তাকালে পিছনের দিকে যেখানে লাবণ্য দরজার পাশে দেওয়ালের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কালীনাথ হঠাৎ মিহিরকে প্রশ্ন করলে—আপনার নাম মিহির বোস না? দর্জিপাড়ার কার্তিক বোসের ছেলে?

মিহির একটু বিস্মিত হয়েই উত্তর দিলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কালীনাথ এবার প্রশ্ন করলে—ও মেয়েটি কে? উনিও বুঝি—

বিমল মধ্যপথেই বাধা দিয়ে বললে—থামো কালীদা। এ ছাড়া আর কথা খুঁজে পেলে না।

চিত্ত তাড়াতাড়ি বললে—উনি আমাদের পাড়ারই মেয়ে, এখানে একটি সমিতি করেছেন, কয়েকজন মিলে। তাই দেখাবার জন্য বিমলদাকে চায়ের আসরে নেমন্তন্ন করেছেন।

—ডাকতে এসেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। লাবণ্য এবার দেওয়ালের কাছ থেকে সরে এসে সকলের সামনাসামনি দাঁড়াল।

বললে, আমি যাই। উনি তো এখন খুব ব্যস্ত আছেন।

কালীনাথ না থাকলে বিমল এতে নিষ্কৃতি পেল বোধ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলত—সঙ্গে সঙ্গে একটু বেদনাও হয়তো অনুভব করতো এইমাত্র। কিন্তু কালীনাথের সন্দিগ্ধ হাসির রেখা তাকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তুললে, সে বললে—দাঁড়ান, আমি যাব আপনার সঙ্গে। ফিরে সে মিহিরকে বললে—আমি আপনার সঙ্গেই যেতে পারি, যদি আপনি একটু অপেক্ষা করেন। মানে এঁদের এখানে চা খেয়ে যাব আমি। আপত্তি যদি না থাকে তবে আমার সঙ্গে আসুন—চা খাবেন।

মিহির একটু হেসে বললে—চলুন।

বিমল কালীনাথকে বললে—আমায় যেতে হবে-কালীদা।

কালীনাথ কিছু বলবার পূর্বেই চিত্ত বললে—আপনি যান, আমি ঘরে তালা দিয়ে যাব। কালীদা একটু বসবে এখানে। আমার ওখানটা তো খোলা মাঠ। এরপর খুব কাছে সরে এসে—ফিস-ফিস করে বললে—কালীদাকে একটু বিয়ার খাওয়াব।

বিমল কোন উত্তর দিল না, প্যাসেজটা অতিক্রম করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। লাবণ্য এবং মিহির তার অনুসরণ করলে।

আহারের পরিচর্যার পারিপাট্য হোটেলেও থাকে, বরং হোটেলে যে পারিপাট্য সম্ভবপর সে পারিপাট্য অন্তত কোন সাধারণ বাড়ীতে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যে নিষ্ঠা এবং মমতার স্পষ্ট পরিচয় মেয়েদের হাতে বাড়ীর আয়োজনে পাওয়া যায়—পারিপাট্য সত্ত্বেও হোটেলে তা পাওয়া অসম্ভব। বিমল বিস্মিত হয়ে গেল—এখানে যেন দুয়েরই সমন্বয় হয়েছে। টেবিলের উপরে ধবধবে সাদা চাদর, জানালাগুলিতে সাদা পর্দা, দেওয়াল ঘেঁষে তক্তপোষ একখানি, তার উপরে ধবধবে সাদা চাদর বিছানো, টেবিলের উপরেও কাচের গ্লাসে টকটকে লাল সাটিনের তৈরী ফুল, ফুলগুলির চারিপাশে সবুজ সাটিনের পাতা; দেওয়ালের কোনখানে কোন ছবি বা ক্যালেণ্ডার নাই, সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটি শুভ্র শুচিতা যেন ঝলমল করছে ঘরখানির মধ্যে। ঘরে ঢুকে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিমল বললে—বাঃ!

একটু স্মিত হাসি ফুটে উঠল লাবণ্যের মুখে।

মিহিরও বললে—সুন্দর!

লাবণ্য বললে—আধঘণ্টা সময় দিতে হবে অন্তত। খাবার তৈরী করতে পনের মিনিট, আপনারা বসুন। আমি বসলে তো চলবে না। খাবারগুলো ভেজে নিই। আমি বরং অরুণাকে পাঠিয়ে দিই। লাবণ্য চলে গেল ভিতরে।

বিমল তার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল; মনে হল এই শুভ্রশুচি ঘরখানির একটা অংশ যেন ঘরখানাকে অঙ্গহীন করে দিয়ে চলে গেল! লাবণ্যের পরিচ্ছদের মধ্যেও এই শুভ্রতার দীপ্তি, গায়ে তার ফুলহাতা সাদা লংক্লথের ব্লাউজ, পরণে ধোয়া থান কাপড় সে যেন এই ঘরখানির মর্মকথার মত ঘরখানিকে মুখর করে সজীব করে রেখেছিল। বিমল প্রসন্ন পরিতৃপ্তচিত্ত নিয়ে বসল। মিহিরও বসল।

মিহির বললে—ইনি কে? চমৎকার রুচি।

বিমল উত্তর দেবার পূর্বে অরুণা এসে ঘরে ঢুকল। বিমল তাকে সম্বর্ধনা করে বললে—আসুন।

অরুণা একটু হেসে নমস্কার করে বললে—লাবণ্যদি বললেন, আপনি চলে যাবেন এখুনি।

—হ্যাঁ। জরুরী তাগিদ রয়েছে। ইনি এসেছেন তাগিদ নিয়ে। এঁর সঙ্গেই যেতে হবে। বসুন আপনি।

অরুণা বসল না। টেবিলের প্রান্তভাগটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন কিছু চিন্তা করছে অথবা কিছু বলতে চাচ্ছে। বিমল তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব অনুমান করে, সঙ্কোচ কাটাতে সাহায্য করবার জন্যেই প্রশ্ন করলে—কি ঠিক করলেন?

অরুণা জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। কোন উত্তর দিলে না। মিহির বললে—কোন কথা যদি থাকে বিমলবাবু, আমি একটু না হয় বাইরে যাই।

বিমল সঙ্কোচ অনুভব করলেও অরুণা সঙ্কুচিত হল না, তার মুখে চোখে বরং উৎসাহের একটি চকিত দীপ্তিই ফুটে উঠল; তারপরই সে বললে—পাঁচ মিনিট। মিহির বাইরে যেতেই সে চেয়ারে বসে পড়ে বললে—সারাদিন আমি ভেবে দেখলাম বিমলবাবু এখানে এইভাবে আমি—। বক্তব্যের শেষ অংশটুকু সে অসম্মতির ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে—না। না, সে হয় না।

একটু চুপ করে থেকে বিমল বললে—কিন্তু কি করবেন?

অরুণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর বললে—আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন না? ফিল্মে কি গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গান দেবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না?

—না। বিমল ঘাড় নেড়ে কায়মনোবাক্যে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললে—না। একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে—ফিল্মে যদি ঢুকতে চান—তবে সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দিলেন কেন? রতনবাবুর মত নামকরা ফিল্ম এক্টরের সঙ্গে আলাপ রাখলে—যে কোন মুহূর্তে আপনি কন্ট্রাক্ট পেতে পারেন।

অরুণা চমকে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেল বিমল—চমকানির সঙ্গে মেয়েটির সর্বশরীর শিউরে উঠল। ঠিক এই মুহূর্তে গলার সাড়া জানিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মিহির। বলল—বাধ্য হয়ে বাধা দিলাম আপনাদের কথায়। বাইরে একটি লোক ঘুরছে—উঁকি মেরে আপনাকে দেখলে কয়েকবার। অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হল।

বিমলের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। কালীনাথের কথা মনে হল। সে কি এরই মধ্যে স্পাই লাগিয়ে দিলে তার উপর। কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? এই মুহূর্তে স্পাই—? সে উঠে দাঁড়াল—বললে—কোথায়?

বেরিয়ে এসে সে দরজায় দাঁড়াল। একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের লোক—কিংবা তার চেয়েও কম বয়স হতে পারে কিন্তু যুবক বলা চলে না, দাঁড়িয়ে আছে। কোল-কুঁজো, শীর্ণ, পরনে ময়লা কাপড়, ময়লা একটা জামা, ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, মাথায় লম্বা ঝাঁকড়া একমাথা রুখু চুল, মুখে গোঁফদাড়ি অল্প, কিন্তু তাও খোঁচা খোঁচা হয়ে বড় হয়ে শ্রীহীন লোকটিকে

আরও বিশ্রী করে তুলেছে, চোখে পুরু লেন্সের একটা চশমা—লোকটিকে দেখলেই মন কেমন বিরূপ হয়ে ওঠে। ভীরু অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা বললে—আমি লাবণ্য দেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—কি নাম আপনার? কি দরকার আপনার?

—কে? পিছনে ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন করলে লাবণ্য।

বিমল মুখ ফিরিয়ে দেখলে লাবণ্য এরই মধ্যে খাবারের থালা হাতে ঘরে এসে ঢুকেছে। সে বললে—একটি লোক আপনাকে খুঁজছে। দরজার মুখটা ছেড়ে সরে দাঁড়াল বিমল। খোলা দরজার পথে ওই কুৎসিত অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিটিকে দেখে লাবণ্যের মুখ প্রসন্ন হাসিতে স্মিত হয়ে উঠল—কয়েক পা এগিয়ে এসে সে সস্নেহ সম্ভাষণ জানিয়ে বললে—পিনাকী? এস—এস!

অপ্রতিভের মত হেসে পিনাকী বললে—হ্যাঁ। নমস্কার করলে সে।

লাবণ্য তাকে প্রতিনমস্কার করলে না। আবার বললে—এস। ভেতরে এস।

—যাব? এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হয়ে যাক।

—না-না। কথাবার্তা নয়, খাওয়া-দাওয়া। এঁদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছি। এস, তুমিও এস। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন সাহিত্যিক বিমলবাবু। ইনি এঁর বন্ধু। আর ইনি হলেন পিনাকী ঘোষ, শিল্পী একজন। আমাদের খুব উপকারী বন্ধু। আমাদের ফ্রক ব্লাউস বেডশীট বালিশের ওয়াড়ের ওপর ডিজাইন এঁকে দেন। ভারী চমৎকার ডিজাইন করেন। ছবিও আঁকেন খুব সুন্দর।

অপরাধীর মত পিনাকী বললে—আমার একখানা ছবি 'বঙ্গভূমি' মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছিল। কিন্তু নতুন আর্টিস্টের অসুবিধে তো জানেন; মানে নতুন কিছুকে সহজে তো লোকে নেয় না। তারপর অপ্রতিভের মত হেসে বললে—খুব গরীব আমি। বেঁচে থাকতে হবে তো। তাই কমার্শিয়াল আর্ট করছি সঙ্গে সঙ্গে। এঁরা কিছু কিছু ডিজাইন নেন—

লাবণ্য বাধা দিয়ে বললে—সব ডিজাইনই তো তোমার। এবার মেঘ-বিদ্যুৎ ডিজাইনটা খুব ভাল হয়েছে, খুব আদর করে নিয়েছে দোকানদারেরা।

হাসতে লাগল পিনাকী।

—বস—খাও। বসুন বিমলবাবু, আপনিও বসুন। বড় একটা থালা থেকে গরম নিমকী সে কাচের প্লেটে পরিবেশন করতে লাগল। বিমল বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিল পিনাকীকে। পুরু লেন্সের ভিতরে চোখদুটিকে ঠিক ঠাওর করা যায় না, তবুও সমস্ত কিছু মিলিয়ে পীড়িত অপরিচ্ছন্ন মলিন অবয়ব এবং বেশভূষার মধ্যে একটি উদাসী অথবা উপবাসী মানবাত্মা যেন উঁকি মারছে ওই দৃষ্টির মধ্য দিয়ে। বাইরের অপরিচ্ছন্নতা এবং ভঙ্গির এই দীনতার জন্য লোকটির উপর ঘৃণা বা বিরক্তি অর্থাৎ একটা বিরুদ্ধ ভাব মানুষের মনে জাগবেই —তবুও লোকটির জন্য অন্তর করুণায় ভরে উঠবে।

লাবণ্য বললে—খান।

পিনাকী চোখ বন্ধ করে গব্ গব্ করে খাচ্ছে। বিমল হেসে একখানা নিমকী মুখে তুললে। লাবণ্যের একজন সহকর্মিণী একটা থালায় গরম সিঙাড়া ভেজে নিয়ে এল।

লাবণ্য বললে—এ আমাদের মলিনা। বানে ভেসে চারটি কুটো আমরা চরে এসে একসঙ্গেই ঠেকেছি, মলিনা—আমাদের এক কুটো। তারপর অরুণার দিকে তাকিয়ে বললে—পঞ্চম কুটো আমাদের অরুণা; কিন্তু ও এখনও দুলছে, একটা চরের কুটোর সঙ্গে আটকেছে, অন্য মাথাটা স্রোতের টানে ছুটতে যাচ্ছে। কি হল?

এতক্ষণে পিনাকী চোখ খুলে অরুণার দিকে তাকালে—বললে—এঁর কথা বলছেন বুঝি? ঘাড় ঝুঁকে সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার দিকে পুরু লেন্সের মধ্য দিয়ে।

অরুণার মুখ লাল হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল। লাবণ্য বললে—পিনাকী, তোমার সহজ বুদ্ধি কখনও হবে না। এমন করে কি দেখছ তুমি?

পিনাকী বললে—দেখছিলাম, বলে সে থেমে গেল, তারপর অপ্রতিভের মত বললে—মানে, মনে হল ওঁকে যেন কোথায় দেখেছি। আবার একটু থেমে বললে—জানেন, আমার আঁকা বিজ্ঞানের একটা ছবি আছে, খুব বিষণ্ণ মেয়ের মুখের ছবি, বন্ধ্যা মেয়ে আর কি; সেই ছবির মুখের খুব মিল আছে। তাই মনে হচ্ছিল—চেনা মুখ। আবার একটু ভেবে বললে—ছেলেবেলায় আমার এক দিদি মারা গেছেন, বিজ্ঞাপনে এসেছিল দিদির মুখ। দিদির মুখের সঙ্গে ওঁর মুখের মিল রয়েছে আর কি। এবার বেশ বুদ্ধিমানের মত খানিকটা হাসলে সে।

এবার চা নিয়ে এল চরে ভেসে এসে লাগা আর দুটি কুটো। তাদের পিছনে দরজার ওপাশে এসে দাঁড়াল বাড়ীর মালিক দালালগিন্নী এবং তার মেয়ে। লাবণ্য পরিচয় করিয়ে দিলে। বিমল কিন্তু কথা বাড়াল না। বললে—আজকে কথাবার্তার সুবিধে হল না। আমার জরুরী কাজে এক জায়গায় যেতে হবে। কথার শেষে সে হাত জোড় করলে।

লাবণ্য হেসে বললে—আমাদের আর কথা কি? আপনারা মানী লোক, অনেক বড়-লোকেরা আপনাদের কথা শোনে। একটু বলে দেবেন আমাদের এখানকার কথা। একটু বিজ্ঞাপন আর কি। কথা ছিল অরুণার। ওর কথা শেষ হয়েছে?

বিমল বললে—হ্যাঁ। আমার যা বলবার আমি বলে দিয়েছি। আচ্ছা আসি। চলুন মিহিরবাবু।

সত্যই তো, আর কি বলতে পারতো বিমল। করুণার্দ্র হয়ে অরুণাকে নিয়ে ফিল্মওয়ালা বা গ্রামোফোন কোম্পানীর দোরে দোরে ঘুরতে পারতো। নিজেকে বিপন্ন করে নিজের উপার্জন থেকে কিছু কিছু সাহায্য করতে পারতো যতদিন না সে নিজে উপার্জনে সক্ষম হয়। অর্থাৎ সাময়িকভাবে সে নিজেকে জড়াতে পারতো অরুণার সঙ্গে। নিজের জীবনের যাত্রাপথে গতিকে মন্থর করতে হত বা সাময়িকভাবে পথের ধারে অরুণার সঙ্গে ভাগে গাছ-তলায় মুসাফেরখানা বানাতে হত। সে তা পারে না। মানুষকে চলতে হবে একা। এতকাল পর্যন্ত মেয়েরা পুরুষকে আশ্রয় করে চলে এসেছে। সে এককাল ছিল, কৃষিপ্রধান

গ্রাম, পুরুষে করেছে চাষ। মেয়েরা রয়েছে ঘর, পুরুষে কেটেছে ধান—মেয়েরা ভেঙেছে চাল, রেঁধেছে ভাত, কেটেছে সুতো—পুরুষে বুনেছে কাপড়। আজ মহানগরীতে সে ধারা অচল হয়ে উঠেছে। সে ধারা ধরে চলতে গেলে মর্মান্তিক কেরানী জীবনকে অবলম্বন করতে হবে। অন্ধকূপের মত আশ্রয়ে—পাততে হবে সংসার, আলো নাই, বাতাস নাই, পলেস্তারা খসে পড়া দেওয়াল, গাঁথনীর ফাঁকে ফাঁকে ক্ষয়রোগের জীবাণু বদ্ধ বাতাসের মধ্যে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে—শ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ করতে হবে তাদের; উঠানে মাটির জলবাহী নর্দমার মুখের বদ্ধ ঝাঁঝরিটায় কলেরা টাইফয়েডের বীজ; মরবে তোমার শিশু। এ পৃথিবীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হবে নরনারীর মিলিত জীবনের সাধের মাশুল হিসাবে। না—তা পারে না—পারবে না। সে অধিকারই নাই তার! হঠাৎ পায়ে একটা হুঁচোট খেলে বিমল।

মিহির বললে—দেখবেন, রাস্তা বড় খারাপ।

রাস্তা খারাপই বটে। বালিগঞ্জের দক্ষিণে ঢাকুরিয়ার দিকে চলেছে তারা। দুপাশে জঙ্গল, নারকেল বাগান, পুরনো বাড়ী, জবজবে জলে ভর্তি ড্রেন—কোথাও কোথাও কাঁচা। রাস্তার আলো অপর্যাপ্ত। মধ্যে মধ্যে দু'চারটে ছোটখাটো দোকান, কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। নেহাত ছোট দোকানে জ্বলছে কেরোসিনের কুপী। মধ্যে মধ্যে হিন্দুস্থানী গোয়ালা বা ধোবাদের জটলা হচ্ছে; উড়িয়ারা ঢোলক বাজিয়ে গান করছে। ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে চারিদিকে।

বিমল লজ্জিত হয়েছিল, নিজের কাজেই সে নিজে লজ্জা পেয়েছিল। কেন সে অরুণাকে সাহায্য করার কথা ভাবতে গিয়ে তাকে নিয়ে সংসার বাঁধার কল্পনা করলে? ছি! জীবনের পথে চলতে কত পুরুষ কত নারীর সঙ্গে দেখা হবে, হয়তো খানিকটা পথ পাশাপাশি চলতেও হবে; সে তো অনিবার্য। কথাও বলতে হবে, কথা বলতে গিয়ে সঙ্গীতের রেশও বাজতে পারে কানে, তার ফলে মিতালীও হতে পারে। তাতে কি? আবার যে দিন সে যাবে এক পথে—ও যাবে অন্য পথে—সে দিন হাসিমুখেই চলবে বিপরীত পথে। চোখে দু'এক ফোঁটা জল আসে—পড়বে ঝরে।

—দাঁড়ান। মিহির পাশে একটু এগিয়েই চলছিল নীরবে, সবল সুস্থ দীর্ঘাকৃতি তরুণ ছেলেটির পদক্ষেপে কঠিন শব্দ বেজে উঠছিল নির্জন অন্ধকার সহরতলীর পথে। সে হঠাৎ বললে—দাঁড়ান।

—কেন?

মৃদুস্বরে বললে মিহির—একখানা মোটর টর্চ ফেলে কি যেন দেখছে।

অদূরেই অন্ধকারের মধ্যে একখানা মোটর দাঁড়িয়েছিল। পিছনের লাল আলোটাও জ্বলছে না—সুতরাং অন্যমনস্ক বিমলের চোখে পড়ে নাই। গাড়ীর ভিতর থেকে টর্চ ফেলে পাশে কিছু যেন দেখছেন আরোহীরা। গাড়ীর দরজা খুলে কয়েকজন নামলেন। বিমল মিহিরকে বললে—আমি আপনাকে বলি নি, আমি একটু অন্যায় করেছি।

—কি?

—আমার বাসায় ওই যে লোকটি আপনার নাম জিজ্ঞাসা করলে—ও হচ্ছে আমার গ্রামের লোক আই-বি ইন্সপেক্টার।

—আই-বি ইন্সপেক্টার? একটু চমকে উঠল মিহির।

—হ্যাঁ, আমার বোধ হয় আজ আপনার সঙ্গে আসা উচিত ছিল না। আপনাকে বিদায় করে দিয়ে, ওকে আটকে রাখলেই ভাল করতাম আমি।

মিহির বললে—না—না। তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। গোপেনদা তো লুকিয়ে নেই যে পুলিশ ফলো করলে কোন ক্ষতি হবে। এ তো কোন গোপন ব্যাপার নয়।

—তবে মোটর দেখে দাঁড়ালেন কেন?

মিহির হেসে বললে—প্রথমটা দাঁড়িয়েছিলাম অভ্যাসে। তারপর দাঁড়িয়েছি—যাঁরা নেমেছেন তাঁদের একজন আমার কাকা।

—আপনার কাকা?

—হ্যাঁ। আমাদের বাড়ী বিক্রী হয়েছে। আপনি তো সে জানেন। এক বছর টাইম দিয়েছে খরিদ্দার বাড়ী তৈরী করে নেবার জন্যে। সম্ভবত কাকা এসেছেন জমি দেখতে! এখানকার জমি বিক্রী হবে। ওখানে একটা সাইনবোর্ড আছে 'ল্যাণ্ড ফর সেল'। একটু থেমে বললে—কাকার চোখে ঠিক পড়তে চাই না।

টর্চটা এগিয়ে গেল—রাস্তার পাশের পতিত জায়গাটার মধ্যে। মস্ত একটা নারকেল বাগান, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ছিটে বেড়ার বাড়ী।

মিহির বললে—এইবার আসুন। গাড়ীটার এদিক দিয়ে আড়াল দিয়ে চলে যাওয়া যাবে

গাড়ীটাকে পাশে রেখে একটা বাঁক ঘুরে পুরানো একতলা একটা বাড়ীর মধ্যে মিহির তাকে নিয়ে গেল। বিমলের বুকটা ঢিপ-ঢিপ করে উঠল। গোপেন মুখার্জী প্রাচীন কালের বিপ্লবী নেতা। এককালে বিমল তাঁকে গুরু বলে পূজা করেছে। তাঁর দেখা পাবার জন্ত কত ব্যগ্রতা ছিল। বাংলা দেশের সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগীদের মধ্যে এমন বিরাট সাহস মাত্র কয়েকজনের ছাড়া আর কারও ছিল না। সিংহের মত সবল দেহ। খালি গায়ে—সে বিরাট বুকের পাটা—সে ক্ষীণ কটি—বাঘের মত হাতের পাঞ্জা—চশমায় ঢাকা—ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ, মাথায় বড় বড় চুল—তাঁর সেকালের মূর্তি স্পষ্ট মনে পড়েছে তার। একটা ঘরের মধ্যে এক কোণে চুপ করে বসে থাকতেন তিনি, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন, তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা কইতে কখনও পারে নি বিমল, কণ্ঠস্বর ছিল ভরাট কিন্তু কথা বলতেন মৃদুস্বরে। শেষবার সে তাঁকে অনুরোধ করেছিল তার গ্রামে তার বাড়ীতে যাবার জন্ত। তখন তিনি অ্যাবস্কণ্ড্ করে ফিরছিলেন। তার অনুরোধের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—না। কলকাতা ছেড়ে গেলে কাজ চলবে না।

মহানগরী কলকাতা ইংরেজের শক্তির কেন্দ্রস্থল; মহানগরী কলকাতা ভারতীয় বিপ্লববাদের জন্মস্থল। মহানগরীর অন্তর জগতে লক্ষ লক্ষ পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সংঘাতে

কলরোল উঠছে অবিশ্রান্ত—বিপুল শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে, আকাশ স্পর্শ করতে চাচ্ছে সে স্বপ্ন, তার আঘাত ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবর্ষের দূরতম প্রান্তে।

আজও ঠিক সেইভাবে—সেই এক কোণে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন গোপেনদা। বিমলকে দেখে একটু হেসে নীরবে হাতখানি তুলে রাখলেন নিজের সামনে—অর্থাৎ বস এইখানে।

বাঘের থাবার মত বলিষ্ঠ এবং প্রশস্ত হাতের মধ্যে সস্নেহে তুলে নিলেন বিমলের হাতখানি; একটু মিষ্টহাসি হেসে গোপেনদা বললেন—বিখ্যাত লোক হয়েছ এখন—এঁা?

একটু কুণ্ঠিত হল বিমল, সে বুঝতে পারলে না গোপেনদা কি বলতে চাচ্ছেন, তবে কথার সুরের মধ্যে এবং তাকে গ্রহণের ভঙ্গিতে স্নেহের ভরসা রয়েছে; তা ছাড়া প্রশংসা বস্তুটাই এমন যে অকুণ্ঠিত গলাধঃকরণ করা যায়, সমাজ-চলিত রীতির অভ্যাসে—নতুন বউয়ের মত মুখ নামিয়ে রক্তিম মুখে আস্বাদন করতেই হয়। বিমল একটু হেসে মুখ নামালে।

গোপেনদা বললেন—তুমি তো জান—আমি নাটক নভেল পড়ি না। তোমার লেখা আমি পড়িনি, তবে লোকে নাম করে শুনেছি; কাগজে সমালোচনা পড়েছি। ভারী আনন্দ হয়। হঠাৎ একজন আমাকে তোমার একটা লেখা পড়ে শোনালেন।

গোপেনদা সোজা হয়ে বসলেন। কণ্ঠস্বর বেশ একটু উস্কে দেওয়া প্রদীপের শিখার মত প্রখরতর হয়ে উঠল। বললেন—গল্পটা শুনে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলাম। গল্পটার নাম আমি ভুলে গেছি। একটি কুষ্ঠরোগগ্রস্তা পাঠশালা-পণ্ডিতের স্ত্রীকে নিয়ে গল্প।

বিমল বললে—হ্যাঁ, 'সারথি' পত্রিকায় বেরিয়েছে।

—হ্যাঁ। সেদিন তোমায় সামনে পেলে আমি তিরস্কার করতাম।

বিমল চুপ করে রইল।

গোপেনদা বললেন—আজ তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এবারও বিমল চুপ করে রইল।

গোপেনদা বললেন—আমার পাশের বাড়ীতে ঠিক ওই ব্যাপার ঘটে গেল। নিতান্ত দরিদ্র কেরানী-ভদ্রলোক—যক্ষ্মা হয়েছিল, স্ত্রী দেবীর মত সেবা করছিলেন, হঠাৎ একমাত্র ছেলে, তাকে ধরল ওই রোগে। গোপেনদা চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন—ভদ্র-মহিলা যেন পাগল হয়ে গেলেন, সেই রাত্রেই ভদ্রলোকটি মারা গেলেন। আমার সন্দেহ হয়—। গোপেনদার চোখ দুটো ঝকমক করে উঠল—খানিকটা অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন—যখন ঘটনাটার কথা মনে হয়—তখনই তোমার ওই গল্পটার কথা মনে পড়ে।

এর উত্তরেই বা বিমল কি বলবে? গোপেনদা বললেন—ওই ব্যাপারেই তোমাকে ডেকেছি। ভদ্রমহিলাটি তাঁর রুগ্ন ছেলেটিকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। আমি প্রতিবেশী হয়ে জড়িয়ে পড়েছি। তাছাড়া ভদ্রলোকটিকে বড় ভালবাসতাম আমি।

বিমল অস্বস্তিকর বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। এই ব্যাপারে গোপেনদা তাকে ডেকেছেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অরুণার কথা। অরুণাকে নিয়ে সে অকারণে অনিচ্ছায়

জড়িয়ে পড়ে অস্বস্তি ভোগ করছে। যে জলে ডোবে সে প্রাণের আকুলতায় পাশে যাকে পায় তাকেই আশ্রয় হিসেবে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চায়। কিন্তু যাকে আশ্রয় করে—তার জীবনও যে যায় তাতে। বাঁচে না কেউ—ডুবে মরে দুজনেই। বিপুল শক্তির অধিকারী যে—সে-ই তীরে উঠতে পারে বিপন্নজনকে পিঠে নিয়ে।

গোপেনদা বললেন—তোমাদের গ্রামের শ্রীচন্দ্রবাবু, যিনি বালিগঞ্জেই থাকেন—তাঁর কাছে একবার যেতে হবে তোমাকে। সেইজন্তেই তোমাকে ডেকেছি আজ।

বিমল এবার আরও বিস্মিত হল। শ্রীচন্দ্রবাবু মস্ত ধনী লোক। নানা ব্যবসায়ে প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছেন। বালিগঞ্জের নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি।

গোপেনদা বলেই গেলেন—শ্রীচন্দ্রবাবুই এই বাড়ীখানা এবং আশপাশের বাগান বস্তী সব কিনেছেন। বুঝছ তো, শহর বাড়ছে, সস্তায় জমি কিনে ব্যবসা করছেন। বাড়ীখানা ভদ্রলোকের পৈতৃক বাড়ীই ছিল, তিনি বিক্রী করেছেন শ্রীচন্দ্রবাবুর কাছে। কথা ছিল জায়গাটা ভেঙেচুরে ডেভেলপ করে প্লট করে বিক্রীর সময় ছোট একটা প্লট এঁদের এমনি দেবেন। দলিলে কিছু নেই অবশ্য।

হাসলেন একটু গোপেনদা। বিমল প্রশ্ন করলে—এখন বুঝি দিতে চাচ্ছেন না?

গোপেনদা বললেন—দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্ন তোলার পথই বন্ধ হয়ে গেছে শুনছি। শ্রীচন্দ্রবাবু নাকি আবার গোটা সম্পত্তিটাই বিক্রী করে দিয়েছেন এক লিমিটেড কোম্পানীকে। তারা নোটিশ দিয়েছে—বাড়ী ভাঙবে তারা, বাড়ী ছেড়ে উঠে যেতে হবে।

গোপেনদা বললেন—কি ভাবছ? যেতে কি তোমার আপত্তি আছে?

—আপত্তি? না আপত্তি নয়। তবে ভাবছি গিয়ে ফল হবে না।

—ফল হবে না? গোপেনদার চোখ দুটি অকস্মাৎ জলে উঠল। একটুখানি চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই?

শঙ্কিত হয়ে উঠল বিমল। পুরাণে অবশ্য শোনা যায়—মদোদ্ধত স্ফীতকলেবর বিন্ধ্য তপস্বী অগস্ত্য সম্মুখে উপস্থিত হতেই সসম্ভ্রমে মাথা নত করেছিল, অগস্ত্য বলেছিলেন—কোটী কোটী মানুষের আলো ও বায়ুর পথরোধ করে আর মাথা তুলো না; বিন্ধ্য আর মাথা তোলে নাই। কিন্তু এ যুগে সে হবার নয়। না হলে ফল হবে সংঘর্ষ। গোপেনদা কি প্রত্যাখ্যানকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবেন!

বিমল বললে—আপনি যাবেন?

—কেন যাব না? সংসারে লিখিত প্রতিশ্রুতিরই দাম আছে? মুখের প্রতিশ্রুতির কোন দাম নাই?

—আগে আমি যাই, আপনার নাম আমি করব। শ্রীচন্দ্রবাবু কি বলেন শুনি। তারপর প্রয়োজন হয়তো যাবেন।

একটু চিন্তা করে গোপেনদা বললেন—বেশ। তা হলে কালই খবর দেবে আমাকে।

—তা হলে আমি উঠি গোপেনদা।

—দাঁড়াও, আমিও যাব। মিহির।

পাশের ঘরে মিহির বসেছিল। সে এসে দাঁড়াল। তার দিকে চেয়ে গোপেনদা বললেন—চল।

মিহির কুণ্ঠিত হয়ে বললে—এই রাত্রেই যাবেন ? কাল দিনের বেলা—

—নাঃ। চল রাত্রেই ভাল। গোপেনদা উঠে দাঁড়ালেন। আলোয়ানখানা তুলে নিয়ে ঘাড়ে চাপিয়ে বিমলকে বললেন, চল। তারপর হেসে বললেন, এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে রাত্রে কাজ করতে যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বেশী। তবু যেন তুমি পেঁচার সঙ্গে তুলনা করো না বিমল।

বিমল বললে, আমি তান্ত্রিকের দেশের লোক দাদা। অমাবস্যায় শ্মশানে যাঁরা শক্তির সাধনা করেন তাঁদের কথা আমার কাছে অজানা নয়।

মুহূর্তে গোপেনদার চোখ দুটো ঝকমকিয়ে উঠল। উষ্ণ হাত দিয়ে বিমলের হাত দুটো চেপে ধরলেন তিনি।

বাসার প্যাসেজের মুখে হঠাৎ বিমলের মনে হল কালীনাথের কথা। সে বললে, দাঁড়ান দাদা।

—কেন ? কি ব্যাপার ?

—বলছি। আসছি আমি। হন হন করে এগিয়ে গেল সে। কালীনাথ চলে গেছে, ঘরের তালা বন্ধ। চাবি চিত্তর কাছে। সে বেরিয়ে এসে বললে, দাঁড়ান চাবিটা নিয়ে আসি।

মিহির বললে, আজ থাক বিমলবাবু। অনেক দেরি হয়ে যাবে। বসলে গোপেনদা গল্পই করবেন।

হা-হা করে হেসে উঠলেন গোপেনদা। হেসে বললেন, ওরে শয়তান, আমি বুঝি গল্পই করি! না—না, বিমল চাবি আন তুমি

বিমল বুঝলে গোপেনদার অভিপ্রায়, সম্ভবতঃ সে ক্ষুণ্ণ হবে বলেই গোপেনদা দেরি হওয়ার যুক্তিটা উপেক্ষা করেও তার ঘরে কিছুক্ষণ বসতে চাচ্ছেন। সে বললে—না গোপেনদা, মিহিরবাবু সত্যিই বলেছেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে আপনার। আজ থাক।

—থাকবে ?

—হ্যাঁ, অন্যদিন আসবেন। সেদিন—আপনাকে কিছু খাওয়াব। গল্প করব। চলুন আজ আপনাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসি।

—চল। তবে কথা রইল, খাওয়াবে। আচ্ছা কালই আসব আমি। তোমার তো শ্রীচন্দ্রবাবুর কথা নিয়ে আমার ওখানে যাবার কথা। তোমার যেতে হবে না, আমিই আসব। মিহির মনে করে দিয়ো।

মোড় পর্যন্ত এসে গোপেনদা দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি বুঝিয়ে বলো শ্রীচন্দ্রবাবুকে। ভাল করে বুঝিয়ে বলো।

বিমল কোন উত্তর দিল না। মিহির বললে—এ আপনাদের মিথ্যে চেষ্টা হবে

গোপেনদা। কোনও ফল হবে না। আমি জানি—এদের আমি জানি।

গোপেনদা বললেন—জানি; তোরা হয়ত এদের জানিস না, আমি জানি—এই সভ্যতার এই নিয়ম। এ নিয়ম মানে আইনের কথা বলছি—সে তো শ্রীচন্দ্রবাবুরা করেনি, করেছে গভর্ণমেণ্ট; কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট জমি অ্যাকোয়ার করে তাকে ডেভেলপ করে চড়া দামে বিক্রী করছে। শহর বাড়ছে, বাড়বে, শহরের এই ধর্ম। বন কেটে শহর বাড়ছে, সমুদ্রের গর্ভ পূর্ণ করে শহর বাড়ছে, বম্বেতে মেরিন ড্রাইভ তৈরী হচ্ছে দেখে এসেছি। আবার দরিদ্র মানুষের বসতি কৃষিক্ষেত্র ভেঙে শহর বাড়ছে। কিন্তু—

সশব্দে একখানা ট্রাম এসে দাঁড়াল। গোপেনদা বললেন—আচ্ছা কাল আসব।

ট্রামে চড়ে বসলেন গোপেনদা ও মিহির। বিমল ফিরল। প্রচণ্ড শব্দ করে একখানা লরী আসছে। সরে দাঁড়াল বিমল। বড় বড় লোহার বীম বোঝাই করে নিয়ে চলেছে লরীখানা। গতির ঝাঁকানিতে লোহাগুলো সশব্দে নড়ছে সেই জন্য এমন প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। বাড়ী তৈরী হবে, লোহার কড়ি চলল। মহানগরী প্রসারিত হচ্ছে। বন জঙ্গলে ঘেরা দরিদ্রের পল্লীভবন ভেঙে তৈরী হবে দীপমালায় উজ্জ্বল—আরামের উপকরণ-সমৃদ্ধ—শ্রীসম্পদে ঝলমল পুরী।

চীৎকার করছে—কে ?

হৈ-হৈ চীৎকার উঠছে। কি হল? বিমল চমকে উঠল এবার। কেউ যেন ছুটে আসছে।…ছুটে গেল একটা লোক। তার পিছনে বিশ-পঁচিশ জন লোক ছুটছে। খুন—খুন। ছোরা মেরেছে। ছোরা।

মহানগরীর রাত্রি। এমন একটি রাত্রিও বোধ হয় মহানগরীর ইতিহাসে নাই যেদিন মানুষের দেহের তাজা রক্ত মাটির বুকে না পড়ে।

চাবি নেবার জন্য সে চিত্তর ডিপোর সামনে এসে দাঁড়াল। চিত্তর ডিপোতেই লোক জমে রয়েছে।

—কি ব্যাপার চিত্ত? খুন?

ঘাড় নেড়ে চিত্ত বললে—বেঁচে গেছে। হাত দিয়ে আটকেছিল—হাতে লেগেছে। লাবণ্যদির বাড়ীতে এক ছোকরা, ছবি আঁকে, পাগলাটে ধরন, অতি গো-বেচারা লোক, বেঁচে গেছে খুব।

এবার নজর পড়ল, সেই শিল্পী পিনাকী বসে আছে হাতখানা ধরে, একজন তুলো দিয়ে বাঁধছে।

আট

মহানগরীর ইতিকথায় ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। স্বাভাবিকও বটে, যে ভাবের ব্যবস্থায় মহানগরীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তাতে স্বাভাবিক বললে সত্যই বলা হবে, মহানগরীর অপমান করা হবে না।

ব্যাপারটা ঘটেছিল অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে আকস্মিক ভাবে।

পিনাকী বিদায় নিচ্ছিল লাবণ্যদের কাছে। এক লাবণ্য ছাড়া পাগল পিনাকী অপর মেয়েগুলির কাছে কৌতুকের মানুষ। সদাই অপ্রস্তুত হতভম্ব শিল্পীটিকে বেশী করে অপ্রস্তুত করে মেয়েরা আমোদ পায়। পিনাকী বাইরের সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়েছিল—মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিল। লাবণ্য ছিল ভিতরে। অরুণাও এসে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কথা হচ্ছিল সমাজব্যবস্থা নিয়ে। সমাজসম্বন্ধে কথা হলেই ক্ষেপে ওঠে পিনাকী। শান্ত বিনীত কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে ওঠে, তার মুখ চোখের ভীরু ভাব কেটে যায়, সে তার মাথার বড় বড় চুল অধীর ভাবে টানে এবং সমাজকে ভেঙ্গে ফেলবার শপথ গ্রহণ করে। সেই সুযোগে মেয়েরা কেউ বিধবা বিবাহের কথা তুলে দেয়। অর্থাৎ সকলেরই ধারণা পিনাকী লাবণ্যকে ভালবাসে। মেয়েদের ঐদিক দিয়ে একটা সহজ স্বচ্ছ দৃষ্টি আছে। এক দৃষ্টিতেই বুঝতে পারে কোন পুরুষের দৃষ্টি কাকে দেখে রঙীন হয়ে উঠছে। লাবণ্যকেও এ নিয়ে তারা মধ্যে মধ্যে পরিহাস করে থাকে কিন্তু লাবণ্যের সঙ্গে পরিহাস জমে না। তার সহজ গাম্ভীর্যের স্পর্শে এসে তটের উপর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ভেঙে নেমে যাওয়ার মত মিলিয়ে যায়। এই কারণে পিনাকীকে নিয়েই তারা একটু বেশী করে পড়ে।

ঠিক এই সময়েই রাস্তার ওপারের বাজারটার পিছন দিকের নিম্নস্তরের বস্তীর ভিতর থেকে দুটি লোক বেরিয়ে এদের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ভদ্র বেশভূষা, চলার ভঙ্গিতে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য। ওরা ওই বস্তীর বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। লাবণ্য-ও এদের একটু একটু চেনে। এ পাড়ার রাস্তায় মধ্যে মধ্যে লাবণ্যকে বিরক্ত করে থাকে। দেখা হলেই খানিকটা পিছু নিয়ে চলে; কখনও শিস্ দিয়ে ওঠে, কখনও অকস্মাৎ চোখ পড়লে ইঙ্গিত করে থাকে। লাবণ্য এদের দেখলে, যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে, সে রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে; যে ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর না হয় সে ক্ষেত্রে অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গে চোখ নামিয়ে পথ চলে। খানিকটা অনুসরণ করেই ওরা ক্লান্ত বা হতাশ হয়ে ফিরে যায়। লোক দুটি পেশাদার গুণ্ডা নয়, কাজ-কর্ম করে, কিন্তু মহানগরীর জীবনধারায় সঞ্চারিত এই ব্যাধির বিষে জর্জর ভাবে সংক্রামিত। ওদের ধারণা লাবণ্যদের ধরনের অভিভাবকহীন মেয়ে—যাদের ভরণপোষণের ভার নেবার কেউ নাই, জীবিকার দায়ে যারা এমন পথে পথে স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় তারা কখনও ভালো মেয়ে হতে পারে না। স্বাধীনভাবে মেয়েদের জীবিকা উপার্জনের একটি পথই তাদের চোখে পড়ে। সে এই পথ। তারা জানে মেয়েদের মূলধন একমাত্র দেহ। দেহের শক্তিতে মেয়েরা ভাত রান্না করে, ঝিয়ের কাজ করে, দিনমজুরী খাটে অথবা দেহ ভাঙ্গিয়ে তারা জীবিকা উপার্জন করে। বি-এ, এম-এ, পাস করে যারা চাকরি করে খেটে খায় তাদের কথা স্বতন্ত্র। এ ছাড়া অপর কোনরকম বুদ্ধিগত পন্থায় মেয়েরা জীবিকার্জন করতে পারে এ ধারণা তাদের নাই। এটা শুধু তাদের মন্দত্ব ঢাকবার ছদ্মাবরণ। স্নো ক্রীম পাউডার দিয়ে স্বাভাবিক রূপকে ঢেকে তাকে উজ্জ্বল করে তোলার মতই এই জীবিকার্জনের চেষ্টাটা তাদের মন্দত্ব ঢাকার একটা পালিশ বা প্রলেপ।

আজ এই সন্ধ্যার অভিসার-রাগময় সময়ে মেয়েগুলিকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে এব

পিনাকীর সঙ্গে চপলপরিহাসমুখর অবস্থায় দেখবামাত্র তাদের মনে হল আজ তারা এদের চাতুরী ছলনা ধরে ফেলেছে। তারা মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেই সরাসরি এসে পিনাকীর পিছনে দাঁড়াল। মেয়েগুলি চকিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। অরুণা সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে নীরবে সব দেখছিল এতক্ষণ, সে প্রশ্ন করলে—কে? কে আপনারা? কি চান?

একজন হেসে বলে উঠল—আজ তো ধরে ফেলেছি বাবা।

অপরজন হেসে উঠল। পিনাকী সবিস্ময়ে এদের দিকে ফিরে দাঁড়াল হাসির শব্দ শুনে এবং লাবণ্য ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে অরুণা?

—দু'জন লোক।

—লোক? লাবণ্য সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কি চান এখানে?

—তোমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গেল। শীর্ণ কুব্জদেহ পিনাকী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠল—স্কাউণ্ড্রেল!

মুহূর্তে লোকটির হাতে ছুরি ঝলকে উঠল, ছোরা নয়, স্প্রিং-দেওয়া পিতলের বাঁটের ছুরি। স্প্রিং টিপ্‌লেই ফলাটা বেরিয়ে পড়ে। মেয়েরা চীৎকার করে উঠল। লাবণ্য হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে টেনে নিলে পিনাকীকে, পিনাকী হাত তুলেছিল আত্মরক্ষার জন্য, সেই হাতে ছুরিটা গেল বিঁধে। এর পরই লোক দুটো পালিয়ে গেল।

বিমল বিস্মিত হয়ে গেল পিনাকীর এমন সাহসের পরিচয় পেয়ে। পিনাকী অপ্রতিভের মত হাসতে লাগল। বললে—ওসব লোকগুলো এমনিই হয়। যে কেউ সাহস করে রুখে দাঁড়ালেই ছুটে পালায়। আমি দেখেছি, ওদের জানি আমি।

—জানেন? সবিস্ময়ে চিত্ত বললে—জানেন ওদের আপনি?

—হ্যাঁ। আরও বারদুয়েক ওদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। একবার পিঠে ছুরি মেরেছিল। পিঠে হাত বুলিয়ে পিনাকী বললে—মিউজিয়মের সামনে রাস্তার ধারে গাছগুলোর তলা দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে—সেই রাস্তার উপর। পিঠে দাগ আছে এখনও। অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম। সাহস করে দাঁড়ালেই ওরা ভয় পায়, পালায়। সন্ধ্যের অন্ধকার ছিল নইলে বোধ হয় ছুরি মারতে পারত না। এমনিই ভয়ে পালাত।

চিত্ত হেসে বললে—পালায়। কিন্তু ছুরি বসিয়েও দিয়ে যায়। আপনার তো এই তালপাতার সেপাইয়ের মত শরীর, সেবার পিঠে ছুরি খেয়ে বেঁচেছেন—এবারে খুব ফস্কে গিয়ে হাতে লেগেছে কিন্তু এরপর বুকে পিঠে বিঁধে হাসপাতালে যাবার সময় হবে না। এ রকম গোঁয়ার্তুমি আর করবেন না। শুধু হাতে এগুবেন না। আমিও অবিশ্যি দুর্বল মানুষ কিন্তু হাতিয়ার আমার সঙ্গে থাকে। ওটি না নিয়ে আমি এক পা বাড়াই না।

তারপর সে আক্ষেপ করে বললে—লোকটাকে চড় না মেরে যদি চীৎকার করে ডাকতেন

মশায়! আঃ! এই তো প্রায় দোরের কাছে বললেই হয়। হারামী দুটোকে আজ আঃ! বসে আছি আমরা—আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ভোঁ করে দৌড়ে পালাল।

—চিন্তদা।

—কে? লাবণ্যদি? চিন্তি ডিপোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রাস্তার উপর। লাবণ্যই। লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে—পিনাকীকে আজ মেসে ফিরতে দেবেন না। আমি বিছানা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার ডিপোতেই একটু জায়গা করে যদি—

—ডিপোতে? এখানে তো কুলীরা থাকে, চারিদিকে কয়লা আর কালি—

—না, না। আমি বেশ চলে যাব। আপনি কিছু ভাববেন না। পিনাকী উঠে দাঁড়াল ব্যস্ত হয়ে।

—না। দৃঢ়স্বরে বললে লাবণ্য। রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। তা ছাড়া তোমার মত আধ-কানা আধ-পাগলা মানুষ, পথে যদি লোক দুটো কোথাও লুকিয়ে থাকে—কি? না। যাওয়া হবে না তোমার। এখানে অসুবিধা হলে বিমলবাবুর ওখানে থাকবে, আমি যাচ্ছি তাঁর কাছে। তিনি কখনও না বলবেন না।

বিমল বিস্মিত হয়ে নিস্তব্ধ বসে ভাবছিল পিনাকীর কথা। অপ্রতিভ নিষ্প্রভ এই জীর্ণদেহে পিনাকীর এই সাহসটা কি? চিন্তুর শরীর এমনি দুর্বল কিন্তু জীবনে এমন আবেষ্টনীর মধ্যে সে পড়েছে যে এই দুঃসাহস তার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে ব্যাধির মত। ক্ষেত্র ছিল অনুকূল। শিক্ষার অভাব, নেশায় আসক্তি, দুর্দান্ত লোকদের সাহচর্য দুঃসাহসকে জাগিয়ে তুলেছে গ্রীষ্মের আবহাওয়ায় বাতাসের সাহায্যে শুকনো কাঠের আগুনের মত। কিন্তু পিনাকীর এ দুঃসাহস কি করে হল?

লাবণ্যের কথা শুনে সে বেরিয়ে এসে নমস্কার করে বললে—আমি এখানেই রয়েছি। আপনি ঠিকই বলেছেন। এই রাত্রে পিনাকীবাবুর যাওয়া ঠিক হবে না। উনি আমার কাছেই থাকবেন। তবে—একটু লজ্জিত ভাবেই বলল—ওঁর জন্যে খাবার পাঠিয়ে দেবেন। মানে আমি তো পাইস হোটেলে খাই।

—হাঁ—হ্যাঁ। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

পিনাকীর জামা কাপড় অপরিচ্ছন্ন ময়লা, একটা দুর্গন্ধও তাতে আছে কিন্তু পুলওভার এবং সার্টটা খুলতেই এমন দুর্গন্ধ অনুভব করলে বিমল যে মনে হল তার বমি হয়ে যাবে এখনি। পিনাকীর গায়ের গেঞ্জিটার দুর্গন্ধ এতক্ষণ জামা দুটোর তলায় চাপা ছিল। অসংখ্য ছিদ্রভরা প্রায় রান্নাঘর নিকানো ন্যাতার মত ময়লা এবং চটচটে একটা গেঞ্জি। বোধ হয় নতুন কিনে পরেছে, আজও কাচা হয় নি, এক দিনের জন্যও গায়ের থেকে নামে নি। কিন্তু বলবেই বা কি করে?

বিছানার উপর বসে সে বিড়ি খাচ্ছিল। ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে খুব আরাম করে বিড়িটা উপভোগ করছিল। হঠাৎ বললে—আপনি বেশ আরামে আছেন, চমৎকার ঘরখানি। ছোট্ট, বেশ ঝকঝকে তকতকে—তেমনি নির্জন। I am monarch of all I survey—একলা ঘর না হলে লেখা কি ছবি আঁকা হয়?

বিমল বললে—কিছু মনে না করেন তো একটি কথা বলি।

—আমাকে ?

—হ্যাঁ। কিছু মনে করবেন না যেন।

অপ্রতিভ নির্বোধের মত তার মুখের দিকে চেয়ে পিনাকী বললে—মনে করব কেন ? কি মনে করব ?

একটু ইতস্তত করে বিমল বললে—গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন গা থেকে। বড়—

—হ্যাঁ—বড্ড দুর্গন্ধ। অপ্রতিভের মত পিনাকী গেঞ্জিটা টেনে নাকের কাছে তুলে শুঁকলে—বড্ড দুর্গন্ধ। ছিঁড়েও গেছে। মানে একটাই গেঞ্জি কি না। ওটা আর কাচা হয় না। বলতে বলতেই সে খুলে ফেললে গেঞ্জিটা। তারপর একবার ভাল করে দেখে আর একবার শুঁকে বললে—এটাকে তাহলে ঘরের বাইরে রেখে দি। সে উঠে বাইরে রেখে এল গেঞ্জিটা—দরজার ওদিকে সিঁড়ির উপর।

বিমলের কোন কথা বলবার শক্তি ছিল না। সে বিস্ময়ে বেদনায় বাক্যহীন হয়ে গিয়েছিল—পিনাকীর দেহ দেখে। পাঁজরার প্রতিটি হাড় গোণা যায়, বোধ হয় ভাল করে লক্ষ্য করলে—হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনিও দেখা যাবে চামড়ার উপর। শুধু তাই নয়—পিঠে একটা সাংঘাতিক ক্ষতের চিহ্ন—যেন দগদগ করছে।

পিনাকী ফিরে বিছানার উপর বসে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে তার দৃষ্টির অর্থ। হেসে বললে, আমার শরীর দেখছেন ?

—আপনার শরীর এত খারাপ !

—এত খারাপ ছিল না আগে। অপ্রতিভের মত হাসলে পিনাকী,—ওই পিঠে ছোরা মেরেছিল—তারপর থেকেই শরীরটা বেশী খারাপ হয়ে গেল। মানে আর সারাতে পারলাম না। আমার ছবি একেবারেই কেউ নিতে চায় না ! ভাগ্যিস লাবণ্যদিদির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল—উনিই আমার বড় খরিদ্দার। দশ টাকা বারো টাকা মাসে পাইওঁর কাছে।

—পিঠে ওই দাগটা বুঝি সেই ছোরার দাগ ?

—হ্যাঁ। আর খানিকটা ঢুকলে বাঁচতাম না। ডাক্তাররা বললে। হাসতে লাগল পিনাকী।

হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে বিমল প্রশ্ন করলে—মিউজিয়মের সামনে রাস্তার ওপাশে গাছের তলায়. সন্ধ্যের সময় যান কেন ? জায়গাটা তো খুব ভাল নয়।

—না। জায়গাটা খুব খারাপ। তবে ওখানে সূর্যাস্তের সময় ফোর্টের ছবিটা খুব ভাল লাগে। গরমের সময়, ওখানে গাছতলায় বসে সূর্যাস্ত দেখে বসেই ছিলাম। ঘুমিয়েই গিয়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল একটা শব্দ শুনে। কেউ যেন আঁতকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় কেউ যেন বললে—চুপ। চেঁচালে জান মেরে দেব। আমি লাফিয়ে উঠে গাছের ওপাশ থেকে এসে লোকটার ঘাড় চেপে ধরলাম। লোকটা ঝাঁকি মেরে ফেলে দিলে আমাকে। আমি উপুড় হয়ে পড়েছিলাম, হাত বাড়িয়ে পা চেপে ধরলাম। অন্য লোকটি চীৎকার করতে লাগল ; এ লোকটা আমার পিঠে ছোরা মারলে।

একটু থেমে শার্টটা তুলে পকেট খুঁজলে পিনাকী ; দুটো পকেটই খুঁজলে, বললে—এ হে—বিড়ি ফুরিয়ে গেছে।

—সিগারেট খান। সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলে বিমল।

—সিগারেট আমার পোষায় না দাদা। বিড়ি না হলে গলায় সানায় না।

—চুরুট আছে, খাবেন ?

—চুরুট ? মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিনাকীর ;—ওঃ—জীবনের বিলাসকামনার মধ্যে ওইটে একটা। চুরুট খাব আমি। বুঝলেন ?

স্যুটকেস খুলে চুরুট বার করতে গিয়ে বিমল একটু ভাবলে—তারপর চুরুটের সঙ্গে একটা নতুন গেঞ্জি বার করে পিনাকীর হাতে দিলে, বললে—শীতকাল, খালিগায়ে রাতে শীত করবে। এটা পরে ফেলুন। আর এই নিন চুরুট।

—নতুন গেঞ্জি! খুব নরম। এটা গায়ে দেব ?

—হ্যাঁ গায়ে দিন—চুরুটটা ধরান।

—আপনি আমাকে—আপনি বলবেন না। গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে চুরুট ধরিয়ে সে বললে—আজকের দিনটা আমার কাছে খুব মূল্যবান। বুঝলেন ? চিরকাল মনে থাকবে। লাবণ্যদি এত স্নেহ করলেন, নিজের হাতে বিছানা করে দিয়ে গেলেন, আপনি গেঞ্জি দিলেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হল, তারপর এই চুরুট। আমার বিছানাটা খুব ময়লা আর খুব শক্ত—চমৎকার বিছানাটি।

বিমল উঠে আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছিল। পিনাকী বললে—আর একটু থাক। চুরুটটা খেয়ে নি। ধোঁয়া না দেখতে পেলে আরামটা পুরো হবে না। গলগলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখব তবে তো!

পিনাকীই উঠে আলোটা নিভিয়ে দিলে।

বিমল তখনও ভাবছিল পিনাকীর কথা। পিনাকীর মাথার মধ্যে গণ্ডগোল আছে। হয়তো আতঙ্ক অনুভব করায় স্নায়ুশিরাগুলি দুর্বল, অথবা ওর রক্তের ধারার মধ্যে একটা দুর্দান্তপনার সূক্ষ্ম স্রোত প্রবহমাণ রয়েছে। হয়তো সেটা অপরাধপ্রবণতাও হতে পারে।

—ঘুমালেন দাদা ?

—কিছু বলছেন ?

—এই দেখুন। আবার আপনি বলছেন ?

হেসে বিমল বললে—অভ্যেস হয় নি এখনও। কিছু বলছ ?

—আর একটা স্মরণীয় দিনের কথা মনে পড়ছে। আমার জীবন—কিই বা জীবন! তাতে বলবার মত, স্মরণ করবার মত দিন আর আসবে কি করে ? কিন্তু এসেছিল একটি দিন! সে দিনটির মত দিন বোধ হয় আর আসবে না। আমার বয়স তখন চৌদ্দ-পনের বছর। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে ভলান্টিয়ার হয়েছিলাম। গান্ধীজী এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে একদিন বিপ্লববাদীরা দেখা করলে। আমি ঢুকে পড়েছিলাম, এক কোণে বসে-ছিলাম। মহাত্মাজী বলছিলেন অহিংসার কথা। বলতে গিয়ে, বুঝাতে গিয়ে বললেন—

বুঝলেন দাদা, থম থম করছে সমস্ত আসরটা—আস্তে আস্তে গান্ধীজী কথা বলছেন, সকলে রুদ্ধশ্বাসে শুনছে, অনেকের মনে বিরুদ্ধ যুক্তি ধারালো ছুরির মত উঁচিয়ে উঠে ঝকঝক করছে, তাঁদের চোখের চাউনি হয়ে উঠেছে ছোট, ভুরু কপাল উঠেছে কুঁচকে ; ওঃ সে যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। গান্ধীজী আঙুল দেখিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—আমার অহিংসা দুর্বলের নয়, আমার অহিংসা আমাকে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি নির্ভয়ে দাঁড়াবার শক্তি দেবে। মৃত্যু আমার সামনে এসে দাঁড়ালেও আমি স্থির হয়ে তার দিকে তাকাব। আমার বুকটা গুর্ গুর্ করে কেঁপে উঠল। মনে হল মৃত্যু বুঝি খুব কাছে—হয়তো আমারই পাশে—কিম্বা গান্ধীজীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছে। শরীরের রোঁয়া খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

বিমলের শরীরও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সে কথা বলতে পারলে না। পিনাকী বললে—ওই কথাটি রোজ আমার মনে পড়ে! জানেন—এই যে দুবার ছুরি খেলাম, দুবারই আমার মনে পড়েছে কথাটি।

ভোরবেলা দরজায় কড়া নড়ে উঠল, বিমল তখন উঠেছে। মুখ হাত ধুয়ে সে বিব্রত হয়ে বসে ছিল—ভাবছিল বেড়াতে বেরুবার কথা। পিনাকী এখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে ; ওই শীর্ণ দেহ—ওতেও ওর নাক ডাকছে। সম্ভবত আরামটা হয়েছে বেশী। কিন্তু এই ভোরে কড়া নেড়ে ডাকছে কে?

দরজা খুলতেই দেখলে দাঁড়িয়ে আছে লাবণ্য। তার পিছনে অরুণা। হাতে কেটলি, চায়ের কাপ।

—এ কি? এই সকালে চা নিয়ে খাওয়াতে এসেছেন?

লাবণ্য বললে—আপনি খুব সকালে বেরিয়ে দোকানে চা খেতে যান—সে আমি জানি। তার আগেই আসব বলে এলাম। কিন্তু পিনাকী এখনও ঘুমুচ্ছে? পিনাকী! পিনাকী!

পিনাকী চোখ মেলে চাইলে। তারপর ধড়মড় করে উঠে বসল। বললে—লাবণ্যদি!

—ওঠ, মুখ ধুয়ে চা খাও। তারপর চল—হাতটা খুলে গরম জলে ধুয়ে ভাল করে বেঁধে দেব।

চারদিকে সিটি বাজতে লাগল। মহানগরী ঘুম ভাঙাবার আহ্বান জানাচ্ছে। ওরা চলে যেতেই বিমল গল্পটা শেষ করতে বসল।

নয়

রাত্রি তিনটে বাজল।

পাশের বাড়ীর দোতলাতে একটা বড় দেওয়াল-ঘড়ি আছে। যার শব্দ শীতের রাত্রে দরজা বন্ধ থাকলেও শোনা যায়। বিমল ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে চুমুক দিতে আরম্ভ

করল। চোখ জ্বালা করছে, হাতের শিরায় টান ধরেছে। আজ সারাটা দিনই লিখছে। গল্পটা শেষ করতে হবে। বাংলা মাসের সংক্রান্তি আজ। হিরণদের কাগজ লেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। বিমলের অনুরোধে সম্পাদক অপেক্ষা করতে রাজী হয়েছেন। বিমলের উপর ক্রমশ তাঁর আস্থা বাড়ছে। আগামীকাল পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করবেন বলেছেন। কিন্তু বিমল আজই লেখাটা শেষ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে বসেছে। কালকের দিনটা তার নিষ্ফলা দিন গিয়েছে। লাবণ্য, অরুণার নিমন্ত্রণ, কালীনাথের আকস্মিক আবির্ভাব, গোপেনদার ডাক, পিনাকীর ছুরি খাওয়া এবং রাত্রিটা তাকে নিয়ে কাটানো—এই সব নানা ঘটনার মধ্যে লেখার কাজ তার কিছুতেই হয় নি। লেখা দূরে থাক, গল্পটা নিয়ে সে ভাবতেও পারে নি। আজ সকালে পিনাকীকে বিদায় করে সে লিখতে বসেছে। স্নান করে নি, লিখেই চলেছে। মধ্যে মধ্যে এই ভাবে সে লেখে। এ লেখার যত যন্ত্রণা তত আনন্দ। আবিষ্ট মস্তিষ্কের অন্তরালে দৈহিক সচেতনতা ক্লান্ত কাতর হয়ে থামতে চায়, কিন্তু থামবার উপায় নাই। চলচ্ছক্তিহীন তৃষ্ণার্ত যেমন বুকে হেঁটে এগিয়ে চলে দূরবর্তী পদ্মদীঘির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ঠিক তেমনি ভাবেই লেখা লিখেই চলে। মধ্যে মধ্যে কলম রেখে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনী আঙুল দুটি টেনে ঝটকে নিতে হয়, মধ্যে মধ্যে চা খায়, বাঁ পাশে থাকে বিড়ির বাণ্ডিল ও দেশলাই, একটার পর একটা ধরায়, কয়েকটা টান দিয়ে ফেলে দেয়। সেই চায়ের জন্যই সে একটা ফ্লাস্ক কিনেছে, নইলে চা খাবার জন্য বার বার উঠে দোকানে যেতে হয়। এর সঙ্গে থাকে একটা পাঁউরুটি আর দু-চার পয়সার মাখন। নিতান্ত ক্লান্ত হলে—এক একবার উঠে রাস্তায় খানিকটা ঘুরে আসে—সেই সময় ফ্লাস্কটা নতুন চায়ে ভর্তি করে আনে।

চুমুক দিয়ে বিমলের চা আর ভাল লাগল না। বুকের ভিতরটায় কেমন যেন প্রদাহ অনুভব করছে। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সে কুঁজো থেকে গড়িয়ে খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেয়ে তৃপ্তি পেলে। বিড়ি খেতে ইচ্ছে হল না। একটু চোখ বন্ধ করে বসে রইল।

শেষরাত্রে স্তব্ধ মহানগরী। রূপকথার জনহীন পুরীর মত মনে হচ্ছে। অন্ততঃ এ অঞ্চলটা মনে হচ্ছে। এ অঞ্চলে এমন কোন কারখানা নাই যা দিনরাত্রি চলে। খবরের কাগজের আপিস থাকলে এতক্ষণে রোটারী চলতে সুরু করত। স্টেটস্ম্যান, অমৃতবাজারের মেসিনরুম এতক্ষণে মুখর হয়ে উঠেছে। বসুমতীরও রোটারী আছে। এ ছাড়া আর সব বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন। হাসপাতালে রোগী দু'একজন জেগে আছে। নার্স ঢুলছে। হাঁপানীর রোগীরা উঠে বসে কাশছে, হাঁপাচ্ছে। চোরেরাও আর জেগে নাই; তারা নৈশ অভিযান সেরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেহপণ্যাদের পল্লীতেও তাণ্ডবের আসর ঝিমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে।

হঠাৎ সে উঠল। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল রাজপথের উপর। চিক্ চিক্ শব্দ করে চকিত হয়ে ছুটে পালাল একটা ছুঁচো। তার পায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল একটা প্রকাণ্ড বড় ইঁদুর।

পল্লীগ্রাম হলে হয়তো দেখা যেত সাপ। কিম্বা ঝাপ্ শব্দ করে লাফ দিয়ে পালাত একটা

'ঢাউস বেড়াল'। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেত বাদুড়। গাছ থেকে ডাকত পেঁচা। আর ডাকত অসংখ্য ঝিঁ ঝিঁ এবং লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ।

খাঁ-খাঁ করছে জনহীন রাজপথ। দু ধারে গ্যাসের বাতি জ্বলছে, মধ্যে মধ্যে দু-একটার শিখা কাঁপছে—লালচে হয়ে উঠেছে তাদের শিখা, ম্যাণ্টাল ভেঙে গেছে। কালো পিচ দেওয়া পথের রঙ মনে হচ্ছে ইস্পাতের মত। শীতের রাতে ছাইগাদায় শুয়ে আছে পথবিহারী কুকুর। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলে বিমল। তারপর ফিরে এসে আবার লিখতে বসল। মিহিরের বাবাকে নিয়ে গল্প। কিছুদিন আগে সে তাঁকে দেখেছিল, বর্ষার রাতে ভাঙা ফাটলধরা পুরানো ড্রয়িংরুমে পায়চারি করতে। সেই দিনই তিনি বিক্রী করেছিলেন তাঁর বাড়ী। লালচে কেরোসিনের আলো পড়েছিল তাঁর পীত পাণ্ডুর দেহবর্ণের উপর। অদ্ভুত দৃষ্টি ছিল তাঁর চোখে। অতীতকালের স্বপ্ন দেখছিলেন বোধ হয়। অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল বিমলের। তাঁর জীবন আজও শেষ হয় নি কিন্তু গল্প তাকে শেষ করতে হবে। তাই সে ভাবছিল। পুরানো বাড়ীখানা ভাঙতে সুরু করেছে এইটুকু সে জানে। মিহিরের বাবা কোথায় তা সে জানে না। মিহিরকেও সে জিজ্ঞেস করতে পারে নি। তাই তাকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে।

হঠাৎ মনে পড়ল তার নিজের বাপের কথা। মনে পড়ল তার শেষ জীবনে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় মহলটি বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। এর পর তিনি আর বাইরে বড় বের হতেন না। দিনে থাকতেন পূজো অর্চনা নিয়ে, শাস্ত্রপাঠও করতেন, গভীর রাত্রে তিনি গিয়ে উঠতেন ছাদে। মনে পড়ছে কতদিন ঘুম ভেঙে গিয়ে সে শুনতে পেত ছাদের উপর ভারী পায়ের খড়মের শব্দ বাজছে খট-খট, খট-খট। মধ্যে মধ্যে শব্দ বন্ধ হত। সে শুনেছে, তার মা বলতেন—আর তিনি তাকিয়ে থাকতেন উত্তর দিকের দূরের গাছপালার দিকে; রাত্রির অন্ধকারে গাছপালা স্পষ্ট দেখা যেত না কিন্তু তিনি নাকি বলতেন, ওই ডিহি শ্যামপুরের অশত্থগাছের মাথা, ঐ তারাসায়রের পাড়ের শালবনের শোভা, দেখতে পাচ্ছ ?

হাতে কলম তুলে নিয়ে সে লিখতে বসল।

"শেষ রাত্রির মহানগরী! নিস্তব্ধ, কিন্তু আলোকিত। জনহীন পথঘাট। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নতুন তৈরী বিশাল প্রশস্ত কংক্রিট করা পথের ধারে জ্বলছে ইলেক্‌ট্রিক আলোর সারি- সেই পথের ধারেই একটা বিশাল পুরানো ধ্বংসস্তূপ। অর্ধেক ভাঙা হয়েছে—ছাদ নাই, দরজা জানালা ছাড়ানো হয়ে গেছে। একদিকে সাজিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। ভাঙা ইট এবং পুরানো চুন সুরকীর গাদা পড়ে আছে।

তারই উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ; পীত পাণ্ডুর বর্ণ, শীর্ণ দেহ, চোখে মৃতের দৃষ্টির মত স্থির ভাবলেশহীন দৃষ্টি। বিশাল পুরানো বাড়ীটার প্রাণপুরুষ, অতীতকালের যক্ষ, মুক্তি পেয়েও বিব্রত হয়ে পড়েছে; মাথার উপরে গ্রহতারকার দীপ্তময় মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে ভাবছে কোথায় যাবে ? মধ্যে মধ্যে নিজের পাঁজরায় হাত বুলায়, মনে হয় পাঁজরাগুলি ভেঙে গেছে—বুকের মধ্যে জমে উঠেছে অস্থিপঞ্জরের ভগ্নস্তূপ, ঠিক এই চুন সুরকীর ভগ্নস্তূপের মতই। কদর্য লাগে নূতন কালের ইমারতগুলি, গড়িয়ে আসে চোখ থেকে জলের ধারা। রাত্রি শেষ

হয়ে আসে। অকস্মাৎ এক সময় বড় বস্তীর ধারের ইলেকৃটিক আলোগুলি নিভে যায় এক সঙ্গে। আবছা অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে যায়। তারপর ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটতে থাকে কিন্তু মূর্তিকে আর দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে সে মূর্তি মিলিয়ে গেছে বোধ হয়। সকালে শুধু দেখা যায় ওই ইট চুন সুরকীর স্তূপের উপর পড়ে আছে ছেঁড়া একটা শালের টুকরো; জীর্ণ পুরানো শালের আঁচলার খানিকটা। মজুরের মেয়েরা কুড়িয়ে নিয়ে যায়, ছেলেদের খেলা করতে দেবে।

সকাল বেলা ওদিকে মিহির বের হয় তার কাজে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ পদক্ষেপে সে চলে—ডকের ওখানে তাকে সাড়ে সাতটায় পৌছুতেই হবে। সে এখন কাজ নিয়েছে ডকের নূতন কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেণ্টে।"

শ্রী পত্রিকার সম্পাদক কঠিন ধাতুতে গড়া মানুষ। মোটা নাক, বড় বড় চোখ, বলিষ্ঠ চেহারা, যেমন হাস্যরসিক তেমনি অপ্রিয়ভাষী। এই দুয়ের যেখানে সংমিশ্রণ হয় সেখানে লোকটির জুড়ি মেলা ভার। আর একটি দুর্লভ গুণ মজলিসী শক্তি। সকাল আটটা থেকে চেয়ার জুড়ে বসেন—খাওয়া নাই স্নান নাই ঘর নাই সংসার নাই আছে শুধু কাগজের আপিস আর লেখকের দল, একদল আসে একদল যায়, গল্প লেখক, প্রবন্ধ লেখক, চিত্রশিল্পী, প্রফেসর, ধনীর সন্তান মায় রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত।

চায়ের পেয়ালা খালি বা ভর্তি টেবিলের উপর আছেই। মধ্যে মধ্যে টোস্ট ডিম আসে। কখনও চলে নূতন কালের সাহিত্যের কঠোর সমালোচনা, কখনও চলে নূতন কালের প্রশস্তি; অর্থাৎ যখন যাদের দল ভারী থাকে তখনই চলে তাদের মতের উচ্চ ঘোষণা।

সম্পাদক বিজয়বাবু কোন ক্ষেত্রেই বিশেষ মত প্রকাশ করেন না, শুধু হুঁ-হাঁ করে যান মধ্যে মধ্যে, সুযোগ পেলেই রসিকতা করে হাসির উল্লাসে জমিয়ে তোলেন আসরকে। মধ্যে মধ্যে লোকটির অকপট চেহারা বেরিয়ে পড়ে। সে কিন্তু কদাচিৎ।

গল্পটি নিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে ঘরে ঢুকল বিমল। এঁদের এই আসরে প্রত্যেকেই তার চেয়ে খ্যাতিমান। এবং সকলেই এই গ্রাম্য লোকটির প্রতি বেশ একটু অবজ্ঞা পোষণ করে থাকেন। সে বিমল জানে। কিন্তু তাকে জয় করতেই হবে। জেনে শুনেও সে আসে লেখা নিয়ে, চেষ্টা করে সম্পাদককে একা পেতে। একা তাঁকে শুনিয়ে লেখাটি তাঁর হাতে দিয়ে চলে যায়। অনেক সময় দলের ভিড় এসে পড়লে চুপ করে একপাশে থাকে। এদের তরল উচ্ছ্বসিত সংস্কৃতি-বিলাস চোখ মেলে চেয়ে দেখে। মজার কথা হচ্ছে—বিমল এই কবি ও গল্প লেখকদের সকলের চেয়েই বয়সে বড়, কিন্তু সে এখানে বসে থাকে সকলের কনিষ্ঠের মত।

শুধু নীরেন তার একমাত্র সমবয়সী এ দিক দিয়ে—অর্থাৎ এই অবজ্ঞাত সহকারী সম্পাদক-টিই তার একমাত্র অন্তরঙ্গ। আর সম্পাদক বিজয়বাবু অন্তরঙ্গ না হলেও তাকে বুঝতে চেষ্টা করেন। এক ক্ষেত্রে বিমলের কাছে বিজয়বাবুকে ঠকতে হয়েছে।

শ্রী পত্রিকা প্রথম বের হচ্ছে সেই সময়ের কথা। এই আপিসেই বিজয়বাবু প্রত্যেককেই লিখতে অনুরোধ করলেন তাঁর কাগজে, শুধু বিমলকে অনুরোধ করলেন না। কথা দু'চারটে বললেন—অবশ্য—তাও আরও দু'চারটে সিঙাড়া কচুরী নেবার অনুরোধ জানিয়ে। সিঙাড়া

কচুরী বিমল খেলে না কিন্তু উঠেও গেল না আসর থেকে। সেই আসরেই ঠিক হয়ে গেল প্রথম সংখ্যার লেখক তালিকা। গল্প লিখবেন স্থির হল বিখ্যাত গল্পলেখক সূর্য লাহিড়ী এবং কমল রায়। আসরের শেষে উঠে গেল বিমল। সন্ধ্যায় নীরেন তার বাসায় এসে তার কাছে কাতর ভাবেই ক্ষমা চাইলে, সে-ই তাকে একরকম জোর করে নিয়ে গিয়েছিল ওই আসরে। প্রত্যক্ষ ভাবে বিজয়বাবুর সঙ্গে বিমলের আলাপও সেই প্রথম। বিমল হেসে সেদিন নীরেনকে বলেছিল—বোস, ও সব কথা ছেড়ে দে। কাল রাত্রি থেকে একটা লেখা সুরু করেছি, শুনবি? শেষ হয় নি তবু শোন না খানিকটা—।

লেখা যতদূর হয়েছিল পড়া শেষ হতেই নীরেন তার হাত চেপে ধরে বলেছিল—লেখাটা শেষ কর। আর আমায় না বলে কোথাও দিবি না বল?

—দেব না?

—ওরে তুই যেন হঠাৎ সোনার কাঠি খুঁজে পেয়েছিস। লিখে ফেল বিমল—লিখে ফেল।

সত্যিই সোনার কাঠি হঠাৎ খুঁজে পাওয়া। লেখা শেষ করে সে নিজেও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। লেখাটার শেষের দিকে বিজয়বাবুর প্রত্যাখ্যানজনিত ক্ষোভটাই হয়তো সে সোনার কাঠি খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল।

নীরেন গল্পটা চেয়ে নিয়ে শুনিয়েছিল বিজয়বাবুকে। বিজয়বাবু লেখাটি শুনে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি করে এসে বিমলের টিনের ঘরে হাজির হয়েছিলেন। বলেছিলেন লেখাটি আমায় দিতে হবে। এই প্রথম সংখ্যাতেই ছাপব আমি, সূর্যবাবুর লেখা দ্বিতীয় সংখ্যায় যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে পনেরোটি টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন—শ্রীতে আপনাকে লিখতে হবে, নিয়মিত ভাবে লিখতে হবে। আপিসের আসরে যাবেন।

আসরে সে আসে, চুপ করে একপাশে বসে থাকে, শোনে। বড় বড় কথা, অধিকাংশই ইউরোপীয় সাহিত্যের কোটেশন। মোটামুটি ওমরখৈয়ামী ধারা—জীবন একপেয়ালা আনন্দ-রস, তার উপর জমে আছে বেদনার ফেনা।

তাকে দেখেই বিজয়বাবু বললেন—আপনার জন্তে বসে আছি। বসুন। ওরে চা নিয়ে আয়। পড়ুন লেখা পড়ুন।

লেখাটি হাতে দিয়ে বিমল বললে—আপনি দেখুন। আমার শক্তি নেই আর। ঘুমে চোখের পাতা ভেঙে পড়ছে। চাও খাব না, কাল থেকে দিনরাত চা খেয়ে আছি।

বিজয়বাবু মজলিসে উপস্থিত লোকগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন—থাক এখন।

—আমি উঠি।

না। ভিতরের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে নিন খানিকটা।

একখানা বইয়ে ঠাসা ঘর, বিজয়বাবুর লাইব্রেরী, তারই মধ্যে একটা ক্যাম্পখাটে একটা বিছানা পাতাই আছে। মধ্যে মধ্যে বিজয়বাবু এখানেই রাত্রি কাটিয়ে থাকেন। পত্রিকা বের হবার আগে দুদিন থাকতেই হয়, তা ছাড়াও থাকেন—কবিতা লেখার নেশা চাপলে সেদিন আর বাড়ী যান না। আর দু'চার দিন থাকেন; বইয়ের আলমারীর ফাঁকে প্রকাণ্ড

বিয়ারের বোতল রাখা রয়েছে। আলমারীর পিছনে আরও দু'চারটে ছোট বোতল খুঁজলে পাওয়া যাবে। জটিল চরিত্রের লোক বিজয়বাবু। লেখক দলের এক গোষ্ঠী আছে যাদের নিয়ে এই হৈ হৈ করে বেড়ানোও তাঁর জীবনের একটা দিক।

বিয়ারের বোতলটার দিকে তাকিয়ে বিজয়বাবুর কথা ভাবতে ভাবতেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিজয়বাবু ডেকে তার ঘুম ভাঙালেন। বিমলের মুখের ওপরেই সিলিং থেকে ঝুলছে ষাট ক্যাণ্ডেল পাওয়ার ইলেকট্রিক বাল্ব, আলোটা জ্বলছে। তীব্র আলো, চোখে লাগল। বিজয়বাবু বললেন—উঠুন। রাত্রি নটা বাজে। নীরেন!

নীরেন উত্তর দিলে—যাই।

পাশে বাথরুমের দিকে দেখিয়ে বিজয়বাবু বললেন—যান, মুখ হাত ধুয়ে আসুন।

মুখ হাত ধুয়ে ঘরে এসে বিমল দেখলে—নীরেন এসেছে, টেবিলের উপরে তিনটি প্লেটে ডবল ডিমের মামলেট—আর চা।

বিজয়বাবু বললেন—খেয়ে নিন। তারপর গল্পটা পড়ুন। আপনার মুখে শুনব।

বিমল শঙ্কিত হল। পড়তে পড়তে তা হলে কি সে নিজেই বুঝতে পারবে লেখাটা ভাল হয় নি?

বিজয়বাবু তাড়া দিলেন—পড়ুন।

সঙ্কোচ রেখে বিমল খাতাটা টেনে নিলে। ব্যর্থ হয়ে থাকে—তাতেই বা কি? বইতে পারবে সে ব্যর্থতার বোঝা। পড়তে আরম্ভ করল সে।

—মহানগরী কলকাতার এক প্রাচীন অভিজাত বংশীয়ের প্রায় দেড়শো বছরের পুরানো বাড়ী।

গল্প শেষ করলে বিমল। বিজয়বাবু বড় বড় চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন তার দিকে। চোখে শিরার জাল রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে নেশা করেছেন তিনি। নীরেনও চুপ করে বসে রয়েছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিজয়বাবু বললেন—দিন লেখা।

নীরেন আবার হেসে বললে—বড় জবর লিখেছিস রে বিমলা।

গভীর স্বরে বিজয়বাবু বললেন—জবর মানে? বাংলা সাহিত্যের পাঁচটি শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে এটি একটি। যাও দিয়ে এস প্রেসে। কম্পোজিটার বসে আছে। কাল সকালে শেষ হওয়া চাই।

নীরেন চলে যেতেই, বিজয়বাবু বললেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে।

বিমল তাঁর মুখের দিকে তাকালে।

বিজয়বাবু বললেন—আপনি সকলের সামনে এমন চুপ করে বসে থাকেন কেন? ওদের সামনে লেখা পড়তে চান না—।

বিমল তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। বিজয়বাবু বিস্মিত হলেন তার দৃষ্টি দেখে। এমন দৃষ্টি যে এই লোকটির চোখে ফুটতে পারে এ ধারণা তাঁর ছিল না। কথা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

বিমল বললে—হয়তো আমারই দোষ। ওঁরা ভাবেন দুঃখের ফেনা মাথায় করে জীবন এক পেয়ালা আনন্দ। আমি তা ভাবতে পারি না বিজয়বাবু।

চমকে উঠলেন বিজয়বাবু। এতখানি গভীর-গম্ভীর উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন নাই।

বিমল বললে—ওই ধারায় যদি আমাকে ভাবতে বলেন; তবে আমি বলব সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বট পাতা মাথায় দিয়ে আনন্দের ধ্যান করব আমি।

বিজয়বাবু আবার স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বিমলের দিকে। এ যেন নূতন করে পরিচয় হচ্ছে তাঁদের উভয়ের মধ্যে।

হঠাৎ কাঠের সিঁড়িতে একদল লোকের জুতোর শব্দ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের হাসি। বিমল প্রশ্ন করলে—এত রাত্রে কারা ?

বিজয়বাবু গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। বিরজাদের দল আসছে। বিরজা বিখ্যাত গল্প লেখক, নকুল তার ভক্ত কবি, রতন—বাংলা সাহিত্যের নবীনতম লেখক—বিজয়বাবু ওকে বলেন ডার্ক হর্স, ভূপেন এবং আরও কয়েকজন। লম্বা বাবরী চুল আঙুলে জড়িয়ে পাক দিতে দিতে ভূপেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করছে। চমৎকার আবৃত্তি করে ভূপেন, পড়াশুনাও তেমনি প্রচুর। আরও একটি গুণ আছে ভূপেনের। জীবন তার খোলা খাতা। সে ভালবাসে এক অভিনেত্রীকে। স্ত্রী পুত্র সকলকে পরিত্যাগ করে সে তার সঙ্গে ঘর বাঁধবার ভূমিকা রচনা করছে। মধ্যে মধ্যে দশ দিন বারো দিন একাদিক্রমে সেখানেই থাকে, সকলকেই ঠিকানা দিয়ে রেখেছে—'দরকার হলে বাড়ীতে না পেলে সেখানে পাবে আমাকে।' অসঙ্কোচে বলে সে। এর জন্য বিমল ভূপেনকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে; কিন্তু ওই ভূপেনই যখন এসে বলে, 'কিছু টাকা আমায় আজ দিতেই হবে বিজয়বাবু। বাড়ীতে বউ বিয়ের বেনারসী পরে রান্না করছে অর্থাৎ কাপড় না কিনলেই নয়। টাকাটা অবশ্য এ্যাডভান্স।' তখন বিমল ক্ষুব্ধ হয়।

বিমল উঠল, বিজয়বাবুকে বললে—চললাম আমি তা হলে।

এককালে ভারতবর্ষে সাহিত্য রচনার কেন্দ্র ছিল বনভূমি। দেবতার স্তবগান রচনা করতেন ব্রাহ্মণেরা। তারপর রাজার সভায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন কবিরা। রাজার স্তবগান মিশিয়েছিলেন তাঁরা দেবতার স্তবের সঙ্গে। মুসলমান আমলে হিন্দু কবিরা গ্রামে পাতার কুটীরে বসে গান রচনা করে গানের দল নিয়ে বেড়াতেন। একালে মহানগরীতে সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল স্থাপিত হয়েছে। ছাপাখানা বসেছে, প্রকাশকেরা দোকান খুলেছে, কবি লেখকদের রচনা বই হয়ে বেরুচ্ছে—বিক্রী হচ্ছে সর্বসাধারণের মধ্যে। অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষের কথা এসেছে। মুক্ত হয়েছে রাজার স্তবগান করার লজ্জা থেকে। রাজা গুণী হলে গুণীর গুণগানে লজ্জা নাই কিন্তু রাজার গুণগান আশ্রয়ের জন্য—অন্নের জন্য—সে যে দাসত্ব, চাটুকারবৃত্তি। চাই জীবনের জয়গান। যে জীবন মাটির তলায় বীজ ফাটিয়ে উদ্গত অঙ্কুরের মত আকাশ-লোকে আলোক স্নানে যাত্রা করতে চায় বনস্পতির মত সেই জীবনের জয়গান। মাটির কঠিন আস্তরণকে চৌচির করে ফাটিয়ে ঠেলে পথ করে নেওয়ার কষ্টে প্রাণান্তকর বেদনায় জর্জর অথচ আনন্দের তপস্যায় বিভোর সেই জীবনের গান। সমস্ত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা

বাধা বিঘ্নকে ঠেলে সে উঠতে চাচ্ছে। দিকে দিকে তার অভিব্যক্তি। যত দুর্বার গতি তার, তত বিরাট বাধা তার সম্মুখে, যত কঠিন বাধা তার পথে তত বিপুল জয় তার, সুখ এবং দুঃখে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িয়ে আছে দিন এবং রাত্রি আলোক এবং অন্ধকারের মত। এই বেদনা এই আনন্দ মর্মে মর্মে অনুভব না করলে কি সে গাইতে পারে এই গান?

হন হন করে হেঁটেই চলেছিল বিমল। মনের খুশীতে এবং উত্তেজনায় ভাবতে ভাবতেই চলেছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে মনোহর-পুকুর রোড। এসপ্ল্যানেডের মোড়ে সে থমকে দাঁড়াল। একখানা শ্যামবাজারের ট্রামে জানালার ধারে অরুণা বসে রয়েছে। অরুণার ওপাশে কে? পিনাকী? ঝাঁকড়া চুল, পুরু চশমার একখানা কাচ দেখা যাচ্ছে। পিনাকীই তো!

চৌরঙ্গী পার হয়ে বিমল এসপ্ল্যানেড এল। অরুণা এবং পিনাকীই বটে। পিনাকী অপ্রতিভের মত হেসে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতে নমস্কার করলে। বললে—ওঁকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলাম চাকরির জন্যে।

অরুণা বললে—একটা অনাথ আশ্রমে ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে।

গম্ভীরভাবে বললে কথাটা, রাজ্যের ভাবনার ছায়া নেমেছে অরুণার মুখে। গম্ভীর মুখে সে ময়দানের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরেই বললে—আমি অনেক ভাবলাম, ওখানে ওই ভাবে দর্জির কাজ—। কথাটা শেষ না করে সে ঘাড় নাড়লে বারবার।—পারবে না, সে তা পারবে না।

পথে ভবানীপুর চক্রবেড়ের ধারে বিমল নেমে পড়ল ট্রাম থেকে। এইখানে একটা পাইস হোটেল আছে, সেখানে খেয়ে বাসায় ফিরবে। অরুণা কোন কথা বলল না, সে ভাবছে। পিনাকী একটু হাসলে।

খেয়ে বাসায় ফিরে দরজা খুলতে গিয়ে সে চমকে উঠল। কে বসে রয়েছে দরজায়?

—কে?

—আমি, পিনাকী।

—পিনাকী?

—হ্যাঁ। আজও একটু শোব এখানে। ট্রামে উঠতে গিয়ে দেখি পকেটে একদম পয়সা নেই। একখানা দু টাকার নোট যেন ছিল। কিন্তু—

অন্ধকারে দেখতে না পেলেও বিমল অনুভব করলে সে অপ্রতিভের মত হাসছে।

—লাবণ্যদির কাছে গেলে দিতেন কিন্তু বড্ড বকতেন। আমারও লজ্জা লাগল।

বিমল হেসে বললে—ওঠ, দরজা খুলি।

দশ

পিনাকীর মাথাটা বোধ হয় খারাপ।

সমস্ত রাত্রিটাই প্রায় বকেছে। আপন মনে নয়, নিজে বকেছে এবং বিমলকে শুনিয়েছে। বিমল শুনবে না আর নিজে সে বকে যাবে—তা হবে না। বিমল যতবার চেষ্টা করেছে ততবার সে ডেকেছে, ঘুমুলেন না কি?

সাড়া না দিলেও সে ক্ষান্ত হয় নাই—আবার ডেকেছে—বিমলবাবু!

তাতেও সাড়া না দিলে—উঠে আলো জেলে গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছে—বিমলবাবু!

একবার বিরক্তি প্রকাশ করে বিমল বলেছিল—পিনাকী এবার তুমি আমাকে সত্যিই বিরক্ত করে তুলেছ।

—তা হলে আমি বাইরে গিয়ে বসি, সিঁড়িটায় বসে চুরুট খাই?

—এই শীতের রাত্রে? তুমি পাগল না কি? শুয়ে পড়।

—আমার ঘুম আসছে না বিমলবাবু। অপ্রতিভের মত সে হাসলে।

—কি? তোমার হল কি।

কি যে হয়েছে—এই কথাটা এখনও পর্যন্ত বললে না পিনাক এবং ঠিক বুঝতেও পারে নি বিমল। কথা আরম্ভ করেছিল সে অরুণার চাকরি প্রসঙ্গ নিয়ে। তার বুদ্ধি, তার দৃঢ়তা, তার সাহস সম্পর্কে শত-উচ্ছ্বাসময় প্রশংসা করেই এসেছে এতক্ষণ। অনাথ আশ্রমে প্রাথমিক ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর পদের জন্যে সে তাকে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে—আশ্রমের অধ্যক্ষ নাকি বলেছেন—আপনি—আমাদের এখানে কুমারী হলে চলবে না, বিবাহিতা হওয়া চাই, শুধু বিবাহিতা নয়, সধবা হতে হবে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অধ্যক্ষের মুখের দিকে চেয়ে অরুণা বলেছে—কেন বলুন তো?

—এই নিয়ম করে রেখেছেন কর্তৃপক্ষ।

এর উত্তরে অরুণা এই নিয়মের যে ব্যাখ্যা করেছে অধ্যক্ষটির মুখের উপর—সে শুনে পিনাকী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। বলতে বলতে উত্তেজনায় বিছানার উপরে উঠে বসে শতমুখ হয়ে বলে—অদ্ভুত মেয়ে, বিমলবাবু—অদ্ভুত মেয়ে। বললে কি জানেন? বললে—সার্কাসে বাঘ সিংহের আফিং খাওয়ায় শুনেছি, আপনারা শিক্ষয়িত্রীদের স্বামীদের কি খাওয়ান? কথাটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল লোকটা। অরুণা আবার হেসে বললে—সার্কাসে অবশ্য চাবুকও মারে আফিংয়ের সঙ্গে। এখানে হয়তো চাবুকই চালান আপনারা। কারণ শিক্ষয়িত্রীদের স্বামীরা কখনই বাঘের জাত নয়, গরু-গাধার জাত! বলেই বেরিয়ে এল। সমস্ত রাস্তাটা আমি অরুণার সেই বেরিয়ে আসবার সময়ের মূর্তি ভেবেছি। বুঝলেন—ভেবেছি ঠিক নয় ধ্যান করেছি। কল্পনা করেছি—কালো বিদ্যুতের রূপ। কালো বিদ্যুৎ মনে ভাবা যায়…কিন্তু ছবিতে আঁকা যায় না।

বিমল এবার পাশ ফিরে শুয়ে বললে—আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড় পিনাকী। ঘুম না

আসে তো—অন্ধকারে শুয়ে ভাবো—কি ভাবে কালো বিদ্যুৎকে রূপ দিতে পার। আমার ঘুম পাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরেই আবার ডাকলে—ঘুমুলেন নাকি—শেষ পর্যন্ত উঠে আলো জ্বেলে গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে—বিমলবাবু।

সকালে উঠে বিমল বিস্মিত হয়ে গেল। পিনাকী সত্যই দরজার বাইরে সিঁড়িতে বসে আছে। বিমলকে দেখেই সে বললে—আমি বাসায় যাচ্ছি বিমলবাবু।

—বাসায় যাচ্ছ? কিন্তু সারা রাত্রি তুমি এই বাইরে বসেছিলে নাকি?

অপ্রতিভের মত হেসে বললে—ঘরের মধ্যে মনে হল বড্ড গরম। ঘুম কিছুতেই এল না। বাইরে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আরাম পেলাম। খানিকটা ঘুমও হয়েছিল।

উঠে ঘরের মধ্যে কম্বলটা রেখে—নমস্কার করে সে বললে—চললাম। কাল রাত্রে বড্ড বিরক্ত করেছি আপনাকে।

বিমলের মনে পড়ে গেল—কাল রাত্রে পয়সার অভাবে পিনাকী বাসায় ফিরতে পারে নাই। এতটা রাত্রে এসপ্ল্যানেডে গিয়ে আবার ওদিকের ট্রাম না পায় এই জন্যে বিমল পয়সা দিয়ে তাকে যেতে বলে নাই। কথাটা মনে পড়তেই সে পিনাকীকে ডেকে বললে—দাঁড়াও। শোন।

পিনাকী বললে—বলুন। ভারী তাড়া রয়েছে আমার।

এক টাকার একখানা নোট তার হাতে দিয়ে বিমল বললে—সারারাত্রি ঘুমোও নি। হেঁটে যেয়ো না। ট্রামে বা বাসে যাও।

নোটটা হাতে নিয়ে সে বিমলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বিমল তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ না দেবার জন্যই ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু পিনাকী দরজায় এসে ডাকলে, বিমলবাবু।

—কি? আবার ফিরলে যে! এদিকে তাড়াতাড়ি আছে বলছিলে।

অকুণ্ঠিত ভাবেই পিনাকী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—আমাকে আর চারটে টাকা দেবেন? মানে পাঁচ টাকা ধার চাচ্ছি।

বিমল সন্তুষ্ট হল না। কপাল কুঁচকে উঠল তার। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করলে সে।

পিনাকী বললে—খুব দরকার আমার। পেলেই দিয়ে দেব আপনাকে। না পারি বইয়ের কভার ডিজাইন করে দেব আপনার। দেবেন?

বিমল কোন কথা না বলে চার টাকা এনে পিনাকীর হাতে দিয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। টাকা দিতে হওয়ায় মন তার বিরূপ হয়ে উঠল পিনাকীর উপর। ছোকরা যাকে বলে কুগ্রহের মত এসে তার জীবনযাত্রার নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে সুরু করেছে। ও যেদিন আসে সে দিন আর সকালে বেড়ানো হয় না। বেলা অনেক হয়ে গেছে। সাড়ে সাতটা বাজে। তবু ভাল যে আজ তার কোন তাগিদের কাজ নাই।

প্রাতঃকৃত্য সেরে চা খেতে বেরুবার মুখেই চিত্ত বললে—কাল সন্ধ্যের পর মিহিরবাবু বলে সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন দাদা।

—মিহিরবাবু!

—হ্যাঁ। আপনার দরজার গোড়া থেকে ফিরছেন—আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। আমি দেখেই চিনেছি—সেই সেদিনের ভদ্রলোক। কালীকাকা বলেছিল—দর্জিপাড়ার বোসেদের বাড়ীর ছেলে। আমাকে কিন্তু চিনতে পারে নি ভদ্রলোক। কয়লা চালছিলাম নিজেই, একেবারে কুলির মত চেহারা হয়েছিল। আমি বললাম—বিমলবাবুকে চান বুঝি? কিন্তু তাঁর তো ফিরতে দেরি হবে। আমাকে বললে আমি বলতে পারি। বলুন কি দরকার?

চিত্তরঞ্জন কথা বলতে সুরু করলে থামতে চায় না। একজন কেউ অনর্গল কানের পাশে নিতান্ত নিরস ভাবে বকে গেলে মানুষ যে কি যন্ত্রণা অনুভব করে—চিত্ত নিজে বুঝতে পারে না, বেচারী কানে কালা। ওকে থামিয়ে না দিলে ও বকেই যাবে। বিমল তাকে বাধা দিয়ে বললে—বুঝতে পেরেছি। আজ বিকেলে আসবেন বলে গেছেন তো!

চিত্ত কথা শোনে মুখের দিকে তাকিয়ে, অর্ধেক শুনে বোঝে—অর্ধেক বোঝে ঠোঁট নাড়ার ভঙ্গি দেখে। বিমল মাঝখানে অতর্কিত ভাবে কথা বলার জন্যে সে সতর্ক ছিল না তাই কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নাই। সে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলে—কি বলছেন?

বিমল নিজেই ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে স্পষ্ট কিন্তু অনুচ্চ স্বরে বললে—আজ বিকেলে আসবেন বলে গেছেন তো?

চিত্ত ঘাড় নাড়লে—অর্থাৎ—না।

—তবে?

—আসবেন না বলে গিয়েছেন।

—আসবেন না?

—না। ভদ্রলোকের বাবা মারা গিয়েছেন কি না। বোধ হয় অশৌচের মধ্যে আসতে অসুবিধা হবে।

—বাবা মারা গিয়েছেন? চমকে উঠল বিমল। বিশাল প্রাচীন ফাটলধরা প্রাসাদের মধ্যে একটি শীর্ণ বিবর্ণদেহ মানুষের ছবি ভেসে উঠল তার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে। রক্তাভ কেরোসিন ল্যাম্পের অপর্যাপ্ত কম্পিত আলোয় আলোকিত প্রশস্ত ধূলিমলিন ঘরের মধ্যে স্ফটিকের চোখের মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে মন্থর ক্লান্ত পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কলকাতার ঊনবিংশ শতকের সভ্যতা আভিজাত্যের জীর্ণ প্রতিভূদের অন্যতম ব্যক্তি চলে গেছেন।

চিত্ত বললে—হার্টফেল করে মারা গেছেন বোধ হয়। অদ্ভুত মৃত্যু! বুঝেছেন কি না!

—কে বললে তোমাকে?

—শ্রীচন্দ্রবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। ওখানেই শুনলাম। বোসেদের বাড়ীটা কিনেছে যারা তাদের কাছ থেকে ওই বাড়ীর পুরনো মেটিরিয়েল

কিনেছেন শ্রীচন্দ্রবাবুরা। ওঁরা আজকাল ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্টের ব্যবসা করছেন জানেন তো। কাঁকুলের ওই দিকে অনেক জমি কিনে রাস্তা করে প্লটে-প্লটে ভাগ করে বিক্রী করেছেন; দু'চারখানা বাড়ী করেও বিক্রী করছেন; অনেক ব্যাপার আছে। পুরনো মেটিরিয়েলের ইট দরজা জানালা লাগাবেন সেই সব কাজে; ভাঙা ইট চুন-সুরকী দিয়ে রাস্তা ঘাট তৈরী করবেন। বাড়ীটার মেটিরিয়েল কিনবেন তিরিশ হাজারে—তা মাল যা মিলবে তাতে অন্ততঃ পঁয়ষট্টি সত্তর হাজারের মার নাই, বুঝেছেন কি না, আরে বাপ্‌রে—কড়ি বরগা দরজা জানালা—সে কত! আর সে সব কাঠ কি? ফার্স্টক্লাস টীক—এ রকম টীক আজকাল আর জন্মায় না।

বিমল চিত্তর হাত ধরে তাকে সচেতন করে দিয়ে বললে—আঃ চিত্ত, বোস মশায়ের কথা বল। শ্রীচন্দ্রবাবুর ভাগ্য ভাল, কাঠ কেন, বাড়ীর ধুলোর মুঠোও তাঁকে পয়সা দেবে। সে কথা থাক।

চিত্ত বললে—পরশু সকালে লোক দেখে বোস মশায় ওই ভাঙা বাড়ীর ইট কাঠ ধুলোর গাদার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন।

চমকে উঠল বিমল।

কালই সে তার গল্পটা শেষ করেছে—লিখেছে—শেষরাত্রির মহানগরী। আলোকিত কিন্তু জনহীন, প্রাণহীন যক্ষপুরীর মত। নতুন প্রশস্ত পথের ধারে বিশাল বাড়ীর ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে পীত পাণ্ডুরবর্ণ শীর্ণ দেহ, চোখে স্ফটিক চক্ষুর মত স্থির ভাবলেশহীন দৃষ্টি, শুভ্র কেশ একটি মানুষ; ধ্বংসস্তূপে পরিণত বিশাল বাড়ীটার প্রাণপুরুষ, অতীত কালের যক্ষ যেন।

চিত্ত বলেই চলেছিল—নানা জনে তো নানা গুজব নানা জল্পনা কল্পনা করেছিল, কেউ বলে আত্মহত্যা করেছেন, বলে বাড়ীর কোথাও গুপ্তধন আছে, তারই সন্ধানে এসেছিলেন—অন্য মন্দ লোকে তক্কে তক্কে ছিল—খুন করে গিয়েছে। শেষে মর্গে গেল—ডাক্তারেরা রিপোর্ট দিয়েছে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন।

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বিমল।

চিত্ত বললে—শ্রীচন্দ্রবাবুরা এখন ভারী বিপদে পড়েছেন। বুঝেচেন কি না। একটু হাসলে চিত্ত।—মানে, কুলিরা কেউ বাড়ী ভাঙতে আসবে না। এর মধ্যে গুজব হয়ে গিয়েছে যে, ওই বুড়োবাবু ভূত হয়ে রাত্রে ঘুরে বেড়ায় আর বাড়ীর ইট কাঠ আগলায়। তার এক কারণও ঘটে গিয়েছে—বুঝেচেন কি না; হয়েছে কি—কাল লরীতে কাঠ বোঝাই করে আনতে গিয়ে একখানা মোটা কড়ি হাত ফসকে একটা কুলির পায়ে পড়ে একেবারে ছাতু হয়ে গিয়েছে। বাস্। আর যায় কোথা! সব একেবারে দে ছুট। এখন শ্রীচন্দ্রবাবুরা মহা মুস্কিলে পড়েছেন, কাজকর্ম সব বন্ধ। ওদিকে পাড়ার সব বওয়াটের দল যে যাচ্ছে তাকেই বলছে—রাত্রে সে কি আওয়াজ রে বাবা, খচ-খচ, খট-খট ঘুরেই বেড়াচ্ছে সারা রাত্রি। তাই এখন শ্রীচন্দ্রবাবু আমাকে ডেকে ধরেছেন—চিত্ত তোর লরী নিয়ে তুই বাপু কাজ আরম্ভ কর—তাহলে দেখা-দেখি লোক আসবে।

বিমলের ভাল লাগছিল না এসব কথা, তার মনের মধ্যে এখন দুটি বিপরীত ভাবনার দ্বন্দ্ব

চলছিল। তার গল্পের মধ্যে ওই অভিজাত বংশীয়ের যে শোচনীয় মানসিকতার চিত্র ফুটে উঠেছে—যা কাকতালীয়ের মত অতি নিষ্ঠুর সত্য পরিণতির সঙ্গে প্রায় মিলে গেছে—তার জন্য মনে মনে কুণ্ঠা বোধ করছিল, ভাবছিল গল্পটি মিহির এবং ওদের আত্মীয়স্বজনের চোখে পড়লে তারা কি মনে করবে? তারা কখনই বুঝবে না, বিশ্বাস করবে না যে, কল্পনা এমন আশ্চর্যভাবে সত্য হয়ে উঠেছে, তারা ভাববে—তাদের বংশের কুৎসা প্রচারের জন্যই সে এমন করেছে। আবার তার কল্পনা এমনভাবে সত্যের সঙ্গে মিলে যাওয়াতেও সে আশ্চর্য আত্ম-প্রসাদ অনুভব করছে। তার ইচ্ছা হচ্ছে এই মুহূর্তেই সে নীরেনের কাছে ছুটে গিয়ে কথাটা বলে আসে। জানিয়ে আসে তার দৃষ্টি কেমন ভাবে সত্যদৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। সে অকস্মাৎ হন হন করে চলতে সুরু করে বললে—আমি চললাম চিত্ত, আমার অনেক কাজ আছে।

চিত্ত ডাকলে, শুনুন শুনুন।

—কি?

—সব কথাই যে বলা হয় নি।

—কি? আর কি কথা?

—শ্রীচন্দ্রবাবুর কাছে যেতে বলেছিলেন আপনাকে। গিয়েছিলেন নাকি আপনি?

—কেন বল তো? কথাটা প্রকাশ করতে চাইলে না বিমল; চিত্ত কতটা জেনেছে সেটাই আগে জানতে চাইলে। চিত্তকে অবিশ্বাস নাই তার কিন্তু অসাবধানতা বশতঃ সে যদি কথাটা বলে বেড়ায় বিশেষ করে কালীনাথের কাছে তবে ক্ষতি হবে।

চিত্ত বললে—যদি গিয়েছিলেন তো গিয়েছিলেন। না গিয়েছেন তো যাওয়ার দরকার নেই। মিহিরবাবু বলতে বলে গিয়েছিলেন আপনাকে।

—ঠিক শুনেছ তো তুমি?

এবার চিত্ত হেসে উঠল, বললে—কানে খাটো বলে বলছেন?

বিমল হেসে ফেললে, বললে—তা বলছি বৈকি। তুমি রাগ করো না যেন।

চিত্ত বললে—কালাকে কালা বললে কালারা রাগ করে কিন্তু আমি করি না।

—তা হলে তুমি ঠিক কালা নও।

এই রসিকতায় চিত্ত প্রচুর হাসতে সুরু করে দিলে। খানিকটা হেসে একটু সংযত হয়ে বললে—তার মানে আপনি বলছেন আমি কালা নই, কালা সেজে থাকি। মানে আমি কালা বলে লোকে গোপন কথাও তো আমার সামনে ফিস ফিস করে বলে না, চেঁচিয়ে বলে—আমি দিব্যি শুনি।

আবার সে প্রচুর হাসতে সুরু করে দিল। বিমলও খানিকটা না হেসে পারলে না; তারপর বললে—আচ্ছা চললাম।

—শুনুন—শুনুন। তবে মজার কথা বলি শুনুন। কাল ঠিক তাই হয়েছে। মধ্যে মধ্যে আমি বেশ শুনতে পাই। মানে বেশী গ্রীষ্ম হলে কি বেশী বর্ষা হলে আমি কানে একদম শুনতে পাই না। কানের পাশে ঢাক বাজালেও না বেশী শীতেও না; কানে যেন ঝাঁপ ধরে

থাকে। কিন্তু না-গরম না-শীত মানে ঠাণ্ডা আরামের দিন হলে বেশ শুনতে পাই, সে একেবারে সহজ মানুষের মত। এই তো এখন এত কথা বললেন—বেশ শুনতে পাচ্ছি।

হেসে বাধা দিয়ে বিমল বললে—এত কথা কিন্তু আমি বলি নি চিত্ত। কথা সব তুমি বলেছ।

চিত্ত আবার হাসতে সুরু করে দিলে। বললে—ওই আমার স্বভাব। কথা বলি না তো বলি না। বলতে আরম্ভ করলে আর থামি না। এখন কালকের কথাটা বলি শুনুন। শ্রীচন্দ্রবাবুর কাছে গিয়ে আর আমি কি করব, চুপ করেই ছিলাম। কিন্তু কানে এই বসন্তের আমেজ পড়েছে এখন বেশ শুনতে পাই। আমি শুনতে পাচ্ছি না মনে করে শ্রীচন্দ্রবাবু একজন পার্টনারের সঙ্গে কাল অনেক কথা বলে গেলেন। আমি তা দিব্যি শুনেছি। কাঁকুলেতে কলোনী করছেন না? ওখানে এক বিধবার বাড়ী নিয়ে ফৌজদারী করেছেন, এ নিয়ে হাঙ্গামাতে পড়েছেন। পাড়ার ছেলেরা এমন মারপিট করেছে ওদের লোকদের যে, গাঁইতি শাবল ফেলে যে যার দৌড় মেরেছে—তাই বলছিল—আমার সামনেই বলছিল, মনে করেছিল আমি শুনতে পাচ্ছি না। বলছিল—ওদিকে ভূত এদিকে ভূতের বাড়ী—পাড়ার যত বওয়াটে ছেলে।

বিমল বুঝতে পারলে—গোপেনদা ছেলেদের নিয়ে তাঁর কাজ সুরু করে দিয়েছেন।

চিত্ত আবার হাসতে লাগল—হাসতে হাসতেই বললে—বুঝেচেন—আমি এমন মুখ করে রইলাম যে কার বাবার সাধ্যি বলে আমার কানে কিছু ঢুকছে। অথচ হাসিতে পেট আমার কব্ কব্ করছে কাদাজলের মাগুর মাছের মত। মনে মনে হাসি আর বলি—বাবাধন, পাড়াগাঁ থেকে এসে কোলকাতায় জেঁকে বসে ব্যবসা ফেঁদেছ। এইবার ফাঁদে নিজেই পড়েছ। এ সব বাবা কলকাত্তাই ছেলে, গাঁইয়া নয়। এরা বাবা পীরকে মানে না। মামদোর বাড়া এরা।

বিমল আবার যেতে উদ্যত হল। চিত্ত এবার তাকে না থামিয়ে তার সঙ্গ নিলে। বিব্রত হয়ে বিমল বললে—ডিপোয় যাবে না?

—ডিপো তো আছেই, চলুন আপনার সঙ্গে যাই খানিকটা। কোথায় যাচ্ছেন?

—দাদার দোকানে, চা খেতে।

—দাদার দোকানে? ওই চোরটার দোকানে? যান আপনি, ওখানে আমি যাব না। দাদার সঙ্গে চিত্তর ঝগড়া হয়ে গেছে কয়লার দাম নিয়ে। দাদা প্রতিবারই অভিযোগ করে—কয়লা খারাপ। সেই অজুহাতে অন্তত মণকরা দুটো পয়সাও না কেটে দাম দেয় না।

চিত্ত বলে—চেয়ে নাও দুটো পয়সা দিচ্ছি। কিন্তু জবরদস্তি কি ভাঁওতা দিয়ে এক আধলা দিতে দেব না।

দাদা বলে—খারাপ জিনিস দিয়ে ভালো জিনিসের দাম নেবে—সে দেব কেন?

এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। সেই ঝগড়ার কারণে বিমল আজ চিত্তর কবল থেকে নিষ্কৃতি পেলে।

দাদার দোকানে চা খেয়ে বেরিয়ে পথে সে নেমেছে এমন সময় একখানা মোটর তার

পাশ দিয়ে বেরিয়ে খানিকটা এগিয়েই ব্রেক কষে সশব্দে থেমে গেল। গাড়ীর ভিতর থেকে মুখ বের করে শ্রীচন্দ্রবাবু তাকে ডাকলেন—বিমল, বিমল।

বিমলকে এগিয়ে যেতে হল। গাড়ীর মধ্যে শ্রীচন্দ্রবাবু একা নন—কালীনাথও রয়েছে। কালীনাথকে দেখে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

শ্রীচন্দ্রবাবু বললেন—এস, গাড়ীর মধ্যে এস।

—কোথায়?

—আরে এস না। শ্রীচন্দ্রবাবুর বাড়ীতে যাব—চা খাব—গল্প করব খানিকটা। কালীনাথ বললে।

—আমার কাজ আছে কালীকাকা। লেখা দিতে হবে।

শ্রীচন্দ্রবাবু হেসে উঠে বললেন—আরে বাপ্ রে। সাহিত্যিকেরাও কাজের লোক হয়ে উঠল। কি সর্বনাশ! আমাদের রুটি এইবার মারা গেল দেখছি।

হেসে বিমল বললে—আপনারা রুটি খান না শ্রীচন্দ্রবাবু—লুচি খান। ভাতও খান না—পোলাও খান। সুতরাং ভাগ্যে যদি রুটি কি ভাত জোটে তবুও আপনাদের পাতে আমাদের হাত পৌছবে না।

আবার হা-হা করে হেসে উঠলেন শ্রীচন্দ্রবাবু। বললেন—সাহিত্যিকেরা কথা বলতে পারে বটে।

কালীনাথ আই-বি ইন্‌স্পেক্টর—দেশের লোককে বিশেষ করে যে লোকেরা এগিয়ে হাঁটে তাদের শাসন করে দমিয়ে রাখাটাই তার অভ্যাস, অভ্যাসমত সে সরাসরি বললে—তোমার সঙ্গে তো গোপেন মুখুজ্জের আলাপ আছে। একটা কাজ করে দিতে পার? শ্রীচন্দ্রবাবুর সঙ্গে তিনি ঝগড়া বাধাচ্ছেন কেন বলতে পার?

কালীনাথের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বিমল বললে—আমি কেমন করে সে কথা বলব বল?

—আরে এই সেদিন তো তুমি তাঁর ওখানে গিয়েছিলে। কীর্তি বোসের ছেলে—মিহির এসেছিল তোমাকে ডাকতে। তুমি জান না? বলেন নি তোমাকে গোপেনবাবু? শ্রীচন্দ্রবাবু আমাদের দেশের লোক, গোপেনবাবু নিশ্চয় সে কথা জানে—বলে নি?

ধীরে ধীরে কালীনাথের ভিতরের পুলিশ-পুঙ্গব বেরিয়ে আসছে। গোপেনদার সম্পর্কে কথা আরম্ভ করেছিল 'জানেন—বলেন' বলে—এইবার 'জানে—বলে' সুরু করেছে।

বিমল বললে—না জানি না আমি কিছু, তিনি এ সম্পর্কে আমায় কিছু বলেন নি।

—তবে কি জন্তে ডেকেছিলেন?

অত্যন্ত শক্ত হয়ে উঠল বিমল এবার, বললে—আমায় যে তুমি জেরা আরম্ভ করলে? সত্যিই কোন এনকোয়ারী করছ না কি?

শ্রীচন্দ্রবাবু ব্যবসায়ী। তিনি বলে উঠলেন—আরে না—না! তুমি যে একেবারে রেগে গেলে। উঠে এস—রাগ করো না। হাতটা তিনি ধরে ফেললেন বিমলের।

কালীনাথ বললে—সাহিত্যিকেরা ভয়ানক সেন্টিমেন্টাল। এইজন্তেই ওরা কিছু করতে

পারে না।

শ্রীচন্দ্রবাবু ব্যাপারটা নিয়ে আর অগ্রসর হতে চান না। মিটিয়ে ফেলতে চান। চিত্ত যখনকার কথা শুনে এসেছিল—তখন থেকে ব্যাপারটা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ একটা অভাবনীয় মোড় ফিরতে চলেছে।

কালই অংশীদারেরা একটা নূতন খবর পেয়েছেন। খবর পেয়েছেন প্রচুর অর্থ নিয়ে কয়েকটি জমি ও বাড়ী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে বিত্তশালী অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য সুরম্য নির্জন বাসপল্লী গড়তে উদ্যত হয়েছেন। একটি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা করেছেন—তাঁরা কেবল সিনেমা আর্টিস্টদের জন্য আমেরিকার অনুকরণে স্বতন্ত্র পল্লী গড়ে তুলবেন। সেখানে যে সব তারকারা নিজেরা বাড়ী করবেন—তাঁদের জমি বিক্রী করবেন, প্রয়োজন হলে—কণ্ট্রাক্ট নিয়ে নিজেরাই বাড়ী তৈরী করে দেবেন; যাঁরা বাড়ী নিয়ে থাকবেন—তাঁদের আধুনিকতম ফ্যাশনের—সর্বোত্তম আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে বাড়ী তৈরী করে ভাড়া দেবেন। কয়েকটি সিনেমা কোম্পানীকেও তারা স্টুডিয়ো করবার জন্য প্রলুব্ধ করেছেন।

একটি প্রতিষ্ঠান শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি কিনে রাখছেন। এই সব সংবাদ পেয়ে তারা বুঝতে পেরেছেন মহানগরী হতে চাচ্ছে এবং হবেই। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট—করপোরেশন—তাদের এলাকা গণ্ডীবদ্ধ করলেও সে গণ্ডীর শাসন মানবে না সে। এই সব আলোচনা করে এঁরা স্থির করেছেন—আরও দূরে অর্থাৎ শহরতলীর প্রান্তভাগে সস্তায় অনেক বেশী জমি তাঁরা কিনে ফেলবেন। কাঁকুলিয়ায় যে জমিটা কেনা হয়েছিল সেটাকে উন্নত করে এখন যে দাম তার দাঁড়িয়েছে তাতে বিক্রী করলে যথেষ্ট লাভ হবে। সেই টাকাটা এখন ওদিকে ফেলতে পারলে ভবিষ্যতে কল্পনাতীত লাভ হবে এতে কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য এক মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠানকে কাঁকুলিয়ার অবিক্রীত জমিটা সবই একসঙ্গে বেচে দেবেন। কালই তার কথাবার্তা সুরু হয়ে গেছে। এখন গোপেনবাবু ওখানকার ছেলেদের নিয়ে যে উৎপাত সুরু করেছেন—সেটা একটা বাড়ী নিয়ে হলেও গোটা জমিটার স্বত্ব নিয়ে সন্দিহান করে তুলবে ক্রেতাকে। সেইজন্যেই এটাকে মিটিয়ে ফেলতে চান শ্রীচন্দ্রবাবুরা। ভোরবেলা উঠেই শ্রীচন্দ্রবাবু গিয়েছিলেন কালীনাথের কাছে। আই-বি ইন্‌স্পেক্টার কালীনাথ গোপেনবাবুদের মত লোকেদের কায়দা করতে জানে—ওদের গুপ্ত তথ্যও অবগত ওরা। অজগরের সামনে যেতে গেলে ওঝা নিয়েই যাওয়া সঙ্গত এবং নিরাপদ। কিন্তু কালীনাথ জানে, সাপের ওঝার মতই জানে, তার মন্ত্রতন্ত্র সব মিছে, সরকারী পরওয়ানার দণ্ডটি না থাকলে গোপেনবাবুর সামনে সে শ্রীচন্দ্রের মতই অসহায়। তাই পথে বিমলকে দেখে ওকেই ডেকে কাজটা উদ্ধার করে নিতে চাচ্ছে। অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন শ্রীচন্দ্রবাবু। যাদবপুরে ওদের একটা কলোনী আছে। পূর্বের শর্তমত সেখানে একটা আড়াই কাঠা প্লট ভদ্রমহিলাকে দিতে রাজী আছেন, শুধু তাই নয় এখানকার জমির দামের সঙ্গে—ওখানকার জমির দামের তফাৎ হিসাবে ওই জমির উপর সিমেন্টের মেঝে টিনের দেওয়াল টিনের চাল দিয়ে একখানি দু'কুঠরী ঘরও তৈরী করে দেবেন পনের দিনের মধ্যে। ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ীতে চলে যেতে

হবে। অর্থাৎ এখানকার বাড়ীর দখল ছেড়ে দিতে হবে।

কালীনাথ বললে—তুমি গিয়ে গোপেনবাবুকে বুঝিয়ে বল। বুঝেছ? মামলা-মকদ্দমায় তো ফল হবে না। লেখা যখন কিছু নেই তখন আইনে পাবেন না। ওর ওই ছেলের পাল ক্ষেপিয়ে বিশেষ ফল হবে না। তাতে যদি না শোনে তখন আমি যাব।

শ্রীচন্দ্রবাবু বললেন—আমার গাড়ীতে যাও তুমি।

কালীনাথ বেরিয়ে এসে যাবার সময় মৃদুস্বরে বললে—আমার নামটাম করিসনে যেন?

নিরীহের মত বিমল বললে—করব না?

—না। বুঝলি না—এটা তো আমার official ব্যাপার নয়।

হেসে বিমল বললে—বুঝেছি।

গোপেনদা অরাজী হবেন কেন এতে? তিনি বললেন—এ তো ভাল কথা! তবে দলিলটা আগে করে দিন। আমার বন্ধু এক উকিলকে বলে দিচ্ছি—সে সব করে নেবে এঁর তরফ থেকে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—এ ভালই হল। কি বলিস? এদের মত পরিবারের পক্ষে শহরের মধ্যে থাকা অসম্ভব। তার চেয়ে পাড়াগাঁয়ের আবহাওয়ায় এর চেয়ে অনেকটা আরামে থাকবে।

আবার খানিকটা পরে বললেন—একটু হেসেই বললেন—আর শেষ পর্যন্ত সেই যেতেই হবে।

তারপর আবার গম্ভীর ভাবে বললেন—যে দিক দিয়েই ভাবি না কেন, শহরে আর ওদের থাকার অধিকারও নেই। নাই মানলাম—ধনী দরিদ্রের ভেদ—অক্ষম এবং সক্ষমের ভেদ তো মানতেই হবে। একটা পঙ্গু অসুস্থ ছেলে—আর একটি বিধবা হিস্টিরিক মেয়ে—কি করবে শহরে?

বিমল চুপ করেই বসেছিল। এর মধ্যে নিজের বক্তব্য তার কি থাকতে পারে। সে শুধু ভাবছিল এই মহানগরীর কথা।

গোপেনদা বললেন—তুমি বস একটু, আমি ভদ্রমহিলার সঙ্গে একবার কথা বলে আসি। তাঁর মতটা নেওয়ারও তো প্রয়োজন আছে।

বিমল বেরিয়ে এসে ফালি বারান্দাটায় একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল। কোথায় কেউ বা কারা কিছু কাটছে। শব্দ উঠছে। দূরে দেখা যাচ্ছে—একটা নতুন বাড়ীর তেতলায় গাঁথনী চলছে, কপিকলে দড়ি ঝুলিয়ে ঝুড়িতে ইট তুলছে টেনে, খন্ খন্ কর্ণির শব্দ হচ্ছে। অকস্মাৎ একটা মড়মড় শব্দ উঠল—শব্দ লক্ষ্য করে বিমল দেখতে পেলে একটা নারকেল গাছ পড়ছে—শূন্য পথে ক্রমবর্ধমান বেগে তার ঘন সবুজ পাতায় ভরা মাথাটা মাটির দিকে নেমে আসছে।

দুম্ করে একটা শব্দ হল।

মহানগরী দ্বিপ্রহর ঘোষণা করছে। একটা বাজল।

নির্জন দুপুরের প্রথম রৌদ্রচ্ছটার দিকে তাকিয়ে বিমল দিবাস্বপ্ন দেখছিল। নারকেল

গাছগুলি একের পর এক কাটা পড়ছে। শহরের এই প্রান্তসীমার পল্লীটিকে মানুষ অনেক কাল আগে ফলের জন্য ছায়ার জন্য ঝড়কে রুখবার জন্য যে উদ্ভিদপ্রজা পত্তন করেছিল—তাকে শহরের বিস্তৃতির প্রয়োজনে কেটে ফেলছে। মধ্যে মধ্যে বড় বড় লরী বোঝাই হয়ে চলেছে—শহরের আবর্জনা ভাঙা বাড়ীর ধুলো টুকরো ইট একটা লরীতে গেল। লম্বা কোঁকড়ান চুলের মত লোহার পাড়ের ছাঁট—ওগুলোকেও ফেলা হবে ওই আবর্জনা এবং টুকরো ইট ধুলোর মত সুরকীর স্তূপের সঙ্গে। ডোবা খানা খন্দ বন্ধ করে সমান করা হচ্ছে। যেখানে নারকেল গাছগুলি কাটা পড়ছে সেখানে আগে ছিল কোন এক সৌখীন ধনীর শখের বাগান, বাগানের মধ্যে মধ্য-আয়তনের একটি চমৎকার পুকুর ছিল—সেটাও পুরিয়ে ফেলা হচ্ছে। পুকুরের কি প্রয়োজন মহানগরীর মধ্যে? অকারণে কেন বিঘে দেড়েক জায়গা অধিকার করে থাকবে? জলের জন্য এখানে পুকুরের প্রয়োজন নাই। মাঁটির তলায় তলায় চলে গেছে এখানে জল সরবরাহের পাইপ। ভোর পাঁচটার পরেই কলের মুখে জল এখানে।

বিমল পল্লীর মানুষ, এবং সে পল্লী ভারতবর্ষের পল্লী। তাই ওই গাছগুলির জন্য সে গভীর বেদনা অনুভব করলে। বাহিরের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তৃপ্তিতে অন্নব্যবস্থার প্রাচুর্যের লোভে, এদেশের মানুষ শহরে আসে—থাকে—অনেকে বাসও করে কিন্তু অন্তরে পল্লীর প্রতি একটি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে তারা। যারা নিজেরা বাড়ী করে এখানে—তাদেরও শতকরা আশীজন পল্লীর বাড়ীটিকে রক্ষা করে যায়। কেউ বা যত্ন করে রক্ষা করে—মধ্যে মধ্যে যায়—ঝাড়ামোছা মেরামত করায়। কেউ বা অবহেলার মধ্যেই বাড়ীটাকে রেখে দেয়। দু দশ বছর অন্তর সেখানে গিয়ে দেওয়ালের গা থেকে বট পাকুড়ের গাছ কাটিয়ে তার উপর বালি চুন লাগাবার ব্যবস্থা করে। মনে মনে সংকল্পও করে এবার সুযোগ পেলেই এখানে এসে থাকবে কয়েক মাস; মুক্ত শীতল বায়ু—অবারিত সূর্যস্নেহ—ভূমিলক্ষ্মীর অকৃপণ সতেজ প্রসাদ প্রাণভরে উপভোগ করবে। কিন্তু মহানগরীর কুহকে যে একবার পড়েছে তার পরিত্রাণ নাই। ছেড়ে গেলেও সে তাকে টেনে নিয়ে আসে। এখানে এলে পড়ে যেতে হয় দ্রুততম গতি ধাবমান জীবনপ্রবাহের মধ্যে। তখন সে স্রোত কেটে পাশে তীরে ওঠা আর হয়ে ওঠে না।

বিমলের স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে বাস্তব ছবি লুপ্ত হয়ে গিয়ে মহানগরীর নূতন রূপ ফুটে উঠেছিল। পিচঢালা মসৃণ রাজপথ সরল ও সমান্তরাল রেখায় চলে গিয়েছে—তার দু'ধারে নতুন বাড়ীর সারি, ছোট বড় নানা আকারের নানা রঙের। ইলেকট্রিক ল্যাম্প-পোস্টের সারি—দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে, চৌরাস্তায় অথবা তেরাস্তার মোড়ে পল্লীটির প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহের দোকান—মুদীর, মনিহারীর দোকান, চায়ের রেস্তোরাঁ, লণ্ড্রী, ছোটখাটো ওষুধের দোকান—তার মালিক সম্ভবতই হবে তরুণ কোন ডাক্তার যে সদ্য সদ্য পাশ করে পসারের চেষ্টা করছে।

বিমলের স্বপ্নভঙ্গ করে হঠাৎ বেজে উঠল কারখানার বাঁশী। অত্যন্ত নিকটে কোথাও বাজছে। কাছেই কোথাও কারখানা আছে। বিমল উঠে দেখতে চেষ্টা করলে—কারখানার লোহার চিমনীর মাথা কোথাও দেখা যায় কি না। দেখা গেল না। পূর্ব দক্ষিণ কোণে রেল

লাইনের ধার বরাবর ঘন ঘন পল্লবের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সম্ভবত। গাছগুলো ভবিষ্যতে থাকবে না। সে স্পষ্ট দেখতে পেলে প্রসারিত হয়ে চলেছে মহানগরী। গাছগুলো কাটা পড়ে যাচ্ছে। বস্তী ভেঙে গড়ে উঠছে নব উপনিবেশ। পল্লী অঞ্চল থেকে দলে দলে চলে আসছে নবযুগের দুঃসাহসী অভিযানকারীর দল। তারা সেখানে বাসা বাঁধছে। তার মধ্যেও কিন্তু থাকবে ওই কারখানাটি। ও থাকবেই। হয়ত ওরই দৌলতে ওখানকার পারিপার্শ্বিক আরও জমজমাট হয়ে উঠবে। বড় বাজারই একটা গড়ে উঠবে।

গোপেনদা বেরিয়ে এলেন এতক্ষণে। তিনি বললেন—তোমার খানিকটা কষ্ট হল।

বিমল হাসলে।—কি করব বল? ভদ্রমহিলা কিছুতেই রাজী হতে চান না। বলেন আমার শ্বশুরের ভিটে।

হাসলেন গোপেনদা। বললেন—শহরের মাটি বীরভোগ্যা না হোক বণিকভোগ্যা। ভাগ্যান্বেষিণী বাস্তববাদিনী আধুনিকা। অথবা কি বলতে পার। গত্যন্তর গ্রহণই বল আর মনিব বদলানোই বল হাসিমুখে করে যায়। গরীবের ঘর থেকে বেরিয়ে বলে—বাঁচলাম। সে উনি কিছুতেই বুঝবেন না।

বিমল বললে—তা হলে ওঁদের কি বলব?

—বলবে রাজী হয়েছেন। এই প্রস্তাবই পাকা হয়ে রইল। আমার বন্ধু উকীল এরপর সমস্ত ব্যবস্থা করে নেবেন।

বিমল প্রশ্ন করলে—দেখবেন, কোন গোলমাল হবে না তো?

—না। অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী করে এনেছি। শেষ কথাই আদায় করতাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঁদতে শুরু করে দিলেন—আমার শ্বশুরের ভিটে। একবার ক্ষেপে উঠে বললেন—এই মাটিতে আমি চোখের জল ফেলে যাচ্ছি। এই জল আগুন হয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে তার সংসার যে এখানে বাড়ী করবে।

তারপর বললেন—চল তোমার সঙ্গে আমিও যাই। আজ আর রান্নাবান্নার ব্যবস্থা হয়ে ওঠে নি। মিহিরের ওখানে যাব। সে আবার অশৌচের মধ্যে পড়েছে—তার উপর বাপের টাকা নিয়ে লাঠালাঠি লাগবার সম্ভাবনা আছে ভাইয়ে ভাইয়ে। বড় ভাই নিশ্চয় আসবে ভাগ নিতে।

পথে চলতে চলতে বললেন—ওখান থেকে যেতে হবে খিদিরপুরে। মিহির আটকে পড়ে মুশকিল হয়েছে আমার। লেবার নিয়ে কাজ অত্যন্ত কঠিন। অনেক কষ্টে ওদের যে মনটুকু পেলে—একদিনে একটি গাফিলতিতে সব চলে গেল। তা ছাড়া আরও দলগুলো চেষ্টা করছে। করপোরেশন-ইলেকশন এসেছে তো।

বিমলের হাসি পেল। কিন্তু আত্মসম্বরণ করলে সে। ধনিক-ভোগ্যা মহানগরীতে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে করপোরেশন-ইলেকশন; শ্রমিকদের প্রতিনিধি! পরিকল্পনা ভাল। রাবণরাজা স্বর্গপুরী পর্যন্ত সিঁড়ি তৈরী করে স্বর্গলোকে গণতন্ত্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন—তারই পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে চিরকাল। এ কথা বললে গোপেনদা ক্ষুণ্ন হবেন—ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন তার উপর। গোপেনদার স্বপ্ন সম্পর্কে আদর্শ সম্পর্কে তার মনে যতই রহস্যকৌতুক জেগে

উঠুক—গোপেনদার ওই ইলেকশনে সাফল্যের কামনা সে অন্তর দিয়েই করে। গোপেনদার এটা পাওনা। সন্ন্যাসী যারা ঈশ্বর-সন্ধানে ঘর ছাড়ে—কৃচ্ছ্রসাধন করে, তারা ঈশ্বর না পেলে ততটা বঞ্চিত হয় না, যতটা বঞ্চিত হয় শেষ বয়সে একটি আশ্রয়—অন্ততপক্ষে গঙ্গার ধারে একটি গাছতলায় ছোট একটি কুঁড়েতে সিঁদুরমাখানো পাথরের সামনে একটি পাকা আসন—না পেলে।

পথের মাঝখানে গোপেনদা বললেন—চা খাবে?

—চা? এই দুপুরে? না দাদা।

—তবে তুমি চল, আমি এককাপ চা আর টোস্ট খেয়ে নি। মিহিরের ওখানে তো হবিষ্যি।

শ্রীচন্দ্রবাবু খুশীই হলেন। বিমলের লেখা সম্পর্কে গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন—অনেক মারাত্মক রকম ভুল উক্তি করলেন, মধ্যে মধ্যে দু'চারটে রসিকতাও করলেন, যা থেকে খুব খুশী হওয়ার ভাবটা ব্যক্ত হয়ে পড়ল। কালীনাথও তাতে ফোড়ন দিলে।

শ্রীচন্দ্র বললেন—আমি শুনেছি, বুঝেছ কালীনাথ—মেয়েরা যা চিঠি লেখে বিমলকে! ওঃ—সে সব চিঠি কি!

কালীনাথ বললে—তুমি শুনেছ—আমি দেখেছি!

—দেখেছ? বল কি?

—হ্যাঁ গো। জিজ্ঞাসা কর না। সেদিন হঠাৎ এসে পড়েছিলাম এদিক দিয়ে। পথে হারামজাদা চিত্তর সঙ্গে দেখা। চিত্ত বললে—বিয়ার খাওয়াতে হবে কালীদা। বললাম—পয়সা নেই। চিত্ত বললে—তবে আমি খাওয়াই তুমি খাও। কি করি—রাজী হলাম। কিন্তু ওর ওই ডিপোয় কয়লার ধুলোতে যেতে গা ঘিনঘিন করল। চিত্তই নিয়ে গেল বিমলের ওখানে। গিয়ে দেখি একটি অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে—চমৎকার দেখতে, দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমলের দরজার সামনে। কি ব্যাপার; না বিমলকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছে—ডাকতে এসেছে।

তারপর বিমলের দিকে চেয়ে কালীনাথ বললে—কি ব্যাপার বল তো বাবাজী? চায় খাও খেয়ো—কিন্তু যেন টোপ গিলো না বাবা।

বিমলের সমস্ত অন্তরটা ঘিনঘিন করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধও হয়ে উঠল সে। কানের পাশ দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল, গরম হয়ে উঠেছে কান। জিভের ডগায় অনেকগুলো কটু কথা শানের উপর ক্ষুরের মত দ্রুত এবং চঞ্চলভাবে আসা-যাওয়া করতে লাগল তবুও সে আত্মসম্বরণ করলে।

শ্রীচন্দ্র ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। তিনি বললেন—তুমি বড় ভাল্‌গার কালীনাথ।

কালীনাথ বললে—আমরা পুলিশ শ্রীচন্দ্র।

বিমল এবার বললে—কিন্তু পুলিশ হয়ে জন্মাওনি কালীকাকা, জন্মেছিলে মানুষ হয়ে।

কালীনাথ হেসে উঠল। বললে—তুই প্রেমে পড়ে গিয়েছিস বিমল। রেগে উঠেছিস তুই।

শ্রীচন্দ্র বললেন—তাই প্রেমেই পড় বিমল। ওদের খাতা থেকে তোমার নামটা কাটা যাক।

কালীনাথ বললে—আজকাল প্রেমে পড়লে নাম কাটা যায় না হে। মেয়েটির নামসুদ্ধ লেখা হয়ে যায় খাতায়। প্রীতিলতা, কল্পনা—চিটাগাং আর্মারী রেইড কেসের মেয়ে-আসামী-দের নাম শোন নি? লেবংয়ে লাটসাহেবকে গুলী করলে যে দল—তাদের মধ্যে উজ্জ্বলার নাম তো তুমি জান হে। পার্বতীপুরে দার্জিলিং মেল যখন সার্চ হয়—তখন তো তুমি গাড়ীতে।

বিমল উঠে পড়ল। বললে—চললাম আমি।

কালীনাথ বললে—বস্ বস্। রাগছিস কেন?

বিমল বললে—এখনও স্নান করি নি—আর বসা চলে?

শ্রীচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে বললেন—সে কি? আমি জানি—তুমি—।

কথাটা কিন্তু লজ্জায় শেষ করতে পারলেন না। কারণ অস্নাত অভুক্তের যে ছাপটা বিমলের চেহারায় ফুটে উঠেছিল—সেইটাই তাকে মর্মান্তিক ব্যঙ্গে স্তব্ধ করে দিলে। সামনের ঘড়িতে বাজছে দুটো। তিনি উঠে এসে বিমলের হাত ধরলেন। বললেন—স্নান কর, খাও! আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব।

বিমলের অন্তর বিদ্রোহ করে উঠল। কিছুতেই সে এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলে না। তার মনে হল যে ক্ষুধা এখন যা হোক কিছু গ্রাস করবার জন্য আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে—সে ক্ষুধাও এই নিমন্ত্রণের আহ্বানে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে, তার গলায় এবং জিভে যেন অখাদ্যের নামে বমন আক্ষেপ জেগে উঠেছে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করবে কি করে? হঠাৎ সে বলে উঠল—উপায় নেই শ্রীচন্দ্রবাবু। আমার নিমন্ত্রণ আছে। তাঁরা আমার জন্য বসে থাকবেন।

—কোথায় নিমন্ত্রণ আছে? আমি টেলিফোন করে বলে দিচ্ছি—বেলা হয়ে গেছে—

বাধা দিয়ে বিমল বললে—না, সে হয় না। তা ছাড়া সেখানে টেলিফোন নেই।

—বেশ তবে চল—তোমাকে গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না—না। কেন ব্যস্ত হচ্ছেন আপনি! কাছেই নিমন্ত্রণ। তা ছাড়া আমাকে স্নান করতে হবে।

—স্নান তুমি এখানেই করে নাও। আমি কাপড় দিতে বলছি।

—না না, শ্রীচন্দ্রদা।

—তা হবে না বিমল। আমি জানি আমার জন্যেই তোমার দেরি হয়ে গেছে। আরও জানি তুমি যেখানে থাক—সেখানে স্নানের জায়গা নেই। একটা টবে—তুমি রাস্তা থেকে জল ধরে নাও। জল আছে কি না জানি না। থাকলেও সে জল একেবারে অব্যবহার্য হয়ে গেছে।

কালীনাথ চুপ করে বসে শুনছিল। সে এবারে বললে—ছেড়ে দাও শ্রীচন্দ্র, ওকে ছেড়ে দাও।

শ্রীচন্দ্রবাবু আবার বিমলের হাত ধরলেন। তাঁর এ আন্তরিকতা হয়তো সাময়িক, এবং

এই সাময়িক আন্তরিকতাটুকুর উদ্ভব বিমলের প্রতি প্রীতিবশত নয়; সম্পদশালীদের প্রশংসালোলুপ মানসিকতার উপরেই এর ভিত্তি; তবুও আর প্রত্যাখ্যান করা তার রূঢ়তার সামর্থ্যে কুলিয়ে উঠল না। সে মিষ্টি করেই বললে—ঝঞ্ঝাট বাড়ালেন আর কি। আমার কাপড় ছেড়ে—আপনার কাপড় পড়ে যাব, সমস্তক্ষণ সাবধানে থাকতে হবে—কোথায় কাঁটা কি খোঁচায় লেগে ছিঁড়বে, বিড়ি খেতে হবে সাবধানে—।

কালীনাথ সোফায় শুয়ে পড়ে একটা সিগারেট মুখে পুরে দেশলাইয়ের কাঠি বের করতে করতে বললে—ভেরী ক্লেভার চ্যাপ।

বিমল তার কথার কোন উত্তর দিলে না।

এগার

স্নান করে কিন্তু সত্যই খুব আরাম পেলে। সম্পদশালীরা যত সুখ উপভোগ করে এবং এই মহানগরীর স্বাচ্ছন্দ্য-ব্যবস্থার যত রকম আয়োজন আছে তারি মধ্যে এই স্নানাগারের আরামটিই বিমলের কাছে সব চেয়ে কাম্য; এইটুকু বললেই যথেষ্ট হল না—ওই ব্যবস্থার প্রতি ওর লোভ আছে। অভিজাত শ্রীচন্দ্রবাবুর স্নানাগারে বড় টব, শাওয়ার বাথ, গরম জল ঠাণ্ডা জল; ব্যবস্থা অনেক। তার উপর নূতন তোয়ালে নূতন সুগন্ধ সাবান; সুগন্ধ তেল শাম্পু করার ব্যবস্থা—ত্রুটি কিছুরই নাই। কাপড় দিয়েছিল নতুন একখানি শান্তিপুরে ধুতি। সম্ভবতঃ রসিকতা করে যে কথা বিমল বলেছিল—তার উত্তরে নিখুঁত ধনিকোচিত ব্যবস্থা।

স্নান করে বেরিয়ে আসতেই শ্রীচন্দ্রবাবু—বললেন—নাও চল। কালীনাথকে পৌঁছুতে যাচ্ছি, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব, কোথায় তোমার নিমন্ত্রণ আছে।

কালীনাথ দাঁড়িয়ে আছে, চিন্তা করবার অবকাশ পর্যন্ত নাই। শ্রীচন্দ্রবাবু জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে অগ্রসর হলেন। বিমল বললে,—আপনারা যান। আমি—

কালীনাথ তার হাত চেপে ধরলে। হেসে বললে—যাবি তো সেখানে। আয়। এত লজ্জা কিসের!

বিমলের মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। চিন্তা করবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেললে যেন। মধ্যে মধ্যে শুধু ইচ্ছে করতে লাগল, সে চলন্ত মোটর থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে পালিয়ে যায়।

কালীনাথ পথ দেখাচ্ছিল—ডাইনে। আবার ডাইনে। আবার ডাইনে। বাস্।

গাড়ীটা এসে দাঁড়িয়েছে লাবণ্যদের বাড়ীর সামনে। নামল বিমল। মনে মনে ঠিক করলে ওরা গাড়ী নিয়ে চলে গেলে সেও ফিরে আসবে বাসায়। হোটেলে আর ভাত নাই, দোকান থেকে পুরী তরকারী আনিয়ে নেবে। কিন্তু গাড়ী নড়ছে না। ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে কালীনাথ বললে—ডাক না—শ্রীচন্দ্র না দেখে নড়বে না।

মাথাটা ঘুরে উঠল বিমলের। ইচ্ছে হল একখানা আধলা ইট নিয়ে ছুঁড়ে মারে ওদের।

মোটরের স্টার্ট বন্ধ করে বসে ক্লেদাক্ত হাসি হাসছে।

লাবণ্যদের দরজা আপনি খুলে গেল। বেরিয়ে এল পিনাকী এবং অরুণা। তাদের পিছনে লাবণ্য। অবাক হয়ে গেল বিমল। পিনাকী আজ সাজসজ্জা করেছে, তার দেহের প্রতি অযত্ন এবং অপরিচ্ছন্নতার অন্তরালে যে তারুণ্য চাপা পড়েছিল—সে তারুণ্য আজ ফুটে বেরিয়েছে—বর্ষণ-পরিচ্ছন্ন গাঢ় নীল আকাশের ক্ষীণজ্যোতি নীলাভ তারাটির মত। সে আজ চুল ছেঁটেছে—দাড়ি কামিয়েছে, বোধ হয় সাবান মেখে স্নান করেছে—তার উপর স্নোর চিহ্ন সুস্পষ্ট—গায়ে পাটভাঙা লংক্লথের চুড়িদার, পরনে ধোয়া ধুতি, পায়ে সাদা রঙের ফিতে দেওয়া স্যাণ্ডেল। একটি মিষ্টি গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। অরুণার পোশাকে আতিশয্য নাই—কিন্তু পরিচ্ছন্নতার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল—শুধু চুলে আজ তেল না দিয়ে হয় সাবান দিয়েছে নতুবা শাম্পু করেছে, রেশমের মত নরম কালো চুলের রাশি ফেঁপে পড়ে আছে পিঠের ওপর ; এতে তার রূপ যেন বেড়ে গেছে। ওকে আর কালো মেয়ে বলে উপেক্ষা করা চলে না।

পিনাকী একটু হাসল। অপ্রতিভের হাসি নয়। সপ্রতিভ—মিষ্টি অথচ দীপ্ত হাসি হেসে বললে—বসন্ত এসেছে বিমলদা।

অরুণা লজ্জিত হল একটু। সে বললে—জু-য়ে যাচ্ছি আমরা।

পিনাকী বললে—সন্ধ্যেবেলা সিনেমায় যাব। তবে সবই আপনার দৌলতে। সকাল বেলায় পাঁচটা টাকা না পেলে যে কি করতাম আমি—হঠাৎ সে বলে উঠল—হয়তো আত্মহত্যা করতাম কারুর মোটরের তলায় পড়ে। হাসতে হাসতে পিনাকী চলে গেল, অরুণা তার অনুগমন করলে। লাবণ্য সবিস্ময়ে দেখছিল বিমলকে এবং গাড়ীর আরোহীদের।

কালীনাথ নমস্কার করে বললে—ওকে আমরাই আটকে রেখেছিলাম। ওর কোন দোষ নেই, কিছু মনে করবেন না, আপনাদের খাওয়াদাওয়ার অনেক দেরি করে দিলাম।

বিমল এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে বললে—অত্যন্ত অপরাধ করে ফেলেছি আপনার কাছে। বাড়ীর মধ্যে চলুন—সব বলব।

শ্রীচন্দ্র বললে—চলি বিমল। ভালমন্দ খেতে খেতে আমাদের স্মরণ করো ভাই।

বিমল তখন দরজার মুখে, লাবণ্য ঘরে ঢুকেছে—সে ওদের কথা শুনে বিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—এখনও খান নি ?

বিমল বললে—বলছি। ঘরের মধ্যে একটা পা দিয়েও সে থমকে দাঁড়াল, তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে, শ্রীচন্দ্রের গাড়ীখানা দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, সে অনেক কথা। অন্য সময় বলব। এখন আমি যাই।

লাবণ্য ভ্রূ-কুঞ্চিত করে মৃদু হেসে বললে—বসুন। অনেক কথার একটা কথা বুঝতে পেরেছি। ওঁরা যা বললেন, তাতে মনে হয় আপনি ওঁদের বলেছেন, আপনি এখানে খাবেন। কি ব্যাপার বলুন তো ?

বিমল বুঝতে পারলে না কি বলবে।

লাবণ্য বললে, বলুন না কি ব্যাপার ? ভদ্রলোক দুটির একজনকে তো সেদিন আপনার ওখানে দেখেছিলাম। অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল আমার।

—উনি আমার গ্রামের লোক, একজন আই-বি ইন্‌স্পেক্টর।

—আই-বি ইন্‌স্পেক্টর?

—হ্যাঁ, আর একজন এই পাড়ারই ধনী ব্যক্তি। উনিও আমার দেশের লোক।

—ওঁদের কাছে আপনি বলেছেন, এখানে খাবেন? হঠাৎ লাবণ্যের কণ্ঠস্বর উগ্র হয়ে উঠল। সে বললে, এটা কি হোটেল বিমলবাবু?

বিমল তার মুখের দিকে তাকালে, অভুক্ত অবস্থায় এই ধরণের তীক্ষ্ণ বাক্যের আঘাতে তার মাথার ভিতরটা ঝিম-ঝিম করে উঠল। মাথার মধ্যে রক্তের ধারা ঠেলে উঠছে। তবু সে নিজেকে সংযত করলে।

লাবণ্য বললে, দেখুন আপনি আমাকে অত্যন্ত বিপদে ফেলেছেন। আপনি বুঝতে পারবেন না কত বড় বিপদ; কিছুক্ষণ আগে পিনাকী আর অরুণাকে নিয়ে ব্যাঙ্কের গিন্নীর বউয়ের সঙ্গে একদফা হয়ে গেছে। কুৎসিত ঝগড়া। আবার—। সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বিমল উঠল। বললে—গোড়াতেই আপনার কাছে মার্জনা চেয়েছি। আবার চাচ্ছি। আমি থাকতেও আসি নি খেতেও আসি নি। আপনার এখানে আমার নিমন্ত্রণ আছে এ কথাও আমি বলি নি। নিতান্তই পাকচক্রে ঘটে গেছে, অত্যন্ত অবাঞ্ছিত অন্ন গলাধঃকরণ করার তিক্ততা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বলেছিলাম আমার নিমন্ত্রণ আছে। কালীনাথ—ওই আই-বি অফিসারটি—ধরে নিলে নিমন্ত্রণ আমার এখানে। সে-ই বললে, এখানে নিমন্ত্রণ বুঝি? আমি ভাবছিলাম কার বাড়ীর নাম করব। কালীনাথের কথায় তাড়াতাড়ির মধ্যে সায় দিয়ে ফেললাম। ওরা ছাড়লে না, গাড়ী করে পৌছে দিয়ে গেল। নইলে এখানে আসতামও না। এসেছি, ওরা গেলেই চলে যাব বলেই এসেছি। এটুকুও অপরাধ হয়েছে এটা স্বীকার করছি।

লাবণ্য বললে—কিন্তু তাতে তো আমার ক্ষতিপূরণ হবে না বিমলবাবু।

—ক্ষতি?

—হ্যাঁ, ক্ষতি। ওঁদের হাসি ওঁদের কথার মধ্যে ওঁদের মনের ধারণা তো প্রকাশ হতে বাকী নেই। আমি অভিভাবকহীনা বিধবা—আমি আপনাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবই বা কেন আর ওঁরা এই ধরণের হাসি হাসবেনই বা কেন? এমন বিশ্বাস ওঁদের জন্মাল কেন?

বিমল একটু চুপ করে থেকে বললে—আপনি বিশ্বাস করুন, তাতে আমার কোন অপরাধই নেই।

—তবে কি অপরাধ আমার? আমি ওঁদের বলে এসেছি?

—আপনারও নয়। বিমল হাসলে। তারপর বললে—দোষ মানুষের মনের। বিশেষ করে শহরের লোকের মনের, বিশেষ করে আই-বি কর্মচারী কালীনাথের মনের দৃষ্টির। যেদিন ও এসেছিল সেদিন আমার নিমন্ত্রণ ছিল আপনার এখানে। আপনি আমাকে ডাকতে গিয়েছিলেন যখন তখন ও দেখেছিল। সেই ভিত্তির উপর পুলিশের লোক কলঙ্কের মনুমেন্ট বানিয়ে তুলেছে। যাক, কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। আমি চলি। নমস্কার।

সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। লাবণ্যও এল পিছনে পিছনে। ঘরের দরজাটাই সে বন্ধ

করছিল। হঠাৎ ঘরের ভিতরে একটি নারীকণ্ঠধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠল। কথাগুলি বিমলের কানে এসে পৌঁছল। কথাগুলি শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল, তার চলবার শক্তিও যেন কয়েক মুহূর্তের জন্ম বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

—তারপর লাবণ্যদি, ওই পিনাকী ছেলেটি না হয় অরুণাকে বিয়ে করতে চায়—সেই জন্মই একঘরে বসে হা-হা করে হাসছিল। কিন্তু এই ভদ্দরলোকটি? এর সঙ্গে যে এই ভর দুপুরে মান-অভিমানের পালা গাইলে—এর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধটা কি শুনি!

লাবণ্য স্তম্ভিত বিমলের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি চলে যান। দাঁড়িয়ে এসব শুনবেন না। বলেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

বিমল পা বাড়ালে। যেতে যেতেই শুনলে—লাবণ্য উত্তর দিচ্ছে—এসব কুৎসিত কথার উত্তর আমি দেব না। তুমি যা খুশী তাই মনে করতে পার।

বিমলের যাওয়ার কথা দাদার দোকানে, কিছু খেতে হবে। কিন্তু অন্যমনস্ক ভাবে সে উঠল—নিজের ঘরে। দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে—আগন্তুকদের জন্ম রাখা পুরানো ভাঙা সোফায় বসে পড়ল। মানুষের কদর্যতায় মন তার বিষিয়ে উঠেছে। একটা বিড়ি ধরালে। মনে পড়ল তার পল্লীগ্রামের কথা। পল্লীগ্রামে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কুৎসিত মন নেই এমন নয়, আছে, যেখানে আছে সেখানে হয়তো এই মহানগরীর অধিবাসীদের চেয়ে বেশীই আছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভুল করে না। তারা বুদ্ধি দিয়ে অথবা অঙ্ক কষে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নির্ণয় করে না। জীবজন্তুর মত আশ্চর্য একটা বোধশক্তি আছে তাদের। তার মনে পড়ল লালবউয়ের কথা। অভিভাবকহীনা, সন্তানহীনা রূপসী গ্রাম্য ব্রাহ্মণবধূ। তার ভাই ছিল রমজান মের্দা। পাতানো ভাই। রমজান ছিল ভাল ঘরামী এবং পাকা বাসন-চোর। শোনা যায়, এক বর্ষার রাত্রে রমজান এসেছিল লালবউয়ের বাড়ী চুরি করতে। বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রি। রমজান উঠানে বাসনগুলি সন্তর্পণে গামছায় বাঁধছে এমন সময় প্রবল বেগে বৃষ্টি। পুরুষ নাই বাড়ীতে, রমজান নির্ভয়ে বৃষ্টি ধরবার প্রতীক্ষায় দাওয়ার এককোণে উঠে গিয়ে বসল। কয়েক মিনিট পরেই সে চমকে উঠল—দাওয়ার চালের কোণ থেকে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল তার মাথায়। সে সরে দাঁড়াল ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই শুনতে পেলে ঘরের মধ্যে খস-খস শব্দ। তার সঙ্গে গুন্‌গুন্ করে কান্নার আওয়াজও তার কানে এসে পৌঁছল। কান পেতে শুনে সে বুঝতে পারলে ঘরের মধ্যে জল পড়ছে, জল থেকে বাঁচবার জন্ম বিধবা বউটি বিছানা টেনে সরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এবং আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে আক্ষেপ করে কাঁদছে। রমজান আকাশের দিকে চেয়ে অকস্মাৎ উদাস হয়ে গেল, তারপর একসময় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পথে মনে পড়ল গামছার কথা। আবার ফিরল। ফিরে গামছাখানা খুলে নিতে গিয়ে মনে হল—সে ছুঁয়েছে, এ বাসন পড়ে থাকলে কাল সকালে বিধবা বউটি নিজেই মাজবে। ব্রাহ্মণের ঘরের এঁটোকাঁটা ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচারের কড়াকড়ির কথা সে জানত। সে খানিকক্ষণ ভাবলে। ভেবে ঠিক করলে ওর শাস্ত্র ওর ধর্ম ওর কাছে তার নিজের ধর্ম নিজের শাস্ত্রের মতই সত্য! কিন্তু

সেই বা এঁটোবাসন মাজবে কেন? অবশেষে মুক্ত উঠানের উপর অবিশ্রান্ত বর্ষণের নীচে বাসনগুলোকে রেখে সে চলে গেল। দেবে ধুয়ে খোদাতালার দেওয়া বৃষ্টি। ওই বৃষ্টির তো এই কাজ, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করাই তো তার ধর্ম্ম।

পরের দিন সকালে সে দাঁড়াল লালবউয়ের দরজায়। সমস্ত রাত্রি বর্ষণ লালবউয়ের জীর্ণ চাল বিপর্যস্ত করে ঘরের মেটে মেঝেতে ডোবা তৈরী করে দিয়েছে। লালবউ বসেছিল গালে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

রমজান এসে সেলাম করে বললে—সালাম গো দিদি!

তারপর বললে—আল্লার নাম নিয়ে কই দিদিঠারান—আমারে মন্দ করবেন না। আমার আপন মায়ে আর আপনকাতে সমান দেখি তবু আপনারে দিদিই বলব। প্রথমেই 'বেরাইছে' মু থেকে—আপনি আমার দিদিই।

লালবউ সবিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল তার দিকে।

রমজান অকপটে বলে গেল গতরাত্রের কথা। পরিশেষে বললে—দিদিঠারান, আপনি আমারে ভাই বলেন। আমি ঘরখানা আপনার ছাইয়া দি। খড় নাই, তালপাতা কেটে আনি—তাই দিয়া দিই ছাইয়া। দেখবেন রমজানের হাতে তালপাতার ছাউনি খড়ের ছাউনি থেকে ভাল হবে। বলেন আমার দিদি হলেন?

কেউ ছিল না সেখানে; শুধু ছিলেন তিনি যিনি সব সময়ে সর্বত্র থাকেন। তিনি হয়তো অহরহ ঘোষণাও করে থাকেন যা কিছু যেখানে ঘটে সব। কিন্তু শুনতে তো পায় না মানুষ। এ ঘোষণা বুঝতে পারে অনুমান করতে পারে তারাই যাদের আছে ওই বোধশক্তি। পল্লীর মানুষেরা অনুমান করতে পেরেছিল। ওই একটি তরুণী রূপসী ব্রাহ্মণবধূ আর এক মুসলমান তরুণ ঘরামী যে সম্পর্ক পাতালে, যার সাক্ষী কেউ ছিল না তাকে বুঝতে অনুমান করতে। তাদের একদিন এক মুহূর্তের জন্যও ভুল হয় নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লালবউ আর রমজান ছিল দিদি আর ভাই। নিত্য রমজান দিদিকে নির্জলা-খাঁটি দুধ যুগিয়ে এসেছে। রমজান জেলে গিয়েছে, চুরি করে, রমজানের বউ দুধ যুগিয়ে গেছে ঠাকুরঝির জন্যে। লালবউ ভাইফোঁটার ফোঁটা দিয়েছে রমজানের কপালে, কাপড় দিয়েছে। যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয়েছে সে বাড়ীর সন্দেশ মিঠাই লালবউ নিয়ে এসেছে আঁচলে পুরে, রমজানভাইকে দিয়েছে। রমজানের চুরির মালের সম্বন্ধে বারদুয়েক পুলিশ লালবউয়ের বাড়ীও সার্চ করেছে। তবু একটা অপবাদের কথা কেউ কোনদিন মুখে উচ্চারণ করে নি।

মহানগরীর হিসাব অঙ্কের হিসাব। ফরমূলার উত্তর। বাহিরের জগৎ যত বিস্তৃত হয়ে চলেছে, উগ্র প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, হৃদয় হয়েছে তত সংকীর্ণ, মন হয়েছে তত বুদ্ধিবৃত্তিতীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ এবং অবিশ্বাসী।

হঠাৎ কারও জুতোর শব্দ বেজে উঠল বাঁধানো গলিটার মধ্যে। চকিত হয়ে একটু সোজা হয়ে বসল বিমল। সেই মুহূর্তে বিড়ির খানিকটা আগুন খসে পড়ল কাপড়ের উপর। প্রায় লাফ দিয়ে উঠল সে এবার। সর্বনাশ! কাপড়খানা শ্রীচন্দ্রবাবুর, নতুন পাটভাঙা শান্তিপুরে

কাপড়। পুড়ে গেলে শ্রীচন্দ্রবাবু হয়তো ওই অজুহাতে কাপড়খানা বিমলকে দানই করে ফেলবেন, বলবেন—ওটা অগ্নিসাক্ষী করেই দিয়েছিলাম তোমাকে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট ছিল। অগ্নিদেব তাঁর সাক্ষ্য জ্বলজ্বলে করে ফুটিয়ে রেখেছেন—পাছে মনের কথাটা ভুলে যাই। ও কি আমি ফিরিয়ে নিতে পারি ?

বিড়িটা ফেলে দিয়ে সে দড়ির আলনা থেকে টেনে নিলে নিজের কাপড়খানা।

সেই মুহূর্তেই সেলাম করে দাঁড়াল শ্রী পত্রিকার আপিসের দারোয়ান।

—কি খবর ?

—চিট্‌ঠি। হিরণবাবু ভেজিল।

হিরণ লিখছে—পত্রপাঠ চলে এসো। জরুরী দরকার। না এলে ক্ষতি হবে।

থাক আজ খাওয়া! চল।

ব্যাপারটা জাঁকজমকের ব্যাপার এবং তাকে নিয়েই।

সমারোহ করে লেখক কয়েকজনকে ডেকে তার ওই গল্পটা পড়া হবে। পড়তে হবে তাকেই। বিজয়বাবু জাঁকিয়ে বসে আছেন এবং রসিকতায় মজলিস সরগরম করে তুলেছেন। বিমল যেতেই তাকে তাঁর পাশের চেয়ারে বসিয়ে বললেন—গল্পটা পড়ুন। আপনার মুখে শুনবার জন্যে সব বসে আছে।

বিমল বসল, কিন্তু তার অন্তর বিদ্রোহ করে উঠল। সে এদের সকলকেই শ্রদ্ধা করে, কিন্তু এদের গল্প পড়ে শোনাতে তার প্রবৃত্তি নাই। কারণ সে জানে এরা প্রত্যেকে তাকে নিতান্ত অবজ্ঞার চোখে দেখে। হয়তো পড়তে শুরু করে মাঝখানেই তাকে থামতে হবে—অথবা শেষ করে যখন উঠবে তখন দু'একজন ছাড়া কেউ থাকবে না। সে দু'একজনেরও টাকার দরকার থাকবে—এ্যাডভান্স নেবে, সেই জন্য থাকবে।

বিরজা ঢুলছিল। এরই মধ্যে তার আফিংয়ের নেশা জমেছে। রতন রেসগাইড নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে।

কাব্য-পাগল, দীর্ঘকেশী ভূপেন আঙুলে চুল জড়াতে জড়াতে আপন মনেই ওমর খৈয়াম আবৃত্তি করে চলেছে। একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য, কিছু আঙুর-চোয়ানো সুরা আর প্রিয়া—এই হলেই স্বর্গ।

সদ্য প্রকাশিত কাগজখানা হাতে দিয়ে বিজয়বাবু বললেন—পড়ুন।

বিমল কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললে—পড়ার কি দরকার আছে? ছাপার অক্ষরে যখন বের হল—তখন অবসরমত পড়বেন সকলে।

বিজয়বাবু বললেন—আপনি তাহলে কিছুই জানেন না। সাহিত্যিকরা কেউ কারও লেখা পড়েন না। পড়ুন, শোনাতে চাই আমি গল্পটা।

রতন রেসের বইটা বন্ধ করে বললে—পড়ুন। তাড়াতাড়ি শেষ করুন। আমাকে একবার চারটের সময় দেবপ্রসাদ এণ্ড সন্স-এ যেতে হবে।

বিরজা সমানে ঢুলছে, কিন্তু শুনছে সব, সে বললে—আমাকেও একবার যেতে হবে। পড়ুন মশায়।

বিজয়বাবু আবার তাগিদ দিলেন—পড়ুন।

বিমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পড়তে আরম্ভ করলে। অবজ্ঞার বিনিময়ে অশ্রদ্ধা দেখানোটাই আত্মম্ভরিতা চরিতার্থ করবার সব চেয়ে সস্তা এবং সহজ উপায়। সাহিত্যিক হিসাবে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁরা শক্তিমান, তাদের শক্তিকে সে নিজেও স্বীকার করে, সুতরাং অশ্রদ্ধা দেখিয়ে সে নিজেকে নিজের কাছে ছোট করবে কেন? সে ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরখানি স্তব্ধ হয়ে গেল। মাথার উপরে ইলেকট্রিক পাখার একটা একটানা শব্দ প্রবাহের মত বয়ে চলেছে। মধ্যে মধ্যে দেশলাই জ্বালার শব্দ হচ্ছে, সিগারেট ধরাচ্ছেন; বিরজাবাবু নিজে সিগারেট ধরিয়ে গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট খুলে টেবিলের উপর রেখে দিচ্ছেন, যার যখন ইচ্ছে বের করে ধরাচ্ছেন।

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন। বিজয়বাবু বললেন—এক মিনিট। বাইরের আপিস ঘরে তিনি উঠে গেলেন।

বিমল এতক্ষণে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। স্তব্ধ হয়ে সকলে সিগারেট টেনেই চলেছেন। রতন আপন মনেই পায়ের ঠেলা দিয়ে চেয়ারে দোল খাচ্ছে, বিরজা বড় বড় চোখ দুটি মেলে চেয়ে রয়েছে বাইরের দিকে, ভূপেন চোখ বন্ধ করে এক হাতে ধরে আছে চুলের গুচ্ছ, অন্য হাতে সিগারেটটা পুড়েই চলেছে। আর কয়েকজন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বিমলের মুখের দিকে।

বিমল দেখলে—সত্য করে প্রত্যক্ষ করলে বাংলার সাহিত্যিক সমাজকে। সকল তুচ্ছতা সকল ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে প্রতিভার মহিমায় প্রজ্বলিত হয়ে সাহিত্যরসের হবি গ্রহণ করছেন হোমশিখার মত। যজ্ঞকাষ্ঠের অন্তর্নিহিত বহ্নিশিখার মতই তাঁদের আত্মা যেন বেরিয়ে এসেছে। মহিমান্বিত মূর্তিতে। সে মনে মনে তাঁদের প্রণাম জানালে।

বিজয়বাবু টেলিফোন রেখে ফিরে এসে চেপে বসলেন। বললেন—পড়ুন। বিমল আবার পড়তে শুরু করলে।

পড়া শেষ হল। বিজয়বাবু হাঁকলেন—চা!

ভূপেন বললে, চা নয় মদ খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এমন একটা রসের কারবারের পর ট্যানিক এ্যাসিডে নেশা ছুটে যাবে। গোটা আষ্টেক টাকা খরচ করুন বিমলবাবু।

—বিমলবাবু না, আমি। আমি পনেরো টাকা দিচ্ছি। চল তোমার সাকীর ওখানে, গান শুনব, কাটলেট খাব। রাজী?

—রাজী।

—বিমলবাবু আপনাকেও যেতে হবে কিন্তু।

—নিশ্চয় যেতে হবে। ভূপেন বললে।

বিমল হেসে বললে—যাব।

রতন অকস্মাৎ বলে উঠল—ভাল হয়েছে গল্পটি। সুন্দর হয়েছে। তারপর উঠে পড়ল সে, বললে—বিজয়দা, কথা আছে।

হেসে বিজয়বাবু বললেন, কোন্ ঘোড়া? বলেই নোটকেস খুলে দু'খানা দশটাকার নোট

বের করে হাতে তুলে দিলেন।

বিমল হিরণের হাত টিপে ইসারা দিয়ে বাইরে এল। বললে, কিছু খেতে হবে। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি।

—সে কি ?

—সে অনেক কথা।

পিছনে ভারী পায়ের শব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠল কাঠের মেঝেতে। রতন বেরিয়ে আসছে। লম্বাচওড়া কালো জোয়ান রতন—বাংলা সাহিত্যের ডার্ক-হর্স; কালো তেজী ঘোড়ার মতই চলেছে। পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়েও রতন আবার দাঁড়াল। বললে—ভারী ভাল গল্প লিখেছেন বিমলবাবু। বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প।

বিমল একটু হাসল।

হিরণ বললে—আসবেন তো সন্ধ্যেবেলা ?

—দেখি। এখন তো যাব দেবপ্রসাদ এণ্ড সন্সের ওখানে।

—ওরা আপনার একটা বই ছাপলে, না ?

—হ্যাঁ। ওদের 'জন্মভূমি' কাগজে একখানা বই ধারাবাহিক ভাবে বের হচ্ছে। সেটাও ওরা ছাপবে।

বিমল বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব রতনবাবু ?

—কি ?

—আমিও একখানা বই ওদের দিয়েছি। তাই জিজ্ঞাসা করছি। কি টার্মে দিলেন ?

আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। বিমলের মুখের কাছে মুখ এনে অত্যন্ত কদর্যভাবে মুখ নেড়ে রতন বলে উঠল—আপনাকে বলব কেন ?

বলেই সে দ্রুতপদে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। কয়েকটা সিঁড়ি নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে হা হা করে হেসে উঠে বললে—ঠাট্টা করলাম। কিছু মনে করবেন না। তবে সকলকে তো সমান দেয় না। আপনাকে আমার সমান না দিতে পারে। সুতরাং শুনে কি করবেন ?

হিরণ বললে, চল। তুই যেমন ! ঘটোৎকচটা এমনই বটে। ও একটা দুর্বার। শক্তিও যেমন, দম্ভও তেমনি।

অদৃষ্ট মানে না বিমল। কিন্তু এক-একটা দিন এমনই দুঃখ কষ্ট অপমানের বোঝা নিয়ে আসে যে মানতে ইচ্ছে হয়। অবশ্য বাংলা দেশের লেখকদের পক্ষে নিছক সুখ ও সম্মানের দিন কখনই আসে না। তবুও এক-একটা দিনের দুঃখ কষ্ট অপমানের তুলনা হয় না। এ দিনটাই তেমনি একটা দিন বিমলের পক্ষে।

একটা রেস্তোরাঁয় খেয়ে শ্রী আপিসে ঢুকতেই একটি বুড়ো মুসলমান তাকে সেলাম জানিয়ে বললে—আপনি বিমলবাবু ? প্রসন্নবাবু একখানা চিঠি দিয়েছেন। বহু কষ্টে পাত্তা পাইছি আপনার।

প্রসন্নবাবু একজন নামকরা সাহিত্যিক-কবি। বিমলের এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিজয়বাবুর সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটেছে সম্প্রতি। এবং বিমলের সঙ্গে বিজয়বাবুর প্রীতি বর্তমানে ঘনী-

ভূত হওয়ায় তিনি বিমলের উপর বিরূপ হয়েছেন। প্রসন্নবাবুর প্রেস থেকেই বিমলের প্রথম বই ছাপা হয়েছে। মুসলমানটি সেই বইয়ের দপ্তরী, প্রসন্নবাবুরই দপ্তরী। প্রসন্নবাবুই বাংলা দেশের এক বড় প্রকাশককে অনুরোধ করে বইখানির প্রকাশক স্থির করে দিয়েছেন। তাঁরা একশো বই নিয়েছেন। বাকী বইয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি, তাঁদের গুদামে নূতন লেখকের রাবিশ রাখবার জায়গা নাই। সোনার ধান বোঝাই করে নেয় যে সোনার তরী—তাতে যাচাই করা কষ্টিপাথরে কষা সোনা ভিন্ন অন্য কিছুকে ঠাঁই দেবেন কি করে?

যাক সে কথা। তার জন্যে আক্ষেপ নাই বিমলের। আজ প্রসন্নবাবুর পত্র নিয়ে দপ্তরী তার কাছে এসেছে টাকার জন্য। প্রকাশক আর বই নেন নি, টাকাও দেন নি। প্রসন্নবাবুর কাছে টাকা তার জমা আছে, ছাপার খরচ এবংকাগজের দাম দিয়েও তো কিছু থাকতে পারে, প্রসন্নবাবুর কাগজে সে লিখেছে তার জন্যও সে কিছু প্রত্যাশা করে, কিন্তু সে সব হিসেব-নিকেশ সাপেক্ষ বলে প্রসন্নবাবু দপ্তরীকে তার কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দপ্তরী বললে—তিনি চিঠিতেও লিখছেন, মুখেও বলে দিছেন তিনি কিছু জানেন না। এরপর সে একেবারে সোজা বলে দিলে—টাকা না-পালি পর আমি ছেঁড়া কাগজের দরে বেচ্যা দিমু কইলাম আপনারে।

বিমলের মুখ সাদা হয়ে গেল।

দপ্তরী বললে—প্রসন্নবাবুরে কইলাম তিনি কইলেন, আমি তো কথা বল্যাই দিছি কিছু জানি না, তুমি তার সাথে গিয়া কথা কও, তা বাদে যা খুশী করবারে পার। আমি কইতে যাব না কিছু।

—কত টাকা পাবে তুমি? হিরণ প্রশ্ন করলে।

দপ্তরী পকেট থেকে একটা বিল বার করলে।

—কি হিরণ? সিঁড়ির মাথায় কখন এসে দাঁড়িয়েছেন বিজয়বাবু।

হিরণ তাকালে বিমলের দিকে, স'বতঃ বলবার জন্য অনুমতি চাইলে। বিমল দাঁড়িয়ে রয়েছে মাটির পুতুলের মত, তার বংশগত শিক্ষাদীক্ষা তাকে বলছে—তুমি বল, দিক তাই বেচে দিক। তুমিও ছেড়ে দাও এই দুঃখ-দৈন্যের তপস্যা। তুমি অক্ষম তুমি অলস তুমি ভীরু তাই তুমি এসেছ সাহিত্যের পথে, ঘরের কোণে বসে রচনা কর কল্পকথা, কলমের ডগায় খোঁচা মেরে মনে কর তুমি মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছ অন্যায়কে—মনে কর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করছ। ভেবে দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও মিথ্যা আত্মতৃপ্তি অনুভব কর।

বিজয়বাবু নেমে এলেন, প্রশ্ন করলেন—ব্যাপার কি?

দপ্তরী উৎসাহিত হল, সম্ভবত সাহিত্যিক সমাজের মাটির জীবনের পরিচয় সে ভাল করেই জানে—জানে একজন অপমানিত হলে এদের অন্য সকলে মনে মনে খুশী হয়ে ওঠে। সে উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করে বললে—কাল সকালে আমি সব বই বেচ্যা দিব মশায়। গুদামে ওই বাজে মাল রাখবার ঠাঁই নাই আমার।

বিজয়বাবুর নাকের ডগাটা স্ফীত হয়ে উঠল। বড় বড় চোখে ফুটে উঠল কঠিন দৃষ্টি; তিনি দপ্তরীর দিকে বার-দুয়েক দৃষ্টিনিক্ষেপ করে—তার হাত থেকে বিলখানা টেনে নিয়ে

দেখলেন। তারপর নোটকেস তুলে ছ'খানা দশটাকার নোট বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন—ফেরত দাও চার টাকা। বিল ছাপার টাকার।

দপ্তরী বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে এটা প্রত্যাশা করে নাই। বিজয়বাবু আবার বললেন—থাক টাকাটা, ন'শো বই তুমি আমার বাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবে। শ্যামবাজার। বুঝেছ?

তারপর বিমলের হাত ধরে বললেন—আসুন, আজ থেকে আমি আপনার পাবলিশার হলাম।

বিমল কোন কথা বলতে পারলে না। কিন্তু গভীর ভাবাবেগ তার অন্তরের মধ্যে পূর্ণ তিথির সমুদ্রের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। বিজয়বাবু হয়তো নিজেকে আজও আবিষ্কার করতে পারেন নাই কিন্তু সে আজ বিজয়বাবুকে আবিষ্কার করেছে।

চন্দ্রমুখী নামে দেহব্যবসায়িনী কেনাবেচার কদর্যতম হাটের মধ্যে দেবদাসকে ভালবেসেছিল। এমন ভালবেসেছিল যে, ব্যবসা ছেড়ে সে সন্ন্যাসিনী হয়েছিল। সমাজের মধ্যে যাদের স্থান নাই, যুগ-যুগান্তরের ঘৃণার ফুৎকার মানুষেরা যাদের উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফুৎকারের আকণ্ঠগভীর একটা খণ্ড সমুদ্র তৈরী করে তুলেছে তাদের চারিপাশে—তাদের সঙ্গে পরিচয় মানুষের কম। মানুষ চরিত্রবান বলে নয়, এদের সঙ্গে পরিচয় কেনাবেচার রূঢ় বাস্তবতার মত এমনি শুষ্ক এমনি উপর-উপর যে চন্দ্রমুখীকে বিশ্বাস করতে চায় না মানুষের মন। কিন্তু বিমল আজ চোখে দেখলে—চন্দ্রমুখী আছে। শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করলে মনে মনে।

মহানগরীর ডাস্টবিন এই পল্লী। জীবনের কুৎসিত তৃষ্ণা নিবারণের পল্লী। জীবনের যত কদর্যতা উগরে দিয়ে যায় মানুষ এখানে।

বিজয়বাবু বললেন—এ হল অভিনব গয়াক্ষেত্র বিমলবাবু। মানুষের অন্তরের প্রেতলোক এখানে পিণ্ড গ্রহণ করে।

বিমল মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিল। কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ করে নাই। কৌতূহলও ছিল। ভূপেনের সাকী শ্রীমতীর ঘরে এসে তাকে দেখে তার কথা-কাহিনী শুনে তার মনে হল আসা তার সার্থক হয়েছে। শরৎচন্দ্রের চন্দ্রমুখীকে সে দেখে গেল। তাঁর সে আবিষ্কারকে সে এতদিন শুধু বিস্ময়কর এবং সুন্দর—এর বেশী বুঝতে পারে নি—তাকে সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে।

স্বাস্থ্যবতী শ্যামবর্ণা মেয়েটি। কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট। কথাবার্তা বুদ্ধির বিচারে তেমন মার্জিত হয়তো নয় কিন্তু যত সংযত তত সম্ভ্রমপূর্ণ তত মিষ্ট। শ্রীমতী খ্যাতিসম্পন্না গায়িকা। অভিনয়েও সে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু গানের তুলনায় সে কিছু নয়। শ্রীমতীর কণ্ঠ সুধাক্ষরা। ভূপেনকে সত্যই দেবদাসের মত ভালবেসেছে। তার প্রতি অনুরাগের পরিচয় শ্রীমতীর সর্বাঙ্গে, তারই রুচি অনুযায়ী সে বেশভূষা করেছে; ঘরে-দুয়ারের সর্বত্রও সেই পরিচয়—রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা গীতবিতান সাজিয়ে রেখেছে, শরৎচন্দ্রের বই কিনেছে, ঘরের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের শরৎচন্দ্রের ছবি টাঙানো, মাসিকপত্র থেকে কেটে বাঁধিয়ে যামিনী রায়,

নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছবি। চীনেমাটির বাসনে সাজিয়ে শ্রীমতী নামিয়ে দিল সিদ্ধ ভেজিটেবল্ কাটলেট ; ভূপেনের হাতে দিলে একটা বাটিতে খানিকটা সুপ। বললে—এটা খাও আগে। ভূপেনের সাহিত্যিক বন্ধুরা আসবে জেনে সে নিজে হাতে পরিচর্যা করে তৈরী করেছে সমস্ত খাবারগুলি।

তারপর আরম্ভ হল গান—বিজয়বাবু বললেন—আপনি বসুন।

ভূপেন গেলাসে মদ ঢালছিল। সে বললে—আপনি কেন? ওকে 'তুমি' বলুন।

—ঠিক হ্যায়। আপসে ঠিক হো যায়গা।

বিরজা টেনে নিলে গেলাস। বললে—তুই বেটা বেশ আছিস। বলে হা হা করে হেসে উঠল।

ভূপেন বললে—তুই অত্যন্ত ভালগার বুঝলি! সে একে একে গ্লাস এগিয়ে দিল। বিজয়বাবু নিজে নিয়ে বিমলকে বললেন—আপনি একটু জিভে ঠেকান। বাস্।

বিমল কপালে ঠেকিয়ে রেখে দিলে।

সকলে তার দিকে তাকালে। বিজয়বাবু বললেন—ঠিক আছে। বিমলবাবুর ওই হয়েছে। ওর ভাগটা হিরণকে দাও। হিরণ না পারে, রেখে দাও—রতন আসবে। নাও—আরম্ভ কর গান।

শ্রীমতী গান আরম্ভ করলে। রবীন্দ্রনাথের গান। ভূপেন তাকে শিখিয়েছে। শ্রীমতী কীর্তন সব চেয়ে ভাল গায়! এমন কীর্তনগায়িকা আধুনিক বাংলাদেশে বিরল। কিন্তু তবু সে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেই বেশী ভালবাসে। গাইবার আগে সে ভূপেনকে জিজ্ঞাসা করলে—কোন্ গানটা গাইব?

ভূপেন সকলের দিকে তাকিয়ে বললে—শুরু হোক রবীন্দ্রনাথে, শেষ হবে চণ্ডীদাস অথবা বিদ্যাপতিতে। কি বলেন?

—ঠিক হ্যায়। বিজয়বাবু একটা কৃত্রিম কাপ্তেনী উৎসাহ নিয়ে অভিনয় করে চলেছেন।

ভূপেন বললে—আজ সুর বাঁধো আনন্দের তারে। আরম্ভ কর। 'আজ কি বারতা পেল রে'।

হারমোনিয়মে সুর বেজে উঠল, অতি মৃদু স্বরে বাজছে যন্ত্রটা ; শ্রীমতীর কণ্ঠস্বরে যন্ত্রের সুর লজ্জা পায়। মানায় একমাত্র বাঁশের বাঁশী। সে আরম্ভ করলে গান—

আজ কি বারতা পেল রে কিশলয়!
ওরা কার কথা কয় বনময়!
এসো কবি এসো, মালা পরো, বাঁশী ধরো
হোক গানে গানে বিনিময়।

গানের মধ্যেই ভূপেন উঠে সকলের গলায় পরিয়ে দিল একগাছি করে বেলফুলের মালা। সকলের আগে দিলে বিমলের গলায়।

গানে গানে মনোলোকে সে এক সুরলোক সৃষ্টি করলে শ্রীমতী। সমস্ত দিনের সকল ক্লেদ গ্লানি ধুয়ে মুছে গেল বিমলের।

মালাগাছি গলায় ঢুলিয়েই সে বাড়ী ফিরল। অন্ধকারের মধ্যে মনে হল ময়দানের গাছগুলির শাখার প্রান্তে প্রান্তে যেন মুকুলেরা উদ্গত হচ্ছে। গলার মালার গন্ধের সঙ্গেই মিশে আছে সে গন্ধ। মহানগরীকে সে মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিলে। তাকে বন্দনা করলে।

মহানগরী না থাকলে শ্রীমতীকে কেউ জানত না। নিজেকে নিজেই জানত না হয়তো শ্রীমতী। দূর মুর্শিদাবাদের এক নগণ্য গ্রামে তার জন্ম; প্রাচীন নবাবী আমলের কতকগুলি দেহবিলাসী শেঠেরা এনে তাদের বসিয়েছিল সেখানে, দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে তারা আজও সেই জীবন যাপন করছে। তারই মধ্যে উদ্ভব শ্রীমতীর। অল্পস্বল্প কীর্তন গাইতে শিখেছিল; গুণীজন-সন্ধানী মহানগরী তাকে আহ্বান জানালে—সে এল; মহানগরী তার জীবনের আর কোন বিচার করলে না, বিচার করলে গুণের। সেই বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে অকুণ্ঠচিত্তে তাকে দিলে সমাদরের আসন।

চিন্তায় তার ছেদ পড়ল। ট্রাম এসে পড়েছে রাসবিহারী এ্যাভিনুয়ে, দেশপ্রিয় পার্ক পার হয়ে চলেছে। ডাবুর হাউসে আজ এত আলো কিসের? আলো গিয়ে পড়েছে পার্কের মধ্যে। একটা গাছে অজস্র সাদা রংয়ের ফুল ধরে আছে। আশ্চর্য, যাবার সময় চোখে পড়ে নি! মন—সবই মন। মন তখন চোখকে দেখতে দেয় নি। এখন মনের মধ্যে গুঞ্জন করে উঠল।

আজ কি বারতা পেল রে কিশলয়!

ট্রাম থেকে নেমে পড়ল সে। গলায় মালাখানি দুলছে।

ওরা কার কথা কয় বনময়!

গুঞ্জন করতে করতে এসে সে দরজা খুললে ঘরের। আলো জ্বাললে। আলোর মধ্যে নজরে পড়ল একখানা খাম পড়ে আছে। দরজার চৌকাঠের কাছে। দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে গেছে। ডাকের চিঠি নয়। কোন এক বাহক এসেছিল। পত্রখানা তুলে নিয়ে সে খুলে ফেললে। কে লিখেছে? নামের জায়গাটাই আগে দেখলে। 'লাবণ্য'।

লাবণ্য লিখেছে! মনটা রূঢ় আঘাত পেলে। ও-বেলার জের টেনেছে লাবণ্য।

বারো

দীর্ঘ পত্র। প্রায় পূর্ণ তিন পৃষ্ঠা। বারকয়েক চিঠিখানা উল্টেপাল্টে দেখলে, দু'চারটে লাইন চোখে পড়ল। চিঠিখানা পড়বে কি পড়বে না ভেবে স্থির করতে পারছিল না বিমল। কয়েক জায়গায় অরুণার নাম রয়েছে। সম্ভবত অরুণাকে এনে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য অভিযোগ করে থাকবে। এ অভিযোগ করবার অবশ্যই অধিকার আছে লাবণ্যের। আরও কিছুক্ষণ ভেবে সে চিঠিখানা পড়লে। চিঠির আরম্ভে কোন পাঠ নেই। সরাসরি লিখেছে —"ও-বেলায় আপনাকে যে সব কথা বলেছি—এবং যে ব্যবহার করেছি তার জন্য নিজের

কাছেই নিজে লজ্জা পেয়েছি, নিজেকেই অনেক তিরস্কার করেছি, কিন্তু তাতেও যেন অপরাধের ভার লাঘব হচ্ছে না। সেই জন্যই অনেক ভেবে আপনাকে পত্র লিখছি, পত্রযোগে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। সব চেয়ে দুঃখ হচ্ছে…বেলা দুটোর পর আপনি অভুক্ত জেনেও আপনাকে ঘর থেকে একরকম বের করে দিয়েছি। মানুষের জীবন এবং চরিত্র নিয়ে আপনার কারবার, আপনি এ কথা নিশ্চয় জানেন যে, রাগ করে হোক, ঘৃণা করে হোক আপনার জন না খেলে—মেয়েরা সব চেয়ে বেশী দুঃখ পেয়ে থাকে। আমার দুঃখের এবং লজ্জার আর সীমা পরিসীমা নেই। আপনি খান নি এ কথা জেনেও আমি আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করি নি, উপরন্তু অপ্রিয় কটু কথা বলেছি। যে সময়ে আপনি এখান থেকে গেছেন তখন বোধ হয় আড়াইটে, তখন কলকাতার কোন হোটেলে ভাত ছিল না। সমস্তটা দিন আপনি নিশ্চয় উপবাসে কাটিয়েছেন। বন্ধু বা আত্মীয় ধনীজন বলে সেখানকার অন্নগ্রহণের অরুচিকর দায় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য যদি বলে থাকেন—আমার এখানে আপনার নিমন্ত্রণ আছে, তাতে লজ্জা পাওয়া বিরক্ত হওয়া আমার উচিত ছিল না। কিন্তু মনের অবস্থা আমার তখন এমনই ছিল যে এমনই একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল স্বাভাবিক ভাবে। আমার কোন হাত ছিল না। আমি তখন নিজের উপর সমস্ত সংযম হারিয়ে বসেছিলাম। এর খানিকটা আভাস আপনি নিশ্চয় পেয়ে গেছেন। বাড়ীর ভিতর থেকে ব্যাঙ্কার গিন্নীর পুত্রবধূ যা বলেছিলেন—সে আপনি শুনেছেন। 'এই ভরদুপুরে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যে মান অভিমানের পালা গাইছে—এঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি শুনি?' আপনার মনে আছে বোধ হয়। আমার সর্বাঙ্গে কদর্য কাদা মাখিয়ে দেবার যে প্রাণপণ চেষ্টা এই বউটি কদিন ধরে করছে—সে শুনলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

যে দিন থেকে এই বাসায় এসেছি—সেই দিন থেকেই মেয়েটি এই ভাবে আমার পিছনে লেগে আছে। আমার মত অভিভাবকহীনা অল্পবয়সী একটা বিধবা মেয়ে এমনি স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, এটা তার কাছে শুধু অবিশ্বাসের কথাই নয়—অসহ্যও বটে। মধ্যে মধ্যে সে বলে—যে সব মেয়েরা চাকরি করে, এমনি করে সেলাই-ফোঁড়ের ব্যবসা করে তারা আমার দুচক্ষের বিষ। অথচ আশ্চর্যের কথা এই মেয়েটিই পাশের তিনতলা বাড়ীর শিক্ষিতা বউটির কাছে নিত্য-নিয়মিত ভাবে সেলাইয়ের কাজ শিখে আসে। শুধু তাই নয়, স্বামীর কাছে রাত্রে পড়াশুনা সুরু করেছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।

হয়তো আমার কিছু দোষ আছে। ওদের পারিবারিক মনোমালিন্যের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে গেছি। বউটির শাশুড়ী তাঁর দুঃখের কথা আমার কাছে বলেন, আমি সান্ত্বনা দিয়ে থাকি, তার বিধবা ননদটি আমাদের কাছে আসে—সেলাই শেখে। তার দুটি কুমারী মেয়েও আমার কাছে পড়ে।

ক্রমে ক্রমে এই বিরোধিতা বেড়েই চলেছে। আমার বহু পরিশ্রমের ফলে আরও তিনজন আমার মতই হতভাগিনী এসে যোগ দিল, ধীরে ধীরে আমাদের কাজের আদর হল, সঙ্গে সঙ্গে বউটিও হয়ে উঠল নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর। তার এই আক্রোশে ঘৃতাহুতি দিলেন আপনি। আরও একটু খুলে বলি। চিত্তদা আপনার দেশের লোক, তাঁকে আপনি ভাল করেই

জানেন। সরল দয়ালু মানুষ কিন্তু নেশা করেন এবং শুনেছি আরও অখ্যাতি আছে। যাই থাক—তিনি আমার কাছে একান্ত আপনার জনের মত। এই মানুষটির একটি অদ্ভুত সহজ দৃষ্টি আছে—যে দৃষ্টি দিয়ে মানুষের ভালত্ব-মন্দত্ব এক নিমেষে চিনে নেন। তিনি অনেক সাহায্য করেছেন আমাকে। এই বধূটি তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আমাদের নামে অপবাদ রটনা সুরু করেন। একদিন চিত্তদা বউটির স্বামীকে রাস্তায় ধরে বলেন—'দেখুন—আপনার বউ যদি এমন কথা আর কোনদিন বলে—তবে আপনার দাঁত ভেঙে দেব। যতবার বলবে ততটি দাঁত আপনার যাবে।' চিত্তদার কথায় এবং কাজে তফাৎ নেই। সে কথা এখানকার সকলেই জানে। ওই তিনতলার মালিক বাবুটি কয়েকদিন আগেই সদর রাস্তার উপর একজন অপরিচিত লোকের হাতে কানমলা খেয়েছিলেন। ঠিক দু'দিন আগেই চিত্তদা তাকে বলেছিলেন, 'শহরে কে কার কড়ি ধারে, এমন মেজাজের জন্যে কার কাছে কোন দিন কানমলা খাবেন আপনি।' পাড়ার কয়েকটি তরুণ প্রহার খেয়েছিল কয়লার ডিপোর কুলীদের কাছে। কাজেই তার শাসন-বাক্যকে উপেক্ষা করতে সাহস করেন নি বউটির স্বামী। স্ত্রীকে নিরস্ত করেছিলেন।

হঠাৎ আপনি নিয়ে এলেন অরুণাকে।

চিত্তদা আপনার নাম করে আমার এখানে অরুণাকে নিয়ে এলেন—আমি পরম ভাগ্য বলে মনে করলাম। এতদিন দূর থেকে আপনাকে দেখেছি—আর এবার অরুণার কল্যাণে আপনি কাছে এলেন। প্রথম দিন সেই আনন্দেই আপনাকে নিমন্ত্রণ করে উৎসব করতে চেয়েছিলাম। আপনাদের নামের একটা মোহ আছে। থাক সে কথা। না থাকবেই বা কেন? গোপন করব কেন? সাহিত্যিক শিল্পী দুর্নিবার আকর্ষণে সাধারণকে টানে। আমাকেও টানে। আমার মনে হয় আপনাদের কাছে গেলেই পাব সকল দুঃখের সান্ত্বনা, সকল অভিমান ক্ষোভে অন্তরজুড়ানো স্নেহস্পর্শ; অনাত্মীয়তার রূঢ়তায় রূঢ় এই সংসারে আত্মীয়তার মাধুর্য সম্ভারে সম্ভারে জমা হয়ে আছে—আপনাদের কাছে; অসম্মানিত সাধারণ আমরা আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ে আপনাদের সম্মানের অংশ পাব। এই কারণেই তো ওই পিনাকীকে সহ্য করতে পেরেছিলাম। আমার ভাগ্য, আমার ভাগ্যে তো পরিহাস ছাড়া বিধাতার আর কোন দান নেই; পিনাকী আমাকে ভালবেসেছিল; অকপটে সে ভালবাসার কথা আমাকে পত্রযোগে জানাতেও সে সাহস করেছিল। তার সাহসই বলুন আর ধৃষ্টতাই বলুন—পরিণামে সে বিস্ময়কর। যাক সে কথা।

আপনি কাছে আসাতেই আগুন ধরল। বউটি এবার প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অথচ সে আপনার লেখার খুব ভক্ত। তার স্বামী পাড়ার লাইব্রেরী থেকে যে বই নিয়ে আসেন তার মধ্যে আপনার বই-ই বেশী। প্রথম যেদিন আমার এখানে চা খেয়ে গেলেন—সেদিন সে স্তম্ভিত হয়ে রইল। পরের দিন থেকে আগ্নেয়গিরির মুখ নতুন করে খুলল। আপনার মনেই বকে যেত—কল্পনা করা কুৎসিত কথা। কান দিই নি। কিন্তু আজ পিনাকী ঘটালে বিস্ময়-কর ঘটনা। বেলা সাড়ে এগারটায় সে এল অভিনব বেশে।—আপনি নিজের চোখেই তার সে অভিনব বেশ দেখেছেন। আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। চুল ছেঁটে—কামিয়ে প্রসাধন পরিচ্ছন্ন বেশে সে এসে দাঁড়াল—আমার মনে পড়ে গেল রূপকথার বুদ্ধ-ভুতুমের কাহিনী;

রাজপুত্রেরা থাকত বানর আর পেঁচার খোলস পরে। সেই খোলস একদিন পুড়িয়ে দিলে তাদের ভাবী বউয়েরা। রাজপুত্রদের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। আমি হেসে তাকে সেই কথাই বললাম। বিনা ভূমিকায় সে আমায় বললে—ঠিক বলেছেন লাবণ্যদি; বড় ভাল বলেছেন। আমি প্রেমে পড়েছি—তাই আমার সকল ময়লা খোলস খসে গেছে। আমি অরুণাকে ভালবেসেছি। কাল সারারাত্রি আমি ভেবে দেখেছি। তাকে আমি ভালবাসি। অরুণাকে আমি বিয়ে করতে চাই লাবণ্যদি। তার চোখমুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলতেও আমার সাহস হয় নি। বরং ভয় পেলাম আমি। পিনাকী বললে—আমি কোন আপত্তিই শুনব না আপনার। আপনাকে মত দিতেই হবে।

আমি বললাম—আমি তো অরুণার অভিভাবক নই পিনাকী, আমি কি বলব? এ কথার জবাব শুধু অরুণাই দিতে পারে।

বিনা বাক্যব্যয়ে পিনাকী উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম—শুধু একটি কথা বলব আমি পিনাকী, তুমি আমাকে দিদি বল—তাই বলব।

সে ঘুরে দাঁড়াল।

আমি তুললাম উপার্জনের কথা, আর্থিক সঙ্গতির কথা। বললাম—কোন ভরসায় বিয়ে করবে বলছ—সেটা ভাব। তুমি তাকে ভালবাস, সে-ও যদি তোমাকে ভালবাসে—তবে মনের কথা বলা-কওয়া করে—প্রতীক্ষা কর সুদিনের।

সে বললে—সুদিন তো আসতেও আছে যেতেও আছে লাবণ্যদি। কাল এসে—পরশুও তো চলে যেতে পারে। দুঃখের মুখ তাকিয়ে আজ যদি প্রেমকে উপেক্ষা করি—তবে এর চেয়ে প্রেমের অপমান আর কি হতে পারে? কাল যখন সুদিন আসবে—তখন যদি প্রেমের এ আবেগ না থাকে!

পিনাকী হয়তো পাগল, হিসেবী লোক বিবেচক লোকের কাছে এ-কথাগুলি পাগলামীর কথা ছাড়া কিছুই নয়, উচ্চস্তরের লোকেরা হয় তো বলবেন—প্রেম তো শুধু ভোগের জন্যই নয়, প্রেম যে মানুষকে ত্যাগের পথেও নিয়ে যায়। আরও হয় তো বলবেন—প্রেমের আবেগ যদি সময়ক্ষেপে জুড়িয়েই যায়—তাতেই বা ক্ষতি কি—সেই তো বরং ভাল। আরও হয়তো অনেক কথাই বলবেন—বলতে পারেন; বলুন যাঁর যা খুশী। আমি এর উত্তরে কিছু বলতে পারি নি। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, অরুণার সৌভাগ্যে আমার মন ভরে উঠেছিল, চোখে জলও এসেছিল।

তাকে আমি অরুণার কাছে নিয়ে গেলাম। বললাম—অরুণাকে তুমি বল। তাদের একঘরে রেখে চলে এলাম। শুনে আশ্চর্য হবেন—এর পর অকারণেই আমি কাঁদলাম।

কাঁদছিলাম, হঠাৎ বউটির গলায় শাঁখ বেজে উঠল। আগেকার কালে শাঁখ বাজত যুদ্ধ-ক্ষেত্রে। চীৎকার করে আরম্ভ করলে—কুৎসিত কদর্য অভিযোগ। কদর্যতম অভিযোগ বিমলবাবু, বললে, ব্যবসায়ের একটা আড়াল তৈরী করে—আমরা পেতেছি একটা দেহ-ব্যবসায়ের আসর। আমাকে বললে—। যাক সে কথা। অবশ্য অনেক শুনেছি এমন সব কথা! পথে বেরিয়ে পিছনে বলতে শুনেছি, দুই পাশে বলতে শুনেছি মানুষকে। তাদের

কথাকে ঘৃণা করেছি, উপেক্ষা করেছি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—এমন বিষ মেশানো কথা কখনও শুনি নি। একে কোনমতে উপেক্ষা করতে পারলাম না। প্রতিবাদ করবার জন্ম উঠে দাঁড়ালাম। আমাকে বাঁচালে পিনাকী আর অরুণা। তারা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল—হাসিমুখে মাথা উঁচু করে। অরুণা বউটিকে বললে—কেন এমন ধারা কদর্য কথা-গুলো বলছেন আপনি?

বউটি বললে—কদর্য? তোমাদের ওই কদর্য রসালাপের ভাষ্য কি গীতা-ভাষ্যের মত পবিত্র হবে?

অরুণা বললে—আপনার স্বামীর সঙ্গে আলাপ তো আপনিও করে থাকেন। ভালবাসার কথাও বলেন। তাকে কি আপনি কদর্য মনে করেন?

ফুঁসে উঠল মেয়েটি। বললে—কি? আমরা স্বামী-স্ত্রী—নারায়ণ সাক্ষী করে—

বাধা দিয়ে অরুণা বললে—আমরাও স্বামী-স্ত্রী হতে চলেছি। অবিশ্যি নারায়ণ সাক্ষী রাখবার ভাগ্য হবে না, তবে রেজিস্ট্রী করে আমরা বিয়ে করব।

বউটি দমে গেল—তবু বললে—সে বিয়ে—আর এ বিয়ে—

আবার বাধা দিলে অরুণা। বললে—আইনমতে বিয়ে করছি, এ বিয়েকে গালাগালি দিলে আইনের ফ্যাসাদে পড়বেন আপনি।

মেয়েটিকে চুপ করতে হল এরপর।

আমার মুখের দিকে চেয়ে অরুণা বললে—ওই বউটিই আমার সকল দ্বিধা ঘুচিয়ে দিলে লাবণ্যদি। ওকে আমার ঘটকী-বিদেয় দিতে হবে। বলে সে হেসে উঠল।

তারপর ওরা মেতে উঠল সমারোহে। অকস্মাৎ ওদের চোখে ধরা পড়ল—কলকাতায় বসন্ত এসেছে। পার্কে পার্কে ফুল ফুটেছে। খোলা ময়দানে দক্ষিণা বাতাসের প্রবাহ বয়ে চলেছে। পিনাকী বললে—ডালিয়া ফুটেছে অপরূপ হয়ে—চিড়িয়াখানার বাগানে।

বউটির কথাগুলি ফিরিয়ে দিলে সুদে আসলে। হাসতে হাসতে চলে গেল সে বিজয়িনীর মত। কিন্তু আমি? আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বউটির বাক্যকণ্টকবিদ্ধ অন্তর নিয়ে। কাঁটা ফুটে বিঁধে থাকলে রক্ত ঝরে না—কিন্তু দুঃসহ বেদনা হয়। আমার অবস্থা হল তেমনি। অরুণার জীবনে সকল কাঁটা গোলাপ হয়ে ফুটল—দক্ষিণা বাতাস তাদের ডাক দিলে—তারা চলে গেল। আমিই অরুণাকে সাজিয়ে দিলাম, অতীত জীবনের স্বামীসৌভাগ্যের অবশেষের মধ্যে কয়েকখানা শাড়ী আছে, তারই মধ্যে সবচেয়ে যেখানা ভাল তাই তাকে পরিয়েও দিলাম। আমার ভাগ্যে কাঁটা ফুল হয়ে ফুটবার নয়, জীবনে সে বিঁধেই রইল, প্রথম জীবন থেকে যত কাঁটা বিঁধে আছে তাতে তার অবস্থা শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মত; কণ্টকশয্যায় অন্তর আমার শুয়ে পড়েছে আজ।

ঠিক এই সময়ে এলেন আপনি। প্রথমটায় অন্তর আমার পরম আগ্রহে সান্ত্বনার প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল—ভীষ্ম যেমন অর্জুনের কাছে চেয়েছিলেন তৃষ্ণা মেটাবার উপযুক্ত ভোগবতীর জল, তেমনি চাইব আপনার কাছে সান্ত্বনার স্নেহ—নির্ঝরের শীতল স্নিগ্ধ-ধারা। কিন্তু কি জানি কেন চাইতে পারলাম না। সঙ্কোচ হল। তার পরিবর্তে আমার মনে

সকল ক্ষোভ বেরিয়ে এল। আঘাত করলাম আপনাকে।”

এর পর অনেকটা অংশ লিখে বার বার দাগ টেনে সযত্নে কেটে দিয়েছে। কৌতূহল হল বিমলের। কি লিখেছিল লাবণ্য? বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল তার। সে উঠে দাঁড়িয়ে আলোটার খুব কাছে গিয়ে তুলে ধরে চিঠির কাটা অংশটা পড়বার চেষ্টা করলে।

হাত তার কাঁপছে, সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানাও কাঁপছে। চোখের দৃষ্টিতে যেন কিছু ধরা পড়ছে না। কি লিখেছিল লাবণ্য? সে কি লিখেছিল—সে তাকে ভালবাসে?

কিছুই কিন্তু পড়া গেল না। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কেটেছে। পাথরের অথবা ধাতুফলকের উপরের লেখা যেমন উখো দিয়ে ঘষে ঘষে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় তেমনিভাবে লেখার উপরে দাগ টেনে টেনে কেটেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বিমল।

অনেকক্ষণ পর শেষ অংশটা সে পড়লে।

“দুর্ভাগ্যের এইখানেই শেষ নয়। যে তিনজন সঙ্গিনী এসে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল —তিনটি বিধবাকে আপনি দেখেছিলেন নিশ্চয়, আশ্চর্যের কথা তারাও বিকেলে আমাকে জানালে তারা আর থাকবে না এখানে, অরুণা এবং আমি যে ভাবে কলঙ্কের ক্ষেত্র করে তুলেছি এই আসরটিকে—তাতে এখানে থাকলে ভবিষ্যতে তাদেরও কলঙ্কের ভাগ নিতে হবে। কিন্তু তার চেয়ে মেয়েদের পক্ষে মরণই মঙ্গল। সুতরাং তারা চলে যাবে। নয়তো—। বুঝেছেন নিশ্চয় নয়তো’র পর কি? আমি ভাবলাম। ভেবে ঠিক করলাম আমিই চলে যাব। আমি চলে যাচ্ছি। হয়তো জীবনে আর দেখা হবে না। দেখা হলেও যে সব অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন আসবে আপনার জীবনে, আমার জীবনে তাতে হয়তো পরস্পরকে চিনতেই পারব না। হয়তো চিনতে পারলেও—পরিচয়কে স্বীকার করাও সম্ভবপর হবে না। ভাবুন তো যদি কোনদিন পথের ধারে আমাকে ভিক্ষুনীর বেশে ভিক্ষা করতে দেখেন তবে চিনতে পারা সম্ভবপর হবে কি?”

বিমল স্তম্ভিত হয়ে গেল। এতখানি তেজ এত বড় অভিমান এত সাহস যে মেয়ের সে মেয়ে না পারে কি? কোথায় গেল সে এই রাত্রে? যতই অসম সাহসিনী হোক লাবণ্য রাত্রির মহানগরীকে সে জানে না। শিউরে উঠল সে। তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছুটে গেল চিত্তরঞ্জনের দোকানে। রাত্রি অনেক হয়েছে। রাস্তা জনহীন। চিত্তর দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। সে বার কয়েক ডাকলে, কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ভাবলে, চিত্ত এখানে নেই, বাসাতে আছে, সেখানে গিয়ে চিত্তকে ডাকবে? অথবা লাবণ্যদের ওখানে গিয়ে লাবণ্যের নাম ধরেই ডাক দিয়ে যারা আছে তাদের কাছে জেনে নেবে লাবণ্যের সংবাদ! তাতে কলঙ্ক রটনার সম্ভাবনা আছে, হয়তো বাড়ীসুদ্ধ লোকে কুৎসিত ভাষায় কদর্য অভিযোগে অভিযুক্ত করবে। এমন কি দুষ্ট লোকের হাতে লাঞ্ছনাও ঘটতে পারে তার।

ঘটুক। যে যা বলে বলুক। সে তাদের সম্মুখীন হবে। সে বলবে—লাবণ্যকে সে

ভালবাসে। তারা পরস্পরের কাছে বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। লাবণ্য যদি এখনও না গিয়ে থাকে, তবে তাই না হয় হবে। গ্রহণ করবে সে লাবণ্যকে তার জীবনে। সে আজ যেন অন্তর দিয়ে অনুভব করছে প্রিয়ার গণ্ডের তিলের বিনিময়ে বোখারা সমরখন্দ দান করার কল্পনা কবির অতিশয়োক্তি নয়, ভাবাবেগে হয়তো বটে কিন্তু এ ভাবাবেগ জীবনে সত্য। বাস্তববুদ্ধিতে এই আবেগের সত্যকে যে লঙ্ঘন করে সে জীবনে হয়তো সমৃদ্ধি লাভ করে, সুনাম হয়তো অক্ষুণ্ণ থাকে কিন্তু আত্মাকে লাঞ্ছিত করে, পীড়িত করে, আত্মা তাকে অভিসম্পাত দেয়—"আজীবন মরুতৃষ্ণায় তুমি তৃষিত হয়ে ফেরো।"

সে দৃঢ়পদেই অগ্রসর হল। খানিকটা গিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। লাবণ্যের বাড়ীর ওদিক থেকেই দুজন কারা আসছে। এক মুহূর্ত পরেই সে তাদের চিনতে পারলে। পিনাকী আর অরুণা।

তারা দুজনেও থমকে দাঁড়াল বিমলকে দেখে। বিমল বললে—এ কি? এত রাত্রে কোথায় যাবে?

পিনাকী বললে—আমাদের আজ বাসর বিমলবাবু। বাসর পাততে চললাম। সে হেসে উঠল। তারপর বললে—গিয়েছিলাম চিড়িয়াখানা—সেখান থেকে গঙ্গার ধারে ইডেন গার্ডেনে বেড়িয়ে গেলাম সিনেমায়। ফিরে অরুণাকে পৌঁছে দিতে এসে দেখি দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে শুনলাম ওখানে অরুণার ঠাঁই হবে না। দরজা খুললেন না। বললেন—আছে একখানা কাপড়—সে এসে কাল নিয়ো।

—লাবণ্য? লাবণ্য দেবী বললেন?

অরুণা বললে—লাবণ্যদি নাকি ওখানে নেই শুনলাম। বললেন—সেও এখান থেকে চলে গেছে। কোথায় গেছেন জিজ্ঞেস করায় বললেন—

—কি বললেন?

পিনাকী বললে—কুৎসিত ভাবেই বললেন অবশ্য—বললেন—অরুণার কপালে চিত্রকর জুটেছে—তার কপালে সাহিত্যিক—বিমলবাবুর ওখানে খোঁজ কর গিয়ে।

অরুণা ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলে—লাবণ্যদি কোথায়?

উত্তর দিলে পিনাকী—বললে—লাবণ্যদিকে আমি জানি অরুণা। বিমলবাবুর ওখানে তিনি যাবেন না। তারপর তার সেই স্বভাবগত অপ্রতিভের মত হাসি হেসে পিনাকী বললে—সে ভাগ্য বিমলবাবুর নয়। লাবণ্যদি চলে গেছেন। চল।

তারা অগ্রসর হল।

বিমল দাঁড়িয়েই রইল। তার প্রশ্ন করতে খেয়ালও হল না—ওরা কোথায় যাচ্ছে? সে ভাবছিল লাবণ্যের কথা। কোথায় গেল লাবণ্য?

মনে পড়ল তার মহানগরীর এক বিশিষ্ট রূপের কথা। এই ধরিত্রী বহুরূপা। আগ্নেয়-গিরির মুখ থেকে যখন অগ্ন্যুদগার হয়—তখন তার এক রূপ—সে তখন জ্বালামুখী। অরণ্যের গলিতপত্রের রাশি থেকে উত্থাপিত বাষ্পরাশি ও গাঢ় ছায়ার সংমিশ্রণে তার আর এক রূপ—মন্থর গমনে চলে অজগর, দন্ত নখর বিস্তার করে ফেরে শ্বাপদ; পৃথিবীর সেখানে চামুণ্ডা রূপ।

মরুভূমিতে তার আর এক রূপ। এই মহানগরীতে ধরিত্রীর সকল রূপ প্রতিবিম্বিত প্রতিফলিত হয়েছে। সমগ্র মানবসমাজের উপরেই হয়েছে—কিন্তু সমাজ সভ্যতার কেন্দ্রস্থল এই মহানগরীতে সে প্রতিফলন সব চেয়ে উগ্র—সব চেয়ে স্পষ্ট—সব চেয়ে প্রদীপ্ত।

লাবণ্য অভিমান করে চলে গেল—একবার ভাবলে না মহানগরীর রূঢ় উগ্র রূপের কথা। তার হৃদয়হীনতার কথা। প্রচণ্ড শক্তি না থাকলে এর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। সে শক্তি কি আছে লাবণ্যের ?

হঠাৎ এরই মধ্যে বিদ্যুচ্চমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল। অভিমানের আবেগ বেদনার ক্ষোভ যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে মানুষের জীবনে, বিশেষ করে নারীর জীবনে—তখন তাকে হার মানানো যায় না, অনায়াসে সে তখন জীবন-মূল্য দিয়েও জয়ের গৌরব অর্জন করতে চায় ; সকল ক্ষেত্রে জয়ের গৌরব হয় তো পায় না, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানিকে নিশ্চিত-রূপে উপেক্ষা করতে পারে।

কাছেই লেক। কিছুদিন আগেই এই লেকে একটি মেয়ে এবং ছেলে ডুবে মরেছে। এই সব দৃষ্টান্তগুলি মানুষের কাছে পথচিহ্নহীন প্রান্তরে পদচিহ্ন-ধারার মত। লাবণ্যের এই পায়ের ছাপে পা ফেলে চলা বিচিত্র নয়।

হনহন করে সে চলল লেকের দিকে।

জ্যোৎস্নালোকিত লেক। ফাল্গুন মাস—এরই মধ্যে লেকের জলের উপরে ধোঁয়ার মত পাতলা কুয়াসার স্তর জেগে উঠেছে। জনহীন—চারি পাশ খাঁ খাঁ করছে। লেকের ধারের ক্লাবগুলিতেও কোন সাড়া নাই। লেকের মধ্যে দ্বীপগুলির গাছপালার মাথায় জ্যোৎস্না চক্‌চক্‌ করছে। মধ্যে মধ্যে মাছে সাড়া জাগাচ্ছে লেকের জলে।

ও-কে! দূরে যেন সাদা মূর্তির মত কেউ বসে আছে—একটা বেঞ্চে। এগিয়ে গেল সে।

লাবণ্য নয়। অরুণা এবং পিনাকী। চমকে উঠল তারা। বিমলও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। এই লেকের ধারে কেন ?

পিনাকী বললে—কি করব ? এইখানেই রাতটা কাটিয়ে দেব দুজনে।

বিমল বললে—না। চল—আমার ওখানে চল।

পিনাকী রাজী হল না। বললে—বড় ভাল লাগছে। তারপর হেসে বললে—ও বুঝেছি। আপনি সন্দেহ করছেন আমরা মারাত্মক কিছু একটা করে বসব বলে। না-না। সে ভয় করবেন না। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভবনে'—আমরা মরব না।

বিমল অগত্যা ফিরল।

কিন্তু কোথায় গেল লাবণ্য ?

সকালে যখন সে উঠল তখন মন তার উদাস হয়ে উঠেছে। লাবণ্যকে খুঁজে দেখবার মত মনের আবেগ নাই কিন্তু সমস্ত কিছুর উপর থেকে তার আসক্তি চলে গেছে।

চিত্ত এসে হাজির হল এই সময়ে। সে বললে—হ্যাঁ শুনেছি সব। আমার সঙ্গে দেখা

করে নি লাবণ্যদি।

তারপর বললে—কে জানে কোথায় গেল। এই শহরে আর তাকে খুঁজে পাওয়া কি সহজ ?

আবার বললে—থাক। কতজন আসছে কতজন যাচ্ছে ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নাই। এখন আমি একটা খবর দিতে এসেছিলাম। কাল সন্ধ্যায় দুজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। আবার আসবেন আজ। কি যেন সব কাজের কথা আছে। আপনাকে তাঁদের চাই-ই।

আজ না হয়ে গতকাল বা আরও কয়েক দিন পরে হলে বিমল মনে মনে মহানগরীকে নমস্কার করে বলত—মহানগরী, তোমার জয় হোক!

তের

ডাক দিয়েছেন এক ফিল্ম ডিরেক্টর। বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'শক্তি'র সর্বাধ্যক্ষ প্রদোষ চৌধুরী একখানা চিরকুটে লিখে দিয়েছেন—"বিমল, আমার বন্ধু বিখ্যাত শিল্পী এবং ফিল্ম ডিরেক্টর হীরু সেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আমাদের কাগজে তোমার যে উপন্যাসটি বেরিয়েছে সেটি তাঁর ভাল লেগেছে। ইতি বুনোদা।"

প্রদোষ চৌধুরী বাংলা দেশে বুনো চৌধুরী নামে পরিচিত। নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চেহারাটাকে চুলে দাঁড়িতে গোঁফে যথাসম্ভব বন্য করে রাখেন। খ্যাতনামা লোক। দেশের সকল আন্দোলনের মধ্যেই তিনি আছেন। শিল্প সাহিত্য রাজনীতি সমস্ত কিছুর সঙ্গেই যোগ ঘনিষ্ঠ। মোটামুটি বেশ লোক। বিমল মনে মনে কৃতজ্ঞতা অনুভব করলে প্রদোষ চৌধুরীর প্রতি।

হীরু সেন থাকেন টালিগঞ্জে। তারই একজন সহকারী বুনো চৌধুরীর চিঠি নিয়ে সকালেই এসে বিমলের কাছে উপস্থিত হল। বিমল মনে মনে প্রতীক্ষমাণ হয়েই ছিল। এর পর সে এখান থেকে সরে অন্য কোথাও যেতে চায়; যে কাজ নিয়ে রয়েছে তার চেয়েও অধিকতর আকর্ষণ-বিশিষ্ট কোন কাজ সে চায়। লাবণ্যকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল এবং আকস্মিকভাবে ওই ঘটনার যে পরিণতি ঘটল তাতে জীবন একটা নাড়া খেয়ে গেছে। মনে মনে গভীর বেদনা অনুভব করেছে সে; মধ্যে মধ্যে লজ্জাও অনুভব করছে, দশের কাছে লজ্জা নয়—নিজের কাছে লজ্জা, নিজের অক্ষমতার জন্য নিজের কাপুরুষতার জন্য লজ্জা, মধ্যে মধ্যে অনুভব করছে যে, সে অত্যন্ত স্বার্থপর। লাবণ্যকে তার ভালই লেগেছিল, তার রূপ ভাল লেগেছিল, তার সাহসিকতাপূর্ণ উদ্যমকে ভাল লেগেছিল, তার মর্যাদাময়ী সংযত চিত্তকে ভাল লেগেছিল—যার ফলে সে তাকে ভালই বেসেছিল—যে ভালবাসাকে সে জোর করে অস্বীকার করেছে।

এর জন্য দায়ী এই মহানগরীর সভ্যতা। মহানগরীর সভ্যতার অনাড়ম্বর নীড়ের মধ্যে সুখ নাই শান্তি নাই। আদিম কাল থেকে মানুষ প্রেয়সীর জন্য সংগ্রহ করে এসেছে শাঁখের গহনা—পলা পুঁতির মালা; পল্লীর মধ্যে নববধূর জন্য বর আনে কাচের চুড়ি, রূপার হার, মহানগরীর রাস্তার পাশে পাশে সাজিয়ে রেখেছে মণি মুক্তা সোনার আভরণ, বহুমূল্য বিচিত্রবর্ণ

বেশভূষা, গৃহসজ্জার শত সহস্র উপকরণ, এই মহানগরীর বুকে যখন বিচিত্র সংঘটনে দেখা হয় প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ার—তখনই প্রিয়াকে, প্রিয়ের মনে সাধ জাগে, এই নগরীর শ্রেষ্ঠ আভরণে শ্রেষ্ঠ সজ্জায় সাজাবে সে। তাকে নিয়ে সে যে নীড় রচনা করবে সে নীড়টিকে সাজিয়ে তুলবে সর্বোত্তম সুদৃশ্য এবং আরামপ্রদ উপকরণে। প্রিয়ার মনেও সেই প্রত্যাশা জাগে—নিশ্চয় জাগে। কিন্তু পরক্ষণেই এই মহানগরীর জীবনযুদ্ধের প্রচণ্ডতাকে এবং নিজের সহায়-হীন শক্তিকে স্মরণ করে মাথা নত করে সরে যায় পরস্পরের কাছ থেকে। এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রিয়ার অপেক্ষা প্রিয়েরই বেশী। নারীর ভয় দূর করে পুরুষ, তার সাধ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় পৌরুষে। এই লজ্জা আজ আত্মগ্লানি হয়ে বিমলকে পীড়িত করে তুলেছিল। সে বার বার নিজেকে প্রশ্ন করেছে—কেন সে পিনাকীর অরুণার হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়ার মত বেরিয়ে পড়তে পারলে না, কেন সে লাবণ্যকে নিয়ে ওদের মত বাসর পাততে পারলে না আকাশের তলায়? মনের এই অবস্থায় সবচেয়ে অসহনীয় হয়ে উঠেছে এই স্থানটি। মানুষের কুৎসা-মুখর রটনা কাল থেকে যে প্রখরতর হয়ে উঠবে এ সম্পর্কে তার সন্দেহ ছিল না। আরও লাবণ্য এখন থেকে অপমানিত হয়ে চলে যাওয়ার পর এ স্থানটিও তার ভাল লাগছে না। এ ছাড়া আরও আছে। তার মাসিক আয় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশে উঠেছে। সে এখন স্বচ্ছন্দে মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ার ঘর থেকে আট-দশ টাকা ভাড়ার ঘরে যেতে পারে, অপেক্ষাকৃত ভদ্র পল্লী—টিনের চালের পরিবর্তে—পাকা ছাদওয়ালা ঘর দশ টাকায় নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

ঠিক এই কারণেই চিঠিখানা পেয়ে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার জন্যই উঠে পড়ল। বললে—চলুন।

শিল্পী হীরু সেন, বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিদগ্ধ সমাজের মানুষ, বর্তমানে সে সমাজের গণ্ডীকেও অতিক্রম করে ফিল্ম ডিরেক্টর হয়েছেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁর ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। হীরু সেনের চেহারায় শিল্পীজনোচিত একটা ছাপ আছে। পোষাকে—চুল ছাঁটায়—চোখের দৃষ্টিতে এই ছাপ তিনি সযত্নে পরিচর্যা করে ফুটিয়ে তুলেছেন। সিগার মুখে হীরু সেন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। নূতন একখানি ছবির জন্যে তিনি এক মাড়োয়ারী প্রযোজকের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। সেই ছবির কথা ভাবছিলেন তিনি।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত তিনি বিমলের দিকে তাকিয়ে বললেন—এসেছেন আপনি? ভাল হয়েছে। আমি কাজ আরম্ভ করতে চাই কাল থেকে।

বিমল ঠিক এই ধরণের পরিচয়-ভূমিকাহীন আলাপ প্রত্যাশা করে নাই। সে বললে—প্রদোষবাবু আমাকে লিখেছেন—

বাধা দিয়ে হীরু সেন বললেন—হ্যাঁ আমি তাকে বলেছিলাম। আপনার একটা লেখা আমি পড়লাম, ভাল লেগেছে আমার।

বিমল বললে—ও গল্প থেকে ছবি কি ভাল হবে বলে মনে করেন আপনি?

—না। ও গল্প থেকে ছবি নয়। গল্প আমার নিজের। গল্পটাকে ডেভেলপ করে ডায়লগ দিয়ে লিখবেন আপনি। আমি আপনাকে ডিরেকশন দেব অবশ্য। কাল থেকেই

লেগে যান আপনি। এই দেখুন গল্পটা।

একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজে ইংরাজীতে টাইপ করা এক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ গল্প। একটি ধনী তরুণ তার তরুণী বান্ধবীকে নিয়ে মোটরে গেছে পল্লীভ্রমণে। সেখানে মোটর খারাপ হল। গাড়ীটা থেমে গিয়েছিল একটা গাছের তলায়। সেখানে গাড়ীটা মেরামত করছে ছেলেটি, এমন সময় গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল একটি মেয়ে। নিছক পল্লীবালা। সে গাছের উপরেই ছিল—কাঁচা আমের লোভে উঠেছিল, এমন সময় এসে থামল গাড়ী, গাড়ীটা যখন অনেকক্ষণ নড়ল না তখন সে না লাফিয়ে করে কি! সেই মেয়েটিই তাদের রাত্রে দিল আশ্রয়। তারপর আরম্ভ হল প্রেমের দ্বন্দ্ব। একদিকে পল্লীবালা অন্যদিকে আধুনিকা মধ্যস্থলে ধনী তরুণ। অবশেষে অবশ্যই জয় হল পল্লীবালার। মিলন।

বিমল পড়ছে গল্পটা এমন সময় হীরু সেন বললেন—আমি এই এতক্ষণ বসে বসে ভাবছিলাম একটা chase দিয়ে open করলে কেমন হয়! মনে করুন ওই গ্রাম্য মেয়েটি একেবারে full of vigour প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ মেয়ে তো—ও ধরুন, আম পাড়তে গিয়ে একটি গ্রাম্য ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে মারলে এক চড় তার গালে—তারপর সে তাকে করলে তাড়া, মেয়েটি দৌড়ুল খাল ডিঙিয়ে বেড়া টপকে—ছুটল—এসে পড়ল একেবারে গাড়ীর সামনে। শহরের সোফিস্টিকেটেড মেয়েটি আঁতকে পা পিছলে একটা খানায় পড়ে গেল। শহরের ছেলেটি মানে নায়ক রাগে লাল হয়ে গ্রাম্য মেয়েটির সামনে দাঁড়াল। মেয়েটি হেসেই খুন। খিল খিল করে হাসি—রূপোর ঘণ্টার আওয়াজের মত হাসি। বুঝতে পারছেন—ছেলেটির মুখে রাজ্যের তেল কালি লেগেছে আর কি!

বিমল অবাক হয়ে হীরু সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হীরু সেন বলেই চললেন—তাঁর কল্পনার কথা। বললেন—কোন কিছু লিখবার আগে কল্পনায় দেখে নেবেন—ছবিটা কেমন হচ্ছে। ভিসুয়েলাইজ করতে হবে। এই ভিসন না থাকলে ছবির কাজ হয় না।

বিমল এবার গল্প লেখা ফুলস্ক্যাপখানি নামিয়ে রেখে বললে—এই ধরণের গল্প আমি কখনও লিখি না।

—লিখুন। লিখতে শিখুন। Filmএ এই হল গল্পের ধারা। আপনাদের সাহিত্যের ধারা—ওই যে সব তত্ত্বকথা—ও সব ছবিতে চলে না। আমরা ধরি মানুষের আদিম অস্তিত্বকে, I mean individual-কে। Individual lifeএ আছে শুধু Sex আর Hunger; Hungry People ছবি দেখে না। তাই ছবিতে Sexটাই হচ্ছে বড়। অবশ্য সাহিত্যেও Sex-এর স্থান ছোট নয়—ওই হল আদিরস। অর্থাৎ first; firstও বটে foremostও বটে।

বিমল বলল—আমি আপনাকে ভেবে বলব।

—ভেবে বলবেন?

—হ্যাঁ। ভাবতে হবে বই কি। এ কাজ আমার শক্তিতে কুলোবে কি না, রুচিতে ঠিক খাটবে কি না—ভেবে দেখে আপনাকে জানাব।

হীরু সেন তার মুখের দিকে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—কিন্তু সাহিত্য করে বাঁচতে হবে আপনাকে। এই শহরে থেকে শুধু সাহিত্য করে জীবিকার্জন করা অসম্ভব। সুতরাং এই রকম একটা পথ আপনাকে নিতে হবে। খবরের কাগজের চাকরি অথবা কিছু—অথবা এই Film-এর কাজ। এদিকে opening পাওয়া সহজ নয়। পয়সা এই দিকেই আছে। তা ছাড়া এই নূতন শিল্পটাকে আপনারা এসে যদি উন্নত করতে পারেন তবে সাহিত্যের চেয়ে অনেক বড় কাজ হবে। এক বছরে—বিশ বছরের কাজ হতে পারে। একটা জাতকে গড়ে তোলার দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে আপনাকে।

এ সব কথার জবাব দেবার ইচ্ছা হল না বিমলের।

হীরু সেন বললেন—অবশ্য এই ছবির কাজে আপনাকে টাকাকড়ি কিছুই দিতে পারব না আমি। কারণ contract হয়ে গেছে already। পরের ছবিতে আপনাকে পাইয়ে দেব। এ ছবিতে কোন উপায় নেই। আপনাকে আসতে হবে পর্যন্ত—মানে ট্রাম-বাস ভাড়া পর্যন্ত আপনার। আমার এখানে দশটায় খেয়ে-দেয়ে আসবেন। ছটা পর্যন্ত কাজ। এর মধ্যে দু'চার কাপ চা আপনি পাবেন। তারপর হেসে বললেন—আমি খুব খোলাখুলি কথা বলি বিমলবাবু। আপনি অনেক কিছু প্রত্যাশা করবেন, শেষে আশাভঙ্গে আমার উপর দোষ দেবেন—এমন অস্পষ্টতা রেখে আমি কথা বলি না, বুঝলেন?

বিমল হেসে ঘাড় নাড়লে। ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে সে বুঝেছে। এ কথা সে ঘরে ঢুকেই যেন অনুমান করেছিল। হীরু সেন নিভে যাওয়া চুরুটটা আবার জ্বালিয়ে নিলেন—তারপর বললেন—তা হলে কাল থেকে লেগে যান। এ ট্রেনিং আপনার জীবনে কাজে লাগবে। আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজেই সব শিখে নিলে আপনার worth বাড়বে।

বিমল নমস্কার করে বললে—আমি তা হলে আসি।

কাল দশটা থেকে, বুঝেছেন? হীরু সেন জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন চুরুটটা। ওটাতে আর ধোঁয়া বের হচ্ছিল না।

বিমল ঘরের দরজার গোড়ায় এসে পড়েছিল. সে এতক্ষণে একটা বিড়ি খাওয়ার তাগিদ অনুভব করলে, পকেট থেকে বিড়ি বের করতে করতেই বেরিয়ে এল হীরু সেনের ঘর থেকে। নীচের দরজা অতিক্রম করে পথে নেমে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

হীরু সেনের কথাবার্তায় সে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করেছে। কৌতুক অনুভব করাই উচিত ছিল—কিন্তু তা অনুভব করা সম্ভবপর হয় নি। হীরু সেনের কথা বলতে তার চোখে পড়েছে হীরু সেনের চারিপাশের অবস্থা। গৃহসজ্জার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে দারিদ্র্যের জীর্ণতার পরিচয় বিমলের চোখে পড়েছে। সবচেয়ে পীড়া দিয়েছে ঘর এবং সিঁড়ির পাশের দেওয়ালগুলি। পেরেকে কণ্টকিত দেওয়ালগুলি ময়লা থান কাপড় পরা দরিদ্র মেয়ের বৈধব্য-দশার মত সকরুণ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে বিমলের চোখে। বিমল অনুমান করতে পারে শিল্পী হীরু সেনের সমৃদ্ধির সময়ে এই প্রত্যেক পেরেকে টাঙানো ছিল ভাল ভাল ছবি। কত নামকরা বিদেশী শিল্পীর আঁকা ছবি, দেশের খ্যাতনামা শিল্পীর ছবি, হীরু সেনের নিজের আঁকা ছবি। সে-গুলির আর একখানিও অবশিষ্ট নাই। কোথায় গিয়েছে সে অনুমান করতে বিমলের দ্বিধা

হল না। ঠিক এই কারণেই হীরু সেনের পারিশ্রমিক দিতে অক্ষমতার কথা শুনে সে বিস্মিত হয় নি। ঘরে ঢুকেই যেন অনুমান করেছিল, অর্থকরী সাচ্ছল্যের প্রত্যাশা এখানে নাই।

খানিকটা দূর এসেছে এমন সময় পিছন থেকে তাকে কেউ ডাকলে। ফিরে দাঁড়াল বিমল। হীরু সেনের যে এ্যাসিস্ট্যাণ্টটি তার কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল—সে-ই এগিয়ে এল। বললে—উনি আবার আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।

—বলুন।

—একটা কথা বললেন উনি। মানে ডিসিপ্লিনের জন্তে। ডিসিপ্লিনের জন্তে ওঁর সামনে smoke করা উচিত নয়।

বিমল স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে—তার মানে?

এ্যাসিস্ট্যাণ্টটি বললে—ওঁর ঘর থেকে বের হবার সময় বিড়ি বের করেছিলেন।

—হ্যাঁ করেছিলাম।

—সেই জন্যেই কথাটা বলে দিলেন উনি।

—কিন্তু আমি তো—ওঁর কাজ আমি এখনও নিই নি। আর নিলেও উনি যখন কোন মাইনে দেবেন না—তখন মাইনে নেওয়া লোকের মত আনুগত্য উনি প্রত্যাশা করেন কি করে?

এ্যাসিস্ট্যাণ্টটি এই উত্তর প্রত্যাশা করে নাই। সে হতভম্ব হয়ে গেল। কি উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না।

বিমল বললে—আপনি ওঁকে বলবেন, আমি এ কাজ করতে পারব না।

বাসার দরজায় এসে সে বিস্মিত হল।

গোপেনদা বসে আছেন—প্রায় ফুটপাথের উপর। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের প্লটের সীমানা নির্দেশক C. I. T. লেখা একটা পাথরের উপর চুপ করে বসে আছেন। বিমলকে দেখেই বললেন—কোথায় গিয়েছিলে?

বিমল বললে—সিনেমা ডিরেক্টর হীরু সেনের লোক এসেছিল।

গোপেনদা তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন। বললেন—সিনেমা করতে যাচ্ছ? সর্বনাশ করল ওই সিনেমাগুলো।

বিমল ঘরের দরজা খুলে বললে—ঘরে আসুন। চা খাবেন?

—খাব। নিয়ে এস চা।

দাদার দোকান থেকে কেটলী করে চা এনে কাপে ঢেলে গোপেনদাকে এগিয়ে দিয়ে বললে—তারপর কি হুকুম বলুন।

গোপেনদা বললেন—প্রশংসা করতে এসেছি। তোমার গল্পটা খুব ভাল লেগেছে। মিহিরের বাবাকে নিয়ে যে গল্পটা লিখেছ সেইটের কথা বলছি। আর—। বিচিত্র তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে বিমলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—আমাদের একটা কাগজের ভার নিতে হবে তোমাকে। তুমি সমাজের সংঘাতটা ধরেছ। তাই তুমি কাগজের ভার নিলে আমি ভরসা

করতে পারি। আমরা কিন্তু কোন টাকাকড়ি দিতে পারব না।

বিমল বললে—আপনাকে ভেবে বলব দাদা। কয়েকদিন আমাকে সময় দিন।

—কয়েক দিন?

—আমার মন চঞ্চল হয়ে রয়েছে এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হল—এখানে থাকা আমার পক্ষে প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। একটা বাসা বা মেস দেখে উঠে যেতে চাই।

—একটা মেস আছে। সেখানে থাকবে? সেখানে ছোট্ট একটা কুঠরী পেতে পারবে। সে ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।

—কোথায়?

—বউবাজারে। তবে বাড়ীটার একদিকে থাকে কয়েক ঘর বাঈজী, অন্যদিকে মেস। যাবে সেখানে?

চৌদ্দ

বড়বাজার ষ্ট্রীট। কলেজ ষ্ট্রীট এবং সেণ্ট্রাল এ্যাভিনুয়ের মধ্যবর্তী অংশ। এরই উপর উত্তরদিকে প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ী। ঠিক সামনে প্রকাণ্ড বড় একটা গির্জা। এ বাড়ীটাও বিখ্যাত বাড়ী। এককালে এটাই ছিল বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সারভেণ্টে'র আপিস। নীচের তলাটায় সবটাই এখন গুদাম, ঠিক রাস্তার উপরের ঘরখানাকে দুভাগ করে একটাতে হয়েছে জুতার দোকান অন্যটা হল আসবাবের দোকান। উত্তর দক্ষিণে লম্বা বাড়ী, প্রায় মাঝখানে সিঁড়ি, তাই পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ বউবাজার থেকে বাড়ীটায় ঢুকতে গেলে একটা গলির মধ্যে দিয়ে গিয়ে সদর দরজা পেতে হয়; সদর দরজার মুখেই কাঠের প্রশস্ত সিঁড়ি। বাইরে দরজার সামনে খানিকটা উঠানের মত খালি ইটে বাঁধানো জায়গা, তিন দিকে বস্তীর ঘরের মত সারি সারি ঘর; এখানে থাকে যত রিক্সাওয়ালা। উঠানে থাকে রিক্সাগুলি, খুপরীর মত ঘরগুলিতে থাকে রিক্সাওয়ালারা।

দোতলায় ছখানা, তেতলায় ছখানা—বারোখানা ঘরে মানুষ বাস করে। প্রায় মাঝখানে সিঁড়ি, সুতরাং সিঁড়িই বাড়ীখানাকে দুভাগে ভাগ করেছে। ঘরগুলি সাধারণ মাপের নয়, প্রকাণ্ড হল এক-একখানি। দোতলায় তেতলায় রাস্তার দিকের চারখানি ঘরেই থাকে বাঈজী। বাঁয়ের অর্থাৎ পিছনের দিকের দুই তলায় চার চার আটখানা ঘরে মেস হয়েছে। আটখানা ঘরে চারটি মেস। চারতলায় অর্থাৎ ছাদের উপর কাঠ দিয়ে তৈরী সারি সারি খুপরী ঘর, মেস এবং বাঈজীদের রান্না হয় এখানে, আরও কয়েকটা খুপরীতে থাকে কয়েকটি ক্রিশ্চান, যাদের ব্যঙ্গ করে সাধারণত বলা হয় চুনা গলির ফিরিঙ্গি।

বিমলকে মেস দেখাতে এনেছিল মিহির। গোপেনদা ভার দিয়েছেন মিহিরের উপর। দোতলার দুটি মেসের সঙ্গেই গোপেনদার সংযোগ আছে। একটি মেস সাধারণ মেস অর্থাৎ নানা ধরণের লোক এখানে থাকে। দালাল, ছোটখাটো ব্যবসায়ী, একটু সচ্ছল অবস্থার

কেরানী, দু' তিন জন অবস্থাপন্ন ছাত্র, গোটা দুয়েক বাড়তি জায়গাও আছে—মধ্যে মধ্যে মেস-বাসীদের আত্মীয় বন্ধু আসেন—দুদিন চারদিন থাকেন, আবার চলে যান। খাওয়া-দাওয়া ভাল, অল্প দামের হলেও খাট টেবিল চেয়ার নিয়ে আসবাবপত্র মেসের পক্ষে মূল্যবান বলতে হবে। সপ্তাহে তিনদিন রাত্রে ফাউলকারী, তিনদিন মাটন, একদিন রাবড়ী। দিনে মাছ ছ'দিন—তাও ইলিস, রুই, ভেটকী প্রভৃতির নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে—এর উপরে মধ্যে মধ্যে আসে তপ্‌সে। একদিন দিনে পায়েস মিষ্টি, রাতে নিরামিষ। অধিবাসীদের বিচিত্র গতিবিধি—শেয়ার মার্কেট ডালহৌসি তো কর্মক্ষেত্র, এ ছাড়া চাঙোয়া, ব্রিস্টল, মন্টিমার্গে থেকে ফুটবল মাঠের গ্যালারী, ফিল্ম স্টুডিয়ো এবং থিয়েটারের গ্রীনরুম পর্যন্ত যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়। সিগারেট ছাড়া বিড়ি এ মেসে নিষিদ্ধ, এ বিষয় কড়া আইন আছে। এদের মেসের কর্তৃপক্ষের মধ্যে দু'একজন আছেন যাঁরা গোপেনদার ভক্ত, গোপেনদার সংকেত বহন করে নিয়ে যে আসে—তাঁরা তৎক্ষণাৎ সমাদরের সঙ্গে আত্মীয় পরিচয়ে ওই বাড়তি সিটে স্থান করে দেন। আত্মীয়ের খরচ নিজেরাই বহন করেন। প্রয়োজন হলে আত্মীয়কে টাকাও ধার দিয়ে থাকেন। মেসে টেলিফোন পর্যন্ত আছে। ম্যানেজারের নাম আছে, আগন্তুকের সম্পর্কে প্রয়োজন হলে গোপেনদার কাছ থেকে নির্দেশ আসে, প্রয়োজন হলে এঁরাও জেনে নেন ব্যক্তিটি সম্পর্কে এঁদের কর্তব্য।

বিমলের থাকবার ব্যবস্থা এ মেসে করেন নি গোপেনদা, তা হলে মিহিরের আসবার প্রয়োজন হত না, তিনি টেলিফোনে বলে দিতে পারতেন। বিমল সম্পর্কে একটু বিচিত্র ধরণের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। সেই কারণেই মিহিরকে আসতে হয়েছে। বিমল থাকবে চারতলার ছাদের ওই সারিবন্দী রান্নাঘর ও ফিরিঙ্গি বাসিন্দাদের ঘরেরই একপাশের একটা ঘরে। ঘরখানা বাড়ীওয়ালার নিজের প্রয়োজনে লাগে বলে ভাড়া দেওয়া হয় না। বাড়ী মেরামতের সময় ঘরটায় চুন সিমেন্ট থাকে, প্রয়োজন অনুযায়ী কাঠ, ইলেকট্রিক লাইনের কেসিং, তার, জাল, রঙ এই ধরণের জিনিস রাখা হয়, মেরামতের পর পড়ে থাকে রঙের খালি টিন, ভাঙ্গা দরজা-লার দু'একটা টুকরো, পুরানো ইলেকট্রিক লাইন কেসিংয়ের অংশ, বাতিল সুইচবোর্ড, জলের পাইপের টুকরো, ক্ষয়ে যাওয়া জলের কলের কক; আরও দু'চারটে জিনিসও থাকে। মেরামতের পর কিছু দিন থাকে—তারপর ক্রমে ক্রমে জিনিসগুলি কমতে সুরু হয়। বাড়িওয়ালার দারোয়ান, সরকার এরা কিছু বিক্রি করে দেয়, মেসের ঠাকুর, চাকর এবং ওই ফিরিঙ্গি বাসিন্দারাও জানালাটা বিচিত্র কৌশলে খুলে—আঁকশী দিয়ে কতক কতক বের করে ঘরখানাকে পরিষ্কার করে ফেলে। বাড়ীওয়ালা এ সবই জানেন কিন্তু—জুতো পরলে নখের কোণের ব্যথার মত এ হল বাড়ীর মালিকানি স্বত্বর অনিবার্য উপেক্ষণীয় ব্যাধি—এ নিয়ে কোনদিন প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে তিনি চেষ্টা করেন না। বাড়ীওয়ালা কলকাতার প্রাচীন সম্পত্তিশালী বংশের সন্তান, স্বাভাবিক ভাবেই মিহিরদের বাড়ীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আছে। আছে বলা অবশ্য ভুল, ছিল বলাই ঠিক। প্রবীণ বাড়ীওয়ালা মিহিরকে চেনেন—স্নেহও করেন, সেই পরিচয়েই মিহির অনেকবার এসে এই ঘর খানি দু মাস চার মাসের জন্য ভাড়া পেয়েছে। ভাড়া দশ টাকা। ভাড়ার গোলমাল আজও

কখনও হয় নি। সুতরাং মিহির এসে বলতেই চাবিটি তার হাতে দিয়ে বলেন—ঘর বোধ হয় পরিষ্কারই আছে, দু'চারটে ভাঙ্গা টিন কি কাঠের টুকরো থাকলে এক কোণে ঠেলে দিয়ো। অসুবিধে হলে—বের করে ফেলে দিয়ো, কেউ-না-কেউ বিক্রী করে দেবে।

মিহির ঘরখানা খুলে দিয়ে বললে—নেহাত খারাপ নয়, আপনি যেখানে ছিলেন—তার চেয়ে ভাল হবে! ঘরখানা বড়ও বটে।

—গৌরবে তো অনেক বড়। চারতলা।—আলো চাই—চাই মুক্তবায়ু দাবীটা ষোল আনা মিটে গেল। হাসলে বিমল।

মিহির চকিত হয়ে বললে—ঘরখানা কি—? মিহির অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। রসিকতা, কৌতুকের অংশ তার জীবনে অত্যন্ত কম। তার উপর সদ্য পিতৃবিয়োগের আঘাতে সে স্বল্প অংশ আরও স্বল্প হয়ে গিয়েছে।

বিমল বললে—না-না। এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে—অন্তত বাংলা দেশের একজন নামহীন নূতন লেখক—এর চেয়ে ভাল কি কল্পনা করতে পারে বলুন? আমি ওটা রসিকতা করলাম।

এবার মিহির একটু হাসলে, বললে—আমি প্রায় মা কালীর মানসিক অবস্থায় এসে পৌঁচেছি। একটু চুপ করে থেকে বললে—জীবনে আশ্বাস খুঁজে পাচ্ছি না বিমলবাবু। এমন জটিল সমস্যার মধ্যে পড়েছি। আপনি তো আমাদের বাড়ীর কথা জানেন। আবার একটু হাসলে সে। হেসে বললে—বাবাকে নিয়ে যে গল্পটা লিখেছেন ভারী ভাল লেগেছে আমার। এর মধ্যে আমি কয়েকবারই পড়েছি। যখনই বাবার জন্য মন খারাপ হয়—গল্পটা পড়ি। যাক চলুন, এইবার আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দি।

দোতলার দ্বিতীয় মেসটায় বিমলের খাবার ব্যবস্থা করেছে মিহির। প্রথম মেসটার সঙ্গে বিমলের কোন সম্বন্ধ থাকে—গোপেনদা চান না। তাঁর নিজের দলগত কোন সাবধানতা এর মধ্যে আছে কি নেই সেটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না। সে নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতেও বিমলের নিজের কাছেই নিজে অপরাধ অনুভব করে। মিহির বললে, ওদের সংস্রবে আপনি পড়েন—এটা গোপেনদা চান না। ওদের কথা তো বলেছি আপনাকে। ওদের অধিকাংশ হল snob, আপনাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। তা ছাড়া ওদের মেসের চার্জ বেশী। এ মেসটা গরীব কেরানীদের মেস, চার্জ কম, এদের সাহিত্য সম্পর্কে অনুরাগ স্বল্প কিন্তু সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা করে। সাহিত্যিকেরা যে ওদের চেয়ে পণ্ডিত এটা ওরা বিশ্বাস করে ধনীর ভাগ্যের মত। আপনাকে বিরক্ত করবে না, তর্ক করবে না, বড় জোর দু'চারখানা বই পড়তে চাইবে, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে গল্প শুনতে চাইবে। হয়তো আধুনিক নামকরা লেখকের কথাও শুনতে চাইবে। তবে একটি বিষয় সাবধান করে দি। কদাচ গোপেনদার নাম করবেন না কি কোন বিপ্লবী কর্মীর নাম করবেন না, তা হলে আপনাকে আর কাজকর্ম করতে দেবে না।

একটু থেমে হেসে আবার বললে—এবং গোটা কলকাতায় রটিয়ে দেবে যে, সাহিত্যিক বিমলবাবু উপরে সাহিত্যিক হলেও ভিতরে ভিতরে সাংঘাতিক এ্যানার্কিস্ট, টেররিস্ট, রেভলুশ-

নারিস্ট, যেটা জিভের ডগায় আসবে বলে দেবে। আপনার সম্পর্কে গৌরব করেই বলবে, তার ফলে যদি পুলিশ আপনাকে ধরে তবে আপনার উপর শ্রদ্ধা বাড়বে। কিন্তু শুধু যদি সার্চ করে ক্ষান্ত হয় তা হলে বিপদ, তখন আপনাকে এখান থেকে তাড়িয়ে ছাড়বে।

বিমল বললে—জানি।

মিহির মেসের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে, সকল ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেল। মেসটির সঙ্গে মিহিরের জানাশুনা বা যোগাযোগ বিচিত্র। ম্যানেজার তাকে খাতির করলে বাড়ীওয়ালার মত, অফিস-মাস্টারের মত। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মেস এটি। মফঃস্বলের কোন ধনী ব্যবসায়ীর মালিকানা প্রতিষ্ঠান। হরেক রকম ব্যাপার। অর্ডার সাপ্লায়িং, স্টিভাডোর, কয়লাখনি, কণ্ট্রাকটারি, ব্যাঙ্কিং এবং ইনসিওরেন্স। জন তিরিশেক কর্মচারী সমস্ত বিভাগের কাজ চালায়, তার মধ্যে বিশ জন থাকে এই মেসে। বাকী দশ জন কেউ বা বাসা করে থাকে, কারও বাড়ী কলকাতায়, কেউ কেউ অন্য মেসে থাকে। এই মেসের বাড়ীভাড়া দেওয়া হয় আপিস থেকে, ঠাকুরের বেতনও আপিস দেয়। আপিস থেকে আরও একটা টাকা পাওয়া যায়—গেস্ট চার্জ হিসাবে,—তার জন্য মফঃস্বল থেকে মালিকের কর্মচারী যারা আসে—তারা থাকে খায়—চলে যায়। কোন বাইরের লোক নেওয়া সম্পর্কে আপিস থেকে নিষেধ আছে; তবে মিহিরবাবুর বন্ধুর সম্পর্কে স্বতন্ত্র কথা। বাড়ীওয়ালার মত এই প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সঙ্গেও মিহিরদের পরিচয় পরিবারগত; মালিকদের একটি ছেলেও মিহিরের বন্ধু, সুতরাং পার্থিব জ্যামিতিক নিয়মানুযায়ী মিহির মালিকের পুত্রের মতই শ্রদ্ধেয়। এবং মিহিরই এই ঘর দুখানি ভাড়া করে দিয়েছে আপিসের মালিককে।

ম্যানেজার বললেও সে কথা—দেখুন দিকি, আপনার বন্ধুলোক—তার সম্বন্ধে কথা আছে? তা বেশ! খানিকটা চুপ করে থেকে আবার বললেন—তা ছাড়া উনি শুধু খাবেন আমাদের এখানে। থাকবেন তো আলাদাই, আমাদের মেসে তো থাকছেন না। তা বেশ!

মেসটি প্লেন লিভিংয়ের একটি চরম দৃষ্টান্ত স্থল। দেওয়াল ঘেঁষে মাথার দিকে বা পাশে একটি বা দুটি সুটকেস—তার পাশে মেঝের উপরেই মাদুর বা সতরঞ্চি বিছিয়ে সিট। আসবাব দূরের কথা—কাপড় জামা রাখবার ব্যবস্থা এখানে দেওয়ালে পেরেক পুতে।

খাওয়ার ব্যবস্থা—ভাত ডাল তরকারী দুটো—আর দুখণ্ড মাছ—তার সাইজ একেবারে মাপা। এর উপরে আপন আপন ব্যবস্থা যার যেমন খুশী করতে পারে, করেও। কয়েকজনই সকালে চা খেয়ে ফেরার পথে নিয়ে আসে চার পয়সার দই, সন্ধ্যায় ফেরার সময় চার পয়সার বা ছয় পয়সার রাবড়ী। দু'তিনজন আছে, তারা মধ্যে মধ্যে রেস্তোরাঁ থেকে কোয়ার্টার ডিস কারী এনেও খেয়ে থাকে। মাসে একদিন হয় মেসবরাদ্দ মাংস। যাই হোক খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা পাইস হোটেলের অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা থেকে অনেক ভাল; আরও একটা সুবিধা হল—পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ—উভয় বঙ্গের লোকের রুচির দ্বন্দ্বের আশ্চর্যরকম একটা মীমাংসা আছে এখানে। লঙ্কা এখানে পরিমিত। তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কার বিশেষ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বাজার থেকে কাঁচা লঙ্কা আসে যথেষ্ট, পরিমিত ঝালের বেশী ঝাল যার পক্ষে

রুচিকর—সে যতগুলি ইচ্ছে কাঁচা লঙ্কা পারে। এ দিক থেকেও বিমল খানিকটা আরাম পেলে। শুধু অসুবিধা হল একটি। দিনের বেলা দশটা বাজা মাত্র এখানে রান্নাঘরে অল ক্লীয়ার বেজে যায়। মেসের ঠাকুর আপিস থেকে মাইনে পায় সাধারণ ঠাকুর থেকে ছ সাত টাকা বেশী, তার জন্য দশটা বাজতেই তাকে বের হতে হয় আপিসের কাজে।

একটু অসুবিধা স্বীকার করেই তারও মীমাংসা হয়ে গেল। স্থির হল খাবার ঢাকা দিয়ে সে উনোনের উপর রেখে যাবে। বিমল প্রয়োজনমত নিজে নামিয়ে নেবে। চাকর একজন আছে, কিন্তু তার ছোঁয়া-নাড়া এ মেসে অচল। ম্যানেজার নিজে জাতিতে সদ্‌গোপ এবং আর এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক—যার-তার ছোঁয়া নিজেরাও খান না, অন্য কাউকেও খেতে দেন না। এ বিষয়ে তাঁদের পক্ষে আছে প্রবলতম সমর্থন যাকে অন্য কেউ উপেক্ষা করতে সাহস করে না। মালিকপক্ষের সমর্থন আছে। মালিক ঠিক নয়, মালিকের গৃহিণী এবং মালিকের পুত্রের। এরা দুজন গোঁড়া হিন্দু। মালিক নিজে এসব মানে না। গৃহিণী স্বামীকে সংশোধন করতে না পেরে পুত্রকে নিজের মত করে গড়ে তুলেছে এবং তাদের আয়ত্তাধীনে রয়েছে বিশ্বসাম্রাজ্যের যে খণ্ডটুকু তার উপর চালিয়েছে এই পবিত্র সংস্কার আন্দোলন। তবে যদি কেউ বাইরে অখাদ্য খায় বা স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার না করে, তার জন্য আইনের কোন কড়াকড়ি নেই। এমন কি কেউ যদি চাকর মারফৎ ফাউলকারি কি এগ্‌পোচ আনিয়ে রান্নাশালার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে খায় তাতেও নিষেধ নেই। কারণ সাম্রাজ্যবাদী হলেও যুগ এবং স্থান সম্পর্কে তাদের চেতনা যথেষ্ট আছে। এটা বিংশ শতাব্দী এবং কলিকাতা মহানগরী—এখানে চাকরি গেলে মানুষ কষ্টে পড়ে কিন্তু আবার পায় এবং চাকরি গেলেই চাকরে মালিকে কোন তফাৎ থাকে না। মেসের ঘরভাড়া ঠাকুরের মাইনে এই দুটো দিয়ে সংস্কার আন্দোলন ওর বেশী আর চালানো যায় না। শুধু রান্নাঘর উনান এবং বাসন সম্পর্কে আইন সুপ্রতিষ্ঠিত; সুতরাং এ অসুবিধাটুকু স্বীকার করে নিলে বিমল।

ম্যানেজার বললে—দেখবেন মশায়, কেউ থাকবে না বলে চাকরকে ছোঁয়ানাড়া করাবেন না!

বিমল হেসে বললে—না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। সে আমি করব না।

—হ্যাঁ। ভদ্রলোক আপনি। তার উপরে লেখক মানুষ—আপনি করবেন কেনে এমন? তবে—। একটু চুপ করে থেকে বললে, আপনাকে তো বলতে হবে না, পাপ মানে না আপন বাপ, ঠিক একদিন দাঁত বার করে আপন চেহারাটি 'দেখায়ে' দেবে। প্রকাশ হয়ে পড়বেই।

ম্যানেজারের বাড়ী বর্ধমান জেলার আসানসোল সাবডিভিশনে। বাঁকুড়ার সীমার কাছাকাছি। ম্যানেজারের গুপ্তচর আছে। ওই যে তিনটি কালো মেম থাকে এখানে—তাদেরই এক বৃদ্ধা ম্যানেজারের চর। বুড়ীকে সকলে আদর করে—ম্যাগী বলে ডাকে। কথাটা মাগী। য-ফলার নেকটাই পরিয়ে চতুর রূপান্তরে কথাটাকে সাহেবী করে নেওয়া হয়েছে। ম্যানেজার ওকে বলে 'আন্টি' অর্থাৎ 'মাসী'। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ম্যানেজার রান্নাঘরে রান্নার তদ্বির করতে এসে আন্টির সঙ্গে গল্প করে। আন্টি তিনটে ভাষা জানে—ইংরিজী হিন্দী বাংলা।

তিনটেতেই সমান দখল। ম্যানেজারের পর্যায়ের বাঙ্গালীরাও ঠিক ওই তিনটে ভাষা জানে এবং এক বাংলা ছাড়া বাকী দুটোতে ওই ম্যাগীর সমান দখল। সুতরাং কথাবার্তায় কোন অসুবিধা হয় না।

বুড়ীর সঙ্গেই প্রথম আলাপ হল বিমলের। এখানেই একখানা তক্তপোষ দুটো সেল্ফ একখানা সস্তা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার কিনে ঘরখানায় আস্তানা পেতে ফেললে। মনোহর-পুকুর রোডের জিনিসগুলো চিত্তর জিম্মায় রেখে এসেছে, সেগুলো সে তার সুবিধামত একদিন পৌঁছে দেবে। লরীর ব্যবসায় আছে, লরী যেদিন এ অঞ্চলে ভাড়া পাবে সেদিন বোঝাই মালের সঙ্গে তার সেই পুরনো সোফা আর চেয়ার—এই দুটোকে শাঁকের আঁটির মত এনে ফেলে দিয়ে যাবে। মেসের চাকরটার নাম পঞ্চানন, নিরীহ ধরণের মানুষ—বয়সে প্রৌঢ়—সে তাকে সাহায্য করলে। তার হাতে একটি সিকি দিয়ে বিমল ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে মহানগরীর চারতলার উপর বিপুল তৃপ্তি নিয়ে বসে পড়ল। মনে মনে ধন্যবাদ দিলে, প্রণাম জানালে গোপেন দাদাকে।

বুড়ী ম্যাগী বারকয়েক তার সামনে দিয়ে পায়চারি করে অবশেষে তার কাছে এসে দাঁড়াল।—গুড ইভনিং।

বিমলও প্রত্যভিবাদন জানিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বুড়ী বললে—মি লিভ ইন দ্যাত রুম। সে হাসলে। বুড়ী ম্যাগীর একটিও দাঁত নেই। চুলগুলো শনের নুড়ি হয়ে গেছে। তাতে বাঙালী ধরণেই একটা ছোট লাট্টুর মত গোঁজা খোঁপা বেঁধেছে। পরনে ময়লা রঙীন ঝলঝলে পা পর্যন্ত লম্বা সেমিজের মত একটা জামা। গাউন সেমিজ যা খুশী ওটাকে তাই বলা যায়। পায়ে একটা ছেঁড়া নেকড়ার চটি।

এর পর বুড়ী গলগল করে একগঙ্গা কথা বলে গেল। তার অল্প কয়েকটা বিচ্ছিন্ন শব্দ ছাড়া বিমল আর কিছু বুঝতে পারলে না। বিপদে পড়ল সে। ইংরিজীতে সে পারদর্শী নয় কিন্তু কাজ চালাতে কষ্ট হয় না; ইংরিজী বইও পড়েছে, তার মধ্যে গ্রাম্য প্রাকৃত চরিত্রের মুখের ভাষা—ডান্ নো জাতীয় সংলাপ পড়ে অনায়াসেই বুঝতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে তার দেশের অনুরূপ জনের মুখের 'মুই জেনে না' কথা মনে পড়ে যায়, কিন্তু এই মহানগরীর এই স্তরের কালো সাহেবদের সঙ্গে তার পরিচয় নূতন—তায় বুড়ী দন্তহীন, তার কথা অনুধাবন করা তার সাধ্যাতীত মনে হল।

বুড়ী কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলিকে প্রকট করে বললে—এ্যাংলি? গেত্তিং এ্যাংলি?

এবার বিমল বুঝলে কথাটা। বুড়ী ধরে নিয়েছে বিমল তার কথা শুনে রুষ্ট হয়ে নিরুত্তর রয়েছে। সে মিষ্ট করে বললে—নো—নো—নো।

—নো?

—না। বাট্ ইউ'ল প্লিজ এক্সকিউজ মি, আই অ্যাম সরি, আই কাণ্ট ফলো ইউ।

বুড়ী ব্যস্ত হয়ে উঠল, নো নো। নো ফলোয়িং? বলেই সে তাড়াতাড়ি আপন ঘর থেকে একটা মোড়া এনে সামনে বসে বললে—ইউ সিত দাউন। মাই লুম বেরী দার্তি।

বিমল বুঝলে বুড়ী 'ফলো' কথাটা অন্য ভাবে ধরেছে। সে আবার বললে, আই কাণ্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইউ। তারপর হিন্দী করে বললে—সমঝমে নেহি আতা।

বুড়ী হেসে সারা হয়ে গেল। তারপর নিজের মুখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—নো তিথ! বেরী ওল্ড। তারপর বিচিত্র বাংলায় বললে—বাংলা বুলি জানে। বাংলা বাত বোলো মহাশা। বলেই আবার হেসে খুন।

বিমলও হাসলে। বুড়ী আশ্চর্য রকমের অনাবিল হাসি হাসছে। বিমলের মনে তার স্পর্শ সংক্রামিত হয়েছে। হেসে বিমল বললে—বাঃ, তা হলে তো খুব জমবে। বাংলা জানেন আপনি?

—জানে না? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে বুড়ী; তারপর হেসে চুপি চুপি বললে—জানে। বোলে না।

—কেন? বলেন না কেন?

বুড়ী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বললে—সাহিব পিউপিল দোস্ত লাইক ইত। দে হেত ইত। নেতিব নেতিব।

বিমল হাসলে। বুড়ী সত্য কথা বলেছে।

বুড়ী আবার বললে—ইউ হেত আস।

বিমল চমকে উঠল। বুড়ী ঠোঁট উলটে ক্ষোভের সঙ্গে বললে—মেস বাবুজ কল মি ম্যাগী। হামি জানে মহাশা ম্যাগী কিস্‌কে বোলে! হঠাৎ ঘাড় নেড়ে বললে বুড়ী, মাগী বালী যাবি? দি মাগীজ লিভ হিয়া, বিলো বিলো। হাতের আঙুল নীচের দিকে করে দেখিয়ে বার বার বুঝিয়ে দিলে বাইজীদের কথা বলছে সে। অর্থাৎ মাগী কথাটার অর্থ সে জানে। তারপর বললে—ম্যানেজার স্যাত ফেলা কল মি 'অস্তি', মাছী মাছী! আই নো, নো! হাসলে সে।

বিমল লজ্জায় নীরব হয়ে বসে রইল।

বুড়ীও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—পুওর উয়োম্যান। নো বদি ইন্ দি ওয়াল্দ। আই স্মাইল—লাফ। হাত দুটো উল্টে দিলে সে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বুড়ী বললে, ইউ দু হোয়াত? কোন কাম করেন মহাশা। বিজিনেস?

বিমল বললে—আই এ্যাম এ লিটারেটওর। নভেলিস্ট।

—হোয়াত?

—নভেলিস্ট, স্টোরি রাইটার। আই রাইট নভেলস, শর্ট স্টোরিস—

—তোরিজ নভেলস? বুড়ীর বার্ধক্যম্লান হলুদ রংয়ের স্তিমিত চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।—ইউ রাইত স্তোরিজ? হোয়াত স্তোরিজ? ঘোস্তস?

—নো নো। আই রাইট স্টোরিজ অব রিয়েল লাইফ।

—ইউ গেত মনি? দে গিভ ইউ মনি?

—ইয়েস!

বুড়ী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—আই হ্যাভ নো মনি। আই নেভা বাই বুকজ্। আই দোন্ত রিদ্ বুকজ্! গত্ ওনলি ওয়ান বুক—হোলি বাইবেল। দোন্ত রিদ ইত। ভাচ্ ইত্ অন দি হেদ। বুড়ী মাথায় হাত দিলে। তারপর বুকে হাত দিয়ে বললে—অন দি ব্রেস্ত! কিস্ ইত।

বিমল বললে—হোয়াই ডোন্ট ইউ রিড ইওর হোলি বাইবেল?

—কান্ত রিদ। কান্ত সি। অলমোস্ত ফরগতন রিদিং। উদাস ভাবে সে চেয়ে রইল সম্মুখের কলকাতার প্রাসাদশীর্ষময় শূন্যলোকের দিকে। সূর্য পশ্চিমের দিগন্তে বোধ হয় ঢলে পড়েছে। পশ্চিমে ডালহৌসি স্কোয়ারের চারতলা পাঁচতলা বিশাল বাড়ীগুলির অন্তরালে দিগন্ত দেখা যায় না। জেনারেল পোস্ট আপিসের গম্বুজ, চার্চের মিনার, লাটসাহেবের বাড়ীর গম্বুজ দেখে ওগুলিকে চেনা যায়। স্টেটসম্যান আপিসের পাশে ভিক্টোরিয়া হাউসের মাথায় কালো গোলকটাকে দেখা যাচ্ছে। এদিকে জোড়া গির্জের মাথা দেখে চেনা যায়। বউবাজার ধরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সামনে পূব দিকে শেয়ালদার মোড়ে আর একটা গির্জে দেখা যাচ্ছে। এদিকে অর্থাৎ উত্তরে মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়াগুলি দেখা যাচ্ছে।

মধ্য কলকাতার বউবাজার।

কলকাতার প্রাচীনতম স্থান। ইংরেজ মহানগরী নির্মাণকালে কি কল্পনা করেছে তার নিদর্শন এখানে চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। ওই গির্জের মাথা, বউবাজারের পাশে চার চারটে গির্জের চূড়া। বিমলের সামনে বসে রয়েছে—

বুড়ী উঠে পড়ল হঠাৎ। বললে—আই গো নাও। আই গো। ইউ আর এ গ্রেত ম্যান। রাইত বুকজ্! গেত মনি। গ্রেত ম্যান। ইওর নেম? আপনার নাম কি মহাশয়—

—বিমল মুখার্জী।

—বিমল? গুড। বেরী সুইত। বেরী সুইত!

—এক্সকিউজ মি, ইওর—

—মাই নেম? বুড়ী হেসে বললে—কল মি ম্যাগী অর অস্তি। দে অল কল মি দ্যাত।

বিমল বললে—নো। আই শ্যাল কল ইউ মা-মি!

মুহূর্ত কয়েকের জন্য বুড়ী যেন কেমন হয়ে গেল। তারপর আবার আগের মতই বললে—ইয়েস। এনি নেম ইউ লাইক। থ্যাঙস গুড। ইউ কল মি মা-মি, আই কল ইউ মাই সন্। থ্যাঙস গুড। বলতে বলতে সে সচকিত হয়ে উঠল। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ উঠছে। একজন নয়, দুজন তিনজনও হতে পারে। বুড়ী ব্যস্ত হয়ে বললে—অ—কেটি কামিং উইদ ফ্রেন্দস। অ—টি নট রেদি। অ—

ঠিক পরক্ষণেই এসে দাঁড়াল এক স্বাস্থ্যবতী যুবতী কালো মেম সাহেব।

তার সঙ্গে—বিমল বিস্মিত হল—ডিরেক্টর হীরু সেনের দুজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট।

পনর

হীরু সেনের সহকারীদের সহজে চেনার উপায় ছিল না। ওরা বিমলকে দেখে না চমকালে বিমল হয়তো ওদের চিনতেও পারত না এবং চিনতেও চাইত না। একেবারে বউবাজার অঞ্চলের ম্যাগী ও কেটিদের গোষ্ঠীর খাঁটি পিটার-গোমেস সেজে এসেছে তারা। শুধু অবস্থাটা একটু ভাল বলে মনে হয়। সম্ভবত ফিল্ম কোম্পানীর মেকআপ রুমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে বলেই সাজসজ্জা ভঙ্গি এমন নিখুঁত হয়েছে। বিমলকে দেখে ওরা চমকে উঠতেই বিমল ওদের দিকে ভাল করে তাকালে। মনে হল চেনা মুখ। উপরের দিকটা অর্থাৎ কপালের উপর ফেল্ট হ্যাট বেশ একটু বেশী করে বেঁকিয়ে টানা থাকায় এবং চোখে রঙীন চশমা থাকায় উপরের দিকটা চেনা বলে মনে হয় না কিন্তু নীচের দিকটা দেখে চেনা মনে হল। কয়েক মুহূর্ত পরেই ওদেরই একজন হেসে টুপিটা কায়দা করে খুলে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানিয়ে বললে—গুড্ ইভ্নিং মিস্টার মুকুর্জী? তারপরই সে চোখের চশমাটা খুলে ফেললে। তার দৃষ্টান্তে অপরজনও টুপি চশমা খুলে একটু হেসে বললে—আপনি এখানে?

কেটি মেয়েটি বিস্মিত হয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। ওদের দুজনের হাসি এবং প্রশ্নের অন্তর্নিহিত রঙ্গ বা ব্যঙ্গকৌতুকের সরসতা বাক্য কয়েকটি মূল অর্থকে অতিক্রম করে আরও অনেকগুণ অর্থবান হয়ে উঠেছে। বিমল একটু হেসে বলতে গেল—আমি এখানে ক্ষণিকের বা দুই দণ্ডের অতিথি নই—আমি—। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করলে, শুধু বললে—আমি এখানকার বাসিন্দা হয়েছি সম্প্রতি। নিজের ঘরখানা দেখিয়ে বললে—এই ঘরখানাই আমার বাসা এখন।

দুজনেই ওরা অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। বিমল বললে—বসবেন? কিন্তু আমার ঘরে বসতে দেবার মত আসন আর নেই।

একজন একটু ঢোক গিলে বললে—না। ব্যস্ত হবেন না আপনি।

ম্যাগীর মতই কেটি বাংলা বুঝতে পারে। সে সবই বুঝছিল। প্রথমটায় বন্ধুদের সরস ব্যঙ্গ-কৌতুকে উদ্বুদ্ধ হতে দেখে সে অধিকতর সরস কিছুর প্রত্যাশায় ঠোঁটের চাপের মধ্যে মৃদু হাসি শিথিল যোজনায় যোজিত করে প্রতীক্ষা করছিল। প্রত্যাশা করছিল এরা এইবারই বুঝি বলে—লেট মি ইনট্রোডিউস্ আওয়ার সুইট কেটি টু আওয়ার ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড এণ্ড কমরেড। কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ ফিস্টী চটা সীসের বাটের মত পরিণতি লাভ করতেই সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে গম্ভীর মুখে গট গট করে নিজের ঘরে গিয়ে দরজার তালা খুলতে খুলতে সরু গলায় চীৎকার করে উঠল—ম্যাগি! এ! ডোণ্ট ইউ হিয়া—র? ম্যা—গি!

বুড়ী নিজের ঘরের ভিতর থেকেই চীৎকার করে উঠল—হো-য়া-ই ডু ইউ—? ন্যাকড়া দিয়ে একটা ডিস মুছতে মুছতে সে বেরিয়ে এল। কেটি ততক্ষণে নিজের ঘরে ঢুকেছে। বুড়ী খুব রেগে গেছে—সে নিজের জরাজীর্ণ দেহখানাকে অন্তরের ক্ষোভের তরঙ্গে আন্দোলিত করে অঙ্গ দুলিয়ে কেটির ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।—হো-য়া-ই ডু ইউ তক লাইক দ্যাত? মি এ মেদ সারবেন্ত? এঁ?

বুড়ীর সঙ্গে বিমলের গ্রামের কুঁদুলী পাচী পিসীর কোন পার্থক্য নাই।

হীরু সেনের সহকারীদের একজনের নাম রতু রায়, অপরজনের নাম মণ্টু বোস। রতুর আসল নাম রতন হলেও হতে পারে, মণ্টুর নাম অনুমান করার উপায় নাই। চিত্রজগতে ওই ধরণের কাটাছাঁটা নাম একটা স্টাইলও বটে এবং প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞাপনও বটে। সে কথা থাক। ওদের দুজনের মুখেই একটু একটু ঝাঁঝালো গন্ধ উঠছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকল সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে বললে—কেটিকে আমরা ছবিতে নেব। একটা ফিরিঙ্গী নার্সের পার্টে নামাব। হাসতে লাগল রতন রায়।

মণ্টু বোস বললে—শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়। কিন্তু কতক্ষণ? পিসী যদি পাতের কাছ থেকে না ওঠে? আমি ওসব ভালবাসি না।

রতু বললে—এই মণ্টু!

—ও—নো। শুনুন স্যর। আমরা কেটির এখানে বেড়াতে এসেছি। আমাদের গার্ল ফ্রেণ্ড; আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন! ডোণ্ট ড্রিঙ্ক মিল্ক উইথ ঝিনুক—। রাগ করবেন না যেন।

বিমল বললে—না-না। রাগ করব কেন? বেশ তো, বান্ধবীর কাছে এসেছেন—তাতে—

বুড়ী কেটির সঙ্গে কথা শেষ করে গজগজ করতে করতে ঘরে ফিরে গেল—হাউলিং বার্কিং লাইক এ বিচ। কলিং মি ওল্দ উইচ—ইউ ব্ল্যাক ক্যাত—। ইউ দতার অব এ সোয়াইন—হালামজাদী—এক লোজ তুম সমঝেগা।

বুড়ী ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। টং—টং—ঠং—ঠং শব্দে ঘরখানাকে মুখরিত করে তুললে। খুব ক্রুদ্ধ হয়েই কাজ করে যাচ্ছে বুড়ী। কাপ ডিস নামাচ্ছে—সাজাচ্ছে।

কেটি বুড়ীর গালাগালির জবাব দিল না কিন্তু তীক্ষ্ণস্বরে এদের দুজনকে বললে—উইল ইউ কাম ইন অর টক ননসেন্স উইথ হিম অল দি টাইম?

মণ্টু বোস ঘরে গিয়ে ঢুকল। রতু বললে—আপনি এখানে কেন বাসা নিলেন স্যর? এত জায়গা থাকতে বৌবাজারে—চামড়ার গুদোমের গন্ধের মধ্যে—বাইজী—ফিরিঙ্গী মাগীদের মধ্যে—আমি তো অবাক হয়ে গিয়েছি!

বিমল কপালে হাত দিয়ে বললে—অদৃষ্ট বলতে পারেন অথবা মহানগরীর আবর্তের আকর্ষণ বলতে পারেন। বাইজীর কথা জানতাম—তারা একপাশে থাকে—মেস একপাশে। কেটিদের কথা জানতাম না। অবশ্য জানলেও প্রত্যাখ্যান করতাম না।

—এদের লাইফ ষ্টাডি করবেন বুঝি?

—না। না। নেহাৎ স্থান সমস্যাতেই সম্ভবত অদৃষ্টের ফেরে এসে পড়েছি এখানে।

মণ্টু এবং কেটি বেরিয়ে এল, কেটি এবার মাথায় একটা রঙীন রুমাল বেঁধেছে এবং ঠোঁটে গালে আর এক পোঁচ রঙ চড়িয়েছে। সে দরজায় তালা বন্ধ করে ম্যাগীর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। মণ্টু রতুকে হাত ধরে আকর্ষণ করে বিমলকে বললে—চললাম স্যর!

কেটি আগেই গট গট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মণ্টু হেসে বললে—কেটি আপনার

উপর চটে গেছে। আমাকে বললে—হোয়াই হ্যাভ হি কাম হিয়ার? বললে, সব জাগামে তুমলোক আয়েগা তো হামলোক কাঁহা যায়েগী?

হাসতে হাসতে তারা কেটির অনুসরণ করলে। সিঁড়ি থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে—ঈ—! হোয়াট—দি—হেল—ইউ আর টকিং? ঈ—!

বুড়ী বেরিয়ে এসে কয়েক মুহূর্ত ওই সিঁড়ির দিকে চেয়ে রইল। তারপর বিমলের কাছে এসে বললে, মাই সন্! গো এ্যাওয়ে ফ্রম হিয়া। ব্যাদ্ প্লেস—বেরী ব্যাদ্! ছাত গাল্—ছাত কেটি—দভাল্ অব এ সোয়াইন—হালামজাদী কুত্তি। বহুত কুত্তি হিঁয়া আতা হ্যায়। দে আর বেরী বেরী ব্যাদ্ ম্যান। দেঞ্জারাস পিউপুল। কাম উইথ বিগ নাইফ। সাম্ তাইমস দে ড্রাঙ্ক। ছাত বিচ ওয়াজ কাসিং ইউ। আস্কড মি—হোয়াই হি হিয়া? হোয়াই? দিসতারবিং আস? হোয়াই? আ—! লাইক বহুরাণী অব বহুবাজার! অল, অল হাল্ ফাদারস পপাটি, হাল হাজব্যাণ্ড পপাটি!

বকতে বকতে ঘরে ঢুকে একটা সস্তা টি-পট হাতে বেরিয়ে এসে বললে—লুক—লুক হিয়া মাই সন্। ওয়ান পণ্ড ফুল তি—অল বরবাদ্।

বুড়ী ওদের জন্য চা করেছিল—কিন্তু কেটি বন্ধুদের নিয়ে চলে গেল, পুরো এক টি-পট চা বরবাদ হয়েছে।

বুড়ী কেটির কেউ নয়। মাসীর সইয়ের বোনপো বউয়ের বোনঝি কি ওই ধরণের সম্বন্ধ একটা আবিষ্কৃত হয়েছে জীবনের এত তরুণীতে ভাসতে ভাসতে। বুড়ীর নেই কেউ। জীবনে সে বিবাহই করে নি। বুড়ীর আসল নাম মিস অ্যানা কুক। প্রথম জীবনটা কেটেছে বহু উন্মাদনার মধ্যে। বউবাজার সংলগ্ন কপালীটোলায় জন্মেছিল এক কুক পরিবারে। খালি পায়ে ফ্রক পরে কপালীটো- বউবাজার বেন্টিক স্ট্রীটে খেলা করে ঘুরে বেড়িয়েছে। কাটা ঘুড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে। পাদরীদের অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে পড়েছে। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে এসপ্ল্যানেডেও হাজির হয়েছিল। সেখান থেকে ইডেন গার্ডেন—গঙ্গার ধার—কেল্লার আশেপাশে। তখন তার বয়স ষোল-সতের। কতজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কতজন টুপি খুলে ইঙ্গিতময় চোখে মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলেছে—গুড ইভ্‌নিং মিস—। কতজন! কেল্লার গোরার দল—তাদের আসতে দেখলে ও এবং ওর সঙ্গিনীরা পরস্পরের গা টিপে বলত—ইয়া, দে আ-কামিং দি বয়েজ! কত জেন্টিলম্যান। ওর প্রথম যৌবনকালে মটর ছিল না, ছিল ফিটন। ফিটনে যেতে যেতে—জেন্টিলম্যান মৃদু হেসে টুপি খুলে সম্মান দেখাত, ওরাও হেসে পরস্পরের দিকে চাইত; ফিটন থেমে যেত; জেন্টিলম্যান নেমে আসত; ফিটনে বেড়াবার হোটেলে খাবার নিমন্ত্রণ জানাত। আলোকোজ্জ্বল হোটেল, স্বর্ণাভ পানীয় ভরা কাচের গেলাস, নরম গদীআঁটা চেয়ার, কার্পেটপাতা সরু মেঝে, দেওয়ালে দেওয়ালে আয়নায় আয়নায় প্রতিবিম্ব, যন্ত্রসঙ্গীতের ঐকতান; তুষারশুভ্র দেহবর্ণ জেন্টিলম্যানের পাশে বসে কালো মেয়ে ভুলে যেত কপালীটোলার এঁদো গলি, মুর্গী-কুকুর অধ্যুষিত নোংরা উঠান, ময়লা বিছানার গন্ধ, ভাঙা দাগধরা কাচের বাসন, আরও অনেক কিছু। মনে

হত স্বর্গে এসেছে।

কপালীটোলা থেকে—এলিয়ট রোড, সেখান থেকে এণ্টালী, এণ্টালী থেকে বউবাজারের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমা সেরে এসেছে এখানে ; এই চারতলার ছাদের উপর সঙ্কীর্ণ কাঠের ঘরে। কেটির সঙ্গে বৎসর দুয়েক আগে আলাপ হয়েছে। পথে আলাপ, কেটির শরীর তখন খুব খারাপ, সবে বেরিয়েছে হাসপাতাল থেকে ; আশ্রয় নাই, ঘুরে বেড়াচ্ছিল—ভাবছিল কোথায় যাবে! বুড়ী এ্যানার সঙ্গে দেখা হল হঠাৎ। তাকে দেখবা মাত্র ম্যাগী তার অবস্থা বুঝতে পারলে। সে তাকে ডেকে নিজের ওই ছোট কুঠুরীতেই স্থান দিয়েছিল। কিছুদিন সে-ই তাকে খাওয়ালে। এখন কেটি স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে, যৌবন তার এখন পরিপূর্ণ। বেশভূষায় যথেষ্ট খরচ করেও তার কিছু অর্থ বাঁচে। পূর্বের উপকারের কৃতজ্ঞতাবশেই কেটি এখন ম্যাগীর কাছে খায়। বন্ধুবান্ধব এলে ম্যাগী চা দেয়, কেক বা টোস্ট করে দেয়, আগে বরাত থাকলে মুর্গীর সুরুয়াও বানিয়ে দেয়। উদ্বৃত্ত খাবার থেকেই ম্যাগীর চলে যায়। এর জন্য যে টাকাটা কেটি তাকে দেয় সে তার বাঁচে, তার থেকে ঘরভাড়াটা দেয়, কেটির ঘরদোরও সে গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে থাকে। তা বলে সে তার ঝি নয়, সেটা সে স্নেহবশেই করে। স্নেহবশে সে কেটিকে অনেক সদুপদেশ দিয়ে থাকে। সুস্থ শান্ত মুহূর্তে কেটির রুখু ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দন্তহীন মুখে স্নেহের হাসি হেসে বলে—কেটি মাই ডিয়ারি—ইউ নটী গাল—লিচেন মি। বে—লি ব্যাদ—দিছ লাইফ ; নো হ্যাপিনেছ, নো পীছ! লুক মি, দিছ ওলদ্ আনহ্যাপি উয়োম্যান! লুক!

বলে—কেটি এ পথে শান্তি নেই রে, সুখ নেই আনন্দ নেই, নেই কিচ্ছু নেই। আমার দিকে চেয়ে দেখ, জরাজীর্ণ বৃদ্ধা হতভাগিনী আমার দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই। সমাজে সকলে ঘৃণা করে, এই বাবুরা বলে ম্যাগী—তার অর্থ বেশ্যা, বলে মাসী—তার অর্থ তরুণী বেশ্যা নিয়ে ব্যবসায়িনী বৃদ্ধা বেশ্যা। দুঃখ দেখ, আজ আমি তোর ঝিয়ের বৃত্তিই অবলম্বন করেছি একরকম। কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখ।

নিজের সেই ঝলমলে ঘাঘরাটার প্রান্ত টেনে তাকে দেখিয়ে বলে—দার্তি র‍্যাগ! লুক!

কেটি কোন কথা বলে না, সে উপুড় হয়ে বুকে বালিশ রেখে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে সামনের সেন্ট জেভিয়ার্স চার্চের পাশের মেহগনি গাছের সারির মাথার দিকে। কখনও কখনও চার্চের মাথায় ক্রশটার দিকে চায়।

ম্যাগী তাকে বলে—এর চেয়ে বিয়ে করে ঘর বাঁধ। তুইও রোজগার কর, স্বামীও রোজগার করুক। এই সেদিন আমার ছেলেবয়সের সই মেরী এসেছিল, এই শরীর তার, তেতলায় উঠে হাঁপিয়ে সারা ; বেশ আছে, মুখে হাসি কত! তার কানে এই মস্ত দুটো সোনার বলইয়ারিং। হাতে দুগাছা করে চারগাছা সোনার চুড়ি। ফ্রকটা দেখলাম চমৎকার দামী ছিটের। সিল্ক সাটিনের পোষাকও ওর আছে। তার ওলদ্ ম্যানকে কত বকলে আমার কাছে। ছেলে হয়েছে, তারা চাকরি করছে, মধ্যে মধ্যে কত জিনিস দেয়, টাকা দেয় ; বউ হয়েছে, নাতি-নাতিনী হয়েছে। ছোট বউটা কাছে থাকে। তার বড় ছেলেটাকে নিয়ে বগলস-আঁটা খরম পায়ে—এই বড় ঝোলা হাতে রোজ সকালে বাজারে যায়, দুপুরে পশম

নিয়ে মাফলার সোয়েটার বোনে। বললে—অ্যানি, বোনার আর বিরাম নেই আমার। তবে দুপুরটা কাটে ভাল। রবিবারে সুন্দর পোষাক পরে সুন্দরী নাতনীগুলোকে নিয়ে চার্চে যায়। নাতনীরা বড় বড় হয়েছে, এই তো সামনের লরেটোতে পড়ে; বড়টি লরেটো সেরে নার্সিং শিখছে। মেজটি এবার শেষ করবে লরেটোর পড়া। তারপর সে শিখবে টাইপরাইটিং। কাজের তো অভাব নেই। টেলিফোন আপিসে চাকরি, রেলের বুকিং আপিসে চাকরি, এগুলো তো আমাদেরই জন্যে। রং যাদের কটা তারা অবশ্যি খাতির বেশী পায় কিন্তু চেষ্টা করলে তোকে যোগাড় করে দিতে পারি কিছু না কিছু। বলিস তো, আমি যাই সেণ্ট জেভিয়ারের ফাদারের কাছে। বলি—ফাদার, বি ম্যাস্থিফুল, তেক পিতি অন এ ফলেন গার্ল। রিপেনটেন্ট গার্ল! পুওোর ক্রিচার। ইউ ত্রাই ফর হার! প্লিজ প্লিজ ফা-দার!

কেটি চুপ করে শুনতে শুনতে হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, স্টপ—ইউ, ইউ উইচ আই সে, ইউ স্টপ!

—হোয়াত?—চমকে ওঠে ম্যাগী।

—ডেভিল মে টেক ইউ, ডোণ্ট ইউ হিয়ার? স্টপ, আই সে ইউ স্টপ, ইউ ওল্ড হ্যাগ, ন্যাস্টি ক্রীচার।

ম্যাগী ক্ষেপে যায়—হোয়াত?

কেটি উঠে চুলটায় বার কয়েক চিরুনি বুলিয়ে জুতো পায়ে দিয়ে, হাতব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে খট খট করে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। রাত্রে ফেরে মত্ত অবস্থায়। কেউ সঙ্গী এসে পৌঁছে দিয়ে যায়। বুড়ী সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। রাত্রে ওর ঘুম ভাল হয় না। কেটি যতক্ষণ বাইরে থাকে ততক্ষণ ঘুম আসেই না। একটা উদ্বেগ অনুভব করে। হয়তো থানায় ধরে নিয়ে গেছে। অথবা হয়তো কেটি জখম হয়েছে। কাল হাসপাতাল থেকে খবর আসবে। কিংবা হয়তো কেটির আর কোন খবরই পাওয়া যাবে না। মর্গে কয়েকদিন পচবে, তারপর যা হোক কোন পরিণতি লাভ করবে। হয়তো তার হাড়গুলো কোন ডোম কোন ছাত্রকে বিক্রী করে দেবে, সে টেবিলের উপর তার হাত অথবা পায়ের হাড় ঠুকবে আর পড়বে। কেটির আত্মা বেদনায় অঝোরঝরে কাঁদবে। বুড়ো বয়সে ম্যাগী তার শক্তির সঙ্গে জীবনের সকল ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে! মহানগরীর জীবন অবিরল মন্থিত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের শাসনত্রস্ত প্রবৃত্তি গুহার অন্ধকারে লুকিয়ে সকল গতিকে পিছন দিক থেকে টানছে। দুই আকর্ষণে মন্থিত হচ্ছে জীবন, মহানগরীর জীবন। অমৃত উঠছে, বিষ উঠছে। সেই বিষে জর্জরিত হয়ে ম্যাগী পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে এই চারতলায় কাঠের কুঠুরীর কোণে। কেটি ছুটে যায় ওই বিষের প্রলোভনে। তাই তার কেটির জন্য এত উৎকণ্ঠা। তাই কেটি এত গালাগালি দেওয়া সত্ত্বেও, সে ফিরে এলেই ম্যাগী সন্তর্পণে উঠে তাকে দেখে আবার শোয়। সে মত্ত হয়ে ফিরে এলে ম্যাগী বেরিয়ে আসে নিজের ঘর খুলে, কেটির ঘর খুলে তার সঙ্গীর সাহায্যে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সঙ্গীটাকে বিদায় করে দেয়। কেটিকে প্রাণভরে গাল দেয়, মাথায় জল দেয়, বাতাস করে, সময়ে সময়ে এই সুযোগে সে তাকে দু'চারটে চড় কষিয়েও দেয়। আবার সকালে কেটি উঠলেই তার ঘরে উঁকি মেরে বলে—ফিলিং ওয়েল?

কেটি একটু হাসে। ম্যাগী বলে—ওয়াশ ইওর হেড, ফেস। আন্দাস্তান্দ?

একটু পরেই চা রুটি এনে সামনে রেখে পাশে বসে। বলে—বেদী গুড হেলথ! ভ্যাতস গুড। নাউ তেক তি।

বিমল উঠল। চা খাবার সময় হয়েছে। মেসে চায়ের ব্যবস্থা নাই। দোকানে গিয়ে সকলে খেয়ে আসে। সমৃদ্ধ অবস্থার বাবুদের মেসের বাবুরাও দোকানে যায়। চায়ের ব্যবস্থা রাখলে আপিসের ভাত হয় না। তাছাড়া মোড়ের মাথায় একটি ভাল চায়ের দোকান আছে, যার আকর্ষণই হল সব চেয়ে বড়। চা থেকে খাবারদাবার চমৎকার তৈরী করে ওরা। পরিচ্ছন্নতাও প্রশংসনীয়। এর সঙ্গে আছে রেস্তোরাঁ সমারোহের নেশা, নগরজীবনের এটা একটা বিলাস। যারা রেস্তোরাঁয় ঢোকে নি তাদের প্রথম ঢুকতে বাধ-বাধ ঠেকে। ঢুকলেই আর রক্ষা নাই। সে তাকে টানবেই।

এ মেসের বাবুরা সাধারণত ও রেস্তোরাঁয় যায় না। যায় পাশের একটা রেস্তোরাঁয়। সেটার জমজমাট কম। খাবার-দাবারের দামও কিছু কম। চপ কাটলেটে দু পয়সা, কারির ডিস দু আনা, মটনচপ ব্রেস্ট কাটলেট বড় কেউ একটা খায় না—তা হলেও তার দামও কিছু কম। এ ছাড়া ওখানে ঢুকে এ মেসের বাবুরা মনে মনে একটা জটিলতার পাকে পাক খেতে থাকে যেন; ঘন ঘন চারিপাশের টেবিলে তাকায়, টেবিলের অধিকারীদের সাজসজ্জা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে—গিলে করা পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, স্যুট, রকমারি চশমা, কারও মুখে চুরুট, কারও মুখে সিগারেট, এ সব দেখে নিজেদের লংক্লথের ইস্ত্রি, লাটখাওয়া পাঞ্জাবি ও সাবান-কাচা কাপড়ের দিকে চেয়ে কেমন যেন অস্বস্তি ভোগ করে, চা খেয়ে বিড়ি ধরাতে লজ্জা পায়। তাই তারা পাশেরটার গিয়ে বসে। বিমল দুটোতেই যাবে অবশ্য। যেদিন যেটার উপযুক্ত সামর্থ্য তার পকেটে থাকবে, সেদিন সেটাতে গিয়ে ঢুকবে।

একবার মনে হল বুড়ী ম্যাগীর সঙ্গে চায়ের ব্যবস্থাটা করে নিলে মন্দ হয় না। তেতলা সিঁড়ি ভেঙে যাওয়া আসা, কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত হাঁটা, অনেক সময় সাপেক্ষ। পর-মুহূর্তে মনে হল—না, একান্ত বাধ্য হয়ে এদের সঙ্গে যতটুকু জড়িয়ে না পড়ে উপায় নেই তার চেয়ে জড়ানো ঠিক হবে না। বুড়ী ম্যাগীও আশ্চর্য, পূর্ণ এক টিপট চা তার নষ্টই হল কিন্তু বিমলকে বললে না—এক কাপ তুমি খাও।

চা খেয়ে খানিকটা ঘুরে সে ফিরল। পাড়াটাকে চিনে নিতে চেষ্টা করলে। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট লালবাজার থেকে সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যু পর্যন্ত প্রাচীন বউবাজার এখনও টিঁকে আছে। নানা জাতের সংমিশ্রণ এখানে, অভারতীয় অনেক, অবাঙালী প্রায় সবাই। বউবাজার স্ট্রীটের দুই পাশে অসংখ্য সরু গলি এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে। এগুলি যত সংকীর্ণ তেমনি অপরিচ্ছন্ন, তেমনি জীর্ণ, তেমনি বিপদসঙ্কুল। উর্দুভাষাভাষী মুসলমান, ম্যাগী-কেটির গোষ্ঠী ফিরিঙ্গী, চীনেম্যান, জু, ইয়োরোপের আরও অনেক দেশের অধিবাসী দুজন একজনকে এ অঞ্চলে খুঁজলে পাওয়া যায়। পাড়ার বাড়ীগুলি অধিকাংশই উনবিংশ শতাব্দীর। বিংশ শতাব্দীতে উনবিংশ শতাব্দী যেন এই প্রাচীন অঞ্চলটার জীর্ণ ইট-কাঠ-পাথরে

জড়িয়ে পড়ে আছে। এখানকার মানুষগুলির অধিকাংশেরও ওই অবস্থা। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলো নিভে গিয়েছে, বিংশ শতাব্দীর আলো—তার কল্যাণস্পর্শ যেটুকু, তা পায় নি—তারা ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ধকারকে আশ্রয় করে রাত্রির মানুষের মত জীবনযাপন করে চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ গড়তে চেয়েছিল যে কলকাতা, তারই জীর্ণ টুকরো। আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্র স্থাপন করেই সে ক্ষান্ত হয় নি, সে স্থাপন করতে চেয়েছিল ধর্মে সংস্কৃতিতে সভ্যতায় ইংরেজের একান্ত অনুগত মানুষের বসতি। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বউবাজারে চার-চারটে গির্জা। গির্জার সঙ্গে কৃশ্চান এবং ফিরিঙ্গীদের জন্যে ইস্কুল। সে নিজেদের ধর্মে দীক্ষিত করে দীক্ষাগুরু হতে চেয়েছিল; ইংরিজী ভাষায় শিক্ষিত করে শিক্ষাগুরু হতে চেয়েছিল; আপিসে, ডকে, রেলওয়েতে, কলকারখানায় তাদের চাকরি দিয়ে তাদের প্রভু হয়েছিল—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রভু হয়েছিল—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রভু; এদের দুর্দান্তপনা শিখিয়ে পৃষ্ঠপোষক হয়েছিল এবং এদের দিয়েই বাঙালীকে, বাঙালীর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষকে দমন করেতে চেয়েছিল, দাস করতে চেয়েছিল।

কাঁসরঘণ্টা বাজছে। ফিরবার পথে থমকে দাঁড়াল বিমল।

ফিরিঙ্গী কালীর বাড়ীতে আরতি হচ্ছে। মাটির কালীমূর্তির সামনে প্রদীপ ঘুরিয়ে আরতি হচ্ছে। কয়েকটি বুড়ো-বুড়ী ফিরিঙ্গী দাঁড়িয়ে আছে। পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে গেঞ্জী, মাথায় হ্যাট। আরতির শেষে বুড়ো-বুড়ীরা চলে গেল, একজন বুড়ী একটা পয়সা দিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মনে মনে বিড় বিড় করে কিছু বলে তবে গেল। ছেলেগুলো এখনও ঘুরঘুর করছে। এক এক টুকরো মিষ্টান্ন প্রসাদের জন্য বোধ হয়। ফিরিঙ্গীকালী, বিচিত্র নাম, হিন্দুদের উচ্চস্তরের লোকেরা অবজ্ঞার চোখেই দেখে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থেরা প্রণামও করে না। কিন্তু তারা জানে না—ফিরিঙ্গীকালী আসলে গির্জের দরজায় দাঁড়িয়ে হিন্দুদের রক্ষাকালীর মত যুদ্ধ করে এসেছে।

সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যুয়ের মোড়ে এসে দাঁড়াল বিমল। মহানগরীর আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবাদের আবিষ্কারের কল্যাণে সভ্যতার মধ্যে গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল দাবীতে প্রশস্ত আলোকোজ্জ্বল মসৃণ পথ চলে গিয়েছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অভিমুখে।

আশ্চর্য! ঊনবিংশ শতাব্দীর নগরীর অংশটা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা সঙ্কুচিত হয়ে পিছনে হটে গিয়েছে। সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যুর দু পাশের স্থান অধিকার করে বড় বড় প্রাসাদ গড়ে তুলেছে মাড়োয়ারী ...রা। ওপাশে এগিয়ে এসেছে বাঙালী উচ্চ-বিত্তেরা, সচ্ছল মধ্যবিত্তেরা। ইংরেজ ধনীর স্থলে ভারতীয় অবাঙালী ধনীরা জয়লাভ করেছে। বাঙালীর স্থান অধিকার করেছে।

পথে আরও একটি কালীবাড়ী। সেখানেও আরতি হচ্ছে। সেন্ট জেভিয়ার্স চার্চের ঠিক সামনেই। চার্চের অন্তর্ভুত সেন্ট জোসেফ স্কুলের কোথাও ছেলেমেয়েরা কোরাসে গান গাইছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখানে। চীনে-সাহেবরা দোকানে বসে লম্বা পাইপে ধূমপান করছে আরাম করে। এই এক জাত। এদের বোধ হয় কেউ হটাতে পারবে না। ধনশক্তি, সৈন্যশক্তি নিয়ে ওরা আসে নি, ধর্ম প্রচার করতে আসে

নি, চীনা সংস্কৃতি বিস্তার করতে আসে নি, এসেছে নিজেদের শ্রমশক্তি ও কর্মনৈপুণ্য নিয়ে ; কারও সঙ্গে তাই মানসিক দ্বন্দ্ব নাই, কেউ ওদের শত্রু বলে গ্রহণ করে নি, মিত্র বলেও সমাদর করে স্থান দেয় নি, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ওরা নিজেদের স্থান দখল করেছে। দখল করার মধ্যে দ্বন্দ্ব করে নাই, যে স্থানটা শূন্য হয়েছে সেই স্থানটা পূর্ণ করেছে। ক্ষয়িষ্ণু ফিরিঙ্গী এবং অপ-ম্রিয়মাণ অপর সম্প্রদায়ের স্থান পূর্ণ করে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট থেকে বউবাজার পর্যন্ত নিজেদের প্রসারিত করেছে। মহানগরীর জীবনে ওদের কর্মনৈপুণ্যের শ্রমশক্তির স্থান অপরিহার্য, অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বকর্মা এ পুরীর অন্যতম দেবতা, ওরা তার অনুচর। সেণ্ট জেভিয়ার্স চার্চের পিছনে এমনি আর একটি সম্প্রদায় বস্তীর অন্ধকারে কেরোসিনের ডিবে জেলে কলরব করছে। ওড়িয়া শ্রমিকেরা।

বিচিত্র উপলব্ধি নিয়ে সে আপন ঘরে ফিরল।

মেসগুলি তখন গুলজার হয়ে উঠতে সুরু করেছে। বাবু মেসের সভ্যেরা ফিরছে খেলার মাঠ থেকে, চাঙোয়া থেকে, সিনেমা থেকে, এসপ্ল্যানেড থেকে। এ মেসের বাবুরা ফিরছে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বক্তৃতা শুনে, গোলদীঘির চারিপাশে পাক দিয়ে, হাড়কাটা গলির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত বারকয়েক টহল দিয়ে।

জনকয়েক ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। দেখবার মত দৃশ্য বটে। চারতলার উপর থেকে রাস্তাটাকে দেখাচ্ছে বিচিত্র। মধ্যালোকে আলোর সারি। তার অপর্যাপ্ত আলোকে অস্পষ্ট রাস্তাটাকে দেখাচ্ছে যেন একটা দীর্ঘ সরল গহ্বর পথের মত, দ্রুত সঞ্চরমাণ মটরের হেডলাইট ছুটে আসছে—বেঁকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে ; যেন পাতালপুরীতে ছুটোছুটি করছে হাজার আলেয়া।

এখানে এসে এক অদ্ভুত সত্যকে সে প্রত্যক্ষ করেছে। সেই কথাটাই সে ভাবছে। কলকাতায় ইংরেজ হেরে গেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে যে অংশটা প্রত্যক্ষ—তা ছাড়া আরও একটা যুদ্ধ চলে আসছে কতকাল ধরে। ইংরেজ সেখানে হারছে। ইংরেজ এই পাড়াটার উত্তর সীমানায় সেকালে একটা কেল্লা গড়েছিল। ইস্কুল তৈরী করেছিল, অনুগত দাস তৈরী করবার কার-খানা করেছিল। সে কারখানায় তারা বেদখল হয়েছে প্রত্যক্ষ ভাবে। সেটা সবারই চোখে পড়েছে। কিন্তু সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু বউবাজারের মোড়ে সে দেখে এসেছে তারা কতটা পিছিয়েছে। কথাটা সে গোপেনদাকে বলবে। মিহিরকে বলবে।

পরদিন সকালে উঠে সে এই কথাটাই লিখতে বসল।

বাইরে থেকে কে বললে—মে আই কাম ইন ?

বিমল চোখ তুলে চাইলে ; কেটি দরজায় দাঁড়িয়ে। সে উঠে বললে—কাম ইন। ইজি-চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বললে—টেক ইওর সীট প্লীজ !

কেটি বললে—আই হ্যাভ সামথিং টু টেল ইউ।

—ইয়েস, আই স্যাল বি—

—নো। আই নো, ইউ আর নট প্লিজড। আই নো।

সে বসল চেয়ারে।

বুড়ী ম্যাগী—এসে মুখ বাড়িয়ে হেসে বললে—গুড মর্ণিং মাই সন্! তারপরেই সবিস্ময়ে বললে—কেটি হিয়া? গ্যাড! দোস্ত কোয়াল—কেটি—দোস্ত—!

কেটি বিরক্ত হল। বুড়ী বললে—বি ফ্রেন্দ। তারপর বললে—তি? তু কাপস অব তি? এঁ! একমুখ হেসে সে চলে গেল।

ম্যাগী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই কেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ইউ লীভ্ দিস প্লেস।

বিমল তার দিকে তাকালে। কেটির কপাল কুঞ্চিত, চোখের কোণে একটা বিরূপতার ছাপ।

—হোয়াই? বিমল স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলে।

—ইফ ইউ স্টে—নো ফ্রেণ্ডস্ কাম্ হিয়ার—ইউ লীভ!

—না। বিমলের কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ দৃঢ়তর হয়ে উঠল। কেটি নিষ্ফল আক্রোশে নিজের ঠোঁট দুটি কামড়ে ধরলে। কণ্ঠা ফুলে উঠেছে। চোখের দু'পাশে অসহায় ক্রোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ছে। বিমল অনুভব করলে, সে থাকলে কেটির ব্যবসায় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। নিশ্চয় রতু আর মণ্টবাবু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে গেছে, বিমল থাকলে তারা আর আসবে না। বিমলকে এ মেস ছাড়তে হবে, নইলে তারা অন্যত্র যাবে।

কেটি অকস্মাৎ চীৎকার করে উঠলে—ইফ্ ইউ ডোণ্ট গো, আই শ্যাল কীল ইউ!

বিমল স্থির অবিচলিত কণ্ঠে বললে—ডোণ্ট শাউট্।

তার চীৎকারে ম্যাগী ছুটে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দন্তহীন মুখব্যাদান করে প্রাণপণে সন্ধির প্রস্তাব করে—দোস্ত কোয়াল—ফ্রেনদ—তি হিয়া—তেক—।

এক ধাক্কায় কেটি চায়ের পেয়ালা দুটো ফেলে দেয়। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় কাপ দুটি। ঘরময় গড়িয়ে পড়ে সদ্য তৈরী করা গরম চা।

—আই উইল কল হামফ্রে, হী উইল স্ট্যাব্ হীম—হী উইল কীল হীম। কেটির কণ্ঠস্বর সপ্তম স্বরে উঠে যায়।

বিমল ভর্ৎসনার সুরে বলে, ডোণ্ট শাউট—গো নাউ।

ম্যাগী মাঝখানে এসে উভয়ের বন্ধুত্বের সেতু গড়বার চেষ্টা করে, কিন্তু কেটি ডান হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে, লেখার কাগজপত্র ওলটপালট করে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। পাশের ঘর থেকে তার কান্নার অস্ফুট শব্দ ভেসে আসে—ম্যাগী তার পিছন পিছন গিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে—দোস্ত কাই মাই গাল—দোস্ত কাই।

বিমল নিঃশব্দে লেখার কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে তুলতে লাগল।

—কি ব্যাপার বিমলবাবু?

বিমল মুখ তুলে দেখলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেসের ম্যানেজার ফুলু বোস। বিমলের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

ষোল

খাঁটি বাঙালী ঘরের মেয়ে কেটি। ধর্মে কৃশ্চান অথচ খাঁটি বাঙালী, বিমলের অজানা নয়। এঁদের অনেককে জানে। এঁদের দু'তিনজন তরুণ সাহিত্যিককেও সে জানে। নিজের দেশেও সে এঁদের দেখেছে। সেই ঘরের মেয়ে? কেটির নাম কেতকী? সে বি-এ পর্যন্ত পড়েছে? শিক্ষিতা মেয়ে? তার এই পরিণতি? বিমলের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। অবিশ্বাস করবারও উপায় ছিল না। শেষ কয়েকটি কথা কেটি খাঁটি বাঙলায় বিশুদ্ধ বাঙালী উচ্চারণে বলে গেল।—বোস থামতেই সে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলে—তারপর?

—তারপর? একটু দুঃখের হাসি হাসলেন বোস। সে হাসিটুকু তাঁর মুখে লেগেই রইল, বললেন—তারপর কেতকী থেকে হল কেটি, শাড়ী ব্লাউজ ছেড়ে ফ্রক-গাউন পরলে, চুলের লম্বা বেণী কেটে ফেলে বব করলে, কপালে কুমকুমের টিপ ছেড়ে লিপস্টিক রুজ ধরলে। ধাক্কা খেতে খেতে এখানে এল, নিয়ে এল ওই ম্যাগী। ম্যাগী অবশ্য ওর আসল পরিচয় জানে না, সে ওকে নিজেদের জাতিগোত্রই মনে করে। কেটি ওদিক দিয়ে পাকা অভিনেত্রী, আজও এক আমার কাছে ছাড়া বউবাজার অঞ্চলে আর কারও কাছে ধরা পড়েনি।

বিমল প্রশ্ন করে বসলে—আপনি ওকে ধরলেন কি করে? প্রশ্ন করেই সে লজ্জিত হল। বললে—মাফ করবেন আমাকে—প্রশ্নটা করা আমার অন্যায় হয়েছে।

বোস হেসে উঠলেন। বললেন—কিছু অন্যায় হয় নি। যতটা বলেছি তাতে যে কেউ হোক এ প্রশ্ন করতই। প্রশ্নটা এড়াতে গেলে কথাটা পাড়াই উচিত নয়। এ কথা গোপেনদা, মিহিরবাবু জানেন। আর আপনাকে বলছি। একসময় সন্দেহ হয়েছিল মেয়েটা পুলিশের স্পাই। আমাদের মেসটার সঙ্গে গোপেনদার সংস্রব সন্দেহ করে তারাই একে এখানে পাঠিয়েছে। আমাদের মেসটার বিচিত্র ধারা-ধরণের কথা জানেন তো!

বিমল ঘাড় নেড়ে জানালে—সে জানে।

বোস বললেন—আমার জন্যেই এটা হয়েছে। আমার পরিচয়টা বলি শুনুন। পয়সাওলা বাপের ছেলে, আমার নাম দিলীপ বোস, ছেলেবয়সে সকলে ভাল ছেলেই বলত। স্বাস্থ্য দেখছেন তো, এমনি স্বাস্থ্য আমার ছেলেবয়েস থেকেই; তার উপর দুর্দান্ত মারহাত্তা আর ফুটবল ক্রিকেট হকিতে ভাল খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিলাম। পড়াশুনাতেও কোনবার ফেল করি নি। কাজেই গোপেনদাদের দল আমার উপর হাত দিলে। আমারও তরুণ বয়স, আমিও ঝুঁকে পড়লাম। তারপর কলকাতায় কলেজে এলাম। তিরিশ সালে জেলও ঘুরে এলাম। তারপর বছর খানেক ডিটেনশন। সেখান থেকে আবার কলেজ। গোপেনদারা তখনও ডিটেনশনে। কলেজে ঢুকে, মানে ল কলেজে, খেলায় মাতলাম। বাস, কেরিয়ার খুলে গেল। কলেজের টিম থেকে নামজাদা বড় টিমে ঢুকে গেলাম। আমার সেণ্টার-হাফের খেলা দেখে ছেলেরা হিরো বানিয়ে ফেললে, মেয়েরা প্রেমে পড়ে গেল, দিলীপ বোস থেকে নাম হয়ে গেল ডুলু বোস।

—আপনিই খেলোয়াড় ডুলু বোস ?

হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে বোস বললেন—আপনি মশাই নেহাৎ গোঠছাড়া সাহিত্যিক। সাহিত্যিকদের খেলা দেখার বাতিক বিখ্যাত। খেলার মাঠে বেলা দুটো থেকে তাঁরা বসে থাকেন, এখনও থাকেন বোধ হয়। সাহিত্যিকদের কাছে আমার পরিচয় দিতে হয় না। দেখলেই তাঁরা আমাকে চিনতে পারেন।

বিমল লজ্জিত হল, বললে,—খেলা আমি বড় দেখি না, কিন্তু তবু আপনাকে চেনা উচিত ছিল আমার। আপনার ছবি অনেকবার দেখেছি।

—ছবি ? হো-হো করে হেসে উঠল ডুলু বোস। ছবি দেখে না চেনার জন্যে নিশ্চয় আপনার অপরাধ নেই। ছবি যারা তোলে তারা আমাকে এমন সুপুরুষ বানিয়ে তোলে যে সে ছবি দেখে আসল আমাকে চেনাই যায় না।

বিমলও হেসে ফেললে।

ম্যাগী উঁকি মারলে এবার—মিস্তার বোস।

বোস মুহূর্তে পাল্টে গেলেন—ভুরু কুঁচকে বাংলাতেই বললেন—কি ?

—ওয়ান ওয়াদ। ওনলি ওয়ান ওয়াদ। প্লিজ !

বোস তাকে ধমকালেন, বললেন—বাংলা, বাংলাতে বলো ম্যাগী।

ম্যাগী ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে মিনতিভরে বললে—কেটির পর বহুত গোসা আপনি কররেন না বোসবাবু! আনফরচুনেত গাল।

—হ্যাঁ, হতভাগী! সে তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু আজকের ও কেলেঙ্কারিটা তুমি বাঁধালে কেন! ঝগড়ার জন্য তুমিও দায়ী।

—ফর দিস—মুকুর্জী, বোসবাবু, মুকুর্জীবাবুর লিয়ে। মুকুর্জী হামকে বললো মামী। আপনা বেটার মতুন ভালবাসলো আমি। বোসবাবু, কেটি মুকুর্জীকে উপর খোসা করল। কাল রাতে মাতোয়ারা হয়ে আসলো, বহুত গাল দিলো মুকুর্জীকে। হামকে বললো হামক্রেকে ডাকবে। আজ সকালে ও নিজুসে আসলো মুকুর্জীর ঘর। আই থট বোসবাবু—দিস ইজ জাস্ট দি টাইম, কেটির সাথ মুকুর্জীর দোস্তি লাগাইয়ে দি। বাট্। হতাশ ভাবে সে ঘাড় নাড়লে। সি ইজ তেরিবল। আই কুদ নত রেজিস্ত মাইসেফ্। স্থাতস মাই ফল্ত। মাই ফল্ত বোস, দোণ্ট গেত অ্যাংরিং উইথ পুয়োর কেটি।

বোস হাসলেন। বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা। কেটিকে কিছু বলব না, তুমি যাও।

—প্লিজ, বোসবাবু, প্লিজ! ম্যাগীর যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, আবারও সে মিনতি করলে।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ আমি কথা দিচ্ছি ম্যাগী। তুমি জান আমি কথার খেলাপ করি না। যাও। তুমি এখন যাও।

দন্তহীন মুখে তোষামোদের হাসি হেসে ম্যাগী বললে—আই নো, আই নো স্থাত বোসবাবু। ইউ আ এ ম্যান অব ওয়ার্দ। এ ম্যান উইথ এ বিগ হাত, আই নো। চলে যেতে যেতে সে আবার ফিরে দাঁড়াল, বললে—তি ?

—না না। তুমি যাও এখন ম্যাগী। দেখছ না কথা বলছি আমরা!

ম্যাগী চলে গেল। বোস বললেন—গরীবের জাতও নেই, ধর্মও নেই বিমলবাবু। ও যখন বলছিল—কেটির সঙ্গে মুখার্জির ভাব করিয়ে দি, তখন আমার মনে পড়ে গেল শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের মোক্ষদা ঝিয়ের কথা। সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে এর তফাৎ কোথায় বলুন তো! যদি ভাব হত আপনার সঙ্গে কেটির—তবে দেখতেন ও মদ খেতে চাইত, এবং মদ খেয়ে চীৎকার করত যে মুকুজ্জির কাছে কেটির আন্টি হিসেবে টাকা আদায় করে তবে মদ মুখে তুলেছি। কোন তফাৎ নেই!

বিমল বললে—ম্যাগী কিন্তু কেটিকে সত্যিই ভালবাসে।

—তা বোধ হয় বাসে।

—বোধ হয়? সন্দেহ করেন আপনি!

—খানিকটা।

—কেন বলুন তো!

—কেন! হাসলেন বোস। বললেন—কেটির দৌলতে আজ ওর ভাত জুটছে বিমলবাবু। কেটির নাগরদের কাছে টিপসই হল ওর প্রধান উপার্জন। কেটি ওর কাছে খায়—লোকজন এলে চা কেক রুটি দেয়—তার থেকেই ওর আহার সংস্থান হয়। কাজেই কেটিকে ভালবাসার কতখানি ওর প্রয়োজনের খাতিরে, কতখানি অকৃত্রিম এ কথা বলা শক্ত।

বিমল হেসে বললে—প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ মানুষের কাছে আসে দিলীপবাবু, তারপর প্রয়োজনের মেলামেশার মধ্যেই ভালবাসার সুরু হয়।

—অস্বীকার করি না। কয়লার মধ্যে শুনেছি হীরে পাওয়া যায়। কয়লাই কোন যাদুতে হঠাৎ খানিকটা জায়গায় হীরেতে পরিণত হয়। কিন্তু সে কদাচিৎ। আমার অভিজ্ঞতা অনেক। যাক ওসব কথা। এখন যা বলছিলাম। কি বলছিলাম! হ্যাঁ, কেটির কথা বলতে গিয়ে নিজের কথা বলছিলাম। বলার খানিকটা দরকার আছে।

দিলীপ বোস একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

—দিলীপ বোস ডুলু বোস হয়ে গেল বিমলবাবু। খেলার পিছল মাঠে দৌড়ুতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেলাম। খেলায় স্লিপ জানেন তো, পড়ে তেমনি ভাবে পিছলে একবারে এসে খানায় পড়ে গেলাম বিমলবাবু। এমন বদভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম সে অভ্যাস আর কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডুলু বোস বললে—সব হারালে সব পাওয়া যায় বিমলবাবু—চরিত্র হারালে আর বোধ হয় পাওয়া যায় না। যারা দু'চারজন পায় তারা অসাধারণ। গোপেনদার মত এমন ব্যক্তিত্ব এমন চরিত্র—তিনি ডিটেনশন থেকে ফিরে এসে আমায় শোধরাবার জন্যে অনেক করলেন—কিন্তু। হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়লে ডুলু বোস—গোপেনদার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে, ডুলু বোস তার নিকলুষ আত্মাকে ফিরে পায় নি।

—তবে এই কলুষ কাজে লাগল অন্যদিকে। ল কলেজে পড়লাম বছর পাঁচেক—পরীক্ষা অবশ্য দিলুম না। তারপর আরম্ভ করলাম ব্যবসা। দালালী। এই বদভ্যাসগুলো মূলধনে দাঁড়াল। এক এক সময় নিজেই আশ্চর্য হয়ে ভাবি—মা লক্ষ্মী এই অনাচার সহ্য

করেন কি করে। অথচ প্রায় গোটা ব্যবসার ক্ষেত্রটাই যেন এই অনাচারের ইঙ্গিতে চলছে। ধরুন—নতুন কণ্ট্রাক্ট পেতে হবে, আপিসের বড় সায়েবকে পার্টিতে নেমন্তন্ন করে আপ্যায়িত করতে হবে। পানীয় না হলে পার্টি হয় না, তার সঙ্গে প্রচারনৃত্য দেখতে হয়।

হাসলে দুলু বোস।

বিমল একটু চুপ করে থেকে বললে—জীবনে সংসারী হবার চেষ্টা করেন না কেন দিলীপবাবু?

নিভে-যাওয়া সিগারটা আবার ধরিয়ে দুলু বোস উপরের দিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছেড়ে বোধ হয় ভেবে নিয়ে উত্তর দিলে—সংসারে কোন মেয়েকে দু দিনের বেশী তিন দিন ভালবাসতে পারি না বিমলবাবু। প্রথম দিন নেশা ধরায়, তারপর দিন সে নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠি, দুদিন তাকে ভালবাসার ভানে ভোগ করার পর তৃতীয় দিন সকালে সে নেশার একবিন্দু আর অবশিষ্ট থাকে না। নিজের উপরেও ঘৃণা জন্মে যায় দিন কয়েকের জন্যে. সে কয়েক দিন কৃচ্ছ্রসাধন করি, তারপর আবার মেতে উঠি নূতনের নেশায়।

বিমল বললে—এ সম্ভবত এক ধরণের ব্যাধি।

—তাতে সন্দেহ নেই। এ থেকে আমার পরিত্রাণ নেই বিমলবাবু। যাক্—তারপর শুনুন। গোপেনদা হাল ছেড়ে দিলেন। আমি নিজেই গোপেনদাকে বললাম—আমার উপর আর পণ্ডশ্রম করবেন না; তবু গোপেনদা সংস্রব ছাড়লেন না। এই মেস করে দিলেন। বললেন—একটা উপকার হবে আমার। কারও গা-ঢাকা দিয়ে থাকার দরকার হলে—নিরাপদেই থাকতে পারবে। সামনে বাঈজীরা থাকে, মেসের বাসিন্দারা রীতিমত বাবু লোক, মালিক দুলু বোস—চট করে নজর কারও পড়বে না। এখানকার বিখ্যাত গুণ্ডারা খেলোয়াড় দুলু বোসকে জানে—তার গায়ের শক্তি, ঘুষির জোরের কথাও জানে, টাকাপয়সার ব্যাপারে দিলদরিয়া মেজাজের কথাও জানে, ভালবাসে, ভক্তি করে, ভয় করে; কাজেই তারা আমাকে জানায় কে কোথায় উঁকিঝুঁকি মারছে। এই অবস্থায় এক দিন ম্যাগী নিয়ে এল কেটিকে। রোগা-কালো মেয়েটাকে প্রথমে গ্রাহ্য করি নি। কিছুদিন যেতেই মেয়েটা স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে আমাদের সচকিত করে তুললে। মিহিরবাবু এখানে আসেন যান—তিনি প্রথম বললেন—দিলীপবাবু এ ফিরিঙ্গী মেয়েটা তো সন্দেহের কারণ হয়ে উঠল। আমার পিছনে ঘুরছে। সেইদিন সন্ধ্যের সময় আমি চৌরঙ্গীতে একটা হোটেলে ঢুকছি—দেখলাম মেয়েটা হোটেলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে—লক্ষ্য আমি। মিহিরের কথাটা মনে পড়ে গেল। সন্দেহ হল, মেয়েটা বোধ হয় পুলিশের স্পাই। মিহির আসে, যাসে অবশ্য বাড়ীওয়ালার বন্ধুপুত্র হিসেবে, ঘরভাড়া দেওয়া-নেওয়ার অজুহাত নিয়ে। কিন্তু পুলিশের দৃষ্টি অদ্ভুত তীক্ষ্ণ। দুলু বোস আজকাল প্রতিটি সন্ধ্যা হোটেলে গেলাস রেখে বসে থাকে, ট্যাক্সীতে তাকে তরুণী সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে দেখা যায় কিন্তু একদিন সে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছিল। পুলিশের সন্দেহ করাই স্বাভাবিক। মেয়েটা ফিরিঙ্গী, ঘুরছে মিহির এবং আমার পিছনে, কাজেই ওই কথাটাই মনে হল। হোটেলে ঢুকলাম, কেটিও ঢুকল। সারাক্ষণ আমাকেই লক্ষ্য করলে। আমি উঠলাম, ও-ও উঠল, বেরিয়ে এসে ট্যাক্সীতে উঠছি, কেটি পিছনে এসে দাঁড়াল। বললে—

আমায় একটু সঙ্গে নেবে ? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে কঠিন ভাবেই বললাম—কেন বল তো ? ও বললে—আমাকে কি তুমি চিনতে পারছ না ? আমরা একই বাড়ীতে থাকি। আমায় সঙ্গে নিলে একসঙ্গেই বাড়ী ফিরতে পারব। উপেক্ষা করেই চলে এলাম। ট্যাক্সীটা ছাড়ছে সেই সময় ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর চোখ জ্বলছে। এসে জগুকে বললাম, জগু-গুণ্ডাকে চেনেন তো ? এখানে কালীতলায় সিঁদুরের টীপ পরে বসে থাকে। সে আর করিম—এরা দুজন হল এ অঞ্চলটির মালিক। ওদের বললাম—ওর পিছনে থেকে খবর নিতে। খবর জগুরা দিতে পারলে না—দিলে কেটি নিজেই। কয়েকদিন পর একদিন রাত্রে—ম্যাগীর চীৎকার আর হুটোপুটি শব্দ শুনে ছুটলাম ছাদে, দেখলাম একটা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কেটিকে নির্মম ভাবে ঘুষির পর ঘুষি মেরে চলেছে। আমি তাকে ধরলাম, সে আমাকে আক্রমণ করলে—লোকটা শক্তিমান কিন্তু মাতাল, আমি শক্তিতেও তার চেয়ে কম ছিলাম না—তার উপর সেদিন পানীয় পান করেছিলাম মাত্রা রেখে। লোকটা কয়েক মিনিট পরেই শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে ভাল করে দেখলাম লোকটাকে, চেনা লোক, ফুটবলের মাঠে হামফ্রেও নাম-করা হাফব্যাক। মারামারিতে সিদ্ধহস্ত। আমার সঙ্গে মাঠে দু'দশবার শক্তিপরীক্ষা হয়ে গেছে; হামফ্রেও আমাকে চিনলে। বললে—বোস তুমি ? তুমি এখানে ? সে মার্জনা চেয়ে নেমে চলে গেল। আমি নীচে নামতে যাচ্ছি কেটি এসে আমার হাত ধরলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। একটু মায়া হল বিমলবাবু। ঘরে এসে বসলাম। মেয়েটা হঠাৎ পরিষ্কার বাংলায় বললে—বোস, তুমি এত নিষ্ঠুর কেন ?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—তুমি বাংলা এত ভাল বলতে পার ?

কেটি বললে—আমি কেটি নই বোস—আমি কেতকী। আমি কৃশ্চান কিন্তু ফিরিঙ্গী নই। আমি বাঙালীর মেয়ে।

সতের

দুলু বোস কাঠের দেওয়ালের ছোট জানালাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে—সে দিন ছিল শরৎকালের জ্যোৎস্নার রাত্রি। কেটি বললে—বোস, তুমি পাঁচ মিনিট বস। ম্যাগীর ঘরে গিয়ে কয়েক মিনিট পরে সে ফিরল—একেবারে বাঙালী মেয়ের পোষাকে। সাদা ব্লাউজ সাদা মিলের শাড়ী, পায়ে স্লিপার, কপালে কুমকুমের টিপ, মাথার চুলটা অবশ্য বব করা কিন্তু তাতেও সামনের দিকটায় নিখুঁত বাঙালী ছাঁদ। বললে—দেখ তো বোস আমি কেতকী কিনা ?

চোখে আমার নেশা ধরে গেল। সাদা শাড়ীর বেষ্টনীর মধ্যে শ্যামলা রঙের চিরকেলে মিষ্টি বাঙালী মেয়ে।

কেটির সঙ্গে সে অভিসারের রাত্রি আমার চিরদিন মনে থাকবে। হুড খোলা ট্যাক্সী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ডায়মণ্ডহারবারে একটা দোলনায় বসে দোল খেতে খেতে ওকে

বললাম—কেতকী তুমি এমন হলে কেন ?

কেতকী বললে—আমার পোড়াকপাল বোস—আমি হতভাগী !

সম্ভ্রান্ত দেশী কৃশ্চান ঘরের মেয়ে। বাপ একটা বিলাতী ফার্মের একজন ছোট সাহেব। কেতকী তখন বি-এ পড়ছে। কুমকুমের টিপ পরে বেণী ঝুলিয়েই কলেজে যায়। কলেজের সভা-সমিতির পাণ্ডা। সভা-সমিতিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে। গান গায়। নিজেই ও নিজেদের কয়েকজন অন্তরঙ্গের মধ্যে আইন করেছিল—বাংলা কথা বলবার সময় যে ইংরিজী শব্দ ব্যবহার করবে—তাকে প্রতি শব্দের জন্য এক পয়সা জরিমানা দিতে হবে। সেই সময় হঠাৎ ঘটল এক কাণ্ড। ওদের কলেজের একটা অনুষ্ঠানে এলেন ছোটলাট-মহিষী। সেপাই এল, সান্ত্রী এল, তাদের সঙ্গে এল একজন তরুণ ইংরেজ পুলিশ কর্মচারী। আই-পি। লাটসাহেবের মেম যাবেন—দুধারে পাহারা পড়েছে, পরিষ্কার পথ, সেই পথে একটি মেয়ে ব্যস্ত ভাবে ঢুকে কোন কাজে যাচ্ছিল। ছোকরা সাহেব—তার হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিলে। মুহূর্তে কেতকী এসে তার সামনে দাঁড়াল। রূঢ়ভাবে প্রতিবাদ করলে। ওকে বৃটিশ সিংহশাবক—তার উপর বৃটিশ ভারতের আই-পি, টেগার্টের উত্তরাধিকারী—সে কালো মেয়ের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করবে কেন ? সে ওকেও দিলে টেনে সরিয়ে। কেতকী চীৎকার করে বললে—এ অপমানের প্রতিবাদে আমরা এ সভা ছেড়ে চলে যাব। এস, সব বেরিয়ে এস। বেরিয়ে কেউ গেল না। কালটা তখন মেয়েদের পক্ষেও ভয়ঙ্কর হতে সুরু করেছে। বীণা দাস কনভোকেশনে গুলী ছুঁড়েছে। প্রীতিলতা—চাটগাঁয়ে গুলী খেয়ে মরেছে. মেয়েদের জন্যে জেলখানায় পলিটিক্যাল ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েও সকলে মাথা হেঁট করে যে যার জায়গায় বসে রইল ; তাদের চোখের উপর সাদা পোষাকে বাঙালী আই-বি বাবু নাম টুকবার জন্যে খাতা পেন্সিল বের করেছে—একা কেতকীই বেরিয়ে এল।

কেতকীর বাপ চটলেন। বললেন—আমরা কৃশ্চান সমাজ নিরপেক্ষ রয়েছি। না থেকে আমাদের উপায় নেই। তুমি এ কি করে এলে ?

কেতকী বললে—এই অপমান সইতে হবে ?

—নিশ্চয় না। তার প্রতিকার হত। আমরা সভা করে এর প্রতিবাদ করতাম।

কেতকী এ কথার কোন উত্তরই দিলে না। বাপের দিকে একবার বিশ্রী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল রাস্তার দিকের বারান্দায়। বাপ পিছনে পিছনে এসে বললেন—তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায় ?

—আই-বি আপিসে। ডি-আই-জির কাছে নিয়ে যাব। আমাদের বড়সাহেব একটা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন। এ্যাপলজি চাইতে হবে তোমাকে।

কেতকী বললে—না।

—না ? জানো এর ফল কি হবে ?

কি ফল হবে সে কল্পনা করতে হল না ; ঠিক সেই নাটকীয় মুহূর্তটিতেই একখানা মোটর এসে দাঁড়াল ওদের বাড়ীর সামনে। সেই মোটর থেকে নামল সেই তরুণ বৃটিশ সিংহশিশু।

বাপ ব্যস্ত হয়ে নেমে গেলেন। কেতকীর বুকটা মুহূর্তের জন্ম কেঁপে উঠল, কিন্তু সে নিজে স্থির দৃঢ় করে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলে। ধীর পদক্ষেপে সে ঘরে ঢুকল। প্রতীক্ষা করে রইল—পুলিশের আহ্বানের। আহ্বান এল, বাপ হাসিমুখে ব্যস্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকে বললেন —কেটি শিগগির! শিগগির! কাপড়টা পাল্টে মাথাটা একটু আঁচড়ে আয় মা। মিস্টার মরিসন এসেছেন তোর সঙ্গে দেখা করবেন, ক্ষমা চাইবেন।

কেতকী কাপড় পাল্টালে না, চুল আঁচড়ালে না, সে সেই পোষাকেই এল। বিদ্রোহিনীর মন এবং রূপ নিয়েই এল। মরিসন উঠে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা করে সবিনয়ে বললে—আমি সেদিন অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করেছিলাম। আমি জানতাম না যে আপনি ক্রিশ্চান। আমি ভেবেছিলাম কোন হিন্দু মেয়ে, যারা নাকি আজকাল সন্ত্রাসবাদীদের দলভুক্ত।

কেতকী তিক্ত হাসি হেসে বললে—কিন্তু তারাও মেয়ে। প্রাপ্য সম্মান তাদেরও প্রাপ্য।

মরিসন ওদিক দিয়েই গেল না। সে বিনত ভাবেই বললে—আপনি বিশ্বাস করুন মিস্ চৌধুরী, আমি অত্যন্ত লজ্জিত। কর্তব্য বড় কঠোর। সকল সময়ে মেজাজ ঠিক রাখা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আমরা পুলিশের চাকরি করি কিন্তু আমারাও মানুষ। কঠোর পরিশ্রম, নানা ধরণের মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করা—এ যে কি বিরক্তিকর আপনি অনুমান করতে পারবেন না মিস্ চৌধুরী। আর আমরা কি করব? হিন্দু মেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী—তারা কনভোকেশনে গুলী ছোঁড়ে। হয়তো এমন মেয়ে হাজারে একটা কিন্তু আমাদের নজর রাখতে হয় হাজার জনের উপরেই। হাজার জনের যে কেউ ও একজন হতে পারে।

কেতকীর বাপ মরিসনের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কেতকীর মা চা কেক টোস্ট ডিম এনে টেবিলের উপর সাজিয়ে দিলে। মরিসন বললে—মিস্ চৌধুরী ক্ষমা না করলে আমি খাব না।

কেতকীকে ক্ষমা করতে হল। শুধু তাই নয় ওই এক প্লেট থেকে খাবারের অংশ নিতে হল। মনে মনে স্বীকার করতে হল মরিসনের যুক্তিকে। এমন মেয়ে হাজারে হয়তো একটা কিন্তু ওদের যে নজর রাখতে হয় হাজার জনের প্রত্যেকের উপর, সন্দেহ করতে হয় প্রত্যেককে। হাজার জনের যে কেউ ওই একজন হতে পারে।

মরিসন গল্প বলে আসর জমিয়ে তুললে। স্বল্পকালের পুলিশ জীবনের কয়েকটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার গল্প বললে সে। চমৎকার গল্প বলতে পারে তরুণ পুলিশ কর্মচারীটি! শুধু তাই নয়—পরদিন সন্ধ্যায় মরিসন পুলিশের পোষাকে না এসে সাধারণ ভদ্রলোকের পোষাকে ওদের বাড়ী এসে প্রমাণ করে দিলে সে প্রিয়দর্শন তরুণ।

মরিসন সেদিন অকপটে স্বীকার করে গেল কেতকীর মত তেজস্বিনী মেয়ে সে বিলাতে খুব কম দেখেছে। এবং তার এই তেজোদৃপ্ততার মধ্যে এমন একটি মনোমুগ্ধকর রূপ আছে যে রূপ অপার্থিব।

ভদ্র ভাবে একটু লজ্জার সঙ্গেই বললে—মিস্ চৌধুরী, আশা করি আমার কথায় কোন

অন্যায় অর্থ আপনি করবেন না। বার বার আমার মনে হয়েছে আমি যদি চিত্রকর হতাম তবে আপনার রূপের সেই মুহূর্তের ছবি এঁকে রাখতাম।

ভাদ্র মাসের বর্ষণমুখর রাত্রির সন্ধ্যেটা কেয়াফুলের মতই কেতকী স্নিগ্ধ মনোরমা হয়ে উঠল।

তারপর? তারপর কেতকী সাজলে কেটি।

চুল ছাঁটলে বব করে। লিপস্টিক রুজ পাউডারে বেশভূষার ভঙ্গিতে সে পুরোদস্তুর মেমসাহেব হয়ে উঠল। ইংরেজীতে কথা বলতে সুরু করলে। কেটির মা-বাপ আশান্বিত হয়ে উঠলেন মরিসনের প্রত্যাশায়। মরিসনের সঙ্গে চৌরঙ্গীপাড়ায় ঘুরতে লাগল কেটি।

হঠাৎ মরিসন দীর্ঘকালের ছুটি নিয়ে একদা জাহাজে চেপে বসল। সকলের অজ্ঞাতসারেই অবশ্য। কেটিরও অজ্ঞাতসারে। কেটি তখন অন্তঃস্বত্বা। সংবাদ যখন জানলে তখন তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

বাপ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবার, কেটির উপরেই ক্ষিপ্ত হলেন। মা কপাল চাপড়ালেন, গাল দিলেন মেয়েকে—মরে যা—মরে যা তুই।

কেটি গেল পুলিশের একজন বড়কর্তার কাছে, ইংরেজ বড়কর্তা। তিনি বললেন—দেখ আমাদের সব সংবাদ রাখতে হয়। তোমার এবং মরিসনের খবরও আমার অজানা নয়। কিন্তু মেলামেশা ঘোরাফেরা তো তোমার একা মরিসনের সঙ্গেই আবদ্ধ ছিল না মিস্ চৌধুরী! এমন কি বিখ্যাত মুসলমান পুলিশ অফিসার মিঃ সামসুদ্দিনের সঙ্গেও তোমাকে ট্যাক্সীতে ঘুরতে দেখেছে লোকে। তুমি না বলতে পার না।

কেটি পুলিশ অফিসে সংজ্ঞাহীনের মত বসে ছিল কিছুক্ষণ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সে নীরবে উঠে চলে এল। প্রতিবাদ করে বললে না—সামসুদ্দিনকে মরিসনই অনুরোধ করেছিল—তুমি অনুগ্রহ করে তোমার গাড়ীতে কেটিকে পৌঁছে দেবে? সামসুদ্দিন বলেছিল—আনন্দের সঙ্গে। কেটি রাজী হয় নি। মরিসন বলেছিল—লক্ষ্মীটি! আমার কাজ রয়েছে। তুমি জান কেটি পুলিশের কত কাজ। গাড়ীতে সামসুদ্দিন তার অভিপ্রায় ইঙ্গিতে প্রকাশ করলেও মুখে কথায় ব্যক্ত করতে সাহস করে নি। কেতকী সংযত ভাবে মহীমময়ীর মত বসেছিল।

তারপর?

তারপর—গৃহত্যাগ। তারপর ভ্রূণহত্যা।

তারপর—আত্মগোপন করে নিষ্ঠুর আক্রোশে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মৃত্যু ওকে গ্রহণ করে নি। হাসপাতাল থেকে ফিরে এল। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল। আদালত ওর কাহিনী শুনে ওকে সতর্ক করে ছেড়ে দিলে।

তারপর ধাপে ধাপে পিছলে পড়ে কেটি এসেছে এইখানে। ম্যাগীর পাশের ঘরে।

কেটি সেদিন রাত্রে কেতকী হয়ে ফুটে উঠেছিল ডায়মণ্ডহারবারের গঙ্গার কূলের কেয়াফুলের মত—জীবনে এ তার দ্বিতীয় দিন ফোটা।

সেদিন কেতকী দিলীপ বোসকে বলেছিল—তুমি কি আমাকে তোমার বাড়ীর দাসীর

মত থাকতে দেবে ?

ডুলু বোস বললে—বিমলবাবু, আমি ওকে বলেছিলাম—কেতকী, তুমি আমি এই মহানগরীর বলি। আমাদের ঘর বাঁধার নয়। আমাদের ঘর ভেঙে মহানগরী বাড়ে।

মহানগরীর বলি। বিমলবাবু আমরা মহানগরীর বলি।

ডুলু বোসের সেই কথা কটি বিমলের কানে অহরহ বাজতে লাগল। ডুলু বোসের কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাস ছিল না, মুখের অভিব্যক্তিতেও না, সে বরং হেসেই কথাটা বলেছিল। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত চলে যাওয়ার সঙ্গে ডুলু বোসের কণ্ঠস্বর যেন করুণ থেকে করুণতর হয়ে উঠতে লাগল বলে বিমলের মনে হতে লাগল। শুধু তাই নয়, ডুলু বোসের কথা কটি যেন মহানগরীর আকাশে বাতাসে কর্মমুখর কলকোলাহলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে হল।

নীচে রিক্সাওয়ালাদের আড্ডায় বোধ হয় বচসা চলছে; ক্রুদ্ধ চীৎকারের মধ্যে সে শুনতে পেলে ওই কথা! আমরা মহানগরীর বলি।

মেসের ঘরে গান ধরেছে—গানের ভাষা ভাল বুঝা যাচ্ছে না; চট্টগ্রামের ছেলে, কথায় চট্টগ্রামের টান বড় বেশী; তবে সুর শুনে মনে হয় কোন উদ্দীপনাময় গানের সুর। বিমলের মনে হল তার মধ্যেও ওই কথা কয়টি ধ্বনিত হচ্ছে। 'মহানগরীর আমরা বলি'

ও পাশের বাঈজীদের ঘরে আজ ধনী অতিথি এসেছে। বিকেলবেলা থেকে সমারোহ পড়ে গেছে। হিন্দুস্থানী চাকরটা বিশবার এল উপরে, দোকান থেকে পান, জর্দা, সিগারেট, বেলফুলের মালা, সোডা, লেমনেড, খাবার, বরফের চাই কিনে এনে ছাদের এই রান্নাঘর থেকেই ট্রে থালা বের করে সাজিয়ে নিয়ে গেল। সারেঙ্গী বাজছে, তবলা বাঁধা হচ্ছে, মধ্যে মধ্যে ঘুঙুর নাড়ানাড়া হচ্ছে; তার মধ্যেও ওই কথা।

মহানগরীর লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রবৃত্তির ক্ষুধার তৃপ্তি হেতু বলি চাই—এরা তাই! একটি ভাববিচলিত মুহূর্তে বিমলের মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই উপলব্ধি চীৎকার করে উঠল, তারই প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল কলকাতার কলরব কোলাহলের মধ্যে। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা। দিবা দ্বিপ্রহরে বিদেশযাত্রার আয়োজন যখন প্রস্তুত—তখন অবুঝ বালিকা কন্যা এসে কাতরভাবে বলল—যেতে দেব না, যেতে নাহি দিব। স্নেহ-কাতরতার পবিত্র বেদনায় মুহূর্তে পিতা শুনতে পেলেন ধরিত্রীর আর্তনাদ—যেতে নাহি দিব; তুচ্ছ তৃণটির জন্যও ধরিত্রীর যে বেদনাময় ক্রন্দন, বিরাট বনস্পতির জন্যও ঠিক সেই ক্রন্দন। এই ক্রন্দন ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তির মধ্যে পরিধির মধ্যে আর কোন ধ্বনি নাই আর কোন অভিব্যক্তি নাই। বিমলের কাছেও মহানগরীর সকল আয়োজন—সমস্ত পরিধির মধ্যে ঠিক তেমনি—আজ এই মুহূর্তে ওই কথাটিই অবিরাম ধ্বনিত হয়ে চলেছে।

একটা গভীর যন্ত্রণায় সে যেন পঙ্গু হয়ে পড়েছে। মনে পড়ল বৎসর কয়েক আগে দেশে একদা রাত্রে গ্রামপ্রান্তে বাউড়ীপল্লীর মধ্যে প্রচণ্ড কোলাহল শুনতে পেয়ে ছুটে গিয়েছিল সেখানে; মদ খেয়ে নেশায় উন্মত্ত বাউড়ীদের ঝগড়া হচ্ছিল—লাঠি কাটারী দা নিয়ে ঝগড়া;

ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করেছিল সে—তার ফলে একজন নেশায় উন্মত্ত বাউড়ী প্রতিপক্ষ ভ্রম করে তার গলা টিপে ধরেছিল। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল; সেই যন্ত্রণার কথা মনে পড়ল। সে ভেবে পেলে না কোথায় গেলে সে মুক্তি পাবে—শান্তি পাবে।

ভেবে পেলে না, তবু সে বেরিয়ে পড়ল। এখানে সামনে তার কেটির ঘর, পাশে ম্যাগী একটা কম-জোরের চিমনী জেলে বসে আছে। কেটির ঘরে ইলেকট্রিক কনেকশন আছে কিন্তু ম্যাগীর ঘরে নাই। চিমনীর রক্তাভ আলো ম্যাগীর মুখের উপর পড়েছে, বার্ধক্যের রেখা-জর্জর পাণ্ডুর মুখ ঘোলাটে চোখ। মনে পড়ে গেল কালীপূজার রাত্রি। কার্ত্তিক মাসের শেষ রাত্রে হাড়িকাঠে বাঁধা বলিগুলির কথা। পাটকাঠির লাল আলোর সামনে ভিজে গায়ে অন্যান্য বলির মধ্যে বলির মেষটা ঠিক এমনি চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায় রাস্তায়। রাজপথের উপর হঠাৎ নজরে পড়ল একটা ট্যাক্সী। ট্যাক্সীতে অরুণা আর পিনাকী। হাসি লেগে রয়েছে দুজনের মুখেই। দুজনেই মহানগরীর প্রসাদ পেয়েছে। বিমল মনে মনে মহানগরীকে প্রণাম জানায়।

গ্রন্থ-পরিচয়

'মহাশ্বেতা'

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিণত বয়সের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর 'মহাশ্বেতা' উপন্যাস। তাঁর 'কবি', 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' এবং 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' এবং 'রাধা' ও 'মঞ্জরী অপেরা' প্রভৃতি অতি-খ্যাত উপন্যাস-গুলির আড়ালে 'মহাশ্বেতা' উপন্যাসের রসমাধুর্য ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

যে কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনাশৈলী লক্ষ করলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে অন্যতম হোলো বারেবারেই লেখক লেখার ঢং পাল্‌টে দিয়ে বৈচিত্র্যের সুর নিয়ে আসেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। বিভিন্ন বয়সে—বর্ষচক্রের বিভিন্ন ঋতুর মতো—বিভিন্ন লেখকের রচনাশৈলীতে পালাবদল ঘটে। কবি বা সাহিত্যিক যদি দীর্ঘজীবী হন—তবে তাঁর রচনার পালাবদলের চিহ্ন সহজেই পাঠকের চোখে পড়ে।

তারাশঙ্কর প্রচলিত অর্থে দীর্ঘজীবী ছিলেন। বাঙালীর পক্ষে তিনি জীবনের শেষেও সচল এবং কর্মিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁর হাতের কালি শুকিয়ে যায় নি। তিনি শুধু রাঢ়ের লাল মাটি ও শাল-মহুয়ার বন আর বাগ্‌দি-বাউড়ী-ডোমদের কাহিনী রূপায়ণের মধ্যে নিজেকে সীমায়িত করেন নি। তিনি আজীবন (অর্থাৎ সাহিত্যজীবনের পরিধি) নানা ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁর রচনাশৈলীর মধ্য দিয়ে। তিনি রাঢ়ের আউল-বাউল-দরবেশ-সহজিয়া এবং বৈষ্ণবদের আখড়ার তুলসীমঞ্চ ও মাটির প্রদীপ এবং সন্ধ্যা-আরতির মঙ্গল-শঙ্খের সুমিষ্ট ধ্বনি যেমন শুনিয়ে মুগ্ধ করেছেন—আবার পরিণত বয়সে শহর ও শহরতলীর নানা সমস্যা তুলে ধরেছেন নির্মোহ দৃষ্টিতে। 'মন্বন্তর' থেকে যার শুরু। তারপর নগরীর পঙ্কিল ও বিষাক্ত চিত্র বারে বারে ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। নগরীর চোখধাঁধানো আলোর আড়ালে সে বিষ ও অমৃত রয়েছে সে কথাও শুনিয়েছেন। তারাশঙ্করের গ্রামীণ সাহিত্য শহুরে সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করেছে এটা মিথ্যে কথা। তারাশঙ্করের সমগ্র সাহিত্য-সম্ভার বিচার করলে দেখা যাবে—তাঁর রাঢ়ের আঞ্চলিকতা নিয়ে সৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে নগর-নির্ভর সাহিত্যের পরিমাণও কম নয়।

নগরীর রূঢ় ও রূক্ষ জীবনচর্যার কথা কড়াসুরেই তিনি শুনিয়েছেন। কিন্তু তিনি ক্ষুরের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছেন--নিজের কলমের কালিকে কর্দমে লিপ্ত করেন নি।

'মহাশ্বেতা' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৬৭ (ইং ১৯৬০) সাল। ইম্পিরিয়াল সাইজ, পৃ. ৬+১+২৯৮। বোর্ডবাধাই ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদপট। প্রচ্ছদপট-শিল্পী কানাইলাল পাল। প্রকাশক: শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

উৎসর্গপত্র নিম্নরূপ:

"শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রীতি ও স্নেহভাজনেষু"

'মহাশ্বেতা' উপন্যাসের শেষ সংস্করণ থেকে 'তারাশঙ্কর-রচনাবলী'র সপ্তদশ খণ্ডের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

তারাশঙ্কর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে অনেক গান লিখেছেন। সম্ভবত তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ত্রিপত্র' ছাড়া আর কোনো গান বা কবিতার বইয়ের সংকলন বের হয় নি। তারাশঙ্করের রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, লোকসংস্কৃতি ও লোকসঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর গান ও রচনা সমসূত্রে বাঁধা। তিনি নিজে ধরা না দিলে অনেক সময় মনে হয় অজয়ের তীরে কেঁদুলীর মেলায় শোনা কোনো গান তিনি তুলে এনে তাঁর বইয়ে বসিয়ে দিয়েছেন। উপরোক্ত গানটির যে তিনিই রচয়িতা—তাঁর রচনার মধ্যেই তা ধরা পড়েছে।

শিবনাথ নামের আড়ালে তারাশঙ্কর নিজেকে পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন। তাঁর অনেক গল্পে শিবনাথ নাম পাওয়া যায়। সেগুলি প্রায়ই নিজের জীবন থেকে নেওয়া কাহিনী। বিভূতিভূষণ যেমন শঙ্কর নামের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন।

তারাশঙ্কর সম্ভবত অল্প বয়স থেকেই চিত্রবিদ্যার কিছু কিছু চর্চা করতেন। তাঁর সহজাত প্রতিভার স্ফুরণ আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতোই শেষ বয়সে দেখতে পেয়েছি। 'মহাশ্বেতা' গ্রন্থেও পিতামহ শিবনাথের পরিচয় প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী হিসেবে। তিনি চিত্রশিল্পী হলেও, কিন্তু শিল্পীমানসের অতৃপ্তি দেখতে পেয়েছে নীরা যখন তিনি তাঁর শিল্প-সাধনার পীঠ-স্থান স্টুডিও (studio)-তে ক্যানভাসের সামনে রঙ ও তুলি নিয়ে এসে দাঁড়ান। জাতশিল্পী চিরদিন অতৃপ্ত। তারাশঙ্কর তাঁর 'মহাশ্বেতা' উপন্যাসে শিবনাথের মুখ দিয়ে শিল্পীর এই মহা অতৃপ্তির কথা নিজেই বলেছেন :

"একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, যা আঁকতে চাই তা যে কল্পনা করতে পারছিনে। নীরা, সংসারে রূপ অপরূপ। অনেক এঁকেছি। দেখেছি, এঁকেছি। অরণ্য এঁকেছি, পাহাড় এঁকেছি, সমুদ্র এঁকেছি, আকাশে সূর্য চন্দ্র, সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, প্রতিপদ পূর্ণিমার চাঁদ এঁকেছি, লতা গাছ ফুল মানুষ, মা প্রিয়া পূজারিণী বিধবা, শিশু যুবক বৃদ্ধ, অনাথ বিদ্রোহী প্রেমিক, মৃত্যু ভারাক্রান্ত, মৃত, সদ্য প্রসূত, দেখলাম আর আঁকলাম। ঝড় এঁকেছি, আলো এঁকেছি, অন্ধকার এঁকেছি। বুদ্ধ এঁকেছি, ক্রাইস্ট এঁকেছি, গান্ধী এঁকেছি, রবীন্দ্রনাথ এঁকেছি, সুভাষচন্দ্র এঁকেছি। অনেক নাম, অনেক যশ, তার সঙ্গে অর্থও অনেক পেয়েছি। কিন্তু নিজে কি আঁকলাম? অথবা এসবের পিছনে যিনি বা যা একটা কিছু তাকে কই আঁকলাম? পাচ্ছি না তাকে। যা বা যিনি মধ্যে এসব আছে, সেই বিশ্বরূপ। কিসের শিল্পী আমি নীরা, তাঁকে আমি কল্পনা করতে পারিনে, তাঁকে আঁকতে পারিনে। মিছে—আমার সব মিছে হয়েছে। তাই তুলি ফেলে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শুধু ভাবি, আর কাঁদি আমি নীরা।" তারাশঙ্কর-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, 'মহাশ্বেতা'।

উপরোক্ত পংক্তিগুলির মধ্যে শিল্পীর অন্তরবেদনা ও অতৃপ্তির বর্ণনা তারাশঙ্কর করেছেন তাঁর অননুকরণীয় সহজ ভাষায় সহজ ভাবে।

* * *

'মহাশ্বেতা' উপন্যাসের মুখ্য নায়িকা নীরা। পার্শ্বচরিত্র হিসেবে আরো কয়েকটি মহিলা

চরিত্র তারাশঙ্কর এঁকেছেন ঘটনার নাটকীয়তা পরিস্ফুটনের জন্যে। যেমন জ্যাঠাইমা, সম্পর্কিতা বোন হেনা ও বউদি এণাক্ষী।

নীরা আজন্ম ভাগ্যবিড়ম্বিতা ও নানা আঘাত ও প্রতিঘাতে জীবনের যে মহাসম্বল বিশ্বাস ও ভালোবাসা—তার স্পর্শ থেকে সে বঞ্চিত। ভাগ্য ও নিয়তি তার সঙ্গে নিষ্ঠুর খেলায় রত। নিতান্ত অল্প বয়সে হেনার চটুলতা ঢাকা দেবার জন্যে হেনার দোষ সে নিজের ঘাড়ে নিয়েছে। তার বিয়ের আয়োজন এবং বিয়ের আসর থেকে থানায় গিয়ে আশ্রয়লাভের মধ্যেও নিয়তির নিষ্ঠুর হাতের খেলা দেখতে পাওয়া যায়। তারপর সদানন্দ বৃদ্ধ শিল্পীর গৃহে কিছুদিনের জন্যে আশ্রয়লাভ—তার নিরতিশয় নিরস জীবনে কিছুটা স্নেহ ও প্রীতি এবং ভালোবাসার স্পর্শ এনে দিয়েছিল। তারপর বিনো সেনের আশ্রমে আশ্রয়গ্রহণ। কিন্তু বিনো সেনের সঙ্গে প্রতিমার সম্পর্ক সে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখেছে এবং পরবর্তীকালে বিনোর ভালোবাসাকে ভুল বুঝে ও তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে একটা নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে সে আশ্রমের আশ্রয় ত্যাগ করেছে।

তারপর সে বিলেতে গিয়ে উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে এসেছে। মানসিক স্থৈর্য কিছুটা ফিরেছে। ইতিমধ্যে বিনোর যক্ষ্মা এবং প্রতিমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্বরূপ তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এবং তার ভুল বুঝতে পেরে সে আত্মগ্লানি অনুভব করেছে। বিনোকে সেবা প্রীতি ও ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে সে যৌবন-মধ্যাহ্নে মধুর রসের মাধুর্য আত্মোপলব্ধি করতে পেরেছে।

নীরা চরিত্রের মধ্যে তারাশঙ্কর নিয়তির হাতে বিড়ম্বিতা এক বহ্নিশিখার চরিত্র পরিস্ফুটন ঘটিয়েছেন। বিনো সেনের মনোভাবের মধ্যে দিয়ে স্বয়ং ঔপন্যাসিক 'মহাশ্বেতা' নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

"বিনো সেন টেবিলের উপর থেকে একখানা বই হাতে করে নিলেন—ঝকমকে বাঁধানো বই। বললেন—বইখানা পড়ছিলাম। বড় ভাল বই। সংস্কৃত সাহিত্যের অপরূপ রোমান্স। কবি বাণভট্টের কাদম্বরী। নায়িকা কাদম্বরী, উপনায়িকা 'মহাশ্বেতা'। আশ্চর্য চরিত্র মহাশ্বেতার। যাকে সে ভালবাসে—যে তাকে ভালবাসে, সেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার সেই ভালবাসার উত্তাপে দাহে।" 'তারাশঙ্কর-রচনাবলী,' সপ্তদশ খণ্ড, 'মহাশ্বেতা'।

'মহাশ্বেতা' তারাশঙ্করের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তারাশঙ্করের সাহিত্যরীতির সব রকম বৈশিষ্ট্যের প্রকাশই বইটিতে দেখতে পাওয়া যায়॥

'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে'

প্রখ্যাত সাহিত্যসাধক তারাশঙ্কর শেষজীবনে যে কয়েকটি নগর-নির্ভর উপন্যাস রচনা করেছিলেন—'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে' তার মধ্যে অন্যতম। তিনি শেষজীবনে

রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতই কয়েকটি নভেলেট বা ক্ষুদ্র উপন্যাস। রচনারীতির অভিনবত্বে কিম্বা রসোত্তীর্ণতার দিক থেকে 'সপ্তপদী' উপন্যাসটিই বোধ হয় সব চেয়ে সার্থক। কিন্তু একজন আর্টিস্ট ও একটি কালো মেয়ের ভীরু ভালোবাসার কাহিনীটিও শ্রেষ্ঠ কথাকারের লেখনীর যাদুস্পর্শে পাঠকের মনকে আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ করে রাখে।

তারাশঙ্কর যে কত বড় মাপের কথাসাহিত্যিক ছিলেন এই ছোট উপন্যাসটির মধ্যে তাঁর ডিটেলস-এর কাজ দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাঁর 'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে' উপন্যাসে আঁকা আনন্দ চরিত্রটি তাঁর লেখা এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত মহা উপন্যাস 'কীর্তিহাটের কড়চা'র পূর্বসূরী বলে মনে হয়। আনন্দ সেরকমই উচ্ছৃঙ্খল বেহিসেবী কিন্তু মানবধর্মে বিশ্বাসী। বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নেও তার সব ধর্মকে বিসর্জন দেয়নি—সব রকম বৈপরীত্যের মধ্যে জীবনযাপন করেও।

'সাতরঙ' সাময়িক পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যায় (বাংলা বৈশাখ ১৩৭০) 'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পুস্তক-আকারে প্রথম প্রকাশ: 'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে', প্রথম সংস্করণ: আশ্বিন ১৩৭০ (অক্টোবর ১৯৬৩)। পৃ. ৬+১১৫ ডবল ডিমাই সাইজ। প্রচ্ছদপট: পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রকাশক: স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়, বাক-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯।

'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে' তারাশঙ্কর উৎসর্গ করেছেন বিখ্যাত চলচ্চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ রায়কে। উৎসর্গ পত্রটি এইরকম:

"উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়

গৌরবান্বিতেষু

আপনি গুণী—প্রতিভাশালী গুণী শিল্পী। বাংলা ও ভারতবর্ষের জন্য পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের অভিনন্দন বহন করে এনেছেন। দেশ আপনাকে অভিনন্দিত করেছে। জীবনের অপরাহ্নে আমিও আপনাকে অভিনন্দন জানাই। ইতি—২১।৯।১৯৬৩"

Dolivery of Book Act 1954 আইন অনুযায়ী কলকাতার National Library-তে বইটির পঞ্জী-ভুক্ত হওয়ার তারিখ ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৩ (9 December 1963)। উপন্যাসটির বর্গসংখ্যা ও পুস্তক সংখ্যা যথাক্রমে B 891. 443 এবং V 554 ok)

উপন্যাসের পটভূমি ও বিষয়বস্তু যেন লেখকের চোখের ওপর ঘটেছে বোধ হয়। মনে হয়। কোনো বাস্তব-আশ্রিত ঘটনা লেখক উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। শিল্পী আনন্দ রায়ের চরিত্রটি লেখক অতি দরদ দিয়ে রচনা করেছেন।

উত্তর কলকাতার শহরতলীতে নায়ক-নায়িকা থাকে। দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পাড়া নয়। এখানেই একটি বিরাট পার্কের কৃষ্ণচূড়া ও শিমুলের ছায়ায় আচ্ছন্ন সুন্দর পরিবেষ্টনীতে একজন খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীর বাড়ী তৈরী হচ্ছিল। স্থানীয় লোকদের কৌতূহল ছিল অভিনেত্রী একদিন এখানে এসে বাস করবেন। তার বদলে এলেন একজন চিত্রশিল্পী। তাঁর নামও কম নয়। উপন্যাসটির ঘটনাকাল সম্ভবত ১৯৫৩—১৯৫৪ খ্রীঃ। কারণ দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের সময় মন্বন্তরের ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়েছিলেন শিল্পী জয়নাল আবেদিন। সেটা ১৯৪৩—১৯৪৪ খ্রীঃ।

শিল্পী আনন্দ রায় শৈশবে পিতৃহারা। দুই ভাই এবং মা উঠেছিলেন পিত্রালয়ে। আনন্দের দাদা অক্লেশে স্কুল ও কলেজ-এর পাট শেষ করে খড়্গপুরে রেল-এ ঢুকেছে। অথচ আনন্দ মাত্র দাদার থেকে তিন বছরের ছোট। বার-দুই ম্যাট্রিক ফেল করে প্রাইভেটে আবার পরীক্ষা দেবে বলে বাড়ীতে বসে আছে। ছবি পেলেই ছবি কপি করতো। প্রথমে শ্লেট-এ করতো। তারপর কাগজেও করতো।

সে-সময়েই পারিবারিক ঘটনা নিয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে গিয়ে তাকে মামার বাড়ী ছাড়তে হয়। বামপন্থীদের কাগজ তখন খুব ধুমধাড়াক্কা করে বের হয়েছে। সে ছবি সে কাগজে স্থানীয় বামপন্থী নেতারা ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। মামার বাড়ীর লোক রেগে আগুন। তার ওপর দৈহিক নির্যাতন করেছিলেন। সে পালিয়ে আসে কলকাতায়। বামপন্থী নেতাটি খুব সাহায্য করেছিলেন সে সময়। জয়নাল আবেদিনের প্রায় কাছাকাছি পেঁৗছে গিয়েছিল তার খ্যাতি। তারপর সে কালো ও সাদা ছেড়ে রঙের বাক্স হাতে নেয়। আজ সে খ্যাতিমান কমার্শিয়াল আর্টিস্ট আনন্দ রায়।

এক চৈত্রের অগ্নিঝরা রবিবারের অপরাহ্নে সে ঘুম ভেঙে উঠেছিল। আগের দিন রাতে আর্টিস্টদের দঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে পান ও ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। প্রচুর মদ খেয়ে গভীর রাতে ফিরেছিল আনন্দ। একটি ফিরিঙ্গী বিলাসিনী দেহপসারিণীকে দেখে তার মনে ঘৃণা ও কৌতূহল জেগেছিল। সারাদিন ঘুমের পর তার শরীর ও মন ছিল খুশীতে ভরা। সে আজ রবিবারও বাইরে যাবে মনে মনে ভেবেছিল। এমন সময় চড়ুই পাখীর দল ঘরে ঢুকে ডাকাডাকি ও হানাহানি শুরু করলো। চড়ুই পাখীর লড়াইয়ে একটি চড়ুই এসে আনন্দের মুখে নখ বসিয়ে দিল।

রোজই পড়ন্ত বিকেলবেলায় আনন্দের বাড়ীর সামনে দিয়ে একটি দীর্ঘদেহ মেয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে যায়। আনন্দ নতুন এসেছে এ পাড়ায়। তবুও কৌতূহল জাগে। কিন্তু কখনো মেয়েটির মুখ দেখতে পায়নি। ছাতার আড়ালে ঢাকা থাকে তার মুখ। চড়ুই পাখীর আক্রমণে বিপন্ন আনন্দ পাখীটিকে হাতের থাবায় নিয়ে মেরে ফেলতে গেল—এমন সময়েই আকস্মিক ভাবে মেয়েটির আবির্ভাব ঘটলো। মেয়েটি মধুর কণ্ঠে তাকে তার ক্ষত-স্থানে ওষুধ লাগাতে বললে। তারাশঙ্করের স্বকীয় বর্ণনাই তুলে দিচ্ছি: 'কালো লম্বা মেয়েটি—একটু শীর্ণা, লম্বাটে মুখ সরু কিন্তু টানা চোখ। ওই চোখের লম্বা টান এবং ওই এক রাশ দীর্ঘ চুল ছাড়া শ্রী কোথাও নেই। তবুও বেশ লাগল তাকে।"

এইভাবেই বিচিত্র রাগ-অনুরাগ সৃষ্টি হোলো কমার্শিয়াল আর্টিস্ট আনন্দ রায় ও শ্যামলীর মধ্যে। আনন্দ মনে মনে তার নাম রেখেছিল সুকৃষ্ণা। অনেক ঘটনার টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে তাদের প্রেম সার্থকতার পথ খুঁজে পেলো। নারীর প্রেম যে সর্বদা দেহনির্ভর নয়—কল্যাণী মূর্তির মধ্য দিয়েও আবির্ভাব ঘটে তার—সেই সর্বত্যাগী বিচিত্র প্রেমের আস্বাদনের মধ্য দিয়েই এই ছোট উপন্যাসটি হয়েছে সমাপ্ত।

*　*　*

'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে' উপন্যাসেও এই বিরাট শিল্পীর খেয়ালীপনার পরিচয় পাওয়া যায়। কালো মেয়েটিকে দেখে আনন্দের যে ভাব মনে হয়েছিল (সে কথা তারাশঙ্করই লিখেছেন এমনি ভাবে)—"গান সে গাইতে পারে না ! তবুও মৌজের মুখে—বেশ গলা ছেড়েই গান ধরেছিল :

'কালো তা সে যতই কালো হোক—
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।'

কিছুক্ষণ পর মনে পড়েছিল—কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে ? কালো কেশে রাঙা কুসুম—, না :—তারাশঙ্কর এখানে ফেল।" 'তারাশঙ্কর-রচনাবলী', সপ্তদশ খণ্ড, 'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে'।

*　*　*

"বাংলা 'কবি' বইটা তার খুব ভালো লাগে। তার কারণ কবির নায়িকা ঠাকুরঝি তারই মতো কালো মেয়ে। আর ভালো লাগে শরদিন্দুবাবুর একটি গল্প। তাতে ধনী বিদ্বান নায়ক ছদ্ম পরিচয়ে দুটি মেয়েকে পড়াতে এসে—সুন্দরটিকে ফেলে কালো মেয়েটিকেই পছন্দ ক'রে বিয়ে করলে। সে কালো মেয়েরও তারই মতো একরাশি চুল।" (তারাশঙ্কর-রচনাবলী', সপ্তদশ খণ্ড।

তারাশঙ্করের মহা উপন্যাস 'কবি' সম্পর্কে তাঁর মমত্ব ও দুর্বলতার পরিচয় উপরোক্ত কয়েকটি ছত্রে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথও নিজের নাম বারেবারেই তাঁর শেষ বয়সের উপন্যাস 'শেষের কবিতা'য় ব্যবহার করেছেন।

আরো কিছু আত্মজীবনীর উপাদান এ উপন্যাসটিতে আছে। তারাশঙ্করের টালা পার্ক অঞ্চলে বাড়ী করবার পর থেকে টালা-পাইকপাড়া এলাকায় দ্রুত সাহিত্যিক-উপনিবেশ গড়ে উঠতে থাকে। কিছু আগে পরে প্রথমেই এসেছিলেন সুহৃদ সজনীকান্ত দাস এবং তারপর শৈলজানন্দ, সুকবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রভৃতি। সার্থকনামা সাহিত্যগবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো অনেক সহিত্য-রসিক ওই অঞ্চলে বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। সজনীকান্ত দাস যতদিন জীবিত ছিলেন প্রায় প্রতিদিন 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে সকালবেলায় সাহিত্যিকদের জমাটি আড্ডা বসতো। মিত্র ও ঘোষ-এর বৈকালিক আড্ডার মতই তা ছিল আকর্ষণীয়। তারাশঙ্কর 'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে' উপন্যাসে এই অঞ্চলের সাহিত্য উপনিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন :

"…বাংলা বইয়ের সে ক্ষুধার্ত পাঠিকা, বই সে গোগ্রাসে গেলে। এ পথে ক'জন লেখক এসে বাড়ি করেছেন—বাসা নিয়েছেন। তাদের বাড়ির ধার দিয়ে যেতেও ভাল লাগে। মধ্যে মধ্যে দেখতেও পায়। কেউ বারান্দায় বসে থাকেন। কাউকে দেখা যায় জানালার মধ্য দিয়ে। কাছে যেতে বা গিয়ে আলাপ করতে সাহস পায় না।" ('তারাশঙ্কর-রচনাবলী,' সপ্তদশ খণ্ড, *একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে।*

বঙ্গাব্দ ১৩৫৫ সালের রথযাত্রার দিন টালা পার্কের বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ করেন তারাশঙ্কর।

এ যুগের একজন খ্যাতিমান সাহিত্য-সমালোচক ড: নিতাই বসু তারাশঙ্করের সমগ্র উপন্যাস রচনাসমূহকে দুটি কালের গণ্ডির মধ্যে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্বের উপন্যাস ও গল্প এবং দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস ও গল্প। দ্বিতীয় পর্বের গল্প ও উপন্যাসে তিনি দেখতে পেয়েছেন প্রধানত দশটি শাখায় ভাগ করা যায়। তার মধ্যে যুগমানসের প্রতিফলন বিষয়ক গ্রন্থ হোলো 'যোগভ্রষ্ট' ও 'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে'। ড: নিতাই বসু 'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে' তারাশঙ্করের গৌণ রচনা বলে মনে করেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "তারাশঙ্কর যথেষ্ট মাথায় আধুনিক নন, এই অভিযোগ মাঝে মাঝে লেখকের মনে একটা অভিমানের সৃষ্টি করত বলে মনে হয়। এই অভিমানই তাঁকে মাঝে মাঝে আধুনিক-ধর্মী রচনায় প্রবৃত্ত করে। 'সপ্তপদী' (পৌষ ১৩৬৪), 'যতিভঙ্গ' (বৈশাখ ১৩৬৯) এবং 'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে' (আশ্বিন ১৩৬৯) যার স্বাক্ষর।..."

"...শিল্পীর সমবেদনা নিয়ে তারাশঙ্কর তাকিয়েছেন সেই চরিত্রের অন্তস্থলে, আবিষ্কার করেছেন তার মুক্তির চাবিকাঠি। সে মুক্তির মন্ত্র রয়েছে সংবেদনশীলতায়। এ যুগের পথ-ভ্রান্ত তারুণ্যকে তারই চরিত্রের অন্তর্নিহিত বীজমন্ত্র দেখিয়ে দিয়েছেন তারাশঙ্কর।

একটি চড়ুই পাখির প্রতীক সৃষ্টি করে, তার প্রতি অনুকম্পা, রিরংসা এবং পুনশ্চ তারই প্রতি জিঘাংসা জাগিয়েছেন শিল্পী অপরিণামদর্শী তাৎক্ষণিকের পূজারী অন্তরে। আর সেই চড়ুইয়ের রক্তে স্নান করিয়ে পথভ্রান্ত তারুণ্যকে মুক্তির ইঙ্গিত শুনিয়েছেন—যে মুক্তির নাম প্রেম, তারাশঙ্করের বহুল নির্দেশিত সার্থকতার পথ।

তারাশঙ্করের তথাকথিত আধুনিক বিষয়বস্তু সংক্রান্ত রচনাগুলি পর্যালোচনা করলে মনে হয় লেখক বলতে চান—আধুনিকতা আঙ্গিক মাত্র, সাহিত্যের প্রাণ প্রেরণা প্রাচীন বা অর্বাচীন কোনো আঙ্গিকে নয়, সে প্রেরণা এমন কোনো বৃহত্তর ধ্যানে ও ধারণায়—যার মূল সর্বকালে প্রসারিত, যার শাখাবিস্তার সংবেদনশীল মানুষের অন্তরে।" ('তারাশঙ্করের শিল্পী-মানস', ড: নিতাই বসু, পৃ ২১৪, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৭৩)।

'জঙ্গলগড়'

জীবনের শেষের দিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মতই তারাশঙ্কর কয়েকটি ক্ষুদ্র উপন্যাস বা ইংরেজিতে যাকে বলে নভেলেট—তাই রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'সপ্তপদী' ও 'বিচারক' উপন্যাসের খ্যাতি সমধিক। কিন্তু বক্ষ্যমাণ রচনাবলীতে প্রকাশিত 'একটি কালো মেয়ে ও চড়ুই পাখী' কিম্বা 'জঙ্গলগড়' যিনিই পড়বেন—তিনিই মুগ্ধ হবেন। প্রবীণ কথাশিল্পীর সাহিত্য-নৈপুণ্য ছড়িয়ে আছে এই দুটি অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিচিত ক্ষুদ্র উপন্যাসের পাতায় পাতায়।

তারাশঙ্করের 'জঙ্গলগড়' ক্ষুদ্র উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাসের পটভূমির ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি দীর্ঘ-কালের। কবে রাজপুতনা-গুজরাটের সীমান্ত থেকে শোলাঙ্কিবংশীয় রাজপুতরা বিজয়ীর বেশে জঙ্গলগড়ে এসেছিলেন। রণদুর্মদ বিজয়ীরা আদিবাসীদের হটিয়ে দিয়ে জঙ্গলগড় এলাকায়

রাজ্যস্থাপন করেন। কালক্রমে আদিবাসীদের মধ্যে যারা আরো বন্য—তারা আরো গভীর বনের মধ্যে আশ্রয় নেয়। আর যারা রইলো ধারে কাছে তারা পাইক সৈন্য দলভুক্ত হয়ে রইলো রাজত্ব রক্ষায়। ঝাড়খণ্ড-জঙ্গলগড় অঞ্চলে অনেক নতুন নতুন রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটলো। এরা মুঘল-পাঠান শাসকদের বশ্যতা মান্য করেনি। এদের বীর্যবত্তা ও ক্ষাত্রশক্তির কাছে মুসলমান রাজশক্তির রক্তচক্ষুর আস্ফালন দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু বাংলার পাঠান সুলতান মহম্মদ ইলিয়াস শাহ এই গহন অরণ্যবাসী রাজন্যদের ধ্বংস করবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন। "সুলতানের সেনাপতি কঠিন আক্রোশে শোলাঙ্কি রাজপুতদের হত্যা করতে হুকুম দিলেন। এ বহ্নিবীজ রাখা চলবে না। এ আবার কোনদিন জ্বলে উঠে সর্বনাশ করবে। নারী শিশু বৃদ্ধ সব হত্যা কর। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তারা বাঁচতে পারে। যুদ্ধে সবল শক্তিমান যারা তারা সকলেই প্রাণ দিয়েছিল, বাকী যারা ছিল তারা ওই বৃদ্ধ শিশু আর নারী।"···

"বৃদ্ধেরা পরামর্শ করলেন—কি করবেন? শাস্ত্রে আপদ্ধর্মের বিধান আছে। সেই বিধান অনুসারে জাতির বীজ এবং অবশেষকে রক্ষা করবার জন্য স্থির হল আপাতত আত্মগোপন করে বাঁচতে হবে। যারা বয়স্ক, যাদের উপনয়ন সংস্কার হয়ে গিয়েছিল, রক্তবর্ণ উপবীত যাঁদের চিহ্ন তাঁরা বনের মধ্যে সমবেত হয়ে, অগ্নিকুণ্ড জেলে রক্তবর্ণ উপবীত অগ্নিকে সমর্পণ করে বললেন—তুমি আমাদের বংশের আদিপুরুষ কুলদেবতা, তোমার কাছে গচ্ছিত রইল আমাদের উপবীত। স্বাধীনতা অর্জন করে এই উপবীত যেদিন চাইব সেদিন তুমি আমাদের ফিরিয়ে দিয়ো।···"

"তারপর আশ্রয় নিলেন স্থানীয় অধিবাসীদের ঘরে। মাইতি মণ্ডল অধিকারী সামন্ত প্রভৃতি নানান ঘরে আত্মগোপন করলেন এবং আশ্রয়দাতার উপাধিতে পরিচয় দিয়ে আত্মগোপন করে তখন বাঁচলেন।" ('তারাশঙ্কর-রচনাবলী', সপ্তদশ খণ্ড, "জঙ্গলগড়")।

* * *

'জঙ্গলগড়' উপন্যাস প্রথম গ্রন্থ-আকারে প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৭০ (ইং ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪)। পৃ ৪+১৫২ ডবলডিমাই সাইজ। প্রচ্ছদশিল্পী: শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। প্রকাশক: ময়ূখ বসু, গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

উৎসর্গপত্র

"শ্রীমান হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

কল্যাণীয়েষু

.২.৬৪"

* * *

এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটিতে তারাশঙ্করের ইতিহাস-মনস্কতার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যৌবনে যে গ্র্যাণ্ট ডাফের তিন খণ্ড মারহাট্টা ইতিহাস কিনে সযত্নে পড়েছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে। সেই সঙ্গে তিনি বীরভূম-মেদিনীপুর এবং মালভূমের আঞ্চলিক ইতিহাসও যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়েছিলেন সেই জ্ঞানের পরিচয় আছে। তিনি আদিবাসী ও চুয়াড় এবং পাইক আন্দোলন সম্পর্কেও গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

'জঙ্গলগড়' উপন্যাসে। এই বিষয়ে তারাশঙ্করের গভীর জ্ঞানের কথা তারাশঙ্করের জীবিত কালেই আলোচনা করেছিলেন সুখ্যাত পণ্ডিত বিনয় ঘোষ।* তারাশঙ্করের মৃত্যুর অনতিকাল পরে তাঁর শয়নকক্ষে বর্তমান নিবন্ধকারের যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানেও তারাশঙ্করের শয়নঘরের পুস্তক সংগ্রহে আঞ্চলিক ইতিহাসের এবং লোকসংস্কৃতির ওপর প্রচুর বই দেখে বিস্ময় জেগেছিল। 'জঙ্গলগড়' উপন্যাসের সংক্ষিপ্তকরণের জন্যে দুঃখ জাগে। উপন্যাসটিতে দ্রুত শেষ করবার ছাপ রয়ে গিয়েছে। খ্যাতিমান সাহিত্যিক কেন যে সংক্ষিপ্ত ভাবে এর সমাপ্তি ঘটালেন তা ভাববার বিষয়।

এই উপন্যাসটি পাঠ করতে করতে রাজস্থানের রাজকাহিনীর কথা মনে পড়ে। বাঙালী নাট্যকার ও সাহিত্যিকদের চিরকালই আরাবল্লীর পর্বতমালা এবং মারহাট্টা ইতিহাসের শিবাজী, তানাজী এবং ভাস্কর পণ্ডিতের দল হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। তারাশঙ্করের রোমান্টিক কবিমনেও রাজস্থানের কাহিনী এসে ভিড় করেছে। আরো বহুদূরের ইতিহাসে আরো একজন শোলাঙ্কি রাজকুমারী ও বাপ্পাদিত্যের প্রেমকাহিনীর সঙ্গে ঝাড়খণ্ড-জঙ্গলগড়ের ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় শ্রেণীর রাজকুমারী রুক্মিণী ও রানা মাধবসিংহের সঙ্গে যেন ঈষৎ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

তারাশঙ্করের কবিতা-চেতনা ও রোমান্টিক কল্পনা এবং প্রেমের বৈচিত্র্য তাঁর সব গল্প ও উপন্যাসেরই প্রধান উপজীব্য। 'জঙ্গলগড'-এও এর অপ্রতুলতা নেই। রাজা মাধব সিংহ এবং আদিবাসী সমাজে প্রতিপালিতা 'দলুইসর্দার' বা দলপৎ সিংহের কন্যা রাজকুমারী রুক্মিণীর প্রেমকাহিনী এবং প্রাসাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র পাঠকদের মুগ্ধ করে। তারপর রাজা মাধবসিংহের আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের পর নারীলোলুপ মুসলমান রাজকর্মচারী মীর হবিবের ভয়ে ভীত দলুই সর্দারের সদলে পলায়ন এবং ক্রমে গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে ছত্রিশগড়ীদের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ এবং বুদ্ধির চাতুর্যে 'ছত্রিশগড়ী' সর্দারকে পরাস্ত করার মধ্যে প্রধান লেখকের রচনার মুন্সীয়ানা ও নাটকীয়তা পাঠককে এক বিচিত্র জগতের সন্ধানে দেয় ও বিস্ময়ে আপ্লুত করে। তারাশঙ্কর ক্রনিকল-ধর্মী রচনায় সিদ্ধহস্ত। এই ক্ষুদ্রকায় উপন্যাসটিতেও তার চিহ্ন বর্তমান।

কুমার অর্জুন সিংহের জন্ম ও ঝুমঝুমির সঙ্গে প্রণয় এবং ব্রাত্য ও অরণ্যচারিণী এই কুমারী নারীর হৃদয়বত্তা ও ভালোবাসা পাঠকচিত্তকে মধুর রসে অভিষিঞ্চিত করে। শঙ্করীপুরের মা শঙ্করী মন্দিরের পুরোহিত শঙ্কর ভট্টাচার্য ঝুমঝুমিকে নতুন নাম দিয়েছিলেন 'অপরাজিতা'। অর্জুনকে ধারণ করিয়েছিলেন লালবর্ণে রঞ্জিত উপবীত। ঝুমঝুমি বা 'অপরাজিতা'র মধ্যে কুমার অর্জুনের যোগ্য নায়িকার সন্ধান পেয়েছিলেন।

'জঙ্গলগড়' উপন্যাসটি শেষ হয়েছে মিলন ও আত্মগ্লানির অগ্নিশুদ্ধির মধ্য দিয়ে। চন্দনগড়ের সিংহাসন আবার দখল করেছে বিশ্বাসঘাতক সুচেত সিংহের মৃত্যুর পরে অর্জুন। তার পিতার প্রধান মহিষীর এবং বিধবা পিতৃসমা ও সম্পর্কিতা ভগিনীর সম্মানরক্ষা পেয়েছে দেবী শঙ্করীর আশীর্বাদে ও তার ক্ষাত্রতেজে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে।

---

*'তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ'; 'শনিবারের চিঠি' তারাশঙ্কর সংখ্যা-আষাঢ়, ১৩৭১

চন্দনগড়ের সিংহাসন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে জঙ্গলগড়ের সিংহাসনে আরূঢ় হয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গী আদিবাসি গিরিকন্যা ঝুমঝুমিকেই করেছে তার পাটরাণী।

অষ্টাদশ শতাব্দী মধ্যাহ্নের এক খণ্ড কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য চিত্র পাওয়া যায় 'জঙ্গলগড়'-এর মধ্যে।

'মহানগরী'

তারাশঙ্কর যে কয়েকটি-আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রচনা করেছেন—'মহানগরী' গ্রন্থটি তার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। পরিণত বয়সে যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস উপহার দিয়েছিলেন তারাশঙ্কর—'মহানগরী'র নাম তার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়।

তারাশঙ্কর সত্য ও বাস্তবের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত বিষয় প্রধানত তাঁর উপন্যাসের ভিত্তিভূমি হিসেবে প্রায়শঃ ব্যবহার করতেন। 'মহানগরী' কিন্তু প্রকৃত অর্থেই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এই উপন্যাসে কল্পনার আশ্রয় তিনি খুবই কম নিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার কাহিনী 'মহানগরী' উপন্যাসে বিধৃত হয়ে আছে।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের সারা বিশ্বব্যাপী মন্দা এবং সে-সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ের গ্রাম থেকে একটি অখ্যাত যুবকের কলকাতায় এসে সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার দুশ্চর সাধনার বাস্তব কাহিনী প্রতিফলিত হয়েছে 'মহানগরী' উপন্যাসে।

অনেক পরে ১৯৬৭ খ্রীঃ তারাশঙ্কর যখন 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' পেয়েছেন—তখন কলকাতা পৌরসভা কর্তৃক তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সে সময়ে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন: এই মহান মহানগরীতে তিনি এসেছিলেন কুণ্ঠা ও দ্বিধা নিয়ে। কিন্তু মহানগরী তাঁকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছিল। আজকের সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহানগরীর দাক্ষিণ্য তিনি সদাসর্বদা মাথা পেতে নিয়েছেন।*

'মহানগরী' উপন্যাসের মধ্যে তাঁর সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনীই ছড়িয়ে আছে। তাঁর উৎসাহদাতা কবি-সমালোচক মোহিতলাল এবং সজনীকান্তের কথা আছে। তাঁর সাহিত্যিক-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারে তারাশঙ্কর সজনীকান্ত দাসের কাছ থেকে অকুণ্ঠ ভালোবাসা এবং বহুবার বহু বিষয়ে সৎ পরামর্শ পেয়েছেন। 'মহানগরী' উপন্যাসে বিমল নামের আড়ালে স্বয়ং তারাশঙ্করই লুকিয়ে আছেন। তাঁর শিল্পী জীবনের প্রারম্ভে—দুঃখ ও কষ্ট এবং অভাব ও দারিদ্র্যের সময় বিমলকে তাঁর বলিষ্ঠ পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়েছিলেন বিজয়বাবু। বিমল চরিত্র তারাশঙ্করের আগেই বলেছি। বিজয়বাবু হোলেন সজনীকান্ত দাস। এ বিষয়ে একটি হৃদয়-বিদারক মর্মন্তুদ কাহিনী তুলে দিচ্ছি তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্য-জীবন' প্রথম পর্ব থেকে:

"...একটি বিচিত্র ঘটনার মধ্যে সজনীকান্তের সঙ্গে লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক স্থাপিত হল। 'বঙ্গশ্রী' আপিসে আমার খোঁজে একদিন হঠাৎ এল এক দপ্তরী, পরিচয় দিলে: আমি 'চৈতালী ঘূর্ণি'র দপ্তরী। সাবিত্রীবাবুর 'উপাসনা'র কাজ করতাম। আমি; চৈতালী ঘূর্ণি'র ফর্মা

* 'কলকাতা কর্পোরেশন' কর্তৃক তারাশঙ্করের সম্বর্ধনা সভা ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়।

আর রাখতে পারব না। একশো বই বেঁধে দিয়েছি দেড় বছর দু বছর আগে। তার কিছু টাকা আমি পাব। আর বাকী ফর্মাগুলি মলাট না দিয়ে বেঁধে রেখেছি, তার টাকা পাব। আপনি আমার টাকা মিটিয়ে বইগুলো নিয়ে নিন। গুদামে আমার জায়গা নেই। এই বই আমি রাখব না। না নিলে পুরনো কাগজের দরে বেচে দেবো ফুট পাথের হকারদের।

আমার পায়ের তলায় কাঠের মেঝে। ধর্মতলা স্ট্রীটে পুরনো আমলের বাড়ির সিঁড়ি এবং সিঁড়ির পর দরদালানের মতো অংশটির মেঝেটিও কাঠের, সেই কাঠের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম, সে কথা মনে রইল না। মনে মনে বললাম, মা ধরণী, দ্বিধা হও, আমি তোমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে এ লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাই। মন্দ কবি-যশপ্রার্থীর সমাধি হয়ে যাক।

'বাবু! কি বলছেন বলুন ?'—কণ্ঠস্বর সেই দপ্তরীর। আমি কি উত্তর দেব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার কাছে গোটা আট-দশ টাকা সম্বল। কে আমাকে এখানে টাকা ধার দেবে ? পৃথিবীটা কালো হয়ে গেল চোখের উপর।

এমন সময় হঠাৎ শুনলাম, ভারী পায়ের জুতোর শব্দ। আরও লজ্জায় মাথা নুয়ে গেল। সজনীকান্তের পায়ের শব্দ অনুমান করতে ভুল হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করলাম এ ঘটনা জেনে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্তের অধরপ্রান্তে ঈষৎ ব্যঙ্গহাস্য খেলে যাবে। তিনি সেই হাসি হেসে একবার বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে যাবেন। সজনীকান্ত দাঁড়ালেন থমকে, জিজ্ঞাসাও করলেন, কি হয়েছে ? কি ?' এমন প্রশ্ন করবার জন্য সজনীকান্তের একটি রূঢ় কণ্ঠস্বর আছে। এর উত্তরে আমি কিছু বলতে পারি নি ; বলেছিল ওই দপ্তরী। সমুদয় কথা বলে সে সজনীবাবুকেই সালিশ মেনেছিল—'আপনিই বলুন বাবু, এই বই রেখে কি করব আমি ? দেড় বছরে—'

তাকে কথা শেষ করতে দেন না সজনীবাবু। ওই রূঢ় কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কত ? কত টাকা পাবে তুমি ?'

'বোধ করি ছাপ্পান্ন টাকা কয়েক আনা' দাবি জানিয়েছিল দপ্তরী।

সঙ্গে সঙ্গে সজনীকান্ত বুক-পকেট থেকে ব্যাগ বের করে তার হাতে ছখানি দশটাকার নোট দিয়ে বললেন, 'এই নাও তোমার টাকা। বই সমস্ত আমার 'শনিবারের চিঠি'র ঠিকানায় তুলে দাও। বাকিটা মুটে ভাড়া রইল। বেশি লাগলে দেব।' বলেই আর দাঁড়ালেন না, ভারী পায়ে শব্দ তুলে কাঠের সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলেন। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার কিছুক্ষণ পর চোখে জল এল।" ('আমার সাহিত্য-জীবন', প্রথম পর্ব, বৈশাখ ১৩৭৬, পৃ. ১১৩-১১৪)।

* * *

পুস্তক-আকারে প্রকাশের পূর্বে 'মহানগরী' উপন্যাসটি ১৩৭১ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যা 'সাত রঙ'-এ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ-আকারে প্রথম প্রকাশ : 'মহানগরী', আষাঢ় ১৩৭৩ (ইং ১৯৬৮)। ডবলডিমাই সাইজ। পৃ. ১৬৫।

প্রকাশক : তুলি-কলম, কলকাতা।

'মহানগরী'র প্রথম সংস্করণ থেকে পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

সপ্তদশ খণ্ড সমাপ্ত